REGISTERED NO C. 37

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ।
[illegible] সংখ্যা।

১লা মাঘ, শনিবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবিতেশ্বর, আবার নবীন বর্ষে তোমার চরণতলে আমরা সকলে উপনীত হইয়াছি। সংবৎসর কাল তোমার করুণার কুশলে অতিবাহিত হইল। তোমার নূতন নূতন দান সম্ভোগ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। তোমার কৃপায় এবার হৃদয়ের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তজ্জন্য আমরা কি কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, কিছুই জানি না। তুমি অসম্ভব সম্ভব কর, এ বৎসর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আগামী বর্ষে পদার্পণ করিয়া আমরা তোমার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। সম্মুখে যে সকল পরীক্ষা আছে সে সকলকে তোমার কৃপায় যাহাতে তোমার অভিপ্রায়সাধনজন্য নিয়োগ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারি, তজ্জন্য বল তুমি বিনা কে আর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে? আমরা পরীক্ষাকে ভয় করি না, ভয় করি এই যে, পাছে বা তোমার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিতে আমাদের অনবধান হয়। আমরা জানি তোমার প্রতি আমাদের দৃষ্টি স্থির থাকিলে কোন পরীক্ষাই কিছু করিতে পারে না। পরীক্ষা তখনই প্রাণবিনাশের কারণ হয়, যখন তুমি সে অবস্থায় আমাদিগকে কি [illegible]তেছ, আমাদের শুনিতে অভিলাষ বা সহিষ্ণুতা থাকে না; প্রলোভন আসিবামাত্র আমাদের মনকে ভুলায়। মন যদি একবার ভোলে, অমনি অন্তশ্চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়, অন্তঃশ্রবণ বধির হইয়া পড়ে। তখন তোমায় দেখিতে পাওয়া যায় না, তোমার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না; সামান্য পরীক্ষাও ঘোরতর হইয়া উঠে। ধন, মান, যশ, বিদ্যা, বুদ্ধি এ সকলই তখন সেই পরীক্ষাকে আরও ঘোরতর করিয়া তুলে, কেন না এ সকল অন্তশ্চক্ষু অন্তঃশ্রবণকে কোথায় দর্শন-শ্রবণে সহায়তা করিবে, না আরও উহাদের বিকার বাড়াইয়া দেয়। হে দেবাদিদেব, নূতন বৎসরের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে উৎসব উপস্থিত, এ উৎসব যেন আমাদের চক্ষুর মালিন্য বিদূরিত করে, শ্রবণের শ্রবণশক্তি বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। ধন, মান, যশ, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই আমাদের আস্থার বিষয় নয়, একমাত্র তুমি আমাদের সর্ব্ববিষয়ে ভরসার স্থল। তুমি যদি বল, তোদের সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর, আমরা যেন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাই করিতে পারি। আমরা জানি, বাহিরের সম্পদ আমাদের সম্পদ্ নয়, আমাদের সম্পদ্ তোমার শ্রীচরণ। এই সম্প-

দের বলে, আমরা অকিঞ্চন হইয়া মহাধনী, ইহা কি আর আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি না। যত বিপদ্ পরীক্ষা কাটাইয়াছি ঐ চরণের গুণে। ও চরণ ছাড়িয়া, হে প্রভো, আমরা আর কিছুই চাই না। আমরা চাই কেবল তোমার শ্রীচরণ, সেই চরণতলে চিরদিন আমাদের বাস হইবে, এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

আমরা কি কেশবকে ভাল বাসি?

আমরা কি ঈশাকে ভাল বাসি, এ বিষয়ের আমরা আলোচনা করিয়াছি। এবার দেখা যাউক, আমরা কেশবকে ভাল বাসি কি না? এ সময় কেশবের স্বর্গারোহণের সময়, সুতরাং আমরা তাঁহাকে ভালবাসি কি না, ইহার আলোচনা এই সময়েই শোভা পায়। কেশবকে ভাল বাসি, এ কথা আমাদের কে আর না বলেন? এমন কি প্রায় প্রতিজনই মনে করেন, তিনি যেমন কেশবকে ভাল বাসেন, এমন আর কে ভাল বাসিয়া থাকে। স্বর্গের এই সকল দূতকে ভাল বাসার অর্থ কি? ভাল বাসার অর্থ ঠিক তাঁহাদের মত হওয়া। পরিমাণে সমান না হউক, জাতিতে এক হওয়া চাই। বিন্দুও জল সিন্ধুও জল, কিন্তু জলের সজাতীয় হইতে হইলে জল হওয়া চাই। তাঁহারা রহিলেন পূর্ব্বে, আমরা রহিলাম পশ্চিমে, এরূপ স্থলে বল সজাতীয় সম্বন্ধ ঘটিবে কি প্রকারে? আমরা কাহাকেও ভাল বাসিতে পারি না, যদি তাঁহার মত না হই। ঈশা প্রভৃতির মত হইলাম না, অথচ তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেছি, ইহা নিতান্ত মিথ্যা কথা। কেশবকে ভাল বাসি, ইহা বলিলেই বুঝায় কেশবের মত কতকটা হইয়াছি।

এরূপ কথা কেহ কেহ আস্পর্দ্ধা মনে করেন, কিন্তু মনে করিলে কি হইবে? কেশবকে যদি কেহ ভালবাসে বলে, তবে তাঁহার কথায় তো তাঁহার অগ্রে বিশ্বাস হওয়া চাই। কেশব কি সে ভালবাসা ভালবাসা বলেন, যাতে তাঁর সঙ্গে চরিত্রে একতা হয় না। চরিত্রে এক হওয়া যা, তাঁহার সহিত এক হওয়াও তাই। তুমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলে না, অথবা কতকগুলি কথা বাদ দিয়া সেইগুলি লইলে যে গুলি তোমার রুচিসঙ্গত, ইহা হইলে তুমি তাঁহাকে যত ভাল বাস তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। কেশবের নামে একটি অপবাদ রটিয়াছে, সে অপবাদ তাঁহাকে যাঁহারা ভাল বাসেন বলেন তাঁহাদের আচরণ হইতে কি উত্থিত হয় নাই? কেশবচন্দ্র স্বাধীনতাকে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের মূল ভিত্তি করিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, এবং তাহাতেই তাঁহার মণ্ডলীর দুর্দ্দশা উপস্থিত, এ কথা আর কে না বলিতেছে? তিনি উপাসনাদি সকল বিষয়েই অদ্বিতীয় ছিলেন, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র বুদ্ধি ও সামর্থ্য ছিল না, সেটি মণ্ডলীকে গঠনদান। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যিনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন, তিনি মণ্ডলী গঠন করিতে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? গঠন-কার্য্য কি পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে চলে? খাঁটি সোণায় গড়ন হয় না, একটু খাদ মিশাইতে হয়। পূর্ণ স্বাধীনতা নামমাত্রে থাকুক, একটু বলপ্রকাশ তাহার সঙ্গে থাকা চাই, তাহা না হইলে মণ্ডলী গঠিত হইবে কেন? আমরা বলি সে মণ্ডলী থাকিয়া কিছু লাভ নাই, যে মণ্ডলী স্বাধীনতাব্যতিরিক্ত অন্য ভূমির উপরে সংস্থাপিত।

কেশবের যে রোগ আমাদের সেই রোগ উপস্থিত, এই কথাই সকলে বলিবেন? তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যাদিতে মুগ্ধ হইয়া যে কয়েক জন একত্র ছিলেন, তাঁহারাও সরিয়া পড়িলেন, এখন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা যদি সাবধান না হন, মণ্ডলীর চিহ্নমাত্রও থাকিবে না, একথা বলিয়া আমাদিগকে যদি কেহ ভীত করিতে চান, করুন, কিন্তু আমাদের আর গত্যন্তর নাই। কেশবের ভাল বাসার নিগড়ে যাঁহারা বান্ধা পড়িয়াছেন, তাঁহারা স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোন বন্ধনে লোকদিগকে একত্র বদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতে পারেন না।

কতকগুলি জড়পিণ্ডকে একত্র বান্ধিলে তাহাতে আর কি কৃতার্থতা হইল? পূর্ণ স্বাধীন পাঁচ জনকে যদি একত্র বান্ধিতে পারা যায় যথেষ্ট হইল। মানুষের মনুষ্যত্ব স্বাধীনতায়, যদি তাহাই গেল, তবে আর তাহার প্রতি আদরের প্রয়োজন কি? অস্বাধীন জীব জন্তু অপেক্ষা আর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব রহিল কোথায়? অথবা অরণ্যচারী জীব জন্তু ভাল, কেন না তাহারা প্রমুক্তভাবে স্ব স্ব আবাস-ভূমিতে বিচরণ করে। স্বাধীনতা বন্ধন হইবে কি প্রকারে, ইহা বলিও না। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারকে তুমি এক করিয়াছ, তাই তোমাতে এ ভ্রম উপস্থিত। স্বাধীনতা—প্রবৃত্তিবাসনাদির অনধীনতা, আত্মস্বরূপের অধীনতা; আত্মস্বরূপের অধীনতার অর্থ ভগবানের অধীনতা; কেন না পিতাপুত্রের স্বরূপের ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। তুমি ও আমি যদি আত্মস্বরূপে অবস্থান করি, তাহা হইলে তোমাতে আমাতে ভেদ থাকিল কোথায়? আমরা দুজনে এক হইলাম। কেশবচন্দ্র এজন্যই স্বাধীন-তাকে আপনার মণ্ডলীর ভিত্তি করিয়াছেন। যদি এ ভিত্তির উপরে মণ্ডলী স্থাপিত না হয়, সে মণ্ডলী কেশবচন্দ্র আপনার বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

তবে কেশবকে ভালবাসিতে হইলে স্বাধীন-তাকে ভাল বাসা আবশ্যক। যাহারা দুজনে দুজনের স্বাধীনতা ভাল বাসে তাহারা এক হইবে না তো আর কাহারা এক হইবে? তবে কেশব চন্দ্রের মণ্ডলীগঠনের পত্তনদানে ভুল হয় নাই, আমাদের চরিত্রের দোষে লোকে উহা ভুল মনে করিতেছে। স্বাধীনতাকে কেন তিনি মণ্ডলীর সর্ব্বপ্রথম উপাদানরূপে গ্রহণ করিলেন, তাহার কারণ এখনও প্রকাশ পায় নাই। কেশব বিশ্বাসী, বিবেকী এবং বৈরাগী। বিশ্বাস নিত্য নূতন বিষয় উপস্থিত করে। যাহারা বিশ্বাসী নহে, তাহারা সে সকল কেবল গ্রহণ করিতে পারে না তাহা নহে, তাহারা তাহার বিরোধী হয়। এখানে বিশ্বাসানুসারে চলিবার পক্ষে স্বাধীনচিত্ততা একান্ত প্রয়োজন। ফলতঃ যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে সে বিশ্বাস নাই, যে বিশ্বাস নূতন নূতন সত্য আনিয়া উপস্থিত করে। যাহার মন দেশীয় রীতি ব্যবহার সংস্কার প্রভৃতিতে আবদ্ধ, সে অস্বাধীন, তাহার নূতন সত্যলাভ ঘটিবে কি প্রকারে? যেখানে স্বাধীনতা আছে, সেখানে বিশ্বাস আছে, বিবেক আছে, বৈরাগ্য আছে। স্বাধীনতা মনকে অজ্ঞানতামূলক বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিল, নূতন সত্য গ্রহণের উপযুক্ত করিল। বিশ্বাস সত্য প্রত্যক্ষ করিল, সেই সত্যকে জীবনের সঙ্গে একীভূত করিবার জন্য বিবেক তাহার স্থান নিরূপণ করিয়া দিল; সংসারাসক্তির বন্ধনবশতঃ সেই সত্যপালনে যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, বৈরাগ্য সে বিঘ্ন অপসারিত করিল। এখন দেখিতে পাইলে কেশবের জীবনে স্বাধীনতা, বিশ্বাস, বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রাধান্য কেন। তাঁহার জীবনবেদের আরম্ভেই দেখিবে, তিনি স্বাধীনভাবে জীবন আরম্ভ করিয়াছেন কি না?

আমরা কি কেশবকে ভাল বাসি? বল এখন এ প্রশ্নের আমরা কি উত্তর দিব? আমরা কি স্বাধীন? আমরা কি বিশ্বাসী, বিবেকী ও বৈরাগী? যদি তাহা না হই, নিশ্চয় আমরা কেশবকে ভাল বাসি না। কেশবকে যখন বিবেকী বলি, তখন তাহার সঙ্গে বিজ্ঞান সংযুক্ত। বিবেক ও বিজ্ঞান এ দুইকে তিনি ঈশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছেন। আমরা যদি বিবেকের আদর করি, আর বিজ্ঞানে অবহেলা করি, কেশবের সঙ্গে আমাদের অনৈক্য ঘটিল। তাঁহাকে আমরা ভালবাসি এ কথা বলা আর তখন কিছুতেই শোভা পায় না। স্বাধীনতা, বিশ্বাস, বিবেক, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য, এ কয়টি আমাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক হইবে, ইহা না হইলে আমরা কেশবের, কেশব আমাদের, এ কথা বলাতে কোন ফলোদয় নাই। বিশ্বাস, বিবেক, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, ইহার মধ্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন ও তাঁহার কথা শ্রবণ রহিয়াছে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। স্বাধীনতায় ঈশ্বরের স্বরূপের

্হিত একতা জন্মিলে তবে তাঁহার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে দেখা উজ্জ্বল পরিষ্কার হয়, এজন্য কেশবের মণ্ডলীবন্ধন স্বাধীনতাতে। স্বাধীন ভাবে অধীন হওয়া, তাঁহার এ কথার অর্থ যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি কেশবানুমোদিত মণ্ডলীর মূল কি বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিশ্বাস বিবেক বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য,এ চারি যে জীবনে মিলিত ভাবে কার্য্য করে না, সে জীবন স্বাধীনভাবে অধীন হইতে পারে না। মণ্ডলীতে যত গণ্ডগোল হইয়াছে,তাহার মূল এই। বিশ্বাস বিবেক বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য যদি আমাদের জীবনে এক হইয়া থাকে তবেই আমরা কেশবকে ভাল বাসি, কেশবের মণ্ডলীর ও পত্তন হইয়াছে, অন্যথা না, ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত।

মাঘোৎসবে নিমন্ত্রণ।

মাঘোৎসব উপস্থিত। আমরা বর্ষে বর্ষে বন্ধুগণকে যে ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকি, এবারও সেই ভাবে নিমন্ত্রণ করিতেছি। সংসার পুরাতন হইয়া যাইতেছে, যাঁহারা যৌবনাবস্থায় উৎসব করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন পলিতকেশ বৃদ্ধ, কিন্তু আমাদের ইষ্টদেবতার গৃহে চিরবসন্ত পূর্ব্ববৎ বিরাজমান। যাঁহারা সে বসন্তবায়ু নিয়ত সেবন করেন, তাঁহারা দেহে দুর্ব্বল জীর্ণ শীর্ণ হইলেও আত্মাতে চিরনবীন, চিরযৌবনসম্পন্ন। কোন কালে আত্মার বার্দ্ধক্য নাই সত্য, কিন্তু মানুষ নিজ নিজ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ বৃদ্ধ না হইয়া আপনাদিগকে বৃদ্ধ মনে করে এবং মনে করে যেন তাহাদিগের জ্ঞানার্জ্জন, প্রেমার্জ্জন, পুণ্যার্জ্জন চরম সীমা লাভ করিয়াছে, আর তাহাদের অর্জ্জন করিবার কিছুই অবশিষ্ট নাই, এখন বার্দ্ধক্যে সুখে আলস্যে অর্জ্জিত বিষয় ভোগ করিবে। শরীর বৃদ্ধ হইলে, মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়া কর্ম্ম হইতে বেতনভুক্ ব্যক্তিগণ যেরূপ অবসর গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা মনে করে, আত্মারও সেই প্রকার অবসর লইবার উপযুক্ত সময় আছে। এদেশের সাধকগণ কতকদিন সাধন করিয়া আপনাদিগকে সিদ্ধ মনে করিতেন, সিদ্ধ হইলে আর কিছু করিবার নাই, কেবল সম্ভোগ। বেতনভুগ্‌গণ বৃত্তিলাভ করিয়া যেরূপ বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করেন, ইঁহারাও সেইরূপ সাধনের পরিশ্রমান্তে বিশ্রামসুখে প্রবৃত্ত। আমাদের মতে ইঁহারা মৃত, জীবনশূন্য। জীবন শূন্য না হইলে কখন বিশ্রামার্থ তাঁহাদের প্রবৃত্তি হইত না।

উৎসব করে কাহারা? যাহারা বালক ও বালিকা। বৃদ্ধগণের উৎসবে কোন অধিকার নাই। সাধে কি নববিধানিগণ ঈশ্বরকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি চিরবালক চিরবালিকা না হন, তাঁহারা উৎসব করিবেন কেন? বৃদ্ধ কি কখন উৎসাহে মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়া থাকে বা দৌড়াদৌড়ী করিয়া বেড়ায়? বৃদ্ধের পক্ষে এরূপ ভাব কখনও শোভা পায় না, তাঁহারা তাহা পারেনও না, বিশ্রামই তাঁহাদের শেষ বয়সের আরাম ও স্বভাব। বালক বালিকাগণ খেলায় কি কখন নিরুৎসাহ, না নিরাশ হয়? পাঁচবার হারিলেও কখন তাহাদের উৎসাহভঙ্গ হয় না, আবার সেই খেলায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের স্বভাবের ভিতরে খেলিবার প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, হারিল বলিয়া খেলা কখন ছাড়িতে পারে না। এই দুর্জ্জয় প্রবৃত্তি আছে বলিয়া তাহারা আপনাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, অসম সাহসে প্রবলের সহিত খেলায় প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত হয় না। যদি কোন কারণে বন্ধুগণের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া থাকে, নিরাশা নিরুদ্যম আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন, উৎসব তাঁহাদের জন্য নয়। যে মন কখন নিরাশ হইতে জানে না, নিরুদ্যম হইতে জানে না, যাহা অদম্য উদ্যমপূর্ণ, সেই মন বালকের মন, এবং সেই মন উৎসবে প্রয়োজন। জননীর অনুরোধ, তাদৃশ মন লইয়া সকলে উৎসবে আসেন। তাই সেই মন লইয়া উৎসবে আসিতে আমরা বন্ধুগণকে অনুরোধ করিতেছি।

চারিদিকে শত নিরুৎসাহের কারণ আছে, ইহা আমরা জানি। কিন্তু যাহারা বালক ও বালিকা তরুণবয়স্ক, তাহারা কি কখন সে সকল গণনা করিয়া থাকে। যদি বলি, তাহারা অজ্ঞান তাই সে সকল গণনায় আনে না, আমরা বয়োবৃদ্ধ হইয়া, সংসারে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া, অজ্ঞান তরুণবয়স্কগণের মত কেন হইব? এত দিন যে জ্ঞান অর্জ্জিত হইল তাহা কি জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে? বৃদ্ধের জ্ঞান লইয়া বালক হইতে হইবে, এই তো নববিধানের গৌরব, সে গৌরব কি আমরা খর্ব্ব করিব? হাঁ বন্ধুগণ, তোমাদের এ যুক্তি শুনিতে ভাল, কিন্তু ইহার মূলে যে বিশ্বাসের অভাব আছে, তাহা কি তোমরা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছ? ঈশা মুষা প্রভৃতি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভাই, তাঁহারা শত নিরুৎসাহের কারণের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন, না কেবলই উৎসাহের কারণ তাঁহাদের সমগ্র জীবন প্রোৎসাহিত করিয়াছিল? শত নিরুৎসাহের কারণকে পদতলে নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া কি তাঁহারা আপনাদের অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই? তাঁহারা যেরূপ নিরুৎসাহের কারণ মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অল্প নিরুসাহের কারণ মধ্যে কি আমাদের জন্ম নহে? তবে নিরুৎসাহের কারণ দেখিয়া, তৎসম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা নিরুৎসাহ হইব কেন? জননীর মুখপানে তাকাইলে কি নিরুৎসাহ থাকে? সে মুখপানে তাকান হয় না, তাই নিরুৎসাহ? তাঁহার মুখে কি আমরা কোন নিরুৎসাহের কথা শুনিয়াছি? যদি না শুনিয়া থাকি তবে আমরা নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইব কেন?

নিরাশ ও নিরুৎসাহ এক কথা, আর মনস্তাপ অন্য কথা। বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মবন্ধুগণের জন্য মনস্তাপ থাকিবে না, ইহা আমরা কোন কালে বলি নাই, কোন কালে বলিব না। উৎসবে ঈশ্বরের চরণতলে আমরা সকল বন্ধুগণকে মিলিত দেখিতে চাই, যদি দেখিতে না পাই তাহাতে মনস্তাপ কেনই বা হইবে না? যে পরিমাণে আমাদের আশা উৎসাহ থাকিবে, উৎসবে সুখসম্ভোগ হইবে, সেই পরিমাণে আমাদের মনস্তাপ ঘনীভূত হইবে। আমরা যাহা সম্ভোগ করিলাম তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইলেন, এ ক্লেশ কিছু সামান্য ক্লেশ নহে। তবে এই ক্লেশের ভয়ে কি আমরা মার আহ্বানে অনাদর করিব? বিচ্ছিন্ন বন্ধুগণকে মিলিত করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত, না মার সাধ্যাধীন? তিনি মন না ফিরাইলে আমরা কি কাহার মন ফিরাইতে পারি? আমরা কাহারও মন ভঙ্গ করিবার জন্য কিছু করিব না, এজন্য আমরা দায়ী, কিন্তু নিজ পাপ অপরাধে কাহারও যদি মনোভঙ্গ হয়, সে বিষয়ে তিনি আপনি দায়ী। লোকে কে কি বলিল, তাহা শুনিয়া কি হইবে? আমরা মনোভঙ্গের কারণ নই, ইহা যদি জানি, এবং মা আমাদিগকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানেন, তাহা হইলে অবশিষ্ট আর যাহা কিছু করিবার মার হাতে রাখিয়া দিয়া আমরা তাঁহার আহ্বানে উৎসবে প্রবৃত্ত হই; জননী আমাদিগকে প্রচুর দানে কৃতার্থ করিবেন। বন্ধুগণ আসুন, আমরা আশা, বিশ্বাস ও উৎসাহে উৎসবে প্রবেশ করি, এবং মার প্রসন্নমুখ দর্শন করিয়া জন্মসার্থক করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি—বিবেক, আমি তোমায় আদর করি। তুমি আমার গৌরবের কারণ, তুমি আমার বংশের ভূষণ। প্রাচীনগণ তোমায় সদসদ্বুদ্ধি বলিয়া থাকেন। তাই বুঝিয়াছি, তুমি ও আমি একবংশজাত। তোমায় আমি মানিতে পারি, কিন্তু বল আমি বিজ্ঞানকে মানিব কেন? বিজ্ঞান বাহিরের সামগ্রী, তুমি অন্তরের সামগ্রী। বাহিরের ব্যক্তিকে আপনার বলিয়া গ্রহণ কি বুদ্ধির কার্য্য? তুমি আমার নিকটে বিজ্ঞানের কথা তুলিও না, আমি চিরদিন তোমায় আদর করিয়া চলিব।

বিবেক—বিজ্ঞানকে অনাদর করিয়া তুমি আমার আদর করিবে, এ কথায় আমি সায় দিতে পারি না। আমি ও বিজ্ঞান কি ভিন্ন? একেরই দুই দিক—বিবেক ও বিজ্ঞান। যেখানে ভিতর আছে, সেখানেই বাহির আছে, ভিতর বাহির লইয়া সমুদায়। আমায় তুমি ভিতরের লোক বলিয়া আদর করিলে, আর বিজ্ঞানকে বাহিরের লোক বলিয়া অনাদর করিলে, এতে

তুমি সু-বুদ্ধি নও, কু-বুদ্ধি ইহাই প্রকাশ পাইল। যদি তুমি সুবুদ্ধি সুমতি হইতে চাও, তাহা হইলে আমাতে ও বিজ্ঞানে কোন কালে পৃথক্ করিও না। তোমার নিকটে তোমার ইষ্টদেবতার কথা আমার ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া সমানে আইসে, আমাদের দুজনের একজনকে অনাদর করিলে জানিও তুমি মহাভ্রমে পড়িবে, এবং তোমার দুর্গতির অবধি থাকিবে না। দুর্গতি কি জান? ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতি।

বুদ্ধি—তুমি বিজ্ঞানকে এত বাড়াইতেছ ইহা আমার ভাল লাগিল না। দেখ পূর্ব্বের যত ধার্ম্মিকগণ তাঁহারা তোমার কথা শুনিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। আর তুমি যেমন নিশ্চয় করিয়া সকল কথা বল বিজ্ঞানতো তেমন করিয়া কিছু বলে না; কেবল সম্ভাবনা দেখায়। যাহা সম্ভাবনা তাহা হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, সুতরাং তাহার উপরে আবার একটা নির্ভর কি? তুমি বল আর আমি শুনি, বিজ্ঞানকে দিয়া কি প্রয়োজন? বিজ্ঞান রোগ ও বিপদের সময় যতটুকু সাহায্য করিতে পারে গ্রহণ করিব; জীবনের বিষয়সম্বন্ধে তুমি আর আমি।

বিবেক—তোমার মুখেই ভুল। ইতিহাস তুমি ভাল করিয়া পড় নাই, হৃদয়ঙ্গম কর নাই, তাই তুমি সুবুদ্ধি না হইয়া কুবুদ্ধি হইয়াছ। আমার কথা শুনিয়া ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, স্বর্গে তাঁহারা গৌরবান্বিত হইয়াছেন, কিন্তু আমার নামের দোহাই দিয়া যাঁহারা শত শত লোককে আগুনে পুড়াইয়াছেন, বিবিধ উপায়ে প্রাণে বধ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি তাহাতে নিরাপরাধী বলিয়া গণ্য? আমার অন্য দিক্ বিজ্ঞানের প্রতি যদি তাঁহাদের আদর থাকিত, তাহা হইলে নিজ নিজ নীচ বাসনার কুহকে পড়িয়া কখন সেই বাসনাকে তাঁহারা আমার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিতেন না। তুমি যদি বিজ্ঞানের প্রতি অনাদর কর, তোমারও সেই দশা হইবে। বিজ্ঞান সম্ভাবনার কথা বলে, অতএব তৎপ্রতি কেন আদর করিব? ইহা কুবুদ্ধিপ্ররোচিত কথা। বিজ্ঞান সেই স্থলে সম্ভাবনা বলে, যে স্থলে কতকগুলি অবস্থাধীনে কতকগুলি কার্য্য হয়। যেমন কতকগুলি রোগ এমন আছে, যাহারা সম্ভাবনারূপে দেহে বিদ্যমান থাকে। সেই সম্ভাবনা কতকগুলি অবস্থার অধীনে প্রস্ফুটিত হয় এবং কতকগুলি অবস্থাধীনে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না, সম্ভাবনামাত্রে থাকিয়া যায়। তুমি বিজ্ঞানের কথায় সাবধান হইয়া নিয়ত আপনাকে শেষোক্ত অবস্থাধীনে রাখিলে তোমাতে সে রোগ প্রকাশ হইতে না পাইয়া কালে সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আর কতকগুলি রোগ আছে, যাহা তোমাতে সম্পূর্ণ প্রকাশ না পাইলেও তোমার সন্তান সন্ততিতে, তাহাদের সন্তানসন্ততিতে প্রকাশ পাইবে। এরূপস্থলে বিজ্ঞান নিশ্চয়াত্মক কথা বলে। যেখানে বিজ্ঞান নিশ্চয়াত্মক কথা বলে সেখানে তাহার নিকট অবনতমস্তক হইতে হইবে, এবং যেখানে সম্ভাবনার কথা বলে সেখানে তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। বিজ্ঞানের সম্ভাবনাবাক্য ও নিশ্চয়াত্মক কথা উভয়ই ঈশ্বরের বাণী, সুতরাং এ দুই না মানা আর আমাকে ও ঈশ্বরকে না মানা একই কথা। আজ এই পর্য্যন্ত, যদি প্রয়োজন মনে হয়, অন্য সময়ে এ বিষয়ের আলোচনা হইবে।

আশ্চর্য্য মৃত্যু।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, ভাগলপুরস্থ বিধানবিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয়তম পঞ্চম পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ ২৩ বৎসর বয়সে জ্বর রোগে গত ৩১শে ডিসেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন, তিনি মুমূর্ষ কালে যে জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দান এবং হৃদয়ের অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিবরণ প্রবন্ধাকারে ভাগলপুর হইতে যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি এস্থলে তাহা প্রকাশ করা গেল।

"এই শোকদুঃখবিপৎসঙ্কুল সংসারার্ণবে মানবতরি কোন অদৃশ্য অজানিত রাজ্যের উদ্দেশে প্রতিনিয়ত ভাসিয়া যাইতেছে, কোন গুপ্ত শক্তি কর্ণধাররূপে অবস্থাবিপর্য্যয়ের অন্তরালে থাকিয়া মানবতরি নিয়মিত করিয়া সেই গন্তব্য স্থানের দিকে লইয়া যাইতেছে, ইহারই প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইবার অভিলাষে মানববুদ্ধি মানবজ্ঞান কত কত বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞান, দর্শন ও শাস্ত্র আবিষ্কার করিল, ইহারই গভীর আলোচনার ফলে কত শত ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হইল! জীবন মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল এবং উহাদের পরস্পরের ভেদাভেদ ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া মানবপ্রকৃতি কত প্রকারের বিশ্বাস ও সংস্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিল! কিন্তু এই সমুদায় বিভিন্ন প্রকারের মত ও বিশ্বাসকে প্রকৃত জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করিয়া মানবাত্মা স্বতই এক যথার্থ নিত্যসত্য ভূমিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিয়া সাধু ভক্তগণ চিরকাল অটল ভাবে অবস্থিত করেন। সংসারের সুখ দুঃখকে তাঁহারা অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল জানিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, এবং মানবের বাসনার নিবৃত্তি নাই বুঝিয়া তাঁহাদের আত্মা তাহাতে নির্লিপ্ত হয়। জরা ব্যাধি মৃত্যু ও তজ্জনিত শোক ও যন্ত্রণা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারা চিরকাল সেই আনন্দ ও অমৃতস্বরূপের আশ্রয়ে থাকিয়া অমর হয়েন, এবং অনন্তকাল আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করেন। মৃত্যুর বিভীষিকাদর্শনে তাঁহারা ভীত হয়েন না; রোগের অসহ্য যন্ত্রণাতে তাঁহাদের প্রফুল্লতা বিনষ্ট করিতে পারে না; ইহকাল ও পরকালের ভেদাভেদ তাঁহারা জানেন না। মৃত্যু তাঁহাদের সমীপে জীবনের অন্যতম পরিচ্ছেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং ইহকাল ও পরকাল একই কথার রূপান্তরমাত্র। ইহাই সাধুবচন; ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মলাভই মোক্ষলাভ। ইহা লাভ হইলে ইহজীবনেই স্বর্গের মধুর আস্বাদন প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ইহাই সশরীরে স্বর্গে গমন উক্ত হয়।

"আমাদের উপাস্য আনন্দরূপমমৃতম্। তিনি আনন্দময়, তিনি অমৃতস্বরূপ। যিনি তাঁহাকে লাভ করেন, তিনি শোক দুঃখ বিমুক্ত হইয়া অনন্তকাল আনন্দে অবস্থিতি করেন, এবং অমৃতরস পান করিয়া মৃত্যুবিরহিত হইয়া অমর হয়েন। এই বাক্য প্রকৃত সাধকের মুখে শোভা পায়; সাধারণ মানব প্রতিমুহূর্ত্তে সংসারের অনিত্য বাসনার ভিতরে জড়িত থাকিয়া ঐ উচ্চ ধর্ম্মের আস্বাদন উপভোগ করিতে পারে না। মানবপ্রকৃতি স্বভাবতঃ অসত্যকে ঘৃণা এবং সত্যকে আলিঙ্গন করিতে চায়, নিরানন্দ নিরাশাকে দূরে ফেলিয়া চির আনন্দ ও আশার অনন্ত রাজ্যের দিকে লক্ষ্য রাখে, ইহসংসারে জীবন ও মৃত্যুকে বিশ্বাস ও জ্ঞাননেত্রে দেখিয়া আত্মার অমরত্বে আস্থা স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু এসংসারে মানবের অবস্থার ব্যতিক্রমে সুখ দুঃখ বিপদ্ সম্পদের তারতম্যে মানবের জীবনগতি সকল সময়ে প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না। সুতরাং অবিশ্বাস ও অজ্ঞানতা আসিয়া মানবপ্রকৃতিকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, এবং আপনার স্বভাবকে ক্ষণকালের জন্য লুক্কায়িত করিয়া রাখে। যখন মানবপ্রকৃতির এই মোহ আবরণ ও প্রহেলিকা ভেদ করিয়া শুভ মুহূর্ত্তে ভগবৎপ্রসাদে এবং তাঁহারই ঘটনাচক্রে জীবন ও মৃত্যুর অভ্যন্তর দিয়া ভগবানের সহিত মানবাত্মার অকৃত্রিম পুলক সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় তখনই মানবের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হয় ও তাহার সেই ক্ষণস্থায়ী অবিশ্বাস ও অজ্ঞানতা দূর করিয়া মানব প্রকৃতি সত্যকে আলিঙ্গন করে ও আনন্দরূপামৃতকে আত্মাতে দর্শন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে, এবং জীবনের সর্ব্ববিধ সমস্যার মীমাংসা করে, অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তের জন্য সেই সাধুবচন প্রকৃত ধর্ম্ম মানব উপলব্ধি করিয়া বিমল আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিয়া শোক সন্তাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ঈদৃশ মুহূর্ত্তের জন্য মানবপ্রকৃতি সর্ব্বদা জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; যখনই সুযোগ পায় তখনই ভগবানের অযাচিত কৃপাবৃষ্টি বর্ষিত হইয়া আবরণমুক্ত মানবপ্রকৃতি নিজ স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং যথার্থ বিশ্বাস ও জ্ঞানযোগে অমৃতরূপের আস্বাদ লাভের উপযোগী হয়। যে মানবাত্মা তাঁহার কৃপাতে এই ভাব পরিপোষণ করিতে সমর্থ হয় তাহারই প্রকৃত সাধন হইল ও তাহারই প্রকৃতি মোহমুক্ত হইবার অবসর পাইল। সুতরাং এই সমস্ত শুভ মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতা মানব আলোচনা ও গবেষণাদ্বারা হৃদয়ে যতই ধারণ করিতে সমর্থ হইবে ততই মঙ্গল। এই শুভ যোগ আমরা ভগবানের অজস্র দয়াতে ও আমাদের পরম সৌভাগ্যে লাভ করিয়াছি। তবে কেন আমরা উহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের ধর্ম্মজীবনের যথার্থ উন্নতি সাধন করি না?

এ সংসারে মৃত্যু অনেকেই সন্দর্শন করিয়াছেন; মৃত্যুর বিভীষিকা অনেকের প্রাণকেই আতঙ্কে পরিপূর্ণ করিয়াছে; মৃত্যুশয্যাতে শায়িত ব্যক্তির রোগ যন্ত্রণা কষ্ট দেখিয়া অনেক পাষাণ প্রাণও বিগলিত হইয়াছে; মৃত্যুর বিষাদপূর্ণ ছায়া সংস্পর্শে অনেকের মনেই অন্ততঃ তৎকালের জন্য বৈরাগ্য ও অনুতাপের উদয় হইয়াছে, এমন কি অনেক পাষণ্ড নাস্তিকের জীবনও কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু এমন মৃত্যু দর্শন কয় জনের ভাগ্যে ঘটে, যে মৃত্যুতে মৃত্যুশয্যাকে অমৃতশয্যা করিয়া দেয়, যে মৃত্যুতে শোক ও নিরানন্দের পরিবর্ত্তে চারিদিক আনন্দ আশা ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়া ফেলে; যে মৃত্যুতে বিশ্বাস ও ভক্তিকে উজ্জ্বল করিয়া মানবকে ভগবানের সন্নিধানে উপনীত করে এবং তাঁহার আনন্দস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপের আস্বাদন উপভোগ করায়; যে মৃত্যুতে সর্ব্বোপরি কেবল পরকালকে ইহকালের সান্নিকট করিয়া ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু যথার্থ ভাবে ইহকাল ও পরকালের ভেদাভেদ দূর করিয়া মানবকে এক অবিচ্ছিন্ন অনন্ত জীবন প্রদান করিয়া অনন্তধামের যাত্রী করিয়া দেয়। এই ভাবে ক্ষণজন্মা সাধু মহাত্মাদিগের পরলোক গমনের প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইদানীং সাধারণ মণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ দৃশ্য আমাদের সম্মুখে ঘটিতে পারে তাহা জানিতাম না। ভগবানের একান্ত আশীর্ব্বাদে আমাদের চিরমঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে সেই জীবনপ্রদ মৃত্যুর কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছেন। তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে আমরা আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাঁহার চরণে অর্পণ করি। তৎপর পাঠকপাঠিকাদিগকে আমাদের অভিজ্ঞতা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে জানাইয়া কৃতার্থ মনে করি। যাহা ব্যক্ত করিব, আশা করি তাহার মধ্যে কিছুই বাহুল্য থাকিবে না, বরং নানা কারণে অসম্পূর্ণ থাকিবে।

"পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্য শ্রুত হইয়াছেন যে গত ৩১শে ডিসেম্বর শনিবার প্রাতঃকালে পরম ভক্তিভাজন ডাক্তার বাবু নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ জীবনের কার্য্য আরম্ভ হইতে না হইতেই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণকে ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স সবে ২৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার জননী অতি পূর্ব্বেই স্বর্গধামে গিয়াছেন, তিনি ইহসংসারে থাকিলে তাঁহার কীদৃশ শোক সন্তাপের কারণ হইত একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই জানেন। তাঁহার সৌভাগ্য গুণেই তাঁহাকে পরিবারের নানাবিধ দুঃখ ও বিপদের ভার বহন করিতে হয় নাই। অধ্যয়নের জন্য নরেন্দ্রনাথ সম্প্রতি এলাহাবাদে গিয়াছিলেন। সেখানেই ভীষণ জ্বররোগে আক্রান্ত হন। সেই অবস্থায় কাশীতে আসিয়া কোন আত্মীয়ের সঙ্গে কিছুদিন থাকেন। সেখানে উত্তম চিকিৎসা ও যত্নসত্বে বিশেষ কোন ফল না হওয়াতে নকুড়বাবু সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে ভাগলপুরে লইয়া আসেন। এখানে আসিয়া জ্বরের উপশম হয়, কিন্তু পুনরায় জ্বর আইসে, এইরূপে তিন বার আক্রমণে রোগের বিষম প্রকোপ শরীর আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহাতেই তাঁহার ইহসংসারের লীলা পরিসমাপ্তি হয়। এ প্রকোপ অনেকেরই হইয়া থাকে: অনেকেই নানাপ্রকার ব্যাধি

যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন, কিন্তু এই মৃত্যু আমাদিগের নিকট এত আলোচনার বিষয় কেন হইয়াছে? কেন আমরা ইহাকে আদরের জিনিষ মনে করিয়া সাধারণের সমীপে উপস্থিত করিতে এত উৎসুক হইয়াছি? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে এই মাত্র বলিব, আমাদের ধর্ম্ম ও বিশ্বাস আমাদিগকে প্রণোদিত করিতেছে। যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছি এবং যাহাতে আমাদের মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছে, তাহাতে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যের ব্যাপার ও অনুভবনীয় মর্ত্ত্যলোকে মৃত্যুর বিভীষিকা সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া অনন্ত সুখশান্তির রাজ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া আমরা এত আগ্রহের সহিত বিশেষ ভাবে আমাদের সমবিশ্বাসী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। নরেন্দ্র নাথের শরীর যতই অবসন্ন হইতে লাগিল, মৃত্যু যতই নিকটে আসিতে লাগিল, বিশ্বাসী পিতা প্রিয় পুত্রের আত্মার কল্যাণের জন্য ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার শেষ কয়েক দিন অনবরত রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতেছিলেন। স্থানীয় সমুদয় কৃতবিদ্য ডাক্তারগণ প্রত্যহ ২৩ বার আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোগীর পার্শ্বে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত যিনিই যাইতেন, তাঁহার অকৃত্রিম স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও মধুর হাসি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। কেহ যদি একটু সেবা শুশ্রূষার জন্য ব্যস্ত হইতেন, সেই শুশ্রূষাকারীর যাহাতে কোন কষ্ট না হয় তাহার জন্য রোগীকে ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন দেখিয়া সকলেই সঙ্কুচিত হইতেন। বিজ্ঞ ডাক্তার পিতা যখন দেখিলেন জীবনের আশা একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, তখন অতি প্রত্যূষে তাঁহার সমবিশ্বাসী আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগকে মুমূর্ষু আত্মার কল্যাণার্থ হরিনাম কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদির জন্য আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। আহ্বান শুনিয়া সকলেই শশব্যস্ত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য রোগী ভক্তিভাজন হরিসুন্দর বাবু ও নিবারণ বাবুকে অকস্মাৎ এসময়ে দর্শন করিয়া ত্রাসযুক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন, "আমি ভয় পাইতেছি।" ঠিক অনুভূত হইল রোগী আপনার অন্তিম কাল অতি নিকটে বুঝিতে পারিয়া মৃত্যুর বিভীষিকা স্মরণ করিয়া ভয়ে জড়ীভূত হইয়াছে। পার্শ্বস্থ সকলে অবাক ও চিন্তিত হইলেন।

বিশেষতঃ তাঁহার আত্মার একান্ত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পিতা, হরিসুন্দর বাবু ও নিবারণ বাবু অতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং ভাবিলেন এ অবস্থায় রোগী হয়তঃ যারপর নাই কষ্ট ও যন্ত্রণা পাইয়া সকলকে শোকে মুহ্যমান করিয়া চলিয়া যাইবে। প্রার্থনা উপাসনাদি হইবে কি না রোগীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, রোগী অত্যন্ত ভয়ের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিল, কিন্তু তখন রোগীকে ইহসংসার পরিত্যাগে প্রস্তুত না দেখিয়া কোন উপদ্রব সংঘটন না করাই শ্রেয় মনে করিয়া প্রায় সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, রোগীর অবস্থা ততই খারাপ অনুভূত হইতে লাগিল। যখন বেলা প্রায় ৩টা তখন রোগী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আপনা হইতে পিতাকে বলিলেন "বাবা, আমার সমস্ত ভয় চলিয়া গিয়াছে, সকাল বেলা সকলকে দেখিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম, এখন কি এক আলোক (light) পাইয়াছি যাহাতে অভয় পাইলাম, মৃত্যুর ভয় একেবারে চলিয়া গিয়াছে, কি যে আনন্দ ও শান্তি হৃদয়ে অনুভব করিতেছি তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। তুমি সকলকে ডাক, তাঁহারা হরিনাম করুন এবং আমি তাঁহাদিগের নিকট হইতে আনন্দ অন্তরে বিদায় নিয়া সুখী হই"। রোগীর মুখ প্রফুল্ল হইল, সর্ব্বমুখে হাসি দেখা দিল, এবং ইতিপূর্ব্বে যে বাক্যের কথা কহিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত তাহার প্রাকৃত কথা স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। সাধক বিশ্বাসী পিতার ঐকান্তিক প্রার্থনা ভক্তবৎসল শুনিলেন। পিতার সমস্ত শোক সন্তাপ দূর হইল। তিনি আবার সকলকে আহ্বান করিলেন। যিনি রোগীর শয্যা পার্শ্বে যাইতে ছিলেন, তাঁহাকেই যথোচিত ব্যবহারে সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পূজ্য যাঁহারা তাঁহাদের পায়ের ধূলী লইলেন, আর অতি প্রসন্ন মুখে একে একে বিদায় নিতে লাগিলেন। যিনি সেই পরলোকযাত্রীর তখনকার হাসি হাসি মুখ ও অবস্থা দেখিয়াছেন তিনিই একেবারে মুগ্ধ হইয়া শয্যা পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। কি সুন্দর স্থান। যিনি কোন কারণে আসিতে পারেন নাই, যিনি বিদেশে আছেন, প্রত্যেকের কথা স্মরণ করিয়া যাঁহার নিকটে বলিলে তিনি জানিতে পারেন, তাঁহাকে যথোচিত নমস্কার প্রণাম দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। সকলকেই বলিতে লাগিলেন "আমি আজ যাচ্ছি, বড় আনন্দে যাচ্ছি, আবার সেখানে সকলের সঙ্গে দেখা হইবে, মাকে পাব, বাবাকে পাব, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলকেই পাইব। তোমরা কেহ শোক করিও না; আমরা বিচ্ছিন্ন হইতেছি না, এখান হইতে অন্য স্থানে যাইতেছি মাত্র"। অবসর ক্রমে রোগী আপন মনে প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনন্ত বিশ্বাস ও একান্তনির্ভর পূর্ণ বাক্যে সকলকে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সন্নিধানে উপনীত করিয়া মানবের শোকদুঃখের অসারতা পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করাইয়া দিলেন। তখন মৃত্যুশয্যা অমৃতশয্যাতে পরিণত হইল। বিশ্বাসী পিতা আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইলেন, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া শোকাশ্রুর পরিবর্ত্তে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই গৃহ আনন্দময়ী মার পবিত্র মন্দির হইয়া উঠিল। যিনি তখন শয্যাপার্শ্বে ছিলেন তিনিই আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া মঙ্গলময় বিধাতার চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে লাগিলেন। সেই গৃহ কি এক অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিল তাহা কথাতে ব্যক্ত করা অসম্ভব। কেবল সমবিশ্বাসী সাধকই কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ একে একে তাঁহার যৎসামান্য আপনার সামগ্রী যাহা ছিল, প্রিয়তম ভাই ও বন্ধুদের দান করিয়া কৃতার্থ

হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন, 'দাদা, তোমাকে আমি কি দিব, আমার ত আর কিছুই নাই, আমি তোমাকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা দিতেছি, ইহা ব্যতীত আমার কি আছে?' পরম পূজনীয় হরিসুন্দর বাবুকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করি, কিন্তু আমার কর্ণ ক্রমে ক্রমে বধির হইয়া আসিতেছে, আমি আর ভাল করিয়া শুনিতে পাইতেছি না।' তখন হরিসুন্দর বাবু ভক্তিভরে বলিলেন, 'বাবা, তোমার আর প্রার্থনার দরকার কি? তুমি ত পেয়েছ?' প্রত্যুত্তরে রোগী বলিল, 'আমি কি তাহা বলিতে পারি?' এই বাক্য যিনি শুনিয়াছেন তিনিই কথঞ্চিৎ বুঝিয়াছেন ভক্তসাধক ভক্তবৎসলকে কি চক্ষে দর্শন করেন, এবং কি প্রকারে সম্মান ও গৌরব রক্ষা করেন! ইতিপূর্ব্বে পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রার্থনা করিতে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা যখন প্রার্থনা করিলেন, তখন রোগী সমস্ত রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন।

"ইহার পরে আস্তে আস্তে রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল, এবং মৃত্যুর ২৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে সামান্ত জ্ঞান লোপ আসিয়া দেখা দিয়াছিল, কিন্তু নাম গান ও প্রার্থনা আরম্ভ হইলেই অচিরাৎ সেই ভাব দূর হইয়া রোগী পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া আবার বিশ্বাস ও আনন্দের বাণী শুনাইতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ প্রত্যূষে ৭ ঘটিকার সময়ে দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন। পিতার শোক করিবার কিছুই নাই, ভ্রাতাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই, পরন্তু ব্রাহ্মসমাজের নিরাশ হইবার কিছুই নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম ইহার সার্থকতাতে যদি কেহ প্রশ্ন করেন তাহাকে আমরা ইহা ব্যতীত আর কি বলিব। যে ব্রহ্ম আমাদের আত্মাতে সতত বিরাজিত, তিনি মঙ্গলময় ও তাঁহার রাজ্য আনন্দ অমৃত রাজ্য। নরেন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁহার মুখে স্বাভাবিক বিনয়সূচক হাসি ভিন্ন ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বের কথা কেহ কখনও শোনেন নাই, অতি অজানিত ভাবে আপনার ক্ষুদ্র জীবনতরি বাহিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু কে জানিত ইহ জীবনেই তিনি অমৃতধনের অধিকারী হইয়া নিজে মুক্তি লাভ করিবেন, আর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে মুক্তি পথের দিকে লইয়া যাইবেন, এবং সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মসমাজকে গৌরবান্বিত করিবেন। এইরূপ মৃত্যু ব্রাহ্মসমাজে যতই ঘটিতেছে ততই মঙ্গল। মৃত্যুভয় যেন ঈশ্বরবিশ্বাসীকে স্পর্শ করে না! এইরূপ মৃত্যু কে না প্রার্থনা করিয়া থাকে? সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা সর্ব্বদা অমৃতধামের শুভ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করি!"

প্রাপ্ত।

(আরাঙ্গ বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় হইতে প্রাপ্ত।)

৮ই জানুওয়ারিতে আমাদের পারিবারিক উপাসনা কার্য্যে বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া আমরা জানিতাম না। তবু উপাসনার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই দিবসীয় ঐতিহাসিক প্রধান ঘটনা-সম্বন্ধে চিত্ত এক অভাবনীয় শক্তির প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। উদ্বোধনে কেশবের স্বর্গারোহণের নানা ভাব আরাধনাতেও ব্রহ্মানন্দের সুন্দর শুভ্র জীবনমূর্ত্তির সুপরিস্ফুট বিকাশ, এবং প্রার্থনা সঙ্গীতেও আনন্দময়ী মার কোলে স্বর্গের শিশু কেশব শোভমান! সব ভাব ধরিয়া থাকাই কঠিন—লিখিয়া ব্যক্ত করা এক রকম অসাধ্য ব্যাপার বলিলেই হয়।

প্রার্থনা।—মা, আজ মৃত্যু চিন্তার দিন বটে—ইহা না করিলেও মনে মৃত্যুর কথা উপস্থিত হয়। কিন্তু মৃত্যু আজ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। কৈ, আর তো মৃত্যু আমাদিগকে ভ্রূকুটি প্রদর্শন করে না! কোথা গেল মৃত্যু, তোমার ধারাল, বিশাল দন্ত? কোথা তোমার সুতীব্র দংশন? জননী, আজ "বিশুদাস" শিশু কেশব তোমার কোলে, তাই বুঝি মৃত্যু শুভ্র বেশ ধারণ করিয়াছে! কেশব তুমি সত্য সত্যই মৃত্যুকে জয় করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি নিজে বাঁধিয়াছ, তাই বলিয়া কি আমরা তোমার প্রশংসা করিতেছি? ও তা নয়—আমরা ভীষণ, প্রাণাপহারী একটা ভয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলাম বলিয়া তোমাকে মনের কথা বলিতেছি। মা আনন্দময়ি! তুমি কেশবের মা, তুমি আমাদের মা। বল তো মা, আমরা কি কল্পনা করিতেছি? পৃথিবী জানে অনেক লোকে দেখিয়াছে, আজ পনের বৎসর হইল কলিকাতা নগরে কেশব মরিয়াছেন, নিমতলার ঘাটে সকলে তাঁহাকে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। তবু মা আমরা বলিব কেশব মরেন নাই। আমরা তোমার উপাসনা করিবার জন্ত তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট, সত্য সত্য বলিতেছি, কেশব এখন এই মুহূর্ত্তে আমাদের সমক্ষে, তোমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। মা, তুমি যদি সত্য হও, তোমার সন্তান যদি সত্য হয়, তা হইলে আমরা সত্যই বলিতেছি, কেশব জীবিত, কেশব এখনো আমাদের আচার্য্য। কেশবের উপদেশবাক্য এখনো আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। মা, আজ কাল প্রমাণ না পাইলে কেহ কোন কথা বিশ্বাস করে না। তবে আমাদের কথা কে গ্রাহ্য করিবে? সুখের সংবাদ বিশ্বাসিজগৎ শ্রবণ করুক, প্রমাণ আছে। আমরা জানি কেশবের মূল ধন, নিজস্ব ধন যা কিছু ছিল, অন্যের ধন লইয়া তিনি তাহা বহুগুণে বিপুলিত করিয়াছিলেন। যিনি কেশবের নিকট যাইতেন তিনিই যে কেশবের প্রেমের জালে ধরা পড়িতেন, তা তাঁর শত্রুরাও স্বীকার করিবে। তিনি নিজেও বলিয়াছেন যে, চুষ কাগজের ন্যায় তিনি সকলের ভিতর হইতে রস টানিয়া লইতে পারিতেন। তিনি দলকে এত ভাল বাসিতেন কেন? এত গৌরব দিতেন কেন? তিনি দেখিতেন তাঁহার জীবন, অন্যের যা ভাল তা লইয়া—তিনি দেখিতেন, অন্যের যা তাঁর তাই, তাঁর যা অন্যেরও তাই, অর্থাৎ আমি আর আমার দল এক। তাঁহার জীবনে এই মূল মন্ত্র সপ্রমাণই হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

উনসপ্ততিতম মাঘোৎসব।

১৯ জানুয়ারী	৬ মাঘ	বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।
২০ "	৭ "	শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা অপরাহ্নে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্ট শাস্ত্রের আলোচনা।
২১ "	৮ "	শনিবার—প্রাতে উপাসনা; অপরাহ্নে টাউন হলে শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক ইংরাজীতে বক্তৃতা।
২২ "	৯ "	রবিবার—শান্তিকুটীর মণ্ডপে সায়ং ও প্রাতে উপাসনা এবং অপরাহ্নে সৎপ্রসঙ্গ।
২৩ "	১০ "	সোমবার—মণ্ডপে প্রাতে উপাসনা; অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন।
২৪ "	১১ "	মঙ্গলবার—মণ্ডপে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।
২৫ "	১২ "	বুধবার—মণ্ডপে ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব, সায়ংকালে শ্রীদরবারের বার্ষিক অধিবেশন।
২৬ "	১৩ "	বৃহস্পতিবার—প্রচারাশ্রমে উৎসব। ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট।
২৭ "	১৪ "	শুক্রবার—প্রচারযাত্রা।
২৮ "	১৫ "	শনিবার—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন।
২৯ "	১৬ "	রবিবার—প্রাতে ও সায়ংকালে উপাসনা।
৩০ "	১৭ "	সোমবার—উদ্যানসম্মিলন।
৩১ "	১৮ "	মঙ্গলবার—শান্তিবাচন।

প্রয়োজন অনুসারে প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

সংবাদ।

বিগত ২৫শে পৌষ (৮ই জানুওয়ারি) রবিবার আচার্য্যের স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে পূর্ব্ব দিন শেষ রজনীতে ধ্যান মনন। ২৫শে পৌষ প্রত্যূষে স্তোত্র পাঠ, পূর্ব্বাহ্ণ ৯ টার সময়, বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, অনেকগুলি বন্ধু ও মহিলা সেই উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। বাঁকিপুর হইতে আগত ভাই দীননাথ মজুমদার উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। ভাই অমৃতলাল বসু প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই দিন উপাসনান্তে সকলে হবিষ্যান্ন ভোজন করেন। অপরাহ্নে বেলিয়াটোলাস্থ উপাসনালয়ে উপাধ্যায় জীবনবেদের একটি অধ্যায় পাঠ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সামাজিক উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। উপদেশে পুনরুত্থান বিষয়ের গভীর ব্যাখ্যা হইয়াছিল।

বিগত ২৫ শে পৌষ মধ্যাহ্নে প্রচারাশ্রমে রামপুর হাটের স্বর্গগত অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। উপাধ্যায় উপাচার্য্যের কার্য্য, তাঁহার সঙ্গে ভাই দীননাথ মজুমদার ও গিরিশচন্দ্র সেন অধ্যেতার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ২১ শে পৌষ বুধবার হুগলির সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকলাল দত্ত মহাশয়ের স্বর্গগত পুত্র জহরলালের পরলোকযাত্রার দিন স্মরণার্থ ডাক্তার মহাশয়ের হারড়াস্থ ভবনে জহর লালের সমাধি পার্শ্বে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য ও শ্রীমান মনোমথধন দে সঙ্গীত করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহাশয় আপন সহধর্ম্মিণী ও পুত্রবধূ সহ হুগলি হইতে সেই দিন আসিয়া উক্ত উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন।

২৫ শে পৌষ আচার্য্যের স্বর্গারোহণের দিনে ঢাকা নগরস্থ নববিধানমণ্ডলীতে বিশেষ উপাসনাদি ও নর্থব্রুক হলে বক্তৃতা হইয়াছিল।

বিগত ২রা অগ্রহায়ণ শনিবার হইতে ৩। ৪ দিন ব্যাপিয়া লক্ষ্ণৌ নগরস্থ নববিধান সমাজের উৎসব হইয়াছে। ভাই অমৃতলাল বসু উৎসবের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ৪ঠা অগ্রহায়ণ আচার্য্যের জন্মদিন ছিল। সেই দিন তিনি তথাকার মন্দিরে আচার্য্যজীবনবিষয়ে বক্তৃতা দান করিয়াছেন। পরদিন রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে উৎসব হইয়াছে। ৬ই সোমবার ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবের সময়ে শ্রীমান বিনয় ভূষণ বসুর নবকুমারের নামকরণ হইয়াছে। কুমারের নাম নন্দবিনোদ বসু ভাই অমৃতলাল বসু পিতামহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান হইতে নিম্নলিখিত পত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে;—

"আচার্য্য দেবের দেহত্যাগের দিন উপলক্ষে বিগত ৮ই জানুয়ারী রবিবার প্রাতে বর্দ্ধমান প্রার্থনাসমাজে বিশেষ ভাবে উপাসনাদি হইয়াছিল। স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবিশ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। বিশ্ববিধাতা আচার্য্যদেবের ভিতর দিয়া পৃথিবীতে নববিধান প্রচার করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপদেশে বিপিন বাবু বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় প্রাচীন বিধানের উৎপত্তি ও পরিণতি, নববিধানে সকল প্রাচীন বিধানের সম্মিলন, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সম্মিলন, সকল দেশের সকল ধর্ম্মের সাধু মহাপুরুষগণের সম্মিলন সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন, এবং উপসংহারে আচার্য্যদেবের জীবন স্বীয় স্বীয় জীবনে করাই তাঁহাকে প্রকৃত সম্মান করা উল্লেখ করিয়া স্থানীয় সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে তদ্বিষয়ে যত্নপর হইবার জন্য অনুরোধ করেন।

মাঘোৎসবের জন্য প্রস্তুতিসূচক সাধন গত ১৮ই পৌষ হইতে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্ নববিধান প্রচার আশ্রমে আরম্ভ হইয়া ২৯ শে পৌষ সমাপ্ত হইয়াছে। গত ২২ শে পৌষ সন্তান-সেবা বা শিশু সেবার দিন ছিল। প্রাতঃকালে তদনুযায়ী প্রার্থনাদি

হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর কয়েকটী বালকবালিকাকে লইয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়, তাহাদের গলদেশে ফুলের মালা ও হস্তে গোলাপ ফুলের তোড়া, পুতুল এবং মহারাণীর মুখাঙ্কিত কতকগুলি সুন্দর গ্লাস প্রদত্ত হইয়াছিল। উক্ত আশ্রমের মহিলারা সযত্নে পিষ্টক মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া উক্ত বালক বালিকাদিগকে খাওয়াইয়াছিলেন। ২৩ শে পৌষ ভৃত্যসেবা ও ২৪ শে দীন সেবার দিনে প্রচার কার্য্যালয়ের ভৃত্যদিগকে লুচি মিষ্টান্নাদি ভোজন করান এবং আতুর আশ্রম ও অনাথাশ্রমে মিষ্টান্নাদি পাঠান হইয়াছিল।

আমাদের পরম বন্ধু হাজারিবাগের পুলিষ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ রায়ের জননী ৭৩ বৎসর বয়সে গত ১৯ শে অগ্রহায়ণ সচৈতন্যে ভগবানের নাম করিতে করিতে স্বর্গগতা হইয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। পরলোকে যাইবার জন্য তাঁহার হৃদয়ের প্রস্তুতি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। "আপনি বাঁচিবেন" এই কথা বলিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেন, এবং বলিতেন, "আমি আর কেন ইহলোকে থাকিব? এরূপ কথা বলিও না, আমি তাঁহার কাছে যাইব।" ঈশ্বরের নামগুণ কীৰ্ত্তন করিতে বন্ধুবান্ধবকে অনুরোধ করিতেন, তচ্ছ্রবণে তাঁহার অতিশয় আহ্লাদ হইত। তাঁহার দয়া প্রেম, শত্রুজনের প্রতি ক্ষমা এবং প্রসন্নতা আশ্চর্য্য ছিল। তিনি কখনও কাহার নিন্দা করিতেন না। সেই বন্দনীয়া বৃদ্ধা হিন্দু মহিলার একমাত্র পুত্র গিরিন্দ্র বাবু সস্ত্রীক নববিধানাশ্রিত ও নববিধানে দীক্ষিত। তাহাতে তিনি কোন দিন ক্ষুব্ধ হন নাই, বরং পুত্রের ধৰ্ম্মপিপাসের জন্য আনন্দ ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। গিরীন্দ্র বাবুর নিবাস হুগলি জিলার অন্তর্গত, হুগলী ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ অন্তর সুগন্ধ্যা গ্রামে। তিনি গত ১৯শে পৌষ নিজ বাটীতে মাতৃশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের প্রায় ৬০ জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা যাইয়া সেই অনুষ্ঠানে যোগ দান করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ হিন্দু আত্মীয়েরা উক্ত শ্রাদ্ধে বিঘ্ন জন্মাইতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, উৎপাত আরম্ভও করিয়াছিলেন। ক্রিয়ায় বা শান্তিভঙ্গ হয় এই ভয়ে গিরীন্দ্রবাবুকে পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শ্রাদ্ধক্রিয়ায় উপাধ্যায় উপাচার্য্যের কার্য্য এবং তাঁহার সঙ্গে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী ও গিরিশচন্দ্র সেন অধ্যেতার কার্য্য করিয়াছিলেন।

উক্ত মাতৃশ্রাদ্ধে নিম্ন লিখিত মত দান হইয়াছিল;—

অমরপুর ব্রাহ্মসমাজ	৪৲
চন্দন নগর ব্রাহ্মসমাজ	৪৲
হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটি ঘড়ী এবং	৭৲
বাঁকিপুর প্রচারাশ্রম	৪৲
ঢাকা প্রচারাশ্রম	৫৲
বৰ্দ্ধমান প্রার্থনাসমাজ	৪৲
বালেশ্বর ব্রাহ্ম সমাজের গৃহ নির্ম্মাণার্থ	৫৲
কলিকাতা প্রচারভাণ্ডার	২০৲
ব্রাহ্ম বেনেবলেণ্ট ফণ্ড	৪৲
অমড়া গড়ী ব্রাহ্মসমাজ	৪৲
কলিকাতা অনাথাশ্রম	৫৲
" আতুরাশ্রম	৫৲
" দাতব্য বিভাগ	৪৲
অমর পুর স্কুলের জন্য	একটী ঘড়ী।
সুগন্ধ্যা স্কুলে পারিতোষিক জন্য	৪৲
কলিকাতা ভিক্টোরিয়া কলেজ	১০৲
বৌদ্ধ সাধক	২৲
মোসলমান সাধক	২৲
খ্রীষ্টান সাধক	২৲
কোন দরিদ্রের গৃহ সংস্কারার্থ	১০৲

হিন্দু সাধকের জন্য পিত্তলের ঘড়া, কাঙ্গালীদিগের জন্য বস্ত্র তণ্ডুল ইত্যাদি এবং ২০ টাকার পয়সা। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য দশটী ভোজ্য শয্যা শতরঞ্জী, থালা, বাটী, জলপাত্র, ছাতা, বিনামা ও গৈরিক বস্ত্র ইত্যাদি। শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার পাঁচ দিন অন্তে প্রায় পাঁচ শত কৃষক ও দুঃখী দরিদ্রদিগকে লুচি মিষ্টান্নাদির ফলার দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীমান্ আশুতোষ রায়ের বিশেষ উদ্যোগে বহরমপুরে শ্রীমদাচার্য্যের স্বর্গারোহণের দিনে বিশেষ উপাসনাদি হইয়াছে।

শান্তিপুর হইতে শ্রীমান্ রাইচরণ দাস লিখিয়াছেন;—

"কৃষ্ণনগরে প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলাম। ঈশ্বরকৃপায় প্রায় প্রতিদিনই কিছু কার্য্য করা গিয়াছে। বাড়ী বাড়ী উপাসনা, কীৰ্ত্তন প্রার্থনা ও আলোচনা হইয়াছে। দুই রবিবারে মন্দিরে কাজ করা গিয়াছে। একদিন স্থানীয় চেরিটী স্কুলে "ঈশ্বর ও সংশয়" বিষয়ে একদিন মন্দিরে "ধৰ্ম্মজীবন" বিষয়ে, একদিন ই, ডি, স্কুলে "ছাত্রজীবনের পবিত্রতা" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে। স্থানীয় উকিল বাবু প্রসন্ন কুমার বসু মহাশয়ের বাড়ীতে একদিন 'হরিদাস ঠাকুরের জীবন" বিষয়ে কথকতা করা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা ও উষাকীৰ্ত্তন হইয়াছে। কৃষ্ণনগর হইতে কয়েক দিন হইল এখানে আসিয়াছি। বড়দিন উপলক্ষে গত পূর্ব্ব রবিবার এখানে বিশেষ উৎসব হইয়াছে। সকালে সন্ধ্যায় দুবেলা উপাসনা উপদেশ ও বৈকালে ছাত্রদের সভায় ঈশাচরিত বিষয়ে বক্তৃতাদি হইয়াছে। এখানেও প্রতিদিন কিছু কিছু কার্য্য হইতেছে। দুইদিন ছাত্রসভায় বক্তৃতা করা গিয়াছে। প্রতিদিন উপাসনা, আলোচনা, কীৰ্ত্তনাদি হইতেছে। এখান হইতে মাঘোৎসবে কলিকাতায় যাইতে বাসনা। ভক্তিভাজন শ্রীমদাচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ দিনোপলক্ষে এখানে বিশেষ উৎসব হইয়াছে। প্রাতে মন্দিরে উপাসনা, মধ্যাহ্নে ২ টার পর হইতে ৪।০টা পর্য্যন্ত "জীবনবেদ" পাঠ হয়। তৎপর মন্দির হইতে নগরে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে বড় বাজার দিয়া শ্রীযুক্ত হীরালাল প্রামাণিকের ডিস্পেন্সরীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তথায় "কেশব জীবন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" বিষয়ে প্রায় সোয়া ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হয়। অনেক লোক প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনিয়াছেন। তৎপর ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালীন উপাসনা 'কেশবের শিক্ষা' বিষয়ে একটী উপদেশ হয়। উপাসনা বক্তৃতাদি কার্য্যে ভগবান্ এ দাসকেই ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

বোওয়ালিয়া হইতে শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ সাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বোওয়ালিয়া পারিবারিক সমাজের ত্রয়োবিংশ সাংবৎসরিক উৎসব নববিধানসমাজের শ্রীদরবারস্থ শ্রদ্ধেয় প্রচারকগণ

দ্বারা সম্পন্ন হয় সকলের এইরূপ ইচ্ছা ও যত্ন ছিল, এই সময়ে তাঁহাদের বোওয়ালিয়া আগমন অসম্ভব ভাবিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মগণ নিম্ন লিখিত প্রণালীতে উৎসব করিয়াছেন ;—১৮ই পৌষ (১লা জানুয়ারী) প্রত্যূষে শ্রীযুক্ত ব্রজলাল দাস মহাশয় প্রার্থনান্তর বন্ধুগণ সহ নগরের স্থানে স্থানে উষাকীর্ত্তন করিয়া নবপুষ্প পল্লব ও পতাকায় শোভিত দেবালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে বিধানবাদী বন্ধু শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ধর মজুমদার মহাশয় গভীর ভাবে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। মধ্যাহ্নে দীন দরিদ্রকে তণ্ডুল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত হীরালাল ধর মজুমদার হৃদয়স্পর্শী উপাসনা করেন। ১৯শে পৌষ (২রা জানুয়ারি) প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ধর মজুমদার মহাশয় প্রেমবিগলিত ভাবে উপাসনা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। ধর্ম্মজীবন দুই ভাবে গঠিত হয়, "এক ভাব অপেক্ষা কথা বড়, অপর কথা অপেক্ষা নিস্তব্ধতা ও ভাব প্রবল" উপদেশের সার এই। মধ্যাহ্নে ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল, পরে নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। উক্ত পারিবারিক সমাজসংস্থাপকের রচিত "এই ভাবে যাবে কি হে এজীবন দীনবন্ধু হে" এই সঙ্কীর্তনটি চারি খানা খোল করতাল সহ প্রমত্ত ভাবে নগরের প্রায় সমুদায় রাজপথে গাওয়া হইয়াছিল। শ্যামাচরণ বাবু এই নগর সঙ্কীর্ত্তনের পরিচালক ছিলেন। ২৫ শে পৌষ (৮ই জানুয়ারি) স্বর্গীয় আচার্য্য দেবের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে তত্রত্য পারিবারিক সমাজের মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তশ্যামাচরণ ধর মজুমদার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

টাঙ্গাইল হইতে প্রেরিত তথাকার সাংবৎসরিক উৎসব বৃত্তান্ত স্থানাভাবে এবার প্রকাশিত হইতে পারিল না।

মহাপুরুষ মোহম্মদের পরবর্ত্তী চারিজন ধর্ম্মনেতা অর্থাৎ নেতৃবর আবুবেকর, ওমর, ওস্মান এবং আলির জীবনচরিত পুস্তক এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকা শত হইবে, মূল্য ।৹ মাত্র। স্ত্রীচরিত্র পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কন হইয়াছে মূল্য ।৹ মাত্র।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় ;

অত্রত্য রামপুর বোয়ালিয়াস্থ ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাংবৎসরিক উৎসব নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১লা পৌষ হইতে ৭ই পৌষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন ব্রাহ্ম আবাসে পারিবারিক উপাসনা হয়। ৮ই পৌষ ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়, বাবু বেণীমাধব মল্লিক মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, ব্রহ্মশক্তির পরাক্রম বিষয়ে উপদেশ দেন। ৯ই পৌষ উৎসব। প্রাতে শ্রদ্ধেয় বাবু শ্যামাচরণ ধর মজুমদার মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, "ধর্ম্ম মৃত কি জীবিত কিরূপে বুঝা যায়" বিষয়ে উপদেশ দেন। অপরাহ্নে শ্রদ্ধেয় বাবু হরিশ্চন্দ্র সান্যাল মহাশয় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন এবং সন্ধ্যার পর বেণী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ব্রহ্মধর্ম্ম প্রগাঢ় প্রেমের ধর্ম্ম" বিষয়ে উপদেশ দেন। ১০ই পৌষ প্রাতঃকালে বেণী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন, "নিরাকার ভগবান্‌কে কিরূপে অনুভব করা যায় এবং ভক্তদিগের মধ্যে ব্রহ্মশক্তির বিকাশ দেখিয়া কিরূপে তাঁহাদিগকে অযথা অবতার বলিয়া ধারণ করে" বিষয়ে সুন্দর উপদেশ দেন। অপরাহ্নে বাবু হেমচন্দ্র মজুমদারের বাটী হইতে "একবার বদন ভরিয়া বল ব্রহ্মনাম দিন যায় রে মন" এই সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগর ঘুরিয়া মন্দিরে মত্ততার সহিত কীর্ত্তন করা হয়, তৎপর বক্তৃতা হয়। প্রথমে শ্রদ্ধেয় প্রাচীন সান্যাল মহাশয় "নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং তৎপর বেণী বাবু "সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র ও ঈশ্বরই পরম গুরু" বিষয়ে বক্তৃতা দেন, এবং পরিশেষে শ্রদ্ধেয় শ্যামাচরণ বাবু 'ধর্ম্মের অপবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহত্ত্ব" বিষয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়া বেদির কার্য্য করেন। ১১ই পৌষ প্রাতে ছাত্রসমাজের উৎসব হয়। এবার অনেক ছাত্র সম্মিলিত হইয়াছিল। প্রথমে বাবু বেণীমাধব মল্লিক মহাশয় উপাসনা করিলে উক্ত সান্যাল মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র সান্যাল কার্পাস সূত্র (উপবীত) ধারণের পুরাকালের উদ্দেশ্য ও বর্ত্তমান সময়ের অযথা ব্যবহার ও নিজে উহা ধারণ করিলে লোককে এক প্রকার প্রতারিত করা হয়, এই সমস্ত সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়া সকলের সম্মুখে ও ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া স্বীয় উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিলে সম্পাদক প্রমত্ত ভাবে নবাগত ব্রাহ্ম যুবককে উপদেশ ও ভগবানের নিকট তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা জীবনে যাহাতে অক্ষত ও রক্ষিত হয়, তজ্জন্য হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করেন। তৎপর ভূতপূর্ব্ব শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মথুরানাথ মৈত্রেয়ের পুত্র শ্রীমান্ আশুতোষ মৈত্রেয় স্বীয় গত জীবনের কার্য্যের জন্য বিশেষ অনুতাপের সহিত ভাবী জীবন অতি পবিত্র ভাবে যাপন করিয়া স্বীয় স্বর্গীয় পিতার নাম গৌরবান্বিত যাহাতে করিতে পারেন ও বিশ্বপিতার প্রিয় সন্তান হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে নিজকে নিয়োগ করিতে পারেন এজন্য ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। শেষে সম্পাদক উক্ত যুবকদ্বয়কে ব্রহ্মসেনাশ্রে প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিয়া ভগবানের নিকট হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে তিন ঘটিকার সময় হইতে দীন দুঃখী আতুর অন্ধদিগকে নূতন কাপড় কম্বল ও পয়সা বিতরিত হইয়াছে, সন্ধ্যার সময় বেণী বাবু উপাসনা করেন। ১২ই পৌষ বনসম্মিলন হয়, বেলা প্রায় ১১টার সময় সহকারী সম্পাদক বাবু গুরু গোবিন্দ সাহার বাটী হইতে "আনন্দে গাইয়া বল আর কিবা ভয়রে" এই কীর্ত্তনটী গাহিতে গাহিতে শিরনের বনস্থিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলে সমবেত হইলে সম্পাদক উপাসনা করেন, ইহার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমান্ আশুতোষ মৈত্রেয় স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে জাতিনির্ব্বিশেষে প্রীতি ভোজন করান। তৎপর সকলে নিবিড় বনস্থলিতে পাহাড় সম অতি উচ্চ স্থানে স্বাধীন ভাবে সাধনাদি করেন, এ দিকে বালক বালিকা সকলে বনফল ভক্ষণ করিয়া বেড়ায়, অতি সুদৃশ্য হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আবার কীর্ত্তন করিতে করিতে কৃষ্ণ কান্ত বাবুর পারিবারিক ব্রহ্মমন্দিরে যাওয়া হয়। অতি প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তন হইলে পরে সম্পাদক সংক্ষেপে ব্রহ্মকৃপার প্রাদুর্ভাব, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বপ্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে, হইতেছে, ও হইবে এবং ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করিয়া প্রাণপণে ব্যাকুল হইয়া উদ্যোগ করিলে কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না ও সমস্ত কার্য্যই অলক্ষ্য ভাবে সুসম্পন্ন হইয়া যায়, তাহা দেখাইয়াও উৎসব শেষ না হইয়া জীবনে নিয়ত স্থায়ী হয়, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। এ দিকে আবার ব্রহ্ম মন্দিরে ব্রাহ্মিকা সমাজ হয়, অত্রত্য হাসপাতালের লেডি ডাক্তার শ্রীমতী বিদ্যুল্লতা দেবী উপাসনা ও উপদেশ দেন।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ	}	বিনত নিবেদক
১৪ পৌষ ১৩০৫ সাল।	}	শ্রীব্রজলাল দাস।
		সম্পাদক ;

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ২রা মাঘ কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

REGISTERED NO C. 37

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ।
২। ৩ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন রবিবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য		২।৹
মফঃস্বলে	ঐ	৩৲

প্রার্থনা।

হে জননী, তোমার করুণায় আমরা যথেষ্ট উৎসব সম্ভোগ করিলাম, সে জন্য তোমায় সকৃতজ্ঞ প্রণাম করি। তুমি অসম্ভব সম্ভব করিতে পার, তাহার প্রমাণ এবারকার উৎসবে বিলক্ষণ দেখাইয়াছ। তুমি গোপনে গোপনে আমাদের কল্যাণের জন্য কত কি করিতেছ, আমরা তাহার সংবাদ লই না। আমরা তোমার সর্ব্বপ্রকার গূঢ় ক্রিয়া বুঝিব, তাহা কখন সম্ভব নহে, কিন্তু তুমি তোমার শরণাপন্ন ব্যক্তিগণের জন্য সকল অকল্যাণ নিরসন করিয়া তাহাদের জীবনের লক্ষ্যসাধনের পক্ষে যাহা প্রয়োজন করিতেছ, এ বিশ্বাস যদি আমাদের না থাকে তাহা হইলে, বল, আমরা আমাদিগকে নিরপরাধী সাব্যস্ত করিব কি প্রকারে? এত কাল আমরা তোমার সকরুণ ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি, অথচ আজও যদি ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আশ্বস্তহৃদয় না হই, তাহা হইলে আমরা তোমার পরিচয় লাভ করিলাম কোথায়? আমরা আজ কত বৎসর উৎসব সম্ভোগ করিয়া আসিতেছি, এমন কোন বৎসর যায় নাই, যে বৎসর তুমি আমাদিগকে কৃতার্থ কর নাই। কেবল উৎসবের কথা কেন বলিতেছি, আমাদের জীবনে এমন দিন যায় না, যে দিনে কোন না কোন আকারে তোমার বিশেষ করুণার আমরা পরিচয় পাই না। সে সকল দেখিয়াও কি আমাদের বিশ্বাস জন্মিবে না যে, তুমি আমাদিগকে যে জন্য ডাকিয়াছ তাহা তুমি অবশ্য সম্পন্ন করিয়া লইবে। চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি না জানিয়া শুনিয়া প্রতিদিন তোমার অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছে,আমরাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তোমার অভিপ্রায় কর্তৃক পরিচালিত হইতেছি সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ভাবে পরিচালিত হইলে তুমি আমাদের দ্বারা যে বিশেষ কার্য্য সাধন করিয়া লইবে তাহাতো আর সাধিত হইল না। আমাদের বিশ্বাস যদি জ্বলন্ত না হইল, দর্শন শ্রবণ অবিচ্ছেদে উজ্জ্বল না থাকিল, পাপ বাসনা ও কামনা অসম্ভব না হইল, তাহা হইলে বল আমাদের জীবনে বিশেষ কার্য্য সাধিত হইল কোথায়? হে কৃপানিধান পরমদেব, আমাদের বিশ্বাস, দর্শন শ্রবণ, জীবনের শুদ্ধি যাহাতে দিন দিন বাড়ে, তুমি এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। তোমার অজস্র কৃপার ফল যদি এই সকলেতে আমাদের জীবনে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে আমাদের জীবন অপরাধশূন্য হয়, এবং উহা

জগতের কল্যাণবর্দ্ধনের হেতু হইতে পারে। হে দেবতা, তোমার কৃপায় আমাদের জীবন সার্থক হইবে, এই আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

ঊনসপ্ততিতম মাঘোৎসব।

বালক বালিকার অদম্য উদ্যম লইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমরা আমাদের বন্ধুগণকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। "যে মন কখন নিরাশ হইতে জানে না, নিরুদ্যম হইতে জানে না, যাহা অদম্য উদ্যমপূর্ণ, সেই মন বালকের মন এবং সেই মন উৎসবে প্রয়োজন." আমাদের এ কথা কত দূর এবারকার উৎসবে প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমাদের তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যে টুকুর ভার আমরা আমাদের পরমজননীর উপরে রাখিয়াছিলাম, সেই টুকু তিনি কত দূর পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাই আলোচনা করিয়া কৃতজ্ঞ, সোৎসাহ এবং বিশ্বাসী হওয়া আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। অমরা লিখিয়াছিলাম, "বিচ্ছিন্ন বন্ধুগণকে মিলিত করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত, না মার সাধ্যায়ত্ত? তিনি মন না ফিরাইলে আমরা কি কাহার মন ফিরাইতে পারি?" যাঁহারা মার আহ্বানে উৎসবে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সাক্ষ্যদান করুন, তাঁহারা এ বিষয়ে মার সামর্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি না? বিচ্ছিন্ন বন্ধুগণকে মিলিত করিবার জন্য কৈ এবার তো কোন উদ্যোগ হয় নাই। আমরা দোষী হইলেও সমাগত বন্ধুগণের কোন বৎসরে এ সম্বন্ধে কোন দোষ বা ত্রুটি দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা এবার তবে মিলনবিষয়ে নিরুদ্যম ছিলেন কেন? তাঁহারাও কি তবে মিলন চান না? তাঁহারা মিলন চান তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? এবার যদি তাঁহারা অন্য অন্য বারের ন্যায় মিলনের জন্য যত্ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের যত্নের সাফল্য দেখিয়া অভিমানী হইতেন, সে অভিমান হইতে জননী তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য তৎপ্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবারই বিষয়। অন্য অন্য বার তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, এবার জননী তাঁহাদের ক্ষোভ নিবারণের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহাদের বিশেষ আহ্লাদ হয় নাই? অনেক দিন হইল মণ্ডলী যাঁহাদের সেবা হইতে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডলীর সেবা করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর আহ্লাদের বিষয় কি হইতে পারে? মন ফিরান মার সাধ্যায়ত্ত, আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে; আমাদের পাপ অপরাধে কাহারও মনোভঙ্গ না হয় এ বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব, এবার যদি এ সত্য প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট।

১ মাঘ শনিবার হইতে ৫ মাঘ বুধবার পর্য্যন্ত উৎসবে বিশেষ প্রস্তুতি জন্য প্রাতে উপাসনা ও সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ৬ মাঘ বৃহস্পতিবার ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট প্রচারাশ্রমে প্রাতে উপাসনা ও সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন হয়। ৭ মাঘ শুক্রবার আলবার্ট হলে অপরাহ্নে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্ট শাস্ত্রের আলোচনা হয়। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করেন। তৎপর উপাধ্যায় পীড়িত থাকায় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধেই ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী কিছু বলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন সংক্ষেপে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

অদ্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা করিতে হইবে নির্দ্ধারিত আছে। সেই অনুসারে এই মাত্র মোহম্মদীয় ধর্ম্মের বিষয় বক্তৃতা প্রদত্ত হইল তৎপর হিন্দুশাস্ত্রের বিষয় আলোচনা হইবে। ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় অত্র সভায় হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করিবেন স্থির ছিল, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তিনি অদ্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই। স্থিরীকৃত বিষয় না হওয়া অন্যায় বলিয়া হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। ধর্ম্মশব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, মনুষ্যের সহিত ঈশ্বরের এবং ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ স্থিরীকরণ ও তদনুযায়ী জীবন গঠনের প্রণালী। ধর্ম্মের মূল মনুষ্যের প্রাণেরসহিত গ্রথিত আছে। যত দিন হইতে পৃথিবীতে বর্ত্তমান স্বভাবযুক্ত মনুষ্য আছে, তত দিন হইতেই মনুষ্য কোন না কোনরূপে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে

যত ধর্ম্ম পৃথিবীতে এখন বর্ত্তমান, সে সমস্তই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন না কোন ধর্ম্মের সংস্কারমাত্র। এইরূপে সংস্কৃত হইতে হইতে পৃথিবীতে নবধর্ম্মের অবতরণ হইয়া থাকে। যদিও ধর্ম্ম সকল দেশে ও সকল কালে আছে এবং সমস্ত ধর্ম্মই ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে, তথাপি জাতিগত ভাবের পার্থক্যবশতঃ এক এক দেশের ধর্ম্ম এক এক ভাবে ঈশ্বরসাধনে প্রবৃত্ত। পাশ্চাত্য দেশের য়িহুদি জাতীয় ধর্ম্মের বাহ্যভাব যাহা হউক এইটী মূল ভাব যে, স্রষ্টা ঈশ্বর এক জন ইচ্ছাময় পুরুষ তিনি মনুষ্য আত্মাকে আপনার করিয়া লইবার ইচ্ছা করেন, মনুষ্য প্রথম অনিচ্ছার পরে স্বেচ্ছায় তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া সুখী হয়। পক্ষান্তরে এদেশের ধর্ম্মের মূলভাব এই যে, ঈশ্বর নির্ব্বিকার উদাসীন অথবা আনন্দময়; মনুষ্য সাধন দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয়। এদেশের পূর্ব্বকালের ঋষিগণ সর্ব্বাতীত নিত্য সত্য ব্রহ্মকে লাভ করিতে উৎসুক হইয়া প্রথম বাহ্য জগতে ও পরে চিন্তন, মনন, ধ্যান ধারণা সমাধিতে আত্মাতে পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে লাগিলেন। একমনে ধ্যানে ব্রহ্মদর্শন এইরূপ হইল যে, প্রাণস্ত প্রাণরূপে দর্শন করিতে করিতে, "এই আমার প্রাণ ব্রহ্ম" এই রূপে দর্শন করিতে করিতে, 'আমিই ব্রহ্ম বা সোহহং সচ্চিদানন্দোহহং" ধারণা হইল। এক দিকে ধর্ম্ম এই চিন্তায় পরিণত হইল, অপর দিকে বেদোক্ত অনুষ্ঠানাদি চলিতে লাগিল। এই বিমিশ্রভাবে অসন্তুষ্ট হইয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ প্রকৃত স্বাভাবিক পথ অন্বেষণ করিলেন, ইহাতেই হিন্দুধর্ম্ম হইতে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম হইল। যাঁহারা এই পৃথক্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন না তাঁহারাও অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মের অন্য ভাবে উপনীত হইলেন। যে ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ তিনিই সংসারে লীলা করিতেছেন। সুতরাং সেই ব্রহ্মশক্তির বিশেষ বিশেষ অবতরণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অবতারবাদের সৃষ্টি হইল। অবশেষে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ দেখিয়া ভাবুকগণ ভক্তিরসে মত্ত হইলেন। এই ব্রহ্মনির্দ্দেশ ও ব্রহ্ম অবতরণ দর্শন ও ভক্তিভাবে সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার অধর্ম্ম অনীতিও সময়ে ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু এই ব্রহ্মান্বেষণ, ব্রহ্মলাভ ও ব্রহ্মভক্তি ভারতীয় আর্য্যজাতির প্রধান ধর্ম্মভাব।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয়ও কিছু বলিতে হইবে। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় কিছু জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে একটা মতমাত্র বা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়মাত্র ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে অতৃপ্ত হইয়া কতকগুলি লোক একটা সম্প্রদায় ভুক্ত হইল, পরে ক্রমে পৃথক্ এবং নূতন সংস্কৃত একটা ধর্ম্ম হইয়া পড়িল। আজ ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিলে—বিশেষ নববিধানের ধর্ম্ম বলিলে জগতে কেহ বুঝিতে পারিবে না আমরা পৃথিবীতে সংস্কৃত হিন্দু বই আর কিছু। সেইরূপ বৌদ্ধধর্ম্মও প্রথমে হিন্দুধর্ম্মের সম্প্রদায় বা শাখামাত্র ছিল। এই টুকু পার্থক্য লইয়া আরম্ভ করিয়া এই ধর্ম্ম কেন পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান ধর্ম্ম হইল এবং অধিকাংশ সভ্য দেশ ইহাকে স্বীকার করিল, ইহা বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব বুঝিতে হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেদবিধি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া শান্তি লাভ হয় না, অথচ সমস্ত ব্রাহ্মণধর্ম্মযাজকেরা সেই সেই ধর্ম্মশাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস ও প্রচার করিয়া তাহার অনুযায়ী হোম ও পশুবলিদান প্রভৃতি করিয়া ধর্ম্মাভিমানে মত্ত ছিলেন। যাগাদির অসারতা বুঝিতে পারিয়া সময় সময় বিশেষ বিশেষ ভাবে তাহার বিরুদ্ধে তেজস্বী ব্যক্তিগণ তীব্র সমালোচনা করেন। এই সমালোচনায় শেষ ও পরিপক্ব ফল শাক্যসিংহের জীবন, বোধ হয় উপস্থিত সকলেই অল্পাধিক জ্ঞাত আছেন। তিনি কপিলবস্তু নগরের শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের একমাত্র পুত্র। বাল্যকালে জ্ঞানলাভের সময় তিনি তীব্র বৈরাগ্য ও ধ্যানশিক্ষা করিয়াছিলেন; যৌবনে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং একটি পুত্রের মুখও দর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর সংসার কেবল রোগ জরা মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখপূর্ণ বুঝিতে পারিয়া এবং সত্যধর্ম্ম সাধনে সেই দুঃখ দূর হইবে ইহাতে একান্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, উনত্রিশ বৎসর বয়সে পিতা পত্নী প্রভৃতি সকলকে মহাশোকে ভাসাইয়া প্রব্রজ্যা করিলেন। প্রাচীন রীতি অনুসারে শিক্ষা ও সাধন করিয়া ঈপ্সিত লাভ হইল দেখিয়া শ্রদ্ধা ও বীর্য্যবলে মনের সকল আসক্তি ত্যাগ করিলেন ও ষট্‌বর্ষসাধনানন্তর শুভ সময়ে সম্বোধিত্ব লাভ করিয়া বাসনা ও ব্যক্তিত্ব মুক্ত হইলেন। তৎপর দীর্ঘকাল স্বীয় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ও বহুসংখ্যক শিষ্য করিয়া অশীতিবর্ষ বয়সে কুশীনগরে মানবলীলা সংবরণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৌদ্ধধর্ম্ম মৌলিকভাবে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় এ ধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মমতসকল স্বীকার করা হইয়াছে, মায়াবদ্ধ, পুনর্জ্জন্ম, দেবলোক দেবতা ইত্যাদিতে বিশ্বাস অনেকাংশে হিন্দুধর্ম্মের অনুরূপ। প্রধান প্রভেদ এই যে, বেদের প্রাধান্য একেবারে ইহাতে অস্বীকার করা হইল এবং ব্রাহ্মণগণকেও বিশেষ উচ্চস্থান প্রদান করা হইল না। মনুষ্য স্বীয় জ্ঞানে সকল দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া শুদ্ধচরিত্র হইলে প্রাধান্য পাইবে ইহাই বিশেষ শিক্ষা। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের বিষয় কিছু বলেন নাই, এবং অত্যন্ত কঠিন বৈরাগ্য প্রচার করিয়াছেন। এ দুইভাব প্রধান থাকিলে সাধারণতঃ মনুষ্যের মন কিছুতেই আকৃষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মত বিশ্বাস এত কঠিন হইলেও যে পিপাসু ব্যক্তি বুদ্ধধর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিত, সেই মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিত। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের গূঢ়তত্ত্ব এক বুদ্ধদেবের চরিত্র। তাঁহার চরিত্রে কি অপার্থিব মিষ্টতা ছিল, কি মোহিনী শক্তি কি এক অসামান্য শক্তি সেই আয়ত লোচনে ছিল যে, যাহার মনে যে সন্দেহ, যাহার মনে যে অভিমান, যাহার যে দুঃখ, সেই শ্রীমুখের বাক্য শ্রবণ করিলেই সকল প্রশমিত হইত। বৌদ্ধগ্রন্থে এখন অনেক যুক্তিতর্ক, মনোবিজ্ঞান ও দর্শন নিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এসকলের মূলে সেই মহাজনের চরিত্রের বলও আকর্ষণ। পণ্ডিতেরা স্থির

করিয়াছেন যে, সেই সময়ে লেখা পড়ার যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল; বুদ্ধবাণী লিখিয়া রাখিলেই সুবিধা হইত; কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা এরূপ গভীর ও কোমল ছিল যে, বুদ্ধবাণী লিখিত করিয়া রাখা যেন একটা পাপ কার্য্যের মত মনে করা হইত। কেবল শিষ্য পরাম্পরাতে বুদ্ধবাক্য পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত হইত। মহাত্মা শাক্যসিংহের মৃত্যুর তিন শত বৎসর পর পর্য্যন্ত বুদ্ধবাক্য এইরূপে মুখে মুখে রক্ষিত হইয়াছিল। পরে ক্রমে পুস্তকে লিখিত হইয়া প্রচারিত হয়। মহারাজা অশোক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত এসিয়াখণ্ডে, বিশেষ ভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রচারক ভিক্ষুগণকে প্রেরণ করেন। এই সকল ভিক্ষুগণই স্বীয় জীবন ও বুদ্ধের শিক্ষাদ্বারা সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক গ্রন্থ সকল এই সময়ে বহুল পরিমাণে লিখিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় যে, যদিও আজ পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহ কত খ্রীষ্টধর্ম্মের গ্রন্থ প্রচার হইতেছে তথাপি বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের সমান হয় নাই। বৌদ্ধশাস্ত্র সমুদ্রবিশেষ, তাহার বিষয় এরূপ সভাতে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করা বাতুলতা হইবে। এজন্যই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সাধারণ লোকের যে দুইটি মহাভ্রম আছে তাহা প্রদর্শন করিয়াই এ আলোচনা শেষ করা যাইবে। প্রথমতঃ সাধারণ লোক ও কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিরও বিশ্বাস যে, বুদ্ধ যখন ঈশ্বরের বিষয় কিছু প্রকাশ করিয়া বলেন নাই ও ঈশ্বরের উপাসনার কোন প্রণালী দেখাইয়া যান নাই, তখন তিনি নাস্তিক ছিলেন। অপর এক শ্রেণীর লোক বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলেন নাই, কোনরূপে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, হয়ত তিনি ঈশ্বরবিষয়ে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু আমি বলি তিনি প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রকৃত ও পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছিলেন ও তাহাই শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া যে মহাবিপত্তি ঘটিয়াছে তাহা আর অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু যখন চিন্তা করিয়া দেখি যে, ২।৩টি মন্ত্র রাখিয়া অবশিষ্ট বেদ অগ্রাহ্য করিয়াও বৈদিক হয়, কেবল নমাজ মাত্র শিখিয়াই মুসলমান হয়, ঈশ্বরের নামমাত্র লইয়া তাঁহার সকল স্বরূপ গুলি বিদায় করিয়া দিয়াও ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলিয়া লোকে মান্য প্রাপ্ত হয়, তখন নামগ্রহণেও বিপদ আছে ও নামগ্রহণ না করা-তেও বিপদ আছে। বুদ্ধদেব ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন এবিষয় আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয় না। বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল কথা, শাক্যের জীবনের মেরুদণ্ড শ্রদ্ধা ও ইহার সহকারী বীর্য্য স্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞা। শাক্যের জীবনের প্রথম হই-তেই এই শ্রদ্ধা ছিল। শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ সত্যের ধারণা। তিনি সত্যরূপে স্থিতি করিয়াছিলেন, সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কখনও তাঁহা হইতে স্খলিত হন নাই। তাঁহার সাধন জ্ঞান-স্বরূপের উপলব্ধি। জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া অনেক বৃথাজ্ঞান লাভ করিতে করিতে, অনেক বৃথাজ্ঞান পরিত্যাগ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার মুক্ত আত্মাতে চিন্ময়রূপ প্রকাশিত হইয়া সমস্ত মায়া কাটিয়া এবং জ্ঞানস্বরূপে প্রবেশ করিয়া তিনি অনন্ত জ্ঞান-সাগরে মিলিয়া গেলেন। এই অনন্ত সাগরে ডুবিয়া তিনি যেমন মিলিয়া গেলেন, তেমনই আপনাকে "বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং" বলিতে অধিকারী হইলেন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মৃত্যুর মৃত্যু হইল; জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নীচ ব্যক্তিত্ব চলিয়া গেল, এবং অনন্তে ডুবিয়া অভাবাত্মক ভাব চলিয়া গেল। ইহাই পূর্ণতা ও আনন্দ লাভ, অথবা বুদ্ধের ভাষায় সম্বোধিপ্রাপ্তি। তিনি স্বয়ং যখন আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন চারি দিকের দুঃখ তাঁহার চক্ষে পড়িল এবং আনন্দ হইতে প্রেমস্বরূপের আরাধনা আরম্ভ হইল। তাঁহার শেষ জীবনের ক্রিয়া এই প্রেমের ব্যাপার। অতিবৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কেবল দেশে দেশে বেড়াইলেন কেন? লোকের দুঃখে এত কাতর হইলেন যে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যিনি পৃথিবীর সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছিলেন তাঁহাকে কোন মহারজ্জু বন্ধন করিয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর নাই। তিনি প্রেমস্বরূপের আরাধনা করিতে গিয়া স্বয়ং অখণ্ড প্রেম হইয়া গিয়াছিলেন। এই প্রেমের ব্যাপারেই তাঁহার জীবনের নিষ্ঠা ও পবিত্রতা। সেই নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে শুদ্ধ স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা তিনি চিরকাল করিয়াছেন এবং প্রেম ও শুদ্ধতার আনন্দ লাভ করিয়া মহাপরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। যাঁহার জীবন একটি মহৎ আরাধনার ব্যাপার, যাঁহার ঈশ্বর ও বুদ্ধের চরিত্রে বিশ্বাস আছে, তিনি বুদ্ধকে বিশ্বাসী ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিবেন না। দ্বিতীয় বিষয় বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাস। আজ কাল বৌদ্ধগণ ও আমাদের ও অন্য দেশের কৃতবিদ্য লোকগণ বলিতেছেন, বুদ্ধদেব ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার নির্ব্বাণ অর্থে আত্মার লোপ। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে এ সংস্কার ভ্রমাত্মক। আমরা বলি বুদ্ধদেব নিজ অহংকারকে বধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়ের রাজা মন ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জ্ঞাত হইয়া ও তাহার উপর কল্পনার সৃষ্টি করিয়া যে ভোগের রাজ্যে বিরাজ করে, বুদ্ধদেব সেই অহঙ্কারের সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া ছিলেন, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, ইত্যাদি তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ মৃত হইয়াছিল; আর ব্রহ্মে জীবিত ব্রহ্মসন্তান দেব-মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা প্রমাণ করিতে বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে ২।৩টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সম্বোধি-লাভের পর বাসনার মৃত্যু হইল, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারবাসনা রহিল। সপ্তাহকাল চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, এই ধর্ম্মপ্রচার করিয়া পৃথি-বীর দুঃখ দূর করিতে হইবে। এই উচ্চ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া একটি প্রিয় শিষ্যের কথা মনে করিলেন, কিন্তু জানিতে পারিলেন সে ব্যক্তি তখন দেহে নাই, ইহাতে কষ্ট হইল (ইহা উচ্চ ভাবের কষ্ট)। মৃগদাবে যখন শিষ্যগণ অবমানিত করিতে ষড়যন্ত্র করিল, তাহাতে তখন কষ্ট হইল না, কিন্তু যখন তাহাদিগের নিকট ধর্ম্মের কথা বলিলেন তখন যেন একটু দম্ভের সহিত বলিলেন "আমি নূতন ব্যক্তি পাইয়াছি, ইহাতেই আমি বলী-য়ান্।" যখন ভিক্ষুগণ কলহ করিল তখন দুঃখিত হইয়া বেণাভূবে

চলিয়া গেলেন, ইহা তাহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখ। যখন দেবদত্ত কতকগুল শিষ্যকে ভুলাইয়া লইয়া গেল তখনও যেন দুঃখ হইব।

ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী খ্রীষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে বলিতে গিয়া ঈশার জীবনের গূঢ়তত্ত্ব বলেন। সেই গূঢ় তত্ত্বের সার এই,—মহর্ষি ঈশা ঈশ্বরকে 'আমার পিতা' 'আমাদের পিতা' এই দুই প্রকারে সম্বোধন করিয়া প্রতিব্যক্তির সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, এবং সমগ্র মানবজাতির সহিত প্রতিমানবের ঈশ্বরেতে নিগূঢ় সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া, ঈশ্বর ও মানব এই উভয়োপরি নূতন ধর্ম্মের পত্তন দিয়াছেন। ঈশ্বরকে জীবন্ত ব্যক্তিরূপে গ্রহণ না করিয়া তাঁহাকে সত্য জ্ঞান প্রেম বা পুণ্য বলিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে গ্রহণ করা হয় না। ঈশার আগমনের পূর্ব্বে এইরূপে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন জাতিকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছেন, ঈশাই কেবল তাঁহাকে প্রতিব্যক্তি ও মানবজাতির সহিত সুমধুর ব্যক্তিগত সম্বন্ধে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

৮ মাঘ শনিবার প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক টাউন হলে বক্তৃতা। বক্তার বিষয়—পরমাত্মার বিধান। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে;—সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে পরমাত্মার প্রভাবে ধর্ম্মের নব নব অভ্যুদয় হইয়াছে। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন, উন্নতি ও অবনতি, এবং অবনতি হইতে পুনরায় নূতন ভাবে উহার অভ্যুদয়, এ সকলই সেই পরমাত্মার ক্রিয়াসম্ভূত। ব্রাহ্মসমাজও এই পরমাত্মার প্রভাবে উদিত হইয়া পরিবর্ত্তন, উন্নতি ও অবনতির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে, এবং যেন মৃত্যুমুখে নিপতিত সময়ে সময়ে ঈদৃশ ভাব প্রদর্শন করিয়া আবার পুনরায় জীবনের লক্ষণ, উন্নতির লক্ষণ এবং আলোকের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে। সকল দেশেই একেশ্বরবাদ আছে, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ একেশ্বরবাদবিষয়ে কিছুতেই বিশেষ নহে। তবে কি ইহার কোন বিশেষত্ব নাই? অন্যান্য দেশের একেশ্বরবাদের সঙ্গে ইহার বিশেষত্ব এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম একান্ত উদার, সকল দেশ সকল ব্যক্তির ধর্ম্মকে উহা আলিঙ্গন করে। অন্যান্য দেশের একেশ্বরবাদ স্ব স্ব সম্প্রদায়ে বদ্ধ। স্ব স্ব সম্প্রদায়ে বদ্ধ ধর্ম্ম বিলক্ষণ প্রোৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু মানবজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইয়া অন্যান্য ধর্ম্মকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লইতে পারে না বলিয়া উহা কালে আপনি বিনষ্ট হইয়া যায়, উন্নতিশীল ধর্ম্ম উহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিবিধ ধর্ম্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, বিশেষতঃ হিন্দু ও খ্রীষ্টধর্ম্ম তাঁহার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। প্রায় পঞ্চবিংশতিবর্ষ ব্রাহ্মধর্ম্ম শঙ্করের ব্যাখ্যাত বেদান্তধর্ম্মের দোষ মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন, কিন্তু এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, শঙ্করের ব্যাখ্যাই বেদান্তধর্ম্মের একমাত্র ব্যাখ্যা নহে। সেই অব্যয় পরমাত্মা সকলের সঙ্গে এক হইয়া রহিয়াছেন; সমুদায় সৃষ্টি তাঁহাতেই সঞ্জীবিত, তাঁহাতেই অবস্থিত, তাঁহাতেই সম্ভাবান্! হিন্দু ধর্ম্মের এ সত্য কিছুতেই অতিক্রম করা যাইতে পারিবে না। বেদান্ত ধর্ম্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্ম মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাব বর্দ্ধিত করিয়াছে। আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে অনীতি প্রবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সে অনীতি ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের অবতারবাদ, দ্বিজত্ব, পুনর্জ্জীবন বর্ত্তমান বিধানে গৃহীত ও অন্তর্ভূত করা হইয়াছে। প্রকৃতিতে প্রকাশমান ঈশ্বরের সহিত একত্ব হিন্দুধর্ম্মের এবং মানবচরিত্রে ঈশ্বরে সহিত একতা খ্রীষ্টধর্ম্মের সারভূত বিষয়। পরমাত্মার বিধান এ দুইকেই একীভূত করে। বর্ত্তমান বিধান প্রাচীন ধর্ম্মসমূহ হইতে সারভূত বিষয় সকল কেবল আপনাতে একীভূত করিয়া লন, আপনার কিছু নূতনত্ব নাই তাহা নহে। সকল প্রকার ব্যবধান ঘুচাইয়া ঈশ্বরের সহিত প্রতিসাধকের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ইহাতে নূতন। ঈশ্বরের এই সাক্ষাৎসম্বন্ধবশতঃ প্রকৃতি ও ধর্ম্মজীবনগত সমুদায় বিষয় নবীভূত

হইয়া বিধানবিশ্বাসিগণের নিকটে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরকে সমুদায় প্রকৃতিতে দর্শন এখন আর খণ্ড-খণ্ডরূপে হয় না, এক অখণ্ড ঈশ্বরের প্রকাশ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞান সাহায্য করেন, এজন্য বর্ত্তমান বিধানে বিজ্ঞানের সমাদর। জড়, পশু, মানব, দেব সকলই কি প্রকারে অখণ্ডযোগে আবদ্ধ এবং ক্রমে এক হইতে অপর উদ্ভূত বিজ্ঞান-চক্ষুতে ইহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়। বাহ্য প্রকৃতি হইতে মনুষ্য প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেখানে পিতার সহিত পুত্রের সম্বন্ধ ঈশাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈশা সম্পূর্ণরূপে আপনাকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার পুত্রত্ব। ঈশাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিবার কারণ এই যে, তিনি ব্রহ্মবাদিগণের প্রধান। প্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে ঈশ্বর আত্ম-প্রকাশ করেন বলিয়া তিনি ও এ দুই এক নহেন। তিনি প্রকৃতিও নহেন, মানবও নহেন। তিনি যেমন এ দুইয়েতে আত্মপ্রকাশ করেন, তেমনি আপনার স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতাও রক্ষা করেন। মানুষ পাপে তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া পড়ে, ইহা যখন এ বিধানে স্বীকৃত হয়, তখন ইহাতে অদ্বৈতবাদের দোষে নিপতিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ বিধানে প্রতিসাধক প্রথমতঃ আপনাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন অনুভব করেন, পরিশেষে দিন দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ যোগ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হন। এ সময়ে আত্মা ঊর্দ্ধ ভূমিতে আরূঢ় হয়, প্রার্থনা ও তৎসিদ্ধি যুগপৎ উপস্থিত হয়, স্বর্গ ও পৃথিবী দুইই জীবন্ত ভাব ধারণ করে। পবিত্রাত্মার সংস্পর্শে সমুদায় প্রকৃতি, সমুদায় ইতিহাস, সমুদায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক হইয়া উঠে। ব্রাহ্মসমাজের তিনটি বিধি প্রতিপাল্য। প্রথম আধ্যাত্মিকতা; এই আধ্যাত্মিকতায় প্রেমে ঈশ্বর ও মানবের সহিত ঐক্য হয়। দ্বিতীয় উদারতার বিধি; এতদ্দ্বারা সমুদায় ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভূত হইয়া যায়, এবং সকল সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হয়। তৃতীয় পুণ্যের বিধি, যদ্দ্বারা মতাদির উপরে চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষিত হয়। যদি এই বিধান আমরা জীবনে রক্ষা ও পূর্ণ না করিতে পারি অন্য জাতি ও অন্য দেশে উহা পূর্ণ হইবেই হইবে, কেন না এ বিধান কোন জাতি বা দেশে বদ্ধ নহে।

৯ই মাঘ রবিবার শান্তিকুটীরে পটমণ্ডপে সায়ং প্রাতে উপাসনা হয়। প্রাতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার প্রথমাংশ সম্পন্ন করিলে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপদেশ দেন। ঐ উপদেশের সার নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

তিন জনকে আজ বিশেষরূপে স্মরণ করি। প্রথম শাক্য এবং তাঁহার অবিদ্বেষ, দ্বিতীয় চৈতন্য এবং তাঁহার প্রেমাকর্ষণ, তৃতীয় ঈশা এবং তাঁহার শুদ্ধচরিত্র। অবিদ্বেষ—প্রেমেরও শুদ্ধাচার-লাভের অঙ্গীকারমাত্র। এই কয়দিন যে সকল কার্য্য হইবে, হে প্রিয়গণ, তাহার মধ্যে তোমাদের ভিতরে—আমার ভিতরে যেন গভীর অবিদ্বেষ, প্রশান্ত সাম্য ও মধুর স্নিগ্ধতা স্থাপিত হয়। ঈশ্বরের চরণে ব্রহ্মের ঘরে বিশেষ উৎসবের সময়ে যদি বিদ্বেষ মানুষের মনকে অধিকার করিয়া থাকিল, তবে আর মঙ্গল কোথায়? প্রেমের সময়ে হিংসা, বৈরাগ্যের অবকাশে ক্রোধ, সুদৃষ্টি ও সুচিন্তার সময়ে কুদৃষ্টি ও কুচিন্তা এবং চিত্তের চঞ্চলতা, ধর্ম্মের গৃহেও এ কি বিপরীত অবস্থা দেখি? এই যে কয়দিনের আনন্দের মিলন, অন্ততঃ এই সময়ে বিরোধ নির্ব্বাণ হউক—অবিদ্বেষ আমাদের হৃদয়ে বাস করুক। যদি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণে তপ্ত প্রাণ সকল এসময়ে তোমাদের প্রেমের ছায়ায় স্নিগ্ধ হইতে পারে, যদি তোমরা প্রবল ঝড়ের মধ্যেও শান্ত ও শুদ্ধচিত্তে কিছু করিতে পার, যদি শত বিরোধ ভিন্নতার মধ্যেও অন্তরে প্রেম ও ক্ষমাকে সযত্নে রক্ষা করিতে পার, তবে তোমাদের সাধন বটে! শাক্যের নির্ব্বাণের আদর করিবে না? চিন্তাতে ভাবেতে ও কার্য্যেতে যখন অপ্রেম এবং অশুদ্ধতা শত শিখায় জ্বলিয়া উঠে, তখন কি তাহাকে প্রেম ও ক্ষমার জল দিয়া নির্ব্বাণ করিবে না? শাক্যের অবিদ্বেষ ও নির্ব্বাণকে আজ আমরা বরণ করি। যখন সকল আগুন নিবিয়া গিয়াছে, বুদ্ধ অন্ধকারের সাগরে নিমজ্জিত, তখনই আগুন জ্বালিবার উপযুক্ত সময়। বাহিরে শীতল বাতাস বহিতেছে, প্রবল শীতে হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে, কোথাও আগুনের চিহ্নমাত্র নাই, তখন তোমাদের ভিতরে প্রাণের চুল্লীতে আগুন জ্বলুক। যদি অবিদ্বেষের—ক্ষমাশীল ভালবাসার অজস্রধারায় প্রাণ অভিষিক্ত হয়, পরস্পরের চরিত্রে স্বর্গীয় ভ্রাতৃত্বের ক্ষমা স্থান পায়, তবে এই মহোৎসবের সময়ে কি তাহার নিদর্শন প্রকাশ পাইবে না? পরস্পরের ভাবের বিরুদ্ধতায় অন্তরে যে অপ্রেমের আগুন জ্বলিতেছে, তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হউক; কথা ও চিন্তা প্রেমের স্নিগ্ধতায় রঞ্জিত হউক, প্রাণে অবিদ্বেষ

ও প্রসন্নতা সঞ্জাত হউক। অতি ছোট তুচ্ছ বিষয় লইয়া যে দ্বেষ হিংসা উত্তেজিত হইয়াছে, যে আগুনে তোমার আমার সকলের হৃদয়ই পুড়িয়া ছাই হইতেছে, এস আজ তাহা নিবাইয়া দি। অন্তরে যে সকল অসদ্ভাব পোষণ করিতেছি, চেষ্টা করিয়াছি দূর করিতে পারি নাই, আজ আবার বিশেষ চেষ্টা করি। বহু বার বিফল হইয়াও সকলের কাছে বলিব ভাই, দশ বার যদি পাপ প্রলোভন ও কুভাবের উদয় হয়, পাঁচবার কি আমি তাহাদিগকে দমন করি নাই? চারিবার সে আমাকে পরাস্ত করিয়াছে, একবার সেও আমার নিকটে পরাস্ত হইয়াছে। এই যে বিপদ পরীক্ষা কিসে ইহা নিবারিত হইবে! শ্রীগৌরাঙ্গ কেমন করিয়া হরিপ্রেম দিয়া সকলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহা কি শোন নাই? তাঁহার প্রেমাকর্ষণে সকল প্রকার হিংসা বিদ্বেষ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, প্রেমের স্রোতে সকল বিরোধের শান্তি ঘটিয়াছিল। তোমার ভিতরে যে প্রেম আছে, তাহার প্রশংসা করি; কিন্তু তোমার ভিতরে আর একজন চৈতন্যময় শুদ্ধ পুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করি। শ্রীচৈতন্যের ভিতরে, গুরুনানকের ভিতরে, ভক্তদিগের ভিতরে এক জন ভক্তবৎসল বাস করিতেছেন, তাঁহার প্রেমের সন্ধান পাইলে, তুমি সকলকে ভালবাসা না দিয়া থাকিতে পারিবে না। ভালবাসা ভালবাসাই বুঝে। ব্রহ্ম প্রেমময় ভালবাসাময়। যদি আমরা মার প্রেমাকর্ষণ ভাল করিয়া বুঝিতাম, তবে দেখিতাম, মা সকলকেই আত্মহারা হইয়া ভাল বাসিতেছেন। এক জন আছেন, তিনি কোন কিছু ধরিয়া কাহাকেও কোল ছাড়া করেন না, যাহারা তাঁহার বক্ষে আঘাত করে, তিনি তাহাদিগকেও বুক পাতিয়া কোল দান করেন। প্রকৃতিতে এই প্রেমের খেলার অভিনয় হইতেছে। জগতে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা বৃক্ষ লতা সকলেই পরস্পরকে প্রেমকরে, আমরাই কি কেবল পরস্পর প্রেমবিহীন থাকিব? তোমার আমার মধ্যে অনেক সাধন আছে, প্রেম আছে, স্বীকার করি না। মনে করিলে বিধাতার কৃপায় তাহা আরও বৃদ্ধি করিতে পার। যদি পার, তাহাই কর—এই উপায়ে প্রেম দিয়া প্রেম প্রাপ্ত হও, ক্ষমা করিয়া ক্ষমা লাভ কর, ভালবাসা দিয়া ভালবাসার আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ কর। মনে রাখিও প্রেমেই জগৎ মুগ্ধ হয়। যদি ভক্তি চাও চরিত্রের শুদ্ধতা চাও, তবে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ও শ্রীঈশার সঙ্গে মিলিত হও। ঈশা চৈতন্যের মিলন না হইলে প্রেম ভক্তির শুদ্ধতা থাকিবে না, প্রেম ও ভক্তির অপব্যবহার হইবে। ঈশার চরিত্রের শুদ্ধতা তোমাতে সংক্রামিত না হইলে, তোমার প্রেম ভক্তি অপবিত্র ভাবুকতায় পরিণত হইবে। যে প্রেমের প্রার্থনা করিয়া আমরা মিলিত হইয়াছিলাম, আজ বৎসরান্তে আবার সেই প্রেমের প্রার্থনাই করি। তিনি কি আমাদের প্রাণের প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন না? কি প্রকারে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, তাহা তিনিই জানেন; আমরাতো ভবিষ্যতের বিষয় কিছুই জানি না। বিগত বৎসর আমাদের কার্য্যে—আমাদের হৃদয়ে—আমাদের সমুদয় উদ্যমে কতটুকু প্রেমের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দান করিবে। ভালবাসিয়া, ভালবাসা পাইয়া আমরা স্বর্গের দিকে চলিয়া যাই। স্বার্থ হিংসা ভুলিয়া আজ যদি পরস্পরকে প্রেম শিক্ষা দান করিতে পার, তবে বুঝিব এক বৎসর আমাদের বৃথা যায় নাই। কিন্তু বাহিরের আলিঙ্গন কোলাকোলীতে প্রেম আবদ্ধ নহে। ভাবের আত্মীয়তার মধ্যে অনেক অসত্য ও অপবিত্রতার সমাবেশ থাকে; বিশুদ্ধ সত্যভাব তাহার মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকবার বলিয়াছি শেষ পর্য্যন্তও বলিব প্রেমের সঙ্গে শুদ্ধতার, শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে ঈশার একত্র মিলন না হইলে যতই অবিদ্বেষ হউক না কেন ধর্ম্ম স্থায়ী হইবে না। অতএব দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত অতি ব্যাকুলতার সহিত, হে প্রিয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ, আজ পবিত্রতার ব্রত গ্রহণ কর। দেখ যেন কোন প্রকার ভয় ও অপবিত্রতা মনে প্রবেশ করিতে না পারে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও মিথ্যা দম্ভ প্রাণে স্থান না পায়। যাহা পাও নাই, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিও না, যাহা আছে, তাহা লইয়াই ব্যবসায় আরম্ভ কর, তাহার কথাই বল, ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন সযত্নে ও কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহাই রক্ষা কর। যাহার বিবেক নিদ্রিত, ভাব ও প্রেম পবিত্র নহে, তাহার অন্তরে আত্মগ্লানির তীব্র দংশন নাই! ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তাহার মস্তকে বর্ষিত হইলেও, সে আশীর্ব্বাদের শীতলতা সে অনুভব করিতে পারে না। প্রেমে শুদ্ধচার এই কয়দিন যদি আমরা সাধন করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই সেই ধর্ম্ম আমাদের অন্তরে জাগিবে যাহা শোকে সান্ত্বনা, বিবাদে মিলন, হিংসায় অবিদ্বেষ, জীবনে মধুরতা আনিয়া উপস্থিত করিবে; স্বর্গবাসী দেবতাগণ যোগী ঋষিগণ আমাদের মস্তকে পুষ্প চন্দন বর্ষণ করিবেন।

মঙ্গলময়, এবার মহাশক্তি দিতে হইবে, যে শক্তিতে আমাদের মধ্যে প্রেমের রাজ্য স্থাপিত হইবে। সেই শক্তি চাই না, যাহা বিরোধে মিলন আনিতে পারে না, যাহা প্রেমের বারি বর্ষণ করিয়া শুষ্ক প্রাণকে গলাইতে পারে না। কিন্তু সেই শক্তি চাই, যাহা প্রাণে অবিদ্বেষ ও প্রেমকে বিকশিত করিয়া দিবে। যে অবিদ্বেষ বিদ্বেষকে সহ্য করে, পরাস্ত করে, ক্রোধাদিকে শীতল করে, আমাদিগকে তাহা দান কর। তোমার সিংহাসনের পার্শ্বে আমাকে আজ একা দাঁড়াইতে দেখিলে তোমার আনন্দ হইবে না, উৎসবে আমরা সকলে তোমার সিংহাসন ঘেরিয়া দাঁড়াইব, তবেই তুমি আনন্দ লাভ করিবে। প্রেম ও ভালবাসাতে আমাদের সকলকে সজ্জিত কর, আকাশ হইতে প্রেমশিশির বর্ষণ কর, প্রাণ শুদ্ধ হউক, ভক্তিকুসুম বিকসিত হউক। যদি প্রাণ প্রেমিক হইয়াও শুদ্ধতা লাভ না করে, তবে তাহাতে তোমার তুষ্টি হয় না

প্রেমিকেরা যেখানে মিলিত হন, ভক্তির ভারে পৃথিবী সেখানে অবনত হইয়া পড়ে। তোমার অজস্র প্রেম পাইয়াও কি আমাদের প্রাণ এই কয় দিন ভক্তিতে ভাসিবে না? হে মুক্তিদাতা, দুর্ব্বিনীত আমরা আমাদিগকে মুক্ত কর, পরিবর্ত্তিত কর। আমাদের আত্মীয়গণের চরিত্র ও কার্য্য মধুময় হউক। আমাদের সকলের উপরে পুষ্প চন্দন বর্ষণ কর। আমরা শান্ত ভাবে শুদ্ধ চরিত্র হইয়া ভক্তিতে মাতিয়া উৎসব করি তব শ্রীপাদপদ্মে এই আমাদের প্রার্থনা।

অপরাহ্ণে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি যে উপদেশ দেন তাহার সার নিম্নে নিবদ্ধ হইল।

বন্ধুগণ, আমরা উৎসব সম্ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; স্বর্গের দরজা আমাদিগের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। উৎসব সম্ভোগ আমাদিগের পক্ষে স্বর্গসম্ভোগের আশা হইতে উচ্চ না হইতে পারে, কিন্তু এই জাতীয় বটে। অদ্যকার দিনে স্বর্গের বিষয় আলোচনা করা স্বাভাবিক। স্বর্গে যাইতে হইলে কি করিতে হয়? সকলেই জানেন ভবসাগর পার হইয়া স্বর্গে যাইতে হয়। আমরা পরমেশ্বরকে ভবকাণ্ডারী বলি: তিনিই এই ভবসাগরের ত্রাতা, তিনিই ভবসাগরের একমাত্র নৌকা এইরূপ বলি। প্রকৃতই, যদি এই ভবসাগর পার হইতে না পারি তবে কি স্বর্গ সম্ভোগ করিতে পারি? কখনই সম্ভব নয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, উৎসব সম্ভোগ করিব অথচ ভবসাগর পার হইব না, ইহা কি হইতে পারে? এই জন্য বলি এই সমুদ্র পার হইতে হইবে; যদি স্বর্গ রাজ্যে যাইতে হয় তবে এই ভবসমুদ্র পার হইতে হইবে। তবে আসুন সাগর পার হইবার উপায় চিন্তা করি। এ সাগর কোথায়? ভূগোলে ত এ সাগরের উল্লেখ নাই; পৃথীবিতে ত এ সমুদ্র নাই। তবে কোথায়? আমি বলি ইহা অন্তরে। ভবসাগর বিশ্বাসরাজ্যে জ্ঞানরাজ্যে ও প্রাণরাজ্যে। এখন কি বলিতে পারেন, তাহা ভূতকালে, কি ভবিষ্যতে কি বর্ত্তমানে? সম্মুখে কি পশ্চাতে? সকলেই বলিবেন ভবসাগর সম্মুখে। আমি এবং আমার ঈশ্বর এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান তাহাই ভবসাগর; অতএব ভবিষ্যতে। কিন্তু আমি বলি ইহা ভবিষ্যতে নয়; বর্ত্তমানে কিছু, আর সমস্তই ভূত কালে। কেহ বলিতে পারেন কি, মৃত্যুর মুহূর্ত্তে কে পার করিবে। সেই সময় সুখে চলিয়া যাওয়াই ভবপার হওয়া। কিন্তু আমার জন্মের বিষয় আমি যেমন কিছুই জানি না, মৃত্যুর বিষয়ও সেইরূপ কিছুই জানি না। কিরূপে মৃত্যু হইবে সে চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। তাই বলিতেছি ভবসাগর, জীবনসাগর কিরূপে পার হইতে হইবে তাহা জানা নাই। এই জীবনসাগর কি? সংসারে প্রত্যেক মানুষ ৪০ বৎসর কি ৫০ বৎসর, যে যতকাল বাস করিয়াছেন তাহাই তাঁহার জীবনসাগর। এই যে দেহ মন আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছি, কত অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়া বর্ত্তমান ভাবে উপস্থিত হইয়াছি তাহা কি কেহ বলিতে পারেন? জন্মের সময় জড়বৎ ছিলাম; মন আত্মা আছে কিনা তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু তাহারই মধ্যে ক্রমে জ্ঞান আসিল, প্রেম আসিল, পরমাত্মার স্বরূপ ধারণা করিতে পারে এইরূপ এক আত্মার সৃষ্টি হইল। জীবনের অতীত কালের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই তাহা জড় ভাবেই কাটিয়া গিয়াছে। অতি অল্প সময়ই পরমাত্মার সহিত যোগে যুক্ত হইয়া কাটিয়াছে; অবশিষ্ট কাল মনুষ্যনামক জীব ছিলাম। কিন্তু তখনও পরমাত্মার অংশ যে আত্মা তাহা আমার ভিতরে ছিল কেবল আমি দেখিতে পাই নাই। জীবনের এতদিন চলিয়া গেল, এ সময়ের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করা হইল না, আমি যে পরমাত্মার অংশ তাহা দেখিতে পাইলাম না; অতএব এতদিন জড়ভাবেই জীবন যাপন করিয়াছি। এই জড় জীবনই সমুদ্র হইয়াছে। অযোগী জীবনই বৃহৎ সমুদ্ররূপে আমি এবং আমার ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে। এই সমুদ্র যদি পার হইতে পারি তবেই স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতে পারিব। এই যে আমরা ভগবানের সাতটী স্বরূপের উপাসনা করি তাহার প্রত্যেকটি আমাদিগের উপর কতটা কাজ করে তাহা এক এক দিনের জীবন আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারি। কোথায় আজ সত্যস্বরূপের লীলা দেখিলাম, কাল কোথায় জ্ঞানস্বরূপের দেখিলাম; এইরূপে কোথায় প্রেমস্বরূপ, কোথায় পুণ্যস্বরূপ ইত্যাদির লীলা দেখিলাম এবং সেই সকল স্বরূপের কেন্দ্রস্বরূপ ভগবান্‌কে কিরূপ দেখিলাম, তাহা প্রত্যেক দিনের জীবনেই অনুভব করা যায়। যদি আমাদের জীবনকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করি তবে একটি জড়জীবন আর একটি ব্রহ্মযোগযুক্ত জীবন দেখিতে পাই। যতই জীবনের পশ্চাৎ ভাগ আলোচনা করি—ততই দেখিতে পাই পূর্ব্ববৎসর আত্মার অবস্থা যেরূপ ছিল তাহার পূর্ব্ববৎসর তদপেক্ষা কিছু অবনতাবস্থা ছিল, তাহার পূর্ব্ববৎসর আরও কিছু অবনতাবস্থা ছিল। জীবনের এই অবনতাবস্থাই ভবসমুদ্র। যেখানে মানুষের সহিত বিরোধ, বিচ্ছেদ, নিষ্ঠুরতা, ও দুর্ব্বলতা সেইখানেই ভবসমুদ্র। এই সমুদ্র পার হইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। তিনি দয়া করিয়া আমার হীন অবস্থা মধ্যেও তাঁহার প্রেম পুণ্যের লীলা দেখাইয়া দিলেন। এইরূপে পশ্চাতে যাইতে যাইতে আর বেশী দূর যাইতে পারি না, স্মৃতিতে কুলায় না। তখন কি করিব? আমার যে অবস্থার কথা স্মরণ নাই, পরের জীবনে তাহা দেখিতে পাইব। আমার অতি শৈশবাবস্থা স্মরণ নাই, আমি এখন শিশুর জীবন দেখিতে পারি। শিশুর জীবনে ভগবানের কিরূপ লীলা এখন তাহা দেখা সম্ভব। সেই লীলা যত দেখিব তত স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, আমার জীবনেও ভগবানের কিরূপ লীলা ছিল। ক্রমে কল্পনাযোগে জন্মকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রত্যেক অবস্থা বুঝিতে পারি। আমার আত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া কত অবস্থা হইতে উন্নত হইয়াছে তাহা

এখন ব্রহ্মজ্ঞানে অনুভব করিতে পারি। এই ব্রহ্ম লীলাদর্শনেই স্বর্গে যাইতে হইবে; জীবনসাগর এইরূপে পার হইতে হইবে। ভগবান্ আমাদের সহিত চিরকাল ছিলেন, এখনও আছেন, পরকালেও থাকিবেন। আমি স্বর্গের জীব, আমার পিতা মাতা ভ্রাতা, অগ্রজ সাধু পুরুষগণ সকলেই দেবাংশ, এবং ভগবান্ সকলের আত্মায় বিরাজ করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন। অদ্যকার জীবন পার্থিব নয় স্বর্গীয়; ভগবান্ সকলকেই স্বর্গে রাখিয়াছেন আজ ইহাই অনুভব করিতে হইবে। যাঁহারা পার হইতে চান, তাঁহারা জড়ভাব ত্যাগ করিয়া দেবভাবে স্বর্গীয়ভাবে এই উৎসবে যোগদান করুন। সকলে জড়ভাব ত্যাগ করিলে ভগবান্ সহায় হইবেন এবং তিনিই এই ভবসাগর পার করাইয়া স্বর্গধামে স্বধামে লইয়া যাইবেন।

১০ই মাঘ সোমবার প্রাতে পটমণ্ডপে উপাসনা, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী দ্বারা সম্পাদিত হয়। সায়ংকালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন। শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে মন্তব্য ব্যক্ত করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মানুরাগী, সাধু অনুষ্ঠানকারী ও সত্যধর্ম্মের সহানুভূতিকারীদিগকে কৃতজ্ঞতা দেওয়া হইল। তদনন্তর ইউনিটেরিয়ান ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত ফ্লেচার উইলিয়াম সাহেব সংক্ষেপে বক্তৃতা করেন। ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্মমত যে প্রায় ব্রাহ্মধর্ম্মেরই অনুরূপ ইহা তিনি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলনবিষয়ে কিছু বলিলে সভা ভঙ্গ হয়।

১১ই মাঘ মঙ্গলবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। পটমণ্ডপ অতি সুন্দররূপে সজ্জিত, ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা ও উপাসকগণেতে পূর্ণ। প্রাতে ৮ টার সময়ে সঙ্গীতে উৎসব কার্য্যের আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার উপদেশের সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যখন কোন মহাদিনে, মহাক্ষণে মানুষের আত্মা অখণ্ড হইয়া বিশেষতঃ দশজনের আত্মা একাকার হইয়া জ্যোতির্ম্ময় প্রসবিতা পরমেশ্বরের চরণ স্পর্শ করে তখন একটি অভিনব জন্ম হইয়া থাকে; তখনই ইতিহাসের জন্ম হয়। মানুষের যেমন জন্ম আছে, লয় আছে, ইতিহাসেরও তেমনি জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, নিয়তি আছে ও সমাপ্তি আছে। যে মানুষের জীবনের ইতিহাস নাই, নিয়তি নাই পৃথীবীতে সেই ধর্ম্ম মানুষের মনের মতমাত্র। আমরা সেরূপ ধর্ম্ম গ্রহণও করিব না,প্রচারও করিব না। যাহা সত্য, স্থায়ী ও জীবন্ত তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, যদি ধর্ম্ম নিত্য হয় তবে নিশ্চয়ই তাহা আকার প্রাপ্ত হইবে। এই আকারপ্রাপ্তির নামই বিধান,এই আকারের ক্রিয়াই ইতিহাস। অতএব দেখ এই ব্রাহ্মসমাজ গত ৬৯ বৎসরের মধ্যে যদি আকার প্রাপ্ত না হইত, কোন ক্রিয়া না করিত, ভিতর হইতে বাহিরে না আসিত তবে তোমরা কোথায় থাকিতে আমরাই বা কোথায় থাকিতাম। যদি ধর্ম্মকে সংসার হইতে সরাইয়া লও আরবে মরুভূমির মধ্যে মোহম্মদের সত্যধর্ম্মপ্রচার, পর্ব্বতশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষ ঈশা বজ্রগম্ভীর নিনাদে পর্ব্বতপ্রদেশ কাঁপাইয়া যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহার ইতিহাস,এবং বিশ্ববিজয়ী বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রিয়া কোথায় রহিবে। অতএব ইতিহাসকে কেহ যেন অপমান না করেন; নিজের জীবনে যেন এই ইতিহাস নিজে লিখিয়া রাখেন। ৬৮ আটষট্টি বৎসর পূর্ব্বে যে দিন ১১ই মাঘের জন্ম হইল, যে দিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই সত্য ধর্ম্ম ঘোষণা করিলেন, সেই দিন হইতে বঙ্গদেশের নূতন ইতিহাসের সূত্রপাত হইল; তার পর ক্রমে এই ৬৮ বৎসরের মধ্যে পংক্তির পর পংক্তি, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ এইরূপ করিয়া কত প্রকাণ্ড ইতিহাস লেখা হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ইতিহাস কি সমাপ্ত হইয়াছে? পরমেশ্বরের ব্রাহ্মসমাজবিষয়ে বলিবার কি আর কোনও কথা নাই? আমাদের প্রত্যেকের ললাটে যাহা কিছু লেখা ছিল সমুদায় সমাচার কি দেওয়া হইয়াছে? আমাদের প্রার্থনার সাধ কি পূর্ণ হইয়াছে? বিশেষতঃ এই বিধানের জন্ম, যৌবন, বার্দ্ধক্য সবই কি শেষ হইয়াছে? কে বলিবে শেষ হইয়াছে? যখন আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াই তখন কি বুঝি? তাঁর শেষ বাক্য বলা হইয়াছে ইহাই কি বুঝি? কখনই নয়; ইহা আমরা একবারও বুঝি না। তবে কি বুঝি? বুঝি যে এই প্রকাণ্ড ইতিহাসে পরমেশ্বরের নামমাত্র লেখা হইয়াছে; আমরা তাঁর মহামণ্ডলীর মধ্যে আসনমাত্র পাতিয়াছি; বিধানের প্রকাণ্ড ইতিহাসের কিছুই ফুরায় নাই; সবে সূত্রপাতমাত্র। অদ্যকার শুভদিনে এইটি উপলব্ধি করিবার বিশেষ দিন। ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করি তোমার মনে কি আছে? আমাদের জীবনে তোমার যে ইচ্ছা ছিল তাহা কি সব পূর্ণ করিয়াছ? আর কি কিছুই বাকী নাই? কি উত্তর পাইব? উত্তর পাইব যে কিছুই করা হয় নাই; কেবল আরম্ভ বই কিছুই নয়। তবে আসুক; সকল লোক আসুক, সকলের প্রেম ভক্তি উৎসর্গ করুক। লীলাময় পরমেশ্বর আবার এমন এক লীলার অভিনব তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন যাহা শুনিলে আমাদের নবজন্ম লাভ হইবে। আমি অনেক বার বলিয়াছি পুনর্জ্জন্ম একবার নয় অনেক বার হয়; হইতে হইতে ক্রমে মানুষের আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়, অন্যপ্রকার কার্য্যক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত হয়।

মনে করিলে আমরা অনেক ভাব আনিতে পারি, মনে করিলে

আরও অনেক ভাল আরাধনা, উপাসনা ও প্রার্থনা করিতে পারি; কিন্তু মনে করিলেই ইতিহাস রচনা হয় না, মনে করিলেই জীবন পরিবর্ত্তন করিতে পারি না। অদ্যকার শুভদিন ইহার মহাবকাশ। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া, লোকের মনের স্বাদ বুঝিয়া মনে হয় আবার একটা মহা ইতিহাসের ব্যবস্থা হইতেছে। এই যে এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত সকলে উপাসনা করিলাম, কই এক দিনের জন্যও মনে নিরাশ কি নিরানন্দ স্থান পাইল না। যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন জানিতাম না এই মিলনের মধ্যে কি আছে; সোজা রাস্তায় যাইতেছি কি বাঁকা রাস্তায় যাইতেছি সে বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি ঠিক রাস্তায়ই আসিয়াছি, যথা স্থানেই উপনীত হইয়াছি। সকলেই জান ইতিহাস এক দিনে হয় না। একটি শিশু পালন করিতে যার অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। তেমনি ইতিহাস লিখিতে হইলেই সেই সময়ের এবং সেই স্থানের লোকদিগকে অনেক ঘটনার ভিতর দিয়া লইয়া যাইতে হয়।

অনন্তস্বরূপের পবিত্র অচলের দিকে সহস্র সোপান পড়িয়া আছে; এই সকল উচ্চসোপান আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে কত সাধুর বিভীষিকাময় পরীক্ষা, কত নরনারীর অশ্রুধারা, কত লোকের আবদ্ধ নিয়তির দ্বারা সেই সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি মনে থাকে, অনায়াসে এই আবদ্ধ নিয়তির দ্বার উন্মুক্ত করিতে পারিবে তবে তোমার মহাভ্রম। তিনি কোন সূত্রে অমিলিত দিগকে মিলন দিলেন তিনিই বলিতে পারেন; শত পার্থক্যকে দূর করিয়া কিরূপ একাকার করিবেন তাহা তিনিই জানেন; আমরা কিছুই জানি না। অতএব এস সকলে দাসত্ব গ্রহণ করিয়া আশা পূর্ণকারী, মহাক্রিয়াসম্পন্নকারীর হস্তেই সব সমর্পণ করি। যদি তিনি থাকেন তবে উপাসনা মন্দির কি হইবে না! এখনও তিনি আমাদিগের বিশ্বাস পরীক্ষা করিতেছেন, আমাদের দৃঢ়তাকে অপেক্ষা করিতেছেন। আজ যদি মন দৃঢ় হয়, স্বভাব পবিত্র হয়, বিবেক তীব্র হয়, ভক্তি অকপট হয়, তবে আজই ভগবান কোন মহাশক্তির অবতারণা করিবেন ইহা কি বলা সম্ভব মনে করিতে পারি না? উৎসবের আরম্ভ হইতে এই কদিন এমন কি কার্য্যে হাত দিয়াছ যাহা সফল হয় নাই; কি শুভকার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছ যাহাতে তোমার ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে? যাঁহাদের এখানে আগমন কখনও মনে করি নাই তাঁহারাও আসিয়াছেন, যাঁহাদের দেখিলে উপাসনার স্ফূর্ত্তি পায় তাঁহারাও আসিয়াছেন। এখন মনের সঙ্গে মনের একাকারের অপেক্ষা। যদি ভগবান কোন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন সকলে তাঁহার ইঙ্গিত দেখিব এবং ভবিষ্যতের জন্য এক সোপান উর্দ্ধে আরোহণ করিব। ভগবানই কেবল ভাবুক নন; আমরাই ভাবুক। আমরা কত মিষ্টকথায় তাঁহার আরাধনা করি কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্যও করেন না! আজ তাঁহাকে অগ্নিরূপে যে উদ্বোধন করিলে ঠিক করিলে। কিন্তু তিনি কিরূপ অগ্নি; তিনি সেই অগ্নি যাহা পৃথিবী একটি একটি মহাসমুদ্রের জল দ্বারাও নির্ব্বাণ করিতে পারে না। তিনি সেই পবিত্র অগ্নি লইয়া, সত্য-বজ্র ধারণ করিয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলুন কি প্রকারে গ্রথিত হইব? কোন্ মহাব্রত গ্রহণ করিব? তিনি যদি আসিয়া আমাদের নিকট মিলনের মহামন্ত্র শিখাইয়া দেন তবে বুঝিব অদ্যকার এই উপাসনা স্থায়ী কি ক্ষণস্থায়ী। তোমার হৃদয়ের প্রেম দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি; ইচ্ছা হয় তোমার সহিত মিলিত হই। এইরূপ প্রতিজনের মিলনে এই মণ্ডলীটী যদি এক হয় তবে ইহার মধ্যে ব্রহ্মনিশ্বাস প্রবাহিত হইবে; যুবা বৃদ্ধ সকলে মিলিত হইতে পারিব। কিন্তু সবই পরমেশ্বরের সহায়সাপেক্ষ। তিনি যদি মিলিত করিলেন তবে প্রতিজনের জীবনে নিজের গভীর ইচ্ছা সুসিদ্ধ করুন।

উপাসনাকার্য্য দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছিল; এজন্য তিনটার সময় আবার কার্য্যারম্ভ হয়। ভাই দীননাথ মজুমদার মাধ্যাহ্নিক উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনান্তে নববিধানে পুনর্ব্বার বিশ্বাসজ্ঞাপন করিয়া উপস্থিত কার্য্যসমূহের নির্ব্বাহ জন্য একটি ভ্রাতৃমণ্ডলী হয়, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন, এবং সেই প্রস্তাবানুসারে একখানি পুস্তকে উপস্থিত সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। এই কার্য্যে অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়াতে পাঠ সৎপ্রসঙ্গ হইতে পারে না; একেবারে সায়ংকালীন সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সংকীর্ত্তনান্তে সায়ংকালের উপাসনা ভাই গৌরগোবিন্দ রায় নির্ব্বাহ করেন। আচার্য্যদেবের ১৮৮২ সনের ২৬ আগস্টের 'জীবে ব্রহ্মদর্শন' প্রার্থনাটী অবলম্বনপূর্ব্বক তিনি যে উপদেশ দেন তাহার সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হে ভাইগণ, ভগ্নীগণ, পিতৃগণ, মাতৃগণ, তোমাদের আত্মপরিচয় প্রদান কর। তোমাদের পরিচয় যদি না পাইলাম তবে আমার জীবন ধারণ বিফল। জন্মগ্রহণ করিয়া যদি মাকে না দেখিলাম, বাকে না চিনিলাম, তবে জীবন ধারণ করিয়া কি লাভ? তুমি কন্যা হও, পুত্র হও, যে হও সে হও আমার নমস্য; কারণ তোমরা ব্রহ্মখণ্ড। কেশবচন্দ্র তোমাদের আদর করিতে জানিতেন! ভক্তেরা বহু দূর দেশ হইতে আসিয়াছেন কিন্তু আমরা তাঁহাদের সম্মান করিতে জানি না; সম্মান করা দূরে থাকুক তাঁহাদের তুচ্ছ করি।

এই যে আমাদের পশ্চাতে দেবালয়, ইহা কেশবচন্দ্র কেন করিলেন? ভক্তগণ দূর দেশ হইতে পূজা করিতে আসিতেন,

তাঁহাদের স্থান হইত না ইহাতে কেশবচন্দ্রের মন ব্যথিত হইত। সেই ব্যথা দূর করিবার জন্য তিনি এই দেবালয় নির্ম্মাণ করিলেন। ভগ্ন শরীরে তিনি যে দিন এই দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সে দিন তিনি আপনি বলিয়াছেন "গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থানাভাবে তোমার ভক্তেরা ফিরিয়া যাইতেন। আমার বড় সাধ ছিল, কয়েক খানা ইট কুড়াইয়া তোমাকে এক খানা ঘর করিয়া দিই, সেই সাধ মিটাইবার জন্য মা লক্ষ্মী, তুমি স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলে। আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নাচি।" কেশবচন্দ্র ভক্তগণকে এত আদর করিতেন কেন? তিনি তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মখণ্ড দেখিতেন। যদি কেশবচন্দ্রের মত সকলের মধ্যে ব্রহ্ম না দেখিলাম তবে জীবনকে ধিক্কার, নারীতে যদি মাতৃরূপ না দেখিলাম তবে শত ধিক্ আমার জীবনকে। উৎসবের দিনে ব্রহ্মমূর্ত্তি অবলোকন করিব বলিয়া রোগশয্যা ছাড়িয়া আসিয়াছি। আমার সম্মুখে ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মখণ্ড; হউন পাপী, আমার নমস্য। আমাদের আচার্য্য বলিয়া গেলেন, "দেবত্ব মনুষ্যত্ব মিলিয়া অদ্ভুত তত্ত্ব পৃথিবীতে প্রচার করিল। অতএব হে খণ্ড খণ্ড মহাদেবগণ, প্রসন্ন হও। যদিও মহাদেব বলিয়া তোমাদের পূজা করিব না; কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ,—রূপান্তরিত হইয়া, হে পিতৃগণ, হে মাতৃগণ হে দেবতা, হে ঈশ্বরের ভাবান্তর, তোমরা মহীয়ান্ হও সকলে। দেবত্ব মনুষ্যত্বে মিশিয়া গেল এই উৎসবে। পৃথিবীর ঘোলা জল ব্রহ্মসমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া গেল।......ইহাঁদের অগ্রাহ্য করিতে পারি না, কলহ করিতে পারি না, বিচার করিতে পারি না, ইহাঁরা চোর, ব্যভিচারী, নরহত্যাকারী হইলেও তথাপি দেবতা। ইহাঁদের পশুর দিক্ দেখা যায় না, দেবতার দিক্ দেখা যায়। ইহাঁদের ভিতর ব্রহ্ম জ্যোতি, আনন্দের হিল্লোল। ইহাঁরা পাপী তাকি জানি না? তথাপি আমি দেবতার সম্মান করিব! ইহাঁদের অর্চ্চনা বরণ করিয়া সহজে স্বর্গ লাভ করিব।" আমার বাল্যকালের আচার্য্য বলিয়াছেন, দুরাচারীর দুরাচার দর্শন করিও না, সে যদি ভক্তির সহিত ভগবানের অর্চ্চনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করিও, কেন না সে শীঘ্রই সাধু হইবে। অতএব যে সাধু অসাধু জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের ভিতর ব্রহ্মদর্শন করিল না তাহার জীবনকে ধিক্কার। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হিন্দুধর্ম্ম; হিন্দুধর্ম্মের ইহাই বিশেষ ভাব। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতে গিয়া নীতির বন্ধন শিথিল হয়, পাপে প্রবৃত্তি জন্মে, ইহা যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। সাধু অসাধু জ্ঞানী অজ্ঞানী সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখিলে কি কখন পাপের প্রতি প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইতে পারে? অসাধুতার ভিতরে প্রচ্ছন্ন সাধুতা, অজ্ঞানের ভিতরে প্রচ্ছন্ন জ্ঞান যেখানে, সেখানে যোগীর দৃষ্টি প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মদর্শন করে। হিন্দুধর্ম্ম আচণ্ডাল সকলের ভিতরে ব্রহ্মদর্শন করিয়া প্রণত হইয়া ভূতলে প্রণাম করিতে উপদেশ দেন। বর্ত্তমান সময়ে কাণ্টের মত অনুসরণ করিয়া যদিও বাহে সেরূপ সাধকগণ না করেন না করুন, অন্তরে অন্তরে তাঁহারা অবশ্যই সকলের চরণে প্রণত হইবেন; অন্যথা তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি কদাপি প্রগাঢ় হইবে না। হে ব্রহ্মখণ্ডগণ, আমি কি তোমাদিগের বিশেষ বিশেষ পাপ অবগত নই? তোমাদের কোথায় কোন্ দুর্ব্বলতা আছে, তাহা কি চক্ষে পড়ে না? কিন্তু আপনাদের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করি, এজন্য আপনাদিগকে চটাইতে পারি না, বিরক্ত করিতে পারি না। আমি কে যে ব্রহ্মখণ্ডের বিচার করিব? বিচার করিবেন স্বয়ং ভগবান্, বিচার করিবেন ভগবানের মণ্ডলী, আমি বিচার করিবার কেহ নহি। আমার বিচার করিবার কোন অধিকার নাই; ভাল বাসিবার অধিকার। সে ভালবাসা কি ভালবাসা, যে ভালবাসা ভালবাসার পাত্রকে লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত নয়? প্রেম প্রেম সকলেই বলে, প্রেম কি কখন কোন কালে চটিয়া যায়? যাকে ভালবাসি তার জন্য যদি চিরকাল না ভাবি তবে কি প্রেম? যেখানে প্রেম সেখানে পবিত্রতা, সেখানে কি নরনারীর বিরুদ্ধে পাপাচরণ ঘটিতে পারে? এ পবিত্রতা কি সামান্য? প্রেমোদ্দীপ্ত পবিত্রতা থাকিলে ব্রহ্মকে কি ডেকে আনতে হয়? তিনি পবিত্রতা দেখিলে আপনিই আসেন। আপনারা আমার গুরু। আসুন অদ্যকার দিনে কুকামনা, কুদৃষ্টি পরিহার করিয়া সকলে ব্রহ্মদর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। উনবিংশ শতাব্দী, তুমি ধন্য হও! কিন্তু যে বিজ্ঞান অজ্ঞানতা আনিয়া দেয় তাহাকে ধিক্কার। ব্রহ্ম সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে আছেন; ব্রহ্ম সকলেতে পূর্ণ হইয়া আছেন, এবং সকলেই ব্রহ্মে পূর্ণ; অতএব আজ যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদেরে প্রণাম করি। এই গৃহ পবিত্র হইল ইহাঁদের পদধূলিতে। এই গৃহের এত আদর কেন? ইহাঁরা আসেন বলিয়া। আচার্য্য আপনাকে ধন্য মনে করিতেন কেন? ইহাঁরা আসিয়া তাঁহার গৃহে উপাসনা করিতেন সেই জন্য। যিনি ব্রহ্মখণ্ডকে অন্ন পরিবেশন করিয়া ধন্য না হইলেন তাঁহাকে ধিক্। লোকে বলে ইহাঁরা আমাদের বাড়ীতে আসেন কেবল অন্নের জন্য; একথা যে বলে সে পাষণ্ড।

এখানে আজ কন্যাস্থানীয়া অনেকে আছেন; কিন্তু আজ তাঁহারা মাতা, পুত্রস্থানীয়ও অনেকে আছেন তাঁহারা পিতৃস্থানীয়। সকলেই আজ ব্রহ্মখণ্ড; আজ সবই ব্রহ্মময়। গৃহে এই ব্রহ্মখণ্ড, এই ব্রহ্মমূর্ত্তি লইয়া যাইব; কাহারও কুদৃষ্টির ইচ্ছা থাকিবে না। মাতৃরূপ দেখিয়া কুবাসনা যার মনে উদিত হয় সে পাষণ্ড, তাহার দূর হওয়াই উচিত। ব্রহ্মখণ্ডের প্রতি অত্যাচার করিব? ধিক্কার আমার জীবনকে। কেহই ঘৃণার পাত্র নহেন। যিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আইসেন কে তাঁহার আদর না করে? কিন্তু ছিন্নকন্থা পরিয়া যিনি আসিলেন তিনি তদপেক্ষা আদরের। ভগবান্ যাঁহাকে যে বেশে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তিনি সেই বেশেই আমাদের আদরভাজন। ভগবান্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সচ্চিদানন্দখণ্ড আমাদের গৃহে আনিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন; সেই ব্রহ্মখণ্ডকে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে দর্শন করিয়া জীবন কৃতার্থ করি, অদ্য উৎসবের দিনে ভগবান্ এই আশীর্ব্বাদ করুন।

১২ই মাঘ বুধবার শান্তিকুটীরে পটমণ্ডপে ব্রাহ্মিকাগণের উৎসব। শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। নিস্বার্থ ভাবে পরের সেবার্থ জীবন দান নারীগণের জীবনের উদ্দেশ্য, এই সম্বন্ধে উপদেশ হয়। অপরাহ্ণে পটমণ্ডপ হইতে নগরসঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। এবারকার নগরসঙ্কীর্ত্তনের বিশেষত্ব কখন বিস্মৃত হইবার বিষয় নহে। ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল অনপেক্ষিতরূপে স্বয়ং এবার নগরসঙ্কীর্ত্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার নেতৃত্বে সঙ্কীর্ত্তনকারিগণের হৃদয় বিশেষরূপে ভাবোদ্দীপ্ত হয়। সঙ্কীর্ত্তন অপর সারকুলার রোড হইতে মেরজাপুর ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, মিরজাফর লেন, কলেজ ষ্ট্রীট, পুনরায় হ্যারিসন রোড দিয়া ভবানীচরণ দত্তের লেন, কলুটোলা হইয়া ৩ রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে প্রচারাশ্রমে আসিয়া প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তনে উহা শেষ হয়। কলুটোলায় আচার্য্যদেবের পূর্ব্ববাস গৃহ এবং স্বর্গগত শ্রীযুক্ত ঠাকুর চরণ সেনের গৃহে সঙ্কীর্ত্তনের দল প্রবিষ্ট হইয়া তথায় প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন করেন। সঙ্কীর্ত্তনান্তে প্রচারাশ্রমে ভক্তবৃন্দ একত্র মিলিত হইয়া প্রায় রাত্রি ১০॥ টা সঙ্গীতাদিতে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিতেছিলেন,ইতিমধ্যে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী কৃপাকুমারীর ভীষণজ্বরের সংবাদে সঙ্গীতাদি নিবৃত্ত হয়। নগরসঙ্কীর্ত্তনটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(তেওট) নববিধানের দেবতা, আনন্দময়ী মাতা
ডাকিছেন সবে স্নেহ আদরে।
তোরা আয় রে আয় ভাই, মায়ের কাছে যাই,
গিয়ে প্রাণ জুড়াই;
গাই আনন্দে মা নাম সমস্বরে।
(দশকুশী) আহা কি মধুর প্রীতি, অধম তনয়ের প্রতি,
কত ক্ষমা, কতই করুণা; (দয়াময়ী মায়ের)
(পতিত পাতকী জনে)
পাপে তাপে রোগে শোকে, ইহলোকে পরলোকে,
কত আশা, কতই সান্ত্বনা। (আর ভয় নাই রে—
মা আমাদের আমরা মায়ের)
(লোফা) মায়ের কোলে লুকাইলে, তাঁর মুখ নিরখিলে,
দূরে যায় ভয় ভাবনা রে। (সব)
(সেরূপ মনে হলে)
(দোলন) মা নামে পাষাণ গলে, দুনয়ন ভাসে জলে,
উথলে হৃদয়ে প্রেম পাথার;
নিরাশ অন্ধকারে, মা বলে ডাকলে তাঁরে,
অন্তরে হয় আশার সঞ্চার।
বিপদে সম্পদে, জননীর অভয় পদে,
একান্তে যে জন লয় শরণ;
থাকে সে সদানন্দে, নির্ভয়ে নিরাপদে,
করে সুখসাগরে সন্তরণ।
মাতৃপ্রেম সহজ সাধন, সহজে করে যে জন,
সহজে যায় সে শান্তিধামে;
যোগ, যাগ, কর্ম্ম, জ্ঞানে, শান্তি না হয় প্রাণে,
মা—নাম ভরসা পরিণামে। (কেবল)
(খয়রা) সরল শিশুর মত, ডাক মা বলে অনুদিন হে।
(মা মা মা বলে)
(ভক্তিভরে সকাতরে; বিনীত ব্যাকুলান্তরে)
মা যে কি ধন তা অন্যে কে বা জানে রে;
কেবল শিশুই চিনে মাকে, মাতা চিনে শিশু সন্তানেরে।
জ্ঞানী পণ্ডিতেরা, যা বুঝিতে নারে; (বিজ্ঞানে দরশনে)
শিশু সহজে তা জানতে পারে সহজ জ্ঞানে।
(দুগ্ধপোষ্য শিশু; মায়ের মরম)
(খ্যামটা) মাতৃরূপে তাঁরে পেয়েছিল রামপ্রসাদ রে।
ভক্ত (রাজা) রামকৃষ্ণ আর দেওয়ান রঘুনাথ রে।
চল ব্রহ্মানন্দ সনে চিদানন্দ ধামে রে;
চিন্ময়ী জননীরূপ হেরি প্রেমনয়নে রে।
চাহিলে তাঁহার পানে তৃষিত হৃদয়ে রে;
ঘুচিবে সকল গৃহবিচ্ছেদ বিবাদ রে।
(কাটাসওয়াল) জয় মা আনন্দময়ী,—বল বদন ভরে রে।
প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে রে,—নাচ গাও সকলে মিলে রে।
(আনন্দে দুবাহু তুলে রে)

১৩ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রচারাশ্রমে সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে সঙ্গীতানন্তর শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার উপদেশের সার নিম্নে নিবদ্ধ হইল।

ভগবানের সঙ্গে আমাদের যত বিরোধ এত আর কার সঙ্গে; ভগবানের সঙ্গে আমাদের যত মিলন এত আর কার সঙ্গে। জন্মিয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত মানুষ তাঁহার সহিত কত শত্রুতাই করিল, তিনিও মানুষের সঙ্গে কত শত্রুতা করিলেন। যে পাপ করে তাঁর পুণ্যবিধি ভয়ানক আক্রমণে কি তাহাকে

চূর্ণ করে না? জানিয়া শুনিয়া সেই বিধিকে কথায়, ভাবনায়, কাজে, ইচ্ছায় কত প্রকারে আমরা খণ্ডন ও অপমান করিলাম, অথচ এমন কোন্ দিন গেল, মনের সহিত ডাকিয়া তাঁকে অন্তরে পাইলাম না; এমন কোন্ অশ্রুপাত হইল যাহা তাঁহার কোমল হস্ত মোচন করিল না? কোন্ দেশে কোন্ অবস্থাতে তাঁকে ডাকিয়া পাই নাই? তাঁর সঙ্গে যেমন বিরোধ তেমনি মিলন। আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যিনি মন বাক্য জীবন কোনরূপে না কোনরূপে সর্ব্বশক্তিময়ের প্রতি শত্রুতা করেন না? অথচ কোন দিনে বা কোন ক্ষণে যাঁর আকুল ক্রন্দন পরমেশ্বরের সিংহাসনকে আঘাত করে নাই। যুবা কি বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক কি পুরুষ যখনই যে কোন কঠিন অবস্থায় পড়িয়াছিল, মানুষের সকল প্রকার বন্ধুতায় জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল; পরক্ষণেই আবার সেই সর্ব্বশক্তিময়ের কৃপায় এমন এক স্থানে গেল, যেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া সমুদয় সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সঙ্কুচিত হইল না। সকল প্রকার অবস্থায় তাঁহার সহিত আমাদের যেমন মিলন তেমনি বিচ্ছেদ। মানুষের সঙ্গে এই বিচ্ছেদ ও সম্মিলন বিধি অতি নিগূঢ়। কারও উপরে কোন প্রকার বলপ্রয়োগ নাই, মনে হয় ঠিক যেন জগৎপতি জগৎ হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন, কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ নাই, সুরাপান ব্যভিচার প্রভৃতি কতপ্রকার পাপকার্য্য হইতেছে তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই; অথচ এমন কোন কাজ নাই যেখানে তাঁহার শর্তবিধি আসিয়া মানুষের কেশকে আবদ্ধ না করিয়াছে। পৃথিবীতে স্বাধীন কে? সকলেই পরাধীন; কেহ বা দারিদ্র্যের অধীন, কেহ বা ধনের অধীন, কেহ বা স্ত্রীর অধীন, কেহ বা রাজার অধীন। কিন্তু কার অধীনতা সমুদয় বিধির পশ্চাতে মহাবিধি-রূপে বিরাজ করিতেছে? তব বিধিকে তুমি এক মুহূর্ত্ত অতিক্রম করিতে পার নাই অথচ বলিতেছ স্বাধীন। মনে বুঝিলেই স্বাধীন, মনে বুঝিলেই অধীন। এই স্বাধীনতার মদ পান করিয়া একজনেরও গতি সরল হইল না; এই স্বাধীনতায় মানুষ কি করে জানে না, বুঝিতে পারে না; শীঘ্রই ঘোর দুঃখ ও দুরবস্থার হ্রদে পড়িয়া হাবুডুবু খায়। মানুষ যখন এসেছিল পরমাত্মার সহিত এক হইয়া আসিয়াছিল। শিশুর প্রকৃতি আলোচনা কর; সে ঘুমাইয়া হাসে, ঘুমাইয়া কাঁদে, হাত পা নাড়িয়া কত প্রকার আনন্দ প্রকাশ করে। বলিতে পার কি কে শিশুকে হাসায়, কে কাঁদায়, কে তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া তাহার ক্ষুদ্র প্রাণকে আনন্দিত করে? যদি অতি শৈশবের অবস্থা তোমার স্মরণ থাকে বুঝিবে এক অদ্ভুত নিগূঢ় আনন্দময় তোমার অনাবৃত শরীর আবৃত করিয়া, তোমার জড়চক্ষের সমক্ষে জ্যোতি ঢালিয়া বিরাজ করিতেন। তখন না বুঝিয়া তুমি তাঁহাতে বাস করিতে। শিশুকে তোমরা যে সে মনে করিও না। সে সমুদয় মানবজাতির আদর্শ, সে সমুদয় মানবজীবনের ভবিষ্যৎ। সে যে তখন পরমাত্মার সঙ্গে এক যোগে থাকে। সে তাহা জানে না কিন্তু আমরা দেখি এবং বুঝি কার সঙ্গে তাহার প্রাণের যোগ। ক্রমে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, জ্ঞান হইল, পাপ করিল। পাপের প্রথম দিন সেই দিন যে দিন ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইল; পাপের প্রথমাবস্থা যাই সমাপ্ত হইল অমনি সূর্য্যের আলোক কালো হইল, বায়ু বিষ বহন করিতে লাগিল, ভিতরের গর্ত্ত হইতে অনেক সর্প বাহির হইয়া তাহাকে দংশন করিল। তখন সেই শিশুর অজানিত আহ্লাদ কোথায় রহিল। জানিয়া শুনিয়া তুমি যত বার পাপ করিলে ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার তত বার ভয়ানক শত্রুতা হইল। সকলের সঙ্গে তোমার বিরোধের কথা মনে কর দেখিবে ভগবানের সঙ্গে কি ভয়ানক বিরোধ। মনে রাখ যে পাপীকে তিরস্কার করা এবং তাহার মনে যন্ত্রণা আনিয়া দেওয়া তুমি না দিলেও চলিবে। সেটী পুণ্যময় আপনিই দিবেন। পাপের ভিতরে পুণ্য এমনি ভাবে জড়িত যে পাপী আপনার গালে চূণকালী দিবেই দিবে; পাপী আপনার পাপের জন্য নরকের যন্ত্রণা ভোগ করিবেই করিবে। আমাদেরও তাই হইয়াছে। আমরা পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হই নাই; কোন অপরাধের জন্য কাহারও নিকট বিচারিত হই নাই; কিন্তু আমরা আপনার মরমে আপনারাই মরিয়া আছি। আমি অপরাধী সে বিষয়ে আমিই সাক্ষী। এই প্রকারে মনের মধ্যে যখন ধর্ম্মের বিচার হইল, মানুষ তখন বুঝিল সে কি করিয়াছে। তখন সে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইল, কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিল. জনসমাজে আপনার পাপের বিজ্ঞাপন দিল, দীন হইল, হীন হইল। যাই দীন হইল অমনি তাহার পাপজ্ঞানের পার্শ্বে আর এক জ্ঞানের উদয় হইল, বিচ্ছিন্ন দেবতা আবার তাহার গৃহে আসিলেন, আবার পরমেশ্বরের সঙ্গে সে একত্রিত হইল। এই প্রকারে জানিয়া শুনিয়া আমরা শত্রুতা করি আবার মিলন হয়, আবার পুনর্ম্মিলনে সেই চৈতন্যময়ের গৃহে স্থান পাই। আমরা তোমরা সকলেই পাপী। তবে কি করিয়া ভগবানের এই সিংহাসন ঘেরিয়া বসি? কি করিয়া উৎসব করি? এই যে সরল প্রার্থনা করিলে, এই যে আত্মপরিচয় প্রদান করিলে, এই জন্যই তাঁহার সহিত মিলিত হইলে, তাঁর ঘরে স্থান পাইলে। এই যে কদিন প্রার্থনাদি হইল যখন তার মধ্যে মগ্ন হইলে তখন আপনা-দের হৃদয় কি প্রসন্ন হইল না? এই যে তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হইলে, একাসনে বসিতে পাইলে, ইহাতেই নরনারী তোমরা ধন্য হইলে।

এই কথার আর একটা দিক্ আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন আর এক রকম। ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে ১১ই মাঘের দিনে যাহাদের ভাই বলিয়া ডাকিলাম, হৃদয়ের নিভৃতে যাহাদের স্থান দিলাম, জানিতাম না তাহাদের মনে কোন কলঙ্ক আছে কি না; না জানিয়া মহাপ্রেমের স্রোতে ভাসিয়া কত উন্নতি লাভ হইল।

তার পর যখন সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইল, জীবনের কুভাব সকল বাহির হইল, তখন দেখিলাম যাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতাম সে চণ্ডাল, যাহাকে সাধু মনে করিতাম সে ভয়ানক কাজ করে। তখন ঘোর ঘৃণার উদ্রেক হইল। ঘৃণায় ঘৃণায় যত সংগ্রাম, বুঝি প্রেমে ঘৃণায় তত নয়; পাপে পাপে যত সংগ্রাম,বুঝি পাপে পুণ্যে তত নয়। দুরাচারে দুরাচারে সংগ্রামে পৃথিবী কলঙ্কিত হইয়াছে; আমাদেরও দুরাচারে দুরাচারে সংগ্রামে ঘৃণার নরকে গভীর ঘৃণার উৎপত্তি হইয়াছে, তাই এই অমিল। কিন্তু ইহারও শেষ আছে। অত্যন্ত যে সংগ্রাম করে তারও মরণ আছে; তারও এমন সময় আসে যখন সে শত্রু মিত্র না বাছিয়া সকলেরই পদধূলি মস্তকে লয়। এইরূপ সংগ্রামে শ্রান্ত হইয়া পাপী পাপীকে ডাকিয়া বলে "ভাই ক্ষমা কর, আর পাপী ধার্ম্মিককে ডাকিয়া বলে ঢের শত্রুতা করিয়াছি, এখন আপনার ক্রোড় দাও। যখন সে এইরূপ অবস্থায় পড়ে তখন সে দেখিতে পায় যেন দেবদূত মিলনের জন্য কি একটা খুলিয়া দিয়াছে। এই এক বৎসর ধরিয়া এই দেবদূত আমাদের সঙ্গে বিহার করিলেন; কল্যকার সঙ্কীর্ত্তন এই দূতের কার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবে,মহা অমিলনের মধ্যে সেই দূত মিলনের চিহ্ন দেখাইয়াছেন। মিলনে শান্ত নিশ্বাস যেন কালের ঝড়ের ভিতরে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাই শেষ কি না জানি না? কিন্তু প্রথমাবস্থা হইতে দ্বিতীয়াবস্থা ভাল সন্দেহ নাই কিন্তু তুমি কি বল সরলতার সঙ্গে কুটিলতা এক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে? যদি অসারল্য এবং সারল্য এই দুইটি জিনিষ ছাড়িয়া দাও ইহারা নিজ নিজ স্থান খুঁজিয়া লইবে। কেবল আত্মা যদি ভিতরের কথা শ্রবণ করে তবে সকল দোষের ভিতরে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রকাশ পায়; অসারল্যের মধ্যে তাহার সরলতা প্রকাশ পায়। অতএব সারল্যই মূল। যদি সারল্যে মিলিয়া থাক তবে শত দোষ থাকিলেও ভগবানের চরণ পাইবে, ভাইদেরও কোল পাইবে। গত বৎসর এই প্রেমযোগের আরম্ভ হইল, এই বৎসর সেই প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখিলাম, আগত বৎসর যেন ইহার সম্পূর্ণতা অনুভব করিতে পারি।

শ্রীমতী কৃপাকুমারীর অবস্থা উত্তরোত্তর নিতান্ত ভীষণাকার ধারণ করে, সুতরাং সমাগত ব্রাহ্মপরিবারবর্গকে সত্বর তাঁহাদিগের গৃহে প্রেরণ করা হয়। মাধ্যাহ্নিক উপাসনা ভাই বলদেব নারায়ণ হিন্দিতে নির্ব্বাহ করেন। পঞ্জাব, হয়দ্রাবাদ ও বাঁকিপুর হইতে সমাগত সে দেশীয় বন্ধুগণ এই উপাসনায় বিশেষভাবে যোগ দেন। অপরাহ্ণের কার্য্য সঙ্গীত ও উপাসনায় শেষ হয়। শ্রীমতী কৃপাকুমারীর জ্বরে প্রথম হইতে অচেতনাবস্থা। শ্রীযুক্ত ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্র, সত্যেন্দ্র নাথ সেন, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, এন দাস, ইহাঁরা চিকিৎসা করেন, চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হয় না। পরদিন শুক্রবার বিবিধ উপায়ে চিকিৎসা হয়, কিন্তু অপ্রতিবিধেয় রোগের উপশম হইল না, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টার সময় শ্রীমতী কৃপাকুমারী প্রশান্ত ভাবে পিতা মাতা আত্মীয়বর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন। দেহ ত্যাগান্তে ভাই দীননাথ মজুমদার প্রার্থনা করেন। তদনন্তর ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের প্রার্থনান্তে ভাই প্যারীমোহন প্রার্থনা করেন। এই সময়ে শ্রীমতী কৃপাকুমারীর মাতা যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা এক দিকে হৃদয়ভেদী অন্য দিকে সান্ত্বনাপ্রদ। এই শোককর ঘটনা মধ্যে ভাই অমৃতলাল বসু উপস্থিত হন। কৃপাকুমারীর ত্যক্ত দেহ বেষ্টন করিয়া যখন প্রার্থনা হয়, তখন ভাই অমৃত লাল বসু যে প্রার্থনা করেন তাহা বিশ্বাস ও সান্ত্বনায় পূর্ণ। শ্রীমতী কৃপাকুমারীর পিতা তাঁহার হৃদয়ের ভাব যাহা স্বয়ং নিবদ্ধ করিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে দিলাম।

মা কৃপা, চিন্ময়ী কৃপাকুমারী, মৃন্ময়ী তনু ধারণ করিয়া তুমি চট্টগ্রাম নগরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৫৷৷০ ঘটিকার সময় এই মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছিলে। প্রায় নয় বৎসর দেড় মাস তোমাকে এখানে রাখিয়া তোমার আনন্দময়ী মা তোমাকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যা ৫৷৷০ ঘটিকার সময় অমরলোকে লইয়া গিয়াছেন। চর্ম্মচক্ষু আর তোমার সহাস্য সুন্দর মুখ দেখিতে পাইবে না; কর্ণ আর মা, তোমার মুখে মধুর ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে পাইবে না। তুমি নিরাকারা হইয়া তোমার নিরাকারা সতী মায়ের চিন্ময় কোমল হৃদয়কমলে লুকাইয়া স্নেহ-মধুপান করিতেছ, আর স্বর্গের শিশুগণের সঙ্গে খেলা করিতেছ। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে, ঈশাকে কেন ঈশ্বরের পুত্র বলে? কেহ আচার্য্য দেবের নাম করিলে তুমি ব্যথিত হইয়া বলিতে কি! আচার্য্য দেবের নাম করিতেছ? বালিকা হইয়াও তুমি ঈশা এবং ব্রহ্মানন্দকে এত ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলে! সেই স্বর্গের শিশুদিগের সঙ্গে এখন তুমি বাস করিতেছ। একোনসপ্ততিতম ব্রহ্মোৎসবের মহাসমারোহে যখন "নববিধানের দেবতা, আনন্দময়ী মাতা, ডাকিছেন সবে স্নেহ আদরে," এই নগরসংকীর্ত্তনের মহারোল উঠিয়াছিল, তখন তোমার পুণ্যময়ী মা তোমাকে তাঁহার বক্ষে লুকাইয়া রাখিলেন। উৎসবারম্ভে, পরলোকে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে শিশু হইয়া উৎসব

ভোগ করিতে চাহিয়াছিলাম; ভাবি নাই শিশু কৃপা, তোমাকে হরণ করিয়া চিত্তহারী হরি এইরূপে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। পুত্রবিত্ত হইতেও হরি প্রিয়তর, ব্রহ্মানন্দ যখন এই মধুর সত্য ব্যাখ্যা করিতেন কি মিষ্টই লাগিত!! হরি নিশ্চয়ই আমাকে এই সত্য শিক্ষা দিবার জন্য প্রিয়তমা পুত্রী কৃপা, তোমাকে আগে তাঁহার কৃপাবাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ এখন হরির হৃদয়-কমলকুটীরে ব্রহ্মোৎসব ভোগ করিতেছেন; হরি কৃপাকে তাঁহার হৃদয়মধ্যে লুকাইয়া আমার প্রাণকেও বলপূর্ব্বক সেই কুটীরের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। কৃপা, তোমার মায়ের মুখে শুনিলাম তুমি তোমার সত্য মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে তোমার সঙ্গিনী প্রেমলতা, সরলা, নির্ম্মলা, হৈমবতী এবং শিশু নিশির সঙ্গে লুকোচুরি খেলাবার সময় তোমার মাকে বুড়ী করিয়া বার বার নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে আসিয়া তাঁহাকে ছুঁইয়াছিলে। বুড়ীকে ছুঁইলে আর চোর হয় না। ভবে আসিয়া ধূলি খেলার মধ্যে এই খেলা তুমি শিখিয়া গেলে। তোমার মা কল্পনাও করেন নাই যে পৃথিবীতে তোমার সেই শেষ খেলা দেখিলেন। এখন তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, এসব তোমার আসল মা সেই স্বর্গের মহাবুড়ীর আশ্চর্য্য কৌশল এবং নিগূঢ় সঙ্কেত। ভক্ত রামপ্রসাদ তাঁহার কন্যার সঙ্গে তাঁহার আদ্যাশক্তি মাকে দেখিয়াছিলেন। কৃপা, তোমার মা বাপ, তাঁহাদের নববিধানের দেবতা আনন্দময়ী মাতার অনন্ত বিশাল বক্ষে তোমাকে দেখিতেছেন। ধন্য কৃপা, তুমি পৃথিবীর কোন কলঙ্ক স্পর্শ না করিয়া একেবারে তোমার স্বর্গের মা পুণ্যময়ী মহাসতী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর বক্ষে আরোহণ করিয়াছ!! কি অগ্নিময় উৎসাহ, কি মধুময় উৎসাহের সহিত তুমি আমার সঙ্গে এই শেষ গান করিয়া গিয়াছ, "যদি পুণ্যময়ী মহাসতী, আমাদিগের প্রতি প্রসন্না এমন, তবে অবিশ্বাসের মহাপাপে হব না মগন। লোভ মোহাদি রিপুগণে, বলি দিয়ে মার চরণে, এবার ইচ্ছাময়ীর (কৃপাময়ীর, পুণ্যময়ীর) ইচ্ছা (কৃপা, পুণ্য) স্রোতে ভাসাব জীবন।"

মা কৃপা, পার্কষ্ট্রীটে যখন তুমি শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীকে নিম্নোক্ত গানটি শুনাইয়াছিলে, তিনি তোমাকে সঙ্গীতবিদ্যা শিখাইতে আমাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। "চল ভাই মার কাছে যাই, (গিয়ে) নাচি গাই প্রেমভরে, অমর ভবনে, দেবদেবী সনে, হেরি তাঁরে প্রাণভরে। থাকিব না আর মোরা ইন্দ্রিয়গ্রামে; যোগবলে প্রবেশিব চিদানন্দধামে; (আর রব না রব না;—দেহপুরবাসে) সেই জন্মস্থান, হেথা অবস্থান, কেবল দুদিনের তরে। মহামিলন সঙ্গীত গাইব সকলে, বসি মা আনন্দময়ীর শ্রীচরণ তলে; (সুরে সুর মিলাইয়ে) (এক হৃদয় হয়ে) অনন্ত জীবনে, অনন্ত মিলনে, বিহরিব লোকান্তরে।" যখন তোমার স্বাভাবিক কোমল মধুর স্বরে এই গান করিতে, তখন তুমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিতে না; কিন্তু এখন তুমি ইহার অর্থের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছ। "তোমার ঐ নিত্য ধামে, প্রমত্ত ভক্তগণে, নাচে গায় প্রেমানন্দে অনুদিন; এক হয়ে প্রাণে প্রাণে, এক ধ্যানে এক গানে আছে চিদানন্দরসে বিলীন। প্রকৃতির নিয়তি, জীবনের গতি, সহজে ধাইছে তোমা পানে; কিন্তু করমদোষে, বিষয়বাসনাবশে, পঞ্চভূতময় দেশেতে টানে। ধর হে ধর ধর, কৃপা বল দান কর, সকার মৃত দেহেতে জীবন; জয় দয়াময় বলে, স্বধামে যাই চলে, কাটি সংসারমায়াবন্ধন। নববিধানের তরী, সুখে আরোহণ করি, উড়ায়ে নববিধাননিশান। তোমার কৃপাস্রোতে, ভাসিতে ভাসিতে, যাইব করি হরিনাম গান।' (নদী সিন্ধু পানে)।" নিত্যধামবাসিনী বিশ্বজননী শিশুকৃপাকে আমার গুরু করিয়া উপরিউক্ত সঙ্গীতটি শিখাইয়াছিলেন। কয়েকদিন পর কৃপাকে ঐ সঙ্গীতটি করিতে বলিলাম, কৃপা বলিল, বাবা, তোমাকে শিখাইয়া আমি ঐ গান ভুলিয়া গিয়াছি। ইহা কি চিন্ময়ী জননীর লুকোচুরি খেলা নহে? নিরাকারা মা ধরা দিয়াও ধরা দেন না। এবার কৃপার হাতের কলম দিয়া আপনি লিখিয়াছেন। মঙ্গলময়ী মা আর আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র বালিকা কৃপা এ, বি, সি, ডি লিখিতে লিখিতে "গড্ ইজ্" "ঈশ্বর আছেন" "গড্ ইজ্ গুড্" ঈশ্বর মঙ্গলময়" বারংবার এসকল কথা লিখিয়া বোধ হয় ১৭ই সর্ব্বশেষে "কল্যাণের জন্য" এই কথা লিখিয়া ২৭শে জানুয়ারী তাঁহার কৃপাময়ী মায়ের নিকটে চলিয়া গিয়াছেন। "গড্ ইজ্ নিয়ার, ডুনট্ ফিয়ার" "হরি আছেন নিকটে, ভয় করো না সঙ্কটে।" কৃপা তাঁহার বাবার নিকটে এই শেষ শিক্ষা লাভ করেন। অনেকবার কৃপা আনন্দমনে "গড্ ইজ্ নিয়ার, ডুনট্ ফিয়ার।" এই কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। সেই আনন্দের প্রতিমা, সেই সোণার পুতুল কৃপা আজ কোথায়? শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দেবী লিখিয়াছেন, "দাদা, দেবকন্যা কুমারী শ্রীমতী কৃপা এখন স্বর্গোদ্যানে বিমল ফুলদলে মিশিয়া তথাকার শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন! এখানে থাকিতে সেই সুন্দর ফুলে কোন কীট প্রবেশ করিয়া তাহার সুগন্ধ এবং সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে পারে নাই।" শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী শ্রীমতী দীনতারিণী দেবী কৃপার মাকে লিখিয়াছেন, "সে স্বর্গের সুন্দর নির্ম্মল ফুল স্নেহময়ী মার কোলে চিরদিনই স্নেহে থাকবে। আমাদের স্নেহযত্ন অপেক্ষা স্বর্গের স্নেহযত্ন তাহার উপযুক্ত তাই এত শীঘ্র চলিয়া গেল।" আচার্য্যকন্যা শ্রীমতী সুচারু দেবী লিখিয়াছেন, "মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী তাঁহার অনন্ত কৃপারকণা 'কৃপা' কে তোমাদের গৃহ উজ্জ্বল করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, আবার তোমাদের তাঁহার করিয়া লইবার জন্যই বোধ হয় সেই স্বর্গীয় রত্ন তিনি নিজ বক্ষে লুকাইলেন।" শ্রদ্ধেয় ভাই শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত, "মায়ের প্রেমকোলে প্রিয় শিশু কেমন হাসে খেলেরে," এইটি উদ্ধৃত করিয়া বড়ই উপকার করিয়াছেন। কৃপার দেহ সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সায়ংকালীন সুবর্ণ মেঘের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেল। জড়াকাশে কেহ কৃপার

দেহমন্দির দেখিতে পাইবে না; কিন্তু চিদাকাশে চিন্ময়ী কৃপা অধিকতরা লাবণ্যময়ী হইয়া মধুরতর স্বরে বলিতেছেন, "নীলাকাশে নয় কৃপার বাড়ী, কৃপার বাড়ী চিদাকাশে, অখণ্ড চিন্ময় হরি রবিচন্দ্র এই দেশে। অসার সংসারমায়া, ছাড়িয়া মাটীর কায়া, সোণার স্বর্গের পাখী সুখে আছি চিদাকাশে।" অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এবারেও একদিন কোন উদ্যানে আনন্দময়ীর পূজা করিবার কথা ছিল; কিন্তু বাহিরে কোন বাগানে না গিয়া ব্রহ্মসন্তানেরা এবার কৃপার সঙ্গে অদৃশ্য স্বর্গোদ্যান ভোগ করিতেছেন। কেহই জানিতেন না যে, কৃপা এরূপ সহসা চলিয়া যাইবেন; কিন্তু ঈশ্বর জানিতেন, তাই তিনি অজ্ঞাতসারে কৃপাকে প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন। কৃপাকে তাঁহার বাবা একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কাহাকে খুব ভালবাস?" কৃপা বলিলেন, "মাকে আর তোমাকে।" আর কাহাকে ভালবাস? "কাকাবাবু আর ছোট জ্যেঠা মহাশয়কে।" কেন? কৃপা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কাকাবাবু ও ছোট জ্যেঠা মহাশয় ঈশ্বরকে বড় ভাল বাসেন।" বালিকাগণের নীতিশিক্ষার সময়ে অন্যান্য বালিকার ন্যায় কৃপাও প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তাঁহার বাবা বলিতেন, "মা, তুমি বড় হইলে প্রার্থনা করিও।" প্রতি শুক্রবার আশ্রমকন্যাদিগের জন্য সংক্ষিপ্ত উপাসনা হয়। কৃপা ইহাতে যোগ দিতেন না; কিন্তু তাঁহার চলিয়া যাইবার পূর্ব্ব শুক্রবারে যোগ দিয়া অতি স্পষ্ট রূপে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং খুব উৎসাহের সহিত সঙ্গীতাদিতে যোগ দিয়াছিলেন। শিশুদিগের উৎসবের দিনে, "ছোট ছোট শিশু মেয়েরা অল্পমতি অল্পজ্ঞান" এই গান করিয়াছিলেন।

"সাঁচী প্রীতি হাম্ তোমা সঙ্গ যোড়ি। তুম্ সঙ্গ যোড়ি, আওর সঙ্গ তোড়ি।" ভগলপুরে ভ্রাতা শ্রীমান্ হাজারী লালের নিকটে এই গানটী শিখিয়া একা প্রায়ই কৃপা এই গান করিতেন। কৃপার বাবা সেই দিন শোকার্ত্ত হইয়া বলিলেন, "কৃপা চলিয়া গেলেন, কে আমাকে তেমন আদর করিয়া নগরসংকীর্ত্তন শিখাইবেন?" শ্রদ্ধাস্পদ মিত্র মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন? কৃপাই শিখাইবেন।" অতি গভীর এবং মধুর সান্ত্বনা!! সত্যই কৃপা তাঁহার মাতৃবক্ষে বাঁচিয়া আছেন। কৃপার প্রতি স্নেহে কঠিন প্রাণ কোমল হইতেছে। না জানি যিনি কৃপার সত্য মা পুণ্যময়ী পরম সতী, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, (যাঁহার বক্ষে কৃপা এখন গোপনে কত নবনব লীলা ভোগ করিতেছেন) তাঁহাকে ভাল বাসিলে প্রাণ কোন্ স্বর্গে চলিয়া যাইবে। সত্যই মা নামে পাষাণ গলে, দুনয়ন ভাসে জলে, উথলে হৃদয়ে প্রেম-পাথার।"

এই শোকাবহ ঘটনায় অবশিষ্ট কার্য্য আর হইতে পারে নাই। কেবল ১৮ই মাঘ মঙ্গলবার শ্রীদরবারের বার্ষিক অধিবেশন ও সমাপ্তিসূচক যোগ ও শান্তিবাচন হইয়া উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে বন্ধুগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

করাচি, হায়দ্রাবাদ, ঝিলম (পঞ্জাব), লাহোর, গাজীপুর, আরা, খগোল, বাঁকিপুর, মোকামা, মানকর, বর্দ্ধমান, চন্দননগর, চুঁচড়া, হুগলী, অমরপুর, সুগন্ধ্যা, ভদ্রেশ্বর, বাঁশবেড়ে, বালেশ্বর, অমরা, ধুবড়ী, বাঘিল (টাঙ্গাইল), ফুলবাড়ী (দিনাজপুর), চট্টগ্রাম, বরিশাল, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বারাসত, শান্তিপুর, ষোলখাদা (যশোহর), বহিরামপুর, খাঁটুরা, রসা, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া, গড়ভবানীপুর, অমরাগড়ী, ঝিকড়া, মুদিয়ালী, উলুবেড়ে, রাজমহল, তিল্লি।

এ বৎসর এই সকল স্থানে নববিধান প্রচার হইয়াছে;—

দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর, সমস্তিপুর, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, টাঙ্গাইল, ধুবড়ী, চাইবাসা, রসা, চন্দননগর, সুগন্ধ্যা, শ্রীরামপুর, মুঙ্গের, লক্ষ্ণৌ, রামপুর হাট, গাজিপুর, গোরখপুর, ছাপরা, আরা, ডোমরাওন, বাঁকীপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, পিঙ্গনা, গোবরডাঙ্গা, বহিরামপুর, বর্দ্ধমান, মানকর, গয়া, খগোল, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, ফুলবাড়ী (ঢাকা), সাবার, বোওয়াল, রঘুনাথপুর, গুয়াপুর, নওগ্রাম, আমতা, কেদারপুর, নাগরপুর, এলাসিন্, বলোরা, বাঘিল, সন্তোষ, বীরসিংহ, তিল্লি, নারায়ণগঞ্জ, গিরিডি, বোয়ালিয়া, কিশোরগঞ্জ, বিলাসগঞ্জ (ধুবড়ী)।

প্রাপ্ত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

(আরাস্থ বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় হইতে প্রাপ্ত।)

মা, এখন তো আমরাও টের পাইতেছি যে, কেশবের দলের পানে তাকাইলেই তাঁহার প্রেম মুখ দেখিতে পাই। মা, বিশ্বাস দাও দলকে ভালবাসিয়া যেন কেশবকে ভালবাসিতে পারি। কেশবের দল বলিতে কেবল এই দৃশ্য দল নয়, স্বর্গের দলও আমরা দেখিতেছি—যোগী ঋষিগণ হইতে মুশা ঈশা, মোহম্মদ গৌর পর্য্যন্ত সকলকে আমরা এই দলের ভিতর দেখিতেছি। কেবল তাও নয়, আমাদের পিতা মাতা ভাই বন্ধু যাঁহারা এখন স্বর্গলোকে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও এই দলের মধ্যে। তবে মা, এই পরিবার, দলের সঙ্গেও কেশবের সঙ্গে বিশেষভাবে দুইটী আত্মাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিব কেন? স্নেহের প্যারী, প্রাণের দীনেশ এই দলের মধ্যে কি শোভাই ধারণ করিয়াছেন! যাঁদের সুমিষ্ট পার্থিব জীবন গড়িবার জন্য তুমি কলশে কলশে স্বর্গের প্রেম ঢালিয়া দিয়াছিলে, তাঁদের জীবন কি নষ্ট হইবার জিনিষ? ধন্য হইলাম, দয়াময়ি, আমরা কেশবের ভিতর, কেশবের দলের ভিতর প্রেমের পুতুল দুইটি দেখিয়া। আশীর্ব্বাদ কর মা, আমরা

যেন অদ্যকার এই দৃষ্টান্ত পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তৎপর বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ৯টার সময় উমাচরণ বাবুর বাড়ীতে উপাসনা হয়। উপাসনা তিনিই করেন। শ্রীমান্ ত্রৈলোক্য সঙ্গীত করেন। উপাসনান্তে উমাচরণ বাবু খুব ব্যাকুল হইয়া আচার্য্যের প্রতি তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ পায়। সাধারণ প্রার্থনার পর, শ্রীস্তাবলিখকের অন্তর হইতে কয়েকটি প্রার্থনাবাক্য উচ্চারিত হয়। তাহার সার নিম্নলিখিত-রূপে সংগ্রহ করা যাইতে পারে ;—

হে দয়াবান ঈশ্বর, অদ্য আমাদের অনুতাপ করিবার দিন। ভক্তকে আঘাত করিয়া আমরা তাঁহার নিকট খুব অপরাধী হইয়াছি। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে আমরা সকলেই, পৃথিবীর অনেকেই নানা বিষয়ে দোষী করিতে চেষ্টা করিয়াছি—তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ রটাইয়াছি। কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্যও করেন নাই। তিনি বরং বলিয়াছেন যে, অপমান নির্য্যাতন ভোগ করিবার জন্যই তাঁহাদের জন্ম। তাঁহার কোমল প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে ব্রাহ্মসমাজের আত্মকলহে। উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে প্রেমবন্ধনে পরস্পরের সহিত চিরকালের জন্য এক করিবে, এই তাঁহার আশা ছিল। কিন্তু আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করিয়া তাঁহার আশা ছিন্ন করিয়াছি, তাঁহার বুকে ছুরি মারিয়াছি। এই দুঃখেই তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। অল্পবয়সে বৈ কি? ৪৬ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই তিনি আমাদিগকে ছাড়িলেন, আর আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ৭০। ৮০ বৎসরের নিকট আসিয়াছেন। বাস্তবিক আজ আমাদের অনুতাপের দিন। অনুতাপ দাও প্রভো! আমরা পরস্পরকে গ্রহণ না করিয়া ভক্তহৃদয়ে বড়ই ব্যথা দিয়াছি। নাথ, কেবল ভক্ত নন, তোমার সহিত দ্রোহিতা করিয়াছি। প্রভো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর ব্রাহ্মসমাজের ভিতর বিবাদ বিসংবাদ না করি। তাহা হইলেই ভক্ত কেশবকে পাইব, এবং কেশবের হৃদয়ের ধন যে তুমি তোমাকে পাইব। এই আমাদের প্রায়শ্চিত্ত; তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।

সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ীতে সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনা হওয়ার কথা। কিন্তু শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ বাড়ীতে নাই বলিয়া বিশেষ কিছু হইবে না, এই আমরা জানিতাম। তাহাতে আবার প্রাতে এক স্থানে উপাসনা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং কোন আয়োজন উদ্যোগ হয় নাই। এমন কি ভাল করিয়া আলোক পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যায় একে একে প্রায় ১৫। ১৬ জন ভদ্রলোক আসিয়া একত্রিত হইলেন। উপাসনা আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে একটা খোল ও হারমোনিয়ম সহকারে সঙ্গীতের মধুর তান উঠিল। উদ্বোধন আরাধনাদিতে সময়োচিত ভাবের তরঙ্গ উঠিল। অবশেষে বেদী হইতে একটি উপদেশ প্রদত্ত হইল। তাহার সার এই ;—

ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চতম বিকাশকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র "নববিধান" বলিয়া জগতে ঘোষণা করিলেন। নববিধানের একটি লক্ষণে উহাকে অদৃশ্য "উয়েষ্টমিনিষ্টার এবী" বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, যেখানে পঞ্চাশ পুরুষের বৈরিতা সমাহিত ও বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে (It is the invisible Westminister Abbay where the enmities of fifty generation lie buried and forgotten") "উয়েষ্ট মিনিষ্টার এবী" বিলাতের রাজনৈতিক সামরিক, প্রভৃতি বড় বড় লোকের সমাজ; সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে এখানে নির্ব্বিবাদে কাজ চলিবে কেমন করিয়া, মানবীয় ভাব লইয়া কাজ করিতে গেলে বিবাদ কলহ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তো মানবীয় ব্যাপার নয়। এখানে যে প্রথম হইতেই ঈশ্বর স্বয়ং কার্য্য করিতেছেন। ১৬ বৎসর বয়সে রামমোহন রায় হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন কার বলে? কোন্ মানবীয় শক্তি বাঙ্গালীর ছেলেকে এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারে? ইহাতে যাহারা দৈবশক্তি না দেখিতে পায়, তাহারা তবে বোধ হয় কিছুতে দৈবশক্তি স্বীকার করিবে না। ব্রাহ্মও কি তাহাই বলিবেন? অন্যে যা বলিবার বলুক, আমরা কখনও তা বলিতে পারি না। তেমনি সুখ সচ্ছন্দের মধ্যে পালিত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যোগাভ্যাস জন্য বনগমনও দৈবশক্তির পরিচায়ক। কেশবজীবনই কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া এক ব্যক্তির মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক পরিধান একতারা হাতে লইয়া রাজধানীর পথে পথে উন্মত্ত হইয়া বেড়ান, এ সকলের অর্থও ঈশ্বর পরিচালনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ব্রাহ্ম সমাজের ব্যাপারকে ঐশ্বরিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। তাহাই যদি হইল, বিনা বিবাদে আমরা কেন কাজ করিতে পারিব না? এ সম্বন্ধে কল্পনাই বা কেন করি? সমাজের ইতিহাসও প্রাচীন হইয়া যায় নাই। আমরা নিজচক্ষে কি দেখি নাই, কেশব সঙ্গে মিলিয়া সমাজের লোক সকল কি অসাধ্য ব্যাপারই না সাধন করিয়াছেন। ফলে অদ্যকার এই দিনে কেশবের একতার ধর্ম্ম জীবনে না স্বীকার করিলে কেশবকে সম্মান নয় অপমানই করা হইবে। দেশ উৎসন্ন হইয়া গেল গেল একতার অভাবে, অথচ ব্রাহ্মসমাজেই মিল হইল না। কেশবের জীবনসম্বন্ধীয় এক একটা বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে আমরা আড়ম্বর সহকারে উৎসব করিয়া কি করিব, যদি কেশবকে, কেশবের একতাকে জীবনে কার্য্যতঃ স্বীকার না করি? আমরা অনেক কথা বলিয়াছি; কেশবের খুব প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু তিনি আর আমাদের "সার্টিফিকেট" চান না—"সার্টিফিকেটের বোঝা লইয়া আর তিনি চলিতে পারেন না। কেশব এমন কি একটা জিনিষ যে আমারা তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছি না?

কেশব মিলন বৈ তো আর কিছু নন; তবে "মিলনমন্ত্র" জীবনে গ্রহণ করিলেই তো কেশবকে পাইলাম। সংসারের পথ ছাড়িয়া তো আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি; তবে এখানে বিবাদ কি লইয়া? একটুকু ক্ষমা, একটু সত্যপ্রিয়তাভেতো মিলন, আর কিছু নয়। কেশবের জন্য যদি এতাবন্মাত্র আত্মত্যাগও স্বীকার করিতে না পারি, তবে কেশবকে একটা মূর্ত্তির ন্যায় সাজাইয়া সম্মুখে দাঁড় করাইলে কি কেশব সন্তুষ্ট হইবেন? এ যদি আমাদের আশা হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা আত্মপ্রবঞ্চিত। এজন্য আর ব্রাহ্মসমাজে আসিবার প্রয়োজন কি? হিন্দুসমাজেই ভাল ছিলাম। সেখানে এখনও মাঝে মাঝে এমন লোক দেখা যায় যে, পৌত্তলিকতার ভিতর দিয়া তাঁহাদের চরিত্রের সাধুতা, বিনয়, নম্রতা ও পবিত্রতা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত। বন্ধুগণ, কেশবকে সম্মান করিতে হইলে বিবাদ দূর করিয়া দিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে—পরস্পরকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাক্যবাণে কেশবকে আর জ্বালাতন না করাই ভাল। ব্রাহ্মসমাজ কি বিবাদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন? পৃথিবী আমাদের নিকট এই প্রশ্নের সদুত্তর চান।

উৎসবের আয়োজন—ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিস্থাপন।

২ মাঘ, রবিবার, ১৮২০ শক।

যতই জ্ঞান লাভ যতই বুদ্ধির পরিমার্জ্জনা কর যাহা অসম্ভব তাহা দেখিবার জন্য মানুষের প্রবৃত্তি কখনই ক্ষান্ত হইবে না; যতই প্রাকৃতিক নিয়মের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর গতি আলোচনা কর, যাহা অসাধ্য মানুষের মন হইতে তাহা কখনও যাইবে না। বরং দেখিয়াছি যাদের বুদ্ধি অতিমার্জ্জিত, যাদের শিক্ষা সূক্ষ্ম, তাহারা অসম্ভব সম্ভব মনে করে, অঠিক ঠিক মনে করে। সংস্কারের বশীভূত কে নয়? যখন ইহার পূর্ব্বে কু এই কথা লেখা হয় তখনই বিপদ এবং যখন ইহার পূর্ব্বে সু এই কথা লেখা হয় তখনই ইহাতে মঙ্গল। কিন্তু তোমার সংস্কার সু হউক আর কুই হউক অসম্ভব সম্ভব হয় ইহা মনে না করিলে অবিশ্বাসের রাজ্য হইতে তুমি বেশী দূরে নও। তোমার শিক্ষা যতই উচ্চ হউক, চক্ষে যাহা না দেখা যায় তাহা না মানিলে তুমি নাস্তিকতার রাজ্য হইতে বেশী দূরে নও। পরমেশ্বরকে কে কবে চক্ষে দেখিয়াছে, বা পরলোককে কে কবে প্রমাণিত করিয়াছে? তবে কেন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করি, তবে কেন পরলোকের তত্ত্বে বিশ্বাস করি? ধর্ম্মের জন্য যত্ন কর নিষেধ করি না; বরং যদি যত্ন না কর তবে দুঃখিত ও অপ্রসন্ন। কিন্তু তোমার যত্নেরও সীমা আছে। যদি কেবল মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে ক্রয় করিবে এমন কি ধন আছে? যদি সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে হয়, সাধনার কি জান যে তাহার দ্বারা সিদ্ধিদাতাকে লাভ করিবে? অতএব বক্তব্য এই, চিরকাল যেমন অসম্ভব সম্ভব ঘটিয়াছে এখনও সেই প্রকার ঘটিবে, যাহারা মানিবে না তাহাদের পক্ষে ঘটিবে না; বিশ্বাস কর ঘটিবে। যে রোগ দুরারোগ্য, বহু চিকিৎসাতেও যাহা সারে না, একটী সামান্য তাগা ধারণ করিলে সারে কেন? তাগাতে যে এমন কোন পদার্থ আছে যাহার গুণে, অথবা মূলকণাতে এমন কোন পদার্থ আছে যাহার গুণে অথবা মূলকণাতে এমন কোন গুণ আছে যাহার দ্বারা রোগ উপশম হয় তাহা আমি মানি না। আমি এই মানি যে বিশ্বাস সেই তাগার রজ্জুখণ্ডে উত্তেজিত হয় এবং তাহাতেই সেই দুরারোগ্য রোগের উপশম হয়। যখন এই নিকটস্থ মাঘোৎসবের পূর্ব্বে আপনাদের অবস্থা আলোচনা করি, গত বৎসর যেমন নিরুদ্যম, নিরুৎসাহের ভিতর দিয়া উৎসব হইয়াছিল, এবৎসরও সেইরূপ নিরুৎসাহের ছায়া দেখি, তখনই হৃদয় ভগ্ন হয়, কিন্তু যদি চক্ষু বন্ধ করি, অন্তরের অপূর্ব্ব সাধ, হৃদয়ের প্রকাণ্ড আকাঙ্ক্ষার দিকে দেখি, জীবনে পরমেশ্বরের লীলা অনুভব করি, গত ঘটনা সকল এবং বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় আলোচনা করি, তখন মনে হয় আমাদের সাধনায় যাহা হইল না কি জানি তাঁহার ইচ্ছাতে কি হইবে? অতএব কোন দিকে তাকাইতে ইচ্ছা নাই। না বন্ধুর দিকে, শত্রুর দিকে ত নয়ই, না আপনার দিকে, পরের দিকে ত নয়ই, না মণ্ডলীর দিকে, না সম্প্রদায়ের দিকে, কোন দিকে না তাকাইয়া যদি একবার তাঁহার মুখের দিকে তাকাই; এক বার এই নিরাশ্রয় মণ্ডলীর দিকে তাকাই, তিনি মণ্ডলীর ইতিহাসে ও জীবনের ইতিহাসে কি করিয়াছেন তাহা যখন ভাবি তখন দেখি যাহা অসম্ভব তাহা সম্ভব হইয়াছে, অসাধ্য সাধন হইয়াছে। অতএব বন্ধুগণ আর কোন বিষয় আলোচনা করিব? এস, সকলে ইহাই কেবল অন্তরের সুদৃঢ় ধারণা করি যে যাঁহার হস্তে সমস্ত ভার দিলাম তিনি যদি গতি দেন তবেই গতি হইবে, যদি দুর্গতি দেন তাহার ভিতরেও সদ্গতি দেখিতে পাইব। এ সময় নিরস্ত হইবার সময় নয়। সংসারের কোলাহল হইতে কিছু দিন দূরে থাকিতে পারিলেই ভাল। সাধকগণের সহিত একত্র প্রার্থনা করি। যাঁহাদের সঙ্গে একত্র গতি তাঁদের সকলকে সঙ্গে লই। পরমপিতা পরমেশ্বর অসঙ্গত সঙ্গত করেন, কিন্তু তিনি বিধি বিনা করেন না? আপনাকে যে নিয়ম দ্বারা বদ্ধ করিয়াছেন সেই নিয়মের বাহিরে তিনি যাইতে পারেন না। সকলে একত্র প্রার্থনা কর; একত্র সাধারণ অভাবের বিষয় আলোচনা কর; দশজনের দৃষ্টিকে এক দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত করিয়া তাঁর দিকে দেখ; গত পাপের চিন্তা মন হইতে দূর কর, বাক্য সংযম কর—যাহাদের দেহ মন পবিত্র তাহাদের মধ্যে তিনি অদ্ভুত ক্রিয়া দেখান্ এবং তাহাদের মধ্যে তিনি আশ্চর্য্য বিষয় সকল সাধন করেন—ঈশ্বরের কৃত মহাব্যাপার সংঘটন, এবং আপনাদের জীবনে ও মণ্ডলীর মধ্যে যে কঠিন বিষয় সকল মীমাংসা হইয়াছে তাহা স্মরণ কর। আর অধিক বলিতে চাই না; কিন্তু ইহা যেন মনে দৃঢ় ধারণা থাকে যে এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম বিধাননাটকের অভিনয়ের এখনও অনেক বাকী আছে। যদিও ইহার বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ, তথাপি দূর ভবিষ্যতে সর্ব্বশক্তিমানের

ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কে জানে আমাদের ভিতর দিয়া হইবে না। আমরা কোন কালে বড়লোক ছিলাম না, কোন কালে বিদ্বান্ ছিলাম না, ধনের জন্য কি বিদ্যার জন্য কোন কালে গৌরব প্রাপ্ত হই নাই, সামান্য অবস্থার ভিতর দিয়াই আমরা আসিয়াছি, তবে কেন তিনি আমাদিগকে তাঁহার নবধর্ম্মমণ্ডলীভুক্ত করিলেন? আমাদের প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠতম যিনি তিনি এখন দেহে নাই, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মাত্মার সহিত মিলিত হইয়া সম্মুখস্থ অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা জানি কোন্ মহাব্রত ধারণ করিয়াছি এবং কিসের জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছি। অতএব সকলে মহাবিশ্বাস করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাক, দশজনে একত্র তাঁহার দ্বারে প্রতীক্ষা কর, দেহ মনকে সংযত রাখিয়া পরমেশ্বরের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা কর। তবে কি হইবে? এই মহোৎসবের মহাযোজন সফল হইবে; আমাদের সকলের দীন প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করিবেন।

সংবাদ।

বিগত ৭ই মাঘ স্বর্গগত কালীনাথ বসু মহাশয়ের স্বর্গগমন দিন স্মরণার্থ তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই দীননাথ মজুমদার উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত ৮ই মাঘ স্বর্গগত কালীনাথ বসুর পুত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ বসুর নব কুমারের নামকরণ হয়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কুমারকে বিনয়েন্দ্র নাথ নাম প্রদান করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত স্ত্রীচরিত্র পুস্তকের বর্দ্ধিত ও সংশোধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে। মূল্য ॥০ মাত্র।

গত ২৪শে মাঘ মঙ্গলবাটীতে স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর দাস মহাশয়ের সমাধিপার্শ্বে তাঁহার স্বর্গগমনের দিন স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলম নিবাসী শ্রীযুক্ত নানক চাঁদ বিধানের সেবা করিবেন এই সঙ্কল্পে নিজের বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছেন।

রিপণ কলেজের বি, এ, শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র মিত্র ১৪ই মাঘ প্রচারাশ্রমের প্রাতের উপাসনার পর উপাধ্যায় কর্ত্তৃক নববিধান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার সহায় হউন।

বিগত ২৭ শে মাঘ ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্র মহাশয়ের আবাসে তাঁহার নববিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী ও জামাতা শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার রায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

গত ২৩ শে মাঘ একসাইজ ও সল্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের বালিগঞ্জস্থ ভবনে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী মলিনীর জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ সেন তথায় গমন করিয়াছেন। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রায় সপ্তাহকাল হইল ভাগলপুরে গিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি উৎসবসমাপ্তি পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থিতি করিবেন।

অমরাগড়ির উৎসব উপলক্ষে কুচবিহার হইতে ভাই ফকির দাস রায় কিছুদিনের জন্য তথায় যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। ফকিরদাস রায়ের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত কুচবিহার মন্দিরে উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শ্রীদরবারের অভিমতে শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ তথায় গিয়াছেন।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ মোহিত লাল সেন এম্ এ নববিধানের বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হইবার সঙ্কল্পে আপনার উচ্চ বেতনের সম্মানিত পদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বিধান জননী তাঁহার সঙ্কল্পসাধনে সহায় হউন।

শ্রীমান্ প্রমথ লাল সেন দুই বৎসর ইংলণ্ডে তথাকার একেশ্বরবাদীদিগের অর্থ সাহায্যে অবস্থানপূর্ব্বক উৎসাহ সহকারে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্ম চর্চ্চা এবং তথায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিধান প্রচার করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে যাত্রা করিবার উদ্যোগী হইয়াছেন। মাসান্তেই আমরা এখানে তাঁহাকে কুশলমতে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিব, এরূপ আশা করিতেছি।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক বিধানবিশ্বাসী শ্রীমান্ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বি এ, তত্রত্য কতিপয় ছাত্রকে লইয়া আপনার ওয়ারিস্থ আবাসে প্রতিসপ্তাহে নিয়মিতরূপে ধর্ম্মচর্চ্চা ও উপাসনাদি করিয়া থাকেন। যুবক ছাত্রদিগের তাহাতে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ হইতেছে।

গত ২১ শে পৌষ হুগলির সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিক লাল দত্ত মহাশয়ের হাবড়াস্থ ভবনে তাঁহার পরলোকগত পুত্রের পরলোক যাত্রার দিন স্মরণার্থ তাঁহার সমাধিপার্শ্বে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। ডাক্তার মহাশয় হুগলি হইতে স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও পুত্রবধূ সঙ্গে করিয়া আসিয়া উক্ত উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

চারিজন ধর্ম্মনেতানামক পুস্তক গত মাঘোৎসবের সময় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে মহাপুরুষ মোহম্মদের পরবর্ত্তী ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নেতৃবর্গ আবুবেকর, ওমর ও ওস্মান এবং আলির জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত। বাঙ্গালি পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে এস্লাম জগতের অনেক আশ্চর্য্য ও অভিনব ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। পুস্তকের মূল্য ॥০ মাত্র।

বিগত ১৪ই মাঘ শুক্রবার অপরাহ্নে এল্‌বার্ট হলে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ সেন এম্ এ Ministry of the Jesus বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৫ই শনিবার ৯২নং

হ্যারিসন রোডে যুবকদিগের প্রার্থনা সমাজের সমস্তদিনব্যাপী সাংবৎসরিক উৎসব হয়। প্রাতে ও সায়াহ্নে শ্রীমান্ নিমহেন্দ্র নাথ উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে পাঠ আলোচনা ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা এবং সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। রবিবার অপরাহ্নে বালকগণের সম্মিলন হয়। তাহাতে গল্পচ্ছলে নীতিবিষয়ে উপদেশ দান ও ম্যাজিক লেণ্টাণ দ্বারা নানা প্রকার বিচিত্র ছবি প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে আমোদিত করা হইয়াছিল।

ইংলণ্ড হইতে সমাগত শ্রদ্ধাস্পদ একেশ্বরবাদী প্রচারক উলিয়ম ফ্লেচার সাহেব ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া প্রচার করিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়াছেন। ১০ই মাঘ সোমবার শান্তিকুটিরে যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার উদার মত ও বাকপটুতা ওজস্বিতায় শ্রোতৃবর্গ অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এবার নববিধানমণ্ডলী হইতে স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান মনোরঞ্জন দে ও শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ রাজেন্দ্র নাথ সেন বিজ্ঞান বিষয়ে এম্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন মনোরঞ্জন ৪র্থ এবং রাজেন্দ্রনাথ প্রথম হইয়াছেন।

স্বর্গগতা শ্রীমতী হরিদাসীর জীবনচরিত সম্প্রতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। হরিদাসীর চরিত্র উচ্চ ধর্ম্মভাব ও নীতিপূর্ণ ছিল। পুস্তকের সঙ্গে হরিদাসীর অনেকগুলি প্রীতিপূর্ণ পত্র এবং তাঁহার নিকটে ও তাঁহার স্বামী গৌরী নাথের নিকটে লিখিত অনেক বন্ধুবান্ধবের ভাবপূর্ণ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকের সঙ্গে হরিদাসীর একটি সুন্দর ছবিও আছে। পুস্তকের ভাষা ও মুদ্রাঙ্কনাদি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উহা স্মলপাইকা অক্ষরে রয়েল ১২ পেইজি ১০৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ।/০ মাত্র। পুস্তকের আয়তন অনুসারে মূল্য সামান্য।

উৎসবের সময় যখন আমাদের প্রচার আশ্রম বিদেশস্থ বন্ধুবান্ধবে পূর্ণ ছিল, প্রতিদিন প্রাতে ভাই উমানাথ গুপ্ত ও ভাই প্রসন্ন কুমার সেন, অতি প্রত্যুষে নাম গান করিতে করিতে আশ্রমে আসিয়া যাত্রিগণসহ সংগীত ও প্রার্থনা দ্বারায় সকলকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। ভাই রামচন্দ্র সিংহ মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন। উৎসবে আমরা অধিকাংশ ভাইদের প্রাপ্ত হইয়া এবার বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।

প্রেরিত।

অনন্ত লীলাকারী শ্রীহরির অপার করুণায় টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ ব্রহ্মোৎসব নিম্নলিখিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। মা বিধান জননী এ ক্ষুদ্র মণ্ডলীর দাস দাসীদিগের প্রতি অযাচিতরূপে অপরিসীম কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া আমরা কৃতজ্ঞতান্তরে প্রণাম ও ধন্যবাদ করি।

উৎসবের পূর্ব্বে স্থানীয় মণ্ডলীর সঙ্গতসভার অধিবেশনে উৎসবে ভক্তিভাজন উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রেরিত প্রচারক মহাশয়দিগের আগমন প্রার্থনীয় বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতিরূপে অবধারিত হয় এবং তদনুসারে তাঁহাদিগের নিকট মণ্ডলীর পক্ষে পত্র লিখিত হয়, ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয়গণ নানা গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এ মণ্ডলীর প্রতি কৃপাবশতঃ ৬ই অগ্রহায়ণ টাঙ্গাইলে শুভাগমন করেন, তাঁহাদের আগমনে বিশ্বাসীদিগের হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই উৎসবে প্রস্তুত জন্য স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গা দাস বসু মহাশয় উপাসনা করেন, তৎপর ৬ই অগ্রহায়ণ হইতে রীতিমত উৎসব আরম্ভ হয়। ৬ই অগ্রহায়ণ সায়ংকালে মন্দিরে ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনা অতি সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ৭ই তারিখ সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে ও সায়ংকালে উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন। দ্বিপ্রহরের পর মন্দিরে শাস্ত্রপাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ হয়। অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আলোচনা স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় শাস্ত্রপাঠ এবং প্রশ্নকারিগণের প্রশ্নের উত্তর দেন। ৮ই তারিখ প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন হয়। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয় কীর্ত্তনকারীদিগের অগ্রণী হইয়া প্রমত্ত ভাবে মার নাম কীর্ত্তন করেন, তৎপর আনন্দাশ্রম দেবালয়ে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং উপাসনার প্রথমাংশ শেষ হইলে শশিভূষণ তালুকদার সস্ত্রীক দয়াময় শ্রীহরির পবিত্র বিধানে দীক্ষিত হইয়া নববিধানমণ্ডলীতে প্রবিষ্ট হন। ভক্তিভাজন প্রেরিত প্রচারক মহাশয়গণের প্রাণস্পর্শী প্রার্থনায় উপাসকগণের হৃদয় বিগলিত হয়। ঐ দিন অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার পরে ভক্তিভাজন উপাধ্যায় মহাশয় টাঙ্গাইল রমেশচন্দ্র হলে "যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার সাধনপ্রণালী" সম্বন্ধে একটী অতি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা স্থলে স্থানীয় ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসাক মহাশয় ও দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং স্থানীয় আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা অন্তে উকীল শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় বক্তা মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অপরাহ্নে উপাধ্যায় মহাশয় মন্দিরে উপাসনা করার পর উৎসব কার্য্য শেষ হয়। মা জগজ্জননী এইরূপে উৎসবকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহার বিশ্বাসী ভক্তদিগকে এখানে আনিয়া আমাদের ন্যায় পাপী তাপীকে কৃতার্থ করিলেন। মার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

টাঙ্গাইল নববিধানব্রহ্মসমাজে ২৫এ ডিসেম্বর শ্রীঈশার জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হয়, ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীমহিম চন্দ্র সেন মহাশয় উপাসনায় ব্যবহৃত হন। উপদেশে পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা সম্বন্ধে ত্রিবিধ আলোকের অবতারণা হয়। ৮ই জানুয়ারি শ্রীআচার্য্য দেবের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে সমাজে উপাসনা হয়, এবং টাউনহলে নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের সম্মিলনে বৈকালে বিশেষ সভা হইয়া শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের জীবনসম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সুমধুর সঙ্গীতান্তে শ্রীমান হরনাথ ঘোষ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গুহ ও সভাপতি মহাশয় আচার্য্যের জীবনীসম্বন্ধে সারবান্ মধুর বক্তৃতা করেন। উপস্থিত বহুসংখ্যক ভদ্রমণ্ডলী বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠান ব্যাপারে, শ্রীমান্ হরনাথ ঘোষের উদ্যম উৎসাহ বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

শ্রীরাধানাথ ঘোষ
সম্পাদক।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ২রা ফাল্গুন কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ।
৪ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন সোমবার, ১৮২০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে জীবিতশরণ, এ জীবন তোমারই হস্তে ন্যস্ত, ইহাতে যখন কোন ভুল নাই, তখন জীবন-সম্বন্ধে, বল, আমরা নিরাশ হইব কেন? আমরা বিপথগামী হইলে তুমি আমাদিগকে শাসন করিবে, বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত বিবিধ পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিবে, ইহাতেই কি আমরা জীবনসম্বন্ধে নিরাশ হইব? আমাদিগের জীবনকে উন্নত ও তোমার মনের মত করিবার জন্যই যখন তুমি আমাদিগের সহিত নিয়ত এই প্রকার ব্যবহার কর, তখন তো আশারই কথা, নিরাশ হইবার কথা কোথায়? তুমি যদি আমাদের অনন্ত জীবনসম্বন্ধে নিরাশ হইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে, তাহা হইলেই আমাদের নিরাশ হইবার কথা ছিল। যদি আমরা তোমায় ঠিক বুঝিতাম, তাহা হইলে কখনই আমাদের মন হইতে আশা ও বিশ্বাস অন্তর্হিত হইত না। আত্মার মৃত্যু আর কিছুতেই ঘটে না, নিরাশ ও অবিশ্বাস হইতেই উহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তুমি কি আমাদিগকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে দিবে? আমাদের নিরাশা ও অবিশ্বাস কি তুমি অপসারিত করিবে না? যে পরিমাণ নিরাশা ও অবিশ্বাস সেই পরিমাণ কঠিন ক্লেশ দুঃখ আমাদিগের অন্তরে উপস্থিত হইয়া আমাদের চেতনাসাধন করিবেই করিবে। আমরা কোন অপরাধ করিয়া তোমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, তাহার সম্ভাবনা নাই। মানুষ কোনরূপে তোমার হাত এড়াইতে পারে না। তাহাকে তুমি উদ্ধার করিবেই করিবে, অনন্তসুখে সুখী করিবেই করিবে, ইহা যদি সে জানিত, তাহা হইলে তাহার আর সুখের পারাবার থাকিত না। পাপ এমনই তীব্র রোগ যে, উহা সর্ব্বাগ্রে আমাদের জ্ঞান হরণ করে এবং তোমার সহিত আমাদের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহারই বোধ প্রথমতঃ বিলুপ্ত করে। পাপ করিব, অথচ ইহা মনে রাখিতে পারিব, আমার ভয় কি, ঈশ্বর আমায় উদ্ধার করিবেন, ইহা অসম্ভব। পাপের সঙ্গে তীব্র যাতনা ও পরীক্ষা যদি তুমি সংযুক্ত না রাখিতে, তাহা হইলে এরূপ মনে করিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু পাপী যখন জানে, তুমি কখন বিনা অগ্নিপরীক্ষায় তাহাকে তোমার সহবাসসুখে সুখী করিবে না, তখন সে যে, তোমার প্রেমের প্রশ্রয় লইতে সাহস করিবে না, ইহা তো অতি স্বাভাবিক। তুমি আমাদিগকে করুণা করিয়া জানিতে দিয়াছ যে, আমাদিগের প্রতি তোমার করুণার কোন দিন এদিক্ ওদিক্ হইবে না, ইহাতে আমরা আমাদিগকে নিতান্ত কৃতার্থ মনে করিতেছি। হে

দেবাদিদেব, তোমার করুণার প্রতি নিয়ত স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া আমরা যাহাতে আশ্বস্ত চিত্তে জীবনে তোমার আজ্ঞাপালন করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার আশীর্ব্বাদ বিনা আমাদের দৃষ্টি নিয়ত তোমার উপরে স্থিরতর ভাবে অবস্থান করিয়া থাকিবে ইহা কখন সম্ভবপর নহে। তাই তব চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, চরণাশ্রয় দানে তুমি আমাদিগকে ভয়ের অতীত কর, এই তোমার নিকটে বিনীত ভিক্ষা।

অভয়লাভ।

সংসারে নিয়ত আমাদিগকে ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়; কোন্ দিন কোন্ বিপদ্ উপস্থিত হইবে কে জানে? যে দিন মনে হইল আজ বিনা বিপদে গেল, সে দিন ভবিষ্যতের কোন্ বিপদের আয়োজন হইয়াছে আমরা জানি না, তাই আমরা সে দিনকে বিপৎশূন্য মনে করিলাম। কোন দিন এমন যায় না, যে দিনে কোন না কোন একটি ভাবী আপদের আয়োজন হয় না। মনে হইল আজ নিরাপদে গেল, কিন্তু হয় তো সেই দিন অনবধানতায় এমন একটী কথা বলিয়া ফেলিয়াছি, যে কথায় যিনি বন্ধু ছিলেন তিনি শত্রু হইয়া গিয়াছেন, অথবা সেই কথার ছিদ্র ধরিয়া এক জন আমার সর্ব্বনাশ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। যিহুদিগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, মানুষ যত দিন অজ্ঞান ছিল, ছিল ভাল, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পাপ প্রবেশ করিল। অজ্ঞান থাকা এক প্রকার মন্দ নয়। যদি আমাদের বিপদের জ্ঞান পূর্ণ পরিমাণে থাকিত, এ সংসারে আমাদের জীবন ধারণ অনন্ত নরকের যন্ত্রণাসদৃশ হইত। যে প্রতিদিন বসিয়া কেবল বিপদই গণনা করে, তাহার জীবন কি দুঃসহ ক্লেশের আলয়। "কল্যকার নিমিত্ত চিন্তা করিও না, প্রত্যেক দিনের কষ্ট তাহার পক্ষে যথেষ্ট" ঈশার একথা কি গভীর অর্থপূর্ণ।

এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা জীবনের ভাবী ক্লেশদুঃখের ভাবনা ভাবিয়া আপনাদের জীবন নিয়ত ভারবহ করিয়া রাখে। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ভাবনা চিন্তা করিতে জানে না, অত্যন্ত লঘুচিত্ত, আহার পান ভোজনাদিতে এত অনুরক্ত যে তাহাদের অন্য ভাবনা ভাবিবার অবসর নাই; ক্ষুৎপিপাসাদিবারণের উপযোগী আয়োজন পাইলেই হইল। এ জীবন যেন অতি তুচ্ছ, আহার সামগ্রীই জীবনের সর্ব্বস্ব, এই ভাবে তাহারা জীবন কাটায়। এ দুই শ্রেণীর লোকই যে কৃপাপাত্র তাহাতে কোন সংশয় নাই। হে মানব, তুমি বসিয়া বসিয়া কেবল ভাবী বিপৎ গণনা করিতেছ, বর্ত্তমানের সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি তোমায় অণুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই, ইহাতে কি তুমি ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা অপরাধে আপনাকে কলুষিত করিতেছ না? তুমিতো আপনি জীবনের কর্ত্তা নও। প্রতিদিন যে সকল দান সম্ভোগ কর, সে সকলের আয়োজন কি তুমি আপনি করিয়াছ? তুমি যে ভাবী ভাবনা ভাবিতেছ, সে সকল যে ঘটিবেই, ইহার প্রমাণ কি তুমি পাইয়াছ? বিজ্ঞান বা বিবেকের আলোক কি তোমায় ভাবী বিপদ্ দেখাইয়া দিয়াছে? যদি দেখাইয়া দিয়া থাকে, তাহার প্রতিকারও কিসে হইবে, তুমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পাইয়াছ, তবে আর তোমার ভাবিবার বিষয় কি? যদি বিবেক বিজ্ঞানের আলোকে কিছু না জানিয়া থাক, ভাবনার বিষয় কেবল কল্পনাপ্রসূত, তাহা যে ঘটিবেই ঘটিবে ইহার তো কোন নিশ্চয় নাই, সেরূপ ভাবনায় জীবনকে ভারবহ করা কি বৃথা দেহ মনের ক্ষতি করা নয়?

হে আহারপানাদি আসক্ত যুবক, তুমি কি মানুষ, না তুমি পশু? তোমার এ জীবন কি কেবল আহারপানাদির জন্য? ইহার কি কোন উচ্চতর লক্ষ্য নাই? দেহই কি তোমার সর্ব্বস্ব? তোমার কি আত্মা নাই? তুমি কি মনে কর, তোমার দেহ পরিপুষ্ট হইলেই আত্মা পরিপুষ্ট হইল? তোমার দেহের আহার্য্য কি আত্মার

আশ্চর্য্য ? তোমার দেহ পশুর অংশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু তোমার আত্মা যে দেবাংশ তাহা তুমি ভুলিয়া গেলে কেন ? পশুসমুচিত আহারপানাদির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তুমি দিন দিন পশু হইয়া যাইতেছ ! যে বিবেক বিজ্ঞানাদিতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব তৎপ্রতি অভিনিবেশ ও চিন্তাশূন্য ব্যক্তির কি কখনও সুখ সম্ভব ? তুমি যাহা এখন সুখ মনে করিতেছ, দুদিন পরে দেখিবে, তাহা সুখ নহে কালভুজঙ্গ ! চিন্তাবিহীন ভাব পরিহার কর, চিন্তনীয় বিষয় চিন্তা কর, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে উত্থান কর। মনুষ্যত্বের সোপান হইতে দেবত্বের সোপানে আরোহণে যে সকল উদ্যোগ আয়োজনের প্রয়োজন সেই গুলির সংগ্রহে যত্নশীল হও।

এই দুই শ্রেণীর বহির্ভূত আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা জীবন বিপৎপূর্ণ বিলক্ষণ জানেন, অথচ তাঁহাদিগের দৃষ্টি এমন এক স্থানে স্থাপিত যে, বিপদের অন্তরালে অনন্ত কল্যাণ দর্শন করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত। এক দিকে বিপদের সম্ভাবনা, আর এক দিকে নিশ্চিত কল্যাণ, এ দুইয়ের বিমিশ্রভাব মনে এক প্রকার আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্য উপস্থিত করে, যে গাম্ভীর্য্যে মনের লঘুতা থাকে না, মনের প্রশান্ত ভাব সর্ব্বদা সহজে রক্ষা পায়। লঘুতাশূন্য প্রশান্ত ভাব বিবেকের বাণীশ্রবণে উপযুক্ততা উপস্থিত করে, বিজ্ঞানালোকে চিত্ত আলোকিত হইবার পথ খুলিয়া দেয়। বিবেক ও বিজ্ঞান যখন কাহারও নয়ন হয়, তখন তাহার নিকটে অনন্ত জীবন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কোন ব্যক্তি কি অনন্তজীবন এক দৃষ্টিতে দেখিতে পারে ? দেখিতে পারে না সত্য, কিন্তু তাহার নিকটে অনন্তজীবন এরূপ সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সে আর কখন তৎসম্বন্ধে অণুমাত্র সংশয় হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে না, এবং সেই হইতে সে অনন্তজীবনের আস্পদ হইলমাত্র তাহা নহে, সে অনন্তজীবনে প্রতিক্ষণ বাস করিতেছে, ইহাই সে প্রত্যক্ষ অনুভব করে। যখন তাহার এই অবস্থা লাভ হইল, তখন সে অভয় প্রাপ্ত হইল।

এখন জিজ্ঞাসা এই, যাঁহারা অনন্তজীবন প্রত্যক্ষ করিতেছেন তাঁহাদের এই প্রত্যক্ষের ভিতরে কল্পনা ও মিথ্যার সংস্রব আছে কি না ? যেখানে বিবেক ও বিজ্ঞানের সাম্রাজ্য সেখানে কল্পনা ও মিথ্যার প্রবেশাধিকার নাই। তাঁহারা কোন অনুমিত বা কল্পিত বিষয়ের অনুসরণ করেন না, সুতরাং কল্পনা ও অসত্য তাঁহাদিগের দৃষ্টিকে আবৃত করিয়া মিথ্যা দর্শন উৎপাদন করিতে পারে না। ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম ও পুণ্য তাঁহারা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এবং সেই জ্ঞান প্রেম পুণ্যই যে তাঁহাদের অনন্ত জীবনের উপাদান ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইতেছেন। যদি তাঁহারা ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন একটি কল্পিত সুখধামের জন্য অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে সেখানে কল্পনার মিথ্যাদৃষ্টি তাঁহারা উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। বিবেক অন্তরে আলোক বিস্তার করিয়া সকল অন্ধকার নিরসন করিতেছে, সংশয়, সন্দেহ, মিথ্যা,কল্পনা প্রভৃতি ভূত পিশাচগণ সেই আলোকের ভয়ে দূরে পলায়ন করিতেছে, বাহিরে যে সকল ভ্রম কুসংস্কার অজ্ঞানতা উৎপন্ন হইয়া অন্তরের আলোককে আচ্ছাদন করিতে পারে, বিজ্ঞান সে সকল দূরে অপসারিত করিতেছে, এরূপ স্থলে সংশয় ভ্রম কল্পনা হইতে যে মিথ্যা আশঙ্কা ও ভয় উৎপন্ন হয় সে সকল আর তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না। এইরূপে ঈশ্বরে শরণাপন্ন ব্যক্তিতে বিবেক ও বিজ্ঞান সমাদৃত হইয়া সকল ভয় নিবারণ হয়, এবং তিনি অভয়পদ প্রাপ্ত হন।

আমাদের জীবন তুচ্ছ নহে।

প্রতিদিন সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইতেছে, সেই একই প্রকারের নিত্যকৃত্য ক্রমান্বয়ে চলিতেছে, জীবনে নূতন ব্যাপার কিছুই ঘটিতেছে না, সকলই পুরাতন হইয়া আসিতেছে, কেবল অভ্যাস-

বশতঃ, বা দুর্জ্জয় ক্ষুৎপিপাসাদির তাড়নায় সেই একই স্থান আহার পান ভোজনাদিতে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, তাহাও আবার বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে, সর্ব্বসময়ে বিনা অবমাননায় পাওয়া যাইতেছে না। বল যে জীবন এইরূপে নিতান্ত বিরস, সে জীবন তুচ্ছ নয় তো তুচ্ছ কি? পণ্ডিতবর বেকন জীবনের এই ছবি দেখিয়াই মৃত্যুকে মঙ্গল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাদার্শনিক সোপানহিয়র সকল দুঃখ নির্ব্বাণের উপায় এক আত্মহত্যা নির্ণয় করিয়াছেন, জন্মমৃত্যু ব্যাধির রঙ্গভূমি সংসারকে এজন্যই মহামতিশাক্য মায়াময় মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে যত্ন করিয়াছেন, কোন কোন ঋষি সংসারের মূল যাঁহারা তাঁহাদিগকে নরকাগ্নি বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। যখন সকলেই একমত,তখন সংসার মিথ্যা,নরনারীর জীবন একান্ত ভারবহ তুচ্ছ সামগ্রী,ইহা না বলিয়া আর উপায়ান্তর কি?

সাধনে জ্ঞানে যাঁহারা দুর্জ্জয়,তাঁহাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পাঁচ জন মহল্লোকের মতে মত দিয়া চলিয়া যাওয়াই নিরাপদ। ইহাঁদের দৃষ্টি অসত্য দৃষ্টি এ কথা বলা মহাপরাধ। তাঁহারা সংসারের এমন একটা দিক্ দেখিয়াছেন—যে দিক্ না দেখিলে সংসারবন্ধন হইতে কদাপি মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, যে দিক্ বাস্তবিকই নরকাগ্নিসদৃশ। এই নরকাগ্নিদর্শনে ভীত হইয়া পরম বৈরাগ্যাশ্রয় না করিলে কখন জীবের নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণলাভের সম্ভাবনা নাই। সংসারে নিতান্ত বিমূঢ়চিত্ত লোক বিনা আর কাহারও এ সম্বন্ধে মোহ উপস্থিত হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ, সাধকগণ, ঋষিগণ সংসারের মোহ ভঙ্গ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা সে উদ্দেশে যাহা কিছু বলিয়াছেন, স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন, তৎপ্রতি আমরা কোন প্রকারে অসম্মান করিতে পারি না। তবে সংসারের আর একটা দিক্ আছে, জীবনকে অন্য দিক্ দিয়া দেখিবার আছে, সেইটী আমরা বলিতে চাই, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন, একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

সাধন দুই প্রকার। সংসার হইতে ঈশ্বরকে সরাইয়া দিয়া প্রথম সাধন, দ্বিতীয় সাধন সংসারে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত দেখা। প্রথমটির সাধন না হইলে দ্বিতীয়টি হয় না, এজন্য পৃথিবী আজ পর্য্যন্ত প্রথমটিতে ধর্ম্ম বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যিনিই ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইবেন, তিনিই প্রথম সাধনটিকেই জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়া লইবেন। দ্বিতীয় সাধন ভয়সঙ্কুল, দু এক জন তেজস্বী পুরুষের জীবনে মাত্র উহার কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। কালভুজঙ্গ লইয়া ক্রীড়া করা কয়জনের সম্বন্ধে সম্ভব? সংসার প্রবৃত্তিবাসনার রঙ্গভূমি। তুমি বৈরাগ্য সম্বল লইয়া উহাতে প্রবেশ কর, দুদিন পরে দেখিতে পাইবে, সংসার তোমার তীব্রভাব কোমল করিয়া ফেলিয়াছে, গূঢ়ভাবে মায়া মমতা আসিয়া তোমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে, আর যে ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিবার জন্য প্রিয়জনের হৃদয়ে আঘাত দিবে, সে শক্তি তোমার চলিয়া গিয়াছে। বল, ইহার অপেক্ষা ধর্ম্মসাধনার্থীর আর বিপদ্ কি আছে? মনে করিয়াছিলে, বৈরাগ্যসম্বলে তুমি সংসার জয় করিবে; সংসারকে জয় করা এখন দূরে, এখন তুমি আপনি সংসার কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পড়িয়াছ। যেখানে প্রবৃত্তিবাসনার সাম্রাজ্য, সেখানে তুমি ঈশ্বরের রাজ্য দেখিবে, ইহা কি সম্ভবপর? যেখানে তোমার ধর্ম্মের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নয়, দৃষ্টি আত্মীয় স্বজনগণের প্রতি, ভোগবিলাস ধন মান সম্ভ্রমের প্রতি, সেখানে তুমি নিরাপদে ধর্ম্মসাধন করিবে, সংসারে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত দেখিবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর?

তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি একই সময়ে বজ্রসম কঠোর ও অমৃতসদৃশ সুকোমল হইতে পার কি না? যদি না পার, ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য বনে বা শ্মশানে প্রস্থান কর, সংসারে বসিয়া তোমার ধর্ম্মসাধন হইবে না। তুমি আত্মীয় স্বজন

বন্ধুবান্ধবের মনে স্বীয় আচরণে ও কথার ভাবে ভোগবিলাসের ভাব উদ্দীপন করিয়া দিবে, যাহাতে তাহাদের বিবেক জাগ্রৎ হয়, বিজ্ঞানের প্রতি গভীর সম্মাননা বাড়ে, তদ্রূপ ব্যবহারে রত থাকিবে না, অথচ বলিবে সংসার আমার ধর্ম্মপথে নিতান্ত প্রতিকূল, সংসারে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত দেখার পক্ষে ভীষণ বিঘ্ন, বল একথা বলিলে চলিবে কেন? দোষ কাহার? তোমার না তোমার আত্মীয় স্বজনগণের? যদি এক বার তাহারা দেখিতে পায় তোমার বিবেক, বিজ্ঞান, বিশ্বাস, বৈরাগ্যের প্রতি আস্থা নাই, তাহা হইলে আর তাহাদের দোষ রহিল না, তুমি আপনার ঘোর পরীক্ষার বীজ সংসারক্ষেত্রে বপন করিলে, তাহা হইতে যে বিসবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে তাহার তীব্র ফল তোমাকে ভোজন করিতেই হইবে। বিবেক, বিজ্ঞান, বিশ্বাস, বৈরাগ্য মধ্যে শেষোক্ত দুইটি জনসমাজের সঙ্গে ব্যবহারে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পায়, সুতরাং এ দুই স্থলে যদি সুদৃঢ় না হও, সংসার তোমাকে পরাজয় করিবে, সংসারকে জয় করিতে তুমি কদাপি সমর্থ হইবে না, সংসারে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করা তোমার কর্ম্ম নয়।

তিনি কে, যিনি ঈদৃশ বিঘ্ন মধ্যে বাস করিয়াও সংসারে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ? 'আমার জীবন তুচ্ছ নহে' এই বিশ্বাস যাঁহার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত, তিনিই এই কার্য্যে সমর্থ। আমার জীবন তুচ্ছ নহে, কেন না সংসারে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ কথা যাহার প্রাণের গভীরতম স্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত, সে কখনই সে কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইবার নহে। আহার পান ভোজনাদি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া যে রাখিয়াছে, তাহার নিকটে জীবন তুচ্ছ, কেন না সে জীবন কীটপতঙ্গাদির জীবন বই আর কিছুই নহে। কতকগুলি পতঙ্গ এক দিন ভোগসুখ সম্ভোগ করিয়া পর দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই জীবনলীলা সাঙ্গ করে, তুমি না হয় সত্তর বৎসর নীচভোগে জীবন কাটাইলে, তাহাতে কি আসিল আর গেল। বরং পতঙ্গাদির জীবনে ভোগই প্রধান, দুঃখ নহে, তোমার জীবনে দুঃখের মাত্রা অধিক, সুখের মাত্রা যৎসামান্য। জীবন তুচ্ছ সামগ্রী নহে, যেমন তেমন করিয়া কাটাইবার জন্য জীবনদাতা উহা দেন নাই হৃদয়ঙ্গম কর, তৎপর দেখিবে তোমার জীবনে অসম্ভব সম্ভব হয় কি না? তুমি বলিবে, আমি এরূপ গুরুতর কার্য্য করিব কি প্রকারে? সংসারে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করা অতি কঠিন, ইহা দেখিয়াই তো সে কালের সাধু সজ্জনেরা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন! আমি কে যে, সংসারের পরীক্ষা মধ্যে থাকিয়া সংসারে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিব? তুমি অতি যৎসামান্য লোক তাহা আমি জানি, কিন্তু ঈশ্বর যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ইহা কি তুমি জান না? মানবজাতির এক এক ক্রমোন্নতির অবস্থায় এক এক প্রকার জীবনের উপযোগিতা উৎপাদন করিয়া স্বয়ং ঈশ্বর সেই প্রকারের জীবন লাভ সহজ করিয়া দিয়াছেন। যাহার বিশ্বাস আছে সেই সে জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। এবার সাধনের দ্বিতীয় সোপান উপস্থিত। সংসারে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষ করা এজন্য বিশ্বাসীর পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছে। ঐ সোপানে আরোহণ করিবে বলিয়া ঈশ্বর তোমায় জীবন দিয়াছেন বিশ্বাস কর, দেখিবে সে জীবন সহজে তোমার লাভ হয় কি না? আপনার জীবনকে তুচ্ছ মনে করিও না, উহাতে ভগবানের বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। তোমার জীবনে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে দিলে, অন্য জীবনে উহা সংক্রামিত করিবার পক্ষে যে যত্ন প্রয়োজন, তাহা করিতে তুমি বাধ্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি—আর এক দিন তোমার সঙ্গে তোমার ও বিজ্ঞানের যে সম্বন্ধ শুনিলাম, সে সম্বন্ধ যে বাস্তবিকই সত্য তাহাতে আমার আর কোন সন্দেহ নাই। সাধারণ লোকে বিজ্ঞানবিষয়ে অনভিজ্ঞ। তাহারা বিজ্ঞানের স্থলে 'অদৃষ্টকে' স্থাপন

করে। অদৃষ্টকে কেহ বলে কপাল, কেহ বলে 'fate'। 'fate' এই শব্দটির হাত বড় বড় পণ্ডিতেরাও এড়াইতে পারেন নাই, অতএব এ সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার আমার অভিলাষ।

বিবেক—অদৃষ্ট শব্দটি যদিও এক দিকে নির্দ্দোষ, কেন না ভবিষ্যতে কি হইবে মানব তাহা জানেন না, তথাপি এরূপ শব্দ ব্যবহারে বিলক্ষণ দোষের সম্ভাবনা আছে। যাহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাহারা 'অদৃষ্ট' 'কপাল' 'fate' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে। মনুষ্যের নিজ শক্তির অতীত কোন এক শক্তি কর্ত্তৃক তাহার বর্ত্তমান ও ভাবী জীবন নিয়মিত হইতেছে, বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হয়, কেন না ইহার তুল্য নিত্যপ্রত্যক্ষ বিষয় আর কিছুই নাই। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা অস্বীকার করা। যায় না কিন্তু কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লোকে আপনার মনের মত একটা কারণ নির্দ্দেশ করে। মনে কর, এক জন কুসংস্কারপন্ন লোকের বাড়ীতে এক দিন সায়ংকালে একটী কাল বিড়াল প্রবেশ করিয়াছিল। সেই রাত্রেই সেই ব্যক্তির একটি ছোট ছেলের জ্বর হইল, এবং দু তিন দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই বিড়ালকে বালকের মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্থির করিবেন না, কিন্তু সাংঘাতিক জ্বরবিশেষকে কারণ নির্দ্ধারণ করিবেন, কিন্তু সেই কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তির মনে সেই কাল বিড়ালের সঙ্গে নিজ পুত্রের মৃত্যু সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে সেই বিড়ালকেই পুত্রের মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। তাহার মতে সে বিড়াল তো বিড়াল নয়, দুরন্ত ডাইন সেই বেশে ঘোর সন্ধ্যার সময়ে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা কর, সে নির্ব্বন্ধসহকারে সেই বিড়ালকেই মৃত্যুর কারণ বলিবে। এক সময়ে ইউরোপে বড় বড় বিদ্বান্ পদস্থ ব্যক্তি এইরূপ বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং তুমি ইহাতে আশ্চর্য্য হইও না যে, বড় বড় পণ্ডিত অদৃষ্ট, কপাল বা 'fate' মানেন। অদৃষ্ট, কপাল বা 'fate' কারণ নহে স্বয়ং ঈশ্বরই কারণ, ইহা বুঝিলে আর কোন কুসংস্কার থাকিতে পারে না।

বুদ্ধি—ঈশ্বরকে কারণ জানিলেই কি মানুষ কুসংস্কারের হাত এড়াইতে পারে? মুসলমানেরা কপালে বিশ্বাস করা অধর্ম্ম মনে করে, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরকে কপালের স্থানে এমনই করিয়া বসাইয়াছে যে, তাহাতে তাহারা যাহা তাহা একটা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত।

বিবেক।—যত দিন পর্য্যন্ত আমার ও বিজ্ঞানের রাজ্য মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, তত দিন এ সম্বন্ধে কুসংস্কার কিছুতেই যাইবার নহে। আমি ও বিজ্ঞান মানবজাতির নিকটে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। আমরা যে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি, তদনুসারে চলিয়া মানুষ ভবিষ্যতের বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবে, ইহাই তাহার পক্ষে ঈশ্বরের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া মনের মত কোন একটা কিছু স্থির করিয়া লইয়া, আমার ও বিজ্ঞানের বিপক্ষে সাহসিকতা প্রকাশ করা তাহার পক্ষে মহাবিপদের কারণ, কেন না ইহাতে অধর্ম্ম ও বিপদ্ উভয়ই ঘটে। যাহারা আমার ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপরে দৃঢ় আস্থাবান্, তাহারা জানে ঈশ্বর সর্ব্বদা তাহাদের সঙ্গে আছেন, সুতরাং তাহাদের কিছুতেই ভীত হইবার কারণ নাই। যাহারা আমাকে ও বিজ্ঞানকে ছাড়িয়া 'অদৃষ্ট' 'কপাল' বা 'fate' মানিয়া চলে, তাহাদের সান্ত্বনার স্থল নাই। ইউরোপে প্রসিদ্ধনামা সোপনীহয়র 'fate' মানিতেন। তাঁহার নিকটে মানবজীবন এতই ভারবহ ছিল যে, তাঁহার মতে আত্মহত্যাই একমাত্র দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির উপায়। ঈশ্বরে অবিশ্বাস দেখ কি প্রকার কুমতে ও পাপে লোককে নিক্ষেপ করে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জানিবার উপায়ের প্রতি উপেক্ষা করিলে, এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে না তো আর কি হইবে?

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

কর্ম্মযোগ।

৪ঠা ফাল্গুন, রবিবার ১৮১৮ শক।

'কর্ম্মসাগরে ডোবাও যা, ঈশ্বরে ডোবাও তা,' কথা সত্য, কি প্রকারে প্রমাণিত হইবে? কর্ম্ম যোগের বিরোধী; কর্ম্মে অভিমান বৃদ্ধি পায়, কর্ম্মবন্ধনের হেতু, এ সকল কথা যে কোন ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যোগাচার্য্য কর্ম্মের প্রশংসা করিলেন, কর্ম্ম বিনা শরীরযাত্রানির্ব্বাহ হইতে পারে না, অতএব কর্ম্ম অপরিহার্য্য ইহা অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন, কিন্তু তিনিও কর্ম্মকে অকর্ম্ম না করিয়া কর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিলেন না। কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করা হয়, কর্ম্ম না করিয়াও কর্ম্ম করা হয়, ইহা প্রদর্শন করিয়া তিনি কর্ম্ম স্থাপন করিলেন। ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে উহা কর্ম্ম নহে, সুতরাং কর্ম্ম করিয়াও এস্থলে কর্ম্ম করা হয় না, আর যেখানে বিধানসিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া পাপ উপস্থিত হয়, এবং সেই পাপে বন্ধন ঘটে সেখানে কর্ম্ম না করিয়াও কর্ম্ম করা হয়, এ কথার সঙ্গে 'কর্ম্মসাগরে ডোবাও যা, ঈশ্বরে ডোবাও তা' ইহার কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ম্ম বন্ধনের হেতু; কোন প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া নির্লিপ্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে উহা বন্ধনের হেতু হয় না, ইহা বলিতে যেমন সহজ, কর্ম্মতঃ করা তেমন সহজ নহে। আমি কিছু করিতেছি না, ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করিতেছে, এরূপে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিতে যত্ন করা বৃথা, কেন না ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে আমি মিলিত না থাকিলে ইচ্ছাসিদ্ধ কর্ম্মগুলি কখনই হইতে পারে না। আহার পান ভোজনাদি যে কোন কর্ম্ম করি, তৎসহ যে ফলাকাঙ্ক্ষা আছে তাহা হইতে সম্যক্ প্রকারে আপনাকে বিমুক্ত রাখা সকল সময়ে সম্ভবপর নহে। ফলাকাঙ্ক্ষার লেশমাত্র নাই আমি

সম্যক্ প্রকারে নির্লিপ্ত আছি, একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, ইহা আর মনে করিতে পারা যায় না। সুতরাং কর্ম্মসাগরে ডোবা আর ঈশ্বরে ডোবা একই কথা কিছুতেই প্রমাণিত হইতেছে না।

কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে কর্ম্মজন্য দোষ থাকে না, কিন্তু ইহাতে আধ্যাত্মিক উন্নতিরও কোন সম্ভাবনা নাই। সংসারে প্রতিদিন আমাদের বিবিধ কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, সংসারে থাকিলে সে সকল না করিলে চলে না, কিন্তু তদ্দ্বারা আমরা দিন দিন যোগের পথে অগ্রসর হইতেছি ইহাতো কিছুতেই বলিতে পারি না। পিতার প্রতি কর্ত্তব্য, পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য, প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য, আপনার প্রতি কর্ত্তব্য, এই প্রকার বিবিধ কর্ত্তব্য বিভাগ করিয়া লইয়া যথাসাধ্য সেই সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া আমি সন্তুষ্টচিত্ত হইতে পারি, কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া লোকের নিকটে প্রশংসিত হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মযোগ হইল কোথায়? কর্ত্তব্যপালন দ্বারা সাংসারিক বিবিধ সম্বন্ধ মধুর হইতে পারে, মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের সম্বন্ধ মিষ্ট হইতে পারে, ইহাতে যোগ সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? কর্ত্তব্য সাধন করিলে ঈশ্বর তুষ্ট হইবেন, ইহা মনে থাকিলেও ঈশ্বরের সহিত দূর সম্বন্ধ হইল, সাক্ষাৎসম্বন্ধ হইল না, সুতরাং কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ঈশ্বরেতে মগ্ন হওয়া যায়, এ কথাই উঠিতে পারে না। কর্ত্তব্যের ভূমি নীতির ভূমি. এখানে শুদ্ধ কর্ত্তব্যপালনে সমুদায় অনুষ্ঠান চলিতে পারে। ঈশ্বরের বিধি প্রতিপালন করিতেছি এ জ্ঞানও মনে জাগরূক থাকিতে পারে, কিন্তু বাহ্য কর্ম্ম মনের উপরে ঈদৃশ প্রবলরূপে কর্ম্ম করে যে, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় পরোক্ষ জ্ঞান উহা দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানে পরিণত হয় না। নীতি ও ধর্ম্ম, এ উভয়কে যে অনেকে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করেন ইহাই তাহার কারণ। এ দুইয়ের পার্থক্য এখন এত দূর হইয়া পড়িয়াছে যে, নীতিমান্ ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের জন্য লালায়িত নহেন, তাঁহারা কর্ত্তব্য পালন করিয়াই সন্তুষ্ট, ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের পূজাবন্দনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগকে নীতি ভূমির হইতে উচ্চস্থানে আরূঢ় বিশ্বাস করেন এবং সংসারের বিবিধ কর্ত্তব্যগুলিকে উপেক্ষার নয়নে দেখেন, এমন কি অনেক সময়ে সেগুলি ভঙ্গ করিয়াও তজ্জন্য কোন পরিতাপ অনুভব করেন না।

আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি, প্রাচীনকালে কর্ম্মযোগের যে পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং আধুনিক সময়ে কর্ত্তব্যপালন যে উচ্চস্থান গ্রহণ করিয়াছে, এ দুইয়ের কোনটির সম্বন্ধেই বলিতে পারা যায় না, কর্ম্মেতে মগ্ন হওয়া, আর ঈশ্বরেতে মগ্ন হওয়া একই। কর্ম্মেতে মগ্ন হওয়া আর ঈশ্বরেতে মগ্ন হওয়া যদি এক না হয়, তাহা হইলে আমরা কখন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হইতে পারি না। কর্ম্ম করিতে গিয়া যদি আমাদের দৃষ্টি ঈশ্বর হইতে নিবৃত্ত হইয়া বাহিরের বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে প্রাচীনকালে কর্ম্মের যে নিন্দা আছে, তাহা অমূলক বলিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব কোন্ সাহসে? আমরা সংসারে আছি বলিয়াই যে কর্ম্ম না করিলে চলে না তাহা নহে যদি সংসার ছাড়িয়া যাই, সেখানে কি কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন থাকিবে না? যত দিন শরীর আছে, মন আছে, তত দিন কোন না কোন আকারে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম যদি এইরূপে একান্ত অপরিহার্য্য হইল, তাহা হইলে এ কর্ম্মকে যদি যোগের অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া না যাইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের স্খলন অবশ্যম্ভাবী। আমরা এ যুগের লোক, এ যুগে কর্ম্মের প্রাধান্য সর্ব্বত্র, অনিচ্ছাতেও জীবনের অধিকাংশ সময় কর্ম্মেতে আমাদিগকে অতিবাহিত করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কর্ম্ম আর যোগ যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে, তাহা হইলে নিত্য যোগযুক্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যোগাচার্য্যের স্বাভাবিক যোগে আহার বিহার, কর্ম্ম, উদ্যম, নিদ্রা জাগরণ এ সকলই বিহিত হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন যোগের আকাঙ্ক্ষী তাঁহারা এ সকলকে যোগের অন্তঃপাতী না করিয়া কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিবেন? আমি কিছু করিতেছি না, এ সকল প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রকৃতিসিদ্ধ ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে, ইহা বলিয়া এ কালে আর মনস্তুষ্টি হয় না। আমরা যোগ চাই, অক্ষুন্ন যোগ চাই, সর্ব্বথা ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া আছি এ বোধ জাগ্রৎ থাকা চাই, প্রকৃতি প্রকৃতির কর্ম্ম করিতেছে. ইহা বলিলে আমাদের পক্ষে চলে কৈ? প্রকৃতি আমাদের মতে যোগের বিরোধী নহেন, তাঁহাকে অনুকূল করিয়া লইয়া যোগ সাধন করিতে হইবে। এরূপ স্থলে প্রকৃতিকে পর করিয়া রাখিলে চলিবে কেন?

প্রকৃতি বিরোধিনী নহেন অনুকূল, এ মত নূতন হইলেও ইহা নিতান্ত সত্য। কর্ম্মকে যোগে পরিণত করিতে হইলে এ মত মনে রাখিয়া উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং বাহিরের পদার্থ জগৎ, এ উভয়ের সহিত সম্বন্ধ স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে তখনই বিরত হওয়া বিধিসিদ্ধ, যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে এ উভয়ের সম্বন্ধ ঘটে। বাহিরের প্রকৃতি কখন ঈশ্বরের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া কোন কর্ম্ম করে না। আমাদের আত্মপ্রকৃতি 'সর্ব্বাত্মার' শাসনে অবস্থান করিলে বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে উহার কোন কালে বিরোধ উপস্থিত হয় না। যিনি সর্ব্বাত্মা, অন্তরে বাহিরে থাকিয়া সমুদায় শাসন করিতেছেন, তাঁহার শাসন আমরা অগ্রাহ্য করি বলিয়াই সেই শাসনের অধীনে আনিবার জন্য প্রকৃতি আমাদিগের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হন। এ প্রতিকূলাচরণ বাস্তবিক প্রতিকূলাচরণ নয়। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক শাসনাতিক্রম করিয়া আপনাদের পাপ ও অকল্যাণের পথ প্রমুক্ত করিয়াছেন, শাস্তার ইচ্ছানুবর্ত্তিনী প্রকৃতি যদি তাহাদের চেতনাসাধন জন্য প্রতিকূলাচরণ না করে, তাঁহা হইলে প্রকৃতি কি কখন তাঁহার অনুগতা বলিয়া পরিচয় দান করিতে পারেন? ঈদৃশ বিপথগামী লোকদিগকে প্রকৃতি কোন দিন অদণ্ডিত অবস্থায় থাকিতে দেন নাই, কোন দিন দিবেন না। তাঁহার এই দণ্ড

শাস্তার দিকে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে উন্মুখ করে, ইহা কিছু তাহাদিগের পক্ষে সামান্য মঙ্গলের বিষয় নহে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং তাহাদিগের বিষয় কখনই আমাদিগের অকল্যাণ সাধন করিতে পারে না, স্বাভাবিক যোগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, যদি আমাদের নিজের অভিলাষ শাস্তার শাসন অতিক্রম করিয়া বিপথগামী না হয়। শাস্তা তাঁহার অনুশাসন আমাদিগকে প্রতিনিয়ত জানাইয়াছেন, কিন্তু বলপূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করাইতেছেন না, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার অনুসরণ করি, এই তাঁহার অভিপ্রায়। আমরা পুত্রের ন্যায় স্বাধীন ভাবে পিতার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিব, ইহা আমাদিগের গৌরব; সে গৌরব হইতে আমরা নিজেই বিচ্যুত হইতেছি।

পিতার ইচ্ছা নিয়ত ক্রিয়াশীল, সে ইচ্ছার মুহূর্ত্তের জন্য নিবৃত্তি নাই। বলিতে পারা যায়, পিতা নিয়ত কর্ম্মসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তিনি কর্ম্মসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহার আপনাতে আপনি স্থিতি বা যোগ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে? কখন নয়। পুত্র যদি পিতার অনুরূপ না হইলেন, তাহা হইলে তিনি পুত্র হইবেন কি প্রকারে? পিতা কি আপনার প্রয়োজন-সাধনের জন্য কর্ম্ম করিতেছেন? যাহা তিনি করেন, তাহার ফলভাগী তিনি নিজে হন, না অপরে হয়? কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা কি ঈশ্বরের আছে? তাঁহার কর্ম্ম পরের কল্যাণ সাধন করে, পরকে বিশিষ্ট ফলদান করে। পিতা সন্তানদিগের জন্য সকলই করিতেছেন, অথচ তিনি স্বয়ং পূর্ণকাম বলিয়া কর্ম্মজনিত বিকার তাঁহাকে তিলার্দ্ধের জন্য স্পর্শ করিতেছে না। তিনি একবার সৃষ্টি করিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা নহে, ক্রমান্বয়ে তাঁহার সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে; যে সকল সৃষ্টি হইতেছে তাহাদের রক্ষণ-পরিবর্দ্ধনাদি জন্য ক্রমান্বয়ে তাঁহার শক্তি নিয়োগ করিতে হইতেছে। পিতার অবিশ্রান্ত ক্রিয়া দেখিয়াই তৎপুত্র ঈশা বলিয়াছিলেন, 'পিতা এখনও কার্য্য করিতেছেন, আমি কার্য্য করিব না?' বস্তুতঃ পিতার অনন্তশক্তির ক্রিয়া যখন চিন্তা করা যায়, সেই ক্রিয়াকে কর্ম্মের সাগরের সঙ্গে তুলনা করিলেও ঠিক তুলনা হইয়া উঠে না। তাঁহার অবিশ্রান্ত কর্ম্ম যে চিন্তা করে, সে কি কখন অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? পিতা কর্ম্ম করিতেছেন, আমি কর্ম্ম করিব না? এই বলিয়া আত্মা আতুর হইয়া উঠে। এই অস্থিরতা যদি তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হয়, তাহা হইলে পিতা তাঁহার আত্মক্রিয়ার আদর্শ পুত্রের সম্মুখে ধরিলেন কেন? পুত্র কখন অলস থাকিবে না, সর্ব্বদা কর্ম্মব্যস্ত থাকিবে, এই জন্য কি তিনি নিয়ত চন্দ্র সূর্য্যাদিকে ঘুরাইয়া, বিবিধ প্রকারের ক্রিয়া প্রতিমুহূর্ত্ত প্রকাশ করিয়া আপনার মত কর্ম্মশীল হইতে পুত্রকে বলিতেছেন না? নিয়ত কর্ম্মশীল পিতার পুত্র সর্ব্ব প্রকারের কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া কাষ্ঠলোষ্টের দশা প্রাপ্ত হইবে, ইহা কি তাহার পক্ষে শোভা পায়? সে বিশ্বাস করিবে "কর্ম্মসাগরে ডোবাও যা, ঈশ্বরে ডোবাও তা," কেন না সে তদ্রূপ হইলে পিতার অনুরূপ হইয়া তাঁহার সঙ্গে এক হইবে।

পিতার ন্যায় পুত্র কর্ম্মসাগরে ডুবিয়া যোগ রক্ষা করিবে কি প্রকারে? পিতার যেন কোন আত্মপ্রয়োজন নাই, পুত্রের যে বিবিধ প্রকারের আত্মপ্রয়োজন আছে। সে কি কোন কালে প্রয়োজনশূন্য হইতে পারে? হইতে পারে বৈ কি। শরীরের প্রয়োজন তো তাহার নিজের প্রয়োজন নয়? সে যদি শরীর হইত তাহা হইলে শরীরের প্রয়োজন তাহার প্রয়োজন হইত। শরীরের প্রয়োজনসাধন জন্য আহার পান, তাহাতে তাহার আপনার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? শরীর সে আপনি সৃষ্টি করে নাই, আপনি তাহার প্রকৃতি দান করে নাই। পিতা উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পিতা উহাকে উহার বিশেষ প্রকৃতি দিয়াছেন। সেই পিতা উহার সম্বন্ধে যে প্রকার ব্যবহার করিতে বলিবেন, পুত্র সেই প্রকার ব্যবহার করিবে, তাহাতে তাহার আপনার আসিবে যাইবে কি? সে যদি শরীরসম্বন্ধে পিতার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন না করিয়া উহাকে সর্ব্বস্ব করিয়া তোলে, তাহা হইলে তাহার পিতার সঙ্গে যোগ কাটিয়া গেল, কর্ম্ম তাহার বন্ধনের কারণ হইল। শরীর যেমন পিতার সৃষ্টি এবং তাহার প্রকৃতি পিতার প্রদত্ত, তেমনি বাহিরের বিষয় সমুদায়ও তাঁহার সৃষ্টি এবং তাঁহার প্রদত্ত প্রকৃতি। তাহাদের সম্বন্ধে যে প্রকার ব্যবহার পিতা ইচ্ছা করেন, সেই ইচ্ছানুসরণ করিয়া ব্যবহার করিলে ব্যবহার কালে পিতার সঙ্গে দিবা রজনী একত্র কার্য্য করা, তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকা, এ দুই একই। পিতার ইচ্ছানুবর্ত্তনমাত্র যাহার লক্ষ্য, তাহার আবার অন্য ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে কি প্রকারে? সে যে কার্য্য করিবে, লক্ষ লোক তাহার ফলভোগী হইবে, সুতরাং তাহার কর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে পিতারই অনুরূপ। এইরূপ কর্ম্মসাধন লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য বলিয়াছেন, "কার্য্যসাগরে ডোবাও যা, তোমাতে (ঈশ্বরেতে) ডোবাও তাই।" প্রত্যেক বিধানবাদীর এইরূপ কর্ম্মে নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মী থাকা ঈশ্বর অভিপ্রায় করেন।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ।

২৬ মাঘ, রবিবার ১৮১৮ শক।

বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ এক যোগেরই মহিমা গান করে। মনে হইতে পারে, বেদ যখন প্রাকৃতিকশক্তির পূজা প্রচার করিয়াছেন, তখন তন্মধ্যে যোগ আছে, ইহা বলা ঠিক নয়; কিন্তু যখন দেখিতে পাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র বাস বেদ সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করিয়াছেন, এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার সখ্যবন্ধন বেদেই রহিয়াছে, তখন এখান হইতে যোগের আরম্ভ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বৈদিক ঋষি আপনার ভিতরে আত্ম ও পরমাত্মার স্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং পরমাত্মা কিপ্রকার সৌহৃদ্য-বন্ধনে জীবাত্মাকে আপনার সঙ্গে বান্ধিয়া রাখিয়াছেন তাহাও

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, অন্যথা এরূপ সুমিষ্ট কবিত্বপূর্ণ ঋক্ কখন বৈদিক ঋষির হৃদয় হইতে উত্থিত হইত না। সমুদায় জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, ঋগ্বেদ একথা বলিয়া সেই পরমাত্মাকে কেবল আপনাতে বদ্ধ রাখেন নাই, সমুদায় ভুবনের অধীশ্বরকেই আপনার আত্মার সখা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। জগতে যিনি তিনিই আমার হৃদয়ে তাঁহারই সহিত আমার নিত্য সখাবন্ধন, যে বেদ এ কথা বলিতে পারেন, তন্মধ্যে যোগের মহিমা গান করা হয় নাই, এ কথা কি প্রকারে বলিব? মনুষ্যাত্মা প্রথম হইতে পরমাত্মার সহিত আপনার সম্মিলন অন্বেষণ করে এবং এই সম্মিলনাকাঙ্ক্ষা বিবিধ ধর্ম্মের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। উপনিষদে আদ্যন্ত মধ্যে যোগেরই মহিমা লক্ষিত হইয়া থাকে। যোগ এখানে ঘন হইতে ঘনতম অবস্থা লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ পরমাত্মাকে পঞ্চভৌতিক দেহে, তৎপর যথাক্রমে ইন্দ্রিয়গণে, প্রাণে, মনে, বিজ্ঞানে বা জীবাত্মাতে দর্শন, পরিশেষে একেবারে পরমাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন হইয়া তাঁহাতে নিমগ্ন ভাব, এ যোগ কিছু সামান্য যোগ নহে। পরমাত্মা দুর্জ্ঞেয়, সর্ব্বত্র গূঢ়ভাবে প্রবিষ্ট, কেবল অধ্যাত্মযোগে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, উপনিষৎ এ কথা বলিয়া যোগকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বত্র গূঢ়ভাবে প্রবিষ্ট তাঁহাকে বাহিরের চক্ষু দেখিবে কি প্রকারে? সমুদায় বিষয় হইতে মন সংযত করিয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট না হইলে সমুদায়ের অন্তঃপ্রবিষ্ট যিনি তাঁহাকে দেখা কি সম্ভব? অতএব সর্ব্বত্র গূঢ় ভাবে প্রবিষ্ট পরমাত্মাকে দেখিবার জন্য উপনিষৎ যে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। বেদের যোগ স্বাভাবিক, উপনিষদের যোগ চিন্তাপ্রধান, এই যাহা ইতরবিশেষ। পুরাণ অনুরাগের পথে যোগ সম্পাদন করিলেন। ঈশ্বরের নাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া ভক্তের অশেষ দুঃখ অপসারিত করেন, এই কথা বলিয়া পুরাণ প্রেমযোগ স্থাপন করিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্তি, চিন্তা, ও অনুরাগ এ তিনেতেই যোগ সাধিত হয়।

জ্ঞানযোগী ও প্রেমযোগী, যোগী হইলেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্য সামান্য নয়। জ্ঞানযোগী যিনি তিনি কেবল বস্তু অন্বেষণ করেন। বাহিরের ইন্দ্রিয়সকল যাহা দেখিতেছে গ্রহণ করিতেছে, সে সমুদায় তাঁহার নিকটে কিছুই নয় অপদার্থ, অবস্তু। তিনি সে সকলকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের অন্তস্তম প্রদেশে প্রবেশ করেন, সেখানে যিনি অসারের মধ্যে সার, অসতের মধ্যে সৎ, তিনি তাঁহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করেন। সেই সারাৎসার পরম সত্যের প্রকাশে আর সকলই তাঁহার নিকটে তুচ্ছ হইয়া যায়। সংসারের কিছুই আর তাঁহার নিকটে ভাল লাগে না, তিনি নির্জ্জন গিরিগুহা, কানন, নদীতট আশ্রয় করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় জীবনাতিপাত করাই আপনার জীবনের উচ্চতম অবস্থা মনে করেন। স্ত্রীপুত্রপরিবার, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব তাঁহার অন্তর্মুখগতির অন্তরায় জানিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গ দূরে পরিহার করেন। জনসমাজে অবস্থান করিয়া জনকোলাহলের সঙ্গে যোগ তিনি বিষতুল্য মনে করেন। কোন কোন জ্ঞানযোগী পরমাত্মার বিশেষ অনুরোধে জনসমাজের সঙ্গে অনিচ্ছাসত্ত্বে যোগ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ জ্ঞানযোগী নির্জ্জনদেশাশ্রয়ী ছিলেন। প্রেমযোগীর ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। শুষ্ক জ্ঞান ও শুষ্ক বৈরাগ্য এ দুইই তিনি দূরে পরিহার করিতেন। তিনি বলেন, আমার প্রিয়তম ঈশ্বরের সৃষ্টিকে আমি অসার বলিয়া উড়াইয়া দিব কি প্রকারে? তিনি আপনি সার হইয়া কি কখন অসারের সৃষ্টি করিতে পারেন? তিনি সত্য, তাঁহার সৃষ্টিও সত্য। সৃষ্টির মধ্যে তাঁহার সেই সত্যের প্রকাশ দেখিয়া প্রেমযোগী পরম আনন্দ লাভ করেন। স্ত্রীপুত্রপরিবার আত্মীয়স্বজন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জ্জনপ্রদেশে বাস করা প্রেমযোগের বিরুদ্ধ। সহস্র সহস্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া প্রিয়তমের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য তিনি নিতান্ত উৎসুক। তিনি যত অধিক ব্যক্তির সহিত প্রেমে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন ও শ্রবণ করিতে সমর্থ হন, তত তাঁহার আনন্দ। জনসমাজকে দূরে পরিহার না করিয়া তিনি তন্মধ্যে সর্ব্বদা প্রিয়তমের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া সুখী হয়েন। জ্ঞানযোগী ও প্রেমযোগী এ উভয়ের মধ্যে কত পার্থক্য!

জ্ঞানযোগী সমুদায় বস্তুনিরপেক্ষ হইয়া এক সেই পরমবস্তুতে আপনার চিত্ত নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে সেই এক পরমবস্তু ভিন্ন অন্য আর কিছুই বস্তু মধ্যে গণ্য নহে। তিনি জনগণের সঙ্গ অপেক্ষা বৃক্ষ লতা ও নির্দ্দোষ হরিণশিশুর সঙ্গ ভাল বাসেন। এ সকল তো আর তাঁহার যোগের অন্তরায় হয় না। তিনি সমুদায় জগৎকে ঈশ্বরশূন্য করিয়া আপনার ভিতরে তাঁহাকে আনিয়াছেন, জগৎ তাঁহার নিকটে মিথ্যা মায়ার রঙ্গভূমি ভিন্ন আর কিছুই নহে। মায়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য এই মিথ্যা কুহক উপস্থিত করিয়াছে। জ্ঞানযোগী এই মায়ার কুহককে জ্ঞানযোগে উড়াইয়া দিয়া সর্ব্বত্র কেবল ব্রহ্মবস্তু দর্শন করেন, সৃষ্টি তাঁহারনিকটে স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল; উহা স্রষ্টার সৌন্দর্য্যের প্রকাশ নহে। প্রেমযোগীর নিকটে সকলই ইহার বিপরীত। তিনি বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী নরনারী সকলকেই প্রিয়তমের অধিষ্ঠানভূমি জানিয়া তাহাদের সকলের নিকটে প্রণত মস্তক হন; মায়া বা কুহক বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করা মহাপরাধের কারণ তিনি মনে করেন। তিনি পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে মায়ার বন্ধন মনে করিয়া দূরে পরিহার করিবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পুত্রকন্যাগণের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে গিয়া তিনি আপনার পরম পিতামাতাকে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেন। বৃক্ষ লতা পুষ্প পাখী তাঁহার নিকটে মায়ার খেলা নহে, তিনি সে সকলের মধ্যে

প্রিয়তমের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ। হাফেজ গোলাপের সৌন্দর্য্য ও বুল্‌বুলের সুস্বর মধ্যে প্রিয়তমকে স্মরণ করিয়া প্রমত্ত। সৃষ্টি না থাকিলে প্রেমের পূর্ণতা হয় না, এজন্য প্রেমিকের নিকটে সৃষ্টির সমাদর। ভক্ত শাক্ত, শাক্ত ভক্ত; তিনি মহাশক্তির পূজা কিপ্রকারে করিবেন, যদি সৃষ্টিতে সেই মহাশক্তির প্রকাশ না দেখেন। এই মহাশক্তি আনন্দময়ী জননী, তাঁহার আনন্দের প্রকাশে সমুদায় জগতের সৌন্দর্য্যের বিকাশ; জীবমাত্রকে আনন্দ দান করিতে গিয়া তাঁহার অসীম স্নেহ তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত হয়। প্রেমযোগী সংসার ত্যাগ করিয়া যোগসাধন করিতে পারেন না। তাঁহার প্রিয়তমের লীলা দর্শন না করিলে তাঁহার হৃদয় ম্রিয়মাণ হয়। তিনি সংসারে ভিন্ন আর কোথায় তাঁহার জীবন্ত লীলা দর্শন করিবেন? গৃহচত্বরে যখন বালকবালিকাগণ আনন্দে ক্রীড়া করে তখন তাহাদিগের মধ্যে তিনি তাহাদের সঙ্গে আনন্দময়ের খেলা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বত্র ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য ও গৌরব দর্শন করিয়া সুখী হয় সুতরাং সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

প্রেমযোগীর এই পর্য্যন্ত যোগের শেষ হইল তাহা নহে। তাঁহার নিকটে ঋষি, মহর্ষি, সিদ্ধ, মহাজন, মহাপুরুষগণ মৃত বা দূরস্থ নহেন। কোথায় ঈশা, কোথায় মুসা, কোথায় চৈতন্য, কোথায় বুদ্ধ বলিয়া তিনি চিৎকার করেন না, তাঁহারা তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরে নিত্য বিদ্যমান, তিনি আর কোথায় তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিবেন। ঈশ্বর তাঁহার নিজের বাসগৃহ, সেই বাসগৃহ মধ্যে তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিত্য সুখী। তিনি আপনাকে আপনি নিতান্ত হীন ও দুর্ব্বল জানেন, তাঁহার প্রেমভক্তি পুরুষকার কিছুই নাই, কিন্তু এই মহাপুরুষদের সঙ্গে তিনি এক হইয়া গিয়া এ সকল গুণ সহজে লাভ করেন। তিনি যখন প্রেমে হাসেন কাঁদেন নাচেন, তখন আপনার ভিতরে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করেন, যখন আপনার অভিলাষ বিসর্জ্জন করেন, তখন দেখেন ঈশা তাঁহার মধ্যে বিরাজমান, যখন প্রবৃত্তিবাসনার উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়া সর্ব্ববিষয় হইতে নিবৃত্ত হন, তখন দেখেন বুদ্ধের সহিত এক হওয়াতে তাঁহাতে ঈদৃশ পুরুষকার সম্ভব হইয়াছে। প্রেমযোগীর কখন জ্ঞানের অভাব হয় না, তিনি প্রেমে জ্ঞানিগণকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলেন। প্রেমে ঈশ্বরতত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে যত স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, তত জ্ঞানযোগিগণের সহিত তাঁহার একতা উপস্থিত হয়। তিনি সারাৎসার প্রাণের প্রিয়তম ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। তিনি যে পথে চলিতেছেন, যদি তাঁহাতে জ্ঞান উপস্থিত না হইত, শীঘ্র বিকারের সম্ভাবনা ছিল, মহাপুরুষগণেতে চিত্ত আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বর হইতে তাঁহার বিচ্যুতি ঘটিত। তাঁহাতে জ্ঞানের প্রবেশে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, মহাপুরুষগণের যাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহাই তিনি অর্পণ করেন, তদতিরিক্ত দিতে গিয়া তাঁহার হৃদ্দেবতার অবমাননা তিনি করেন না। মহাপুরুষগণ যিনি যাহা প্রচার করিয়াছেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে একীভূত হন, একের যাহা তাহা অপরেতে আরোপ করিয়া তাঁহাকে বাড়াইবার জন্য যত্ন করেন না। প্রেমে সমুদায় মহাপুরুষগণ সহ এক হইয়া তাঁহাদের ভিতরে আপনাকে উড়াইয়া দিয়া মানবীয় উচ্চ ভাবসম্বন্ধে তাঁহার আর কোন অভিমান থাকে না।

জ্ঞানযোগ ও প্রেমযোগ চির দিন স্বতন্ত্র রহিয়াছে। এ দুই পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে থাকাতেই এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। জ্ঞানযোগী বস্তুপ্রধান, প্রেমযোগী অনুরাগপ্রধান। বস্তুতে যদি অনুরাগ না জন্মে তাহা হইলে জ্ঞানযোগীর জ্ঞানযোগ মিথ্যা। তিনি যে বস্তু দর্শন করিলেন সে বস্তুতে যদি তাঁহার মন মুগ্ধ না হইল, তাহা হইলে তাঁহার যোগে প্রবৃত্তি থাকিবে কি প্রকারে? বস্তু দিন দিন যদি আপনার সৌন্দর্য্যে তাঁহার মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বস্তু তাঁহাকে আনন্দ বিতরণ করিবে কি প্রকারে? জ্ঞানযোগী যত দিন বস্তুর উপরে উপরে ভাসেন, তত দিন উহার সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। একবার যখন বস্তুর সৌন্দর্য্যে জ্ঞানযোগী মুগ্ধ হইলেন, তখন আর তাঁহার ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তির উপরে দৃষ্টি না পড়িয়া থাকিতে পারে না। এত দিন তিনি অন্তরে ছিলেন, এখন বাহিরে আসিয়া বস্তুর সৌন্দর্য্যের ছটায় সমুদায় জগৎ সুন্দর ও মনোহর হইয়াছে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। অন্য দিকে প্রেমযোগীরও জ্ঞানযোগনিরপেক্ষ হইয়া থাকিবার উপায় নাই। প্রেমস্বরূপের লীলা দেখিতে দেখিতে তাঁহার জ্ঞানের মাধুর্য্য তাঁহার নিকটে ক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রত্যেক লীলার ভিতরে গভীর জ্ঞান প্রকাশ পায়, সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপের প্রতি প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার দৃষ্টি না পড়িয়া থাকিতে পারে না। জ্ঞানস্বরূপের প্রভাবে তাঁহার হৃদয় সকল প্রকারের মিথ্যা সংস্কারের হাত হইতে মুক্তি লাভ করে; প্রেমস্বরূপের আবির্ভাবে জগতের সৌন্দর্য্য ইহা জানিয়া প্রেমস্বরূপের বস্তুত্ব তাঁহার হৃদয়ে বিশেষরূপে মুদ্রিত হয়। প্রেমযোগী অনুরাগপ্রধান হইয়া যোগ আরম্ভ করেন, কিন্তু পরিশেষে বস্তুতে তাঁহার যোগ পর্য্যবসন্ন হয়, জ্ঞানযোগী বস্তু হইতে যোগ আরম্ভ করিয়া পরিশেষে বস্তুর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অনুরাগপরবশ হন। অন্তিমে এইরূপে জ্ঞানযোগী ও প্রেমযোগী এ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা আর থাকে না। আমাদের জীবনে এই উভয় যোগ একীভূত হইবে, ইহাই আমাদের আশা। কৃপানিধান পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদের জীবনে জ্ঞানযোগ ও প্রেমযোগের বিরোধ না থাকে, এ উভয় একীভূত হইয়া বস্তু ও ভাব সম্মিলিত ভাবে আমাদের জীবনে কার্য্য করে।

প্রাপ্ত।

ব্রহ্মপরিচয়।

ধর্ম্মজীবনের উষাকালে, একদিন আমাদের পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায় বসিয়া আছি। সায়ংকাল নিকটে, লোকজন

নাই, নিস্তব্ধ অবস্থা। প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। এমন সময় পরমাত্মা ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহার সুগম্ভীর আবির্ভাব প্রকাশ করিলেন। প্রাণ এক অপূর্ব্ব মধুময় আবির্ভাবের ভিতর ডুবিয়া গেল। কিছুকাল সেই ব্রহ্মাবির্ভাবের ভিতরে নিমজ্জিত রহিলাম, তখন আর চক্ষু উন্মীলিত করিতে ইচ্ছা হইল না। কতকক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া চারিদিক মধুময় দেখিতে লাগিলাম। এইদিন প্রথম ব্রহ্মপরিচয় লাভ হইল। তৎপরও কয়েক দিন সেই স্থানে ও সেই সময়ে পিপাসিত আত্মা তাঁহাকে অন্বেষণ করিল, কিন্তু আর দর্শনলাভ হইল না। প্রাণনাথ আমাকে আকুল করিয়া লুক্কায়িত হইলেন। তথাপি আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করি যে এ পাপভাগ্যে এমন দিন ঘটাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে ক্ষোভ মিটাইয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ নগরে বাসকালে, এক দিন প্রাতঃকালে প্রাণটা বড় উদাস হইতে লাগিল। জনপদ পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে চলিয়া গেলাম। হেমন্তকাল, সম্মুখে প্রসারিত শস্যপূর্ণ মাঠ, সেই ক্ষেত্র ও আকাশভরা ব্রহ্মরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেখিয়া সকল জ্বালা ভুলিয়া গেলাম, প্রাণ কৃতার্থ হইল, হৃদয় ব্রহ্মানন্দরসে অভিষিক্ত হইল। কতক ক্ষণ এই রূপে চলিয়া গেল। তৎপর গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। আমার প্রাণ ব্রহ্ম কোথায় লুকাইয়া গেলেন। প্রাণনাথের অন্তর্দ্ধানে আমার একগুণ বিষাদ দশগুণ বৃদ্ধি হইল। তখন দিন বড় ক্লেশে কাটিতে লাগিল। একবার একবার দেখা দিয়া তিনি আমাকে বড়ই কাতর করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। তখন আর আমার নিকট কিছুই ভাল লাগিত না। বন্ধুদের সংসর্গ ভাল লাগিত না। পাঠ্যাবস্থা, পড়া শুনাও ভাল লাগিত না। এক বিষাদের ঘন অন্ধকার আমাকে আচ্ছন্ন করিল। প্রাণের দুঃখ বলিবার লোক নাই, কোন মানুষের সহানুভূতি পাইবার আশা নাই, এবং তাহা অন্বেষণে প্রবৃত্তিও হইল না। পড়াশুনায় অমনোযোগ ও বিমর্ষভাব দেখিয়া বন্ধুরা কখনও আমার কল্যাণের জন্যই কটাক্ষ করিতেন; কেন না তাঁহারা আমার অন্তরের অবস্থা বুঝিতেন না। দিনের বেলায় প্রতীক্ষা করিতাম, কখন রাত্রি আসিবে, একাকী নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিয়া চক্ষের জলে প্রাণনাথের পা ধোয়াইব। ময়মন সিংহ ব্রহ্মপুত্রের তটে গবর্ণমেণ্ট গির্জ্জার নিকটে রাত্রিকালে বেশ নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতা হয়। রাত্রি কালে সেই স্থানে যাইয়া একটি অনুচ্চ ইষ্টকস্তম্ভের উপর বসিতাম। বসিয়া প্রাণের দুঃখ ব্যাকুলতা প্রাণনাথকে জ্ঞাপন করিতাম আমার কান্দিবার স্থান হইল সেই নির্জ্জন নদীতট। সেই স্থানে প্রাণনাথের চরণে কত কথাই বলিতাম, আর তিনি কত আশ্বাস বাণীতে সান্ত্বনা দান করিতেন, চক্ষুর জল মুছাইয়া দিতেন, ব্যথিত প্রাণে আরাম দান করিতেন।

সাক্ষী
শ্রীবৈ—ঘোষ।

সংবাদ।

চট্টগ্রামস্থ আমাদের পরম উপকারী সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু রায় কৈলাসচন্দ্র দাস বাহাদুর বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। অনেক বৎসরাবধি তিনি বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, কয়েকবার জীবন সংশয় হইয়া উঠে; ডাক্তারগণের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। এবার তাঁহার রোগবৃদ্ধি এত শীঘ্র শীঘ্র হইয়া পড়িল যে, তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া আর চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাওয়া গেল না। প্রায় একপক্ষ কাল তাঁহার রোগবৃদ্ধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু সরকারী কার্য্যের অত্যন্ত আধিক্যবশতঃ তিনি রোগের দিকে দৃষ্টি না করিয়া নিয়মিতরূপে কার্য্যালয়ে যাইয়া খুব পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে থাকেন। কার্য্যালয়ে যাইয়া কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বে দৈনিক পুস্তকে একটী করিয়া প্রার্থনা লেখা তাঁহার রীতি ছিল; সেই রীতি অনুসারে ১০ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আফিসে যাইয়া যে প্রার্থনা লিখিয়াছিলেন তাহাতে এইরূপ লেখা আছে,"আমার মৃত্যুর দিন নিকট আসিয়াছে, হে পিতা,আমাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত কর।" পরদিন শনিবারেও তিনি কার্য্যালয়ে গমন করেন। সে দিন আর গাড়ী হইতে নামিলেন না, কেবল আফিসের কর্ম্মচারীদিগকে নিকটে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, তোমরা সকলে আজ বাড়ী যাও, চারিদিন আফিস বন্ধ হইল। তিনি এমনি কার্য্যপ্রিয় ছিলেন যে কোন দিন তিনি একসঙ্গে সকলকেই এত ছুটি দিয়া কখন আফিস বন্ধ করেন নাই। হঠাৎ তাঁহার এইরূপ ছুটি দেওয়াতে কর্ম্মচারিগণ সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শনিবার আফিস হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতেই তাঁহার রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। রবিবারেতেই তিনি চলিয়া যাইবেন বন্ধুগণের মনে এরূপ আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, কিন্তু রবিবার রাত্রি প্রভাতের পর সোমবার প্রাতে তাঁহার অবস্থা বেশ ভালই বোধ হওয়ায় আবার আত্মীয় স্বজন সকলেরই মনে আশা সঞ্চারিত হইল। সোমবার রাত্রি হইতে আবার রোগ বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত রাত্রি সকলে বিষম ভাবনায় যাপন করিলেন। রোগীর জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল,নামপাঠ প্রার্থনা সংকীর্ত্তন প্রভৃতি যখন যাহা হইয়াছিল সকলেতেই তিনি যোগ দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাত্রি কত হইল। যখন প্রাতঃকাল হইয়াছে শুনিলেন অমনি বলিলেন 'সুপ্রভাত।' আপনি শয্যাতে শয়ন করিয়া এপর্য্যন্ত এক দিনও আবশ্যকীয় কার্য্য করেন নাই, মঙ্গলবার প্রাতে বিলক্ষণ শ্বাস হইয়াছে সে অবস্থায় সকলের নিষেধসত্ত্বেও বলপূর্ব্বক শয্যা হইতে আবশ্যকার্য্যে গেলেন। এই ঘটনার দুই ঘণ্টা পরেই তাঁহার প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন, "এই অন্তিম কাল, হরিনাম দয়াময় নাম বলুন " তিনি অমনি বলিলেন "আমাকে তোল, আমাকে ধর।" দুই বাহু প্রসারণ করিয়া রমেশচন্দ্র যেমন তাঁহাকে ধরিলেন, অমনি বাহুতে মস্তক রক্ষা করিয়া তিনি চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

রায়বাহাদুরের জীবন অতি উচ্চ, তিনি পরদুঃখে বড়ই কাতর হইতেন আজ তাঁহার অভাবে কত দুঃখী দুঃখিনী শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত ভবিষ্যতে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। অমর আত্মা অমরধামে তাঁহার প্রাণের আচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে লাভ করিয়া পরম সুখে আছেন। পৃথিবীতে তাঁহার পরিবারের মধ্যে মহাশোক মহান্ অভাব। সেই শোকহারী দয়াময় ভিন্ন এ শোক এ দুঃখ আর কে দূর করিতে পারে? দয়াময়ের আশীর্ব্বাদ সকল শোকার্ত্তের হৃদয়ে আসিয়া সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করুক।

এই সে দিন আমাদের প্রাণের ভাই মহিমচন্দ্রকে শরীর সারিবার জন্য সকলে মিলিয়া প্রার্থনা সঙ্গীত করিয়া সপরিবারে দেওঘরে পাঠান হইয়াছিল, গত কল্য তাঁহার দুঃখিনী পত্নী অনাথিনী বিধবা হইয়া তিনটি অনাথ কন্যা, বৃদ্ধ পিতা ও একটি ভাইকে সঙ্গে লইয়া আমাদের প্রচারাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন, এ অনাথ পরিবারের দিকে তাকান যায় না; একজনের অভাবে এ পরিবার রাস্তার ভিখারী হইয়াছেন। শ্রীমান মহিমচন্দ্র দাস ৩৬ বৎসর বয়সে বিগত ৯ই ফাল্গুন সোমবার প্রাতে রোগাক্রান্ত দুর্ব্বল দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাসী পত্নী দেহত্যাগের পরই লিখিয়াছিলেন, "যিনি শরীর সারিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি আজ মৃন্ময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন,জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে।" ভ্রাতা মহিমচন্দ্র আমাদের সমাজের একজন বিশ্বাসী উৎসাহী পরিশ্রমী যুবা ছিলেন। তাঁহার দ্বারায় ব্রাহ্মমণ্ডলী বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার লেখা সমাজেরউপদেশ সকল চিরদিন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তিনি তো স্বকার্য্য সাধন করিয়া নিজধামে অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য যাহা কিছু আমাদের ভাবনা ছিল তাহা তো শেষ হইয়াছে, এক্ষণে তিনি যাঁহাদিগকে এ পৃথিবীতে রাখিয়া গেলেন তাঁহাদের যাহাতে কল্যাণ হয় ব্রাহ্মগণের সেই দিকেই দৃষ্টি পড়ুক্। দয়াময় শ্রীহরি এই নিরাশ্রয় পরিবারকে তাঁহার পদাশ্রয় দিয়া তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন।

ভাই দীননাথ মজুমদার ভগলপুর হইতে লিখিয়াছেন, "এখানকার উৎসব বেশ জমাট হইল। মেয়ে পুরুষ,বালক বালিকা, যুবক সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হইয়াছিল। নগরকীর্ত্তনও কালীনাথ আসাতে বেশ উৎসাহের সহিত জমাট রকম হইয়াছিল। বেচারার গলা ভাঙ্গিয়া পরে আর সঙ্গীত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। নিবারণ বাবুর কন্যা (দ্বিতীয়) সরোজিনীর (লালবিহারীর স্ত্রী) একটী পুত্রসন্তান আজ ১৫ দিন হইল প্রসব করিয়া অবধি ভয়ানক জ্বরে শঙ্কট অবস্থা হইতে মাতৃকৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়া আজ দুই দিন ভাল আছেন। উৎসবের মধ্যে এই দারুণ পীড়া আসিয়া উৎসবকে বড়ই সতেজ করিয়া তুলিয়াছিল। পরিবারের সকলেই এই পরীক্ষার মধ্যেও উৎসবে যোগ দিয়া বিশেষ লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃপা সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। নিবারণ বাবুর একটী ইংরাজী বক্তৃতা (গতবৎসরের ন্যায়) পড়িবার কথা ছিল, কন্যার পীড়ার জন্য সেটী লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন লিখিয়া একদিন পড়িবার কথা এবং পীড়িত কন্যার নবকুমারটির জাতকর্ম্ম করিবার ইচ্ছা।"

ভাই অমৃত লাল বসুর অনেক দিন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিয়া শরীর আবার অসুস্থ হইয়াছে। তিনি গত সপ্তাহে পুনরায় কইলোয়ারে গিয়াছেন।

অমরাগড়ীর সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পাদন জন্য ভাই ফকীর দাস রায় কুচবিহার হইতে আসিয়াছেন। ঢাকার প্রচারক ভ্রাতা বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ কুচবিহার ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য করিতেছেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন তাঁহার মাতৃদেবীর সমাধি প্রস্তুত করিবার জন্য স্বীয় জন্মস্থান পাঁচদোনায় গমন করিয়াছেন।

ভাই প্যারী মোহন চৌধুরী সপরিবারে একসপ্তাহের অধিক কাল রসায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ গুপ্তের ভবনে বাস করিয়া আসিয়াছেন। তথায় প্রতিদিনের উপাসনা প্রার্থনা সংগীত দ্বারায় তাঁহার পত্নী বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন। যোগেন্দ্র বাবুর পরিবার অতি আদরের সহিত ইঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন।

নূতন পুস্তক।

গীতা সমন্বয় ভাষ্য (বাঙ্গলা) ৩য় খণ্ড মূল্য	৵০
স্ত্রী চরিত্র অথবা (স্ত্রীচরিত্র সংগঠন) বর্দ্ধিত ও সংশোধিত	৷০
হজরতের পরবর্ত্তী চারি জন ধর্ম্মনেতা	৷০

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ১৭ই ফাল্গুন কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

REGISTERED No C. 37

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

৩৪ ভাগ ।
৫ সংখ্যা ।

১লা চৈত্র মঙ্গলবার ১৮২০ শক ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা ।

হে পরমাত্মন্, এ সংসারে বিশ্বাসের পরীক্ষা পদে পদে। তোমার কৃপায় অন্তরে যে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে সংসার বহু কৌশল করিয়া সে বিশ্বাস হরণ করিয়া লইতে চায়। যদি বিশ্বাস যায়, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধও বিলুপ্ত হয়। বিশ্বাস অধ্যাত্ম জীবন রক্ষার হেতু, বিশ্বাস গেলে মৃত্যু উপস্থিত হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? মানবসন্তানের প্রতি অপরাধ করিলে তাহার নিষ্কৃতি আছে, হৃদয়ে তুমি যে বিশ্বাস উৎপাদন কর, তাহার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিলে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই, এ কথার মর্ম্ম এখন একটু একটু আমরা বুঝিতে পারিতেছি। মানুষ যাহা বলে তাহাতে অনেক ভ্রান্তি মেশান থাকে, তুমি যাহা বল তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তির সম্ভব নাই। মানুষের দৃষ্টি সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে আবদ্ধ, সুতরাং তাহার কথার ফলাফল চক্ষুর সম্মুখে ভাসমান। তুমি যাহা বল তাহার ফল শত শত শতাব্দী অতিক্রম করিয়া আত্মক্রিয়া প্রকাশ করে, সুতরাং তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আশুফল-নিরপেক্ষ হওয়া মানবের পক্ষে একটী বিশেষ পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় অতি অল্প লোকেই উত্তীর্ণ হইতে পারে। তুমি বলিয়াছ, অতএব প্রাণ থাকুক আর যাউক তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে, এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, বল, কয় জন সংসারের পথে অগ্রসর হইতে পারে? প্রভো, যত দিন যাইতেছে, তত তোমার মুখের কথা রক্ষা করিয়া চলা নিতান্ত সুকঠিন হইয়া পড়িতেছে। অন্য শত বিষয়ে লোকের সঙ্গে মিল রহিয়াছে দেখিতে পাই, কিন্তু বিশ্বাসের গৃহে এক জনের সাক্ষাৎ পাওয়াও দিন দিন অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। একাকী ধর্ম্মসাধন তোমার বিধানে তুমি নিষেধ করিয়াছ, কিন্তু বিশ্বাসের ভূমিতে একাকিত্ব যে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। যদি তুমি বল, এখানে একাকী হইলেই কি একাকী? আমি যখন তোদের জীবন এক পৃথিবীতে বদ্ধ রাখি নাই, অনন্ত লোকের অধিবাসিগণের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছি, তখন কি আর তোদের একাকিত্বের সম্ভাবনা আছে? হে দেবাদিদেব, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, কে তোমার কথার প্রতিবাদ করিবে? কিন্তু যে পৃথিবীর সঙ্গে তুমি আমাদিগকে শতবন্ধনে বান্ধিয়াছ, তন্মধ্যে যদি সমবিশ্বাসী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি আর হৃদয় একান্ত ব্যথিত হয় না?

এরূপ অবস্থায় মনে হয়, এ পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ ফুরাইয়া আসিতেছে, শীঘ্রই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এরূপ মনে করা কত দূর ঠিক জানি না, কিন্তু শ্রীহরি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দিন যে ফুরাইয়া আসিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, অতএব তব পাদপদ্মে আমরা এই প্রার্থনা করি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের মনে যে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছ, তাহা যেন কোন কারণে পরিত্যাগ না করি, বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইয়া তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতক না হই। তব কৃপায় আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা অবশ্য পূর্ণ হইবে আশা করিয়া তব শ্রীচরণে প্রণাম করি।

ইহা কি দৌর্ব্বল্য ?

পৃথিবীর লোক তোষামোদপ্রিয়। যেখানে দেখিলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোষামোদে কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই ; সেখানে যদি কৌশলে তোষামোদ অবলম্বন না কর, তোমার অভিপ্রায় কোন কালে সিদ্ধ হইবার নহে। তুমি বিশ্বাস কর আর না কর, যে ব্যক্তিকে তোমার হস্তগত করিতে হইবে, তাহার মনের মত কথা তোমায় বলিতে হইবে, ইহা যদি তুমি না পার, সে ব্যক্তি তোমার হইল না, তাহার সঙ্গে এক দিন তোমার বন্ধুত্ব ছিল, ইহাও যদি হয়, আশা করিও না সে বন্ধুত্ব পূর্ব্বের মত থাকিবে। মতে মত দিয়া যাওয়া সূক্ষ্ম প্রকারের তোষামোদ, এ তোষামোদে তুমি বড় বড় সুচতুর ব্যক্তিকেও আপনার করিয়া লইতে পারিবে। যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদিগকে আর এখন স্থূল স্থূল তোষামোদবাক্যে বশীভূত করিবার সম্ভাবনা নাই। একটু স্বাধীন ভাবের গন্ধ রাখিয়া মতে মত যদি দিতে পার, জানিও শিক্ষিত সকলেই তোমার হস্তগত হইবেন। এখানে আমরা দেখিতেছি, তোষামোদপ্রিয়তা মানবহৃদয়ের দৌর্ব্বল্য। যাহাদের কোন গুপ্ত অভিপ্রায় সাধনের অভিলাষ আছে, তাহারা এই দৌর্ব্বল্যের আশ্রয় লইয়া অভিপ্রায় সাধন করে, সুতরাং জিজ্ঞাসা উপস্থিত, বাস্তবিকই কি ইহা দৌর্ব্বল্য ?

যাহা প্রকৃতিগত, তাহাকে দৌর্ব্বল্য বলিলে সে দৌর্ব্বল্য প্রকৃতিতে বদ্ধ থাকে না, প্রকৃতির অধীশ্বরে পর্য্যন্ত সে দৌর্ব্বল্য গিয়া পঁহুছায়। ঈশাকে যাই পিটর ঈশ্বরের পুত্র বলিলেন, অমনি তিনি তাঁহার হস্তে স্বর্গের চাবি দিলেন, বল এতদপেক্ষা আর দৌর্ব্বল্য কি হইতে পারে ? এই ঘটনার পর যে পিটরকে তিনি সয়তান বলিয়াছেন, বিপদের সময়ে যে পিটর তাঁহাকে লোকের সম্মুখে অস্বীকার করিবেন তিনি জানিতেন, এক কথায় তাঁহার হাতে স্বর্গের চাবি কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দিতে পারে ? আমি ঈশ্বরের পুত্র এই প্রবল বিশ্বাস, মনে হয়, ঈশাকে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। এই বিশ্বাসের অনুমোদন করে এরূপ লোক তিনি বহু দিন হইল অন্বেষণ করিতেছিলেন, যখন আর এই অনুমোদনের অভিলাষ কিছুতেই চাপিতে পারিলেন না, তখনই শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমি মানবপুত্র ; আমি কে, লোকে তৎসম্বন্ধে কি বলে ?' শিষ্যগণ উত্তর দিলেন, 'কেহ আপনাকে বাপ্তিষ্ট যোহন বলিয়া থাকে, কেহ ইলিয়াস বলে, কেহ জেরিমিয়াস্ বা অন্য কোন এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া থাকে।' সাইমন পিটর উত্তর দিলেন, 'আপনি খ্রীষ্ট জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।' এতক্ষণ অন্যান্য শিষ্যগণ যাহা বলিতেছিলেন তাহাতে ঈশার মন উঠিতেছিল না, যাই পিটর বলিলেন 'আপনি খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র' অমনি আর তাঁহাতে আহ্লাদ ধরিল না, তিনি বলিয়া উঠিলেন 'সাইমন বারযোনা তুমি ধন্য ! মাংস ও শোণিত তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু স্বর্গস্থ পিতা তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। অপিচ আমি তোমায় বলিতেছি, তুমি পিটর, তুমি সেই শিলোচ্চয় যাহার উপরে আমি আমার মণ্ডলী রচনা করিব এবং উহার প্রতিকূলে নরকের দ্বার কখন প্রাবল্য লাভ

করিবে না। অপিচ আমি তোমায় স্বর্গরাজ্যের চাবি দিব, এবং তুমি পৃথিবীতে যাহা বান্ধিবে, স্বর্গে তাহা বদ্ধ হইবে, তুমি যাহা পৃথিবীতে শিথিলবন্ধন করিবে, স্বর্গে তাহা শিথিলবন্ধন হইবে।' পিটর মনের মত কথা বলিয়া এত গুলি শুভ আশীর্ব্বাদ পাইলেন। এখানে কি ঈশার ইহাতে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইল না?

তুমি আমি বলিব, হাঁ দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইল বৈ কি? পিটর হটাৎ একটা বিশ্বাসের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন; যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে পরে পদে পদে তাঁহাতে এত অবিশ্বাস প্রকাশ পাইল কেন? পিটর দুর্ব্বল মানুষ, তিনি একটী বিশ্বাসের কথা বলিলেন বলিয়া আর পাঁচটা বিষয়ে তাঁহার অবিশ্বাস প্রকাশ পাইবে না, ইহা তুমি আমি আশা করিতে পারি না, ঈশাও কখন সেরূপ আশা করিয়া তাঁহার উপরে অতগুলি আশীর্ব্বাদ বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। যদি তাহাই করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় মানবচরিত্রানভিজ্ঞ লোক আর কেহ হইতে পারে না। তিনি পিটরকে একথা বলেন নাই, 'তুমি আমায় ঠিক চিনিয়াছ', তিনি এই কথা বলিয়াছেন, 'মাংস ও শোণিত তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু স্বর্গস্থ পিতা তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।' কোন্‌টি মানুষ আপনি বলিল, কোন্‌টি ভগবানের প্রভাবাধীন হইয়া মানুষ বলিতেছে, এ দুইয়ের প্রভেদ যিনি করিতে না পারেন, তাঁহার এস্থলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে, এবং তিনি পরের তোষামোদবাক্যের বশতাপন্ন হইবেন, ইহা এক প্রকার নিঃসংশয়। অমুক ব্যক্তি ভগবানের প্রভাবাধীন হইয়া অমুক কথা বলিল, কিরূপে বুঝা যাইতে পারে, ইহাই প্রশ্ন। ঈশার ন্যায় ব্যক্তি অবশ্য ইহা সহজে বুঝিতে পারেন, কিন্তু তোমার আমার ন্যায় ব্যক্তি তাঁহার মত সহজে বুঝিবে, ইহা কি সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে আমাদের এ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইবে, আমরা কখন বলিতে পারিব না, আমরা তোষামোদ বাক্যের অতীত হইয়াছি।

সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য এই সকল যাহার মূলে আছে উহা হইতে আমাদের বিপদের আশঙ্কা নাই। আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকসম্বন্ধে এতদ্ভিন্ন নিরাপদের ভূমি আর কোথায়? যদি আমরা নিরাপদ হইতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের আশ্রয় লইতেই হইবে। স্বয়ং সত্য হইতে যে ব্যক্তি ভ্রষ্ট হইয়াছে, ক্রমান্বয়ে অজ্ঞানতার পথে চলিতেছে, হৃদয় প্রেমশূন্য, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী, সে ব্যক্তি আপনাতেই যখন সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্য দেখিতে পাইল না, তখন অপরেতে সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্যের ক্রিয়া দেখিতে পাইবে কি প্রকারে? তুমি আমি সত্যের প্রতি অনুরাগী কি না, জ্ঞানের জন্য চিত্ত আকুল কি না, হৃদয় স্বার্থশূন্য হইয়া পরের কল্যাণে নিরত কি না, সর্ব্বপ্রকারে মনের বিকার ঘুচাইয়া বিবেকের অনুসরণে যত্নশীল কি না, ইহা নিজেও বুঝিতে পারি, অপরেও বুঝিতে পারে। যেমন আপনাতে তেমনি অপরেতে সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যানুরাগ আছে কি না বোঝা সহজ। তুমি আমি যেমন চিরদিন আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারি না, তেমনি অপরেও আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সত্যদৃষ্টি, জ্ঞানদৃষ্টি, প্রেমদৃষ্টি, পুণ্যদৃষ্টি, আমাদিগকে তোষামোদপ্রিয়তারূপ দোষবিমুক্ত করিয়া অপরের সহিত কোথায় আমাদের একহৃদয়ত্ব হইতেছে, এবং সেই একহৃদয়ত্ব হইতে মতের একতা জন্মিতেছে, ইহা আমরা সহজে দেখিতে পাই। তোমার মতে আমি সায় দিলাম, আমার মতে তুমি সায় দিলে, ইহা যেখানে একহৃদয়ত্ব আছে, সেখানে আর তোষামোদ হইল না। মতে মত দেওয়া যদি সত্যমূলক, জ্ঞানমূলক, প্রেমমূলক ও পুণ্যমূলক হয়, তবে ইহা দুর্ব্বলতার জ্ঞাপক নহে সবলতারই জ্ঞাপক। সুতরাং মতে মত দেওয়া, মতে মত দেওয়াতে আহ্লাদিত

হওয়া আর, 'ইহা কি দুর্ব্বলতা ?' এ সংশয়ের বিষয় হইল না।

বিশ্বাস ও পরীক্ষা।

বিশ্বাস ও পরীক্ষা, এ দুই নিয়ত একত্র সংযুক্ত। যেখানে অলৌকিক বিশ্বাস আছে, সেখানে পরীক্ষা উপস্থিত হইবেই হইবে। যদি তুমি বিশ্বাসী হইয়াও পরীক্ষার অধীন না হইয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিতে পারা গেল, এখনও তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই, এবং তোমার বিশ্বাস বিশেষ আকার ধারণ করে নাই। যাহা তুমি বিশ্বাস কর তাহা তোমার নিকটে প্রত্যক্ষ, তুমি তাহার অপলাপ কিছুতেই করিতে পার না, কিন্তু তোমার বিশ্বাস তোমার নিকটে প্রত্যক্ষ হইলেও উহা অপরের নিকট প্রত্যক্ষ নহে, গুরুতর কারণ উপস্থিত হইলে সে বিশ্বাস যে একটুও খর্ব্ব করা যাইতে পারে না, ইহা সে কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সুতরাং বিশ্বাসসম্বন্ধে তোমার অতি আত্মীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, এবং সে বিরোধ যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে আমরা কেহই তাহা বলিতে পারি না।

অলৌকিক বিশ্বাস সাধারণ লোকের সহিত যে পার্থক্য উৎপাদন করে তাহাতে বিশ্বাসীর মহত্ত্ব ও গৌরব প্রকাশ পায়, একথা মনে করা ভুল। এখানে তিনি আত্মবশ নহেন, কোন এক অলৌকিক শক্তি তাঁহাকে সম্পূর্ণ আপনার অধীন করিয়া লইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলেও আর বিশ্বাসের বিরোধে কিছু করিতে পারেন না। প্রবলতর প্রবৃত্তির অধীন ব্যক্তি যে প্রকার অবশ, বিশ্বাসের অধীন হইয়া তিনিও সেই প্রকার হইয়াছেন। পৃথিবী তাঁহার নিকটে বিশ্বাসবিরোধী সহস্র যুক্তি আনিয়া উপস্থিত করুক, তিনি তৎপ্রতি বধির। পৃথিবী তাঁহাকে গণ্ডীর বাহিরে আনিবার জন্য যত যত্ন করে, তত তিনি সেই বিশ্বাসের গণ্ডীর ভিতরে আরও দৃঢ় ভাবে স্থিতি করেন। সেই সঙ্কুচিত সীমার বাহিরে তিনি পদার্পণ করিতে পারেন না দেখিয়া লোকে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা ও ঘৃণা করে, পরিশেষে তাঁহাকে পৃথিবীর পক্ষে অকল্যাণ জানিয়া শীঘ্র শীঘ্র ইহলোক হইতে বিদায় করিয়া দেয়, কিন্তু তিনি কি করিবেন, তিনি আপনি আপনার নহেন; তিনি যাঁহার ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার আজ্ঞাধীন দাস। লোকের কথা শুনিয়া তিনি চলিতে পারেন না, সুতরাং লোকের নিকটে তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

বিশ্বাসী ব্যক্তি যদৃচ্ছাচরণে অক্ষম, ইহাতে তিনি কি মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই। মনুষ্য স্বাধীন, সে আপনি যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করিতে পারে, কাহারও নিকটে সে অধীনতা স্বীকার করে না, ইহাতেই কি তাহার মহত্ত্ব নহে ? দাসবৎ জীবন ধারণ জড়েরই উপযুক্ত, অধীনতা স্বীকার পশুরই শোভা পায়। মানুষ যে সে আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া, আপনার ইচ্ছায় জলাঞ্জলি দিয়া, কেন অধীনতা স্বীকার করিবে ? লোকে যাহাকে মনুষ্যত্ব বলে বিশ্বাসী ব্যক্তির সে মনুষ্যত্ব নাই। সে মনুষ্যত্ব নাই বলিয়াই লোকে তাঁহাকে ধিক্কার দান করে, এবং তাঁহার সামান্য বুদ্ধিও নাই বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। বিশ্বাসী ব্যক্তি যখন আপনার বুদ্ধির উপরে নির্ভর ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুদ্ধির গণনায় যে সকল ভাল ও মন্দের বিচার উপস্থিত হয় তৎপ্রতি যখন আর তাঁহার আস্থা নাই, সম্মুখে সুখকর ফল উপস্থিত দেখিলেও যখন তন্মধ্যে তিনি দুঃখই দর্শন করেন, আশু কল্যাণ মধ্যে অকল্যাণই দেখেন, যখন তাঁহার ঈদৃশ বিপরীত দৃষ্টি উপস্থিত, তখন মনুষ্যত্বের কথা তুলিয়া তাঁহাকে লজ্জিত করিবার জন্য যত্ন করা বৃথা। বিশ্বাসসম্বন্ধে তিনি মনুষ্যত্ব হারাইয়াছেন, মনুষ্যত্ব হারাইয়া তাঁহার উত্থান না পতন হইয়াছে তোমার আমার বিচার করা বৃথা।

বিশ্বাসী ব্যক্তির এরূপ বিপরীত দৃষ্টি কেন উপস্থিত ? পৃথিবীর সহস্র বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কথায়

তাঁহার কর্ণপাত কেন নাই ? তিনি কি লোকদিগকে অতি হেয় দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন ? তাঁহার নিকটে কি আর মানুষ নাই, তিনিই এক জন মানুষ ? পৃথিবীর লোক লোক নহে 'পোক', এই ঘৃণার বাক্য কি তিনি আপনাকে ছাড়িয়া আর সকলের উপরে প্রয়োগ করেন ? তিনি আপনিও কি 'পোক' নহেন ? তিনি আপনি 'পোক' ইহা জানিয়াই বুদ্ধির সকল অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন। যদি তিনি আপনাকে সামান্য কীট না জানিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে ঈদৃশ প্রশংসনীয় বুদ্ধিবৃত্তিকে বিদায় দিয়া মূর্খের দলে কখন আপনাকে নিবিষ্ট করিতেন না। মানুষ কীট, তাহার বল বুদ্ধি কিছুই নাই জানিয়াই তিনি তখন এক ব্যক্তির চরণে আপনার যাহা কিছু সমুদায় সমর্পণ করিয়াছেন, এবং এইরূপে আপনার মনুষ্যত্ব যেটুকু ছিল হারাইয়াছেন। আশু সুখ, আশু কল্যাণ, আশু গৌরব, এ সকলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই এই জন্য যে, তিনি যাঁহার উপরে সমুদায়ের ভার দিয়াছেন তিনি যুগযুগান্তর ভেদ করিয়া কি সুখ, কি কল্যাণ, কি গৌরব উপস্থিত হইবে, তাহাই তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়াছেন, এবং তাহাই দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, আর এদিকে চক্ষু ফিরাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। এ দিকে চক্ষু ফিরান না বলিয়া যে সকল পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহাকে ভীত করিতে পারে না, কেন না তিনি জানেন এ সকল পরীক্ষায় তাঁহার আত্মা আরও সুদৃঢ় ভাবে পরমাত্মার চরণ আশ্রয় করিবে।

বিশ্বাসীর পক্ষে পরীক্ষা ক্লেশকর নহে, তবে ক্লেশকর কি ? ক্লেশকর জনগণের অবিশ্বাস। লোকে যে সকল বিষয়ে তাঁহাকে নিন্দা করে, তিনি সে সকলেতে এজন্য ব্যথিত হৃদয় হন না যে তাঁহাকে তাহারা আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু এই জন্য ব্যথিতহৃদয় হন যে, তাহারা আপনাদের কল্যাণ আপনারা বুঝিতেছে না, ক্ষুদ্র দৃষ্টির সীমার ভিতরে তাহাদের মন সর্ব্বদা পড়িয়া রহিয়াছে. স্বয়ং পরমাত্মা তাহাদের সম্মুখে যে অসীম সম্পৎ প্রকাশ করিতেছেন তাহা তাহারা দেখিতে পাইতেছে না, সামান্য জীবনের সামান্য বিষয় সকল লইয়া ভুলিয়া রহিয়াছে, দিন কয়েকের উদ্যম, উৎসাহ, আমোদ আহ্লাদ ব্যতীত আর কিছু যে উচ্চতম আছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। তাঁহার প্রতি লোকে অসদাচরণ করিতেছে, তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া বিপরীত ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছে, ইহাতে তাঁহার নিজের কিছু ক্ষতি হইতেছে না, বরং সেই সকল হইতে যে নব নব পরীক্ষা উপস্থিত হইতেছে তদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয় ও দৃষ্টি বিশোধিত হইতেছে, কিন্তু এই ব্যাপারে অসদাচারিগণ যে আত্মকল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইতেছে, ইহাই তাঁহার পক্ষে অতীব ক্লেশের কারণ। এ সংসারে ক্লেশ অপরিহার্য্য। ক্লেশ আহ্লাদের সহিত যে ব্যক্তি আলিঙ্গন করিতে পারিল না, বিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়া তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। বিশ্বাস ও পরীক্ষা নিত্য সংযুক্ত কেন ; তাহার কারণ আমরা এস্থলেই দেখিতে পাই। যাঁহারা বিশ্বাসের অনুরোধে সকল প্রকারের ক্লেশ বহন করিলেন তাঁহারা ধন্য হইলেন, কিন্তু যাঁহারা পরীক্ষা আনয়ন করিলেন তাঁহাদের বিমূঢ়-চিত্ততাই বিশ্বাসীর হৃদয়ে যুগপৎ ক্লেশের উৎপাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি—বিবেক, তুমি ঈশ্বরের বাণী, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা নির্ব্বিবাদ নহেন। অন্যান্য মনোবৃত্তি যেরূপ, তুমিও সেইরূপ একটী মনোবৃত্তি, অন্যান্য মনোবৃত্তি যেরূপ ক্রমে বিবিধ অবস্থাধীনে প্রস্ফুটিত হয়, তুমিও সেই প্রকার প্রস্ফুটিত হও, তবে তোমার বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য মনোবৃত্তি অন্ধ, তুমি চক্ষুষ্মান্। প্রবৃত্তি গুলি তোমার অধীন হইয়া কার্য্য করিলে অন্তরে বাহিরে একটা সুশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, জনসমাজ রক্ষা পায়, প্রতিব্যক্তিও তাহাতে সুখের ভাগী হইয়া থাকে। তুমি ভয়ের রূপান্তরমাত্র। তোমাকে ধর্ম্মভয় বলিলে কিছু ক্ষতি নাই।

বিবেক—পণ্ডিতেরা যাহা বলেন, তাহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। এক অখণ্ড সত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দেখিয়া তাঁহারা এক এক জন এক এক কথা বলেন, সুতরাং তাঁহাদের কথা

আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সব কথাগুলি একত্র করিয়া অন্তরের আলোক তাহার উপরে ফেল, দেখিবে তাহাদের ভিন্নতা দূর হইয়া একত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যান্ত মনোবৃত্তির ন্যায় আমি একটী মনোবৃত্তি, তাহাদের প্রস্ফুটাবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রস্ফুটিত হই, একথা বলিবার তাঁহাদের অধিকার আছে। চক্ষুর গ্রহণশক্তি যত বর্দ্ধিত হয় তত আলোক প্রকাশ পায়। আলোকের প্রকাশ যখন চক্ষুর গ্রহণশক্তির উপরে নির্ভর করে, তখন একথা বলায় কিছু ক্ষতি নাই আমি আত্মার দৃষ্টিশক্তি। আত্মার উন্নতির সঙ্গে দৃষ্টিশক্তি বাড়িবে এবং জ্ঞানসূর্য্য ঈশ্বর হইতে আলোক গ্রহণও ক্রমশঃ সমধিক হইতে থাকিবে, ইহা তো স্বাভাবিক। দৃষ্টিশক্তি কিছুই নহে, সেই শক্তি দ্বারা যাহা গৃহীত হইয়া থাকে তাহাই সত্য, তাহাই গ্রহণীয়। আমি যদি ঈশ্বরের আলোকগ্রহণার্থ দৃষ্টি হই, তাহাতে আমিও খর্ব্ব হইলাম না, যিনি আলোক গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মান করিলেন তিনিও খর্ব্ব হইলেন না। আমি কিছুই নই, সেই আলোকই সত্য, এবং সেই আলোকের জন্যই আমার আদর। আমি বাণী নই, বাণী আমা হইতে স্বতন্ত্র এ বিচার বৃথা, কেন না সেই বাণী বিনা আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যখন কেহ অবধারণ করিতে পারেন না, সেই বাণী দ্বারা আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাকে লোকে যখন বৃত্তি বলে, তখন বাণীই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, আমি কিছুই হইলাম না, এরূপ অবস্থায় আমার নাম না করিয়া বাণীর নাম উল্লেখ করাতে কখন সত্য অতিক্রম করা হইতেছে না। বস্তুতঃ জানিও ঈশ্বরের বাণীনিরপেক্ষ আমার অস্তিত্ব নাই। আমি ভয়ের রূপান্তর মাত্র, আমি ধর্ম্মভয় একথা বলাতে আমাকে কিছু অধঃকরণ করা হইতেছে না। আমি শাস্তা হইয়া শাসন করি, সুতরাং আমার কথায় ভয় উৎপন্ন হইবেই। সেই ভয়ে আমাকে ভয় বলাতে আর দোষ কি? উপনিষৎ ঈশ্বরকে "ভয়ং ভয়ানাং" বলিয়া কি কিছু অন্যায় করিয়াছেন?

বুদ্ধি—তুমি যে কথা গুলি বলিলে তাহা সত্য বলিয়া মানিলাম, কিন্তু বংশানুক্রমে মানুষের যে প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই সংস্কারানুসারে ভয় উপস্থিত হয়, একথা বলিলে আর তোমার একটা প্রাধান্য কি রহিল?

বিবেক—আমি তোমায় বলিয়াছি, ক্রমে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য যত বাড়ে, তত মানুষ আলোক গ্রহণ করিতে পারে। একথা বলাতেই তোমায় বুঝিতে হইতেছে যে, মানুষের পৃথিবীতে প্রথম প্রবেশ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার যত দূর উন্নতি হইয়াছে, সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আলোকগ্রহণসামর্থ্যও বাড়িয়াছে। প্রত্যেক মানবশিশুকে নূতন করিয়া আলোকগ্রহণসামর্থ্য বাড়াইতে হইলে মানবসমাজ কোন কালে উন্নত হইতে পারিত না, অতএব পূর্ব্ববংশ যত দূর উন্নত হইয়াছে, সেই হইতে নূতনতর শক্তি বাড়ান ক্রমোন্নতির নিয়ম। এ নিয়ম ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের ধর্ম্মভয় পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণেতে সংক্রামিত হইলে অণুমাত্র দোষ পড়িতেছে না, এবং তাহাতে আমার প্রাধান্যেরও কিছু ক্ষতি হইতেছে না।

উপাসনাবাস।

আত্মসম্ভ্রম রক্ষা।

৮ ফাল্গুন, ১৮২০ শক।

সভ্যতর দেশে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা ভদ্রসমাজের ও শিক্ষিত সমাজের নিয়ম। যে আপনার সম্ভ্রম আপনি না রাখিতে পারে সে ভদ্রসমাজে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু আত্মসম্ভ্রমরক্ষাকারী কি অহঙ্কারী হয়? সহজেই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়। একবার আচার্য্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "Self respect" বলিয়া যে সভ্য ইংরাজ সমাজে একটা প্রথা প্রচলিত আছে আমাদের ধর্ম্মে ইহা রক্ষিত হইতে পারে কি প্রকারে?" তিনি উত্তরে বলিলেন যে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করা আর কিছুই নহে, সত্য রক্ষা; আমার সম্বন্ধে যাহা সত্য সেই সত্য রক্ষা সম্বন্ধে যাহা করি তাহাই আত্মসম্ভ্রম রক্ষা। আমি যাহা নই, কিম্বা আমাতে যে সমস্ত গুণ নাই তাহা লোকে বলিলে আমার সম্বন্ধে অসত্য প্রকাশ পায়; এবং আমি যদি ইহার অনুমোদন করি তবে আমার সত্য রক্ষা হইল কোথায়? এরূপ হইলে আমি ধর্ম্মরাজ্যের মধ্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত নহি। কিন্তু কেহ যদি আমার গুণাগুণ সম্বন্ধে সত্য কথা বলে, এবং যদি আমি তাহার অনুমোদন করি, তবে আমি লোকের কাছে কিম্বা ঈশ্বরের কাছে নিন্দিত নহি। কিন্তু ইহার সঙ্গে আর একটী কথা আছে। আমাদের জীবনে এই আত্মসম্ভ্রম রক্ষার কোন মূল্য আছে কি না? অবশ্য আছে। সত্য রক্ষা করিতে হইলে তদনুরূপ জীবনের প্রয়োজন। যাহার জীবন নাই সে আর সত্য রক্ষা করিবে কি? জীবনের আদরের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের আদর। জীবন আমাদের সামান্য নহে, দুদিনের নহে। সত্য যেমন নিত্যকাল স্থায়ী, আমাদের জীবনও সেইরূপ নিত্যকাল স্থায়ী। সত্য জীবনের সঙ্গে চিরদিনের জন্য গ্রথিত। আমাদের জীবন সম্বন্ধে সত্য কি? আমাদের জীবন অনন্ত জীবন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন জীবনের আরম্ভ কোথায় তাহা ঠিক করা যায় না। ডারউইন হাক্সলি প্রভৃতি বহু পরিশ্রম করিয়া উহার আরম্ভ খুঁজিয়া পান নাই। সুতরাং আদিম জীবন হইতে জীবনের প্রবাহ তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাঁহারা এক বিন্দু জৈবন সামগ্রী হইতে জীবনের আরম্ভ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সে জৈবন বিন্দুও পূর্ব্ব জৈবন বিন্দু না হইলে জন্মায় না, অগত্যা জীবন অনাদি না বলিয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণের বিশ্বাস অনুযায়ী বলিলে এই বলিতে হইবে যে আমাদের এই জীবন দৈহিক জীবন হইতে আরম্ভ। কিন্তু আমাদের সেই দৈহিক জীবনের চেতনা থাকুক বা না থাকুক সেই জীবনের মধ্যে এক অখণ্ড চৈতন্য সর্ব্বদা

বিরাজ করিতেছেন এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব সত্য রক্ষা করিতে হইলে জীবনকে কিছু নয় বলিলে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। সেই চৈতন্যকে যদি সামান্য বলিয়া মনে করি তবে যে কেবল আমাদের জীবনকে কলঙ্কিত করিলাম তাহা নয় ঈশ্বরকেও অপমান করা হইল। অতএব আমাদের জীবন সামান্য নয়। যখন অনন্তের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ অনুভব করি তখন দেখি এই জীবন একটী অনন্ত মহাসমুদ্র। ইহার প্রবাহ অনন্ত হইতে আরম্ভ হইয়া অনন্তেতেই চিরকাল প্রবাহিত হইবে। ইহা কি কোন কালে নিষ্ফল হইবে? ইহা কি কখনও ধূলি হইতে পারে? অতএব এই জীবনের সমাদরই ঈশ্বরের সমাদর; যে ইহাকে তুচ্ছ মনে করে, সে ঈশ্বরের অপমান করে এবং আপনাকে কলঙ্ক-সাগরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু কোন্ জীবনের কথা বলিতেছি? দৈহিক জীবনের কথা নয়। সে জীবন কেবল আসে আর যায়, চেতনা রূপে কোন কালে অবস্থান করিবে কি না ঠিক নাই। আমি আত্মার কথা বলিতেছি। আত্মার কোন কালে মরণ নাই; তাহা চির চৈতন্যময় অখণ্ড এবং অনন্ত, তাহার কোন ভয় নাই; কেমন নিশ্চিন্ত ভাব! এই নির্ভীক, নিশ্চিন্ত ভাব কেন? কারণ ইহা ঈশ্বরের হাতে; যাহা করিবার তিনিই করিতেছেন। ইহার উপর আমার কোন হাত নাই। ঈশ্বরই ইহার নিয়ন্তা। তিনিই আমার সমস্ত যত্ন চেষ্টার মূলে যত্নচেষ্টা হইয়া আছেন। যাহাতে এই আত্মা অনন্তকাল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতে পারেন সে উপায় তিনিই করিতেছেন। পিতা যেরূপ বালক বালিকা লইয়া ক্রীড়া করেন ঈশ্বরও আমাদের লইয়া সেইরূপ ক্রীড়া করেন। (এদেশে বালকবালিকা লইয়া পিতার ক্রীড়া বা আমোদ দূষনীয় বটে, কিন্তু সভ্যতর পাশ্চাত্য প্রদেশে ইহা দূষনীয় নহে।) ঈশ্বরের এই ক্রীড়া দেখিয়া মনে হয় তিনি আমাদিগকে প্রশ্রয় দিতেছেন। যিনি যথার্থ পিতা তিনি পুত্রের রোদনে কখনও সত্যপথ হইতে বিচলিত হইতে পারেন না। পুত্রের সম্বন্ধে যাহা ন্যায় তাহা পুত্রের কষ্টপ্রদ হইলেও তিনি করিবেন। ঈশ্বরও সেইরূপ আমাদের জীবনের সম্বন্ধে আমাদের আত্মার সম্বন্ধে যাহা প্রয়োজন, তাহা তিনি করিতেছেন। আমরা যতই ক্রন্দন করি না কেন, যতই তাঁহার দোষ দিই না কেন, তিনি কিছুতেই ন্যায়পথ হইতে বিচলিত হইবেন না। আমাদের জীবন প্রবাহিত হইতেছে কাহার জন্য? তাঁহার জন্য। যে অবস্থায় যাহা প্রয়োজন তাহা তিনিই বিধান করিতেছেন। কোন কঠিন অবস্থায় পড়িলে আমরা ভ্রমবশতঃ অন্য লোকের উপর দোষারোপ করি, এবং বলি এ অবস্থায় আমার পড়া উচিত ছিল না; অমুক আমাকে এই অবস্থায় ফেলিয়াছে। কিন্তু বিশ্বাসী সেই অবস্থায় কি দেখেন? তিনি দেখেন ঈশ্বরের লীলা। তিনি বলেন "যদি এইরূপ পরীক্ষায় না পড়িতাম তবে আমার জীবন গঠিত হইত না। আমার জীবন গঠনের জন্যই ভগবান আমাকে এই অবস্থায় ফেলিয়াছেন।" তিনি কাহারও উপর দোষারোপ করেন না। তিনি জানেন জীবনের উপর ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারও সম্পূর্ণ অধিকার নাই। অতএব জীবন ঈশ্বরের হাতের রোপিত জিনিষ বলিয়া ইহা আদরের সামগ্রী। সত্য রক্ষা করিবার জন্যই যাহা প্রয়োজন তাহা তিনিই করিতেছেন। আমাদেরও ইহা বোঝা উচিত, আমরা যে অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁহার মধ্যে সর্ব্বদা আছি এবং তিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া সকল অবস্থার মধ্যে মঙ্গল বিধান করিতেছেন। আমাদের জীবনে প্রতিদিন নূতন ঘটনা ঘটিতেছে। ইহা যে অস্বীকার করে, যে বলে একই রূপে জীবন প্রবাহিত হইতেছে—সে নিতান্ত অবোধ; সে জীবনের গতি জানে না। এই জন্য জীবন তাহার পক্ষে ভারস্বরূপ বোধ হয়; সে সেই ভার বহন করিতে পারে না, কাজেই বলে "মৃত্যু! তুমি আমাকে অধিকার কর।" মৃত্যু একদিন হইবে ইহা জানি, কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিবার অধিকার আমাদের কি আছে? অতএব সত্যের গৌরব রক্ষা এবং আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য তিনি যাহা করিবেন জীবনে সেই লীলা দর্শন করিয়া নির্ভীক হই, নিশ্চিন্ত হই এবং অন্যের উপর দোষারোপ না করিয়া যাহাতে যথার্থ ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে, পুণ্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি কৃপাময় এই আশীর্ব্বাদ করুন।

একত্বসাধন।

এই নগরে কত লক্ষ লোকের বাস কিন্তু ইহাদের মধ্যে কি আশ্চর্য্য মিলন। এখানে শকটারোহী ধনী কত, ধূলি ধূসরিত দরিদ্রই কত, গর্ব্বিত ইংরাজ কত, দীন নিঃস্ব দেশীয়ই বা কত! কত খ্রীষ্টান, কত হিন্দু, কত মুসলমান, কত আস্তিক, কত নাস্তিক এই নগরে তথাপি নিশীথ সময়ে উঠিয়া দেখ সকলেই শান্ত হইয়া নিদ্রা যায়, দিবা দ্বিপ্রহরে দেখ সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত। বিবাদ এত অল্প যে চক্ষুগোচর হয় না; রক্তপাত নাই বলিলেই হইল। যদিও এই সহরে অনেক লোকাকীর্ণ তথাপি ইহাতে যে মিলন সে কিসের মিলন? বাজারের ক্রয় বিক্রয়ের চিৎকারে কান পাতা যায় না; অথচ দেখ সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত; এ মিলন কিসের মিলন? প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া শত সহস্র লোক যাতায়াত করিতেছে কিন্তু দেখ কেহ কাহারও কোন কার্য্যে বাধা দেয় না; সকলেই আপন আপন গন্তব্য পথে চলিতেছে। রণে কত শত সৈন্য বধ হয়, কেহ কাহারও জন্য একবিন্দু সহানুভূতির অশ্রুপাত করে না, অথচ আহাদের দিকে তাকাইয়া দেখ তাহাদের শ্রেণীর মধ্যে কত মিলন। এ মিলন কিসের মিলন? নগরে বল, সহরে বল, বাজারে বল, জনসমাজে বল এই যে কি এক মহামিলন বিরাজ করিতেছে, ইহাতেই বদ্ধ হইয়া সকলে সংসারে বিচরণ করিতেছে। এই মহামিলনের মূল কি? স্বার্থ। কার্য্যালয়ে, বিদ্যালয়ে, এই মহানগরীর প্রত্যেক স্থানে এই স্বার্থের মহাকুহকে সকল লোকেই বশীভূত। মনে মনে খুব রুষ্ট কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেককে মিষ্টকথায় তুষ্ট করে; একের ইচ্ছা অন্যের অনিষ্ট

করে কিন্তু তাহাতেও সুখী। এই স্বার্থের আশ্চর্য্য আকার, আশ্চর্য্য প্রকার; ইহার কার্য্য অদ্ভুত। অনেকে বলেন স্বার্থই পৃথিবীতে উপাস্য দেবতা; তাঁহাদের দৃষ্টিতে তাই বটে; আমাদেরও অনেকটা তাই। কিন্তু স্বার্থের মিলন শীঘ্রই শেষ হয়। আমরা এ মিলনের আকাঙ্ক্ষী নই। কেন না যেখানে স্বার্থের ভাব সেখানে মিলন কোথা?

এই স্বার্থের পরপারেই পরমার্থ রাজ্য দেখা যায়। সেখানেও মিলনের অনেক ভাব ভঙ্গী দেখি। কোথাও দেখি শতজন একত্র হইয়া মন্দিরে ধর্ম্মালোচনায় রত, কোথাও দেখি সকলে একত্রে মিলিয়া সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যস্ত। পরমার্থ রাজ্যেও মিলনের অনেক আড়ম্বর। আমরা সে বিষয় কিছু কিছু জানি। কারণ, আমরাও ইহাতে এক সময়ে যোগ দিয়াছিলাম। ঢের লোকের সঙ্গে মিলিয়া অনেক কাজ করিয়াছিলাম, অনেক উপাসনা প্রার্থনাদি করিয়াছিলাম—আজ সে সব লোক কোথায়। এক জায়গায় বসিয়া যাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া উপাসনাদি করিয়া আনন্দানুভব করিয়াছিলাম তাঁহারাই এখন তিন বা বিশ জায়গায় ছিন্নভিন্ন ভাবে আছেন। অতএব এখন যাঁহারা মিলিত হইতে চান ভাবিয়া দেখা উচিৎ কোন্ ভূমিতে একত্র হইবেন। একভাবে দেখিতে গেলে সকল ব্রাহ্মের মধ্যে মিলন আছে। অপৌত্তলিক হইলেই তাঁহাদের সহিত মিলিবে। মুসলমান, খ্রীষ্টান বৌদ্ধ সকলের সহিতই প্রীতি আছে। কিন্তু এই মিল ও প্রীতি কেন জান? কেবল কতকগুলি বিষয় ইহাদের সহিত মেলে বলিয়া। এই মিলন, এই প্রীতি যে অকিঞ্চিৎকর তাহা বলিতেছি না। কিন্তু ইহা কতদূর যায় ভাবিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে। খ্রীষ্টানদের সহিত মিলিত হই বটে কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ মিলন? ব্রাহ্মদের সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা করি, কিন্তু রাখিতে পারি কৈ? যে ভিত্তিতে মিলন তাহা থাকে কৈ? ধর্ম্মের রাজ্যে মতের মিলন নিকৃষ্ট বলা উচিত। কারণ মত বুদ্ধিমাত্র এবং সেই বুদ্ধিতে যতটুকু ঐক্য হয় সে ঐক্য কোন কাজ হয় না। আমাদের মিলনে মতের উপরে আর একটী জিনিষ ছিল। সেটী ভাব, ভালবাসা। ভালবাসার এমন প্রভাব যে তাহার দ্বারা এমন এক মিলন হইল, যাহা এখন দেখা যায় না। কিন্তু তথাপি এই ভালবাসার মিলনের পর আবার অমিল কেন হইল? যখন চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাত হইল, যখন স্বার্থে স্বার্থে সংগ্রাম হইল যখন অহঙ্কারে অহঙ্কারে মহা গোলযোগ বাধিল তখন সেই সব আন্দোলনে হৃদয়ের ভাব ভাঙ্গিয়া গেল। মত ত টিকিলই না।

অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিলন, চরিত্রের মিলন। এক পবিত্রতার জন্য দশজন চেষ্টা করা, এক বৈরাগ্যের জন্য দশজন সাধন করা, এক ঈশ্বরের আজ্ঞাতে দলবদ্ধ হওয়া—এই চরিত্রগত যে মিলন তাহা শীঘ্র লয়প্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় এই চরিত্রের আদর্শ এমনি উজ্জ্বল থাকে, পাপের প্রতি এমনি সাধারণ বিদ্বেষ থাকে, যে পরে আর তাহা হয় না। এক সময়ে আমাদের মধ্যে শুদ্ধ চরিত্রতার জন্য অনেক আলোচনা ছিল। এক সময়ে আমাদের মধ্যে শুদ্ধ চরিত্রের খুব আদর ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যদিও আমাদের মিলনের স্পৃহা ঘোচে নাই চরিত্রের স্পৃহা ঘুচিয়াছে, অতএব এখন যদি মিলনের চেষ্টা থাকে তবে তিনটী ভূমির উপর বিশেষতঃ চরিত্রের উপর—তাহার মূলভিত্তি স্থাপন কর। যাহাতে হৃদয়ভেদ ঘুচিয়া যায় তাহাই কর। স্বার্থপূর্ণ মানুষ আর নিঃস্বার্থ মানুষে মিলন হইবে না; অপবিত্র অন্তঃকরণের সহিত পবিত্র হৃদয়ে মিলন হইবে না, পাপীর সহিত পুণ্যবানের মিলনের আশা অল্প। কিন্তু যে খুব অপবিত্র, যে খুব পাপী সে যদি সরলান্তঃকরণে পুণ্যাত্মার সহিত মিলনের জন্য প্রার্থনা করে তবে মিলন নিশ্চয়ই হইবে। পুণ্যাত্মা ঈশার সঙ্গে ব্যভিচারিণীর মিলন কেন? প্রেমিক চৈতন্যের সঙ্গে দুর্বৃত্তের মিলন কেন? এই জন্য যে পুণ্যাত্মা ও প্রেমিকের পুণ্য এবং প্রেমের প্রভাব পাপী এবং অপ্রেমিকের হৃদয়কে পবিত্রতায় এবং প্রেমে রঞ্জিত করে; এবং ক্রমে সেই পবিত্রতাকে চরিত্রগত করিয়া ফেলে। প্রেমিক লোকদের উপর প্রভাব করিবেই করিবে; এবং যাই এখানে পবিত্র হইল অমনি সেই ভূমিতে মিলন হইল এবং সেই মিলনই চিরকালের জন্য হইল। পরন্তু আমাদের হইতে অনেক উচ্চ। তাঁহার সঙ্গে মিলন কিসে? কেবল আমরা তাঁহাকে চাই বলিয়া। পাপীর সঙ্গে পুণ্যাত্মার মিলন কিসে হয়? এক সহানুভূতিতে, সত্যে, প্রেম এবং পবিত্রতার আকর্ষণে। অতএব বন্ধুগণ পবিত্র হইয়া পাপীকে আকর্ষণ কর, সত্যবাদী হইয়া মিথ্যাবাদীকে সত্যের দিকে এবং শুদ্ধ চরিত্র হইয়া পাপীকে শুদ্ধতার দিকে আকর্ষণ কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

একত্ব।

১১ ফাল্গুন, রবিবার, ১৮১৮ শক।

এই কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে বেদান্তসিদ্ধ সাধন প্রণালীর কথা হইতেছিল। বেদান্ত স্থূল হইতে ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতমে প্রবেশ পূর্ব্বক পরমাত্মাতে একত্ব সাধন করিয়াছেন। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য এই সাধন প্রণালী প্রদর্শন করে। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের অর্থ ও ভাব ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বিগণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু যিনিই যে অর্থ গ্রহণ করুন না কেন, জীব ও ব্রহ্মের একত্ব যে ইহার উদ্দেশ্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ঐক্যে একের অভাব অপরের স্থিতি বুঝায় না, স্বরূপসাম্যে অত্যন্ত অভিন্নতা বুঝায়। বেদান্তের প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক পুরাণকারের এক জ্ঞান বস্তুতে সমুদায়ের পর্য্যবসান করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন, মাটী হইতে ঘট, ঘট হইতে কপালিকা (খাপরা), কপালিকা চূর্ণ হইয়া রজ, রজ হইতে অণু, স্বকর্ম্ম জন্য যে সকল ব্যক্তির আত্মদৃষ্টি মন্দীভূত হইয়াছে, বল, তাহারা এখানে কি বস্তু

দেখে? বিজ্ঞান বিনা, হে দ্বিজ,তাই কোথায় কখন কোন বস্তু নাই। নিজ কর্ম্মভেদে বিভিন্নচিত্ত ব্যক্তিগণ এক বিজ্ঞানকেই বহুবিধ দেখিয়া থাকে।" সমুদায়ের মূলে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে সমুদায়; এই জ্ঞানই জীবাত্মা, এই জ্ঞানেই পরমাত্মা, এইরূপে জ্ঞানেতে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বেদান্ত ও পুরাণ সমভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎগণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্থূল বস্তুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে পরিণত করিতে করিতে পরিশেষে এক মহতী শক্তির অস্তিত্বকে বস্তু বলিয়া স্থাপন করেন। আকার বিরহিত সূক্ষ্মতম জ্ঞান বা শক্তি সমুদায়ের মূল, তাঁহারই আত্মপ্রকাশ হইতে সমুদায় জগৎ ও জীব, বেদান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বত্র এই একই কথা। যোগে একত্ব ক্ষুদ্রজ্ঞানের সহিত অনন্ত জ্ঞানের সম্মিলনে সাধিত হয়। জীবের দিকে ক্ষুদ্র ও পরমাত্মার দিকে অনন্ত, এই দুই বিশেষণ উড়াইয়া দিয়া অদ্বৈতবাদিগণ এক জ্ঞানে একত্ব সাধন করিয়াছেন, দ্বৈত বা বিশিষ্টদ্বৈতবাদিগণ বিশেষণদ্বয় বজায় রাখিয়া একত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বেদান্ত ঈশ্বরকে সমুদায় জগতের প্রাণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাণ স্থূলপদার্থ নহে, সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম প্রাণকে ধারণ করিয়া প্রাণের প্রাণে মনোভিনিবেশ এ পন্থা কিছু মন্দ নয়। প্রাণের প্রাণে সমস্ত জগৎ ও জীবকে গ্রথিত করিয়া সকলের সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া যোগী যখন ব্রহ্মে স্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ব্রহ্ম ভিন্ন তাঁহার নিকটে আর কিছুই থাকিল না। তিনি জগৎ ও জীবকে কেবল সেই মহাপ্রাণে এক করিলেন তাহা নহে, তিনি আপনিও তাঁহার সহিত এক হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার আপনার বল, শক্তি, জ্ঞান যাহা কিছু সকলই সেই ব্রহ্ম হইতে, নিজের কিছুই নাই। এই দেখিয়া তিনি সর্ব্বথা সকল বিষয়ে ব্রহ্মের অধীন হইলেন। তাঁহার এ একত্ব আত্মবিনাশ নহে, আত্মবিস্মৃতি, আমি কিছুই নই, ব্রহ্মই সর্ব্বস্ব এই জ্ঞান। "আমি এবং পিতা এক," ঈদৃশ একত্বে অবস্থান করিয়া মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "তোমরা কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে এবং পিতা আমাতে? আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি আমি আপনি বলি না; কিন্তু আমার ভিতরে যে পিতা বাস করেন, তিনিই সকল কার্য্য করেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনি কিছু করিতে পারেন না,কিন্তু তিনি তাহাই করেন যাহা পিতাকে করিতে দেখেন, কারণ যে সকল তিনি করেন, পুত্রও সেই সকল তেমনি করেন।" বেদান্তবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মকে আত্মার আত্মাভাবে গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যে আত্মহারা হইয়া যাইতেন এবং ব্রহ্মের মুখের কথা "অহং ব্রহ্মাস্মি" * আপনাদের মুখের কথা করিয়া লইতেন। এ আত্মহারা যে, অত্যুৎকট আনন্দ জন্য সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত বেদান্তই তাহা স্পষ্ট বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন †। ঈশ্বর আত্মার আত্মা এ ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া, তাঁহাতে মগ্ন না হইয়া কেবল শুষ্ক জ্ঞানে "অহং ব্রহ্মাস্মি" যাঁহারা বলেন তাঁহাদের দ্বারা বেদান্তের ধর্ম্ম যে মলিন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু ছিল না, ব্রহ্মই সকল হইলেন, অতএব সকলই ব্রহ্ম, এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া জগৎ ও জীব কিছুই নয় "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ তাঁহাদের সমুদায় জীবন দূষিত করিয়া ফেলে।

বেদান্তের একত্ব, ঈশার প্রচারিত একত্ব, আমাদের আচার্য্যের অনুভূত একত্ব কি একবিধ নয়? আমাদের আচার্য্য বলিতেছেন, "যেমন ফুলের সৌরভ দেখা যায় না, আর নাকে গন্ধ যায়, আচ্ছন্ন করে ফেলে, তেমনি তুমি। কোথায় তুমি আছ, কি রকম তুমি, কেউ জানে না; অথচ কর্ণের ছিদ্র ব্রহ্মবাণীতে পূর্ণ, চক্ষু দুইটি ব্রহ্মরূপে পূর্ণ, নাসিকা ব্রহ্মের সুগন্ধে পূর্ণ, মুখ ব্রহ্মসুধায় পূর্ণ, ব্রহ্ম অভিষেকে সমুদায় শরীর ইন্দ্রিয় পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে হইলাম ব্রহ্মাঙ্গ। সমুদায় দেহ তোমার ভিতর গেল, গিয়া পুণ্য হয়ে গেল, শান্তি হয়ে গেল; আর আমায় অসার জমাট অংশ পড়ে রহিল। যা সারাংশ ঠাকুরে মিশে গেল। আমার যা ভাল, যেটা আসল মানুষ, ঠাকুর নিয়ে গেলেন।" আমাদের সারাংশ কি? দেহ নয়, চক্ষু কর্ণ নয়, আত্মা। শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য আত্মার সার। এ সমুদায় মিশিল কোথায়? অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য পরমাত্মাতে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব, ইহাই সারধর্ম্ম। পরমাত্মাতে জীবের নিমগ্ন ভাব, পরমাত্মাতে একেবারে ডুবিয়া যাওয়া, পরমাত্মাতে একেবারে মিশে যাওয়া ইহাই সাধনের চরম লক্ষ্য। "আমি ডুবিব হরিতে, না হরি ডুবিবেন আমাতে? আমি যাব হরির বাড়ীতে, না, হরি আসিবেন আমার বাড়ীতে? একই কথা। প্রবিষ্ট আর প্রবেশ।" এইরূপ প্রবিষ্ট আর প্রবেশে কি হইবে? "নির্ব্বাণ হয়ে গেল। আমি আনন্দ হয়ে গেলাম, পুণ্য হয়ে গেলাম, ব্রহ্মেতে মিশে গেলাম।" এরূপ মিশিয়া যাওয়ায় কি ফললাভ? "এক হয়ে গিয়ে পাপ অসম্ভব হয়ে গেল। আর বুঝ্‌তে হলো না, জান্‌তে হলো না, ভাব্‌তে হলো না।" প্রেম পুণ্যাদি এখন নিতান্ত স্বাভাবিক। কুপ্রবৃত্তি, কুবাসনা সকল এখন তিরোহিত। ব্রহ্মেতে এক হইয়াছে যে, সে আর পাপবাসনা পোষণ করিবে কি প্রকারে? যদি পোষণ করিতে পারে, তবে সে ব্রহ্মে বিলীন হয় নাই। সে ব্রহ্মে বিলীন কি না, চরিত্র তাহার প্রমাণ দিবে। ভ্রম, পাপ ব্রহ্ম হইতে জীবকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে, অন্যথা জীব তো নিরন্তর ব্রহ্মেতেই বাস করিতেছে। সাধক সময়ে সময়ে এই বিলীন ভাব অনুভব করেন আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। যত দিন 'চিরবিলীন' না হইতে পারেন, তত দিন ভ্রম পাপ অসম্ভব হয় না।

---

* ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মান মেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি।" "জগতের আদিতে ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি আপনাকেই জানিলেন- আমি ব্রহ্ম।

† তদ্যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পারিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেব মেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো নবাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।

বেদান্ত চিন্তাযোগে যাহা সাধন করিলেন, নববিধান সাধন করিতে করিতে তাহা করিলেন। "সাধন করিতে করিতে যেটা স্থূল ছিল, সূক্ষ্ম হয়ে গেল; ভাবের উত্তাপে লঘু হয়ে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু হয়ে ব্রহ্মেতে মিশে গেল। জল হয়ে বৃহৎ সমুদ্রে মিশে গেল।" উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন, মহিমা শ্রবণ ইত্যাদি সাধন করিতে করিতে মন যতই ঈশ্বরেতে নিবিষ্ট হইতে লাগিল, ভাবোচ্ছাস উচ্ছ্বসিত হইল, ততই স্থূল সূক্ষ্ম, অণু হইয়া গেল, জ্ঞান জ্ঞানেতে, প্রেম প্রেমেতে, পুণ্য পুণ্যে মিশিয়া গিয়া জীব ব্রহ্মের বক্ষের ভিতরে লুক্কায়িত হইল। আচার্য্য প্রার্থনা করিলেন "তোমার ভিতরে আমাদিগকে সূক্ষ্ম পরমাণু করিয়া শীঘ্র বিলীন কর।" আত্মা কি তবে পরমাণু? "এষোঽণুরাত্মা" এই আত্মা অণু, ইহাই কি তবে তাঁহার মত? "স য এষোঽণিমা" এই বলিয়া সমুদায় সম্বস্ত অণুত্বে পরিণত করিয়া পরমাত্মার সহিত বেদান্ত যেরূপ একীভূত করিয়াছেন আচার্য্যও কি তাহাই করিয়াছেন? তিনি যদি কেবল সাধন দ্বারা একত্বে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে বেদান্তের সহিত কথায় পর্য্যন্ত তাঁহার একতা হইল কেন? সূক্ষ্মত্ব বিষয়ক যত জ্ঞান আছে, পরমাণু সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, আর তদপেক্ষা সূক্ষ্মত্বের নিদর্শন নাই। পরমাণু চক্ষে দেখা যায় না, হস্তে স্পর্শ করা যায় না, কোন প্রকার যন্ত্রযোগে আয়ত্ত করা যায় না, অথচ জড়বাদীদিগকেও উহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে চলে না। সূক্ষ্মতম আত্মার নিদর্শন বেদান্তে অণু গ্রহণ করিয়াছেন, কেশবচন্দ্রও পরমাণু তাদৃশ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সূক্ষ্মতম বিষয় বুদ্ধিগোচর করিতে হইলে সর্ব্বজনবিদিত তৎসূচক শব্দ গ্রহণ করাই প্রয়োজন। তাই আচার্য্য এই উদ্দেশে যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বেদান্তের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া তিনি ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নহে।

আচার্য্য প্রার্থনা করিয়াছেন "হরি, আমাকে তোমাতে চির বিলীন কর। যেন আমরা সকলে এক হয়ে যাই। আর ভেদ স্বতন্ত্রতা থাকিবে না। সুগন্ধির গোলাপ, সুরভির উদ্যান। ব্রহ্মকে খাও, ব্রহ্মের ঘ্রাণ লও, এই যোগ। হরি হে, বুকের ভিতর হইতে জীবাত্মাকে টানিয়া লইয়া তোমার ভিতরে শীঘ্র ডুবাও। সুখ, প্রেম, জ্ঞান, আনন্দ হয়ে যাব।" এ কি ঘোর অদ্বৈতবাদ নয়? না, কেশবচন্দ্র বলিতেছেন, "দ্বৈতবাদও নয় অদ্বৈতবাদও নয়।" তবে এ কি বাদ? যদিনাম দিতে হয়,তবে বলিতে হয়। এটি ভূতার্থবাদ অর্থাৎ যাহা ঠিক তাহাই বলা, কেন না তিনি আপনি বলিতেছেন, "হরি, তুমি যে হও সে হও, আমি সত্য বলিলাম। সত্যেতে বিলীন হয়ে গেলাম।" সাধন করিতে করিতে যখন আত্মজ্ঞান স্ফূর্ত্তি লাভ করে, স্থূল হইতে বিবিক্ত হইয়া আত্মা যখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মরূপে প্রতিভাত হয়, তখন সেই আত্মাকে সূক্ষ্মতম পরমাত্মার ভিতরে বিলীনভাবে অবস্থিত অনুভূত হইয়া থাকে, পরমাত্মা হইতে আত্মাকে আর স্বতন্ত্র করিয়া বাহির করিয়া লওয়া যায় না। আমি আছি বটে, কিন্তু বিলীন ভাবে আছি ইহাই তখন প্রতীতি হয়। যোগযুক্ত প্রত্যেক আত্মার যখন এইরূপ উপলব্ধি, তখন ইহাকে ভূতার্থবাদ বা সত্যবাদ না বলিয়া আর কি নাম দেওয়া যাইতে পারে? আমরা আছি, ঈশ্বরেতে আছি, তাঁহার সহিত অভিন্ন ভাবে আছি, স্বতন্ত্র হইয়াও নিতান্ত অস্বতন্ত্র, এরূপ যত কথা কেন বলি না, জীবাত্মা পরমাত্মার রেখা টানিয়া, এই জীবাত্মা এই পরমাত্মা ইহা বলিবার সাধ্য নাই। যখন পাপ থাকে, ভ্রম থাকে, তখন জীবাত্মা আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাবে, কিন্তু যখন যোগাগ্নিতে ভ্রম পাপ দগ্ধ হয়, তখন এই বিলীনভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব সাধকের নিকটে প্রতিভাত হয় না। আত্মার তখন অন্নপান, আত্মার তখন আরাম শয্যা পরমাত্মা। "ব্রহ্মকে খাও, ব্রহ্মের ঘ্রাণ লও, এই যোগ" এ অবস্থায় ইহা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? এই "একত্ব" যোগ সত্য ভূমির উপরে স্থাপিত। জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বদা এক হইয়া আছেন, কেবল পাপ অজ্ঞানতা এই একতা দেখিতে দিতেছে না। ক্রমিক সাধন দ্বারা পাপ অজ্ঞানতা চলিয়া যাউক, একত্ব আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ঈশ্বর কৃপায় এই নিত্যসিদ্ধ যোগ এই নিত্যসিদ্ধ একত্ব আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমাদিগের আশা।

উপাসনাশ্রম।

চিত্তশুদ্ধি।

৪ মাঘ রবিবার, ১৮১৯ শক।

কিরূপে দেহ ও মন শুদ্ধ রাখিতে পারেন, যোগিগণের সর্ব্বপ্রথমে এই চেষ্টা। তাঁহারা জানেন যদি কোন প্রকারে তাঁহাদের মন বিকৃত হয়, তাহা হইলে আর তাঁহারা যোগ সাধন করিতে পারিবেন না। এজন্যই তাঁহারা কায়, মন ও বাক্য এ তিনটিকে বিবিধ উপায়ে অচঞ্চল করিতেন। প্রথমে কায় ও বুদ্ধির দিকে তাঁহাদের যত্ন। এই যত্ন মধ্যে অনেকগুলি বালকোচিত ব্যাপার আছে সংশয় নাই, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য চিরদিনই সমান আছে সমান থাকিবে। সংসারে যে হস্ত পদাদি নিতান্ত ব্যস্ত ছিল, যাই যোগাসনে উপবেশন করিলাম অমনি যদি উহারা স্থির না হইল, তাহা হইলে দেহ যোগের অন্তরায় হইবেই হইবে। সংসারের কার্য্যে সাংসারিক ভাবে যদি হস্তপদাদি নিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আসন পাতিয়া বসিলেই যে তাহারা স্থির হইবে, ইহা কখন আশা করা যাইতে পারে না। মনে সাংসারিক বিবিধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং সেই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদাদিও চঞ্চল হইয়া উঠিবে। কায় শুদ্ধির জন্য কর্ম্মশুদ্ধির প্রয়োজন। কর্ম্মশুদ্ধির সঙ্গে মনঃশুদ্ধির অতি ঘনিষ্ট যোগ। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল, সায়ংকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সমুদায় ভগবদুদ্দেশে, ভগবানের আদেশ পালন জন্য যদি হয়, সেই সকল কর্ম্মে মনের স্থিরতা ও কায়শুদ্ধি উপস্থিত হয়। আদেশপালনার্থ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াই যদি মন স্থির হইল, শরীর

শুদ্ধসত্ত্ব হইল, তাহা হইলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানযোগের প্রয়োজন, কি? প্রয়োজন যাঁহার আদেশ পালন করিলাম তাঁহাকে দর্শন, তাঁহার সহবাস সম্ভোগ। যিনি প্রতিক্ষণ 'এ কর্ম্ম কর' 'এ কর্ম্ম করিও না' বলিয়া দাসকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ কোন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন, তাঁহাকে দেখা, তাঁহার সহবাস সম্ভোগ করা দাসের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। আদেশ শুনিয়া যতই তাহা প্রতিপালন করা যায়, শরীর মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধি হইতে সন্তোষ প্রফুল্লতা উপস্থিত হইয়া থাকে। সন্তোষ ও প্রফুল্লতা প্রভুর প্রতি দাসকে একান্ত অনুরক্ত করিয়া তুলে। দাস তখন প্রভুর সহবাস সম্ভোগ করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হয়। এই ব্যাকুলতা হইতে ভক্তিযোগের আরম্ভ।

আদেশ পালন দ্বারা কায় মন শুদ্ধ হয় নাই, অথচ ভগবন্নামে কম্পাশ্রুপুলকপূর্ণ দেহ অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে ঈশ্বরভক্ত বলিয়া লোকে আদর করে। ইহাঁরাই কি তবে ভক্তিযোগী? ভক্তি পুণ্যভূমির উপরে স্থাপিত; যেখানে শুদ্ধতা নাই, সেখানে ভক্তি নাই। ভক্ত অথচ অশুদ্ধচরিত্র, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে অকুণ্ঠিত, ঈদৃশ ব্যক্তি কখন ভক্ত নহে। তবে যে এ দেশের শাস্ত্রে কোথাও কোথাও দুরাচার অথচ অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনশীল ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া গ্রহণ করিবার উপদেশ আছে, তাহা সেই সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহাদের ভজনানুরাগ জন্মিবার পূর্ব্ব আচরণ দুষ্ট ছিল, এখন সেই দুষ্ট আচরণ পরিহার করিবার জন্য ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত। অন্যথা অপুণ্যবান্ মূঢ় কুটিলাত্মা ব্যক্তির ভক্তি সিদ্ধ হয় নাই, সেই শাস্ত্রেই কেন এ কথা বলিবেন? নাম গানে চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হয়, অথচ পুনঃ পুনঃ পতন হয়, সে ব্যক্তির হৃদয় কখন ভগবানে স্থিত নয়। সেই হৃদয় ভগবানে স্থিতি লাভ করে, যে হৃদয় শুদ্ধ। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি গাঢ় অনুরাগ স্থাপন করিলে তাঁহার সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভাব কিছু না কিছু সে ব্যক্তিতে সংক্রামিত হইবেই হইবে। যদি না হয়, জানিতে হইবে ঈশ্বরের প্রতি এখনও অনুরাগ জন্মায় নাই, বিষয়ানুরাগ এখনও ঈশ্বরানুরাগ প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াও মনকে যোগের জন্য প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। যোগাচার্য্য এজন্যই বলিয়াছেন, উপবাস দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে ক্ষীণ করা যায়, কিন্তু তাহাতে বিষয়াভিলাষ মন হইতে চলিয়া যায় না। বিষয়াভিলাষ কেবল ঈশ্বরকে দর্শন করিলে অন্তর্হিত হয়।

যেখানে দেহ মনের শুদ্ধতা নাই, সেখানে ভক্তিযোগ যদি অসম্ভব হইল; কর্ম্মযোগও যদি আদেশপালন বিনা ভগবদুদ্দেশে সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে এমন কি সহজ উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে কর্ম্মযোগ ও ভক্তি-যোগ উভয়ই সাধককে সিদ্ধ হইবে। সাধনের আরম্ভে যোগার্থী সত্য আশ্রয় করিবেন। কায়মনোবাক্যে সত্যের অনুসরণ বিনা কখন যোগে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। যোগিগণ যোগে প্রবৃত্ত হন কেন? মিথ্যার সংস্রব ত্যাগ করিয়া সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য। আমাদেরও তাঁহাদিগের ন্যায় অগত্যা সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহা অসৎ, যাহা এই আছে, এই নাই, তাহা তো আমাদের কোন কালে আদরের বিষয় হইতে পারে না। আমাদের মনের বিকার, চাঞ্চল্য, পাপ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? অসৎ ক্ষণস্থায়ী বিষয় সমূহের উপরে চিত্তস্থাপন হইতে। যাহা সৎ, যাহা স্থায়ী, যাহার সহিত জীবনে মরণে আমাদের কোন দিন সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে না, তাহা সৎ, তাহা নিত্য, তাহা চিরস্থায়ী। এই সৎ, নিত্য, চিরস্থায়ী পদার্থ সত্য নামে অভিহিত। ধন মান খ্যাতি যশ প্রভৃতি অসৎ, ক্ষণস্থায়ী, কখন আছে কখন নাই। সে সমুদায়েতে চিত্ত বদ্ধ করাতে লোকে ক্লেশ যন্ত্রণা দুঃখ পাপে নিয়ত নিপতিত হইতেছে। সৎ, নিত্যস্থায়ী, আত্মার চিরদিনের সঙ্গী কি? জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য। আত্মার পক্ষে জ্ঞান প্রেম পুণ্য সত্য, আর সমুদায় মিথ্যা। যে ব্যক্তি জ্ঞানেতে প্রেমেতে পুণ্যেতে স্থিতি করে, সে সত্যেতে স্থিতি করে। সে কোন কালে সত্য অতিক্রম করিয়া কিছু করিতে পারে না। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য আত্মার উপাদান; স্বভাব তজ্জন্য নিয়ত এই সকলেতে অনুরক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এ সকলের আকর্ষণ সম্পূর্ণ কেহ ত্যাগ করিতে পারে না। যখন মন নিতান্ত বিকারগ্রস্ত, তখনও ইহাদের সৌন্দর্য্য সবার মন হরণ করে। অশুদ্ধতা কি? স্বভাব হইতে বিচ্যুতি। জ্ঞান প্রেম পুণ্যই আমাদের স্বভাব, সেই স্বভাবে স্থিতিতেই শুদ্ধতা।

দেহ মন বাক্য শুদ্ধ হয় কিসে? সত্যেতে। সত্য কি? জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য। এই জ্ঞান প্রেম পুণ্যের কি আরম্ভ আছে, শেষ আছে? ইহাদের আরম্ভও নাই শেষও নাই; ইহারা অনন্ত। এই অনন্ত জ্ঞান প্রেম পুণ্যের বিন্দুতে জীবের জ্ঞান প্রেম পুণ্য, উহারা সেই অনন্ত বিন্দুর সহিত চির সংযুক্ত। সত্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া ঈশ্বর হইতে ভ্রষ্ট হওয়া একই। সত্যের অনুসরণ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের অনুসরণ হয়, তাঁহারই আদেশ পালন হয়। সত্যের প্রতি অনুরাগে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ হয়, সুতরাং ইহাতে ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়। এক দিকে হাস্য, আর এক দিকে দৃঢ় ভাববন্ধন এ দুই মিলিত হইয়া সাধকে শুদ্ধতা উপস্থিত করে, বিকার জন্য বিমিশ্র ভাব তাঁহাতে কিছুতেই উপস্থিত হইতে পারে না। অসৎ মিথ্যার উপরে ধর্ম্ম জীবন সাধন করা বালির উপরে অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায় সর্ব্বদা আপৎপূর্ণ। একটি লোভ বা প্রলোভনের বিষয় উপস্থিত হইলেই পতন হয়। যদি চিরস্থায়ী ধর্ম্ম-জীবন লাভ করা আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সত্যেতে, জ্ঞানেতে, প্রেমেতে, পুণ্যেতে আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমুচিত। যাঁহারা চিত্তশুদ্ধি কামনা করেন তাঁহাদের এতদ্ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা সত্যেতে অনুরক্ত ও তদনুসরণে কৃতকৃত্য হই।

প্রার্থনা। *

আনন্দময়, আজকের দিন শুভ না অশুভ? নিশ্চয়ই শুভ! আজ যে আমার খেলার সঙ্গী, পড়ার সঙ্গী, শিক্ষার গুরু, বিপদে সহায় অত্যন্ত স্নেহময় পিতাকে হারাইয়াছি। কিন্তু আর একদিকে আজ যে কি মহালাভ করিয়াছি তাহা ত' আর কেউ জানে না। আজকের দিনে আমি তোমাকে আনন্দময় ব'লে চিনেছি। তা'র আগে কিরূপে তোমার আনন্দস্বরূপের আরাধনা করিতাম মনে নাই, কিন্তু বেশ মনে আছে এই দিনে আমি প্রথম স্বর্গীয় আনন্দের আভাস পাইয়াছি, তুমিই কেবল তাহা জান।

বাবা, তোমাকে হারিয়ে আমি যে কত হারিয়েছি তা' আর কে জানবে? তেমন ক'রে আর ত' কেউ আমার সঙ্গে খেলা করে না; কেউ ত' আর তেমন ক'রে ভাল বই আমার সঙ্গে পড়ে না; তেমন ক'রে ত' আর কেউ আমাকে শিক্ষা দেয় না; তোমার মতন ক'রে ত' কেউ দুঃখের সময় মধুর সান্ত্বনার কথা বলে না। মা, ভাই, বোন্ এঁরা আছেন বটে, কিন্তু বাবা! তোমার মত আমার কথা কেউ বুঝ্‌তে পারেন না, আর আমার বল্‌তে ইচ্ছেও করে না। জগতের জন্যে তুমি যা' ক'রেছ জগৎ তা' বলুক; আমার জন্যে তুমি যা' ক'রেছ অন্ততঃ সেইটুকুও যেন আমি বল্‌তে পারি। স্বর্গে তুমি খুব সুখে আছ, মহর্ষি ঈশার পাশে ঋষি পিতা, তোমার ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গে মিলে কতই আনন্দে রয়েছ। আর আমার জন্যে আজও তুমি নিশ্চয় তোমার পিতার কাছে প্রার্থনা কচ্চ।

হে আনন্দময়, চিরসুখময়, তুমি অনন্তকাল আমার পিতাকে সুখে রাখ; উন্নত হইতে উন্নততর সুখে সুখী কর। আর, আমার জন্যে তোমার কাছে কি চাইব? তিনি যোগী ছিলেন, আমি যেন সংসারাসক্ত না হই। তিনি ঋষি ছিলেন, আমি যেন যথার্থ—ব্রহ্ম দর্শন পাই। তিনি আদর্শ ক্ষমা ছিলেন, আমি যেন নিষ্ঠুর স্বভাব হইয়া সংসার পথে কণ্টক না ছড়াই। তিনি শান্তসাধক ছিলেন, আমি যেন কখনও কাহারও হৃদয়ে অশান্তি আনয়ন না করি। তুমি ত' আমাকে অনেক সুখে সুখী ক'রেছ। এই আট বৎসর পিতাকে তোমার অনন্তবক্ষে লুকিয়ে তুমি যে নিজে আমার সঙ্গী হ'য়েছ; আমার সকল প্রার্থনা শুনেছ; আমার বিপদ, দুঃখে সহায় হ'য়ে আমাকে উদ্ধার ক'রেছ। আর কি কোন দিন তোমাকে অবিশ্বাস করিব? আট বৎসর তুমি সঙ্গে রয়েছ, এখন হইতে কি আর কাছে থাকিবে না? জীবনে আরও কত বিপদ, দুঃখ আছে জানিনে; সংসার নাকি বড় ভয়ানক স্থান। কিন্তু হে পিতার পিতা পরম পিতা, আট বৎসর প্রতিক্ষণ যা'র সঙ্গে ছিলে আর কি তা'কে তুমি পরিত্যাগ করিতে পার? কখনই নয়। আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন কখনও তোমাকে পরিত্যাগ না করি। অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম কি জানি আর কখনও এখানে এমন ক'রে বসিতে পাইব কি না! কিন্তু মনের কথা যে ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না, তুমি প্রাণ দেখে আশীর্ব্বাদ কর। যাহাতে একবিন্দু অপবিত্রতা আছে এমন সুখ যেন কখনও আমার না হয়। একেবারে খাঁটী তোমা সুখে যেন আমি সুখী হইতে পারি, তুমি দয়া ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। আশা ভক্তির সহিত তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

* শান্তসাধক কেদারনাথ দে মহাশয়ের ৮ম শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার প্রার্থনা।

সংবাদ।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র বিশেষ আহ্বানে সোমবারে চট্টগ্রাম যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে বর্ণারপুর কাছাড় তাঁহাদের যাইবার প্রস্তাব আছে।

গত ২৫ ফাল্গুন স্বর্গীয় ভাই কেদারনাথ দের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী স্বর্গীয় ভাইয়ের সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যা সহ খাঁটুরায় গমন করিয়া তথায় উপাসনাদি করিয়াছিলেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিশেষ আহ্বান পাইয়া দ্বারভাঙ্গায় গমন করিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই বাকিপুর, গয়া ও গাজিপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করিবেন এরূপ প্রস্তাব হইয়াছে।

ভাই অমৃতলাল বসু কৈলোয়ার যাইবার সময় মানকর, বাকিপুর ও খগোলে এক এক দিন অবস্থান করিয়া স্থানীয় বন্ধুগণ সহ উপাসনা করিয়াছিলেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার ভাগলপুরে শ্রীমান্ লালবিহারী চৌধুরীর পুত্রের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া মুঙ্গের, মোকামায় ২।১ দিন করিয়া অবস্থান করিয়া বাকিপুরে পৌঁছিয়াছেন। মুঙ্গের ব্রাহ্মমন্দিরে রবিবাসরিয় সন্ধ্যার উপাসনা তিনিই করিয়াছিলেন।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের সহিত তত্রস্থ শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যার শুভ বিবাহ হইয়াছে। নববিধান গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এ, বিবাহের আচার্য্য ও পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। দয়াময় পাত্র পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

২৪ ফাল্গুন মঙ্গলবার প্রচার আশ্রমে স্বর্গগত শ্রীমান্ মহিমচন্দ্র দাসের আদ্যোশ্রাদ্ধ নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হইয়াছে। মহিমচন্দ্রের দশম বৎসরের জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রার্থনা পাঠ করিয়াছিলেন। "আমরা পিতৃহীন হইয়া অসহায় হইয়া পড়িয়াছি" এই সকল বাক্য কন্যাটি যখন কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চারণ করিলেন, তখন উপস্থিত উপাসকগণ কেহই আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সত্যই তাঁহারা একজনের অভাবে বড়ই অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্য এবং পুরহিতের কার্য্য করিয়াছিলেন।

আমরা আনন্দের সহিত সকলকে জ্ঞাত করিতেছি আমাদের স্নেহময়ী পরম জননী আমাদের প্রচার আশ্রমের বাড়ির ছাদের উপর উপাসনার জন্য একটী সুন্দর কুটির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই বিশেষ করুণার জন্য আমরা যে কি দিয়া তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিব জানি না। ইচ্ছা হয় তিনি যেমন দয়া করিয়া আমাদিগকে এই কুটির খানি দিয়া আমাদের একটি বিশেষ অভাব মোচন করিলেন, আমরাও আমাদের দেহ মন প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিয়া জীবনকে ধন্য করি।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ২রা চৈত্র কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

KEISTERED No C. 37

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৩৪ ভাগ ।
৬ সংখ্যা ।

১৬ই চৈত্র বুধবার ১৮২০ শক ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২|০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা ।

হে প্রিয়তম পরমেশ্বর, তুমি যদি আমাদের একমাত্র প্রিয় হও, তাহা হইলে কখন কি আমাদের চিত্ত অবসন্ন হয়? দেহ জরা মৃত্যুর অধীন, রোগ শোক এ সংসারে অনতিক্রমণীয়। দেহের যাতনায় যদি আমরা তোমায় ভুলিয়া যাই তাহা হইলে তোমা হইতে আমাদের দেহ প্রিয় ইহাই তো প্রমাণিত হইতেছে। তোমা অপেক্ষা আমাদের দেহ আমাদিগের নিকটে প্রিয় এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা হয়, কিন্তু লজ্জা করিয়া কি করিব, যখন কার্য্যতঃ সেইরূপই নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তুমি আজ পর্য্যন্ত কেন আমাদের প্রিয় হইলে না, আমাদের বিষয়াসক্তি কেন আজও গেল না, ইহা বলিয়া আমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হইতেছে। হে দেবাদিদেব, আমরা ইচ্ছা করিলেই যে বিষয়ের বন্ধন ছেদন করিতে পারি তাহা নহে, অনেক সাধন যত্ন প্রয়াস দ্বারা কোন একটি বিষয়ের প্রতি অভিলাষ জয় করিতে গিয়া দেখিয়াছি, আমরা যত আমাদের পুরুষকারের উপরে নির্ভর করিয়াছি তত আমাদের পরাজয় ঘটিয়াছে। আবার আমরা যখন মনে করিয়াছি জীবনে অমুক প্রবৃত্তি কোন কালে পরাজিত হইবার নহে, চির জীবন উহা আমাদের কণ্টক হইয়া থাকিবে, অলক্ষিত ভাবে তুমি জীবনে এমন একটি সাধনের ব্যাপার আনিয়া উপস্থিত করিলে, যাহা দেখিতে সেই প্রবৃত্তির উদ্দীপনের অনুকূল, অথচ সেই সাধনে প্রবৃত্তি সহজে বশীভূত হইয়া গেল; যাহা অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইবে, তাহার মূল পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেল, আর প্রবৃত্তির উদ্দীপনের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত রহিল না। এরূপ তোমার কৃপা আবার কখন জীবনে প্রকাশ পাইবে ইহা আমরা জানি না, কিন্তু এই জানি, যদি আমরা সরল ভাবে তোমার ইচ্ছাসঙ্গত বিষয় চাই এবং তজ্জন্য নিয়ত প্রার্থিভাবে তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি কখন হৃদয়ের সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবে না, যথাসময়ে সে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেই করিবে। তুমি আমাদের প্রিয় হইবে, দেহাদির প্রতি আমাদের তোমার ইচ্ছাবিরোধী মমতাবন্ধন থাকিবে না, বিষয়বাসনা আমাদের চিত্তকে তোমা হইতে কখন বিচলিত করিতে পারিবে না, ঈদৃশ মনের অবস্থা, হে নাথ, আমাদের এখন প্রার্থনার বিষয় হইয়াছে। এ প্রার্থনা যদি বাস্তবিক সরল হয়, নিশ্চয় জানি, 'অনতিবিলম্বে আমাদের এ প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করিবে। আমরা

দেখিয়াছি, যে সম্বন্ধে তোমার কৃপা আমাদের প্রতি তুমি প্রকাশ কর, সে বিষয়সম্বন্ধে আমাদের অন্তরে যে মালিন্য থাকে, তুমি অল্পে অল্পে সে সকল আমাদিগকে দেখাইয়া দাও, এবং তজ্জন্য ক্লেশ উৎপাদন করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লও। তোমাকে একমাত্র প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিবার পথে যে সকল অন্তরায় আছে, হৃদয়ের মালিন্য আছে, সে সকল সংশোধন করিয়া লইয়া তুমি আমাদের প্রিয় হইবে, এই আশা করিয়া তব চরণে এই ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাদের অন্তঃকরণ হইতে তোমা ভিন্ন অন্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ অন্তরিত করিয়া দাও, আমরা সম্যক্ প্রকারে তোমার হইয়া কৃতার্থ হই। তোমার কৃপায় আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

শাক্য, ঈশা, চৈতন্য।

সাধন অতি বিস্তৃত ভূমি আশ্রয় করিয়া করিতে গেলে তাহাতে কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে বহুভাবের সমাবেশ করিয়া সাধন করা প্রয়োজন। এক একটি ঈশ্বরবাচক শব্দের মধ্যে ঈশ্বরসম্পর্কে যত অধিক ভাবের সন্নিবেশ হয়, ততই সাধন সহজ হইয়া থাকে। সুদীর্ঘ উপাসনা করিয়া ভাবের গাঢ়তা সাধন করিতে গেলে অনেক সময়ে অকৃতকার্য্য হওয়া যায়, বিশেষতঃ প্রলোভন সম্মুখে উপস্থিত হইলে যদি দীর্ঘ উপাসনার ভাব একটী কথায় হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে উপাসনার আয়োজন করিতে করিতেই প্রলোভনের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, উপাসনা করা আর না করা নিষ্ফল হইয়া যায়। সাধুগণ সাধনের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বহু সাধু ব্যক্তির প্রযত্নে এক একটি সাধনের পথ প্রকাশ পাইয়াছে। পথপরিষ্কারে যতগুলি সাধুর প্রযত্নের প্রয়োজন হইয়াছে, তাঁহাদের সকলকে গ্রহণ করিয়া সাধন আরম্ভ করিতে গেলে কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি সেই পথের বহু সাধুকে একেতে সন্নিবিষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সাধনের পক্ষে কাঠিন্য থাকে না। আমরা উপরে যে শাক্য, ঈশা, চৈতন্য এই তিনটি সাধুর নাম ক্রমে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য সাধনের ত্রিবিধ পথ সহজে আয়ত্ত করা ভিন্ন আর কিছু নহে।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি, এই তিনটি পথ মনুষ্যপ্রকৃতির সার্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আবশ্যক। প্রাচীন ঋষিগণ হইতে শাক্য পর্য্যন্ত জ্ঞানের পথ ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছে। জ্ঞানে একত্বসাধন প্রধান। বহুত্বের ভিতরে একত্বদর্শন, অথবা বহু উড়াইয়া দিয়া এক অবশিষ্ট রাখা, এ উভয়ই জ্ঞানের পথ। ঋষিগণ বহুকে এক সূত্রে গাঁথিয়া একের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন, শাক্য বহুকে উড়াইয়া দিয়া এককেই রাখিয়াছেন। এ এক কেবল জ্ঞান, তদ্ভিন্ন আর কিছু নহে। জ্ঞানে যখন বস্তুদর্শন প্রধান, তখন বস্তু পরিষ্কৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য শাক্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানের পথে চরম বলিতে হইবে। এক বস্তু নিঃসংশয়িত ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই বস্তুতে তদাশ্রিত বিষয়সমূহকে অবলোকন করা এবং সেই একই বস্তুর প্রেরণাধীন সমুদায় বিষয় এরূপ অনুভব করা, প্রাচীন ঋষিগণের রীতি ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একের প্রেরণাধীন হইয়া কর্ম্ম করিবার প্রতিনিধি আমরা আর একজনকে যখন পাইয়াছি, তখন তাঁহাকেই আমরা তৎসম্বন্ধে নেতা জানিয়া এক শাক্যকেই নিবৃত্তিপথের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যত দিন বাসনা ও প্রবৃত্তিসমূহের কোলাহল নিবৃত্ত হয় নাই, প্রত্যেক প্রবৃত্তি ও বাসনা আপনার আধিপত্যস্থাপনের জন্য প্রবল রহিয়াছে, তত দিন নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ কিছুতেই হয় না। নিবৃত্তি বিনা এক অখণ্ড জ্ঞান কখন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয় না। প্রবৃত্তিকৃত বিকারসমূহে মন নানা দিকে ধাবিত, খণ্ড খণ্ড বিষয় লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত, সুতরাং

এক অখণ্ড জ্ঞানবস্তু সাধকসন্নিধানে প্রতিভাত হয় না। শাক্য তীব্র তপস্যাযোগে মনের চাঞ্চল্য নিবৃত্তিপূর্ব্বক অখণ্ড জ্ঞান বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া দেখিলেন, যত দিন বিষয়সমূহ সত্য এ বিশ্বাস থাকিবে, তত দিন বিষয়াকর্ষণ কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে, তাহারা অখণ্ড জ্ঞান বস্তুকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। অতএব সে সমুদায় কিছুই নয় নিতান্ত অলীক এই বলিয়া তাহাদের সহিত মানসিক সম্বন্ধ প্রজ্ঞাযোগে তিনি ছেদন করিলেন। যখন তাঁহার যোগনেত্রে সমুদায় বিষয় অলীক হইয়া উড়িয়া গেল, তখন এক অখণ্ড জ্ঞান বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ করিয়া সম্পন্ন হইলেন। যাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, অপরেও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হউক, সকল বন্ধন ছেদন করুক, এজন্য তিনি নিবৃত্তির পথ শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই শিক্ষাদানে তিনি বিশেষ উদ্যম দেখাইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি যে প্রবৃত্তির পথ অবলম্বন করিলেন তাহা নহে। সেই অখণ্ড জ্ঞান সর্ব্ববিধ-চেষ্টাশূন্য, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সমুদায় অলীক, এ বিশ্বাস যাঁহাতে দৃঢ়মূল হইয়াছে, তিনি সেই বিশ্বাস অপর ব্যক্তিগণেতে দৃঢ়মুদ্রিত করিতে গিয়া যে উদ্যম প্রকাশ করেন সে উদ্যম কখনই প্রবৃত্তিপথের উদ্যম নহে। বুদ্ধের প্রবৃত্তি তবে নিবৃত্তিমূলক ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা তখনই শাক্যের অনুসরণ করি, যখন আমাদের সর্ব্ব প্রকারের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিমূলক হয়। আহারপানাদিতে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছি, অথচ তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্তি রহিয়াছে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? সম্ভব আসক্তিত্যাগে। ভক্ষ্য-ভোজনাদিতে যদি আসক্তি না থাকিল, তাহারা যদি সুখ দুঃখ উৎপাদনের হেতু না হইল, মন বিকার-গ্রস্ত করিতে না পারিল, তাহা হইলে প্রবৃত্তির মূলে নিবৃত্তি রহিয়াছে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, এবং শাক্যের সঙ্গে যোগ সহজে অনুভূত হয়। আমাদের প্রবৃত্তি যত দিন নিবৃত্তিমূলক না হয়, তত দিন ব্রহ্মযোগে সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, এজন্য শাক্য দ্বার হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার মধ্য দিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মযোগে প্রবেশ করিতে হইবে। আমরা যে সমুদায় বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছি, তাহারা অসারের অসার, তাহা-দিগের হইতে যে সুখ উপস্থিত হয় তাহা অতি ক্ষণিক ও তুচ্ছ, তাহাদিগের হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা তীব্র, সুতরাং দুঃখের প্রতি বীতরাগ হইয়া দুঃখচ্ছেদনের জন্য তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে, শাক্য নিরন্তর ইহাই বলিতেছেন। তাঁহার এই কথার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ক্ষণিক অস্থায়ী সুখ এবং দুঃখের মূল সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হইতে হইবে। সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হইলেই সংসারে থাকিয়াও সংসারে না থাকা সিদ্ধ হয়। সংসার যখন আসক্তির বিষয় ছিল, তখন সংসা-রের জন্যই জীব নিরন্তর ব্যস্ত ছিল, তাহার হৃদয় মন প্রাণ সমুদায় সংসারের আকর্ষণে কার্য্য করিতে-ছিল, সেই সংসারের প্রতি যখন বিতৃষ্ণা জন্মিল, তখন হৃদয় মন প্রাণের ক্রিয়াশীল থাকিবার জন্য আর একটি আকর্ষণের প্রয়োজন, সে আকর্ষণ পরের দুঃখমোচনজন্য চিত্তের আবেগ। শাক্য এই আবেগেই সমগ্র জীবন ক্রিয়াশীল ছিলেন এবং তাঁহার অনুযায়িবর্গও পরদুঃখমোচনে জীবন অর্পণ করিয়া জনসমাজের বিপুল হিতসাধন করিয়া গিয়া-ছেন। এইরূপে নিবৃত্তির ধর্ম্ম পরহিতৈষণায় পর্য্যবসন্ন হইয়াছে। শাক্যের পথ আশ্রয় করিয়া পরহিতৈষণা যদি উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পথে দণ্ডায়মান থাকা সম্ভবপর নহে।

পরহিতৈষণা কখন ক্রিয়াশূন্য হইতে পারে না। ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া তদুপযোগী জ্ঞান, বল ও ভাবের প্রয়োজন। আপনার জ্ঞান, বল ও ভাব ক্রিয়াকালে এতই ক্ষীণ ও সামান্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, অন্য কোথা হইতেও সে সকলের পরিপূরণ না হইলে আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারা যায় না। জগৎ ও জীব-সকলকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেও তাহারা উড়িয়া যায় না, এবং উড়িয়া যায় না বলিয়াই

সেই জগৎ ও জীবই সাধকের পক্ষে পরহিতৈষণা চরিতার্থ করিবার ভূমি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জগৎ ও জীবকে মিথ্যা বলিয়া তুচ্ছ করা হইয়াছে; এখন তৎপ্রতি মঙ্গলকামনা উদ্দীপ্ত হওয়াতে তাহাদের সহিত নূতন সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। অসঙ্গ উদাসীন অনন্ত জ্ঞানের সহিত নিবৃত্তিযোগীর সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। সেই অনন্তজ্ঞানই অনন্তমঙ্গল জন্য নিবৃত্তযোগীর হৃদয়ে মঙ্গলভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে, ইহা তখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেই মঙ্গলময় অনন্ত জ্ঞান তাঁহার হৃদয়কে পরের কল্যাণের জন্য নিতান্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, তখন নিবৃত্তিমূলক প্রবৃত্তিযোগ তাঁহাতে উপস্থিত হইল। তিনি যে অস্থায়ী সুখ ও সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন, সেই বিতৃষ্ণই রহিয়াছেন, সুতরাং অখণ্ড অনন্ত জ্ঞানের প্রেরণাধীন হইবার পক্ষে তাঁহাতে কোন প্রতিবন্ধক নাই। সেই অনন্তজ্ঞানের প্রেরণায় যখন তিনি বিবিধ হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত, তখন তিনি আপনাকে মঙ্গলময়ের ইচ্ছাধীন দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন; এবং অনন্ত মঙ্গলময়ের ইচ্ছাধীনতা তখন তাঁহার জীবনের মূল হইল।

এখানে মহর্ষি ঈশার সহিত সাধকের হৃদয়ের একতা উপস্থিত। হৃদয়ের প্রেরয়িতা ঈশ্বর, এমত অতি পূর্ব্ব হইতে আর্য্যঋষিগণের বিদিত ছিল। এই প্রেরণাধীনে মহৎ কর্ম্ম সকল জীব সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতেন। তাঁহাদিগের এই ভাব জুডিয়াভূমিতে যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেরূপ এ দেশে করে নাই। মহর্ষি ঈশাতে এইভাব চরম সীমা আরোহণ করিয়াছে। ঈশ্বরের প্রেরণাময় তাঁহার সমগ্র জীবন ছিল; কখন তিনি সে প্রেরণাবিবর্জ্জিত হইয়া সংসারে জীবন ধারণ করেন নাই। প্রেরণাধীনা হইয়া কর্ম্ম করা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করা, এ দুই তাঁহার নিকটে এক ছিল। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করে তাহারই সহিত তিনি আপনার নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতেন। প্রবৃত্তিযোগী মহর্ষি ঈশা নিবৃত্তিযোগী শাক্যের পর সমাগত। শাক্য সমুদায় আবরণ উন্মোচন করিয়া জ্ঞানস্বরূপকে সাধকের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। সমুদায় আবরণ উন্মোচন করিতে গিয়া প্রবৃত্তি বাসনাদি হইতেও তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে হইল। এইরূপে নিবৃত্ত হইয়া আর তিনি সুখ বা সংসারের পিপাসায় কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। চিত্ত নিবৃত্তি অবলম্বন করিলে স্বার্থ অন্তর্হিত হইল, পরার্থ আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিল। অনন্ত জ্ঞান আপনার জন্য কিছু করেন না, আত্মসম্বন্ধে তিনি পূর্ণ বৈরাগী, এই পর্য্যন্ত দেখিয়া যদিও আর তিনি সেই জ্ঞানই যে অনন্ত মঙ্গল তাহা বলিলেন না, তথাপি তাঁহার হৃদয় সেই মঙ্গলভাব দ্বারা অধিকৃত হইল, এবং তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল বলিয়াই তিনি অতীব কর্ম্মশীল হইলেন। মহর্ষি ঈশা এই ভূমিতে আরূঢ় হইয়া প্রথম হইতে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক অনন্ত মঙ্গলময় পিতা তাঁহার জীবন জগতের কল্যাণসাধনজন্য ব্যবহৃত করিতেছেন ইহা দেখিয়া তিনি আপনি কৃতার্থ হইলেন, এবং অপরকেও সেইরূপ হইতে শিক্ষা দিলেন।

শাক্যেতে জ্ঞানযোগ এবং ঈশাতে কর্ম্মযোগ কি প্রকারে সিদ্ধ হইল আমরা দেখিতে পাইলাম। এ দুজনের সঙ্গে একহৃদয় হইলে আমরা যে জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মযোগী হইতে পারি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জ্ঞান ও ইচ্ছা এ দুইয়েতে ঈশ্বরের সহিত যোগ ঘটিলেও আমাদের প্রকৃতির পূর্ণ পরিতৃপ্তি হইল না। হৃদয় এখনও তাহার প্রীতির পাত্র পায় নাই যাঁহাকে লইয়া সে কৃতকৃত্য হইবে। ইচ্ছাপ্রতিপালন অনুরাগ ভিন্ন কখন সম্পন্ন হইতে পারে না। কর্ত্তব্যবোধে ইচ্ছাপালন কখন সুখকর নহে। যাহা সুখকর নহে, তাহা সমগ্র জীবন অবাধে পালন করিতে পারা যায় না, সময়ে সময়ে শৈথিল্য উপস্থিত হয়। অক্ষুণ্ণভাবে ইচ্ছা পালন তখন হয় যখন তাহার সঙ্গে অনুরাগ অনুস্যূত থাকে। এই অনুরাগ

কর্ত্তব্যসাধনের আনুষঙ্গিক, সুতরাং উহা এখন সুস্পষ্ট বিকাশ লাভ করে নাই। উহার সুস্পষ্ট প্রকাশ তখনই হইল যখন ঈশ্বরই একমাত্র অনুরাগের বিষয় হইলেন। ঈশ্বর একমাত্র অনুরাগের বিষয় হইলে বিষয়বাসনাপরিহার, আজ্ঞাপালন এমনই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া যায় যে, উহা আর গণনা মধ্যে আসে না, মন প্রমত্ত হইয়া পরম প্রেমাস্পদের দিকে ক্রমান্বয়ে ধাবিত হইতে থাকে। এ ভাব শ্রীচৈতন্যের ভাব। শাক্য ও ঈশার ভাবের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ভাব মিলিত না হইলে জীবন পূর্ণ হইল না। এজন্য এ তিন জন সমগ্র মানবপ্রকৃতির পূর্ণতা সাধন জন্য প্রয়োজন আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, এবং এই তিনজনেতে পূর্ব্বকার সমুদায় ঋষিমহর্ষিগণ যখন মিলিত হইয়াছেন, তখন এ তিনের অনুসরণ করিলে তাঁহাদের সকলের অনুসরণ করা হইল জানিয়া এই তিনকে লইয়া আমাদের পক্ষে সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সমুচিত। এই তিনের সঙ্গে একহৃদয় হইলে সমুদায় ঋষিমহর্ষিগণের সহিত একহৃদয়ত্ব হয়, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। আমরা আশা করি, সকলে এক এক বার আত্মপরীক্ষা দ্বারা দেখিবেন, এ তিন জন সাধুর সঙ্গে দিন দিন কত দূর একত্ব জন্মিতেছে।

আশ্চর্য্য মোহ।

জগৎ মায়াময়। এ মায়ার হাত হইতে জ্ঞানিগণও সহজে মুক্ত হইতে পারেন না, এ কথা সকল লোকেই বলিয়া থাকে। মায়া মনুষ্যমনের কল্পনা, মায়ার বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই, দেহাদির প্রতি অত্যাসক্তি মায়ানামে অভিহিত, এ কথা বলিলেও মানুষের এই সকলের প্রতি অত্যাসক্তি জন্য যে মোহ উপস্থিত হয়, সে মোহ কখন অস্বীকার করিতে পারা যায় না। চারিদিকে লোক সকল মোহে আচ্ছন্ন, যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, ইহার মধ্যে যাহারা অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরই বিপদ্। সংসারে তাহাদের সুখ নাই ইহা তাহারা বারংবার প্রত্যক্ষ করিতেছে, কিন্তু ঘুমের ঘোর এখনও তাহাদের যায় নাই, এজন্য সংসারের সঙ্গে অসুখের সম্বন্ধ ছেদন করিয়া যেরূপ সম্বন্ধে সুখশান্তি হয়, সেরূপ সম্বন্ধ স্থাপনে যত্ন করিতে তাহাদের অবকাশ হয় না। জাগিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে, যত্ন করিবে কিরূপে? পূর্ব্বে কি হইয়া গিয়াছে ঘুমে বিস্মরণ করাইয়া দেয়, অল্প যাহা কিছু স্মরণে থাকে তাহা স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়, সুতরাং অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ লোকে মোহভঙ্গে সিদ্ধমনোরথ হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

সংসারে ঘুমন্ত লোক সকল বেড়াইতেছে, কার্য্য করিতেছে, কত প্রকারের উদ্যম প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু এ সমুদায়ই ঘুমের অবস্থায়। লোকদিগের যত্ন চেষ্টা কার্য্য যাঁহারা জাগ্রৎস্বপ্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেরূপ নির্দ্ধারণ একেবারে অসত্যমূলক কি প্রকারে বলা যাইবে? পৃথিবীর সকল লোকে যদি স্বপ্নদর্শী হয়, যাহা বাস্তবিক নয় তাহাই সত্য বলিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান থাকে, তবে তাহাদের সকল প্রকারের যত্নচেষ্টাকে জাগ্রৎস্বপ্ন বলা কি আর অসঙ্গত? তুমি বলিবে, মানুষ যখন অজ্ঞান, যে কোন বিষয় হউক তাহার যথার্থ তত্ত্ব সে অবগত নয়, অনেক বিচার বিবেচনা করিয়াও সে যাহা করে, তাহাও অন্তে নিষ্ফল হইয়া যায়, তখন তাহাকে স্বপ্নদর্শী বলিয়া লাভ কি? সে তাহার প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতে গিয়া যদি দুঃখে নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহার তাহাতে দোষ কি? যাহা অমূলক কিছুই নয়, তাহাকে সত্য ভাবিয়া যদি সে তাহার অনুসরণ করিত, তবে তাহাকে স্বপ্নদর্শী বলা সঙ্গত ছিল, কিন্তু সে যখন দেহাদির প্রয়োজন অনুসরণ করিয়া সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যত্ন করিতেছে, দেহাদি কখন অসত্য নহে, তখন তাহাকে ঘুমন্ত ব্যক্তি বলিয়া দোষ দিলে কি লাভ? ক্ষতিবৃদ্ধি ফলাফল যখন তাহার সমগ্র জীবনের সঙ্গে অনুস্যূত, তখন ক্ষতি দেখিয়া তাহাকে নিন্দা

করা, বিফলতা দেখিয়া স্বপ্নদর্শী বলা ইহা কদাপি উচিত নহে।

মানুষ দেহাদির প্রয়োজন অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করে তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু এই সকলের অনিত্যতা অস্থায়িতা অসারতা যে তাহাদের কার্য্যের সঙ্গে অনুস্যূত থাকিবে, ইহা তোমাকে মানিতেই হইবে। দেহ কি আর চিরদিন থাকে? না দৈহিক সম্বন্ধ জন্য যে সকল বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ তাহাই চিরস্থায়ী? যাহা অস্থায়ী, অনিত্য, জলবুদ্বুদের ন্যায় ভঙ্গুর, তাহাকে স্বপ্ন বলিলে ক্ষতি কি? মুহূর্ত্ত ও পঞ্চাশৎ বর্ষ অনন্তকালের নিকটে পরিমাণে প্রায় একই, সুতরাং নিত্যকালের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করিলে মুহূর্ত্তের স্বপ্ন ও পঞ্চাশৎ বর্ষের অনিত্য অস্থায়ী ব্যাপার উভয়ই সমান। যাঁহারা জাগতিক ব্যাপারকে স্বপ্ন বলিয়াছেন, তাঁহারা এই কারণেই স্বপ্ন বলিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদ যে, আমারা জগৎকে স্বপ্ন বলি না, তাহার সহিত যে প্রকার সম্বন্ধ হইতে নিত্যকালের সম্বল সঞ্চিত হয় তাহাকেও স্বপ্ন বলি না, কিন্তু জগৎ সত্য হইলেও আমরা এরূপ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে পারি, যাহা সত্য নয়, তাহার সহিত আমরা এরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারি স্বপ্নের ন্যায় দুদিনে যাহা ভঙ্গ হইয়া যায়। স্বপ্ন অথচ স্বপ্ন নয়, ইহা দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তি কি ভাবে সমুদায় দেখিতেছে তাহার উপরে নির্ভর করে। বল, তুমি দেহকে প্রতিদিন সেই ভাবে নিয়োগ কর কি না, যাহাতে অনিত্য দেহের ক্রিয়া হইতে নিত্যধন সঞ্চিত হয়, পরিজনবর্গের সহিত আপনাকে সেইরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াছ কি না, যাহাতে তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ পৃথিবীর অনিত্য সম্বন্ধ না হইয়া নিত্যকালের সম্বন্ধ হইয়া যায়।

যদি তুমি মনে করিয়া থাক, যাহা অনিত্য তাহা অনিত্য, তাহা হইতে আবার নিত্য কিছু বাহির হইবে কি প্রকারে? তাহা হইলে তুমি পৃথিবীতে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে পার, কিন্তু জানিও তোমার ধর্ম্ম নিতান্ত মূলশূন্য অসার, তোমার জীবনে ধর্ম্ম কোন কালে স্থায়ী হইবার নহে। তুমি মুখে অসার অসার বল, কিন্তু অসারের সঙ্গে সম্বন্ধ কি ছেদন করিতে পার? অসার বলিয়া অসারের সঙ্গে যতই তুমি ঘনিষ্ঠতা করিবে, তত তুমিও অসার হইয়া যাইবে। তুমি কি জান না সারাৎসার হইতে এই অসার জগৎ। যেখন অসারের মূলে সার আছে, তখন তুমি কেবল অসার বলিয়া জগৎ সংসারকে উড়াইয়া দিবে কি প্রকারে? অসার সংসার কি সারাৎসারের লীলাভূমি নয়? বসন ও দেহ অসার বটে, এ দুইই আত্মার বাহিরের আচ্ছাদন, উহাদের আদর আত্মার জন্য। সংসার যাঁহাকে তোমার চক্ষু হইতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, যখন তাঁহাকে তুমি দেখিবে, তখন তাঁহারই জন্য এই অসার সংসার তোমার আদরভাজন হইবে। সংসার তোমায় যে জ্ঞান শিক্ষা দেয়, প্রেম শিক্ষা দেয়, পুণ্যার্জ্জনে সহায় হয়, তোমার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তোমার বল উদ্ভূত করিয়া দেয়, তাহা তুমি সামান্য মনে করিও না। সংসারের সহিত সংঘর্ষণে আসিয়া তোমাতে এই সকল উদ্ভূত হয় বলিয়া জানিও তুমি অসার হইতে সার, অনিত্য হইতে নিত্যধন সঞ্চিত করিতে সমর্থ হইয়া থাক।

দেখ সংসার এমন পরমোপকারক হইয়াও উহা কেমন মোহের কারণ হইয়া রহিয়াছে। অতি অল্পলোকই আছে যাহারা এই মোহের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে। অজ্ঞানতা ও মায়া এই মোহের নাম দিয়া পণ্ডিতগণ ইহার কতই নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু জানিও যাহা কিছু আমাদের নিকটে নিন্দনীয়, তাহা বাস্তবিক নিন্দনীয় নহে। সে সকলের সঙ্গে আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করা সমুচিত আমরা তাহাদের সঙ্গে সেরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করি না বলিয়া তাহারা সুখ দেওয়ার ছল করিয়া আমাদের ক্লেশোৎপাদন করে, এবং সেই ক্লেশের দ্বারা আমাদের চৈতন্য উৎপাদন করিয়া যাহার সহিত যে প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করা সমুচিত, সেই প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য আমাদি-

গকে প্রস্তুত করিয়া দেয়। প্রবৃত্তি বাসনা হইতে আমাদের মোহ উপস্থিত হয়, এই মোহ আমাদিগকে কাণ্ডাকাণ্ডবিবেকশূন্য করিয়া তুলে। এই কাণ্ডাকাণ্ডবিবেকশূন্যতা আমাদিগকে দুঃখে ক্লেশে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করে। দুঃখ ক্লেশ পরীক্ষায় পড়িয়া আমাদের মনে পরিতাপ উপস্থিত হয়, সেই পরিতাপে আমাদের কলুষবাসনা নিবৃত্ত হয়। কলুষবাসনা নিবৃত্ত হইলে নির্ম্মল বাসনা নির্ম্মল প্রবৃত্তি উদিত হইয়া আমাদিগকে জাগ্রৎ করিয়া তুলে, আমাদের ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া যায়, আমরা অসারের মধ্যে সার, অনিত্যের মধ্যে নিত্যের সাক্ষাৎকার পাইয়া কৃতার্থ হই। যত দিন এরূপ না হইতেছে, ততদিন মোহ অপনীত হইতেছে না, এবং এ মোহ যে আশ্চর্য্য মোহ, মোহ ভাঙ্গিবার পক্ষে নিগূঢ় উপায়,তাহা আমরা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, এ সংসারে ধনের আদর, ধনাগমের উপায় বিদ্যার আদর যত, তত তোমার আদর দেখিতে পাই না। স্বর্গের জন্য তুমি প্রয়োজন হইতে পার, কিন্তু সংসারের জন্য ধন ও ধনাগমের উপায়স্বরূপ বিদ্যা যখন নিতান্ত প্রয়োজন, তখন সংসারী লোকেরা এ সম্বন্ধে যে বড় ভুল করে তাহা মনে হয় না। তোমার এসম্বন্ধে মত কি?

বিবেক। আমার অভিধানে সংসার ও স্বর্গ, এ দুই ভিন্ন নহে; যাহাতে স্বর্গলাভ, তাহাতেই সংসারে সুখলাভ অনিবার্য্য। স্বর্গ ও সুখ এ দুই একপর্য্যায় শব্দ। যদি ধনে বাস্তবিক সুখ হয়, তবে ধন স্বর্গলাভের উপায় অবশ্য মানিতে হইবে। ধন অচল সামগ্রী, তাহার আপনার কোন সামর্থ্য নাই। যে ব্যক্তি ধনের ব্যবহার করে, তাহার চরিত্র ধন হইতে সুখ বা দুঃখ উভয়ই উৎপাদন করিয়া লয়। ধন অচল ও অসমর্থ, এজন্য আমি ধনকে ভাল বা মন্দ কিছুই বলি না। যাদৃশ চরিত্রবান্ ব্যক্তির হাতে ধন পড়ে, তদনুসারে ধন মন্দ বা ভাল বাড়াইবার পক্ষে সহায় এই মাত্র। কুচরিত্র লোকের হাতে অধিক ধন থাকিলে ধন দ্বারা কুচরিত্রতার উপযোগী নীচ বিষয় সকল সহজে সে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারে, এজন্য শীঘ্র শীঘ্র তাহার আত্মবিনাশের পথ খুলিয়া যায়, ইহাতে ধনের দোষ কি? সেই ধন সচ্চরিত্র বিবেকী ব্যক্তির হাতে পড়ুক, দেখিবে তদ্দ্বারা জনসমাজের প্রভূত উপকার হইবে, এবং সচ্চরিত্র বিবেকী ব্যক্তি ধনের প্রকৃত ব্যবহার করিয়া আরও সাধু উন্নতচরিত্র হইবেন। ধনকরী বিদ্যাও ধনের ন্যায় চরিত্রবান্ ও অচরিত্রবান্ ব্যক্তির হাতে পড়িয়া ভাল বা মন্দের সহায়তা করিয়া থাকে।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে এই বুঝিলাম যে সাধু ও উন্নত হইবার জন্যও ধনের প্রয়োজন। নির্দ্ধন দরিদ্র ব্যক্তি নিজের জীবিকার জন্য সদা উদ্বিগ্ন, সুতরাং আত্মার উন্নতিসাধনে তাহার অবকাশ কোথায়? তোমা অপেক্ষা পৃথিবীতে ধনের আদর তবে ঠিকই।

বিবেক। দেখ, আমি যাহা বলিলাম, তুমি তাহার বিপরীত অর্থ করিলে। আমি বলিলাম, বিবেকী সচ্চরিত্র ব্যক্তির হাতে ধন পড়িলে ধনের সদ্ব্যবহার দ্বারা তাঁহার সাধুত্ব ও উন্নতচরিত্রত্ব আরও বাড়ে, তুমি বলিলে ধন দ্বারা বিবেকিত্ব ও উন্নতচরিত্রত্ব হয়। ধনাগমের পূর্ব্ব হইতে যে ব্যক্তি বিবেকী ও সচ্চরিত্র নয়, তাহার হাতে ধন আসিলে সে সাধু ও সচ্চরিত্র হইবে কি প্রকারে? ধনের দ্বারা প্রবৃত্তি বাসনা চরিতার্থ করিবার সহজ উপায় হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি প্রথম হইতে বিবেকী সচ্চরিত্র নয়, ধন দ্বারা তাহার চরিত্রের হীনতা উপস্থিত হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। দরিদ্রের অন্ন চিন্তায় আত্মার উন্নতিসাধনে অবকাশ নাই, একথা মনে করা তোমার বিষম ভ্রম। অনেক ধনসম্পন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক দরিদ্রতা আলিঙ্গন করিয়া চরিত্রে ও সাধুত্বে সর্ব্বোপরি স্থান গ্রহণ করিয়াছেন ইহা কি তুমি অবগত নহ? ফল কথা এই, বাহিরের অবস্থা কিছুই নয়, মানুষের নিজ চরিত্রই তাহার সুখ ও দুঃখের কারণ। সর্ব্বাগ্রে চরিত্রবান্ হওয়া প্রয়োজন, চরিত্রবান্ হইলে আর সকলই সহজে হস্তগত হইবে। চরিত্রের বলে অতি দীনও উচ্চ অবস্থায় আরোহণ করে, চরিত্রের হীনতায় অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও অল্প দিনের মধ্যে অতি হীনাবস্থ হইয়া পড়ে; পৃথিবীতে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। চরিত্রের মূল আমি, ইহা যখন তুমি জানিবে, তখন ধন অধিক আদরের বিষয় বা আমি অধিক আদরের পাত্র, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আর তোমার কোন বাধা থাকিবে না।

প্রাপ্ত।

ব্রহ্মপরিচয়।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে এক দিন সায়ংকালে কোনও এক নগরে ব্রহ্মমন্দিরে একাকী বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি। পাপের জ্বালায় অস্থির হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিরূপে উদ্ধার পাইব? তিনি বলিলেন "আমার দাসত্বে জীবন সমর্পণ কর।" কোথায় কিরূপে দাসত্ব করিব, জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিলেন। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে আমার কনিষ্ঠা বিধবা ভগ্নীটীকে বাড়ী হইতে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আনয়ন করিয়াছি। বিষয় কর্ম্ম করিতে হইবে, বন্ধুরা তাহার যোগাড় করিয়া দিবার

জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। এ সময়ে এ কথা কাহার নিকট বলি, কেই বা সহানুভূতি করিবে? তখন আমার বয়স ২২ বৎসর মাত্র। ভয়ানক মানসিক সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। আমি তো প্রভুর বাধ্য দাস হই নাই, তাই নানা রূপ ওজর আপত্তি করিতে লাগিলাম। যখন আপত্তি করি তখনই মনকে তিনি ম্লান করিয়া দিতে লাগিলেন; যখন রাজি হই তখন তাঁহার প্রসন্নতা অনুভব করি। এইরূপে কিছুক্ষণ গেল। পরে প্রার্থনা করিলাম, প্রভো, তোমার অভিপ্রায় পালনের বল ও ক্ষমতা আমার নাই। আমি তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। এই প্রার্থনা করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। পর দিন স্নানান্তে সমবেত উপাসনার সময় আমার প্রার্থনাযোগে ইহা প্রকাশ হইল। উপস্থিত দুই জন বন্ধু ব্যতীত আর কেহ এ বিষয়ে সহানুভূতি করিতে পারিলেন না। প্রভু আমাকে তাঁহার দাসত্বে গ্রহণ করিলেন।

কুচবিহারবিবাহের সময় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আচার্য্যদেব কুচবিহারবিবাহকে বৈধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আদেশের মত প্রবিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদের একান্ত ভ্রান্তি। ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে এ শিক্ষা আমরা বহুদিন পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। উল্লিখিত ঘটনা কুচবিহার বিবাহের তিন বৎসর পূর্ব্বে ঘটিত ছিল।

ডেরাডুন নগরের পশ্চিমে তিন মাইল দূরে তপকেশ্বর নামে একটি স্থান আছে। হিমালয়ের পাদদেশ ধৌত করিয়া একটী পার্ব্বত্য নদী তথায় প্রবাহিত। নদী বিস্তৃত নয়, কিন্তু এত খরতর বেগে উন্মাদিনীর ন্যায় লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে যে তাহাতে পা ধরান কঠিন। নদীর পরপারে একটী গুহা আছে, সেখানে এক জন সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তখন তিনি সেখানে ছিলেন না। আমি ঐ গুহায় যাইবার মানসে বার বার নদীপার হইতে চেষ্টা করিতেছি, স্রোতের প্রাবল্য দেখিয়া আবার পশ্চাৎপাদ হইতেছি। এমন সময় আমাকে পথ দেখাইবার জন্য ভগবান্ একটি পাহাড়ী লোক লইয়া আসিলেন। সে যে পথে পার হইল আমি সেই পথে সহজে পার হইলাম, গুহার সম্মুখে একটি পাথরে উপবিষ্ট হইলাম। নিকটে জনমানব নাই, প্রাণ হরিদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইল। ক্ষণকালের মধ্যে প্রাণেশ্বর তাঁহার সুন্দর রূপ বিস্তার করিয়া প্রকাশিত হইলেন। কিছুকাল সেই রূপসাগরে প্রাণ নিমজ্জিত রহিল। সে রূপের তুলনা নাই, উপমা নাই, বাক্য তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। দেখিয়া ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। বার বার প্রাণনাথের সুন্দর চরণ চুম্বন করিলাম।

সাক্ষী

শ্রীবৈ——ঘোষ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

প্রাণযোগে পরিবারবন্ধন।

১ ভাদ্র রবিবার, ১৮১৮ শক।

উৎসবের পর উৎসব আসিতেছে; আবার আগামী রবিবারে এখানে উৎসব হইবে। এত উৎসব ভোগ করিয়া আমাদের কি হইল? আমরা উৎসবের জন্য প্রস্তুত কি না? ইহা আমাদের সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। উৎসবের জন্য প্রস্তুত নই, অথচ উৎসবে শরীর লইয়া উপস্থিত, ইহা কি উৎসব, না উৎসবের অবমাননা। বিগত মাঘোৎসবে আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা আমাদের জীবনের সম্পত্তি হইয়াছে কি না, ভাদ্রোৎসবে তাহার পরিচয় দিতে হইবে। এই গৃহে উৎসবে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, সেই লাভের ক্ষতি করিয়াছি কি বৃদ্ধি করিয়াছি, তাহার গণনা দেওয়ার সময় উপস্থিত। উৎসবে যাহা শিখিয়াছি, এ কয়েক মাস তাহার অভ্যাস করিয়াছি, আর কোন দিন উহা জীবন হইতে চলিয়া যাইবে না, জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিবে, ইহা না হইলে আর একটি উৎসব সম্ভোগ করিবার অধিকার জন্মিবে কেন? উৎসব তো আসিল, উৎসব তো আর বন্ধ থাকিবে না, কিন্তু আজ দেখিতে হইতেছে, উৎসবের জন্য আমরা কয় জন প্রস্তুত হইয়াছি। কি হইলে আমরা উৎসবের জন্য প্রস্তুত বিশ্বাস করিব? তখনই বিশ্বাস করিব আমরা প্রস্তুত, যখন দেখিব যে, আমরা ঈশ্বরের সমীপে সকলের সঙ্গে এক না হইয়া কখন যাই নাই। এখনও যদি আমাদের মধ্যে শত্রুমিত্রের ভাব থাকে, বুঝিতে হইবে, আমরা উৎসবের জন্য প্রস্তুত নই। সকলের সঙ্গে কি উপায়ে এক হইতে পারা যায় গত উৎসবে কেবল বলা হইয়াছে তাহা নহে, তাহার অতি পূর্ব্বে মিলনের মূলসূত্র বলিয়া উহা এস্থান হইতে ঘোষিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি মনে করে আমি অতি সাধু ধার্ম্মিক আমাতে কোন পাপ নাই, সে ব্যক্তি যে অপর নরনারীর সঙ্গে আপনাকে এক বলিয়া বিশ্বাস করিবে, ইহা কখন সম্ভব নয়। যেখানে পাপী সাধু বিচারের উপরে মিলন করিবার জন্য যত্ন, সেখানে সে যত্ন কোন কালে সফল হইবার নহে। আমি আমার নিজ চক্ষে সাধু ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি, তাহা বলিয়া কি আমার প্রতিবেশী আমায় সাধু ধার্ম্মিক বলিয়া স্বীকার করিবে, না আমি আমার যে সকল দোষ দেখিতে পাই না, প্রতিবাসীর চক্ষে সে সকল দোষ অপ্রকাশিত থাকিবে? যাঁহার চক্ষু আমাদের অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিতেছে, সে চক্ষুর নিকটে কি আমরা আশা করিতে পারি, কোন কালে আমরা ধার্ম্মিক সাধু বলিয়া পরিগণিত হইব? অথচ আমার মনে যদি সাধুত্বের অভিমান থাকে, আমি যাহাকে পাপী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহাকে কখন একপরিবারভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ব্রাহ্মণ কি কখন চণ্ডালের সহিত মিলিতে পারেন, না চণ্ডাল ব্রাহ্মণের

সহিত মিলিতে সাহস করিতে পারে? চণ্ডাল অন্তেবাসী, সে গ্রামের বাহিরে বাস করে। ময়লা জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার জন্ত যখন তাহাকে গ্রামের ভিতর আসিতে হয়, তখন তাহাকে চণ্ডাল আসিতেছে, চণ্ডাল আসিতেছে বলিয়া চিৎকার করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়। কি জানি বা কোন ব্রাহ্মণের গায়ে তাহার ছায়া স্পৃষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহাকে আগে হইতে সাবধান করিয়া চলিতে হয়। চণ্ডাল তো আপনাকে চণ্ডাল জানে, সে তো ময়লা জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া লইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু যে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ঘৃণা করিল, অস্পৃশ্ত মনে করিয়া তাহার ছায়া মাড়াইল না, তাহাদের হৃদয় কি তাহাতে অপরিষ্কৃত হইল না? এক জন মানুষ আর এক জনকে ঘৃণা করিল, অথচ সে ঈশ্বরের কর্ত্তৃক পূর্ব্ববৎ গৃহীত হইল, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?

পাপী তাপী সকলের সঙ্গে আমাদের একতা স্থাপন করিতে হইবে, সকলকেই ঈশ্বরের পরিবারমধ্যে গণ্য করিতে হইবে, ভগবানের আমাদের প্রতি এই বিশেষ আদেশ। আমরা সকলের সঙ্গে এক হইয়া এক পরিবারের লোক হইয়া ঈশ্বরের পূজা করিব, তবে আমাদের পূজা তিনি গ্রহণ করিবেন, ইহা কি ঈশ্বরের মুখে শুনি নাই? সকলের সঙ্গে মিল করিয়া পরে আমরা পূজার অধিকারী হইব, আমাদের প্রতি ভগবানের এ আদেশ কি নিতান্ত কঠোর নহে? যাহাদের সঙ্গে রুচিতে মিলে, মতে মিলে তাহাদের সঙ্গে বরং মিল করা যাইতে পারে, যাহাদের সঙ্গে ইহার কোনটিতে কোন দিন মিলে না, তাহাদেরে সঙ্গে লইয়া তবে ঈশ্বরের সন্নিধানে গমন করিব, ইহা কোন দিন হয় নাই, হইতে পারে না। যখন চিন্তা, মত, ভাব, ইচ্ছা এবং কার্য্য ইত্যাদি সম্পর্ক চিরকালই মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ থাকিবে, এবং সেই প্রভেদ থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত; তখন সকলের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইবে, ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভিপ্রায়ের বিরোধী এ কথায় আমরা পূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? কে কবে সকলের সঙ্গে মিল করিয়া তাহার পর পূজা করিয়াছে? যাহাদের সঙ্গে মিলে, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পূজা করাই তো সর্ব্বত্র ব্যবস্থা। এত দিন এত সম্প্রদায় এই জন্যই তো হইল, চিন্তা মত ভাব ইহাদিগতে প্রভেদ থাকিবেই, ঐকমত্যের উপরে পরিবার স্থাপন করিতে গেলে শত সহস্র সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবে, ইহা যখন নববিধানকেও স্বীকার করিতে হইতেছে, তখন সকলের সঙ্গে এক হইয়া তবে ঈশ্বরের পূজা করিতে হইবে নববিধানবাদীর সম্বন্ধে এ বিধি কি প্রকারে হইতে পারে?

গত কয়েকবার হইতে প্রাণযোগের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে, সেই প্রাণযোগে সকলের সঙ্গে এক হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, এক বার ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মত, রুচি, ভাব এসকল বাহিরের ব্যাপার, এগুলি মানুষের জীবনের উপরিভাগে থাকে, এক বার বাহির হইতে ভিতরে যাও, প্রাণের মূলে গিয়া উপস্থিত হও, দেখ সেই মূলদেশে কে বসিয়া আছেন? এই প্রাণের মূলে প্রাণস্বরূপ ঈশ্বর কি বিদ্যমান নহেন? তিনি প্রাণের মূলে প্রাণ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি কি কেবল তোমাতে, আমাতে, না সকলেতে? তিনি প্রাণের মূলে প্রাণ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি কি ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ করেন? চণ্ডাল চলিতেছে, বলিতেছে, কার্য্য করিতেছে; তাহার চক্ষুর নিমেষ উন্মেষ নিষ্পন্ন হইতেছে, শোণিত বহিতেছে, নিশ্বাস পড়িতেছে, এসকল কি সেই প্রাণস্বরূপ ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া হইতেছে? কেবল কি তাহার শারীরিক প্রাণ এই সকল নির্ব্বাহ করিতেছে, না সেই প্রাণের সঙ্গে যিনি প্রাণের প্রাণ তাঁহার যোগ আছে বলিয়া শারীরিক প্রাণ এ সকল কার্য্য করিতে পারিতেছে? প্রাণ সমুদায় চেষ্টার মূল, অবিচ্ছেদে ক্রিয়াশীল বায়ু সর্ব্বদা বহমান, এজন্য প্রাচীন কালের লোকেরা প্রাণকে বায়ুর সঙ্গে এক করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু না প্রাণ, না বায়ু, সকলের প্রাণ যিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া, কখন চেষ্টাশীল হইতে পারে? সমুদায় জীব সমুদায় জগৎ সেই প্রাণের প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রাণচেষ্টার সম্ভাবনা কোথায়? এই প্রাণের প্রাণে কি আমরা সকলের সঙ্গে এক নই? এই প্রাণের প্রাণ কি সূত্র হইয়া সকলকে একত্র বাঁধিয়া রাখেন নাই?

নিত্য উপাসনা কেন? উপাস্যের মত উপাসক হইবেন, তাহারই জন্য কি নহে? যিনি প্রাণের প্রাণের উপাসনা করেন, তিনি যদি তাঁহার মত না হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার উপাসনা কি বিফল হইল না? প্রাণস্বরূপ ঈশ্বর যদি আচণ্ডাল সকলের সঙ্গে নিয়ত মিলিত থাকিয়া তাহাদের প্রাণক্রিয়া সকল প্রতিনিমেষে নিষ্পন্ন করাইতে লাগিলেন, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে বিদ্বেষ করিলে কি সেই প্রাণের প্রাণের প্রতি বিদ্বেষ করা হইল না? আমরা যদি তাহাদের হৃদয়ে ব্যথা উৎপাদন করি, বিবিধ প্রকারে উৎপীড়ন করি, প্রাণের অব্যাহত ক্রিয়ার যাহাতে ব্যাঘাত হয় এরূপ কোন অনিষ্ট সাধন করি, তাহা হইলে সে অত্যাচার কি সেই প্রাণের প্রাণের প্রতি নহে? আমাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রাণের প্রাণকে কোন কালে স্পর্শ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু তিনি যাহাদের প্রাণের প্রাণ হইয়া আছেন, তাহাদিগকে আঘাত করা উৎপীড়ন করা তাঁহাকে আঘাত ও উৎপীড়ন করার সদৃশ কি নহে? যখন উৎপীড়নে তাহাদের অশ্রুধারা নিপতিত হয়, ঘোরতর ব্যথায় চিৎকার করে, তখন তাহার মধ্যে কি প্রাণের ক্রিয়া বিদ্যমান নাই? যেখানে প্রাণের ক্রিয়া, সেইখানেই প্রাণের প্রাণের ক্রিয়া। যাতনা দুঃখের কারণ হইয়া তুমি প্রাণের যে দুঃখকর ক্রিয়া উপস্থিত করিলে তাহাতে তুমি আপনি প্রাণের প্রাণের নিকটে নিরপরাধী হইবে কি প্রকারে? তুমি যে অপরাধী, জানিও, সেই রোদন, আর্ত্তনাদ, ব্যথাই তাহা ব্যক্ত করিতেছে। কোন এক ব্যক্তির রোগ শোক বিপদের কারণ যদি আমরা হই, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমরা প্রাণের ক্রিয়ার বৈষম্য উৎপাদন করি। এরূপ বৈষম্য প্রাণের প্রাণের অপ্রিয় কার্য্য, ইহা আমরা অস্বীকার করিব কি প্রকারে?

অপর ব্যক্তির সঙ্গে তোমার বুদ্ধিগত রুচিগত ভাবগত মতগত সহস্র ভেদ হউক না কেন, তুমি কি প্রাণযোগে তাঁহার সহিত এক হইয়া নাই? তুমি তাঁহার সঙ্গে বিচার করিতে যাও, তর্ক করিতে যাও, একত্র কার্য্য করিতে যাও, দেখিবে তোমাতে তাঁহাতে কত প্রভেদ। পদে পদে বিরোধের ব্যাপার উপস্থিত হইবে। এ সকল বিষয়েতে কখন যে তুমি তাঁহার সহিত এক হইবে, এ বিশ্বাস তুমি অনেক সময়ে হৃদয়ে স্থানও দিতে পারিবে না। এই সকল অমিল ও বিরোধের ভিতরেও প্রাণের ক্রিয়াতে যে প্রাণের প্রাণ প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাতে কি তুমি সংশয় করিতে পার? বাহিরে অমিল ও বিরোধ, ভিতরে প্রাণস্বরূপে তোমাতে ও বিরোধী ব্যক্তিতে একতা, ইহা দেখিয়া তুমি কি তোমার তীব্রভাব অসদ্ভাব সংযত করিবে না? বিরোধী ব্যক্তির নিমেষ উন্মেষ, ওষ্ঠাধর পরিচালন, হস্তসঞ্চালন, বিবিধ অঙ্গচেষ্টা, এসকল প্রাণক্রিয়া যখন চলিতেছে, তখন তিনি তোমার নিকট হইতে প্রাণের প্রাণকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবেন কি প্রকারে? তাঁহার পাপাচরণ, অপ্রিয় ব্যবহার, মূঢ়তা, পুণ্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, ও জ্ঞানস্বরূপকে তোমার দৃষ্টিসন্নিধান হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তিনি যে তোমার নিকট হইতে প্রাণস্বরূপকে কোন কালে আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। তুমি বলিবে, তাঁহার দেহ হইতে যখন শারীরিক প্রাণ নিঃসৃত হইয়া যাইবে, তখন তো আর তাঁহার সহিত ঐক্যবন্ধন রহিল না? যদি এরূপই হইল, তাহা হইলে অল্প কয়েক দিনের জন্য অস্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপন করিবার প্রয়োজন কি? তুমি যখন প্রাণের মূলে প্রাণের প্রাণকে দেখিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছ, তখন কোন কালে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে, ইহা ভাবিতেছ কেন? প্রাণের প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যাহা আছে, তাঁহা হইতে যাহার উৎপত্তি ও স্থিতি, তাহার কি কোন কালে বিনাশ আছে?

আরাধনার প্রথম মন্ত্রে প্রাণের প্রাণের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। এই প্রাণের প্রাণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যদি আমরা প্রাণযোগে সকল নরনারীর সঙ্গে এক না হই তাহা হইলে আর আরাধনায় অগ্রসর হওয়া ব্যর্থ উদ্যম। আরাধনার আরম্ভমন্ত্রের লভ্য যোগ হইতে বঞ্চিত থাকিলে নববিধানে যে মহাযোগ চরম প্রাপ্য, তাহা সাধকের সম্বন্ধে অসম্পন্ন রহিল, তাঁহার জীবনে নববিধান মূর্ত্তিমান্ হইল না। আরাধনার প্রথম সোপানে সকলের সঙ্গে এক হইয়া সাধক যতই অগ্রসর হইবেন, ততই অন্যান্য স্বরূপের অনুরূপ ব্যক্তিগণের সঙ্গে তাঁহার ঘনতর যোগ উপস্থিত হইবে। প্রাণযোগে সকল নরনারীর সঙ্গে প্রাণস্বরূপে এক হইলাম এইটি সাধারণ যোগ; অবশিষ্ট জ্ঞানযোগাদিতে জ্ঞানী প্রভৃতির সঙ্গে যে যোগ, উহা বিশেষ যোগ। সাধারণ যোগে সকলের সঙ্গে এক হইতে না পারিলে বিশেষ যোগের ভূমিতে কখন আরোহণ করিতে পারা যায় না। সাধক যাঁহাদের সঙ্গে প্রথমতঃ সাধারণ যোগে সংযুক্ত হইলেন, সময়ে তাঁহাদেরই সঙ্গে আবার বিশেষ যোগে সংযুক্ত হইতে পারা যায়। এই সাধারণ যোগের ভূমি হইতে আমরা কোন একটি সামান্য নরনারীকেও অন্তরিত করিয়া রাখিতে পারি না। অন্যান্য যোগের পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এ যোগে কোন অন্তরায়ের সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান প্রেম পুণ্য অনেক ব্যক্তিতে প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করে, সুতরাং প্রযত্ন বিনা তত্তদ্যোগে অপরের সহিত এক হওয়া কঠিন। অনেক সময়ে এমন সমুদায় আচার ব্যবহার প্রকাশ পায়, যাহাতে যোগ হইয়াও কাটিয়া যায়, কিন্তু এই প্রাণযোগ অন্তরায়শূন্য। প্রাণের ক্রিয়া যেমন সর্ব্বাবস্থায় চলিতেছে, তেমনি তন্মধ্যে প্রাণের প্রাণকে দর্শন করিবারও কোন বাধা উপস্থিত হয় না। অতএব নববিধানের উচ্চ যোগভূমিতে আরোহণ করিবার যাঁহাদের অভিলাষ আছে তাঁহাদিগকে প্রাণযোগে যোগী হইতে হইবে। এই যোগে সমুদায় নরনারীর সহিত এক পরিবার হইয়া ঈশ্বরের চরণতলে সাধক উপস্থিত হউন, অবশিষ্ট সমুদায় সহজে সিদ্ধ হইবে।

উপাসনাবাস।

ঈশ্বরের মুখে সত্যশ্রবণ।

২৯ ফাল্গুন, রবিবার ১৮২০ শক।

পৃথিবীর লোকদিগের সত্যের প্রতি সমাদর কোথায়? তাহাদের সত্যের প্রতি অনুরাগের সম্ভাবনা নাই। সত্য কাহাকে বলে? একজন একথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি উত্তরের প্রতীক্ষা করেন নাই। আর কেহ জিজ্ঞাসাও করে না সুতরাং উত্তরের প্রতীক্ষাও করে না। যে সত্য আমি জানি তাহার প্রতি সমাদর হইবেই হইবে। পৃথিবীর লোক নানা প্রকার সত্যের কথা বলে; কিন্তু সত্য তাহারা বুঝিয়াছে কি না এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য। তাহাদের কার্য্য দেখিয়া মনে হয় তাহারা কিছুই বোঝে না। তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যে দেখি প্রতিমুহূর্ত্তে তাহারা সত্যকে ভঙ্গ করিতেছে। শুধু তা নয় পৃথিবীর ধন মান মর্য্যাদাকে তাহারা সত্য অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর মনে করে। সত্য রক্ষা করার জ্ঞান তাহাদে আছে কি না জানি না। বেদবেদান্ত পাঠ করিলাম, কতপ্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানাদি চর্চ্চা করিয়া যশ লাভ করিলাম, কত লোকের প্রশংসা শুনিলাম, কিন্তু সত্যের জন্য দেহের শোণিতপাত করিতে প্রস্তুত আছি কি না, আত্মাকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে আত্মা এ বিষয়ে অনুকূল উত্তর প্রদান করে না। তবে সত্যের সমাদর কোথায়? কত দেখিলাম কিন্তু সত্যের জয়ত দেখিলাম না। তবে লোকে কত দিন এইরূপে থাকিতে পারে? জীবনের উপরে সত্য বল প্রকাশ করিতে পারে না কত দিন; যতদিন না সেই সত্য ঈশ্বরের নিকট হইতে আসে। মানুষের কাছে কোন সত্য শুনিলে সে সত্য হৃদয়জম হয় না। সত্যের জন্য যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না। আমাদের সত্য গ্রন্থে। বিজ্ঞান বলে ইহা সত্য, সুতরাং ইহা সত্য। কিন্তু তাঁহাদের সত্য জীবনগত।

তাঁহারা বলেন না যে গ্রন্থেতেই সত্য। তাঁহারা যে সত্য প্রাপ্ত হন তাহা ঈশ্বরের নিকট হইতে আইসে, এবং সেই সত্যই সত্য। ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সত্যের অবতারণা হয় তাহার অবমাননা করিও না। এ সত্যের অবমাননা করিলে দেবতাগণের নিকট অপরাধী হইতে হইবে। অতএব সত্য যখন অবতীর্ণ হয় তখন ঈশ্বরের নিকট হইতে হয়। যত দিন ঈশ্বর সেই সত্য না শুনান মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও সে সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের নিকট হইতে সেই সত্যের অপমান হইয়াছে। বিধান কি? কেবল কতকগুলি সত্য যাহা ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে। বিধান ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী। ইহা মানুষের মনগড়া জিনিষ নয়, ইহা মানুষের হাতে নাই, এ বিশ্বাস না করিলে কখনও লোকে ইহার জন্য প্রাণ দিতে পারে না। ঈশ্বর পরিত্রাণের জন্য অনন্ত উন্নতির জন্য যাহা বলিয়াছেন তাহার অবমাননা করিও না। মানুষের বাক্য এ কাণ দিয়া শুনি ও কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সত্য আইসে তাহাও যদি এইরূপ হয় তবে তাহা তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে বলি কি প্রকারে? যদি তাহার জন্য প্রাণ দিতেই না পারিলাম, তবে কি প্রকারে বলি যে আমি এই সত্য ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি? যদি সেই সত্য রক্ষা করিতে সংসারের সুখসচ্ছন্দতাতে জলাঞ্জলি দিতে না পারি, তবে কি বলিতে পারি যে ইহা ঈশ্বরের বাণী? যখন দেখিব যে, সেই সত্যের জন্য ধন মান সব ত্যাগ করিতে পারিব, তখন জানিব যে, তাহা ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছে। যখন প্রাণ এই সত্যের জন্য ব্যাকুল হইবে, তখন জানিব ইহা ঈশ্বরেরই বাণী। লোকের নিন্দায় যখন প্রাণ সেই সত্য হইতে বিচলিত হইবে না, পৃথিবী হইতে তাড়িত হইলেও যখন সত্য ত্যাগ করিতে পরিব না, তখনই জানিব বিধান আসিয়াছে, মানুষের নিকট হইতে নয় ঈশ্বরের নিকট হইতে। তাহার জন্য যখন হাসিতে হাসিতে জীবন দিতে পারিব তখনই জানিব ইহা ঈশ্বরের বাণী। জাহাজে আগুন লাগিয়াছে, ক্যাসাবিয়ানকারকে পিতা যেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে আজ্ঞা করিয়াছেন সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পিতার দেহ অগ্নিসাৎ হইয়াছে, ক্যাসেবিয়ান্‌কার তাহা জানিতে পারেন নাই, অগ্নি তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তিনি চিৎকার করিয়া পিতাকে ডাকিতেছেন, আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'পিতা, আমি কি এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারি?' কোন উত্তর নাই। ক্যাসাবিয়ান্‌কার অটলভাবে দণ্ডায়মান। অগ্নি তাঁহাকে গ্রাস করিল, অথচ তিনি পিতার আজ্ঞা না পাইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন না। যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়াছেন "এই গণ্ডীর বাহিরে তুমি যাইতে পারিবে না, তোমার যত কষ্ট যন্ত্রণা কেন হউক না।" যদি বলি "পিতা, আজ্ঞা কর যাই।" পিতা নিস্তব্ধ। ক্যাসাবিয়ান্‌কারের পিতাকে অগ্নিতে গ্রাস করিয়াছিল, কিন্তু অনন্ত পিতাকে অগ্নি গ্রাস করিতে পারে না, তথাপি তিনি নিস্তব্ধ; শত ক্রন্দনেও অবিচলিত। সহস্র বার যদি বলি "পিতঃ, এই বিধি একটু কমাইয়া লও," তবুও নিস্তব্ধ। তিনি একবার যাহা পৃথিবীতে নিখাত করিয়াছেন, তাহা আর অন্যথা হইবার যো নাই। ঈশা ক্রুশে বিদ্ধ হইবার পূর্ব্বদিন সারারাত্রি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথা শুনিলেন না। অবশেষে যখন ঈশা বুঝিলেন পিতারই ইচ্ছা, তখন হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিলেন। সত্যের জন্য প্রাণ দান এইরূপ। যে বিশ্বাসী সন্তান ঈশ্বরের এই বাণী শ্রবণ করিয়াছেন তিনি অকাতরে প্রাণ দিতে পারেন। কমলকুটীরে কত পাগল আসিত, বলিত ঈশ্বরের বাক্য শুনিতেছি। কত আপন মনে হাসিত কাঁদিত কত কি করিত। তাহারা প্রতি মুহূর্ত্তে আদেশের কথা শুনিত। বিশ্বাসীর পক্ষে এই আদেশ প্রাণের কথা, ভগবানের কথা। ভগবান্ যখন হৃদয়ে আবির্ভূত হন তখন মানুষের এত বল হয় যে, সে অনায়াসে হিমালয়কেও স্থানান্তরিত করিতে পারে। পৃথিবীর লোক কত যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু সে কিছুতেই ভীত নহে। অনন্ত ঈশ্বর যাহা বলিলেন তাহা পালন জন্য প্রাণ দিব না, অথচ বলিব আমি আদেশ শুনিয়াছি, ইহা অসম্ভব। অতএব দেখিতে হইবে প্রত্যেক সত্য কাহার নিকট হইতে আসিতেছ? পল এই বাণী শ্রবণ করিলেন এবং শ্রবণ করিয়াই আর সল থাকিলেন না একেবারে ধর্ম্মাত্মা পল হইয়া গেলেন। ঈশ্বরের বাণী যে শ্রবণ করে তাহার স্বাধীনতা চূর্ণ হইয়া যায়। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন সেই বাণী শ্রবণ করিয়া যেন আমাদেরও স্বেচ্ছাচারিতা বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং লোকের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া নহে, পাঠ করিয়া নহে, কিন্তু গোপনে ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা শ্রবণ করিব, জীবনে যেন তাহা দেখাইতে পারি। যে সত্য তিনি কৃপা করিয়া এই বিশেষ বিধানে আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন সেই সত্যের জন্য আবশ্যক হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত যেন বিসর্জ্জন করিতে পারি এবং সেই সত্য যেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সপ্রমাণ করিতে পারি, তাঁহার চরণে আমরা এই ভিক্ষা করিতেছি।

সংবাদ।

বিগত ৩ চৈত্র বৃহস্পতিবার স্বর্গগত বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস বাহাদুরের শ্রাদ্ধক্রিয়া চট্টগ্রামে তাঁহার আবাসগৃহে যথোচিত আয়োজনে সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, গৌরগোবিন্দ রায়, ললিতামোহন রায় এবং ঢাকা হইতে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় এবং মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসিয়াছিলেন। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় এবং গৌরগোবিন্দ রায় উভয়ে মিলিতভাবে উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত ভাই ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ও গৌরগোবিন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইয়া অধ্যেতার কার্য্য করিয়াছিলেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণেতে শ্রাদ্ধসভা শোভিত হইয়াছিল। দানের বিবিধ সামগ্রী মধ্যে

স্বর্গগত ব্যক্তি যে সকল ফল ভালবাসিতেন সেই সকল দূরতর স্থান হইতে অতি যত্নের সহিত প্রচুর পরিমাণে আনীত হইয়াছিল। আবাসগৃহের সম্মুখভাগে ভস্ম সমাহিত হইয়াছে; সময়ে তদুপরি স্তম্ভ স্থাপিত হইবে। শ্রাদ্ধের পরদিন কাঙ্গালী বিদায় হয়। তত্রত্য অধিবাসিগণের যত্নে শুক্রবার সায়ঙ্কালে উপাধ্যায় চট্টগ্রাম হাই স্কুলে যোগবিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। শ্রোতৃবর্গ অতি মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। যোগ স্বাভাবিক এই বিষয়টি বক্তৃতায় ভাল করিয়া বিবৃত হয়।

১২ চৈত্র শনিবার ঢাকা কলেজের অন্যতর প্রোফেসর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র "আমাদের জীবন" বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। একালে সমগ্র আত্মার উন্মেষসাধন নৈতিককর্ত্তব্য-বিজ্ঞানের চরমলক্ষ্য হইয়াছে। এই উন্মেষসাধন কেবল জ্ঞান-যোগে নয়, কেবল ভক্তি প্রেমযোগে নয় ও কেবল কর্ম্মযোগে নয়, কিন্তু সমগ্র মন সমগ্র জীবন ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সাধিত হইয়া থাকে। নববিধানের এই উচ্চ সত্য আত্মাকে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় করিবার পক্ষে যে নৈতিককর্ত্তব্যবিজ্ঞানের মত আছে তাহার কত উপযোগী, বক্তৃতায় তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বর্ণারপুরে উৎসবোপলক্ষে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দরভাঙ্গা, গয়া ও বাঁকীপুরে প্রচার করিয়া বিগত শনিবার কলিকাতায় পঁহুছেন। শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবন্ধন রবিবারে সামাজিক উপাসনার কার্য্য তিনি নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। গ্রীষ্মপ্রভাবে রজনীতে তাঁহার নিদ্রা হয় না, অগত্যা অদ্যই তিনি করসিয়ঙ্গে গমন করিয়াছেন।

আমাদিগের বন্ধু শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় এজেণ্ট হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট সকলে ওর্য়ার্ল্ড এবং নিউ ডিস্পেন্সেসন, ধর্ম্মতত্ত্ব ও মহিলার মূল্য দিয়া রসিদ লইবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয় ভাষ্যের যাঁহারা গ্রাহক হইবেন তাঁহারাও তাঁহার নিকট টাকা দিয়া রসিদ লইবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয় ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ১ম খণ্ড নিঃশেষিত হওয়ায় পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইয়াছেন তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র ২য় ও ৩য় খণ্ড দেওয়া হইয়াছে, ১ম খণ্ড মুদ্রিত হইলেই পাঠান হইবে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ৪র্থ খণ্ড এক্ষণে যন্ত্রস্থ। যাহাতে গ্রাহকগণ শীঘ্র শীঘ্র উহা পাইতে পারেন তদ্বিষয়ে যত্ন করা হইতেছে। নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না, কতদিন পরে উহা সকলের হস্তগত হইবে।

প্রেরিত।

বিনীত প্রণাম

বিধান পতি বিধাতার কৃপায় এখানে সম্প্রতি একটি বিধান আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। বহুকাল হইতে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় এ অঞ্চলে বিধানপ্রচারে ব্রতী আছেন, এবং শ্রদ্ধের ভাই বলদেব নারায়ণ ও ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীও অনেক দিন যাবৎ এ প্রদেশে সমগ্র শক্তির সহিত বিধান প্রচার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এতদিন তাঁহারা স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। এখন সময়ের অভাবানুযায়ী এবং বিধাতার ইঙ্গিতক্রমে, পরস্পর মিলিত হইয়া সমবেত ভাবে বিধানের জয় ঘোষণা এবং দেশের সেবা করিবার জন্য সম্মিলিত হইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া, বিগত ১২ই মার্চ্চ রবিবাসরে বিধানাশ্রম নামে একটি প্রচার আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। অতি গম্ভীরভাবে এই শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৯টার সময় (বেহার ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রালয়ে) উপাসনা স্থল পুষ্পমালায় সুসজ্জিত হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় হিন্দীতে উদ্বোধন করিয়া শুভানুষ্ঠানের সূচনা করিলেন। ভাই বলদেব নারায়ণ আরাধনাদি সম্পন্ন করেন। অনন্তর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় হিন্দীতে একটী হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করিয়া শান্তিবাচন করিলেন। অনন্তর সমস্বরে ব্রহ্মস্তোত্র পাঠ শেষ হইলে, শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় আশ্রমের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে ইংরাজিতে একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, এবং ভাই বলদেব নারায়ণ তাহার উর্দু অনুবাদ ও ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক একটী হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা হয়। উপাসনান্তে ভিক্ষাপাত্রে কতিপয় ব্রাহ্ম ও সাহানুভূতিকারী বন্ধু কর্ত্তৃক দান প্রদত্ত হয়। অনুষ্ঠানের আদ্যোপান্ত অতি গম্ভীর ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। উপাসনা সঙ্গীতাদি খুব জমাট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। স্থানীয় কতিপয় উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত বেহারী বঙ্গালী ও মুসলমান ভদ্রলোক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এবংএই উপলক্ষে গয়া, মজফ্ফরপুর, খগোল ও ছাপরা হইতে কতিপয় বন্ধু সমাগত হইয়াছিলেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়। তদনন্তর কিয়ৎকাল সৎপ্রসঙ্গ করিয়া সকলে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করেন। মফঃস্বলস্থ বন্ধুগণের অনেকেই ছিলেন, তাঁহারা সায়ংকালে সামাজিক উপাসনায় যোগদান করিয়া পরদিন স্ব স্ব কার্য্যস্থানে গমন করেন।

উপসংহারে বিধাতার চরণে এই প্রার্থনা যে তিনি দুঃখী বিহার-ভূমিকে স্বীয় প্রেমশালার জন্য মনোনীত করুন, এবং এ প্রদেশের অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন নরনারীদিগের মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিন। পুরাকালে এখানে যে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল—যে অগ্নি এক সময়ে সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছিল—সেই ব্রহ্মাগ্নি পুনরায় প্রদীপ্ত করিয়া এই মৃতপ্রায় জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করুন, এবং যাঁহারা তাঁহার রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃপাবলে বলীয়ান্ করুন। আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ হয়!

বাঁকিপুর
বেহার ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১শে মার্চ্চ, ১৮৯৯

একান্ত অনুগত দাস
গণেশ প্রসাদ।

নিম্নলিখিত দাতৃগণ দান করেন :—

বাবু রেওয়ালাল (গয়া) ২৲, বাবু ব্রজবংশী সহায় ২৲, বাবু দর্শনলাল ।৵০, বাবু হুকুমচন্দ্র লাল ২৲, বাবু বেচুনারায়ণ লাল ২৲, বাবু শ্রীরঙ্গবিহারী লাল ১৲, বাবু গিরিজাপ্রসাদ ১৲, বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ দাস ৫৲, মেঃ বিঃ এনঃ দাস ২৲।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ১৭ই চৈত্র কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

REISTERED No C. 37

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ। ৭ সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৮২১ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে হৃদয়েশ্বর, তুমি সকল নরনারীর হৃদয় অধিকার করিয়া স্থিতি করিতেছ। তাহাদের হৃদয়ের উপরে তোমা ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নাই। যদি আমরা তোমার অধিকার হইতে তোমায় বঞ্চিত করি, তাহা হইলে আমরা কখন নিরপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে পারি না। আমাদের প্রবৃত্তিবাসনাকে আমাদের হৃদয়ের উপরে অধিকার দিলে যে অপরাধ, প্রবৃত্তিবাসনার প্ররোচনায় অপরের হৃদয়ে তাদৃশ প্রবৃত্তি বাসনা উদ্দীপন করিয়া তাহাদিগকে অধীন করিবার জন্য যত্ন করা তদপেক্ষা আরও গুরুতর অপরাধ। হে প্রভো, আমাদিগকে ঈদৃশ অপরাধ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা কর। আমরা তোমার অনুগত দাস হইয়া, তোমার চরণে হৃদয় মন প্রাণ বিক্রয় করিয়া আমাদের নিজ দৃষ্টান্তে অপরেও যাহাতে তাহাদের হৃদয় মন প্রাণ তব চরণে বিক্রয় করিতে পারে, তজ্জন্য সহায় হইতে পারি, কিন্তু তাহাদের হৃদয়াপহারক হইতে পারি না। যদি তাহাদের হৃদয় তোমার না হইয়া আমাদের হয়, তাহা হইলে উচ্চতম বিষয়ে সহায় হইতে গিয়াও আমাদের অপরাধ উপস্থিত হইল, এবং এ অপরাধে আমাদের নিজেরও পতনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল। আমাদের ও অপরের হৃদয় তোমারই, তোমা ভিন্ন আর কাহারও নহে, ইহা যেন আমাদের সর্ব্বদা স্মরণে থাকে। আমরা যেন নিয়ত এরূপ সাবহিত ভাবে কার্য্য করি যে, কেহ আমাদিগকে হৃদয় না দিয়া তোমাকেই হৃদয় দান করে। আমরা তোমারই গুণের কথা বলিব, তোমার আশ্রয় বিনা কাহারও কল্যাণ নাই, ইহাই ভাল করিয়া সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিব, আমরা যে কিছুই নই, আমাদের যাহা কিছু সকলই তোমার জন্য, আমরা কাহারও কিছু করিতে পারি না, তুমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু না করিলে আমরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, ইহা সর্ব্বদা লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে যত্ন করিব। যাদৃশ সম্মাননা ও ভক্তিতে তোমার প্রাপ্য স্বয়ং গ্রহণ করা হয়, তাদৃশ ভক্তি ও সম্মান বিষবৎ আমরা দূরে পরিহার করিব। লোকের দৃষ্টি আমাদের উপরে বদ্ধ না থাকিয়া তোমারই উপরে স্থির ভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয়, সেই সকল উপায় অবলম্বন করিব। আমরা যদি হৃদয়ের সহিত অভিলাষ করি, কেহ যেন আমাদিগকে হৃদয় দান না করেন, তাহা হইলে

তুমি আমাদিগকে এ বিষয়ে স্বয়ং সাহায্য করিবে। হে দেবাদিদেব, তাই তব পাদপদ্মে ভিক্ষা করি, তোমার বর্ত্তমান বিধানে সকল লোক তোমায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে হৃদয় দান করিবেন, এই যে তোমার ব্যবস্থা, সে ব্যবস্থার যাহাতে কোন প্রকারে আমাদের দ্বারা ব্যতিক্রম না হয় তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা পরহৃদয়াপহারী চোর হইব না, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

অপরের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কি ?

অপরের সঙ্গে আমাদের কোথায় মিল আছে ইহা দেখা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রভেদ কোথায় তাহাও দেখা আবশ্যক। কেবল মিল দেখিলে চলে না, কেন না তাহাতে যত্ন চেষ্টা শিথিল হইয়া যায়, আর কিছু করিবার নাই এইরূপ মনে হয়। অমিল মিলে পরিণত করিতে হইবে, ইহা যখন জানিতে পারি, তখন সে জন্য প্রগাঢ় যত্ন উপস্থিত হয়। লোকে সহজে যত্ন করিতে চায় না, পরিশ্রম করিতে চায় না, এ জন্য অমিল দেখিলেই ভয় পাইয়া পলায়ন করে, সেই সকল লোককে খুঁজিয়া বাহির করে, যাহাদের সঙ্গে এতটুকু মিল আছে, যাহাতে বিনা গোলে দিন কাটাইতে পারা যায়। সংসারী লোকেরা সংসারবিষয়ে যাহাদের সঙ্গে মিল আছে তাহাদিগকে লইয়া সংসারে সুখে দিন কাটাইতে চায়, ধার্ম্মিক লোকেরা মোটামুটি ধর্ম্মের একটা মিল যাঁহাদের সঙ্গে আছে, তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মোন্নতি সাধনে যত্ন করেন। অমিলকে মিলে পরিণত করিবার জন্য যত্নশীল ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

অমিল ভিন্ন মিল হয় না, এ কথা শুনিতে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সর্ব্বত্র প্রকৃতিতে এই প্রকারই ব্যবস্থা। সকল বস্তুরই নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব আছে, যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলে সব বস্তু এক হইয়া যাইত। কিছু কিছু ভিন্নতা না থাকিলে বস্তুসকলেতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্ভবপর নহে। 'কিছু কিছু ভিন্নতা' বলিবার কারণ এই যে, ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে অভিন্নতা না থাকিলে বস্তুসকলের মিলনে অদ্ভুত নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। ব্যক্তিত্ব ও একত্ব লইয়াই সমুদায় জগৎ; অতএব অমিল ও মিল সর্ব্বত্র একত্র থাকাই অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতির প্রক্রিয়াতে ক্রমান্বয়ে অমিল মিলনে পরিণত হইতেছে। মানুষ সচেতন জীব, সে মিলনও বুঝে অমিলনও বুঝে, সুতরাং জ্ঞানপূর্ব্বক মিলন তাহার পক্ষে সম্ভবপর। মানুষ যখন একা জীবন ধারণ করিতে পারে না, যে কোন বিষয় হউক তাহাতেই তাহাকে অপরের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, তখন তাহাতে মিলনের আকর্ষণ যে প্রবলতর থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে সে যখন যে অবস্থাপন্ন থাকে সেই অবস্থার উপযোগী অপরের সঙ্গে মিল করিয়া লইয়া জীবন নির্ব্বাহ করে। এক মানুষেতে পশুসমুচিত, মানবসমুচিত, এবং দেবসমুচিত মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। দেবসমুচিত মিলন বিরল হইলেও পশু ও মানুষ-সমুচিত মিলন বিরল নহে। কেবল পশুভাবে মিলন স্থায়ী হয় না, অল্পদিনের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিয়া উপস্থিত করে, এজন্য মনুষ্যসমাজে মানব-সমুচিত ভাব পশুসমুচিত ভাবের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া সমাজ ও পরিবারে পরিণত হয়। এখানেও মিলনের ভিতরে যে সকল অমিলনের কারণ থাকে তাহারই সংঘর্ষণে যত্ন, চেষ্টা ও শ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে।

অপরের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কি? ইহা প্রদর্শন করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এরূপ প্রভেদ প্রদর্শন প্রভেদ রক্ষার জন্য নহে, যাহাতে প্রভেদ পরিষ্কাররূপে দেখিয়া সেই প্রভেদ নিবারণের উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, এবং ক্রমে প্রভেদ অভেদে পরিণত হইয়া মিলন সাধিত হইতে পারে, তাহারই জন্য। আমরা কি চাই, অপরে কি চায়, ইহা নির্দ্ধারণ করিলেই আমাদের

ও অপরের প্রভেদ পরিস্ফুটরূপে আমাদের চক্ষুর সন্নিধানে প্রকাশ পাইবে। আমরা চাই, আমাদের জীবন আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের ন্যায় হয়। একথা শুনিবামাত্রই অনেকে মনে করিবেন, এরূপ অভিলাষ আমাদের গর্ব্বিতভাবপ্রসূত, কিন্তু বাস্তবিক ইহার মধ্যে গর্ব্বের কোন কথা নাই, মানবজীবন ধারণ করিবার যাহা উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে কেবল তাহাই আছে। এ উদ্দেশ্য আমরা নিজে মনোনীত করিয়া লই নাই, আমাদের ইষ্টদেবতা স্বয়ং আমাদের সম্বন্ধে এই উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ঋষিজীবন কি? ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা, এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে জীবন যাপন করা। বল, কোন্ মনুষ্যের জীবনে ইহা উদ্দেশ্য নহে? আমাদের ইষ্টদেবতা আমাদের নিকট অসম্ভব কিছু চান নাই; যাহা আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং স্বাভাবিক তাহাই চাহিয়াছেন। ঈশ্বর যাহা সকলের নিকট চান, আমাদের নিকট তাহাই চাহিয়াছেন, আমরা তাঁহার চাওয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তিনি যাহা চান আমরা তাহাই করিব, এই কথা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছি, এবং এই অঙ্গীকারে বদ্ধ হওয়াতেই আমরা অপর অনেক লোকের সঙ্গে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তাঁহাদের সহিত এ প্রভেদ তত দিন বিলুপ্ত হইবার নহে, যত দিন না তাঁহারাও আমরা যে অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছি সেই অঙ্গীকারে বদ্ধ হন।

আমাদের অঙ্গীকার প্রতিপালন করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। যদি ঈশ্বর ভিন্ন অন্য বিষয়ের প্রতি আমাদের অণুমাত্র কামনা থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহার হইতে পারিলাম না সংসারের হইলাম, এবং অপরের সহিত যে প্রভেদক চিহ্ন ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তুমি বলিবে, ধর্ম্মসমাজে যতগুলি লোক আছে, তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য যখন ঈশ্বরলাভ, এবং তজ্জন্য তাহাদের যত্ন, তখন যে প্রভেদের কথা বলা হইতেছে তাহা কাল্পনিক বাস্তবিক নহে। জনসমাজে যত লোক আছে, তাহারা কোন না কোন ধর্ম্মসমাজের অন্তর্ভূত। এরূপ ব্যক্তি অতি অল্প যাহারা আপনাদিগকে কোন না কোন এক ধর্ম্মসমাজের অন্তর্গত মনে না করে এবং সেই ধর্ম্ম-সমাজের নিয়ম প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরলাভের জন্য যত্ন না করে। আমরা বলি, কোন এক ধর্ম্মসমাজের সহিত বাহিরে যোগ আছে বলিয়াই সে ব্যক্তি ঈশ্বরকামী ইহা কখন নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। গভীর পরীক্ষার প্রয়োজন করে না, প্রতিব্যক্তির জীবনের উপরিভাগেই সে কি চায় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ধন মান ভোগ এই সকলই যে অধিকাংশ লোকের জীবনের লক্ষ্য, এবং তাহারই জন্য তাহাদিগের যত প্রকার যত্ন প্রয়াস, ইহা আর কে না দেখিতে পায়? ধন মান ভোগ যাহাতে রক্ষা পায় তাহারই জন্য ঈশ্বরোদ্দেশে তাহারা কিছু কিছু অনুষ্ঠান করে। যদি ইহারা ঈশ্বরের কৃপাপ্রার্থী হয়, তাহাও কেবল ধন মান ও ভোগের জন্য। ধন মান ও ভোগ ইহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, ঈশ্বর অপ্রধান উদ্দেশ্য। ঈশ্বর যখন প্রভূতশক্তিবিশিষ্ট, তখন কি জানি বা তিনি ধনাদি আগমের ব্যাঘাত উপস্থিত করেন, এই ভয়ে ইহারা তাঁহার অর্চ্চনা ও তদুদ্দেশে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহারা কি ঈশ্বরকে চায়? কখনই নহে।

তুমি বলিবে, যাহারা প্রাচীন কালের লোক, কুসংস্কারবিশিষ্ট, তাহাদেরই মনে এ প্রকার ভয় আছে, যাহাদের চিত্ত বিদ্যাশিক্ষায় সংস্কৃত হইয়াছে, তাহারা কি আর ভয়ে ঈশ্বরপূজা করে? বিদ্যাশিক্ষা করিলে কুসংস্কার যায়, ভয় যায়, একথা বলাতে তোমার বহুদর্শনের অভাব প্রকাশ পাইতেছে। এমন বিজ্ঞানালোকে আলোকিত পাশ্চাত্য দেশেই যখন আজও বিদ্যোন্নতির পার্শ্বে কুসংস্কার ও ভয় বিরাজ করিতেছে, তখন এ দেশের কথা তোলা বৃথা। এদেশে অনেক কৃতবিদ্য কুসংস্কারাপন্ন, ভয়ে ত্রস্ত, ইহা কি আর প্রতিদিন

আমরা দেখিতে পাইতেছি না ? তবে ব্রাহ্মসমাজের লোকদের কুসংস্কার নাই, ভয় নাই, অথচ ধন মান ভোগের প্রতি বিলক্ষণ লোভ আছে, এ কথা যদি তুমি বল, আর বলিবেই বা না কেন, তাহা হইলে তজ্জন্য ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোক হইতে আরও ভয়ঙ্কর লোক, তোমায় মানিতে হইতেছে। ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। হিন্দু সমাজে যে সকল কর্ম্ম কেহ অনুষ্ঠান করিতে সাহস করেন না, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা দেশ সংস্কারের দোহাই দিয়া অনায়াসে সে সকল কর্ম্ম করিতেছেন। কিন্তু সে সকল কার্য্যের মূলে যে ঈশ্বরকামনা নাই ভোগ কামনা রহিয়াছে, ইহা একটি দশমবর্ষীয় শিশুও অনায়াসে বুঝিতে পারে। কে না আর বোঝে যে যদি তাঁহারা ঈশ্বরকেই চাহেন, তাহা হইলে তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথমে যে ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দিতে হয়, সেই ভোগবাসনাই তাঁহাদিগের ভিতরে দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন। তুমি বলিবে, ভোগ কি আর ঈশ্বরাভিপ্রেত নয় ? ন্যায়সিদ্ধ ভোগত্যাগ কি অযুক্ত বৈরাগ্য নহে ? ঈশ্বরাভিপ্রেত ভোগের বিরুদ্ধে কিছু বলা হইতেছে না, কিন্তু ক্রমান্বয়ে ভোগই যদি কাহারও জীবনের লক্ষ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তুমি সে স্থলে কি বলিবে ? ব্রাহ্মসমাজে যদি কোথাও ভোগপ্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করিয়া তুমি কি তোমার জীবনের লক্ষ্য সাধন করিতে পার ? যদি স্বাতন্ত্র রক্ষা না কর, তুমিও প্রবলভোগ কামনার স্রোতে পড়িয়া যাইবে, এবং তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে যে অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিলে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

তুমি চাও তোমার গৃহ আশ্রম হইবে, তোমার পুত্রকন্যাগণ ঋষিকুমার ঋষিকুমারী হইবেন, তাঁহারা সকলেই কেবল ঈশ্বরের পূজা করিবেন তাহা নহে, ঈশ্বরের প্রেমমুখ দর্শন এবং তাঁহার কথা শ্রবণ তাঁহাদের সমগ্র জীবনের কার্য্য হইবে। তাঁহারা স্বস্ব জীবনে ভগবানের লীলা দেখিবেন, এবং সেই লীলা তাঁহাদের নিকটে আদরের ভাগবতগ্রন্থ হইবে। তুমি আপনার অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও. তোমার কার্য্য চিন্তাদি সকলই এই দিকে নিযুক্ত হউক, দেখি তুমি কয় ব্যক্তির সঙ্গে মিল রাখিয়া চলিতে পার ? সকলে তোমাকে পাগল বলিবে, উপহাস করিবে, স্বপ্নদর্শী বলিবে, এমন কি তোমার নিজের পুত্রকন্যাগণ তোমার অভিলষিত পথের বিরুদ্ধে কথা বলিবে, এমন সকল আচরণ করিবে যাহা তোমার অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিরোধী। দেখ, তোমার আপনার ঘর তোমার বিরোধী হইল, এখন তুমি কাহার সঙ্গে মিল রক্ষা করিয়া চলিবে ? ঘরে বাহিরে তোমার বিরোধী, বল তুমি দাঁড়াও গিয়া কোথায় ? যদি তুমি একাকী স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে না চাও, তাহা হইলে তুমি তোমার অঙ্গীকার পালন করিতে পারিলে না, তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গ হইল। অপরের সহিত প্রভেদক যে পথ তুমি ধরিয়াছ, তাহাতে জানিও, অন্ততঃ কতক দিনের জন্য, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ তোমার সঙ্গী থাকিবে না। হয় অগ্রসর হও, নয় পশ্চাৎ গমন কর, ইহার ভিতরে আর দ্বিতীয় পথ নাই। এরূপে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া যাহারা তোমায় ছাড়িয়া গেল, তাহারা আবার আসিয়া তোমার সঙ্গে যোগ দিবে কি না, এ প্রশ্ন করিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই, কেন না তুমি যে পথে আছ, সে পথ যখন ঈশ্বরাভিপ্রেত তখন সে পথে প্রতিব্যক্তিকে এক দিন আসিতেই হইবে, এবং আসিলেই তোমার সঙ্গে মিল হইবে। কিন্তু সে মিলনের সময় ও ক্ষণ তুমিও জান না, আমিও জানি না, জানেন কেবল একমাত্র ঈশ্বর।

আমাদের দায়িত্ব।

পরোপকার পরম ধর্ম্ম ইহা সকলেই বলেন। কেবল ধনাদি দ্বারা পরোপকার সাধন করা যায় তাহা নহে, সামান্য মুখের কথাতেও মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। প্রাচীন সাধক মহাজনগণ

এখন আর পৃথিবীতে নাই, তাঁহারা এক এক জন জীবনের দুচারিটী কথা রাখিয়া গিয়াছেন, সেই কথাগুলি শত শত লোকের জীবনে শান্তি ও সুখ আনয়ন করিতেছে। তাঁহাদের সেই কথার নিকটে পৃথিবীর অতুল সম্পৎ পর্য্যন্ত যে তুচ্ছ, তাহার প্রমাণও শত শত লোক তাঁহাদের কথা অনুসরণ করিবার জন্য প্রচুর ধন সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া দেখাইতেছেন। ফলতঃ তাঁহারা যে জনসমাজের পরমোপকারী বন্ধু, ইহা ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হয়। আমরা সেই প্রাচীন সাধুমহাজনগণের চরণরেণুস্পর্শেরও উপযুক্ত নহি। কিন্তু জীবনের দুচারিটী কথার দ্বারা বর্ত্তমান ও ভাবী জনসমাজের উপকার সাধন করিব ইহাই আমাদের কার্য্য। আমাদের ধনসম্পদাদি কিছু নাই যে তদ্দ্বারা দুর্গত ব্যক্তিগণের ক্লেশ দুঃখ নিবারণ করি। যদ্দ্বারা জনসাধারণের উপকার সাধন করিতে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেও যে কি বিশেষ দায়িত্ব আছে তাহা আমাদের ভাল করিয়া জানিয়া রাখা সমুচিত।

সকল কার্য্যের ভিতরেই সাধুতা ও চৌর্য্য উভয়ই আছে। সাধুতার কার্য্য আরম্ভ হইলেও ক্রমে উহা চৌর্য্যে পরিণত হইতে পারে। কোন একটি কর্ম্ম ভাল ভাবে আরম্ভ না হইলে লোকে কখন তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, কিন্তু একবার যখন লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল, এবং ভরসা জন্মিল যে, এ আকর্ষণ রক্ষা করা যাইতে পারিবে, তখন হইতে সাধুতা হ্রাস পাইতে লাগিল, স্বার্থ মান সম্ভ্রমাদির অভিলাষ তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া পড়িল। পৃথিবীর কার্য্যে এরূপে ভাল হইতে মন্দে অবতরণত সর্ব্বদাই ঘটে; কিন্তু ধর্ম্মসমাজের কার্য্যও যে ঈদৃশ দোষ সংস্পৃষ্ট নহে, ইহা কিছুতেই বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্মসমাজে যাঁহারা উপদেষ্টৃশ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা জনহিতবাসনায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কালে যখন বহুলোকের নিকটে সম্মানভাজন হন, এবং সকলেরই ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, তখন তাঁহাদের জীবনে পরীক্ষা উপস্থিত। তাঁহারা আপনাদিগকে অস্বীকার করিয়া জনগণের নিকটে ঈশ্বরকে উপস্থিত করিবেন, এই তাঁহাদিগের সঙ্কল্প ছিল, এখন তাঁহারা ঈশ্বরকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনাদিগকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। কি ঘোর বিপরিবর্ত্তন! এতদ্দ্বারা তাঁহারা আপনাদেরও সর্ব্বনাশ করিলেন, অপরেরও সর্ব্বনাশ করিলেন। যাহা পূর্ব্বে সাধুতা ছিল, তাহাই এখন চৌর্য্যে পরিণত হইল। যে হৃদয় ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গিত হইবে, সেই হৃদয় যদি কেহ আপনি অপহরণ করেন, তাহা হইলে তিনি চোর হইলেন না তো আর কি হইলেন?

আমরা যাহা বলিলাম, মনে হয় তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ হৃদয়াপহারী চোরমধ্যে পরিগণিত হইতেছেন। তাঁহারা অনুযায়িবর্গকে আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিলে তাঁহাদের সদ্গতি হইবে, এই কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। যদি কেহ এ প্রকার মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের আপনার আদর স্থাপন করিতে যত্ন করেন নাই, তাঁহারা যাহা ঈশ্বরের নিকটে শুনিয়াছেন সেই কথার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়াছেন, সে কথা তাঁহাদের নহে ঈশ্বরের। ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস এবং তাঁহাদিগেতে বিশ্বাস এ দুই সমান নহে। তাঁহারা সত্যবাদী এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে তাঁহারা কহিয়াছেন, ঈশ্বরের নামে তাঁহারা যাহা প্রচার করিয়াছেন তাহা ঈশ্বরেরই এই পর্য্যন্ত অনুযায়িবর্গ বিশ্বাস করিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহাদের কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, তদনুযায়ী জীবন যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প না হইয়া, কেবল তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া কেহ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক আপনার বলিয়া গৃহীত হন নাই। এই মাত্র জানিলেই আমরা বুঝিতে পারি, তাঁহারা হৃদয়াপহারী চোর

নহেন। ঈশ্বর হইতে সমাগত কথার অনুসরণ করিয়া ঈশ্বরের নিকটে সকলে উপস্থিত হইতে পারেন, ইহাই তাঁহাদিগের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য ছিল।

পূর্ব্বের সাধু মহাজনগণ ঈশ্বরের নিকটে যাহা শুনিতেন লোকদিগকে তাহাতে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিতেন, ইহাতে আমরা তাঁহাদিগের উপরে কোন দোষারোপ করিতে পারি না। এ সময়ে এ সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমাদিগের তদনুসারে সাবধান হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা ঈশ্বরের নিকটে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বিশ্বাস করিতে আমরা কাহাকেও অনুরোধ করিতে পারি না, যদি সে কথা সে ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বরের নিকটে শ্রবণ করিয়া না থাকেন। যত দিন সে কথা তিনি ঈশ্বরের মুখ হইতে না শুনেন, আমাদের কোন অধিকার নাই যে তাঁহাকে তাহার অনুসরণ করিতে আমরা অনুরোধ করিতে পারি। যদিও আমরা ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারি যে, সেই কথা অনুসরণে তাঁহার নিশ্চিত কল্যাণ, তথাপি কিছু করিবার উপায় নাই, কেন না সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের মুখে না শুনিয়া আমাদের কথায় সে কার্য্য করিলে তাঁহার তো কল্যাণ হইবেই না, আমাদের তাহাতে অকল্যাণের সম্ভাবনা আছে। আমরা যদি এরূপ হইতে দি, তাহা হইলে আমরা অল্পে অল্পে হৃদয়াপহারী চোর হইয়া পড়িব; তাহা হইলে যাঁহারা আমাদের কথা শুনিয়া চলিবেন তাঁহাদের নিকট হইতে এবং আমাদের নিকট হইতে ঈশ্বর দূরে অপসৃত হইবেন।

আমাদের কথা কাহারও সর্ব্বস্ব না হয়, এজন্য আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। মানুষ স্বভাবতঃ অলস, নিজে সাধন করিতে চায় না, পরিশ্রম করিতে চায় না, চিন্তা করিতে চায় না, অপরে তাহাদের জন্য সাধন করুক, পরিশ্রম করুক, চিন্তা করুক, তাহারা তাহাদের সাধনের, পরিশ্রমের, চিন্তার ফল ভোগ করিবে এই তাহাদের অভিলাষ। যখন মানুষের ভিতরে এ দুর্ব্বলতা আছে, তখন একটু লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেই তাহাদিগকে দাস করিতে পারা যায়। তাহারা স্পষ্ট আজ্ঞা শুনিতে চায়, সুতরাং যে যত কর্ত্তৃত্বের সহিত আজ্ঞা করিতে পারে, তাহারই নিকটে তাহারা প্রণত হইয়া পড়ে। সকল সমাজেই এ দোষ আছে, ব্রাহ্মসমাজ যে এ দোষবিমুক্ত এখন আর এ কথা বলিতে পারা যায় না। অতএব আমাদে মধ্যে ঐ একটী চিরন্তন প্রথা ছিল, সেই প্রথাটী ভাল করিয়া আবার জাগাইয়া তুলিতে হইতেছে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞা না করা, কোন বিষয়ে অনুরোধ না করা। বন্ধুভাবে সকল বিষয়ে আলাপ চলিতে পারে, কিন্তু আজ্ঞা বা অনুরোধ করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। সে অধিকার স্বয়ং ঈশ্বরের, আমাদের তাহাতে কি অধিকার? সকলে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে যুক্ত হন, এজন্য যত্ন করিতে আমরা সম্পূর্ণ দায়ী, এ কথা আমাদের কদাপি বিস্মৃত হওয়া সমুচিত নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি আর এক দিন যাহা বলিলে তাহাতে প্রাচীন কালে শাস্ত্রে বিশ্বাস যে প্রকার ছিল তাহাই আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসকল মানুষের রচিত নহে ঈশ্বররচিত, এ বিশ্বাস তো আর একালের কাহারও নাই। তুমি কি মনে কর আবার সেই বিশ্বাস ঘুরিয়া আসিবে?

বিবেক। বিশ্বাস ঘুরিয়া আসা কিছু অসম্ভব নহে। অনেকে প্রথমতঃ ঘোর সংশয়ী থাকিয়া শেষকালে এমন ঘোর কুসংস্কারী হইয়া পড়ে যে, এমন কিছু নাই, যাহা তাহারা বিশ্বাস করে না। মানুষ অতি দুর্ব্বলচিত্ত, কখন তাহার চিত্তের দৌর্ব্বল্য কোন্ অযুক্ত সংস্কারে লইয়া তাহাকে ফেলিবে কেহ তাহা জানে না। যদি সে সকল ব্যক্তি আমার কথায় কান দিত, তাহা হইলে তাহাদের এ বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহারা যে বিষয়মদে মত্ত, তাহারা কি আর আমার কথায় কর্ণপাত করিবে? একটু সংসারের আমোদ প্রমোদ বাড়িলেই আমি অনাদৃত হই। আমার কথায় কর্ণপাত করা তো দূরের কথা, আমার কথাই আর তাহাদের স্মরণ থাকে না। শাস্ত্র বলিয়া কিছু নাই, এ কথা তুমি মনে করিতেছ কেন? যেখানে শাস্তা আছেন, সেখানেই শাস্ত্র আছে। তবে আমি যে শাস্ত্র ও শাস্তার কথা বলিতেছি, তাহা মৃত নহে নিত্যবিদ্যমান। পূর্ব্বতন কালে শাস্তা যে সকল কথা বলিয়াছেন,

সে সকল শাস্ত্র হইয়া গিয়াছে, ইহার অর্থ ইহা নহে যে, সেগুলি গ্রহণ করিতে গিয়া শাস্তার মুখে আর নূতন করিয়া শুনিয়া লইতে হইবে না। যদি তুমি নূতন করিয়া শুনিয়া না লও, তোমার জীবনে সে সকলের উপযোগিতা আছে কি না তুমি কি প্রকারে বুঝিবে?

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে পুরাতনের উপরে কোন আদরই রহিল না, কেবলই নূতনের উপরে আদর।

বিবেক। ঈশ্বরের রাজ্যে বল কিছু কি পুরাতন আছে? তুমি যাহা নিতান্ত পুরাতন মনে করিতেছ, তাহাও পুরাতন নহে নিত্য নূতন হইতেছে। প্রতিব্যক্তি আপনার দেহ পুরাতন বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না যে উহা নিত্য নূতন হইতেছে। এই অধিষ্ঠিত পৃথিবী কত পুরাতন, কিন্তু প্রতিদিন তাহার এমনই পরিবর্ত্তন হইতেছে যে, কল্যকার পৃথিবী অদ্যকার নহে। আকাশস্থ অগণ্য নক্ষত্র কি পুরাতন! প্রতিদিন চক্ষুর নিকটে একই প্রকারে প্রকাশমান। যদি তোমার গভীর বিজ্ঞানদৃষ্টি জন্মায়, তুমি দেখিতে পাইবে, সে নক্ষত্র আর এ নক্ষত্র নহে। বাহিরে আকার সন্নিবেশ এক প্রকার থাকিতে পারে, এক প্রকার থাকে বলিয়া সেই এই বলিয়া তুমি নির্দ্দেশ করিতে পার, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিলে আকারের সাম্যসত্ত্বেও, সে দিনের সে আর নহে। ভূমিষ্ঠকালে তুমি যা ছিলে আজ কি তুমি তাই? সে কালে তোমার অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ, আজ তুমি সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছ। কত লোকে তোমার প্রশংসা করিতেছে, তোমাকে সর্ব্বোপরি স্থান দান করিতেছে, তোমার অনুসরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, জনসমাজের নিকটে সম্মানিত হইতেছে। বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরের মধ্যে যদি তোমার এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে কোটি কোটি বর্ষে কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ। দেখিতে পুরাতন শাস্ত্রের কথা একই আছে, কিন্তু জনসমাজের বুদ্ধিভেদের সঙ্গে সঙ্গে উহারও যে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তুমি যে ভাবে উহাকে গ্রহণ করিতেছ, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহা কখন সে ভাবে গৃহীত হয় নাই, ইহা যখন তুমি বুঝিবে, তখন জানিতে পারিবে, পুরাতন শাস্ত্র নিত্য নূতন হইতেছে কি না?

শ্রীমদাচার্য্য সিমলা হইতে আমাদিগের বন্ধু শ্রীমদ্ যোগেন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত মহাশয়কে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬ শে জুলাই নিম্নোদ্ধৃত পত্র লিখিয়াছিলেন।

শুভাশীর্ব্বাদ,

"সাধন ভিন্ন কোন বিষয়ে সিদ্ধ হওয়া যায় না। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে বিশেষ যত্নের সহিত সাধন আরম্ভ করা হইয়াছে। অপ্রতিহত ও অবিশ্রান্ত যত্ন চাই। কিছুতেই যেন ছাড়া না হয়। বাস্তবিক জিতেন্দ্রিয় না হইলে বাহ্যিক ভক্তি উপাসনা কীর্ত্তনাদি কোন কর্ম্মেরই নহে। ভাঙ্গা ঘরে রং দিলে কি হইবে? সাপের বিষ স্বর্ণ পাত্রে রাখিলে কি হইবে? রাগ লোভ হিংসা ইন্দ্রিয়াসক্তি যদি সকলি তেমনি রহিল তবে আমাদের এত দিনে কি হইল? আর না। ঢের বিলম্ব হইয়াছে। নৈতিক পবিত্রতা সাধন এখনি আরম্ভ করিতে হইবে। পারিব না, একথা আমি শুনিতে চাই না। তোমরা নিশ্চয়ই পার, চেষ্টা করিলে অবশ্যই দেব-প্রসাদে চেষ্টা স্বার্থক হইবে। হরিনাম তবে কিসের জন্য?

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকে।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আত্মা।

১৫ ভাদ্র, রবিবার, ১৮১৮ শক।

শরীর বড়, না আত্মা বড়, এ বিরোধ পৃথিবীতে বহুকাল চলিয়া আসিতেছে। লোকে মুখে কিছু শরীরকে বড় বলে তাহা নহে, কিন্তু তাহারা কাজে দেখায় আত্মা বড় নয়, শরীরই বড়। আমরা যে প্রতিদিন খাটিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছি, ইহা কি আত্মার জন্য না শরীরের জন্য? শরীরের জন্য লোকে কি না করিতেছে? তাহারা মিথ্যা কথা কহিতেছে, পরের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, সামান্য অর্থের জন্য ভাইয়ের কণ্ঠনালী ছেদন করিতেছে, অনাথ বিধবার একমাত্র জীবিকা আত্মসাৎ করা পুরুষার্থ মনে করিতেছে। লোকে বলিতে পারে, তাহারা কি আর আপনার শরীরের জন্য এই সকল কুকর্ম্ম করিতেছে? তাহাদের স্ত্রী পুত্র সন্তান সন্ততি জ্ঞাতি কুটুম্ব আছে, তাহাদের প্রতি তাহাদের যে কর্ত্তব্য আছে, সেই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে গিয়া তাহাদিগকে অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজনের প্রতি যে তাহাদিগের মমতা তাহা কি আত্মার জন্য, না তাহাদের শরীরের জন্য? প্রথমতঃ লোকে আপনার শরীরের সুখের জন্য পরিজনবর্গে পরিবেষ্টিত হয়, পরে তাহাদের শরীরের প্রতি তাহাদের মমতা জন্মে, যত দিন তাহাদের শরীর আছে, শরীর আছে বলিয়া তাহাদিগকে সুখী করিতে পারিতেছে, তত দিন তাহাদের প্রতি মমতা, শরীর চলিয়া গেলে কয়েক দিন তাহাদের জন্য শোক করিয়া পরে তাহাদের স্থান অন্য ব্যক্তির দ্বারা তাহারা পূরণ করিয়া লয়, যাহারা আসিয়া তাহাদের স্থান পূরণ করিল, তাহারাই বা কত দিন মমতার পাত্র থাকিবে? তত দিন যত দিন শরীর আছে, সুখ দেওয়ার সামর্থ্য আছে। পতি ও পত্নীর সম্বন্ধ সমুদায় পরিবারবন্ধনের মূল। এই পতি পত্নীর সম্বন্ধও সংসারে কেবল শারীরিক। শারীরিক সম্বন্ধই ঠিক মনে করিয়া কোন এক ধর্ম্মশাস্ত্র অকুণ্ঠিত ভাবে ব্যবস্থা দিয়াছে, পতির মৃত্যু হইলে পত্নী, পত্নীর মৃত্যু হইলে পতি বন্ধনবিমুক্ত

হইলেন, তাঁহারা যথেচ্ছ অন্য লোকের সহিত পুনরায় নূতন বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারেন।

লোকে কি দেখে? কেবল শরীর দেখে, তাহারা কি আত্মা বলিয়া কোন বস্তু কোন দিন প্রত্যক্ষ করিয়াছে? চক্ষু দিয়া যাহা দেখা যায়, কর্ণ দিয়া যাহা শুনা যায়, হস্ত দ্বারা যাহা স্পর্শ করা যায়, তাহাই তাহাদিগের নিকট বস্তু, তাহারই জন্য তাহারা পরিশ্রম করে। যাহা দেখা যায় না, শুনা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তাহার জন্য তাহারা কেন বৃথা শরীর ক্ষয় করিবে? পূর্ব্বকালের ঋষি তপস্বিগণ শরীরকে, জড়কে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, ধোঁয়ার মত অপদার্থ বলিয়া জানিতেন; যাহা চক্ষে দেখা যায় না, কর্ণে শুনা যায় না, হস্তে স্পর্শ করিতে পারা যায় না, তাহাই তাঁহাদের নিকট সত্য ছিল, কিন্তু একালে সেরূপ আত্মদর্শী লোক কোথায়? এখনকার লোকেরা কি তাঁহাদের কথায় শ্রদ্ধা করিবেন? আত্মা দগ্ধ হয় না, ছিন্ন হয় না, একথা শুনিয়া তাঁহারা বলিবেন ইন্দ্রিয়গোচর ভিন্ন যখন কোন পদার্থই নাই, তখন অদহ্য অচ্ছেদ্য অক্লেদ্য নিরাকার পদার্থ কেমন করিয়া থাকিবে? বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান যাহা প্রমাণ করিতে যত্ন করিতেছে, সে কথা শুনিলে বরং তাঁহাদের কথঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে, আমরা যে সকল পদার্থ নিতান্ত স্থূল ও অস্বচ্ছ মনে করি, তাহারা বাস্তবিক স্থূল বা অস্বচ্ছ নহে। আমাদের চক্ষুর অশক্তিবশতঃ উহারা স্থূল ও অস্বচ্ছরূপে প্রতীত হয়, যন্ত্রযোগে কিরণসমূহ স্থূল পদার্থে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হউক, চক্ষু সেই যন্ত্রের সহায়ে সেই স্থূল বস্তু ভেদ করিয়া অপরদিকস্থ পদার্থ সহজে দর্শন করিবে। তারবিশেষযোগে যেমন দূরস্থ ব্যক্তির কথা যাথাযথ শ্রবণ করা যায়, তেমনি আবার বৈদ্যুতিক ক্রিয়াধীন অপরবিধ তারযোগে তারের অপরদিকস্থ বস্তুসকল চক্ষুরিন্দ্রিয়গোচর হয়। বিজ্ঞান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চক্ষুর অদৃশ্য, কর্ণের অশ্রাব্য, হস্তের অস্পৃশ্য নিরাকার শক্তিকে মূল পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। রাসায়নিক ক্রিয়া স্থূল বস্তুকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য শক্তিরূপে পরিণত, এবং সেই শক্তি হইতে অপর স্থূলের উদ্ভাবন করিয়া নিরাকারই যে সকলের মূল, ইহা নিঃসংশয়রূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতেছে।

প্রায় সকল বিজ্ঞানবিৎ সূক্ষ্ম নিরাকার শক্তি বিনা আর কোন পদার্থের নিরপেক্ষ সত্তাতে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদিগের নিকটে স্থূল পদার্থ শক্তির বিবিধ প্রকাশমাত্র; উহা স্থূল দৃষ্টিতে স্থূল, বস্তুতঃ উহারা স্থূল নহে অতি সূক্ষ্ম। স্থূল অসৎ, সূক্ষ্ম সৎ, এ কথা বলিতে আর এখন তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন। বিজ্ঞানবিৎ ও দার্শনিকগণের কথা লইয়া আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা আর কি ইহা জানি না, 'আমি আমি' আমরা যাহাকে বলি, সে না থাকিলে কিছুই থাকে না। আমি দেখি, আমি শুনি, আমি স্পর্শ করি, একবার এই আমি চলিয়া যাউক, দেখি আমার চক্ষু আর দেখে কি না; কর্ণ আর শুনে কি না, হস্ত আর স্পর্শ করে কি না? যে থাকিলে শরীরের সকল ইন্দ্রিয় বজায় থাকে, যে চলিয়া গেলে ইন্দ্রিয় থাকে না, সেই হইল মিথ্যা, আর শরীর হইল সত্য! যে শরীর হইতে 'আমি' হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে, তাহার কি আর এখন চক্ষু নাই কর্ণ নাই, অন্যান্য ইন্দ্রিয় নাই? তবে উহা নিশ্চেষ্ট কেন? কে আর এখন এই শরীরের আদর করে? আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন সকলেই ব্যস্ত, কি করিয়া সেই আদরের দেহ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। যখন সেই 'আমি' ছিল, তখন চক্ষু কেমন উজ্জ্বল, গণ্ড ও ওষ্ঠাধর কি প্রকার আরক্তিম, শরীর কি প্রকার লাবণ্যবিশিষ্ট ছিল। এখানে সে আমি নাই, সেই আমির গমনের সঙ্গে সঙ্গে উহার সকল সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। সেই অনুজ্জ্বল নয়ন, পাণ্ডুর মুখশ্রী, সুকুমারতাবর্জ্জিত মাংসপেশী আর অট্টালিকার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে না। এখন অগ্নিতে দগ্ধ, জলে নিক্ষিপ্ত, মৃত্তিকায় প্রোথিত বা গৃধ্র শকুনি প্রভৃতি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবার যোগ্য হইয়াছে। এখন যদি উহাকে গৃহে শয্যায় পূর্ব্ববৎ শয়ান রাখা হয়, সমুদায় গৃহ পূতিগন্ধে পূর্ণ হইবে, লক্ষ লক্ষ কীট গলিত মাংসখণ্ডভক্ষণে ব্যস্তসমস্ত হইয়া সমুদায় শরীরকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিবে। কে এই দেহে ছিল, যাহার অভাবে ইহার এই ঘৃণিত পরিণাম। ইহাই সেই আত্মা, ইহাই সেই আমি, যাঁহার সম্বন্ধে বেদান্ত বলিয়াছেন, এক বৃক্ষে দুই পাখী বাস করেন, তাঁহার একটি পাখী স্বাদুফল ভক্ষণ করেন, আর একটি পাখী নিরশন থাকিয়া তাঁহাকে দেখেন।

দেহ আছে বলিয়া ইনি আছেন, অথবা ইনি আছেন বলিয়া দেহ আছে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন ফল নাই। যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়াছে তাহার দেহের ইহারই মধ্যে পাঁচবার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু আত্মা যে আত্মা সেই আত্মাই ঠিক আছে। এ সকল কথা বিজ্ঞানবিদেরা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন, আমরা যাহা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহা লইয়া আমাদের কথা। আমরা দেখিতেছি, আত্মা থাকিলে দেহ থাকে, আত্মা চলিয়া গেলে দেহ আর এক দিনও তেমন থাকে না, অল্পদিনেই সড়িয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। আত্মা চলিয়া গেলে আমাদের সম্বন্ধে সকলই গেল। কোথায় আত্মীয় স্বজন, কোথায় পুত্রবিত্ত, কোথায় আর সমুদায় মমতার সামগ্রী। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সকলেই তাহার সম্বন্ধে বিলুপ্ত হইয়াছে। মৃত দেহ বেষ্টন করিয়া শত শত ব্যক্তি আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দন করিলে, কে আর তাহাদের ক্রন্দনে এখন সাড়া দেয়। অসারের অসার সকলই অসার, ধূলির শরীর ধূলি হইয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার কোন মূল্য নাই, যাহার জন্য উহার মূল্য ছিল, এখন সে একাকী অসঙ্গ উদাসীন হইয়া অনন্ত কালসাগরে ভাসিল, কে আর তখন তাহার সন্ধান লয়। আমি থাকিলে সকল থাকে, আমি না থাকিলে আমার সম্বন্ধে কিছুই থাকে না, এমন আমির মূল্য কেন আমরা বুঝি না। যে শরীর কীটগণের ভক্ষণযোগ্য, সেই শরীরের জন্য

এই অমূল্য আত্মার প্রতি উপেক্ষা! আত্মা শরীরের দাস, না শরীর আত্মার দাস? কে বড়, কে ছোট, এখনও কি তৎসম্বন্ধে বিরোধ চলিবে? বাল্য যৌবন জরা শরীরের অনেক প্রকারের পরিণাম হইয়া গিয়াছে, এখন শেষ পরিণাম মৃত্যু অবশিষ্ট আছে। সকলের পরিণামের যিনি সাক্ষী, যাঁহাকে কোন পরিণাম স্পর্শ করিতে পারে নাই, তিনি শেষ পরিণাম মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিবেন, কিন্তু মৃত্যু তাঁহাকে কখন স্পর্শ করিতে পারিবে না। যে পরমাত্মা তাঁহার নিত্যবাসগৃহ, সেখানে জরা ব্যাধি মৃত্যুর প্রবেশাধিকার নাই। তোমার আমার বাসগৃহ শরীর নহে, স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের বাসগৃহ, আমাদের আবার মৃত্যুকে ভয় কি? মৃত্যু আসিয়া শরীরকে গ্রাস করিবে, আত্মার সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব নাই।

আমরা তবে কি এই মন্দিরে উপস্থিত? আমরা সকলে চিদাত্মা। এই শরীর এই চিদাত্মার একটি প্রকাশস্থল, ইহা সমগ্র প্রকাশস্থল নহে। শরীর এই আত্মাকে পিঞ্জরবদ্ধ পাখীর ন্যায় বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। এই শরীরে থাকিয়া সে লক্ষ লক্ষ ক্রোশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে সমর্থ, অতি দূরস্থ পদার্থ সমুদায়ের বিষয় জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে ক্ষমতাবান্। এই এখন আমরা শরীরে থাকিয়াও শরীরে নই; আমরা অনন্ত চিদাকাশে উড়িতেছি। শরীর অতিক্রম করিয়া যখন অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য সত্য সকল প্রত্যক্ষ করিয়া অলৌকিক আনন্দ অনুভব করি, এবং সেই সকল সত্যকে যখন সমুদায় সৃষ্টির মূলে দেখি, তখন আর আত্মাকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতে পারি না। যাহারা কেবল শারীরিক জীবন যাপন করে, অধ্যাত্মরাজ্যের সংবাদ লয় না, তাহারা আত্মার মর্য্যাদা বুঝিবে কি প্রকারে? যাহারা পরমাত্মাতে আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিল না, তাহাদের নিকটে আত্মার মহত্ত্ব চিরকালই প্রচ্ছন্ন থাকিবে। আমরা আত্মাকে বড় বলি, এবং যাহা কিছু বহিরিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বস্তু সে সকল আত্মারই জন্য, আত্মারই ভোগ্য, আত্মারই নিকটে প্রকাশিত। আত্মা না থাকিলে বিচিত্র শক্তির বিচিত্র ক্রীড়া ঈশ্বর কাহার নিকটে প্রকাশ করিতেন? আত্মা তাঁহার সন্তান, সন্তানের জন্য তিনি সকল করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? এখানে যে সকল ঈশ্বরের পুত্রকন্যা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা কি মনে করিতে পারেন না, ভগবান্ তাঁহাদিগেরই জন্য সকল করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রত্যেক নরনারীরই এ প্রকার মনে করিবার অধিকার আছে, কিন্তু অনেকেরই এ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় নাই। যাঁহাদিগের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাঁহারা কেন অনন্তের অনন্ত সম্পৎ তাঁহাদিগের নিজের জন্য মনে করিবেন না? ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণ আপনার আপনার সৌভাগ্য স্মরণ করুন, আপনারা শরীর নহেন চিদাত্মা, ভাল করিয়া অবধারণ করুন। আত্মমহত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া সংসারের ধূলি কর্দ্দমে পড়িয়া থাকা আপনাদের পক্ষে গৌরব নয়, আপনাদের পরম পিতারও গৌরববর্দ্ধন নহে।

আপনারা পরস্পরকে কোন্ চক্ষে দেখিবেন এই মুহূর্ত্তে স্থির করিয়া লউন। আপনারা কি পরস্পরের শরীর দেখিবেন, আর শরীর দেখিয়া মোহিত হইবেন? শরীরকে উড়াইয়া দিয়া আপনারা কি শরীরের অতীত আত্মাতে প্রীতিবন্ধন করিবেন না? শরীর গেলেই সব গেল, এত দিনে কি আপনাদের এই বুদ্ধির শরণাপন্ন হইতে হইবে? যাহা অনিত্য, কোন প্রকারে ধরিয়া রাখা যাইতে পারে না, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সকলকে আপনার সর্ব্বস্ব করিবে? যাহার সঙ্গে কোন দিন বিচ্ছেদ ঘটিবে না, এমন যদি কিছু প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে থাকে তবে তৎপ্রতি অনুরাগ স্থাপন কি যথার্থ বুদ্ধিমত্তা নহে? যাহার জন্য এই সকল শরীরের এত শোভা, ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল, তাহাকে যদি পাই, তাহাকে যদি প্রীতির আস্পদ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর অস্থায়ী পদার্থে অনুরাগবন্ধনে কি প্রয়োজন? যে মরে সে আমার নয়, যে মরে না সেই তো আমার। অতএব দেহ আবরণে আবৃত অমর ঈশ্বরের পুত্রকন্যাগণকে আমরা আমাদের অনুরাগের পাত্র করিতে চাই। দেহের বিচ্ছেদেও তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন দিন বিচ্ছেদ হইবে না। আত্মা যদি আত্মাকে চিনিয়া লয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে বিচ্ছেদ অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহাতে বিচ্ছেদের জ্বালা কাহাকেও সহ্য করিতে না হয়, সেইরূপ করিতে হইতেছে। শরীর উড়াইয়া দিয়া আত্মা আত্মার সহিত প্রীতি স্থাপন করুক, পৃথিবী স্বর্গধামে পরিণত হইবে। মহান্ আত্মার ক্রোড়ে ক্ষুদ্র আত্মা, এ ব্যাপার যে প্রত্যক্ষ করিল সে বীতশোক বীতভয় হইল। এ সময় আমরা শরীরের চিন্তা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া চারিদিকে কেবল আত্মা বিরাজমান দেখি। আত্মা আত্মার সঙ্গে সম্মিলিত হউক। সকল আত্মা মিলিত হইয়া সেই মহান্ আত্মাতে আপনাদিগের স্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দিত হউক। আত্মা যেন আর শরীরের দাস হইয়া আপনায় সর্ব্বদা ভুলিয়া না যায়। আত্মা পরমাত্মার কথার অনুসরণ করুক। এই কথার অনুসরণে তাহার মহত্ত্ব, এই কথার বিপরীত আচরণে তাহার পশুত্ব, ইহা বুঝিয়া সে সেই কথাকে নিয়ামক করুক। লক্ষ কোটি মুদ্রা, সম্রাটের ভোগ্য বিষয়, বা তদপেক্ষা মহত্তর প্রলোভনসামগ্রী যেন আত্মাকে বিচলিত করিয়া শরীরের দাস করিয়া না ফেলে? আত্মার যেন সর্ব্বদা এ আত্মমর্য্যাদা জাগ্রৎ থাকে। কি, আমি ইন্দ্রিয়ের দাস হইব? পার্থিব সুখের জন্য আত্মার স্বাধীন গতি অবরুদ্ধ করিব? আমি ব্রহ্মসন্তান হইয়া হীন চণ্ডাল হইব? আত্মা যদি আপনায় সর্ব্বদা বুঝিতে পারে ও রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে শত শত আত্মার প্রতি তাহার গভীর সমাদর উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের প্রতি বন্ধুতা স্থাপন করিয়া তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা আমাদের নিত্য আবাসগৃহ ঈশ্বরে স্থিতি করিয়া কৃতার্থ হইবে। হে চিদাত্মা সকল, তোমরা কাহার সন্তান স্মরণ কর। তিনি মহান্ চিদাত্মা, তোমরা ক্ষুদ্র চিদাত্মা, ইহা জানিয়া শরীরেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাতে চিরশান্তি চিরসুখ উপার্জ্জন কর।

তহ্ফতোল মওহদ্দিনের বঙ্গানুবাদ।

কিয়দ্দিন হইল আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় কর্ত্তৃক প্রণীত তহফতোল মওহদ্দিন (একেশ্বরবাদীদিগের প্রতি উপহার) নামক ক্ষুদ্র পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছি। তাহা পাঠ করিয়া অনেক বন্ধু উক্ত পুস্তকের অনুবাদ ক্রমশঃ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন; তজ্জন্য উহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে। উক্ত পুস্তক পারস্য ভাষায় ও তাহার সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আরব্য ভাষায় রচিত। তহফতোল্ মওহদ্দিনের ভাষা ও পদবিন্যাসপ্রণালী সহজবোধ্য ও সরল নহে। আমাদের ন্যায় অপারদর্শী লোকের দ্বারা সর্ব্বত্র তাহার অনুবাদ যে অবিকল হইবে এরূপ আশা নাই। তথাপি যত দূর সাধ্য বিষদরূপে ভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করা যাইবে। সম্প্রতি ক্ষুদ্র ভূমিকাটীর অনুবাদ প্রকাশ করা গেল। পরে মূল পুস্তকের অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

"আমি পৃথিবীর সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশ ও সমতল ভূমি পর্য্যটন করিয়াছি, এবং জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার মূলস্বরূপবিষয়ে তত্রত্যনিবাসীদিগকে একমতাবলম্বী,এবং তাঁহার গুণের বিশেষত্বে ও ধর্ম্মমত সকলের বিশ্বাসসম্বন্ধে এবং বৈধাবৈধতত্ত্বে ভিন্ন মতাবলম্বী প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুসন্ধানে আমার অবধারণ হইয়াছে যে, সাধারণতঃ সমতার ভূমিতে, স্বাতন্ত্র্যে নৈসর্গিক ব্যাপারের ন্যায় পরস্পর যোগ সূত্রে, নিত্য সত্য পরমেশ্বরের প্রতি সকলের আভিমুখ্য এবং পরমেশ্বরের প্রতি ও বিশেষ বর্ণনায় বর্ণিত বিশেষ বিশেষ দেবতার প্রতি ও যাহা পূজা অর্চ্চনা ও ক্রিয়ানুষ্ঠানে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিকর্ত্তৃত্বের বর্ণনায় সম্পর্কিত, তদ্রূপ বস্তুসকলের প্রতি তাহাদের প্রত্যেকের অনুরাগ। অপিচ তাহাদের কোন কোন দলের এরূপ প্রকৃতি যে, পুরাতন উক্তিসকলের সত্যতার দাবিতে একদল অপর দলকে খর্ব্ব করিবার জন্য পরস্পর অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসকে মিথ্যা গণনা করিয়া থাকে, এবং কিয়দংশ লোক অধর্ম্ম, অপরাধ ও বিপরীতাচরণারোপে বিবাদকারী; অতএব, প্রথমতঃ, তাঁহারা সকলেই সত্যবাদী, অথবা পূর্ব্বোক্তরূপ পরস্পরের মতখণ্ডনকারী হইয়া পরস্পরের প্রতি অসত্যারোপকারী, এরূপ বলা অসঙ্গত নয়। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পরস্পরের মধ্যে অসত্য সঞ্চারিত, এপ্রকার বলাও অনুচিত নহে। বস্তুতঃ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের অভাবে তাহাদের মধ্যে অসত্য বিরাজিত। এ বিষয় আমি পারস্য ভাষায় বর্ণন করিলাম। যেহেতু উহা পারস্যভাষাবিদ্দিগের বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে।"

চা বাগানে ভগবানের লীলা।

নীলকর চা-কর প্রভৃতির নাম শুনিলেই সকলের প্রাণে ভয়ের উদয় হয়। নীলকরদিগের প্রজাপীড়ন চা-করদিগের কুলীপীড়ন সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ থাকায় নীলের কুটিতে এবং চাবাগানে যে আবার কখন ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়, সহসা ইহা কেহ বিশ্বাস করিতে সাহস করেন না। কিন্তু আমরা ভগবানের বিশেষ লীলা এই দুই স্থানেই বিশেষ ভাবে অবলোকন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্বর্গগত শ্রীমান্ লক্ষ্মণচন্দ্র আস ভ্রাতার মঙ্গলগঞ্জের নীলের কুটির কথা আমাদের পাঠকগণের অনেকেরই স্মরণে আছে। আমরা সেই মঙ্গলগঞ্জে কখন সদলে কখন একা যাইয়া কত সময় কত উপকার লাভ করিয়াছি, সেই স্থান বাস্তবিকই এক সময়ে আমাদের একটি বিশেষ সাধনক্ষেত্র ছিল। স্বর্গগত ভ্রাতার বিশেষ যত্নে ও পরিশ্রমে সেই নীলের কুটী অনেক সময় স্বর্গের শোভা ধারণ করিয়া কত লোকের মন মুগ্ধ করিয়াছিল। সেখানে যথার্থই নববিধানের লীলারসময় হরি আপনার লোকদিগকে লইয়া নববিধানের বিশেষ লীলাখেলা খেলিয়াছিলেন; সেখানে যাইলে কাহারও কখন নীলকুটিয়ালের অত্যাচারের কথা মনে অসিত না। আমারা সেখানে জমীদার ও গরীব প্রজাদিগের ভিতর একটি অতি সুন্দর সুমিষ্টভাব দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিতাম। সম্প্রতি লীলারসময় হরি আমাদিগকে একটী সুন্দর চা বাগিচায় লইয়া গিয়া আমাদিগকে তাঁহার বিশেষ বিধানের বিশেষ কার্য্যক্ষেত্র দেখাইয়া বড়ই মোহিত করিয়াছেন। এই বাগিচাটী কলিকাতা হইতে প্রায় ৫০০ মাইল দূরে পূর্ব্ব উত্তর কোণে কাছাড়জিলায় স্থাপিত। এই বাগিচার নাম বর্ণারপুর চাবাগান। আমাদের সমবিশ্বাসী বিধানবাদী ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত মহাশয় এই বাগানের প্রধান কর্ম্মচারী। এই বাগানটি তাঁহারই বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নে অল্প দিনের মধ্যে একটি বিশেষ লভ্যতম বাগান হইয়াছে। ২৫৲ টাকার অংশিদারগণ বাৎসরিক ১০৲ টাকা করিয়া কয়েক বৎসর লভ্য অংশ পাইয়াছিলেন, গত বৎসর হইতে চার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় অংশিদারগণ ৫৲ টাকা করিয়া পাইয়াছেন। এত গেল বাহিরের ব্যাপার। আমাদের ভ্রাতা ঐ বাগানে প্রতিবৎসর বসন্তপূর্ণিমার দিনে ব্রহ্মোৎসব করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসরই অনেক ব্যয় করিয়া ঢাকা ও কলিকাতা হইতে প্রচারকগণকে তথায় লইয়া যাওয়া হয়, নিকটস্থ চাবাগান ও জেলা হইতে বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হয়। ৩।৪ দিন অতি সমরোহের সহিত উৎসব হইয়া থাকে। আমরা সৌভাগ্যক্রমে এ বৎসর তথায় উপস্থিত থাকিয়া উৎসবে বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি। আমাদের ভ্রাতার আদর যত্নের সীমা নাই। তিনি স্বভাবতই বড় কোমলহৃদয়, তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যে আমরা কত সময় কত উপকার লাভ করিয়া থাকি। তিনি প্রচারক পরিবারগণের অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া ঢাকায় ও কলিকাতায় তাঁহার নিজ অংশ হইতে চা বাগিচায় ১০টি অংশ আমাদিগের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। আমরা উহার লভ্য অংশ অনেক দিন হইতে ভোগ করিয়া আসিতেছি। ভ্রাতার মুখে যখন চা বাগিচা কেন করিলেন এই ইতিহাস শুনিলাম, তখন আর চক্ষে জল রাখিতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন কেবল দুঃখীর দুঃখ মোচন ও জীবসেবার জন্যই তিনি এই গুরুতর ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহায় সম্পত্তি বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র দয়াময় হরির মুখের দিকে তাকাইয়া এবং তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার দয়াতে একার্য্যে সুফল ফলিয়াছে, আমি কিছুই নহি। ভ্রাতার বিশ্বাস ও নির্ভর দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। আহা, তাঁহার কি বালকের ন্যায় সরল প্রার্থনা, সে প্রার্থনা শুনিলে চক্ষে জল রাখা যায় না। তাই বলি চা-কর ও চাবাগান ভগবানের হস্তে অতি সুন্দর দেবতায় ও স্বর্গধামে পরিণত হইয়াছে। কুলিগণ এখানে বেস মনের আনন্দে কার্য্য করিতেছে। অধিকাংশ কুলীই গৃহস্থালী করে,তাহাদের ক্ষেত খোলা আছে, বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করে, তাহারা আর তাহাদের পরিত্যক্ত দেশে যাইতে চায় না। এক এক সময়ে এক এক জন স্ত্রীলোক চা পাতা তুলিয়া বাগিচার অধ্যক্ষের নিকট হইতে প্রতিদিন এক টাকা করিয়া পাইয়া থাকে। চাবাগানে কার্য্যের শেষ নাই, যে যত খাটিতে পারে সে ততই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। আমাদের ভ্রাতা যখন ভাবে মত্ত হইয়া প্রচারক ও দর্শকগণ সহ বাগানের পথে নগর সংকীর্ত্তন করিতে বাহির হইলেন, দলে দলে কুলীগণ স্ত্রী পুরুষে রাস্তায় আসিয়া প্রণাম করিতে লাগিল, কেহ বা ধুনা ঘৃত আনিয়া অগ্নির উপর স্থাপন করিল। কুলী বালকগণ ছোট ছোট নিশান ধরিয়া সংকীর্ত্তনের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। সকলের মুখেই আনন্দের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল। উৎসবের শেষদিনের ব্যাপার আরও চিত্তহারী। আমাদের ভ্রাতা তাঁহার চার কারখানার তাঁহার বাগিচার সমস্ত কুলী স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকাকে আহ্বান করিয়া সকলকে একস্থানে বসাইলেন (প্রায় ৮।৯ শত লোক), একটি নাম গান হইল। যাহাতে সকলে সেই গান শুনিতে পায় এই জন্য গায়কগণ গান করিতে করিতে অতি দীর্ঘ কারখানার এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সংগীত শেষ হইলে একটী প্রার্থনা হইল। সকলেই স্থির ভাবে গান ও প্রার্থনা শ্রবণ করিলে পর একজন প্রচারক কিছু বলিলেন। তাহার পর অতি সহজ ভাষায় সকলের কাছে কাছে যাইয়া দীননাথ বাবু কয়েকটী কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিলেন। তিনি আপনাকে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আমি কেহই নহি, তোমরা ও আমি সেই এক দয়াময় শ্রীহরির সন্তান, আমরা সকলেই সমান। তোমরা তাঁহাকে ডাক, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তোমাদের সকল দুঃখ সকল জ্বালা দূর হইবে। বক্তৃতা শেষ হইলে উপস্থিত সকলকে এক এক খানি নূতন বস্ত্র প্রদান করা হইল, সকলে আনন্দে গৃহে গমন করিল। এ সব কি লীলারসময় হরির বিশেষ লীলা নহে? তিনি কোথায় কি ভাবে কার্য্য করিতেছেন, আমরা অন্ধ হইয়া দেখি না বলিয়া নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়া থাকি। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সকল স্থানেই সকল কার্য্যের মধ্যেই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে সেই দয়াময়কে দেখিতে পান। বর্ণায়পুরের চাবাগান বাস্তবিকই লীলারসময় হরির লীলাক্ষেত্র হইয়াছে। কার্য্যাধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণের সকলের উপর প্রতিনিয়ত আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। কবে সকল চাবাগান ও নীলকুটি এইরূপ স্বর্গের শোভা ধারণ করিবে। বর্ণায়পুরের উৎসবের কার্য্য সমস্তই ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় সম্পাদন করিয়াছেন।

সংবাদ।

ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় ও মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত কুমিল্লা ষ্টেসনে একত্রিত হইয়া ভাই কান্তিচন্দ্র ও আশুতোষ বর্ণারপুরে যাত্রা করেন। কয়েক দিন রেল গাড়ীতে ও নৌকায় অতি আনন্দের সহিত কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা বর্ণারপুরে চারিদিন অবস্থান করিয়া উৎসব সম্ভোগ করেন। আসিবার দিন দীননাথ বাবু একদিনের পথ তাঁহাদিগের সহিত নৌকায় আসিয়াছিলেন। ৩১শে মার্চ্চ গুড্ ফ্রাইডের দিন প্রাতে নৌকায় বিশেষ ভাবে উপাসনার পর বাগানে চলিয়া যান। যাত্রিদল বদরপুরে আসিয়া ট্রেণ না পাওয়ায় জাহাজে করিয়া করিমগঞ্জে গমন করেন। তথায় ২৪ ঘণ্টা কাল একষ্ট্রা এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করেন। সে দিন রবিবার ছিল; দুই বেলায় সেখানে উপাসনা হইল। পর দিন প্রাতে ট্রেণ ধরিয়া রাত্রি দশটার সময় কুমিল্লার প্রসিদ্ধ উকীল আমাদের সমবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাসায় ২৪ ঘণ্টা সকলে মিলিয়া অবস্থান করেন। তথায় মঙ্গলবার দুই বেলা পারিবারিক উপাসনা হইয়াছিল। মঙ্গলবার রাত্রিতে ট্রেণে উঠিয়া কলিকাতার দল পরদিন সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় আসিয়াছেন। ভাই বঙ্গচন্দ্র সদলে বুধবার দিনেই ঢাকায় পৌছিয়াছেন।

শ্রীমান্ প্রমথ লাল সেন প্রায় ২॥ বৎসর বিলাতে থাকিয়া নানা ধর্ম্মের নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে আসিতেছেন। আশা করি তাঁহাকে আমরা আগামী রবিবারেই আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইব। বিলাতে তিনি যেমন উৎসাহের সহিত নানা স্থানে নববিধান প্রচার করিয়া সকলকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হইয়াছেন, দেশে আসিয়াও তিনি তাহাই করুন।

ভাই দীন নাথ মজুমদার সস্ত্রীক হাজারীবাগের সাংবৎসরিক উৎসবে গমন করিয়াছেন। ১লা বৈশাখ তথায় সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হইবে।

বিগত ২৫শে মাঘ শনিবার কটকে ভ্রাতা রাজমোহন বসুর গৃহে তাঁহার দৌহিত্র শ্রীমান্ প্রিয়নাথ মল্লিকের প্রথম-পুত্রের নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং পুত্রের নাম শ্রীমান্ প্রমথ নাথ প্রদত্ত হইয়াছে।

অদ্য নববর্ষের প্রথম দিন উপলক্ষে প্রচারাশ্রমে প্রাতে ৬॥০

টার সময় বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছে। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা অনেক গুলি উপাসক উপস্থিত ছিলেন।

আলুপোস্তার বিধানবাদী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বসুর পণ্যশালায় নববর্ষের প্রথমদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, এবং তাঁহার পুত্রের নামকরণ নবসংহিতামতে সম্পন্ন হয়। উপাধ্যায় উভয় কার্য্যই করিয়াছেন। উপাধ্যায় কর্ত্তৃক পুত্রের নাম সুহাসচন্দ্র রাখা হইয়াছে।

গত কল্য ব্যাটরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব ভ্রাতা হরকালী দাসের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও সন্ধ্যাকালে উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। ঐ দিন ভ্রাতা হরকালী দাসের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সূর্য্যকুমার দাসের ১ম পুত্রের জাতকর্ম্ম নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হয়।

অদ্য মেটেবুরুজস্থ বিধানবিশ্বাসী শ্রীযুত মিহির লাল রক্ষিতের পণ্যশালায় নববর্ষের প্রথম দিন উপলক্ষে বিশেষ ভাবে উপাসনা হয়। প্রাতে ভাই দীননাথ কর্ম্মকার এবং সন্ধ্যায় উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

অদ্য আলিপুরের স্পেসিয়াল সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বিপিন-মোহন সেহানবীশ মহাশয়ের ভবানীপুরস্থ বাসগৃহে বিশেষ ভাবে উপাসনা হয়। শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। অনেক গুলি উপাসক উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমান্ মনোমথ-ধনের সংগীতে ও বিনয়েন্দ্রনাথের উপাসনায় সকলে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার বিপিন বাবুর গৃহে উপাসনা হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

গত ১২ই চৈত্র শনিবার মধ্যাহ্ন ১২ টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হৃদ্‌রোগ ও তজ্জনিত উদরীরোগে ৩৬ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী গোলাপকুসুম দেবী দেহত্যাগ করেন। ছয় বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হয়। সুতরাং স্বামীর চেষ্টায় যা কিছু সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ইনি সরলতা, আত্মবিস্মৃতিশীল স্বামিভক্তি ও সন্তানবৎসলতা, সকলের প্রতি প্রীতি ও সদ্ব্যবহার, দরিদ্রের প্রতি দয়া, বিলাসিতার সম্পূর্ণ অভাব, সরল ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণে সেকালের আদর্শ হিন্দুরমণীর সমতুল্যা ছিলেন। ত্রিশ বৎসর শান্তির সহিত বিবাহিত জীবন কাটাইয়া ও সাংসারিক কর্ত্তব্যসাধনে দেহপাত করিয়া ষোল হইতে চারি বৎসর বয়সের পর্য্যন্ত ছয়টি সন্তান রাখিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের শেষ-ভাগে তিনি অসহনীয় রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন।

প্রেরিত।

দয়াময়ী জননীর অজস্র কৃপা সম্ভোগ করিয়াও আমাদিগের ভ্রান্ত মন তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতেছে না। মা আমাদের জন্য কত ব্যস্ত, সর্ব্বদা কত আয়োজন উদ্যোগ করিতেছেন, যখনই আমাদিগের মনে আসক্তি কি নিরাশার ভাব উপস্থিত হয়, তখনই মা অযাচিতরূপে এমন একটী সুবিধা লইয়া হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হন যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই সমুদয় অশান্তি ও নিরাশা কোথায় চলিয়া যায়, হৃদয়ে নূতন বল সঞ্চার করিয়া পুনরায় আমাদিগকে অগ্রসর করিতে থাকেন। বর্ত্তমান সময়েও আমরা করুণাময়ী মার সেইরূপ করুণা সম্ভোগ করিয়া বিশেষরূপে কৃতার্থ হইয়াছি।

আমাদিগের মন্দিরটি ভগ্ন হওয়ার পর হইতেই উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ স্থান না থাকায় সমবেত উপাসনার গোলযোগ ঘটিতেছিল। ক্রমে গোলযোগের মাত্রা এত দূর বাড়িতেছিল যে সমবেত উপাসনা এককালে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এমন কি নিজ নিজ দৈনিক উপাসনাও নিয়মবদ্ধরূপে সকলের হইত না। ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা ও পতন কি হইতে পারে জানি না। কিন্তু মা ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাঁর বিধানের কলে যাকে একবার ফেলিয়াছেন তার হাড় গোড় চূর্ণ না করিয়া ছাড়েন না। তাই অযাচিতরূপে ঢাকা বিধানসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র সেন মহাশয়কে হঠাৎ এখানে উপস্থিত করিয়া ও একাদিক্রমে ১৯ দিন পর্য্যন্ত আমাদিগের সহিত একত্র রাখিয়া দীন সন্তানগণের অশান্তি ও নিরাশা দূর করিয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয়ের ভক্তিপূর্ণ সরস উপাসনা, প্রার্থনা, উপদেশ ও সৎপ্রসঙ্গে বাস্তবিকই আমাদের মধ্যে নূতন বল আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার অবস্থান কালে এমনই একটি ভাবের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল যে ক্ষণকালের জন্যও যেন সেই স্রোতের বিরাম হইত না। প্রতিদিন প্রাতে ৯ টা হইতে প্রায় ১১ টা পর্য্যন্ত সমবেত উপাসনা, তাহার পর ২। ৩ টার সময় হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত পরিবারবর্গের মধ্যে শাস্ত্রপাঠ, সৎপ্রসঙ্গ ও সদুপদেশ এবং সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত সদালাপ ও সৎপ্রসঙ্গ হইত। সামাজিক উপাসনার দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে মাঝে মাঝে রাত্রিতে পারিবারিক উপাসনা হইত। পরিবারবর্গ প্রতিদিন উপাসনায় রীতিমত যোগ দিতেন, এমন কি বৃদ্ধা চলিতে অক্ষম হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ অভিভাবিকাগণ তাঁহাদের চির অভ্যস্ত দৈনিক শিবপূজা পরিত্যাগ করিয়া যষ্টির সাহায্যে রীতিমত (অন্যান্যের অপেক্ষা ব্যগ্রতা সহিত) প্রতিদিন উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ শাস্ত্রপাঠের স্থানে আগমন ও যোগ দিতেন। বাস্তবিকই বিধান-জননী শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয়ের দ্বারা আমাদিগের ও পরিবারবর্গের ভিতর এক নূতন ভাবের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। যে স্থানে সামাজিক সমবেত উপাসনা বন্ধ হইয়াছিল সে স্থানে দৈনিক সমবেত উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। করুণাময়ী মার চরণে বিনীত প্রার্থনা যে দুঃখী সন্তানগণের ভিতরে যে ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহা যেন উত্তরোত্তর বেগবান্ হইয়া তাঁর ভাবসমুদ্রে মিলিত হইতে পারে, এই শুভ আশীর্ব্বাদ তিনি দান করুন। ইতি।

ফুল বাড়ী। বিনীত দাস
শ্রীআনন্দ নাথ চৌধুরী,

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ২রা বৈশাখ কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

REGISTERED NO C. 37

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ।
৮ সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবিতেশ্বর, জীবনপ্রদীপ যখন নির্ব্বাণোন্মুখ, তখন প্রাণ যদি তোমার জ্যোতি আত্মস্থ করিতে না পারে, তাহা হইলে আর তাহার অনন্ত জীবনের আশা কোথায় রহিল। এ পৃথিবীতে চিরদিন বাস করিবার জন্য আমরা আসি নাই। তোমার ইহা অভিপ্রায় নয় যে, জীবনের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে অথচ আমরা বলপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে তখনও থাকিবার জন্য যত্ন করিব। এ যত্ন কখন সফল হইবার নহে; কেবল তোমার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে গিয়া অপরাধী হওয়া ভিন্ন আর ইহাতে কি লাভ আছে? এখন আমাদের জীবনের দিন শেষ হইয়া আসিল। তোমার কার্য্যক্ষেত্রে নূতন লোকদিগকে কার্য্যের ভার দিয়া এখন আমাদের কোন কোন কার্য্য হইতে অবসর লইবার সময় উপস্থিত। অল্পে অল্পে তাঁহারা কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, তোমার কার্য্যের ব্যবস্থা হইল দেখিয়া আমরা শান্তহৃদয়ে আস্তে আস্তে ইহলোক হইতে অপসৃত হইব, বৃদ্ধদাসগণের ইহাই তো আহ্লাদের বিষয়। তোমার কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য সংসারের বিষয় বাণিজ্য সমুদায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, এরূপ লোক পাওয়া বড়ই দুর্ল্লভ। তুমি কৃপা করিয়া যখন এরূপ লোক আনিয়া দিতেছ, তখন, বল, দাসগণের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য যে তুমি কৃতসঙ্কল্প, একথা বলিতে আর আমরা কুণ্ঠিত হইব কেন? তুমি যে সকল লোককে কার্য্যক্ষেত্রে ডাকিতেছ, তাঁহাদের উপরে আমাদের বিশ্বাস রাখিতে আমরা বাধ্য। তুমি যাঁহাদিগকে আহ্বান কর, তাঁহারা তোমার বিধানের রক্ষক হইবেন, এ বিষয়ে আর আমাদের সংশয় কি? তুমি আপনি কার্য্যভার দিয়া কার্য্যের দায়িত্ব বুঝাইয়া দিবে; এবং কি প্রণালীতে তোমার বিধানের কার্য্য চালাইতে হইবে, এ বিষয়ে সর্ব্ববিধ উপদেশ তোমা হইতেই তাঁহারা লাভ করিবেন। তুমি আহ্বান করিয়াছ কি না, এই টুকু জানা আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। যখন জানিলাম, তুমি আহ্বান করিয়াছ, আর আমাদের ভয়ের কোন কারণ রহিল না। আমরা অতি সাহস সহকারে তাঁহাদিগের হস্তে সমুচিত কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে পারি, কেন না আমরা জানি, তুমি যেমন আমাদের কার্য্যের প্রেরক, কার্য্যের সংশোধক, তাঁহাদিগেরও তেমনি তুমি কার্য্যের প্রেরক ও সংশোধক। অতএব, হে নাথ,

আমরা তোমার কার্য্যক্ষেত্রে নবীন লোকদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি, তাঁহাদের সহিত আমাদের সমুচিত ভাববন্ধন তুমি করিয়া দাও। বৃদ্ধ ও যুবকগণ সকলে একত্র হইয়া যাহাতে তোমার রাজ্যের কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার কৃপায় তোমার কার্য্যক্ষেত্রে পরিশ্রমীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হউক, এই তব পাদপদ্মে ভিক্ষা করিয়া বিনীত ভাবে প্রণাম করি।

উপাসনাশীলের প্রতি বিশ্বাস।

মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে উপাসনাসম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা নিতান্ত সত্য। যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি কোন জঘন্য অপরাধ করিতে পারেন না, ইহাতে সংশয় কি? ঈশ্বরের চক্ষু আমাদিগের উপরে নিরন্তর বিদ্যমান, ইহা প্রতিনিয়ত স্মরণে রাখিবার পক্ষে উপাসনা অমোঘ উপায়। ঈশ্বর আমাদিগের সাধু ও অসাধু কার্য্য সকল দেখিতেছেন, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা তিনি গণনা করিতেছেন, এ ভাব উজ্জ্বল থাকিলে পাপ করিতে কখন সাহসিকতা জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশীয় শাস্ত্রে ভালই বলা হইয়াছে;

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

'সতত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে হইবে, কদাপি বিস্মৃত হইবে না', সমুদায় বিধি ও নিষেধ স্মরণ ও বিস্মরণ এ দুয়ের কিঙ্কর।' যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, জীব যদি তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরোধী কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না', সুতরাং সে ব্যক্তি নিয়ত স্বভাবতঃ বিধিসিদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বদা সংসারের বিষয়ে নিমগ্ন সে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কার্য্যে রত, তাহা দ্বারা বিধিসিদ্ধ কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে, এরূপ কখন আশা করা যাইতে পারে না। প্রাচীনগণ যাহা বলিয়াছেন আমরা সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, এজন্য উপাসনশীল ব্যক্তি আমাদের নিরতিশয় বিশ্বাসের পাত্র।

প্রাচীন কালে এ নিয়ম সুদৃঢ় ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বিদেশীয় শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে এ নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিলে ভ্রান্তিতে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা আছে অনেকে মনে করেন। আমরা জানি, এখনকার অনেক শিক্ষিত লোক ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় ও দুর্জ্ঞেয় মনে করিয়া তাঁহার আরাধনা বন্দনা অসম্ভব মনে করেন। তাঁহাদের জীবনে নিত্যোপাসনা নাই, কিন্তু নীতির নিয়ম অখণ্ড্য জানিয়া তাঁহারা অতি যত্নসহকারে উহা প্রতিপালন করেন। তাঁহাদের প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে শুদ্ধচরিত্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সত্য বটে সাধারণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এ সকল ব্যক্তির উপরে আস্থা রাখা যাইতে পারে, কিন্তু এ সকল ব্যক্তি সকল স্থলে আপনাদের নীতিমত্তা রক্ষা করিতে পারিবেন কি না তৎপক্ষে সন্দেহ। নীতিমান্ হইলে সাংসারিক, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুখাবহ হইবে, এরূপ বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা তাদৃশ জীবন নির্ব্বাহ করেন, বর্ত্তমান জীবনের অনন্ত জীবনের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের প্রতি কখন সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। কারণ যদি কোন একটি কার্য্যে এসংসারের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, অথচ তজ্জন্য কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার চক্রে ফেলিয়া কোন একটী সম্পদ্ হস্তগত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে লোকের নিকটে আপনার ন্যায়বত্তার পরিচয় দিয়া নিজের স্বার্থসাধনে তাঁহারা কেনই বা কুণ্ঠিত হইবেন? সংসারে সর্ব্বদা এইরূপ ঘটিতেছে। এজন্য যাঁহাদের চিত্তে ঈশ্বরভয় ও ঈশ্বরানুরাগ নাই তাঁহারা আমাদের সম্যক্ আস্থার পাত্র হইতে পারেন না।

তুমি বলিবে, সংসারে অনেক লোকেই তো

কোন না কোন আকারে ঈশ্বরের পূজা বন্দনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রলোভনে পড়িয়া আপনাদিগকে ঠিক রাখিতে পারেন না, ইহা কি আমরা স্বচক্ষে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি না? ঈশ্বরের পূজা বন্দনার ফল ঈশ্বরভয় ও ঈশ্বরানুরাগ। এ দুই যেখানে নাই, সেখানে পূজা বন্দনা নামমাত্র, প্রাত্যহিক অন্যান্য সামান্য কৃত্যের মধ্যে উহা গণ্য। আমরা ঈদৃশ পূজাবন্দনাকে কদাপি ঈশ্বরের পূজাবন্দনা বলি না। প্রাচীন বংশের লোকগণের মধ্যে অনেকে মিথ্যাপ্রমাণ-সংগ্রহের ভয়ে অপরের সম্পত্তি হরণ করা দূরে থাকুক্ আপনাদের পৈতৃক প্রচুর সম্পত্তি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুতরাং ঈশ্বরভয় ও ঈশ্বরানুরাগ যে হৃদয়ে আছে সে হৃদয় যে কখন জ্ঞানপূর্ব্বক পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে না ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ। যে নীতি পৃথিবীর ব্যবহারঘটিত, অনন্ত জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য, সে নীতিতে নীতিমান্ ব্যক্তির প্রতি কিরূপে আস্থা স্থাপন করা যাইবে? যাঁহাদের নিকটে এ জীবনই সর্ব্বস্ব নহে, অনন্ত জীবনের অনন্ত কল্যাণের প্রতি যাঁহারা দৃঢ় আস্থাবান্, তাঁহাদের সে জীবনে অনীতি ঘটিবে কি প্রকারে?

উপাসনার প্রতি নিষ্ঠা আছে, প্রতিদিনের উপাসনা যথানিয়ম যথাসময় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, সামাজিক উপাসনায় কোন দিন অনবধান নাই, ঈদৃশ উপাসনানিষ্ঠ ব্যক্তির জীবনে কি অসদাচারণ প্রকাশ পায় না, এই কথা কহিয়া অনেকে আমাদের কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরভয় ও ঈশ্বরানুরাগপ্রণোদিত পূজা বন্দনা ভিন্ন উপাসনা হয় স্বীকার করি না, তখন আমরা যাহাকে উপাসনাশীলতা বলি তাহাই এস্থলে গ্রহণ করিতে হইবে তদ্বিপরীত নহে। কোন ব্যক্তির বাহ্য উপাসনাশীলতা দেখিয়া আমাদের ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা আছে ইহাও আমরা স্বীকার করি না, কেন না লক্ষণ দেখিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায়, এ ব্যক্তিতে ঈশ্বরভয় ও ঈশ্বরানুরাগ আছে কি না? ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের স্বরূপবিষয়ে যে ভ্রান্তি আছে, তাহাতে অনেক সময়ে আমাদের সিদ্ধান্তের বিপরীত ঘটনা ঘটিতে পারে, কিন্তু যদি একবার সেই সেই সম্প্রদায়ের ঈশ্বরের স্বরূপবিষয়ক জ্ঞান আমরা জানিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে, সে ভ্রান্তিরও সম্ভাবনা থাকে না।

ঈশ্বরের আহূত।

আমরা সকলেই এ সংসারে আপনা হইতে আসি নাই, কেহ আমাদিগকে এখানে আনিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন কার্য্যকারণযোগে আমরা এ পৃথিবীতে আসিয়াছি, কে আর আমাদিগকে আনিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্ফল। তাঁহারা যখন মনে করিতেছেন, কার্য্যকারণযোগে তাঁহারা এ পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তখন যে কার্য্যকারণযোগে তাঁহারা জন্মলাভ করিয়াছেন, সেই কার্য্যকারণানুরূপ তাঁহাদের জীবন হইবে, তাঁহারা সে কার্য্যকারণের অতীত স্থলে আপনাদের জীবন স্থাপন করিবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা দৃশ্যমান কার্য্যকারণশৃঙ্খল অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকারণের কারণের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন যে অন্য প্রকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

জনসমাজে আমরা দুই প্রকারের লোক দেখিতে পাই, এক প্রকারের লোকে পার্থিব জীবন নির্ব্বাহ করিয়া সন্তুষ্ট, আর এক প্রকারের লোক পার্থিব জীবনের উপরে স্বর্গীয় জীবন আছে জানিয়া তল্লাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ পার্থিব কার্য্যকারণশৃঙ্খলে আপনাদিগকে নিয়ত আবদ্ধ দেখিতে পান, এবং সে শৃঙ্খল হইতে কখন আপনাদিগকে প্রমুক্ত করিতে পারিবেন, এ আশা হৃদয়ে পোষণ করেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক পার্থিব কার্য্যকারণের শৃঙ্খলকে এমন এক মহান্ শক্তির দ্বারা নিয়ত পরিচালিত দেখেন

যে, সে কার্য্যকারণশৃঙ্খল আর তাঁহাদের নিকটে পার্থিব বলিয়া গণ্য নহে, স্বর্গীয়। দুই শ্রেণীর ঈদৃশ দৃষ্টির তারতম্যে জীবনে যে বিশেষ তারতম্য হয়, ইহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। অন্ধকার্য্য-কারণশৃঙ্খলে যাহারা আবদ্ধ তাহারা সুখী হয়, কিন্তু এ সুখ চিরস্থায়ী হইবে তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোন আশা নাই; কেন না সেই অন্ধ কার্য্যকারণশৃঙ্খল কখন আবার দুঃখ আনিয়া উপস্থিত করিবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে তাঁহারাই বুদ্ধিমান্, যাঁহারা সুখ ও দুঃখ উভয়ের মধ্যে অপরাজিত চিত্ত থাকিতে পারেন, সুখে বা দুঃখে কিছুতেই অতিমাত্র উল্লসিত বা বিষাদগ্রস্ত হন না। তাঁহারা এইরূপে মানবাত্মার মহত্ত্বের পরিচয় দেন বটে, কিন্তু জীবন তাঁহাদের মধুরতা-শূন্য।

যাঁহারা বিশ্বাস করেন কার্য্যকারণশৃঙ্খল অন্ধ নহে, এক মহান্ শক্তি দ্বারা পরিচালিত, এবং সেই শক্তি আমাদের কল্যাণের জন্য সুখ দুঃখ প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন অন্যপ্রকার। পিতামাতা সন্তানের কল্যাণের জন্য দণ্ডই দিন বা আদরই করুন, উভয়েতেই সন্তানের হৃদয়ের মধুরতা কিছুতেই বিনষ্ট হয় না, ইঁহাদের জীবনও সেই প্রকার। কিন্তু এ শ্রেণীরও ঊর্দ্ধে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাদের জীবন দ্বারা বিশেষ কার্য্য সাধন করিয়া লইবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পার্থিব জীবন দিয়াছেন। তাঁহাদের জীবন ব্যক্তিনিষ্ঠ নহে, নিজের স্বার্থসাধনের জন্য নহে, কিন্তু সমুদায় নরজাতির কল্যাণবর্দ্ধনের জন্য ঈশ্বরের চরণে বিক্রীত। ঈদৃশ ব্যক্তিগণকে আমরা ঈশ্বরের আহূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এ কথা সত্য যে, প্রত্যেক নরনারীর জীবন অনন্ত সম্পদ্ লাভের জন্য সৃষ্ট, এবং সে সম্পৎ তাঁহাদিগের লাভ হইবেই হইবে, কিন্তু অনন্তসম্পদের উত্তরাধিকারী হইলেই যে বিশেষকার্য্যসাধনের জন্য সংসারে তাঁহারা প্রতিজন নিযুক্ত, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যদি তাঁহারা কোন বিশেষ কার্য্য সাধন জন্য নিযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিত। যদি সে প্রকার প্রমাণ প্রতিনরনারীর জীবনে দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ কার্য্যের জন্য আহূত বলিয়া অপর এক শ্রেণী আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে হইতেছে।

অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ত্রিবিধ শ্রেণীর কথা প্রাচীন গ্রন্থে রূপান্তরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যথা বিষ্ণুপুরাণে,

ব্রহ্মভাবাত্মিকা হ্যেকা কর্ম্মভাবাত্মিকা পরা।
উভয়াত্মিকা তথৈবান্যা ত্রিবিধা ভাবভাবনা॥
সনন্দনাদয়ো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মভাবনয়া যুতাঃ।
কর্ম্মভাবনয়া চান্যে দেবাদ্যাঃ স্থাবরাশ্চরাঃ॥
হিরণ্যগর্ভাদিষু চ ব্রহ্মকর্ম্মাত্মিকা দ্বিধা।
বোধাধিকারযুক্তেষু বিদ্যতে ভাবভাবনা॥

"ভাবনা তিন প্রকার, (১) ব্রহ্মভাবাত্মক, (২) কর্ম্মভাবাত্মক, (৩) ব্রহ্ম ও কর্ম্মভাবাত্মক। সনন্দাদি ঋষিগণ ব্রহ্মভাবনাযুক্ত, দেবাদি স্থাবর জঙ্গম সকলেই কর্ম্মভাবনাযুক্ত, হিরণ্যগর্ভাদি ব্রহ্ম ও কর্ম্ম উভয়বিধ ভাবনাযুক্ত, কেন না ইঁহাদের জ্ঞান ও কর্ম্মে অধিকার দুইই আছে।" ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, সকল জীবকে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। যাহারা কেবল কর্ম্মানুষ্ঠায়ী তাহাদিগের মধ্যে তাহারা নিকৃষ্ট যাহারা কার্য্যকারণশৃঙ্খলের দাস হইয়া অবশভাবে কার্য্যের অনুসরণ করে। কোন কোন ব্যক্তি বিবিধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মচিন্তন ব্রহ্মানুধ্যান প্রভৃতি লইয়া জীবন অতি-বাহিত করেন, তাঁহারা সেই শ্রেণীর ব্যক্তি যাঁহারা ব্রহ্মের কল্যাণগুণ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া জীবন অতিপাত করেন। তাঁহারা পরের বিষয় ভাবেন না, আপনি এবং ব্রহ্ম এই উভয় লইয়া তাঁহাদিগের জীবন ব্যাপৃত। ব্রহ্মচিন্তনানুরত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন এবং যে সকল কার্য্য করিতে ব্রহ্ম বিশেষভাবে নিযুক্ত করিয়াছেন সেই কার্য্য করিতে যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে আমরা আহূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

আহূত এবং অনাহূত এ উভয়ের প্রাপ্য একই ; প্রভেদ এই মাত্র যে আহূতগণ দ্বারা জগতের হিতের জন্য ভগবান্ কোন কোন বিশেষ কার্য্য করিয়া লন। এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহারা ঈশ্বর ও মানবের নিকটে দায়ী। তাঁহারা যদি ভারপ্রাপ্ত কার্য্যসম্বন্ধে অণুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কঠিন বিচার উপস্থিত হয়। অন্য লোকে যে কার্য্য করিলে জনসমাজে নিন্দনীয় হয় না, তাঁহারা যদি সেই কার্য্য করেন, তাঁহাদের নিন্দায় সমুদায় দেশ পূর্ণ হয়। অপরের যাহা সামান্য ত্রুটি, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাহা মহাপরাধ। লোকে তাঁহাদিগের কথা লইয়া কত আন্দোলন করে ; তাঁহাদের নিন্দা অপমানে যেন তাহাদিগের গৌরব বাড়ে। অনেক সময়ে তাহারা তাঁহাদিগকে পৃথিবীর বিচারাসনের নিকটে উপস্থিত করিয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করে। এ সকলই আহূত জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে পরিগণিত। সাধারণ কার্য্য লইয়া যাহাদিগের জীবন ব্যাপৃত, তাহাদের কে সংবাদ লয়, কিন্তু যাঁহারা বিশেষ কার্য্যের জন্য আহূত বলিয়া পৃথিবীর নিকটে আপনাদিগকে উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তজ্জন্য লাঞ্ছিত হইতেই হইবে। আহূতগণের জীবন এইরূপ বহুপরীক্ষাসঙ্কুল, এই জন্য অমরা তাঁহাদিগকে সমাদর করি, তাঁহাদিগের প্রতি আমরা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ করি। ঈশ্বরের আহূতগণের সঙ্গে পৃথিবীতে বাস, এতদপেক্ষা আর জীবনের সার্থকতা কি আছে? তাদৃশ সৌভাগ্যলাভ আমরা নিয়ত আকাঙ্ক্ষা করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। সংসারী লোকেরা আমাকে আশ্রয় করিয়া বিষয়কর্ম্ম করে। তাহারা বিষয়কর্ম্মের অনুরোধে কেমন মিলিয়া মিশিয়া থাকে, কেহ কাহারও অসন্তোষ জন্মায় না। আহার পান ভোজনাদি সকল বিষয়ে অসুবিধা উপস্থিত হইবে, ইহা আমি তাহাদিগকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেই, আর অমনি তাহারা ভালমানুষ হইয়া যায়। তোমার সম্বন্ধে তো একথা বলা যাইতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি তোমার অধীন হয় তাহারা অন্নবস্ত্রাদি কিছুরই ভাবনায় যে, মাথা হেঁট করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং এক বার তুমি সেখানে বিরোধের আগুন জ্বালাইয়া দাও, সে আগুন থামায় কাহার সাধ্য? আমায় ছাড়িয়া যাহারা তোমার অনুসরণ করে, এমন যে প্রিয় প্রাণ তাহা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দিতে হয়। মানুষগুলিকে এরূপ পাগল করিয়া দেওয়া কি ভাল?

বিবেক। আমি চিরকাল লোকদিগকে পাগল করিয়া দিয়াছি, আমার আশ্রয় লইলেই পাগল হইতে হয়, বুদ্ধি, তুমি এ আর নূতন কথা কি বলিলে? পৃথিবীর বুদ্ধিমান্ লোকেরা অতিরিক্ত বিবেকী হওয়াকে পাগলাম বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে প্রতিব্যক্তির ততটুকু বিবেকী হওয়া উচিত, যাহাতে পৃথিবীর সুখ সুবিধা বজায় থাকে, লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া বিশ্বাস করে, আর ব্যবসায় বাণিজ্য ভাল করিয়া চলে। বিবেকের অনুরোধে সংসারের সুখত্যাগ, আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বিচ্ছেদ, জনসমাজকে উলটপালট করিয়া দেওয়া, বুদ্ধিমানেরা ইহাকে অতিরিক্ত বিবেকিত্ব বলিয়া উপহাস করে? তাহারা বলে, বিবেক বিবেক করিয়া এত চিৎকার কেন? প্রবৃত্তি, অভিলাষ, ইচ্ছা, এগুলি কি আর ঈশ্বরপ্রদত্ত নয়? এ গুলিকে বিদায় দিয়া এক বিবেককে বাড়ান, ইহা কি বাড়াবাড়ি নয়? অতিরিক্ত পাগলাম নয়? মুষা আমার জন্য তাঁহার লোকদিগের নিকট অপ্রিয় হইলেন, ঈশা আমার জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন। আমার জন্যই তো ঈশা বলিয়াছিলেন, আমি শান্তি দিতে আসি নাই, বিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়াছি ; পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ভগিনীতে আমার জন্য অমিল হইবে। বুদ্ধি, তুমি বোঝ সাংসারিক জীবন, যাহারা তোমার অনুসরণ করে, তাহাদের সংসার সর্ব্বস্ব। সংসারের জন্য যাহারা ঈশ্বর, সত্য ও ধর্ম্মকে খর্ব্ব করিতে পারে, তাহারা তোমার দোহাই দিবে না তো আর কাহার দোহাই দিবে? আশু সুখে যাহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে, তাহারা তোমা বই আমাকে চাহিবে কেন? অগ্রে সুখ পরে তীব্রযাতনা, অগ্রে দুঃখ পরে নিত্য সুখ, ইহার কোন্‌টি ভাল?

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে, আমি কি আর তাহা বুঝি না? প্রবৃত্তিবাসনা চরিতার্থ করিতে আগে সুখ হয়, পরে তাহা হইতেই তীব্র যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। মানুষ পশু, ইহাতো আর তোমার অবিদিত নাই। যাহারা পশুর ন্যায় আশু সুখ চায়, তাহারা ফলাফলচিন্তায় আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমিইবা তাহাদিগকে আশ্রয় না দিয়া কি করি? যখন যাতনা পাইয়া তাহারা ফিরিয়া আইসে, তখন আমিই তো তোমার আলোকে আলোকিত হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি নামে আখ্যাত হইয়া থাকি। তোমাতে আমাতে বিরোধ নাই, মাঝে যে বিরোধ ঘটে তাহা সেই সেই ব্যক্তির শিক্ষার জন্য।

বিবেক। তোমার এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাতে আমাতে বাস্তবিক বিরোধ নাই। নীচ প্রবৃত্তি বাসনা বিরোধ ঘটাইয়া তোমাকে স্বদলে ডাকিয়া নেয়, তুমি গিয়া যুক্তি দিয়া বিপাকে

ফেল। তোমার উদ্দেশ্য ইহাতে ভাল বটে, কিন্তু মাঝে বিপাক ঘটানটা কি তত ভাল?

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আমিত্বের বিদায়।

১৮ই ফাল্গুন, রবিবার, ১৮১৮ শক।

ঈশ্বরতনয় ঈশা বেদান্তের উচ্চতম যোগধর্ম্ম আপনার জীবনে দেখাইলেন। তিনি এ যোগ পাইলেন কোথায়? তিনি কি ভারতবর্ষে আসিয়া ঋষিগণের নিকট যোগধর্ম্ম শিখিয়াছিলেন? ইতিহাসতো ইহার কোন প্রমাণ দেয় না। দুই এক জন আশুপ্রত্যয়ী লোক এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারে, কল্পিত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ঋষিদিগকে যিনি যোগধর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন, তিনি আপনি তাঁহার ঈশাকে সেই যোগ শিখাইলেন, এ কথা সর্ব্বপ্রকারে বিশ্বাসযোগ্য। ঈশা অপর দশ বিষয়ে শিক্ষার জন্য যাঁহার উপরে নির্ভর করিতেন, যাঁহার নিকটে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিখিতেন, তিনিই এই উচ্চতম যোগও শিখাইয়াছেন, এ আর একটা অসম্ভব কথা কি? তিনি যোগের যে সহজ পথ ধরিয়াছিলেন তাহাতো আর কোথাও নাই। "তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি যে ভগবানের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন। "আমি তোমাতে তুমি আমাতে" বলিতে বলিতে তিনি 'পাত্রের জল সমুদ্রে ফেলে দিয়ে পিতার সঙ্গে একাকার নিরাকার হইয়া' গেলেন। তাঁর কোন কামনা ছিল না, বাসনা ছিল না, ছিলেন কেবল এক পিতা। তিনি তাঁর 'আমিকে' পিতাতে উড়াইয়া দিয়া 'ঈশা নাই' হইলেন, এ কি সামান্য কথা, সামান্য যোগ। একেবারে আমি নাই, ইহার চেয়ে যোগ আর কি গভীর হইতে পারে? তিনি কিছুমাত্র আপনার ইচ্ছা রাখিলেন না। যখন বিন্দুমাত্র আপনার ইচ্ছা রাখিলেন না, তখন আর তিনি রহিলেন কোথায়? ইচ্ছা না থাকিলে কি স্বতন্ত্র আমি থাকিতে পারে? ভগবানের ইচ্ছা যখন সকল অধিকার করিল, জীবের ইচ্ছা চলিয়া গেল, তখন জীব 'নাই' হইয়া গেল। জীব 'নাই' হইলে আমিও চলিয়া গেল। কেশবচন্দ্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, "কামনাও চাই না, বাসনাও চাই না, পুণ্যও চাই না, পাপও চাই না, চাই কেবল ঈশার মত 'ঈশা নাই' হইতে।"

"জীবের জীবত্ব দূর হয়ে যাবে, আমি তুমি হয়ে যাব," কেশবচন্দ্রের এ কথা কি ঘোর অদ্বৈতবাদের কথা নয়? "ভগবান্, তুমি আমি, আমি তুমি" "আমি যে,ইনি সেই ; ইনি যে, আমি সেই" * বেদান্তবাদিগণের এ সকল কথার সঙ্গে এ কথার কি প্রভেদ? বেদান্তবাদিগণের নিকট শরীরের সম্বন্ধে যেমন আত্মা, আত্মার সম্বন্ধে তেমনই পরমাত্মা, শরীর ও আত্মাকে অভিন্ন ভাবে যেমন সকলে দেখে, আত্মা ও পরমাত্মাকে তাঁহারা তেমনি অভিন্ন ভাবে দেখিতেন। 'আমি তুমি হয়ে যাব' ইহার অর্থ আমি আর থাকিব না, আমার স্থান তুমি অধিকার করিবে, অন্য কথায় আমি তোমাতে পূর্ণ হইব। বেদান্ত আত্মাকে ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় করিয়া ব্রহ্মকেই 'আমি তুমি তুমি আমি করিয়া লইয়া' এই 'আমি তুমির' ভিতরে জীবাত্মাকে ডুবাইয়া দিয়াছেন, কেশবচন্দ্র জীব ও ব্রহ্মের শরীর ও শরীরী সম্বন্ধ কল্পনা না করিয়া 'আমির' স্থলে 'জীবকে' আনিয়া বসাইয়াছেন। তিনি যে, এইরূপই করিয়াছেন, অন্য এক প্রার্থনায় তাহা বিলক্ষণ প্রকাশিত আছে,—"আগে 'আমি আমি' এই ব'লে মানুষ পশু চেঁচাইত, আর এখন ভগবান্, 'তুমি তুমি' বলে তোমার জয়ধ্বনি করে। এখানে 'আমি' না সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে সুখ নাই।" "সংসারের রাজ্যে দুই পাঁচটা মানুষ খুন করিলে পাপ হয়, আর এখানে একবার আমি বল্লে মহা অন্যায়। আর রসনা অনেক দিন না বলে আমি কথাটা যেন ভুলে গিয়েছে।" এ যোগ কিরূপ?—জীবের স্বরূপবিনাশ নয়, তাহাও স্পষ্ট এই প্রার্থনায় উল্লিখিত আছে,—"যদিও বড় কাঁটা ও ছোট কাঁটা, তবুও যোগের শুভ দুই প্রহর হইবামাত্র দুই কাঁটা এক হইয়া যায়। তোমার ইচ্ছা আমার বুকের ভিতর ধড়ফড় করে।" "কাজ করিতেছ তুমি আমি কেবল ধামাধরা।"

পূর্ব্বতন ঋষিগণ হিমালয় শিখরে বসিয়া ব্রহ্মেতে আত্মসমাধান করিয়া সর্ব্বথা অহম্‌শূন্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই পদার্থমধ্যে গণ্য ছিল না। জুডিয়াতে মহর্ষি ঈশা আপনাকে উড়াইয়া দিয়া পিতাকে আপনার স্বর্ব্বস্ব করিলেন; আপনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া পিতার ইচ্ছাকে সমুদায় জীবনের নিয়ামক করিলেন। ভারতের ঋষিগণ এবং জুডিয়ার মহর্ষি ঈশা এ উভয়ের সঙ্গে একাত্মা হইয়া কেশবচন্দ্র সর্ব্বপ্রধান অহম্‌কেই বিলুপ্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি হিমালয়ে স্থিতি করিয়া পাশ্চাত্য দেশের জন্য অধিভূত এবং আধ্যাত্মযোগ নিবদ্ধ করেন, তাহাতে তিনি অহম্‌কে প্রাণনাশক অমঙ্গলের আকর শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অহম্ মায়াপুরুষ, ভ্রম হইতে উৎপন্ন, এ কথা বলিতেও তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। "রে মারাত্মক শত্রু, দূর হ" বজ্রনির্ঘোষে যোগী এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র অহম্ পলায়ন করিল, অন্তর্হিত হইল, পরমাত্মা যোগীর নিকট প্রকাশিত হইলেন, কেশবচন্দ্র আপনার জীবনের পরীক্ষিত

* "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি ভগবো-দেবতে।" "তদ্যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্।" আত্মার আত্মা এই ভাবে উপাসনা করিবার—"আত্মেত্যেবোপাসীত"—ব্যবস্থা বশতঃ বেদান্ত অভিন্ন ভাব সর্ব্বদা প্রদর্শন করেন। "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতিন স বেদ।" উপাস্য দেবতা এক, আমি আর এক, এইরূপ বোধ বেদান্তে অজ্ঞানতা বলেন।

ব্যাপার হইতে একথা স্পষ্ট বলিয়াছেন। তিনি আপনি জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু বলিতেন না কহিতেন না। আমি গিয়া প্রকাশ পাইল কে? 'তুমি'। কেশবচন্দ্র 'আমিকে' ভুলিয়া শেষ জীবনে 'তুমিকেই' সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন। 'তুমি আছ, 'তুমি আছ' 'তুমিই বল' 'তুমিই শক্তি' 'তুমিই সর্ব্বস্ব' এইরূপ 'তুমি তুমি' বলিয়া আমিকে কেবল ধামাধরা করে রাখা, এ কিছু সামান্য যোগ নয়।

আমিকে বিদায় করিয়া না দিলে কোন দিন নির্ব্বাণ লাভ হয় না। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হইলে, বাসনা কামনা যায় না, বাসনা কামনা না গেলে চঞ্চল মনে ব্রহ্মদর্শন কোন কালে সম্ভবপর নয়। ব্রহ্মদর্শন জীবনে কোন দিন স্থায়ী হয় না, যদি আমি অন্তর্হিত না হয়। আমি যে হৃদয়ের কর্ত্তা হইয়া বসিয়া আছে, সে হৃদয়ে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে স্থাপিত হইবে। যেখানে আমির কর্ত্তৃত্ব, সেখানে ব্রহ্ম লুক্কায়িত। আমি ব্রহ্মের ভিতরে লুক্কায়িত না হইলে, ব্রহ্ম প্রকাশ পাইবেন কেন? কোন কোন বিষয়ে ব্রহ্মের অধীন হইলাম, কোন কোন বিষয়ে আপনার মতে চলিলাম এরূপ ব্যবস্থা যোগরাজ্যে চলে না। ঈশ্বরতনয় ঈশা যে যোগ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে আমি আমার বলিয়া কিছুই রাখিবার পথ নাই। একটু আমিত্ব প্রকাশ পাইলেই তিনি "দূর হ, শয়তান" বলিয়া দূর করিয়া দিতেন। তিনি তো আপনার 'আমিকে' বিদায় করিয়াই দিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যখনই কোন ঈশ্বরবিরোধী ইচ্ছা প্রকাশ পাইত, তখনই তিনি "রে শয়তান দূর হ" গম্ভীর নির্ঘোষে এই বাক্য উচ্চারণ করিতে কখন কুণ্ঠিত হন নাই। যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিত না, সাংসারিক ভাবে জীবন যাপন করিত, তাহাদিগকে তিনি 'পৃথিবীর সন্তান' বলিয়া অধঃকরণ করিতেন। যে কোন ব্যক্তির ভিতরে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী ভাব থাকিত, সে ব্যক্তি হইতে নরকের দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ অনুভব করিতেন। কত ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিল, কিন্তু এক কথায় তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইল। তাহারা 'পৃথিবীর সন্তান' সংসারের দাস, ঈশার সঙ্গী হইবে কি প্রকারে?

আমাদের ভিতরে আমিত্ব নিতান্ত প্রবল। আমি না থাকিলে আমাদের দিন চলে না। আমার মান, আমার সম্ভ্রম, আমার গৌরব, আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, এইরূপ আমার আমার না করিয়া আমরা সংসারে জীবন ধারণ করিতে পারি না। আমরা আমিকে লইয়াই আছি, আমি গেলে আমাদের কি থাকিল? আমরা ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা কিছু করি, এই আমির জন্য করিয়া থাকি। আমরা ঈশার মত আমিশূন্য হইব কি প্রকারে? লোকে আমায় ধার্ম্মিক বলিয়া জানুক, লোকে আমার যোগতপস্যার প্রশংসা করুক, লোকদিগের মধ্যে আমি এক জন গণ্য মান্য হই, এরূপ ভাব যত দিন আছে, আমিকে বিদায় করিয়া দিব ইহা কি কখন সম্ভব? ঈশা মকে বিদায় করিয়া দিয়া পুণ্যের সঙ্গে পিতার সঙ্গে চিরসংযুক্ত হইলেন, তাঁহার জীবনের ভিতর দিয়া পুণ্যের তেজ বাহির হইয়া কত পাপী অসাধু ব্যক্তিকে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিল। এই একত্বের জন্য ঈশা ক্রুশ আলিঙ্গন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না, দুঃখ বিপৎ পরীক্ষা কিছুতেই তাঁহাকে পরাভব করিতে পারিল না, তিনি সকল বিষয়ে সংসারের অতীত হইলেন, তিনি মৃত্যুর অধীন পার্থিব জীবন পরিহার করিয়া অনন্ত জীবন অধিকার করিলেন, স্বর্গের গৌরব তাঁহার ললাটদেশকে উজ্জ্বল করিল। ঈশ্বরতনয়ের এ সকল বিভব দেখিয়াও কি আমরা তাঁহার যোগের অনুবর্ত্তী হইব না? পৃথিবীর ছার গৌরব তিনি চাহিলেন না, কিন্তু পৃথিবীতে তাঁহার মত গৌরবান্বিত কে আছে? তিনি আমিকে বিদায় দিয়া সমুদায় স্বর্গের সম্পৎ অধিকার করিলেন, আর অধিক কি চাই?

আমি আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহার উৎপাতে আমাদের শান্তি নাই। যত দিন এই আমি আছে, তত দিন নরকের আগুন হইতে আমাদের পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা দেখি না। এই আমিটাকে হাত ধরিয়া বাহির করিয়া না দিতে পারিলে নরকের আগুন কিছুতেই নিবিবে না। প্রবৃত্তি বাসনা কামনা সকলই এই আমিকে আশ্রয় করিয়া আছে। জ্ঞান প্রেম পুণ্য শক্তি আমাদের আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্বর্গীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, এই আমির জন্য। আমির প্ররোচনায় সংসারের বিষয় ব্যাপার লইয়া যত ব্যস্ত হইতেছি, ততই দুঃখ ক্লেশ পাপ পরীক্ষা আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। যদি ঈশ্বরতনয় ঈশার পথ ধরিয়া "দূর হ মহাশত্রু" বলিয়া আমিটাকে বিদায় করিয়া না দি, তাহা হইলে আর শান্তিসুখের কোন আশা নাই। আমরা কি ঈশার মত এই মহাশত্রুকে বিদায় করিয়া দিতে পারিব না? ঈশাতো আপনার বলে ইহাকে তাড়াইতে পারেন নাই। তিনি পিতার বলে বলীয়ান্ হইয়া ইহাকে তাড়াইয়াছিলেন। আমরা যে নিতান্ত দুর্ব্বল, আমরা যে এই আমির পদানত হইয়া আছি। আমরা এই আমিকে বড় ভাল বাসি। পিতা পদাঘাত করিয়া এই আমির ঘর ভাঙ্গিয়া দিন। তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকে অবতরণ করুক। তাঁহার বলে বলী হইয়া এই মহাশত্রুকে বিদায় করিয়া দি। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া একত্ব লাভ করিয়া চির দিনের জন্য কৃতার্থ হই। কৃপানিধান পরমেশ্বর, আমাদিগকে অধম দুর্ব্বল জানিয়া এ সম্বন্ধে সহায়তা করিবেন, ইহাই আমাদিগের আশা।

উপাসনাবাস।

প্রার্থনা।

১১ই বৈশাখ, রবিবার, ১৮২১ শক।

হে লীলারসময় হরি, তুমি কত লীলা দেখাইলে। যুগে যুগে ভক্তগণকে লইয়া তুমি কত লীলাই না করিতেছ। আজ তোমার বিশেষ একটী লীলা আমাদিগের এই উপাসনাগৃহে দর্শন করিতেছি

যাহা কখন হয় নাই আজ তাহা হইল। আজ বেদীতে কেহ উপবিষ্ট নাই; তুমি যাঁহাদিগকে মনোনীত ক'রেছ তাঁহাদের মধ্যে কেহ আজ বেদীতে নাই। সেই জন্য বেদী আজ শূন্য। নিশ্চয় ইহার ভিতরে তোমার নূতন খেলা আছে; নিশ্চয়ই তুমি কোন লীলা দেখাইবে। যখন তোমার ভক্ত অন্ধকারে পথ হারান, তখন তুমি অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া বল "সন্তান! নিরাশ হইও না। অন্ধকার ক্ষণস্থায়ী, অন্ধকার দূর হইলেই আলোক দেখিবে, আলোক দেখিয়া সেই আলোক সম্ভোগ করিয়া ও আনন্দিত হইবে।" যখন মানুষের দুঃখ আসে তখন তুমি বল, "সন্তান দুঃখে অবসন্ন হইও না; বিশ্বাস কর, দুঃখ পাইয়া যে সুখ পায় সেই প্রকৃত সুখ পায়; দুঃখ না পাইয়া সুখ হয় না। এই দুঃখ তোমার কল্যাণের জন্য; এই দুঃখের অবসান হইলেই, তুমি সৌভাগ্যবান্ হইবে।" মা তোমার স্বর্গধাম আসিয়াছে; আপনার জীবনেই তাহা বুঝিতে পারিতেছি। এই ঘটনাতেই তুমি তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতেছ। অনেক দিন হইতে যাহা আশা করিয়াছিলাম সেই আশা পূর্ণ হইবার সুযোগ এখন আসিয়াছে। মা, আমাদের দিন অবসান হইতেছে; আমাদের জায়গায় নূতন নূতন লোক সকল—তোমার নূতন ভৃত্য সকল—আসিবেন। আজকার বেদী শূন্য এইজন্য। কেন একজন উপদেষ্টা বিদেশে গেলেন, আর একজন কেন রোগশয্যায় শায়িত? আর যাঁরা এখানে আছেন তাঁরা কেন অনুপস্থিত হলেন? ইহার মধ্যে অবশ্য তোমার শুভ ইচ্ছা আছে। তোমার কার্য্যের জন্য নূতন লোক আনিবে এই জন্যই এই সমস্ত ব্যাপার ঘটাইলে। মা তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমরা বৃদ্ধ, কবে যাইব জানি না। ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমাদের কার্য্যভার কে লইবে তাহা দেখিতে পাইলাম না। মা, তোমার বিশ্বাসী ভক্ত যে কাজ করিয়া গেলেন সে কাজ কখনও শেষ হইবে না; কখনও বন্ধও থাকিবে না; তোমার অপূর্ব্ব কৌশলে তুমিই সে কাজ চালাইবে। কাহার দ্বারা চালাইবে জানি না। যে মূর্খ ছিল সে তোমার কৃপায় বিদ্বান্ হইল, যে দরিদ্র ছিল সে ধনী হইল; অজ্ঞানী কত জ্ঞানের তত্ত্ব প্রকাশ করিল, যাহারা কিছুই জানিত না তারা কত অদ্ভুত কাজ করিল। মা অদ্ভুত তোমার লীলা; বিধানে তোমার লীলা খেলা অদ্ভুত। অবাক্ হইতে হয় আমাদের সহিত তোমার খেলা দেখিলে। আমাদের কিছুই নাই; জ্ঞান নাই, প্রেম নাই, পুণ্য নাই, অথচ আমাদের দ্বারাই তুমি সব করিতেছ। মানুষ ত কিছুই নয়; সে কেবল তোমার হাতের পুতুল বৈত নয়। তুমি তাহার ভিতরে থাকিয়া তাহাকে যাহা করাইতেছ সে তাহাই করিতেছে। মানুষের কোন গৌরব নাই; সবই তোমার। তুমিই স্বয়ং সব করিতেছ। মা হ'য়ে এসেছ সন্তানদের নিয়ে। কত লীলা ক'চ্ছ; তাদের দিয়ে কত কাজ করাচ্ছ, যত দেখি ততই অবাক্ হই। যুগে যুগে বিধান আনিলে; এক এক জন লোক আনিয়া কত কাজ করাইলে; জগৎ কত উপদেশ শুনিল। মা দয়াময়ী, এবারকার বিধানে যিনি আসিয়াছিলেন তিনি নিজকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন; তোমার নিকট হইতে যাহা শুনিতেন তিনি তাহাই বলিতেন। যাঁহাদিগকে তুমি তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলে তাঁহাদিগকে তুমি যত দিন কাজ করাইবে, তত দিন কাজ করিবেন। আবার নূতন কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইল; যুবকদিগের জন্য স্থান খালি হইল। মা, তুমিই তাহাদিগকে নিযুক্ত কর, তুমি ত বেদী শূন্য রাখিতে দিবে না। তুমি যাঁহাদিগকে তোমার বিশেষ কার্য্যে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়াছ তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে আন। তাঁহারা আজই—এই মুহূর্ত্তেই তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন; তোমার কার্য্য করিয়া আপনারা সুখী হউন, জগৎকে সুখী করুন। কত লোকে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। তোমার নূতন কর্ম্মচারী সকল আসিবেন সেই জন্য লোকে কত উৎসুক হইয়া আছেন। মা, তুমিই সেই সকল লোককে আনিয়া দাও। দয়াময়ী, আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। মা, আমি আর কি বলিব? আমি সেবক হইয়া, যাঁহারা তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া তোমার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের সেবা করিতে আসিয়াছি; মা তুমি আমার সব জান; আমি সেবার কার্য্য করিতে পারি, কিন্তু উপদেষ্টার কাজ করিতে পারিব না; উপদেশ দিতে গেলে আমার প্রাণ কাঁপে। মা, যাতে বেদী শূন্য না থাকে এমন কর; তোমার নূতন কর্ম্মচারী আনিয়া কাজ করাও; যাঁরা তোমার কৃপায় জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতিলাভ করিয়াছেন এবং আপনাদের জীবন তোমার চরণসেবায় নিয়োজিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই সকল যুবকদিগের দ্বারা তোমার কার্য্য করাও। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদেরও সেবা করিয়া আমি কৃতার্থ ও সুখী হই—তুমি এই আশীর্ব্বাদ আমাকে কর। যাঁহারা তোমার কাজে প্রাণ দিবেন তাঁদের সেবা করিয়া যেন আমি আপনাকে সুখী মনে করি। মা, তোমার শুভ ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ কর। তোমার কর্ম্মচারী তুমিই নিযুক্ত কর। যাঁদের প্রাণ তোমার চরণের জন্য কাঁদিতেছে তাঁহারা যেন আর বিলম্ব না করেন। অভাব বিলক্ষণ; তুমি সেই অভাব পূর্ণ কর। জগতে তোমার এই নবধর্ম্ম প্রচারিত হউক। লোকে তোমার চরণ পাইয়া কৃতার্থ হউক; মা, তোমার স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হউক, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর; আশা ও বিশ্বাসের সহিত সকলে প্রাণে প্রাণে এক হইয়া প্রণাম করি।

তহফতোল্ মওহদ্দিনের বঙ্গানুবাদ।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কৃত মূলপারস্য পুস্তকের অনুবাদ।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

মানবমণ্ডলীর যে সকল অবস্থা প্রকৃতি ও পরস্পর একান্ত সম্প্রীতিবশতঃ ঘটিয়াছে এবং তাহাদের গুণ সকলের বিভিন্নতা যে সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত স্বভাবসূত্রে বিদ্যমান এ বিষয় নির্ণয়ে যাঁহারা

যত্ন করেন, অপিচ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যাপারের সত্যাসত্য অনুসন্ধানে কাহারও পক্ষাবলম্বন ব্যতীত, বরং কাহারও কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সাধারণ্যে সুপ্রমাণিত তত্ত্বের অনুসন্ধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তাঁহাদের জীবন ধন্য। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের তত্ত্ব, নিগূঢ় মর্ম্ম, কার্য্যশ্রেণীর জ্ঞান যাহা মানবীয় পূর্ণতার প্রধান অঙ্গ, উহা আত্মপ্রবৃত্তিমধ্যে অতি কঠোর ও কঠিন আবরণে সম্বদ্ধ বলিয়া অধিকাংশ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মনেতা আপনাদের নাম চিরস্থায়ী ও সম্মানবৃদ্ধির জন্য কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মমত অলৌকিকতার দাবিতে, অথবা কথার বলে এবং লোকসমাজের ভাবের উপযুক্ত উপায়বিধানে অমিশ্র সত্যের আকারে প্রকাশ করিয়া বহুলোককে নিজের প্রতি এ প্রকার অনুরক্ত করিয়াছেন যে, অধীনতা ও আনুগত্যশৃঙ্খলে বদ্ধ সেই হতভাগ্য লোকেরা চক্ষু ও আন্তরিক দৃষ্টি সম্পূর্ণ হারাইয়া স্বীয় অগ্রণীর আদেশপালনবশতঃ যথার্থ দোষ হইতে গুণসকলকে পৃথক্ করিয়া লওয়া সম্পূর্ণ দোষের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকে; এবং ধর্ম্মের পক্ষপাতিত্ব ও তাহার সংরক্ষণ জন্য ক্রোধ, হত্যা ও অন্যের প্রতি উৎপীড়নকে বস্তুতঃ সত্যানুগত ও ইহা এক ধর্ম্মতরুর শাখা বলিয়া মহাপুণ্য মনে করে। তাঁহারা (ধর্ম্মনেতৃগণ) গুরুতর দোষে—যথা মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য, ব্যভিচারাদিতে (যাহা পারলৌকিক অশুভ ও সাধারণ অনিষ্টজনক হয়) প্রবৃত্ত সত্ত্বে তাঁহাদের জীবনগত বিশুদ্ধ মতকে পাপ হইতে মুক্তির কারণ জানিয়া অনুগামিগণ, বুদ্ধির অগম্য গল্প ও আখ্যায়িকাসকলের চর্চ্চায়—যাহাতে পূর্ব্বতন অগ্রণী ও বর্ত্তমান ধর্ম্মপথ প্রদর্শকদিগের প্রতি তাঁহাদিগের প্রভূত বিশ্বাসের কারণ হইয়া থাকে, আপনাদের দুর্ল্লভ সময় যাপন করে। যদি সরলপ্রকৃতিবশতঃ তাহাদের কেহ আপনার অবলম্বিত আস্থা ও বিশ্বাসের তত্ত্বানুসন্ধানে ইচ্ছু হয়, পরে ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের প্রকৃতির অনুরূপ সেই ব্যক্তি এইরূপ ইচ্ছাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ধর্ম্ম ও সংসারসম্বন্ধীয় বিপদের কারণ জানিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় পূর্ব্বতন গুরুজনদিগের আশ্চর্য্য ও অসম্ভবনীয় ব্যাপার এবং যাহাদের মধ্যে তাহারা জন্মিয়াছে ও প্রতিপালিত হইয়াছে সেই সকল লোকের স্বীকৃত ধর্ম্মমতের কল্যাণকারিত্বের প্রশংসাবাদ বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বে যে সেই সময়ে অন্তরে ধারণ ও সংক্রামণ সমধিক হয়, আত্মীয় ও প্রতিবাসীদিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ করা হেতু তাহাদের ধর্ম্মবিষয়ের সত্যতাসম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান এত দূর হয় যে, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ব অসত্য ব্যক্ত হওয়া সত্ত্বে তাহারা সেই অবলম্বিত মতকে অপর সমুদায় ধর্ম্মমতের উপর শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়া উহার মূল দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক প্রত্যহ সেই মতের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া থাকে। অনন্তর প্রকাশ যে, কোন বিশেষ ধর্ম্মমত এই প্রকার দৃঢ়তা ও স্থিরতার সহিত অবলম্বনের পর উপার্জ্জিত বহুবিদ্যাসত্ত্বে বয়ঃপ্রাপ্তকালেও এত বৎসরের স্বীকৃত মতের সত্যাসত্যানুসন্ধানে যত্ন ব্যতীত সত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে কোন সুপ্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে না, বরং সেই ব্যক্তি বিদ্যাপ্রভাব ও প্রতিভাবলে উত্তম ধর্ম্মতত্ত্বলাভের সমুচ্চ সোপানে আরোহণ করিবার প্রত্যাশায় আপন সংগৃহীত ধর্ম্মমতসম্বন্ধীয় প্রত্যয়ের দৃঢ়তার জন্য বুদ্ধিগত ও পরম্পরাগত প্রমাণ সকল উদ্ভাবনে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকে। সেই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্ধ অনুসরণকারিগণ যাহারা সর্ব্বদা অন্তরে স্বীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তাহারা একটি নবাবিষ্কৃত বচনকে বিচারসম্বন্ধে দৃঢ় অবলম্বনস্বরূপ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মের গৌরব ও অপর ধর্ম্মমত সকলের খর্ব্বতা সম্পাদন করে। যদি দৈবাৎ কোন ব্যক্তি পরিণামচিন্তায় ন্যূনতাবশতঃ আপন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূল প্রত্যয় ও জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন বা কোন একটী কথা উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সেই অসাবধান ব্যক্তিকে তাহার সমকালীন সমধর্ম্মাবলম্বী লোক সকল যথাসাধ্য বড়শাস্ত্রের অগ্রভাগে এবং সংহারসাধনের শক্তির অভাবে তীব্রবাক্যরূপ বড়শাস্ত্রের অগ্রভাগে সমর্পণ করিয়া থাকে। নেতাদিগের ক্ষমতার প্রসার ও তাঁহাদিগের অনুগামীদের আনুগত্যের অবস্থা এত দূর পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে যে, কোন দল শিলাখণ্ড সকলকে, কতক লোক উদ্ভিদ্ ও পশ্বাদিকে স্বীয় অগ্রণীদিগের উক্তির প্রতি বিশ্বাসবশতঃ আপনাদের একান্ত উপাস্য জানিয়া তদনুরক্তির প্রতিষেধ ঘটিলে ও তাহাদের মর্য্যাদার খর্ব্বতা হইলে তাহারা শোণিতপাত ও প্রাণদানকে ঐহিক গৌরব ও পারলৌকিক শান্তির কারণ মনে করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদের নেতৃগণও ন্যায় ও নীতির আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া অপর ধর্ম্মের পণ্ডিতদিগের ধর্ম্মমত সকলের সম্বন্ধে বুদ্ধিগত প্রমাণচ্ছলে আপনাদের স্পষ্ট অসত্য ধর্ম্মের সত্যতা সম্পাদনে কতকগুলি বচন উদ্ভাবন করিয়া চক্ষুহীন সাধারণ লোকদিগের বিশ্বাসের দৃঢ়তা সাধনের কারণ হইয়া থাকে। আমরা স্বীয় জীবনের অকল্যাণ ও কার্য্যের অপকারিতা হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

ব্রহ্মপরিচয়।

শাস্ত্রপাঠ—ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা উচিত, অনেক দিন উহা পাঠ করিয়াছি। কিন্তু মৃত শাস্ত্র কি জ্ঞান দান করিতে পারে, জড়পুথি কি কথা কহিতে পারে? আমার মনই কি শাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্ধার করিতে পারে? মূঢ় মন, অন্ধ আমি, কিরূপে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিব? যখন পরমগুরু প্রাণদাতার আশ্রয় গ্রহণ করি, তাঁহাকে লইয়া পুথি খুলি, পুথির অক্ষরে তাঁহাকে দেখি, তখন শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারি। যখন পুথির ভিতর প্রাণসখাকে লাভ করি, তখন পুথিকে চুম্বন করি। বলি, প্রাণেশ্বর তুমি, এই পুথির ভিতরে কেমন করিয়া লুকাইয়া ছিলে! এত কাল তোমায় না দেখিয়া কি কল্পিত সিদ্ধান্ত করিয়াছি,

আর এক্ষণ তোমায় শাস্ত্রের অভ্যন্তরে দেখিয়া কি রত্ন লাভ করিলাম! কি আশ্চর্য্য সঙ্কেত তুমি শিক্ষা দিলে! শাস্ত্র কি মধু বর্ষণ করিতেছে!

ব্রহ্মসাধকের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা যে, এক বার পরম গুরুকে সম্মুখে রাখিয়া গীতা, বাইবেল, আচার্য্যের প্রার্থনা উপদেশ নবসংহিতা প্রভৃতি যে কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিবেন, শাস্ত্র পাঠ কেমন লাভজনক। আমি এ প্রণালীতে বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

স্নানে পুণ্য—স্নানে পুণ্য সঞ্চারিত হয়, চিত্ত শান্তিরসসিক্ত হয়, ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। ব্রাহ্মসমাজে যখন জলাভিষেক-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তখন জলেতে ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া সুখ হইত। কিন্তু যখন স্বর্গীয় আচার্য্যদেবসহযোগে পবিত্রাত্মা ভগবান্ এই প্রথা প্রকাশ্যে প্রচার করিয়াছেন, তখন হইতে প্রায় নিয়মিতরূপে এই বিধি শিরোধার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। স্নেহময়ী জননীকে যখন স্নানের সময় জলের ভিতর দেখি, মার প্রেমবক্ষে যখন অবগাহন করি, সেই তাঁর সুকোমল হস্তে যখন তিনি আমার শরীর রগড়াইয়া দেন, তখন কি আরাম, কি শান্তি, কি নির্ম্মলতাই সম্ভোগ করি! যেমন শরীর তেমনি প্রাণ সুশীতল হয়। ধন্য মা আনন্দময়ী, কি সুখের বিধানই খুলিয়া দিয়াছ! ভক্তেরা এই জন্যই তোমার জলকে এত ভালবাসেন।

সাক্ষী

শ্রী বৈ—ঘোষ।

যোগসাধন।

স্বর্গগত ভাই শ্রীমৎকালীশঙ্কর দাস প্রণীত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সমাধি। ইহা যোগের শেষকৃত্য। সমাধি অধিকৃত হইলে মনুষ্যের আপনার পক্ষে আর করিবার অবশিষ্ট কিছু থাকে না। ফলতঃ সমস্ত বহির্বিষয় বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের সত্তাসাগরে ডুবিয়া যাইবার নাম সমাধি। এই সমাধি মনে করিলেই কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না। ইহা বিশেষ সাধন দ্বারা ক্রমে লাভ করা যায়।

প্রথমতঃ অপরিষ্কৃত ও বহু শাখায় বিভক্ত বুদ্ধিকে, নির্ম্মল ও নিশ্চয়াত্মিকা করিতে হইবে, এবং সেই পবিত্র বুদ্ধি দ্বারা অসংযত ও বিষয়বিক্ষিপ্ত মনকে নিয়মিত করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মিত-মনা হইয়া সেই নির্ম্মল বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ নামক আত্মাতে নিযুক্ত করিবে। আবার সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে কেবল বিশুদ্ধ নির্লিপ্ত আত্মাতে পরিণত করিতে হইবে *। আবার সেই নির্লিপ্ত কেবলাত্মাকে বিশ্বব্যাপী বিশ্বাধার পরমাত্মাতে অবরুদ্ধ করিয়া সাধক সমুদায় কার্য্য হইতে বিরত হইবেন *; কেন না, ইহার পর আর উৎকৃষ্ট প্রাপ্য কিছু নাই।

এই অঙ্গসমষ্টির নাম যোগ। এই অষ্টাঙ্গবিশিষ্ট যোগের প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ আছে। যথা—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ। জ্ঞানমাত্রসাধনে যে যোগসিদ্ধ হয়, তাহা জ্ঞানযোগ—ভক্তিমাত্রসাধনে যে যোগ সিদ্ধ হয়, তাহা ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মকে উপায় করিয়া যে যোগ সম্পন্ন হয়, তাহা কর্ম্মযোগ নামে খ্যাত। আবার এই জ্ঞানযোগ তিন অংশে বিভক্ত। শ্রবণযোগ, দর্শনযোগ ও স্পর্শযোগ। দৃষ্টির সাহায্যে যে যোগ সিদ্ধ হয়, তাহা দর্শনযোগ, শ্রুতির সাহায্যে যে যোগ সিদ্ধ হয় তাহা শ্রবণযোগ, এবং স্পর্শের সাহায্যে যে যোগ সিদ্ধ হয় তাহাকে স্পর্শযোগ বলা যায়। কিন্তু এই শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শন ইন্দ্রিয়মূলক নহে, জ্ঞানমূলক ও আধ্যাত্মিক; কেন না, আত্মা অশরীরী হইলেও তাহার শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শশক্তি প্রভৃতি আছে। এই সকল শক্তি সাধারণতঃ সূক্ষ্ম শরীর নামে অভিহিত †।

প্রথমতঃ পূর্ব্বকথিত প্রণালীর মধ্য দিয়া আপনাকে যোগ-যোগ্য করিতে হইবে, অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি বহিরঙ্গ যোগ অতি সুন্দররূপে অভ্যাস করিতে হইবে ‡। যদি সাধক যোগোপযুক্ত উপকরণ সকল হস্তগত করিতে পারেন, তবে নির্ব্বিঘ্নে যোগের পথে চলিতে পারিবেন। যদি না পারেন, পথে যাইতে ২ মৃত্যুমুখে পড়িবেন। কেন না, এ পথ কণ্টক-শূন্য নিরাপদ নহে। সাধক উপযুক্ত হইতে পারিলে অতি সহজেই ঈশ্বরের গৌরব ও সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ঈশ্বরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, বাহিরের কার্য্যকলাপের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবেন। যোগের অর্থ—ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলন। যদি বাহিরের কার্য্যে পাপ মলিনতা থাকিয়া যায়, তবে আর নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলনের আশা করিবেন কিরূপে?

একবার কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেই নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বরের প্রভাব স্মরণ বা শ্রবণ করিলে আর তাহা ভুলিতে পারা অসম্ভব। কেন অসম্ভব? সেরূপ গৌরবান্বিত সুন্দর বস্তু আর নাই এই জন্য।

---

* আত্মার অবস্থা দুইটি, একটি শরীরাভিমানবিশিষ্ট। এ অবস্থায় আপন ক্ষেত্ররূপ শরীর ও ধন, জন, গৃহ, বিদ্যা, বুদ্ধি, মান মর্য্যাদার বন্ধনে বদ্ধ। আর যখন কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাময় আত্মা অন্য কিছুতে লিপ্ত হয় না, তখন তাহাকে কেবলাত্মা কহে।

* মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েত্তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো লব্ধোপশান্তির্ব্বিরমেত কৃত্যাৎ॥
ভাগবত।

† শারীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ গীতা।

‡ এই সকল বহিরাঙ্গসাধনের স্থূল ভাব এই যে, বাহিরে যত পদার্থ আছে, তাহা ভুলিয়া একেবারে ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়া লওয়া। চিত্রকর যেমন চিত্র করিবার পূর্ব্বে ফলকে কালী মাখাইয়া লয় সেইরূপ। এরূপ করিলে সৃষ্টির আদিতে যেমন কেবল অন্ধকার ছিল, সেইরূপ হইবে। সেই আদিম অন্ধকার হইতে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির নিরাকার প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ; নতুবা কোন আকৃতির ভাব নিশ্চিত আসিবে।

(ধর্ম্মতত্ত্ব)।

শ্রবণ ও স্মরণাদি দ্বারা যদি তাঁহার প্রতি অনুরাগ হস্তগত করিতে পারা যায়, তবে অবিচলিত ভাবে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করা যাইবে। যে সাধক সহিষ্ণু হইয়া প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন, তিনিই প্রভুর প্রিয়। প্রভু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না *। পূর্ব্বে যেরূপ আসনের ও স্থানাদির ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ মনোজ্ঞ স্থান ও আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রতিদিন প্রভুর অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ—অন্য প্রয়োজন ও চিন্তাতে নিরপেক্ষ হওয়া। কিছুদিন এই রূপে অপেক্ষা করিতে পারিলে, একটি আলোকময় বল নিকটে আসিবে। সে আলোক ও বল কিসের, প্রথমতঃ বুঝা যায় না, এবং সাধক যে কোন স্থানে থাকেন, এই আলোক ও বল সঙ্গে থাকে; সুতরাং এত দিন যে ভাবিতেন সাধক একাকী, এখন আর সে ভাবনা থাকিল না। এখন চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিলে চক্ষু কাহাকেও দেখিতে পায় না, কিন্তু হৃদয় তাহা বিশ্বাস করে না। সে যেন সর্ব্বদাই কোন স্বর্গীয় বলে বলীয়ান্ ও স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত বলিয়া আপনাকে বিশ্বাস করে। কোটী কোটী ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও হৃদয়ে ভয় ও সঙ্কোচ জন্মে না।

(শ্রবণযোগ।)

এই দৈবী শক্তি দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিতে পারিলে আর একটি অবস্থা উপনীত হয়। সাধক পূর্ব্বে যে বলের প্রভাবে নির্ভীক হইয়া চলিতেন, তাহা কি ও কাহার বল জানিতেন না। এখন দেখিলেন, সে বল কেবল বল নহে, তাহার বাক্‌শক্তি আছে। বল কথা কহে। আশ্চর্য্য!! মুখ নাই, হস্তপদাদি নাই অথচ কথা আছে। সাধক শুনিলেন, সেই বলের ভিতর হইতে কে যেন বলিল "ভয় কি? চিন্তা কি? শক্তি কখন শূন্যে থাকে না, আধার আছে।" "বল যখন সঙ্গে আছে, তখন বলপ্রয়োক্তাও নিশ্চয় আছে।" এই বাক্য শুনিয়া সাধকের শরীর কণ্টকিত ও নিস্পন্দ ভাব ধারণ করে, এবং সাধক ভয় ও বিস্মিত চিত্তে চতুর্দ্দিক অবলোকন করেন। অবাক্ হইয়া চিন্তা করেন, ব্যাপার কি? কোথাও কেহ নাই, কথা কহে কে? সে শব্দ অতিমধুর। কেমন মধুর, তাহা নির্ব্বাচন করা যায় না। একবার শুনিয়াই সাধক উন্মত্ত হইলেন। আবার শুনিবার লালসা বাড়িল। কোথায় পাইবেন, তেমন শব্দ মাধুর্য্য বীণাতে নাই—কোকিলের গানেও নাই। তেমন অর্থগাম্ভীর্য্য বেদে নাই পুরাণে নাই, কোরাণে নাই, বাইবেলে নাই—সে এক নূতন শব্দ; অথচ দুর্ব্বোধ্য নহে শুনিলেই বুঝা যায়। সাধক এইরূপে এক দিন দুই দিন ক্রমে তিন দিন শুনিলেন; তাহার পর আর শুনিতে পান না। পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলেন, সে যেন স্বপ্ন কল্পিতের ন্যায় বোধ হয়; কিন্তু ভুলিতেও পারেন না। সুতরাং নীরবে নির্জ্জনে সেই শব্দের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন। গোলমাল ভাল লাগে না, বন্ধুবান্ধব ভাল লাগে না, স্ত্রীপুত্রাদি ভাল লাগে না। সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। সর্ব্বদাই মনে হয় "আর কেন শুনি না, আর কি শুনিতে পাইব না, কি উপায়ে শুনিব? কে শুনাইবে?" এইরূপে চিন্তাপরায়ণ সাধক আবার কখন সেই শুভযোগ আসিবে, তাহারই জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রতীক্ষা করেন। এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ যখন বড় ব্যস্ত হয়, বড় আকুল হয় সাধক উন্মাদগ্রস্ত লোকের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠেন। তখন আবার শুনিতে পান, প্রাণেশ্বর প্রাণের মধ্য হইতে বলিতেছেন; "আমি আছি ভয় কি"। * এই কথা শুনিয়া সাধক কিয়ৎকালের জন্য স্তম্ভিত ও বিস্মিত হন, আনন্দে তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। কিঞ্চিৎ পরে ধৈর্য্য ধরিয়া বসেন, এবং প্রশান্ত চিত্তে প্রাণেশ্বরকে নানাবিষয়ক প্রশ্ন করেন। যখন যাহা আবশ্যক অমনি জিজ্ঞাসা করেন, আর প্রাণেশ্বর প্রাণের মধ্য হইতে উত্তর প্রদান করিয়া সাধকের সংশয় দূর করেন। এই প্রশ্নোত্তর হইতে বেদ, পুরাণ, বাইবেল ও কোরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ ঈশ্বরপ্রসাদভোগী সাধক কোন বিশেষ পুস্তক-বদ্ধ জ্ঞান যাহার পরিমাণ অতি অল্প, তাহার অনুগামী হইয়া বদ্ধ ভাবে চলিতে পারেন না। † অসীম আকাশ বিহারী বিহঙ্গ যেমন পিঞ্জরে থাকিতে চায় না, সেইরূপ। অসীম আকাশ যাহার সঞ্চরণ স্থল, সে অল্পায়তন পিঞ্জরে সুখী হইবে কেন; যাহার ভোগ্য সাগরের জল, সে কুপজলে পরিতৃপ্ত হইবে কেন। ‡ সাধক আপন প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প প্রভৃতি সমুদায় জ্ঞানের আকর পাইয়াছেন, আর তিনি সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে সুখী হইবেন কেন। তাঁহার অভাব বোধ হইলেই সেই আকরে হস্তপ্রদান করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সকল অভাব দূর হইয়া যায়। বেদের অর্থ, পুরাণের অর্থ, বাইবেলের অর্থ, কোরাণের অর্থ, সকল অর্থই তাঁহার প্রাণেশ্বর তাঁহাকে বলেন। পূর্ণ জ্ঞানের কথা শুনিয়া তিনি একেবারে মাতিয়া যান। (ক্রমশঃ)

* অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ গীতা।

* অশিরস্কহকারাভমশেষাকারসংস্থিতম্।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে॥ যোগবাশিষ্ঠ।

† যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ গীতা।
প্রায়েণ মুনয়ো ব্রহ্মন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ। ভাগবত।

‡ যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্॥ উপনিষৎ।

সংবাদ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয় ভাষ্য সংস্কৃত চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, বাঙ্গালা চতুর্থ খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। সংস্কৃত ছয় খণ্ডে এবং বাঙ্গালা দশ খণ্ডে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। সংস্কৃত সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৩৷৷৵০ আনা এবং বাঙ্গালা সম্পূর্ণ খণ্ডের মূল্য ৩।৵০ আনা। যাঁহারা পূর্ব্বে গ্রাহক হইয়া উহা প্রকাশিত হইবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারা সংস্কৃত সম্পূর্ণ খণ্ডের জন্য ৷৵০ আনা এবং বাঙ্গালা সম্পূর্ণ খণ্ডের জন্য ১৷৷৵০ পাঠাইবেন।

গত ১৯শে চৈত্র শ্রীযুক্ত বিহারীলাল নাথের জননীর আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার ধোপাপাড়াস্থ পৈতৃক বাসভবনে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় ও কলিকাতাস্থ কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধু এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

পঞ্জাবাস্থ শ্রীমান্ লালা নানক চাঁদ ভগবানের আদেশে প্রচার ব্রতগ্রহণার্থী হইয়া শ্রীদরবারে আবেদন করিয়াছেন। শ্রীদরবার কর্ত্তৃক আবেদন গৃহীত হইয়া যথাবিধান একবর্ষকাল শিক্ষা ওনিয়মাধীনে থাকিতে হইবে এই উপদেশ তাঁহাকে দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি পঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিলেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র স্বর্গীয় ভাই কেদার নাথ দের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহোপলক্ষে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছেন।

ভবানীপুরস্থ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন মোহন সেহানবীসের বাসভবনে প্রতি বৃহস্পতিবার উপাসনা হইতেছে। শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেন ও প্রমথ লাল সেন ক্রমান্বয়ে উপাসনা করিয়াছেন। স্থানীয় ও কলিকাতাস্থ বন্ধুগণ তাহাতে যোগ দান করিয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছেন।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিখিত হইতেছে, চট্টগ্রামস্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাসের একটি পুত্র এবং একটী কন্যা তাহাদের পিতাকে শোকাকুল করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছে। ৭ই এপ্রিল কন্যাটীর এবং ১০ই এপ্রিল পুত্রটির পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। আমাদিগের গভীর সহানুভূতি এই শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি আমরা প্রকাশ করিতেছি। জগজ্জননী এই শোকার্ত্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করুন এবং পরলোকগত আত্মা দুটিকে তাঁহার শান্তিপ্রদ ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ করুন,এই প্রার্থনা।

শ্রীমান্ প্রমথ লাল সেন গত ৪ঠা বৈশাখ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য অনেকগুলি ব্রাহ্ম জাহাজ ঘাটে গিয়াছিলেন। তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে যুবকগণের প্রার্থনা সমাজে, ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটে, ভবানীপুরে এবং কলুটোলাস্থ আচার্য্যদেবের পৈতৃক বাসভবনে বিশেষ উপাসনা ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল। নববিধানপ্রচারোদ্দেশে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ভগবান্ তাঁহার সেই কার্য্যের সহায়তা ও উন্নতির পক্ষে সহায় হউন, এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন ;—"আমি গত রবিবার অপরাহ্নে ময়মনসিংহে পঁহুছিয়া সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিয়াছি। অত্রত্য সেশন জজ শ্রীমান্ অম্বিকাচরণ সেন এবং অপর কয়েকটি ভদ্রলোক উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। বিগত ভীষণ ভূমিকম্পে পূর্ব্বতন মন্দির ভূমিসাৎ ও চূর্ণীকৃত হইয়াছে। প্রিয় ভ্রাতা দীননাথ কর্ম্মকার ও চন্দ্রমোহন কর্ম্মকারের বিশেষ যত্ন চেষ্টায় এবং জজ বাহাদুরের বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্যে মন্দির এক প্রকার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে, ক্রমে দুইবার ভূমিকম্পে ময়মনসিংহস্থ নববিধান মন্দির বিচূর্ণ হইয়াছে। এবার সেই ভয়ে ইষ্টকের ছাদ না করিয়া করগেটেট আয়রণের ছাদ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব মন্দির অপেক্ষা বর্ত্তমান নবমন্দির আয়তনে বৃহৎ হইয়াছে, এক্ষণও কতক কার্য্য অবশিষ্ট আছে। মুক্তাগাছার মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য এবং প্রধান ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় এবং অনেক স্থানীয় ভদ্র লোক মন্দির পুনর্নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছেন ও সাহায্য দানে অঙ্গীকৃত হইয়াছেন, এবং ইংলণ্ডের একেশ্বরবাদী সমাজ হইতে এ জন্য ২০০৲ শত টাকা পাওয়া গিয়াছে।

"গত কল্য বৃহস্পতিবার প্রাতে অত্রত্য নববিধানসমাজের সম্পাদক শ্রীমান্ বৈদ্য নাথ কর্ম্মকারের আবাসে পারিবারিক উপাসনা হয় ; রাত্রিতে সঙ্কীর্ত্তন, সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। স্থানীয় কয়েক জন ভদ্রলোক তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন ; অদ্য পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমান্ বিহারিকান্ত চন্দের আবাসে পারিবারিক উপাসনা ও সবান্ধবে ভোজন হইল। অপরাহ্নে শ্রীমান্ বৈদ্যনাথের আবাসে কয়েকটী মহিলা মিলিত হন,নবসংহিতা হইতে স্বামী ও স্ত্রী শীর্ষক অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখা এবং আলোচনা হয়। পরে কয়েকটি যুবকের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছে। অদ্য সন্ধ্যার পর সেশন জজ প্রীতিভাজন শ্রীমান্ অম্বিকাচরণ সেনের আবাসে উপাসনা ও ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ, তথায় যাইবার জন্য এক্ষণ প্রস্তুত হইতেছি। আগামী কল্য সামাজিক উপাসনার পর কাওরাইদ যাইব, তথা হইতে পরশ্ব প্রাতে ঢাকায় যাইব এইরূপ সঙ্কল্প। ঢাকায় ও বাড়ীতে বিশেষ কার্য্যবশতঃ তিন দিনও পূর্ণ এখানে থাকিতে পারিলাম না।"

১৪ বৈশাখ বুধবার হাইকোর্টের উকীল শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রলাল খাস্তগিরের প্রথম নবকুমারের জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে তাঁহার শাঁকারিটোলাস্থ বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। বিগত ৮ই চৈত্র মঙ্গলবার রাত্রি ২ টার সময় এই নবকুমার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর শিশু এবং তাঁহার জনক জননাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

স্বর্গগত শ্রীমান্ বঙ্কুবিহারী দত্তের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া ১৫ই বৈশাখ প্রাতে আমাদের আশ্রমস্থ দেবালয়ে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐ দিবস হাজারীবাগে শ্রদ্ধেয় ভাই দীন নাথ মজুমদার স্বর্গগত আত্মার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ভাগলপুরস্থ বিধানবিশ্বাসী ভ্রাতা ডাক্তার নকুড় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র স্বর্গগত শ্রীমান্নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীমান্ নরেন্দ্র অল্প বয়সেই আপনার জীবনে খুব আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমরা জীবনীপুস্তকা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।

উপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম জন্যই তাঁহার শরীর বড়ই দুর্ব্বল হইতেছে, কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া কিছুদিন বাস করিবার জন্য ডাক্তারগণ পরামর্শ দিয়াছেন। গীতাভাষ্য ও আচার্য্যজীবন লেখা সম্পূর্ণ না হইলে তিনি কোথায়ও গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। গত রবিবারে তিনি সামাজিক উপাসনা করিতে অক্ষম হওয়ায় শ্রদ্ধেয় ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা যথাস্থানে প্রকাশিত হইল।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ১৮ই বৈশাখ কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

KEISTERED NO C. 37.

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ।
৯ সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে জীবিতেশ্বর, জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিল। এখন ইহলোক হইতে যাইবার পূর্ব্বে তোমার কাজের কি ব্যবস্থা হইল, দেখিতে অভিলাষ হয়। মানুষের দিকে দেখিলে নিরাশার কারণ ভিন্ন আশার কারণ দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় না, তোমার দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মানুষের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলে এইরূপই তো হইবে। নাই হইতে তুমি এত বড় প্রকাণ্ড বিশ্ব উৎপাদন করিলে, নাই হইতে সমুদায় করা তোমার স্বভাব। আমরা দেখিতেছি ভবিষ্যতের কোন আয়োজন নাই, এই নাইয়ের ভিতর হইতে তুমি বিচিত্র ব্যাপার উপস্থিত করিবে, ইহা আর অস্বীকার করিব কেন? এখন যে কারণে অব্যবস্থা রহিয়াছে, সময়ে এ সকল কারণ তিরোহিত হইবে। এখন যে সকল বিষয়ে লোকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না বলিয়া বিবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত, সময় আসিতেছে যে, সময়ে তাহারা সেই সকল বিষয় বিশ্বাস করিবে, এবং বিশৃঙ্খলার স্থলে সুশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইবে। কয়েক দিনের জন্য আমাদের ক্লেশ হইল বটে, কিন্তু বিনা ক্লেশে কোন দিন তোমার বিধান পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্রথম যাঁহারা বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের ভাগ্যে ক্লেশ বিনা সুখ কবে ঘটিয়া থাকে? আমরা ক্লেশ পাইয়া গেলাম তাহাতে ক্ষতি নাই, তোমার বিধানেরতো জয় হইবে? আমরা লোকের না পছন্দ হইলাম তাহাতে কি, তোমার কার্য্যকে লোকে তো ইহার পরে পছন্দ করিবে? লোকে আমাদিগকে অস্বীকার করিয়া আমাদিগকে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিতে যত্ন করিল, তাহাতে কি আসে যায়, তুমি আমাদের সম্বন্ধে যাহা মনে করিয়াছ তাহাই হইবে, শত সহস্র লোকের চেষ্টায় কি হইতে পারে? আমাদিগের দৃষ্টি নিয়ত তোমার দিকে স্থাপিত থাকুক, লোকে কি বলিল কি করিল তাহা দেখিয়া শুনিয়া অন্তশ্চক্ষু যাহাতে মলিন না হয়, তজ্জন্য আমাদের নিয়ত প্রযত্ন হউক। লোকে না বুঝিয়া বিধানবিরুদ্ধ আচরণ করিতেছে, অপরাধের জালে আপনাদিগকে আবৃত করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমাদের মর্ম্মচ্ছেদকর ক্লেশ হয়, কিন্তু ঈদৃশ ক্লেশ বহন বিনা ভবিষ্যতের আশার স্থল কোথায় আছে? আমাদের ক্লেশে যদি ভবিষ্যতের কল্যাণ হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কৃতার্থতার বিষয় কি আছে?

হে করুণানিলয় পরমেশ্বর, তাই তব পাদপদ্মে ভিক্ষা করিতেছি, বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খলা ও অল্প বিশ্বাস দেখিয়া যেন ভবিষ্যতের আশা সঙ্কুচিত না হয়। তোমার কৃপায় আমাদের আশা সকল অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদিগকে নিয়ত প্রোৎসাহিত রাখিবে, এই আশা করিয়া করিয়া তব চরণে প্রণাম করি।

সত্যমূলক বিশ্বাস।

যাহা নিয়তকাল আছে, কখন কোন কারণে যাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না, তাহাই সত্য। পরব্রহ্ম সত্য, কেন না সত্যের এ লক্ষণ তাঁহাতে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। তিনি সত্য, তাঁহার ক্রিয়া সত্য। তিনি যাহা করেন, চিরদিনই একই ভাবে করেন। যদি কোথাও তাঁহার ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিল আমাদের মনে হয়, উহা আমাদেরই বুঝিবার ভ্রম। যাহা নিয়তকাল আছে, কখন কোন কারণে যাহার ব্যতিক্রম ঘটে না, তদুপরি আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। যাহা আজ আছে কাল নাই, যাহা নিতান্ত অচিরস্থায়ী, তাহা অসত্য মিথ্যা ভ্রম। তদুপরি যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিল, সে সেই বিশ্বাসের জন্য নিয়ত দুঃখ ক্লেশ ও পাপের অধীন হইবে। এখন জিজ্ঞাসা এই, এ সংসার সত্যস্বরূপের রঙ্গভূমি, তাঁহার ক্রিয়া স্থল। এখানে সত্য ভিন্ন অসত্য থাকিবে কেন? তিনি সত্য তাঁহার ক্রিয়াও যে সত্য। সত্যস্বরূপ হইতে অসত্য কিছু হইতে পারে, এরূপ মনে করা কি ভ্রান্তি নহে? আলোক অন্ধকার, সত্য অসত্য ইত্যাদি কল্পনা আমাদের। যেখানে আমাদের অসামর্থ্যনিবন্ধন আমরা দেখিতে পাই না, আমরা বলি এখানে অন্ধকার, সেখানে নিশাচর জীবগণের নিকটে তাহা অন্ধকার নহে। এইরূপ আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের অসামর্থ্যনিবন্ধন যখন ঘটে, তখন সত্যদর্শী ব্যক্তি কখন তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। তিনি সমুদায় ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত করিয়া দেন।

আলোক ও অন্ধকার, সত্য ও অসত্য ইত্যাদি কিছুই নাই, এ ভূমি অদ্বৈতবাদের ভূমি। যখন আমাদের দৃষ্টি ব্রহ্মেতে স্থাপিত, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, সেখানে কেবলই আলোক, কেবলই সত্য, অণুমাত্র অন্ধকার বা অসত্য নাই, ইহা বলিলে অসত্য বলা হয় না। আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বদা তাঁহার উপরে স্থাপিত থাকে না, আমরা যে নিয়ত তাঁহারই ক্রিয়া দর্শন করি তাহাও নহে। পরিবর্ত্তনশীল জগৎ ও তাহার নিয়মসমূহের প্রতি আমাদের দৃষ্টিনিবদ্ধ। আমাদের প্রবৃত্তিসমূহ নিরতিশয় চঞ্চল, তাহারাই আমাদের এ দৃষ্টির পরিচালক, সুতরাং এখানে অসত্যসংস্রব থাকিবে না, ইহা কখন সম্ভবপর নহে। পরিবর্ত্তন থাকিলেই অসৎ হইল তাহা নহে, কেন না ক্রিয়া পরিবর্ত্তন বিনা প্রকাশ পাইতে পারে না। পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ ক্রিয়াতে প্রতিনিয়ত জগতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই পরিবর্ত্তনে একটি নিগূঢ় অভিপ্রায় সাধিত হইতেছে। সমুদায় জগতের গতি সেই অভিপ্রায়ের দিকে। সকল বস্তুরই স্থিরতর প্রকৃতি আছে, সেই প্রকৃতির গতি সেই অভিপ্রায়ের দিকে। তুমি যদি সে বস্তুর প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া কিছু করিতে যাও, তুমি কেবল অকৃতকার্য্য হইবে তাহা নহে, সেইরূপ করিতে গিয়া তোমার দুঃখ ক্লেশ ও পাপ উৎপন্ন হইবে। ব্রহ্মেতে তুমি যখন স্থিতি কর, তাঁহার দৃষ্টিতে যখন সকল দেখ, তখন তোমাতে মিথ্যাদৃষ্টির সম্ভাবনা রহিল না। যে বস্তুর প্রকৃতি যাহা, তাহাই তুমি দেখিতেছ। পরব্রহ্ম যেমন তৎপ্রদত্ত প্রকৃতির কোন দিন ব্যতিক্রম সাধন করেন না, তুমিও তেমনি সেই সেই বস্তুর প্রকৃতি অতিক্রম করিয়া কিছু কর না। এখানে তোমার দৃষ্টি সত্য এবং ক্রিয়া সত্য হইল; দুঃখ ক্লেশ ও পাপের মূল বিনষ্ট হইল।

আমাদের বিশ্বাস সত্যমূলক হওয়া প্রয়োজন। অসত্যমূলক বিশ্বাস কখন বিশ্বাস নহে। কেন না অসত্য যেমন দাঁড়ায় না, সে বিশ্বাসও তেমনি দাঁড়ায়

না। যাহা যাহা নহে, তাহাকে তাহা বলিয়া বিশ্বাস কর, দেখিবে দুদিনে তোমার বিশ্বাস টলিয়া যাইবে। যদি অসত্যদৃষ্টিনিবন্ধন ক্রমান্বয়ে সেই মিথ্যা বিশ্বাস লইয়া সংসারে চলিতে থাক, তজ্জন্য তোমায় বিবিধ পাপ ও ক্লেশে পড়িতেই হইবে। সাধারণ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হইবে। ধন জন যৌবন, এ সকলই অসৎ, ইহাদের উপরে কোন আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়; প্রতিলোকে এই কথা বলিয়া থাকে, অথচ তাহারা এই তিন লইয়া প্রমত্ত রহিয়াছে, কিছুতেই এ তিন সম্বন্ধে মিথ্যাদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। যদি এ তিন সম্বন্ধে মিথ্যাদৃষ্টি ভিন্ন সত্যদৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে এ তিনকেই সত্যস্বরূপের সহিত সম্বন্ধবিরহিত, তাঁহার ক্রিয়ার বহির্ভূত বলিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু যখন জগতে কিছুই তাঁহাকে এবং তাঁহার ক্রিয়াকে অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে না, তখন ধন, জন, যৌবন এ তিনকে তাঁহার ক্রিয়া বহির্ভূত বলিয়া তুমি গ্রহণ করিবে কিরূপে? অন্যান্য জগতের বস্তুসমূহে যে প্রকার পরিবর্ত্তন আছে, এ তিনেতেও সেই প্রকার পরিবর্ত্তন আছে। সে সকলের যে প্রকার স্থিরতর প্রকৃতি আছে, এবং সেই প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর, এ তিন সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে। দেখা যাউক এ তিন সম্বন্ধে সত্যমূলক বিশ্বাস কি?

ধন—ইহার সঙ্গে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের কি কোন সম্বন্ধ আছে? মানুষ আপনাদের জীবন নির্ব্বাহের জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, সেই উপায়ের নাম ধন। মানুষ যাহা করিল তাহার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি? যখন ঈশ্বরের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই, তখন ঈশ্বরকাম ব্যক্তিমাত্রের উহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা সমুচিত। প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যত ঈশ্বরকাম ব্যক্তি হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ধনের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ কাটিয়া দিয়া ঈশ্বরান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নিয়ত ধনের ব্যবহার করিব, অথচ আমার মন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল থাকিবে, এ দুই কখন সম্ভব নহে। "কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না" একথা চির দিনই সত্য। এখন কথা হইতেছে এই, ধনমাত্রেই প্রাকৃতিক সামগ্রী। যে সকল প্রাকৃতিক সামগ্রী সুপ্রাপ্য তাহা জীবনধারণের জন্য যত কেন প্রয়োজন হউক না, সকলেরই সুলভ জন্য তাহার কোন মূল্য নাই। যাহা সকল লোকের পক্ষে সুলভ নহে, এমন সামগ্রীকে ধনরূপে লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্য এজন্যই ধনমধ্যে গণ্য। মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্যের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই, এ কথা তুমি বলিতে পার না, তবে লোকে উহাদিগের যে ব্যবহার করে, তাহার সহিত ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কোন যোগ আছে কি না, ইহাই বিচার্য্য। যদি ইহাদিগের কোন ব্যবহার না থাকিত, ইহাদের সৃষ্টি হইত না, ইহা আমরা সকলেই বুঝি, তবে আমরা যে প্রকারে এ সকলের ব্যবহার করিতেছি, সে প্রকারে ব্যবহার ঈশ্বরাভিপ্রেত কি না, ইহাই জিজ্ঞাস্য। বিনিময়প্রথা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ইহাতে কোন সংশয় নাই, কেন না বিনিময় আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে চিরগ্রথিত। তুমি আমায় সাহায্য করিবে, আমি তোমার সাহায্য করিব, ইহা অতি প্রথম হইতে চলিয়া আসিয়াছে। যদি আমরা অল্পসংখ্যক হই, সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময় চলিতে পারে, কিন্তু যখন আমাদের সংখ্যা এত হইয়া পড়ে যে সেরূপ করা অসম্ভব হয়, তখন অসুলভ দ্রব্য গুলি সাধারণ বিনিময়ের উপায় করিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এখানে ঈদৃশ বিনিময়সম্বন্ধে ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় নাই, এ কথা তুমি বলিতে পার না। কিন্তু এ সম্বন্ধে যতটুকু ঈশ্বরের অভিপ্রায় লোকে তাহার অতিক্রম করিয়া ধনে আসক্ত হয় বলিয়াই পাপ, ক্লেশ ও দুঃখের উৎপত্তি।

জন—জনের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই এ কথা উঠিতেই পারে না। পিতা মাতা বন্ধু

স্বজন আত্মীয় ইহাঁদিগের সহিত সম্বন্ধ কাল্পনিক বা মিথ্যা নহে। যাহারা এ সকলের সহিত সম্বন্ধ কাল্পনিক বা মিথ্যা মনে করিয়া সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, উদাসীন হইয়া তাঁহাদের প্রতি সমুদায় কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়, তাহারা যে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরোধী কার্য্য করে তাহার আর সন্দেহ নাই। ধনে আসক্ত হইয়া লোকের যেমন সর্ব্বনাশ হইয়াছে, জনেতে আসক্ত হইয়া সেই প্রকার হইয়াছে, এজন্য ধনজনের সহিত সম্বন্ধ বিলোপ করিয়া ধর্ম্মসাধনে সাধকগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে এই দেখায় যে, ধনজনসম্বন্ধে তাঁহাদের ব্যবহার ঠিক ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুরূপ ছিল না, এ জন্যই তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক এ দুইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। ধন জন এ উভয়সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের বিশ্বাস সত্যমূলক থাকিত, তাহা হইলে কদাপি তাঁহাদিগকে ঈদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত না। জনসম্বন্ধ আমাদের ইচ্ছাসম্ভূত নহে, ঈশ্বরকৃত। তিনি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগকে ঈদৃশ সম্বন্ধে গ্রথিত করিয়াছেন, তাহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। যদি কেবল দেহ রক্ষার জন্য ইহাঁদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে দেহ যেমন অস্থায়ী ইহাঁদের সহিত সম্বন্ধও তেমনি অস্থায়ী। দেহ রক্ষার জন্য যতটুকু সম্বন্ধের প্রয়োজন, তদতিরিক্ত স্থলে আর কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ বিশ্বাস করিলে যে জনসম্বন্ধ হইতে ঘোর বিকার উপস্থিত হইবে, ইহাতে আর সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহাদের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ বিশ্বাস করা সমুচিত, তাহা না করিয়া আমরা অন্যরূপ বিশ্বাস করি,ইহাতেই দুঃখ ক্লেশ ও পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যৌবন—যৌবন কালে সকল প্রকারের প্রবৃত্তি নিরতিশয় প্রবল। এ সময়ে ভাল বা মন্দ উভয় দিকেই চিত্ত বেগে প্রধাবিত। যৌবনের চাঞ্চল্যে মন এক বিষয়ে স্থির হইয়া থাকে না, যাঁহারা মনকে বশে আনিতে যত্ন করেন তাঁহারা এজন্য যৌবনের প্রতি বিষদৃষ্টিতে দেখেন। যৌবন সঞ্চয়ের কাল। যৌবনে সঞ্চিত বিষয় বার্দ্ধক্যে ভোগ করা হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তুমি যৌবনকে ভাল বিষয়ে বা মন্দ বিষয়ে নিয়োগ করিতেছ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমার। যৌবনের উদ্দেশ্য তুমি সত্য দৃষ্টিতে দেখিলে না, বিবেকের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিলে, অবিহিত প্রবৃত্তি সকলের অধীন হইয়া মন্দবিষয়ে উৎসাহ নিয়োগ করিলে, ইহাতে যে তোমার যৌবন সুন্দর শ্রীভ্রষ্ট হয়, বার্দ্ধক্য বিষাদের ঘন কালিমায় চিহ্নিত হয়, তাহাতে যৌবনের অপরাধ কি? স্রষ্টার অভিপ্রেত সময়ে সে তোমার দেহে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে সে নিয়ত প্রস্তুত ছিল, তাহাকে তুমি যখন প্রবৃত্তির দাস করিয়া তাহার প্রকৃত কার্য্য তাহাকে করিতে দাও নাই, তখন সে যদি তোমায় দণ্ডভাজন করিয়া চলিয়া গিয়া থাকে তাহাতে তৎপ্রতি তোমার কোপ প্রকাশে কি ফল, তুমি আপনার কর্ম্মফল আপনি এখন ভোগ কর।

ধন, জন, যৌবন, এ সকলের অপব্যবহার সত্যমূলক বিশ্বাসের অভাবে ঘটিয়া থাকে, এখন হয়তো তুমি বুঝিতে পারিতেছ। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে তাঁহার দৃষ্টিতে দেখিলে কাহার ব্যবহার কিরূপ হওয়া চাই, সহজে আমরা বুঝিতে পারি। সকল বিষয়ের সঙ্গে সত্যমূলক সম্বন্ধ রক্ষা করা প্রয়োজন, অন্যথা অতি ভাল বিষয়ও আমাদের সুমহৎ অকল্যাণের জন্য হয়। মানুষের যত প্রকারের ব্যবহার তাহার মূলে কোন একটি বিশ্বাস থাকে। অমুক কর্ম্ম করিলে অমুক ফল লাভ হইবে, এই বিশ্বাসে লোকে কর্ম্ম করিয়া থাকে। বিশ্বাস যাহার যে প্রকার সে জীবনে তদনুরূপ ফল লাভ করে। ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ এ সকলই বিশ্বাসপ্রসূত ফল। যদি তুমি ভাল চাও, সুখ চাও সত্যমূলক বিশ্বাস আশ্রয় কর। অসত্যমূলক বিশ্বাসে কার্য্য করিতে গিয়া তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা যেন কখন তুমি বিস্মৃত না হও।

মনসংযম।

মনঃসংযমসম্বন্ধে কত নিয়ম নিবদ্ধ রহিয়াছে। সে সকল নিয়ম যে কার্য্যকারী নহে, ইহা আমরা বলিতে চাহি না। কাহার পক্ষে কোন্ নিয়ম কার্য্যকারী হইবে, ইহা বলা সুকঠিন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে মনঃসংযম করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। মনঃসংযমের কোন একটি সাধারণ নিয়ম আছে কি না, ইহাই দেখা আমাদের উদ্দেশ্য। এরূপ নিয়ম যদি থাকে আমাদের জীবনে কার্য্যকর হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে।

ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্যের প্রতি মনোভিনিবেশ, এবং সেই কার্য্যের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন মনঃসংযমের সহজ উপায়। যৌবনের প্রারম্ভ মনের সমধিক চাঞ্চল্যের সময়, এই সময়ে কার্য্যপ্রিয়তা স্বাভাবিক। দেহ মনে সমধিক উদ্যম যখন একালে অবস্থান করিতেছে, তখন ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্যে উহার নিয়োগ যে স্বভাববিহিত নিয়ম ইহা মানিতেই হইবে। কার্য্য করিয়া যে সময় অবশিষ্ট থাকে ঐ সময়ে অনিষ্ট ঘটা সম্ভব, এজন্য নিয়মিত কার্য্যের পর এমন সকল কার্য্যের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাহাতে মন অসদ্বিষয়ে যাইবার কিছুতেই অবসর পাইবে না। অধ্যয়ন, চিন্তা, ধ্যান, উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ, পরসেবা ইত্যাদি কার্য্য নিয়মিত কার্য্যের অন্তরালে সংযুক্ত থাকিলে মন নীচ বাসনায় সংলগ্ন হইবার অবসর পায় না, সুতরাং আপনি সংযতাবস্থা অবলম্বন করে। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে ভোজন না করা, নিদ্রার উদ্গম না হইলে শয্যায় গমন না করা মনঃসংযমের পক্ষে উপায়, কেন না অক্ষুধায় ভোজনে রসনার তৃপ্তিকর সামগ্রীর প্রতি লালসা, অনিদ্রায় শয্যায় গমন অনুচিত চিন্তার অবসর দান করে। চিন্তাকুলিত মনে যে নিদ্রা হয় সে নিদ্রা সুনিদ্রা হয় না, সুনিদ্রান্তে গাত্রোত্থান না করিলে সমুদায় দিন মনোভিনিবেশ সহকারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না এবং মনোভিনিবেশে অক্ষমতা অনুচিত চিন্তায় প্রবৃত্তি, ইহা আর কে না জানেন?

'ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্যে মনোভিনিবেশ' এই কথা বলাতে এ কার্য্য যে যোগমধ্যে গণ্য ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কর্ম্মযোগ মনঃসংযমের প্রধান উপায় ইহা পরীক্ষিত সত্য। যে সে কার্য্য করিতেছি, উহা আমার সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি না, তাঁহার ইচ্ছাসঙ্গত কি না, ইহা একবারও হৃদয়ঙ্গম করিতেছি না, ইহাতে মনঃসংযম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সে কার্য্যের প্রতি আত্মার অনুরাগ হইবে কি প্রকারে, যদি আত্মা জানিতে না পায় এই কার্য্য করিতে গিয়া আমার ঈশ্বরের সহিত একতা উপস্থিত হইবে। চিরদিনের জন্য কোন একটি কার্য্যে প্রবৃত্তি, কোন একটি কার্য্য হইতে মনের নিবৃত্তি, তখন কি সম্ভবপর, যদি সেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে আত্মার পরম প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনতর একতাবন্ধন নিবদ্ধ না হয়? কার্য্যকালে চিত্ত বিরস হইয়া উঠে, মনের প্রসন্নতা চলিয়া যায়, যদি সেই কার্য্য করিতে গিয়া ঈশ্বরসহবাসসম্ভোগে মনের সকল প্রকারের অবসাদ ও ক্লান্তি বিদূরিত না হয়। জানিও সে কার্য্য বিষতুল্য যাহাতে ক্রোধাদির উদ্রেক হইয়া থাকে। ঈদৃশ কার্য্যে মনঃসংযম না হইয়া মনের অসদ্ভাব উপস্থিত হয়।

'ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য' ইহার মধ্যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত চিন্তাও অন্তর্ভুক্ত। কেবল হস্তাদি দ্বারা যে কার্য্য করা হয় তাহাই কর্ম্ম নহে। চিন্তা মনের কার্য্য, উহা সর্ব্ববিধ বাহ্যিক কার্য্যের অগ্রগামী। আমি এখন হয়তো বিনা চিন্তায় কার্য্য করিয়া যাইতেছি, কিন্তু কেন এরূপে কার্য্য করিতেছি ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় একটী চিন্তা নিরন্তর উহার নিম্নে বহিয়া যাইতেছে। কোন একটী চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি অনভিপ্রেত তৎপ্রতি দৃষ্টি মনঃসংযমাভিলাষীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, কেন না তাঁহার কখন

এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বাহিরে কিছুতো হইল না, মনে একটী অসচ্চিন্তা ক্ষণকালের জন্য আসিল তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী চিন্তা নিমেষের জন্য মনে স্থান পাইলে তাহা হইতে সময়ে যে কি বিষময় ফল উপস্থিত হইবে, তাহা তুমিও জান না, আমিও জানি না। সেরূপ চিন্তা আইসে কেন? কোন একটী অদম্য বাসনা তাহার মূলে আছে, সেই বাসনা হইতে সেই চিন্তার উদ্রেক। যে চিন্তা পরিহার্য্য সে চিন্তা মনে আসা কখন কল্যাণের জন্য নহে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণে রাখা সমুচিত।

মন সংযত হইয়া আসিলে তাহার এই লক্ষণ হয় যে, তাহার সে চিন্তায় সে কার্য্যে প্রবৃত্তি থাকে না, যে চিন্তা বা কার্য্য ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত নহে। কুপথ্য জানিলেই আর তাহাতে লালসা হয় না; আর লালসা হইতেছে, করে কি রোগযন্ত্রণার ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছি, এই দুই কিছু সমান নহে। যে মন সংযত হইয়াছে, সে মন লালসাবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত বিষয় ভিন্ন আর কিছুতে তাহার অভিলাষ হয় না। যে প্রকারের চিন্তা, যে প্রকারের ভোগ, যে প্রকারের কার্য্য ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকা আর সে মনের পক্ষে প্রয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। যদি ভিতরে লালসাই থাকিল তাহা হইলে মন সংযত হইয়াছে কোথায়? বাহিরে লোকের চক্ষুর্গোচরে কোন এমন কার্য্য করিতেছ না যাহা গর্হিত বলিয়া লোকের চক্ষে প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু যদি ভিতরে তোমার লালসা থাকে, জান না কবে কোন্ প্রবল প্রলোভন তোমার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িবে। ভিতর হইতে লালসা যত দিন না যাইতেছে, মনে করিও না, কার্য্যে কিছু আজও হয় নাই বলিয়া তুমি নিরাপদ। কর্ম্ম ও চিন্তা এ দুই যখন ঈশ্বরাভিপ্রায়ের বাহিরে না যায় তখন জানিও মন তোমার বশীভূত।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি অদৃশ্য বিষয় লইয়া এত ব্যস্ত কেন? লোকে দৃশ্য বিষয়ে আসক্ত না হয়, এজন্য নিয়ত তাহাকে তুমি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোল। আগে তাহাদিগকে দৃশ্য বিষয় ভোগ করিতে দাও, তাহার পর যুগান্তে যথোপযুক্ত সময়ে সে অদৃশ্য বিষয়ের চিন্তায় কালাতিপাত করিবে। যে সময়ের যাহা বুদ্ধিমানেরা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।

বিবেক। হাঁ, পৃথিবীর লোকেরা জীবনের সময় ভাগ করিয়া লইয়া এক এক ভাগে এক এক কার্য্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করে। এরূপ ভাগ করাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় কি না, তুমি কি কখন ইহা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? এক এক ভাগে এক এক কার্য্য করিতে গিয়া সে কার্য্য এমনই অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, আর সে কার্য্য ছাড়িয়া অপর কার্য্যের আরম্ভ করা ঘটিয়া উঠে না। প্রবৃত্তি বাসনা রুচি এক বার যে কার্য্যের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে সে কার্য্য হইতে সে গুলিকে বিচ্ছিন্ন করা কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠে। অধিকাংশ লোকের জীবনে এই জন্য চিরদিন একই প্রকারের কার্য্য চলিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের জীবনে উন্নতির স্রোত একেবারে অবরুদ্ধ। লোকে নিয়ত এইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছে, চল্লিশের পর নূতন কিছু মনে স্থান পায় না। বাল্যকাল হইতে তত্তৎকালোপযোগিভাবে জ্ঞানাদি অর্জ্জনে প্রবৃত্ত না থাকিলে সমুদায় জীবন সেই সকলের উপার্জ্জনে অতিবাহিত হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।

বুদ্ধি। অধিকাংশ ব্যক্তি জীবনের কতক দিন পর হইতে একই প্রকারে জীবন কাটাইয়া থাকে, ইহা সত্য, কিন্তু যাহারা প্রথম হইতে তোমার কথা শুনিয়া চলে, তাহাদেরও কি এ প্রকার দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় না?

বিবেক। আমার অনুগত লোকেরা যদি অশীতিবর্ষে যুবকের ন্যায় উৎসাহের সহিত আমার নিদেশ পালন করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমি কখন তাঁহাদিগকে আমার লোক বলি না। মানবজাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ কৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের কি আমার নিদেশপালন-বিষয়ে বার্দ্ধক্যদোষ উপস্থিত হইয়াছিল? আমার লোকেরা উন্নতি-বিষয়ে চিরযৌবনসম্পন্ন, ইহা যেন তোমার মনে থাকে।

তহফতোল্ মওহদ্দিনের বঙ্গানুবাদ।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কৃত মূল পারস্য পুস্তকের অনুবাদ।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

এ বিষয় অস্বীকার করা যায় না যে, মনুষ্যের দলবদ্ধ ভাবে বাসের প্রবৃত্তি এরূপ আকাঙ্ক্ষা করে যে, এই জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্বামিরূপে পরস্পর সম্মিলিত ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ ও বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিতে থাকে। যখন একত্র বাস পরস্পরের

মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম করণ ও কল্যানের উপর, এবং পরস্পরের স্বত্বাদি নির্ণয় ও এক জনের প্রতি অন্য জনের অত্যাচার নিবারণ সম্বন্ধীয় কয়েকটী ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে বুঝাইতেছে, তখন তদ্ভিন্ন সমস্ত দেশের লোক বরং দূরতর দ্বীপ ও উচ্চতর পর্ব্বত-নিবাসী লোকও আপনাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতানুসারে ধর্ম্মবিষয়ের ভাব ও তত্ত্বজ্ঞাপক শব্দ সকল, এক্ষণ যাহার উপর সংসারের ব্যবস্থা নির্ভর করিতেছে তাহা উদ্ভাবন করিয়াছে। ফলতঃ পক্ষে ধর্ম্মসকলের স্থিরতার মূল দেহের অধিবাসী মৌলিক বস্তুরূপে যাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারের উপর ও দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ হওয়ার উপর ঐহিক দুষ্কৃতি ও সুকৃতির দণ্ড পুরস্কারের ভূমি বলিয়া যাহাকে নির্দ্ধারণ করা গিয়াছে সেই পরলোকপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে। পরন্তু যাহারা একান্ত পারলৌকিক শাস্তি ও বিচারকদিগের দণ্ডভয়ে আপনাদিগকে দুষ্ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত রাখে সেই সাধারণ লোকদিগের কল্যাণের প্রতি তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার ও শিক্ষাদান বিষয়ে এবং পরলোকসম্বন্ধে উভয়ের প্রকৃত অবস্থা অনভিব্যক্ত সত্ত্বেও লক্ষ্য করায় ক্ষমার যোগ্য হইবেন। কিন্তু এই দুই অনুসর্ত্তব্য বিশ্বাসের অন্তর্গত আহার পান, শুদ্ধাশুদ্ধ ও কল্যাণাকল্যাণবিষয়ে শত শত দুঃখ ক্লেশ যোগ করিয়া সংসারের অবস্থার সংশোধনস্থলে জীবনোপায়ের হানি ও একত্র বাসসম্বন্ধে ক্ষতি এবং লোকের ইন্দ্রিয়-বিক্ষিপ্তির কারণ হইয়া থাকে।

ধর্ম্মনেতৃগণের এই সকল বিধি ব্যবস্থার দোকানের উন্নতি ও মানবীয় প্রকৃতির প্রতি উৎপীড়নকারীদিগের ক্ষমতা বিস্তার সত্বেও লোকের অবরোধশক্তি এতদূর সুস্পষ্ট যে, তাহাতে এক জন প্রজ্ঞাবান্ লোক ধর্ম্মবিশেষ অবলম্বনের পূর্ব্বে বা তাহা গ্রহণের পরে অপক্ষপাতিরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নির্দ্ধারিত জ্ঞাতব্য ধর্ম্মমত সকলের মূল ও শাখার বাস্তবিকতা ন্যায় দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলে দৃঢ় ভরসা যে অসত্য হইতে সত্যকে মিথ্যা বিবরণ হইতে যথার্থ বৃত্তান্তকে নির্দ্ধারণে তাঁহারা সমর্থ হইবেন এবং একের প্রতি অপরের পক্ষপাত হেতু ও দৈহিক নিগ্রহ এবং বুদ্ধির বিকৃতি বশতঃ যে অসার বন্ধন হইয়াছে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া আদি নিয়ামক ও কৃপাময় পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহারা একান্ত উন্মুখ ও সমুদায় লোকের কল্যাণের প্রতি সাভিনিবেশ হইবেন। "পরমেশ্বর যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন তাহাকে বিপথে লইয়া যাইবার কেহ নাই, এবং ঈশ্বর যাহাকে বিপথগামী করেন তাহার পথ প্রদর্শক নাই।"—(কোরাণ)

দেখা আবশ্যক, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক এই দাবি করে যে, সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রত্যয়ানুগত হইয়া ঐহিক পারত্রিক ব্যাপার সকল সাধনের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অপর সম্প্রদায় যে তাহাদের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে ভিন্নতা রক্ষা করিয়া থাকে,তাহারা পারত্রিক ক্লেশ ও পারলৌকিক শাস্তি পাইবার উপযুক্ত। যখন প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আপনাদের কার্য্যের শুভ ও অশুভ ফল ইহ জীবনাবসানে পরজীবনে লাভ হইবে এরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে, কাজে কাজে তখন এক পক্ষ অপর পক্ষের দাবির অসত্যতাপ্রতিপাদনে অসমর্থ হইয়া প্রীতি ও শুদ্ধতার স্থলে অন্তরে কেবল বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিতার বীজ বপন করিয়া অপর পক্ষকে অধম ও হতভাগ্য বলিয়া জানে। এক্ষণ প্রকাশ যে গগন-মণ্ডলসম্বন্ধীয় সম্পদ্ লাভ, অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহদিগের জ্যোতি লাভ, বসন্ত কালের রমণীয়তা, বর্ষার বৃষ্টিপাত এবং শারীরিক স্বাস্থ্য, জীবিকার স্বচ্ছলতা আন্তরিক বাহ্যিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতি প্রাপ্তি ও দুঃখ ক্লেশ বিষয়ে,—যথা; প্রত্যেকের অন্ধকারে ভীতি,শীতের তীব্রতা, জীবনের রোগ ও অবস্থার কাঠিন্য এবং আন্তরিক বাহ্যিক কদর্য্যতা ধর্ম্মপ্রণালীর বিশেষত্ব ব্যতিরেকেও ধর্ম্মের উপলক্ষ ব্যতীত এক পক্ষের জীবন অপর পক্ষের তুল্যরূপে ভোগ করিয়া থাকে।

যদিচ অন্য প্রদত্ত শিক্ষা ও উপদেশ ব্যতীত অনুভব ও অনুধাবনান্তে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশকল্পে, বিভিন্ন প্রণালীতে নানা বিষয়ের স্থিতিসম্বন্ধে ও ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ উদ্গত হওয়ার কাল নির্দ্ধারণ বিষয়ে, অপিচ স্থিতি ও গতিশীল সমুজ্জ্বল নক্ষত্রসকলের নির্দ্ধারণে এবং বিনিময়প্রত্যাশা ব্যতীত সন্তানসম্বন্ধে জীব জন্তুর অন্তরে স্নেহসঞ্চারবিষয়ে পরন্তু, জড়, জীব, উদ্ভিদ, এই ত্রিবিধ পদার্থের প্রত্যেকের উৎপত্তি স্থিতি ও বিকৃতি অবস্থার ব্যবস্থা-বিষয়ে মূলতঃ বিশ্বব্যবস্থাপকের সত্তার দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির উন্মুখ হওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু ইহা অপ্রকাশিত না হউক যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে দলের ভিতরে জীবন যাপন করিয়া থাকে সেই দলের আনুগত্য ও অনুসরণক্রমে বিশেষ ঈশ্বরত্ব বিষয়ে এবং সেই ধর্ম্মসম্পর্কীণ অবান্তর বিষয়সমূহের বিষয়ে পরিচয় লাভ করিয়াছে। কোন কোন লোকের এরূপ উক্তি যে, মানব প্রকৃতির ন্যায় পরমেশ্বরের প্রকৃতি অর্থাৎ তিনি ক্রোধী, দয়ালু ও ঘৃণাকারক এবং প্রেমিক। কতক লোক সুবিস্তীর্ণ সুগভীর বিদ্যমানতামাত্রের বিশ্বাসী। কোন দল কাল ও প্রকৃতিকে স্বীকার করে। কোন সম্প্রদায় সুমহান্ সৃষ্ট পদার্থ সকলকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল-স্বরূপ সংযোজিত বিশ্বাস ও যাহা হইতে মনুষ্যের নিষ্কৃতি নাই সেই স্রষ্টার সত্তাতে মৌলিক বিশ্বাস এই দুইয়ের মধ্যে তাহারা ভিন্নতা স্থাপন করে না। এত দূর পর্য্যন্ত দাঁড়ায় যে, অভ্যাসের প্রাবল্য এবং মূলতত্ত্ব ও কার্য্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ অনুসন্ধানে অস্পৃহাবশতঃ নদীতে স্নান, বৃক্ষ ও শিলাদর্শন, ধর্ম্মসকলের বিরুদ্ধে স্বীয় সাময়িক ধর্ম্মনেতা হইতে পাপ ক্ষমা ক্রয় এবং প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান পাপ হইতে পরিত্রাণের ও সমগ্র জীবনের মলিনতা হইতে পরিশুদ্ধিলাভের উপায় মনে করিয়া থাকে। তাহারা যে সকল বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে উহাদের গুণে এবং ধর্ম্মনেতার অলোকিকতা ও উপদেশের প্রভাবে এই শুদ্ধতা ও নির্ম্মলতা হইয়া থাকে, এরূপ বিশ্বাস ও কল্পনা না করিয়াও মনে করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিরুদ্ধবিশ্বাসী অন্য দলেতে এরূপ কোন

প্রভাব তাহাদের উপলব্ধি হয় না। যদি এই সকল সার কল্পিত প্রভাবের কোন সারবত্তা থাকিত নিশ্চয় তাহা হইলে উহা এক বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও অভ্যাসের উপর স্থিরতর না থাকিয়া সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিত। যেহেতু পদার্থসকলের প্রভাবের দুর্ব্বলতা ও প্রবলতার সম্পর্ক সংযোগ ও সংক্রামকতার অবস্থানুরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু কখন বিশ্বাসীর যে বিশ্বাস নিতান্ত কল্পিত ব্যাপার তদনুসারে হইবে না। ইহা কি দর্শন করে না যে, মধুজ্ঞানে বিষপান করিলে তাহার বিষাক্ততা পানকারীর একান্তই মৃত্যু ও বিনাশের কারণ হয়। "হে পরমেশ্বর তুমি আমাকে প্রকৃতি হইতে অভ্যাসকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে প্রবল শক্তি প্রদান কর।" (আপ্তবাক্যচন্দ্র)—ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আমি, তুমি।

২রা চৈত্র, রবিবার, ১৮১৮ শক।

এ সংসারে এই আমিকে লইয়া ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। এ নিরন্তর আমায় বলিতেছে, তুই কি সামান্য লোক, তুই যে ঈশ্বরের সন্তান, তোর কত গৌরব কত সম্পদ। ঈশ্বর তোকে বহুবিধ দানে ভূষিত করিয়াছেন। তোর বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম নীতির নিকটে, পৃথিবীর আর কোন ব্যক্তি কি দাঁড়াইতে পারে? তোর যোগ ধ্যান সমাধি চরিত্রশুদ্ধি পুণ্য প্রেমের তুল্য আর কাহারও কি সে সকল আছে? তুই নববিধানের উচ্চতম জ্ঞান লাভ করিয়াছিস্, পৃথিবীতে এমন কোন লোক নাই, যে তোর জ্ঞানের নিকটে দাঁড়াইতে পারে। তোর বিচারশক্তি এত সুতীক্ষ্ণ যে বড় বড় পণ্ডিত তোর নিকট হার মানিয়া যায়। তুই বলিতেছিস্, আমি কিছুই নই, আমি অপদার্থ, আমি সকল লোকের পদধূলি। এ মিথ্যা বিনয়ে তুই সত্যের অপলাপ করিতেছিস্। তুই একাসনে বসিয়া দশ ঘণ্টা যোগ করিতে পারিস্, বল্, তোর তুল্য যোগপরায়ণ কে আছে? তোর বৈরাগ্য কেমন সুতীব্র, কোন একটি অসাত্বিক অন্ন তোর উদরস্থ হয় না, তোর মত এমন বিশুদ্ধাচারী বৈরাগী কে আছে? যদি বলিস্, এ সকল আমার গুণে নয় ঈশ্বরের গুণে, তাহা হইলে তোকে ঈশ্বর দয়া করিয়া যে সকল সম্পদ্ দিয়াছেন, সে সকল সম্পদ্ অস্বীকার করা কি দাতাকে অস্বীকার করা নয়? তিনি দিলেন, অথচ যেন তিনি দেন নাই, এইভাবে যদি লোকের নিকটে দরিদ্রের ন্যায় বিচরণ করিস্ তাহা হইলে কি তোর অকৃতজ্ঞতাজনিত ঘোর অপরাধ হইল না? কি আশ্চর্য্য! আমির যুক্তির নিকটে হার মানিতে হয়। সে যদি সংসারের দিক্ দিয়া আপনার দাস করিয়া লইতে না পারে, তবে ধর্ম্মের দিক্ দিয়া আসিয়া দাস করিতে যত্ন করে। সে বলে, তুই যে ঈশ্বরের নিযুক্ত প্রেরিত প্রচারক। তুই কি আপনার পদমর্য্যাদা ভুলিয়া যাইবি? ঈশ্বরপ্রদত্ত পদের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য যে যত্ন না করে, সে আপনার পদকে তুচ্ছ করিয়া যিনি সে পদ দিয়াছেন তাঁহার অবমাননা করে। তুই কি দেখিতেছিস্ না, ঈশ্বর তোকে কি অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতা দিয়াছেন? তুই যেখানে যাইস্, লোকে তোর উপদেশ বক্তৃতা আলাপ শুনিয়া কেমন মুগ্ধ হয়। লোকে তোর সম্মাননা করিবার জন্য উচ্চ আসন দা[illegible] করে, তোর পদবন্দনা করে; তোর সঙ্গে বাস করিলে তাদের মন শুদ্ধ হয়; ভক্তি প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়; এসকল কি মুধাই [illegible] থাকে? যদি তুই ধার্ম্মিক না হইবি, তোর ভিতর যদি এমন কি[illegible] সারবত্তা না থাকিবে, যাহার জন্য লোকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না, তাহা হইলে লোকে তোর এত সম্মামনা করে কেন? তোর মুখের কথা শুনিয়া লোকে যে ধন্য ধন্য করে, তাহার ভিতরে কি তোর কোন বিশেষত্ব নাই? যদি বিশেষত্ব না থাকিবে, তাহা হইলে তোর মত অন্য লোকে তেমন ধন্যবাদ আকর্ষণ করিতে পারে না কেন? আমি, তোর যুক্তির নিকটে পরাস্ত হইলাম, কিন্তু কে যেন ভিতর হইতে বলিয়া দিতেছেন, এ সমুদায়ই সর্ব্বনাশের পথ। আমি তোর সব কথার উত্তর দিতে পারি আর না পারি, তোর কথা মনে ভাল লাগিতেছে না। এ সব উপদেশ হইতে তুই ক্ষান্ত হ।

কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিলাম। আমিকে শাসন করিবার জন্য কৃচ্ছ্র সাধন অবলম্বন করিলাম। এই সাধনগুলি আড়ম্বরে পরিণত হইল। গৈরিক, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, একতারা, একাহার, হবিষ্যান্ন, এ সকলের ভিতর দিয়া আবার আমি আসিয়া দেখা দিল। আখ্যায়িকায় কথিত আছে, মহীরাবণ নানা বেশ ধারণ করিয়া আসিয়াও ভক্ত হনুমান্‌কে ভুলাইতে পারে নাই। পরিশেষে বন্ধুর বেশ, বিভীষণের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া হনুমান্‌কে ভুলাইল। আমি কখন শত্রুর বেশে আসে না, সর্ব্বদা বন্ধুর বেশে আসিয়া থাকে। অনেক সময় ইহাকে ধরিয়া ফেলা নিতান্ত সুকঠিন। কঠোর বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্র সাধন গৈরিক, ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি কোথায় আমিকে দমন করিবে, না আমির পোষণসামগ্রী হইল। আমি দুর্ব্বল হইবে কোথায়, আমি দিন দিন বলবান্ হইয়া উঠিল। চারিদিকের লোক ঘোর সংসারী, ভোগে রত, সমুদায় দিন বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত, আমি তাহাদের মধ্যে অকামী ভোগত্যাগী বিষয়বিরাগী, একথা ভুলিব কি প্রকারে? যত আমার বৈরাগ্যাদি বাড়িতেছে, তত এই সকল লোকের সঙ্গে পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে; এইবার সর্ব্বনাশ! এইবার আমির জয়। কঠোর বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া, গৈরিক ব্যাঘ্রচর্ম্মাদির ভিতর দিয়া, আমি আসিয়া উপস্থিত। এখন ইহার তপস্বীর বেশ, বৈরাগীর বেশ, যোগীর বেশ। কেহে তুমি? আমি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ের লোকদের ভোগবিলাস বিরুদ্ধাচার দেখিয়া ধর্ম্ম সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এক আমায় আসিয়া আশ্রয় করিয়াছেন, আমি মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছি। আমার এ বৈরাগ্যের বেশভূষা, এ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার লোকের মন আকর্ষণ করিয়া ধর্ম্মের দিকে আনিবে এজন্য আমি এবেশে

একভাবে বিচরণ করিতেছি। আমার কোন লাভালাভ নাই, কেবল পরদুঃখে কাতর হইয়া সংসারে আছি, তাহা না হইলে সংসারীদের গতি হইবে কি প্রকারে? আমার কি! আমি তো অসঙ্গ উদাসীন হইয়া বনচারী হইতে পারি, ফলমূল ভোজনে বা অনশনে দিনপাত করিতে পারি; কিন্তু এই সকল সংসারী লোকদের কি দশা হইবে? আমার বাহ্য বৈরাগ্যের বেশভূষায়ও প্রয়োজন নাই, এ সকলের আমি অতীত হইয়া গিয়াছি তবে লোকশিক্ষার্থ এসকল আমাকে আশ্রয় করিতে হইয়াছে। কেবল পরের কল্যাণ, পরের হিত ভিন্ন আমার আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই। সংসারে পুড়িয়া মরিতেছে যাহারা, একান্ত দুঃখ ভার ক্লান্ত, আমি যদি জনসমাজ হইতে চলিয়া যাই, তাদের কি গতি হইবে!! আমির মত নিস্বার্থ ধার্ম্মিকের বেশধারী কে আছে? কেইবা এমন আছে যে ইহার কথায় কর্ণপাত করে না, ধন্য ধন্য বলে না।

ভিতরের আমির তো এইরূপ ছলনা, বাহিরের আমিগুলিও সামান্য শত্রু নয়। মহর্ষি ঈশাকে অতি প্রিয় শিষ্যকেও "দূর হ, শয়তান" বলিতে হইয়াছিল। তিনি এরূপ কেন বলিলেন? এই জন্য বলিলেন যে, তাঁহার প্রিয় শিষ্য পিটর ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী ভাবে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। যে কোন ব্যক্তি আমাদিগকে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তাহারা আমাদের মিত্রবেশধারী মহাশত্রু, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। আমার আমি ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধে আমায় প্রবৃত্ত করিয়া যেমন আমার সর্ব্বনাশ করে, তেমনি বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনগণের আমি, ঈশ্বরের ইচ্ছা খণ্ডন করিবার পক্ষে, সহায় হইয়া শত্রুতা সাধন করে। পূর্ব্বতন যোগিগণ স্ত্রীপুত্র পরিবার আত্মীয় বন্ধুবর্গকে ছাড়িয়া নির্জ্জন প্রদেশ আশ্রয় করিতেন, আমরা তাঁহাদিগকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া কতই নিন্দা করি। কিন্তু তাঁহারা যে আমির উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া এরূপ করিতেন, তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে? তাঁহারা সংগ্রামে বিমুখ হইলেন কেন? ইহা স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু স্বজন পরিবারের মধ্যেও আমিশত্রুর অত্যাচার ভারি, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। মহর্ষি ঈশা বলিলেন, "কেহই দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, কারণ হয় সে এক জনকে ঘৃণা ও অপরকে প্রীতি করিবে; নতুবা সে একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে ও অপরকে তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না।" ঈশ্বরতনয় এরূপ বলিলেন কেন? ঈশ্বর ও সংসার এ উভয়কে বিরোধী রাখিয়া কেহ ধর্ম্মপথে অবস্থান করিবে, আমিত্বের অত্যাচার হইতে বিমুক্ত থাকিবে, ইহা কি কোন কালে সম্ভব? সংসার যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী হইল তাহা হইলে সে সংসার যোগীর অনুরাগের বিষয় হইতে পারে না, উহা তাঁহার ঘৃণারই উদ্রেক করিবে। পূর্ব্বতন যোগিগণ যে সংসারের সমুদায় বিষয় ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার কারণ এই। ঈশ্বরতনয় সংসারকে ঈশ্বরের অনুগত করিয়া লইতে বলিতেছেন; কখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী না হইতে পারে এজন্য সাবধান করিতেছেন। আমিশত্রুর হাত হইতে মুক্ত হইতে চাহিলে এরূপ না করিলে কিছুতেই সিদ্ধমনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি আর তুমি এই দুই শত্রু আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে, এই দুই শত্রুকে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। আমার সম্বন্ধে যে সকল আমি আমার চারি দিকে আছে, তাহাদিগকে তুমি শব্দে সম্বোধন করিয়া থাকি, সুতরাং আমি তুমি, দুইই সমান শত্রু। তুমি আমিরই রূপান্তর মাত্র।

আমি ও তুমি, এ দুইয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইব কি প্রকারে? এ দুয়ের হাত এড়াইতে না পারিলে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল মিথ্যা আড়ম্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি তুমি, এই দুই শব্দকে যদি ব্রহ্মবাচক করিয়া লইতে না পারি, তাহা হইলে যত বার আমি তুমি শব্দ উচ্চারণ করি, আমাদিগকে ব্রহ্ম হইতে দূরে সুদূরে যাইতে হইবে। আমি তুমি ব্রহ্মবিরোধী ব্রহ্মের আচ্ছাদক, ইহা অপেক্ষা আমি ও তুমির ভীষণ শত্রুতা কি হইতে পারে? বেদান্ত "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" এই দুই বাক্যে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় করিলেন, দূর হইতে অন্তরের অন্তরে আনিলেন, কিন্তু এখানেও আমির কুহকে ঘোর অদ্বৈতবাদ উপস্থিত হইল, ধর্ম্মাধর্ম্মের রেখা অন্তর্হিত হইল। "জগতের আদিতে ব্রহ্ম ছিলেন, তিনি আপনাকেই জানিলেন—'অহং ব্রহ্মাস্মি'—আমি ব্রহ্ম আছি।" ব্রহ্মের মুখের উক্তি সমুদায় জগৎ ও জীবের মধ্য দিয়া যোগীর নিকটে আসিতেছে। যে বস্তু তিনি দর্শন করেন সেই বস্তুর ভিতর হইতে ব্রহ্ম বলেন, "আমি ব্রহ্ম আছি।" জগতে ও জীবে এই প্রকার ব্রহ্মের "আমি আছি" বাক্য যিনি শ্রবণ করিলেন, তিনি "আমি আছি" শব্দের সঙ্গে ব্রহ্মকে অভিন্ন করিয়া লইলেন। যদি নীচ পশু আমিকে তাড়াইয়া দিয়া যিনি 'আমার আমি' তাঁহাকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখিতে হয়, তাহা হইলে নরনারী বৃক্ষলতা প্রভৃতির মধ্য হইতে "আমি আছি" ব্রহ্মমুখের এই বাণী শ্রবণ করা প্রয়োজন। "আমি" বলিতেই যদি ব্রহ্ম নয়নগোচর হন, তাহা হইলে আমি পশু কি আর অত্যাচার করিতে পারে? 'তত্ত্বমসি' "সেই তুমি আছ" এখানে তুমি শব্দ ব্রহ্মবাচক। "স আত্মা তত্ত্বমসি" ইহার পরে "শ্বেতকেতো" এই সম্বোধনপদ আছে। এই সম্বোধনপদকে উপাসকরূপে স্বতন্ত্র রাখিয়া, জগৎ জীবাদিতে বিদ্যমান পরোক্ষ ঈশ্বরকে "তুমি আছ" এইরূপ সাক্ষাৎ উপাস্যরূপে গ্রহণ করিলে আর কোন গোল থাকে না। যিনি হৃদয়ে থাকিয়া বলিতেছেন 'আমি আছি,' তাঁহাকে উপাসক প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন 'তুমি আছ'; এইরূপ যেস্থানে থাকিয়াই তিনি বলিতেছেন 'আমি আছি' সেই স্থান লক্ষ্য করিয়াই উপাসক বলিতেছেন, 'তুমি আছ', এরূপ হইলে 'তুমি' শব্দের ব্রহ্মবাচকত্ব কিছুতেই অন্যথা হয় না।

'আমি তুমি' এ দুই শব্দ আমাদিগকে নিয়ত উচ্চারণ করিতে হইতেছে। এ দুই শব্দ হয় আমাদিগকে নরকে, না হয় আমা-

দিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী 'আমি তুমি' আমাদের পরম শত্রু। এই শত্রু চলিয়া গিয়া যখন ব্রহ্ম 'আমি তুমি' হন, তখন সকল ভয় নিবারণ হয়। ব্রহ্মমুখে 'আমি' শব্দ শুনিয়া সাধক কেবল তুমি তুমি তুমি ক্রমান্বয়ে বলিবেন, আর কোন কালে আপনাকে লক্ষ্য করিয়া আমি শব্দ উচ্চারণ করিবেন না, এরূপ না হইলে মায়াত্মক মায়াপুরুষ আমির অত্যাচার কোন কালে অবরুদ্ধ হইবে না। যেখানে আমি খুব জ্ঞানী যোগী ভক্ত ইত্যাদি অভিমান আছে, সেখানে ব্রহ্মমুখে 'আমি' কথা শুনা বা তাঁহাকে ঠিক ভাবে তুমি শব্দে সম্বোধন করা কখন সম্ভবপর নহে। পরস্পর পরস্পরের প্রশংসাবাদ করিয়া অভিমান বাড়াইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ করা কোন কালে উচিত নহে। যাহাতে মানুষের আমি তুমি বাড়িয়া যায় সেরূপ কথা বলা বা ব্যবহার করা বন্ধুতা নয় শত্রুতা। প্রশংসা প্রাপ্য একমাত্র পরব্রহ্মের। তাঁহার প্রাপ্য আপনি লইলে বা অপরকে দিলে তাহাতে অপরাধ ও ক্ষতি উভয়ই ঘটে। অতএব মানবের দিকের আমি ও তুমিকে ব্যর্থ করিয়া ঈশ্বরের দিকে আমি ও তুমি যাহাতে দিন দিন বাড়িয়া যায় যোগার্থিগণের পক্ষে তাহাই করা সমুচিত। পৃথিবীর লোক আমি ও তুমি শব্দের যথার্থ ব্যবহার জানে না, আমরাও কি তাহাদের মত এ দুই শব্দের প্রকৃত ব্যবহার জানিব না? আমি আমি তুমি তুমি শব্দ নিয়ত উচ্চারণ করিব, অথচ এ দুই শব্দের সঙ্গে ব্রহ্মের কোন সংস্রব থাকিবে না, ইহাতে নিয়ত যোগযুক্ত থাকিব কি প্রকারে? ব্রহ্মকে লক্ষ্য না করিয়া যত আমি তুমি শব্দ উচ্চারণ করিব, তত আমাদের অন্তর মলিন হইবে, আমি প্রবল হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। এই সর্ব্বনাশ হইতে করুণানিধান আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমি তুমি এ দুই শব্দ তাঁহার সাক্ষাৎসম্বন্ধবাচক হইয়া তাঁহাকে প্রতিক্ষণ আমাদিগের অন্তশ্চক্ষু নিকটে প্রকাশমান রাখুক।

প্রাপ্ত।

ব্রাহ্মসাধারণের অবগতির নিমিত্ত।

বোধ হয় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন, বি সি রেলওয়ের গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট চতুর্দ্দিক গ্রামে বেষ্টিত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে খাঁটুরা ব্রাহ্মমন্দির নামক একটি মন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যান ও ভবনাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। সমাজের সম্পাদক ও তাঁহার স্বর্গীয় ভাগিনেয় লক্ষ্মণ চন্দ্র আশ দ্বারা ঐ মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের উভয়ের দ্বারা স্থাপিত "মিশন ফণ্ড" হইতে উহার ব্যয়নির্ব্বাহ হইয়া আসিয়াছে। লক্ষ্মণচন্দ্রের লোকান্তর গমনের পর হইতে ঐ মিশন ফণ্ডের অবস্থা কতকগুলি কারণে দিন দিন হীন হওয়ায় সমাজের অন্তর্গত বালিকাবিদ্যালয় লাইব্রেরি, নৈশবিদ্যালয় ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যয় অনেক পরিমাণে সংক্ষেপ করিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ যে একটী নীলকুঠীর আয় এস্থানের কার্য্যের প্রধান অবলম্বন ছিল, কয়েক বৎসর হইতে তাহাতে লোকসান হওয়ায়, এ বৎসর হইতে তাহার কার্য্য বন্ধ করিতে হইয়াছে। স্থানীয় যে কয়েকটি ব্রাহ্ম ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশের পরলোকগমনে ও সমাজ পরিত্যাগে অর্থের সহিত সমাজ লোকবলবিহীনও হইয়া পড়িয়াছে। এখন যে দুই তিনটি ব্রাহ্মপরি[বা]র আছেন, তাঁহারা বিচ্ছিন্ন ও তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের উন্নতি [আ]শা করা যায় না। মিশন ফণ্ডের সামান্য সাহায্যে ও একমাত্র [স]ম্পাদকের যত্নে কোনরূপে সমাজের কার্য্য চলিতেছে। এইরূপ [অ]বস্থায় সম্পাদকের লোকান্তর গমনের পর ব্রহ্মমন্দির, আশ্রম ও [উ]দ্যানাদি তাঁহার ও লক্ষ্মণ চন্দ্রের এমন আত্মীয় ও উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা, যাঁহাদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিবে না। এই কারণে সম্পাদক এক উইল করিয়া ব্রহ্মমন্দিরাদির ভার কতকগুলি কৃতবিদ্য উৎসাহী যুবক ব্রাহ্মের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর তাঁহার উইলে লিখিত একজিকিউটরগণ প্রবেট গ্রহণ করিয়া ঐ সকল যুবক ব্রাহ্মের হস্তে উহা ট্রষ্ট সম্পত্তিরূপে অর্পণ করিবেন। সমাজের আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত তিনি উইলে কিছু সামান্য সম্পত্তিও দান করিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দিরাদির ন্যায় তাহাও ট্রষ্ট সম্পত্তিরূপে ট্রষ্টিগণের হস্তে অর্পিত হইবে।

কিন্তু এরূপ উইল করা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে যে ব্রহ্মমন্দিরাদি অন্য হস্তগত হইবে না, এ চিন্তা দূর হইতেছে না। কারণ যাঁহাদিগের হস্তে উইলে ভারার্পণ করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে অবস্থিতি করেন। একটিমাত্র স্থানীয় ব্রাহ্মপরিবার আছেন। উদ্যোগী হইয়া উইলের প্রবেটাদি গ্রহণ করত ব্রহ্মমন্দিরাদি অধিকার করাতে কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকারের উপায় লওয়ার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উৎসাহী ও সাহসিক ব্রাহ্মের ঐ স্থানে অবস্থিতি বিশেষ আবশ্যক। তজ্জন্য অন্ততঃ দুই একটি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মপরিবারের ঐ স্থানে এখন হইতে অবস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছে।

কোন ব্রাহ্ম যদি উপরিউক্ত শুভ উদ্দেশ্যে এই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাদরে গৃহীত হইবেন। ব্রহ্মমন্দির ও আশ্রমোদ্যানাদি ষ্টেশন হইতে দেখা যায় ও ৭।৮ মিনিটে যাওয়া যায়। স্থানটি যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই অতি রমণীয় বোধ করেন। ষ্টেশনের নিকটে ইংরাজী বাঙ্গালা স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও এক মাইল দূরে হাইক্লাস ইংলিশ স্কুল আছে। গ্রামসকলে যাহা কিছু থাকা আবশ্যক তৎসমুদয় আছে। কোন বিষয়ের অসুবিধা নাই। দুই ঘণ্টা, শছই ঘণ্টায় ট্রেণে কলিকাতায় যাওয়া যায়। এখান হইতে কলিকাতা ৩৬ মাইল দূরে। ব্রহ্মমন্দির ও মঙ্গলালয় নামক বাটীর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে বাসস্থান ও বাগানাদির জন্য ১০।১১ বিঘা জমি বার্ষিক খাজনা ও সেলামী দিয়া চিরস্থায়ী মৌরশ পাওয়া যাইতে পারে, ধান্যক্ষেত্রের জমিও যথেষ্ট আছে, তাহাও লইতে ইচ্ছা করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

চতুর্দ্দিকে গ্রামসকলে যেরূপ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী লোকের বাস তাহাতে স্থানটি প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

অন্যান্য বিষয় বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিলে খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক, ডাক—গোবরডাঙ্গা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে জানা যাইবে।

সমাধিপ্রতিষ্ঠা ও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ। *

১৩০৪ সনের ৩০শে বৈশাখ মাতৃদেবী স্বর্গগতা হইয়াছেন। তাহার পরবৎসর এই দিনে অর্থাৎ ১৩০৫ সনের ৩০শে বৈশাখ সমাধিস্থাপন করিব এই সঙ্কল্প ছিল, সমুদায় আয়োজন উদ্যোগ হইতেছিল, সমাধিও এক প্রকার প্রস্তুত হইয়াছিল, কোন বিঘ্ন হওয়াতে তখন এ কার্য্য হইতে পারে নাই। অবশেষে গত আশ্বিন মাসে সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইবে এরূপ প্রস্তাব হয়। তখন আমি বিহারপ্রদেশে দীর্ঘকালব্যাপী সঙ্কট রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত ছিলাম, তজ্জন্য সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। গত ফাল্গুন মাসে সমাধি স্থাপন ও তাহার উপর মন্দিরনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করা যায়। প্রথমতঃ রাজমিস্ত্রীদিগের অসাবধানতাবশতঃ কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত ও অর্থক্ষতি হয়। পরে অন্য রাজমিস্ত্রী দ্বারা নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদন করা যায়। বিঘ্নবিনাশন পরমেশ্বরের কৃপায় নানা বিঘ্ন অতিক্রম করার পর আজ জননীর স্বর্গগমনের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক দিনে তাঁহার পবিত্র দেহভস্মের উপর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই সমাধি প্রতিষ্ঠিত ও ইহার আবরণ উন্মুক্ত হইয়াছে।

এই শ্বেতশিলাময় সমাধিনির্ম্মাণে কলিকাতাস্থ সোওয়ারিজ কোম্পানিকে পারিশ্রমিক ইত্যাদি স্বরূপ দেওয়া যায় ২০০৲

কলিকাতা হইতে পাঁচদোনা গ্রাম পর্য্যন্ত ইহা আনয়ন করিতে প্যাকিং খরচ এবং রেল ও জাহাজ ভাড়া ইত্যাদিতে ব্যয় হয় ৫৫৲

সমাধির উপর মন্দিরনির্ম্মাণে ও আনুষঙ্গিক অন্য অন্য কার্য্যে সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক ব্যয় ১৫০৲

মোট ৪০৫৲

মাতৃদেবীর এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের ব্যয়ানুকূল্যার্থ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাঁহারা দান করিয়াছেন তাঁহাদের নামও দানাঙ্ক—

ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়	৫০৲
জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত	৫০৲
স্বর্গগত মধ্যম ভাগিনেয় ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্ত	২৫৲
তৃতীয় ভাগিনেয় শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত	২৫৲
ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র সেন অপিচ দানাঙ্গীকার	২৫৲
” ” সতীশচন্দ্র সেন ” ”	১০৲
” ” রমেশচন্দ্র সেন ” ”	২৫৲
মুন্সীগঞ্জস্থ উকিল শ্রীমান্ জগচ্চন্দ্র রায় ২০ বিশ মণ উৎকৃষ্ট চূণ মূল্য	১৮৲
	২২৮

আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়ার দিবস বিবিধ ব্যাপারের দানাঙ্গীকারের তালিকা পাঠান্তে এইরূপ ব্যক্ত করা গিয়াছিল যে, আমাদের ও প্রতিবেশী জ্ঞাতিবর্গের পরিবারস্থ মহিলাদিগের জন্য উপযুক্ত স্থানে স্বতন্ত্র জলাশয় নাই যে, তাঁহারা লজ্জা ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্নানাবগাহনাদি করিতে পারেন। আমাদের বাড়ীর সম্মুখ ভাগে প্রকাশ্য রাস্তার পার্শ্বস্থ দীর্ঘিকার যে ঘাটে সাধারণ পুরুষগণ স্নানাবগাহনাদি করে, সেই ঘাটে আমাদের পরিবারস্থ মহিলারাও সঙ্কুচিত ভাবে স্নানাদি করিতে বাধ্য হন। সচরাচর রাস্তার ও বাজারের লোকের দৃষ্টি সেই অবস্থায় তাঁহাদের উপর নিপতিত হয়। অনেক পরিবারেরই এরূপ স্বচ্ছল অবস্থা নয় যে, ভৃত্য দ্বারা প্রতিদিন মহিলাদিগের স্নানাদির জন্য সরোবর হইতে জল আনয়ন করিতে পারেন। বিশেষতঃ বিধবাগণ শূদ্রের সংস্পৃষ্ট জলে আচমন করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিতা। তাঁহাদিগকে অনেক সময় নানা শ্রেণীর পুরুষদিগকে ভেদ করিয়া অতি কষ্টে সেই ঘাটে যাইতে হয়। ইহা দেখিয়া আমি অনেক দিন হইতে ক্লেশানুভব করিতেছি। মাতৃদেবীর দেহত্যাগের পর তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপযুক্ত স্থানে উক্ত মহিলাদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র সরোবর খনন করিব মনস্থ করিয়া শ্রাদ্ধবাসরে তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তন্নিমিত্ত উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেল না। বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে একটি ক্ষুদ্র স্থান মনোনীত করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই স্থানে ক্ষুদ্র সরোবর স্থায়ী হইবে না, অচিরেই পাড় ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহা খননে বৃথা অর্থব্যয় মাত্র হইবে, অনেক অভিজ্ঞ লোকের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইয়াছে। কেহ কেহ পাকা ইঁদারা করিবার পরামর্শ দান করেন, তাহাতে আমার উৎসাহ হয় না। কেন না পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক গভীর ইঁদারা হইতে দীর্ঘ রজ্জুযোগে কলসীতে করিয়া জল তুলিয়া সেই জল ব্যবহার করিতে কোন মহিলার রুচি ও প্রবৃত্তি হইবে না, আমার এরূপ বিশ্বাস। তাঁহাদের এ বিষয় কখন কিছুমাত্র অভ্যাস হয় নাই। অতএব খিড়কির পুকুর ও ও ইঁদারা খননে আপাততঃ নিবৃত্ত থাকিতে হইল। যদি ঈশ্বর কৃপায় মৃত্যুর পূর্ব্বে কখন উপযুক্ত স্থান ও অর্থের সংস্থান হয় আমি জলকষ্ট মোচন করিয়া আত্মীয় মহিলাদিগের কিঞ্চিৎ সেবা করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিব।

আদ্যশ্রাদ্ধ দিবসে সন্ধ্যাকালে উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় "পরলোকতত্ত্ব" বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সেইটি সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নাই, সুতরাং পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উক্ত উপাধ্যায় প্রদত্ত 'আত্মা' শীর্ষক উপদেশটি, যাহা কিছু দিন হইল ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, সময়োপযোগী জানিয়া

---

* ভাই গিরিশচন্দ্র সেন স্বর্গগত জননীর সমাধিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ইহা পঠিত হইয়াছিল।

জন্য এইস্থানে পাঠ ও বিতরণের জন্য উহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া আনা গিয়াছে, পরে তাহা পাঠ করা যাইবে।

সংবাদ।

হাজারীবাগস্থ শ্রীমান্ ব্রজকুমার নিয়োগীর তৃতীয়া কন্যার জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান ভাই দীননাথ মজুমদার কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। জগজ্জননী নবকুমারীকে এবং তাহার জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই অনুষ্ঠান ৩০শে বৈশাখ রবিবার হইয়াছে।

ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র লক্ষ্ণৌ হইতে আসিবার সময় গাজিপুর, আরা, খগোল, বাঁকিপুর, মোকামা এবং ভাগলপুরের অধিকাংশ ভ্রাতাভগ্নীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। সকল স্থানেই পারিবারিক ও সামাজিক উপাসনাতে যোগ দিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছেন। বিদেশে যাইলে ভ্রাতা ভগ্নীগণের আদরের আর সীমা নাই। আমরা এত আদর যত্নের কবে যথার্থ উপযুক্ত হইতে পারিব জানি না।

১৯শে বৈশাখ সোমবার লক্ষ্ণৌ সহরে স্বর্গগত শান্তসাধক ভাই কেদারনাথ দেবের দ্বিতীয়া কন্যার শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র দাসের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রটি দেরাড়ুনে কর্ম্ম করেন। বয়স ৩৩ বৎসর। পাত্রীর বয়স ২৬ বৎসর। ভাই উমানাথ গুপ্ত আচার্য্য ও পৌরোহিতের কার্য্য করিয়াছেন। এটি অসবর্ণ বিবাহ। লক্ষ্ণৌস্থ সমবিশ্বাসী ভ্রাতাভগ্নীগণ এই বিবাহে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। দয়াময় শ্রীহরি নবদম্পতীকে তাঁহার চরণচ্ছায়াতে চিরদিন সুখে ও শান্তিতে অবস্থিতি করিতে দিন।

আমরা অত্যন্ত ব্যথিত অন্তরে পাঠকবর্গকে আমাদের সমবিশ্বাসী পরম উপকারী কুমিল্লার উকীল শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনসংবাদ দিতেছি। ইনি অনেক দিন যাবৎ রক্তপিত্ত রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, এলপ্যাথী, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথী প্রভৃতি অনেক চিকিৎসায় রোগের কোন বিশেষ উপকার হয় নাই; তবে মধ্যে মধ্যে ভাল থাকিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিতেন। বিগত ২৩ বৈশাখ দিবা দুই প্রহরের সময় ইঁহার আত্মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছে। ইঁহার অনেকগুলি আত্মীয় স্বজন এবং নিজ পরিবারের ছেলে মেয়ে ও সহধর্ম্মিণী অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। ইনি পীড়ার আরম্ভ হইতে আসন্ন মৃত্যু স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতেন; সর্ব্বদা সংসারের দেনা পাওনার হিসাব পরিষ্কার রাখিতেন; সর্ব্বদা সকলের সহিত সদ্ভাবে বিদায় লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার অমর আত্মা আজ অমরলোকে গিয়া শান্তি সুখ সম্ভোগ করিতেছে। শোকভারে অবনত পরিবারবর্গকে সেই শান্তিদায়িনী জননী সান্ত্বনা প্রদান করুন।

মুঙ্গেরস্থ বন্ধুর পত্র হইতে উদ্ধৃত—"এবার কোন বিশেষ কারণবশতঃ পৌষ মাসে আমাদের মুঙ্গেরের সাংবৎসরিক হয় নাই। পূর্ব্বে আমাদের এপ্রেল মাসে হইত এজন্য গত রবিবার ৯ই এপ্রেল আমাদের উৎসব হইয়া গিয়াছে। শনিবার কেল্লার পূর্ব্বগেটে বাজারের সম্মুখে open air meeting অর্থাৎ হিন্দিতে হিন্দুস্থানী ভাইদিগকে ধর্ম্মের কথা বলা ও উৎসবে আহ্বান করা হয়। আমি ২।৩ টা হিন্দি সঙ্গীত ও বক্তৃতা করি। রবিবার সমস্ত দিন [illegible]পী উৎসব। অর্থাভাবে শ্রদ্ধেয় দীন বাবুকে আনিতে পারি ন[illegible] ভাগলপুর হইতে শ্রদ্ধেয় হরিসুন্দর বাবু আসিয়াছিলেন; দু[illegible]ব[illegible] উপাসনা তিনিই করিয়াছিলেন। প্রথম—এমন কি [illegible]াধন হইতে কান্দিতে কান্দিতে শেষ পর্য্যন্ত কি যে স্বর্গের উপাস[illegible] হইয়াছিল ছেলে বুড়ো যত লোক ছিল সকলে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। উৎসবের কথা বিস্তারিত লিখিবার লোক নাই, আমার অবকাশ নাই।"

প্রেরিত।

গত ফাল্গুন মাসে স্বর্গীয় কেদারনাথ দেবের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রকন্যাগণ এবং শ্রদ্ধেয় প্রচারক প্যারীমোহন চৌধুরী সস্ত্রীক খাঁটুরায় আগমন করেন। তাঁহাদিগের অবস্থিতি কালে দুই বেলা এমন বিশেষ ভাবে উপাসনা মৃত্যু ও পরলোকাদি বিষয়ে এমন গভীর তত্ত্বসকলের আলোচনা হইয়াছিল যে তাহাতে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ সকলে বেশ মুক্তভাবে অনুরাগের সহিত যোগদান করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করেন।

এক দিবস মহিলাগণ গ্রামের মধ্যে একটি ভদ্র হিন্দুপরিবার-মধ্যে গমন করেন। তাঁহাদিগের আগমনে অনেকগুলি প্রতিবেশী স্ত্রীলোক সেখানে সম্মিলিত হন। মহিলাগণ তাঁহাদিগের সহিত সদালাপ ও ধর্ম্মবিষয়ে প্রসঙ্গ উপস্থিত করেন। সকলে তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন এবং এমন ভাব দেখান যাহাতে অন্তরে সায় দান করিতেছেন বুঝা যায়, কিন্তু দেশাচার ও লোক-ভয়ের জন্য তাহা কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করিতে পারেন না। পরে কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া কার্য্য শেষ হইলে পরিবারস্থ কয়টী মহিলা তাঁহাদিগের জলযোগের জন্য যথেষ্ট আয়োজন ও অনুরোধ করেন। পরিশেষে সকলে অত্যন্ত প্রীত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ ব্রাহ্মিকাদিগের পরিচ্ছদ ও রীতি নীতিতে সমস্ত দেশীয় ভদ্রভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে আত্মীয়ের মত জ্ঞান করিয়া সহজে সাহানুভূতি করিতে পারেন। এজন্য অন্তঃপুরিকাগণের নিকট তাঁহাদিগের জ্ঞানধর্ম্মপ্রচারে বিশেষ কোন অসুবিধা দেখা যায় না।

যে সকল স্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে এমন সকল স্থানে ব্রাহ্মিকারা গমন করিয়া হিন্দুরমণীগণের সহিত যদি প্রসঙ্গাদি করেন, তাহাতে অন্তঃপুরের মধ্যে সহজে জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার হয়।

গত ৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার হুগলীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত আর এল্ দত্ত মহাশয়ের ভবনে তাঁহার পৌত্র শ্রীমান্ রঙ্গলালের ৪র্থ বাৎসরিক জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। হুগলীর সেশনজজ শ্রীযুক্ত গুপ্ত মহাশয় উক্ত উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনা করেন ও শ্রীমান্ মনোমতধন দে সঙ্গীত করেন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" ৩ জ্যৈষ্ঠ কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ।
১০ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রশান্ত অনন্ত জলধি, তুমি চির শান্ত, তুমি কোন সময়ে কোন কারণে উচ্চলিত হও না। অসংখ্য অগণ্য জগৎ ও জীব নিত্য তোমা হইতে উদ্ভূত হইতেছে, ইহাদের শাসন জন্য কত বিধি তুমি প্রতিনিমেষ প্রচার করিতেছ অথচ তুমি যেমন তেমনই আছ, ইহার কিছু তোমাকে বিকারগ্রস্ত করিতে পারিতেছে না আমাদের নিকটে যাহা অসংখ্য ও অগণ্য তোমার নিকটে তাহা এক অখণ্ড, তাই বহুরূপে প্রতীয়মান বিষয় সমুদায় তোমায় বহুধা করিতে পারে না, তুমি যে এক ও অখণ্ড সেই এক ও অখণ্ড বিদ্যমান থাক। আমরা আজ পর্য্যন্ত বহুকে এক করিতে পারি নাই, তাই আমাদের মন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। আমরা যদি বহু দিকে মন দি, আমাদের মন ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে না তো কি হইবে? এক অখণ্ড তোমাতে যদি আমাদের মন স্থাপিত হয়, তোমা হইতে আর কোথাও না যায়, বিপৎপরীক্ষা সময়েও আন্দোলনের ভিতরে যদি তোমার দিকে দৃষ্টি স্থির থাকে; যখনই মন বিক্ষিপ্ত হইবার উপক্রম করে, অমনি তোমার চরণে গিয়া যদি আশ্রয় শরণাপন্ন হই, বিপৎ কাটিয়া যায়, পরীক্ষা কল্যাণফল বহন করে, আন্দোলন প্রশান্তভাব ধারণ করে। আমরা যখনই তোমার উপরে একটু আস্থা স্থাপন করিয়াছি, তখনই এই অদ্ভুত ব্যাপার জীবনে দেখিয়াছি, অথচ আমাদের চিত্ত এমনই দুর্ব্বল, আমাদের বিশ্বাস এমনই ক্ষীণ যে, পরীক্ষা বিপৎ উপস্থিত হইলেই আমাদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা প্রশান্তভাব রক্ষা করিতে পারি না, তোমার সঙ্গে আমাদের যোগ কাটিয়া যায়। চিত্ত যদি অশান্ত হইল, অস্থির হইল, আপনাতে আপনি থাকিতে না পারিল, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে যোগও রহিল না তোমা হইতে জ্ঞানাবতরণেরও অবকাশ চলিয়া গেল। হে জীবিতেশ্বর, কত কাল আর এইরূপ যোগের অন্তরায় আমাদের জীবনে বর্ত্তমান থাকিবে। জীবনের শেষভাগে যদি যোগের মহিমা আমাদের জীবনে প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে আমাদের জীবন বিফল হইয়া গেল, এত কাল যে তোমায় ডাকিয়াছি তাহা অপ্রমাণিত হইল, পৃথিবীর পক্ষে সাধন ভজনে অপ্রবৃত্তির কারণ আমরা হইলাম। এত কাল পরে আমাদের জীবন কি অপরের অকল্যাণের জন্য হইবে? এই কি আমাদের জীবনের চরম হইল?

আমাদের সম্মুখে অনন্তলোক, এখন সেই অনন্তলোকের ভাবনা আমাদের মনে প্রবল হওয়া প্রয়োজন; সংসারের সামান্য বিষয় লইয়া উত্তপ্ত হইবার কি এ সময়? অশান্ত চিত্ত কখন সত্যদৃষ্টি রক্ষা করিতে পারে না। তাদৃশ চিত্ত লইয়া না ইহলোকে সুখ হয়, না পরলোকের সম্বল হয়। অতএব প্রার্থনা, তোমার প্রশান্ত মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে আমরা প্রশান্ত চিত্ত হই, সকল প্রকার আন্দোলন পরীক্ষার মধ্যে তোমার শ্রীচরণে চিত্ত দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া চিত্তের অবিকারিত্ব রক্ষা করি। তোমার কৃপায় আমাদের এই প্রার্থনা সত্বর পূর্ণ হইবে, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

জ্ঞানই প্রেম।

ঈশ্বরে জ্ঞান ও প্রেম দুই নয় একই সামগ্রী, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। মানুষেতেও জ্ঞান ও প্রেম এক, ইহা প্রতিপাদন করিলে ঈশ্বরের স্বরূপের সহিত মানুষের স্বরূপের যে একতা আছে, তাহা সহজে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। জড়পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণ আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি। শৈত্য, উষ্ণতা, দৈর্ঘ্য, হ্রস্বত্ব, শুক্ল কৃষ্ণ ইত্যাদি বিবিধ গুণ কখন এক নয়। জড়ে এক শক্তিই পদার্থ, গুণগুলি শক্তির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সংক্রামিত হয়, অতএব উহারাও এক শক্তিরই রূপান্তরমাত্র, একথা বলিলেও শৈত্যের সহিত উষ্ণতার, দৈর্ঘ্যের সহিত হ্রস্বত্বের, শুক্লের সহিত কৃষ্ণের কখন একতা আমাদের অনুভবগম্য নহে। জ্ঞান ও প্রেম এ দুই যদিও লোকে ভিন্ন বলিয়া মনে করে, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জ্ঞানই প্রেম অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

আত্মা—চৈতন্য; চৈতন্য—জ্ঞান। জ্ঞান ও আত্মা একই সামগ্রী। জ্ঞানের প্রকাশে আত্মার প্রকাশ, আত্মা হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হয় তাহা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক জ্ঞানই সম্বন্ধভেদে প্রেম বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। জ্ঞান কখন আপনাকে জানিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, যে সকল পদার্থে ও নরনারীতে উহা পরিবেষ্টিত তাহাদিগ সকলকে জানিতে যত্ন করে। জানা দুই প্রকা[র] সাধারণ ভাবে ও বিশেষ ভাবে। সাধারণ ভাবে [যা]হাদিগকে জানি তাহাদের সম্বন্ধে আমরা উদাসী[ন] থাকিতে পারি, কিন্তু যাহারা আমাদের বিশে[ষ] ভাবে জ্ঞানের বিষয়, তাহাদিগের সম্বন্ধে ঔদাসী[ন্য] প্রকাশ করা কখনই সম্ভবপর নহে। বিশেষরূপে চিন্তা নিয়োগ না করিলে বিশেষ ভাবে [জা]না যাইতে পারে না। নরনারীর কথা দূরে, যে [স]কল বস্তু বা জীব নিয়ত আমাদের চিন্তার বিষয় হয়, তাহাদের সম্বন্ধে ভাবযোগ এমনই দৃঢ়মূল [হ]ইয়া পড়ে যে, তাহারা আমাদের হৃদয়মনকে [স]হজে আকর্ষণ করিতে থাকে। বিশেষ জ্ঞান[জ]নিত এই আকর্ষণই প্রেমনামে অভিহিত হই[য়া] থাকে। সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে অপরের প্রতি [ট]ান থাকে না, বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে অপরের প্রতি একটা টান থাকে, এই প্রভেদ স্বীকার করি[য়া] জ্ঞান ও প্রেম স্বতন্ত্র করা হইয়া থাকে, কিন্তু [ব]স্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই।

জ্ঞানের ভাব এই, যে কোন বস্তু বা মানবের প্রতি উহার [প্র]য়োগ হয়, সেই বস্তু বা মানবের গূঢ় বিষয় সমুদা[য়] প্রকাশ করিয়া ফেলে। সকল সময়ে সমান ভা[বে] আমরা জ্ঞানের নিয়োগ করি না, উপরি উপ[রি] ভাবে দেখি ও শুনি, এবং বলি অমুক ব্যক্তি [বা] বিষয়কে আমরা জানি। সংসারের সাধারণ ক[া]য[্য] নিয়ত এইরূপেই চলিতেছে; না জানিয়াও [আ]মরা জানি এইরূপ আমরা মনে করি। কিন্তু যেখ[ানে] একত্র স্থিতিবশতই হউক, অন্য কারণেই [হউ]ক, বা স্বাভাবিক টানেই হউক, আমাদের মন কোন ব্যক্তিকে লইয়া নিয়ত ব্যাপৃত হয়, সেখানে আর উপরি উপরি ভাবে দেখা শুনা চলে না। উপরিভাগ ভেদ করিয়া চিত্ত অপরের আত্মাতে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং সেই

আত্মার সঙ্গে নিজের আত্মাকে মিলিত করিয়া তাহার চিন্তায় মগ্ন হয়। এক জনের আত্মা যখন অপরের আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন সে ব্যক্তি আপনাকে ভুলিয়া গিয়া সেই অপরের আত্মাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই লোকে প্রেম বলে। কোন নারী যত দিন সন্তানবতী না হন, তত দিন তিনি আপনার চিন্তায় ব্যস্ত, কিন্তু যাই তাঁহার একটি সন্তান হইল, অমনি চিন্তা আপনার প্রতি হইতে নিবৃত্ত হইয়া সন্তানে গিয়া লগ্ন হইল। যখন মাতার চিন্তা নিয়ত সন্তানেতে সংলগ্ন, তখন সন্তানের অভাবে তাঁহার অভাব, সন্তানের ক্লেশে তাঁহার ক্লেশ,সন্তানের সুখে তাঁহার সুখ হইয়া গেল। এক ব্যক্তির স্থল আর এক ব্যক্তি অধিকার করিল, ইহারই নাম প্রেম হইল। এস্থলে আমরা কি দেখিতেছি, এক শুদ্ধ জ্ঞানই বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রেম আখ্যা ধারণ করিল।

যত দিন মানুষ পশুভাবে আবদ্ধ থাকে, তত দিন জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় না। আহার, পান, ভোজন, প্রবৃত্তিচরিতার্থতা এই সকলের জন্য যে যৎসামান্য জ্ঞানের প্রয়োজন তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে। অপরের প্রতি নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার, কথায় কথায় শোণিতপাত, এ সময়ের প্রধান লক্ষণ। নরমাংসলোলুপ বর্ব্বরজাতি জ্ঞানে অতি হীন, এজন্য তাহারা স্বজাতির মাংসে আত্মোদর পূরণ করিতে সঙ্কুচিত হয় না। যদি সেই জাতিকে জ্ঞানে উন্নত করিতে পারা যায়, তাহাদের কঠোর নিষ্ঠুর ভাবের স্থলে সুকোমল ভাব আসিয়া অধিকার করে। এরূপ হয় কেন? পূর্ব্বে জ্ঞানাভাববশতঃ অপরকে আপনার সদৃশ মনে করিতে পারে নাই, অপরের সুখদুঃখাদি মানসগোচর হয় নাই, আপনার রসনার তৃপ্তি উদরপূর্ত্তি মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া ছিল, তাই সে অনায়াসে স্বজাতির মাংসে ক্ষুন্নিবারণ করিয়া কিছুমাত্র মনে ক্লেশানুভব করে নাই। আমাদের অভিমান এই, আমরা নরমাংসলোলুপ বর্ব্বরজাতিকে জ্ঞানোন্নতিতে অনেক দূর অধঃকরণ করিয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছি, তাহাদিগের ন্যায় নিষ্ঠুর কার্য্যে আমাদের ও আমাদের সন্তানসন্ততিগণের প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। বর্ব্বরগণ দুর্গত মানবমানবী পাইলে উদরস্থ করিত, এবং তাহাতেই তাহাদের কত আমোদ হইত, এখন আমরা তাদৃশ নরনারীর দুঃখ বিমোচনের জন্য ব্যস্ত। হাঁ, একথা সত্য যে,আমরা জ্ঞানে বর্ব্বরজাতি হইতে অনেক দূর উন্নত হইয়াছি, কিন্তু এখনও যে আমাদের বর্ব্বরত্ব ঘোচে নাই, ইহা মনে করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। আমরা এখনও জ্ঞানে নরনারীর হৃদয় অধিকার করিতে পারি নাই, তাহাদের মনের ভাবের সহিত আমাদের সহানুভূতি জন্মে নাই, তাহাদের নিগূঢ় ক্লেশ দুঃখ আমাদের গণনায় আইসে না। এমন কি যাঁহাদের সহিত আমরা নিয়ত এক গৃহে বাস করি, শোণিতমাংসে নিরতিশয় ঘনিষ্ঠ, তাঁহাদের মনোভাব পাঠ করা আমাদের দ্বারা হয় না। ইহার কারণ এই যে, এত বিদ্যা বুদ্ধি লইয়া আমরা আপনার চিন্তায় ব্যস্ত, অপরের বিষয় ভাবিবার আমাদের অবসর নাই, তাই আমরা ঘরের লোকেরও চিত্তজ্ঞ নহি, ভাবজ্ঞ নহি।

আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইল যে, জ্ঞানোন্নতিই প্রেম। মা শিশুর বিষয় ভাবেন চিন্তা করেন, তাহাতেই তাঁহার চিন্তা নিবিষ্ট, সুতরাং অপর সহস্র লোক অপেক্ষা আত্মশিশুর প্রতি তাঁহার সমধিক স্নেহ। শিশুর অভাবাদি তিনি যেমন জানেন ও বোঝেন এমন আর কে জানে? কিন্তু মাতা যতই কেন শিশুকে জানুন না, তথাপি তাঁহার অনেক বিষয়ে জ্ঞানের অভাব আছে বলিয়া শিশুসম্বন্ধে সকল প্রয়োজন বোঝেন না, এবং বোঝেন না বলিয়াই তাঁহার দ্বারা অনেক সময়ে অনিষ্ট ঘটে। পশুগণের শিশুর প্রতি যে স্নেহ তাহাতেই সকল অভাব পূরণ হইবার সম্ভাবনা আছে, কেন না তাহাদের অভাবাদির একটা সীমা আছে। মানবজাতির জ্ঞানোন্নতিরও সীমা নাই, প্রেমের ক্রিয়ারও কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

এরূপ স্থলে যে পরিমাণে জ্ঞানের অভাব আছে, সেই পরিমাণে স্নেহেরও ন্যূনতা থাকিবে, ইহা অপরিহার্য্য। অজ্ঞানতাজনিত কত মাতা শিশুর ক্লেশ দুঃখের কারণ হন, ইহাতো আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই অজ্ঞানতার জন্যই মাতা যে শিশুর প্রতি অনেক সময়ে অত্যাচার করেন ইহাই বা আর কে না দেখিয়াছেন? অতএব জ্ঞান ও প্রেম এক, জ্ঞানোন্নতিতে প্রেমোন্নতি, ইহা আমাদের সকলকেই মানিতে হইবে।

ঐকমত্য।

পিতা পুত্রে, মাতা কন্যায়, ভ্রাতা ভগিনীতে, স্বামী স্ত্রীতে, বন্ধুতে বন্ধুতে যখন ঐকমত্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন আর কাহারও সহিত কোন বিষয়ে ঐকমত্য হইবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? যে বিষয় লইয়া দুই ব্যক্তির মন এক, সেখানে ঐকমত্য সম্ভবপর, কিন্তু পৃথিবীতে এস্থলেও বিরোধের বীজ ছড়ান রহিয়াছে। স্বার্থপ্রণোদিত চিত্ত শীঘ্র এস্থলে ঈর্ষানল জ্বালাইয়া দেয়, এবং যেখানে ঐকমত্যের সম্ভাবনা সেখানে উহা বিরোধ ঘটায়। তুমিও অর্থ চাও আমিও অর্থ চাই, অর্থের কথা লইয়া যখন আমাদের দুজনের আলাপ হয়, তখন দুজনের মন প্রমত্ত, কত অনুরাগই পরস্পরের প্রতি প্রকাশ পায়, আলাপ করিবার জন্য আমি দৌড়াইয়া তোমার নিকটে আসি, তুমিও দৌড়াইয়া আমার নিকটে আস! পাড়ার সকল লোকেই বলে এ দুজনের মধ্যে ভারি বন্ধুতা' কিন্তু যখন দুজনে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হই, যখন তুমি বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন কর, আমি তাহা পারি না, তখন পূর্ব্ব ভাল ভাব ও বন্ধুতা প্রথমতঃ ঈর্ষা তৎপর ঘৃণায় পরিণত হয়। তুমি বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গ্রামে বড় ধনী হইলে, আমি ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে দরিদ্র হইয়া গেলাম, এখন তুমিও আমাকে সে চক্ষে আর দেখিতে পার না, আমিও আর তোমায় সে চক্ষে দেখিতে পারি না। এখন সে আলাপের স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, যদি তুমি আমায় দেখিয়া কুশলপ্রশ্নমাত্র কর আমি কৃতার্থ হইয়া যাই।

একই বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকিলেও ঐকমত্য চিরদিন থাকে না, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বিষয়। অর্থ কেন, ধর্ম্মে যদি দুজনের প্রথমে ঐকমত্য ঘটে, সে ঐকমত্যও চিরদিন থাকিবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। তুমি ধর্ম্মে অগ্রসর হইয়া গেলে, আমি বিষয়বাণিজ্য করিতে গিয়া সংসারী হইয়া পড়িলাম, আর তোমার সঙ্গে ঐকমত্য হইবে কি প্রকারে? যদিও বা দুজনেই ধর্ম্মব্যবসায়ে প্রবৃত্ত থাকি, তথাপি চিরদিন ঐকমত্য থাকিবে মনে করিও না। আমরা দুজনেই যদি শিষ্যসংগ্রহে ব্যস্ত হই, শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে ঈর্ষা আসিয়া দেখা দিবে। যদি বল আমাদের ধর্ম্মে তো আর শিষ্যসংগ্রহ নাই যে, বিরোধ ঘটিবে? শিষ্যসংগ্রহ না থাকিল, স্তাবকসংগ্রহে প্রযত্ন থাকিতে পারে। তুমি অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইলে, লোকে তোমার কত প্রশংসা করিতে লাগিল, আমি অজ্ঞাতকুলশীলের ন্যায় দিন দিন হইতে লাগিলাম, তোমার কর্ম্মণ্যতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল, আমি অকর্ম্মণ্য হইতে চলিলাম, বল এরূপ স্থলে ঈর্ষানল জ্বলিবে না, ইহা কি কখন সম্ভব? আমার ধর্ম্মবন্ধু বাড়িয়া যাউন, আমি দিন দিন লুক্কায়িত হই, এরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ধর্ম্মসমাজে কয়জন আছেন! যদিই বা থাকেন, যিনি বাড়িয়া চলিলেন, তিনি কি আর যিনি জন সমাজে অনাদৃত তাঁহার প্রতি সমান ভাব রক্ষা করিতে পারেন? যখন দুজনের ভিতরে ঈদৃশ তারতম্য উপস্থিত তখন ঐকমত্যের সম্ভাবনা অতি অল্প।

ঐকমত্য বাল্যোচিত, যৌবনোচিত নহে। বাল্যকালে যখন বিষয়গরল পান করা হয় নাই তখন ক্রীড়ার সঙ্গিগণের সঙ্গে ঐকমত্য সম্ভবপর; যদিও কখন কখন বিরোধ ঘটে, সে বিরোধে আরও মিলন সুমিষ্ট করিয়া দেয়, পরস্পরকে

ছাড়িয়া থাকা বড়ই কষ্টকর হয়। আমরা এখন বৃদ্ধ হইয়াছি কিন্তু বাল্যকালের সে সুমিষ্ট একতা আজও ভুলি নাই। ঈশা যেমন স্বর্গরাজ্য ঘোষণা করিলেন, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিশুভাবকে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের উপায় বলিলেন। তুমি বৃদ্ধ, জ্ঞানে, বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ, এখন তুমি বালক হইবে কি প্রকারে? তোমার জ্ঞানের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, অভিজ্ঞতার অভিমান ছাড়িবে কি প্রকারে? যাহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই, জ্ঞান নাই, তাহাদের সঙ্গে বাল্যোচিত ভাবে একমত হইবে, ইহা কি সম্ভব? অথচ যদি বাল্যভাব না থাকে, কাহারও সঙ্গে ঐকমত্যের সম্ভাবনা নাই। যতই তুমি অধিক বুঝিবে, ততই তোমার অপরের সঙ্গে মিল হইবার সম্ভাবনা অল্প। তোমার আলোকের নিকটে আমরা অন্ধকারের ন্যায় প্রতীত হইব, আলোকে অন্ধকারে মিল হইবে কি প্রকারে?

এমন কোন স্থল হইতে পারে না, যেখানে অনৈকমত্যের কিছু না কিছু কারণ নাই। আজ যদিও ঐকমত্য আছে, সময় আসিতেছে, যে সময়ে অনৈকমত্য দেখা দিবেই দিবে। তোমরা কয়েক জন বেশ একমত হইয়া বাস করিতেছ, যাঁহারা সংসারে বৃদ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা গম্ভীরভাবে বলিবেন, 'হাঁ, আমাদেরও বন্ধুগণের সঙ্গে প্রথমে এরূপ ঐকমত্য ছিল, কিন্তু অধিক পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের অনৈক্যগুলি এমনি প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, আর ঐকমত্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইল না। তোমাদের এইরূপ হইবে, সুতরাং বর্ত্তমান ঐকমত্যের উপরে কোন ভরসা রাখিও না। যদি অধিক ভরসা রাখ, অধিক পরিমাণে নিরাশার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।' বৃদ্ধগণের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া তাহার উপরে আস্থা স্থাপন করিয়া যুবকগণ নিরাশচিত্ত হইবেন, না তাঁহারা আপনাদের মধ্যে চির ঐকমত্য রাখিবার জন্য আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন। ঐকমত্য রক্ষা যখন কোথাও সম্ভবপর নহে, তখন এমন কি উপায় তাঁহারা অবলম্বন করিবেন, যাহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঐকমত্য চির রক্ষিত হইতে পারে।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে একটি নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অবলম্বন করিলে আমরা আশা করি, চিরজীবন ঐকমত্য রক্ষা করা যাইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যখন গ্রহ বা নক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদিগের প্রতিজনের গণনায় যে ভিন্নতা উপস্থিত হয়, প্রতিব্যক্তির ঝটিতিদর্শনসম্বন্ধে যে মৌহূর্ত্তিক ভিন্নতা আছে, সেই ভিন্নতা বাদ দিয়া তাঁহারা গণনার ঐক্য সম্পাদন করেন। তাঁহারা প্রতিজন আপনাদের এই ভিন্নতা অবগত আছেন, এবং সেই ভিন্নতাকে গণনা হইতে অন্তরিত করিয়া দেন বলিয়াই অপর সকলের পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে মিল রাখিতে পারেন। আমাদের অপর বন্ধুগণের সহিত কোথায় ব্যক্তিগত ভিন্নতা আছে, ইহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়া সেই ভিন্নতাকে মিলনের ভূমির বহির্ভূত করিয়া রাখিতে হইবে। যাহা ব্যক্তিগত, তাহাকে মিলনের ভূমিতে প্রবেশ করিতে দিয়া মিলনের ব্যাঘাত উৎপাদন করা, ইহা একান্ত ক্ষুদ্রহৃদয়ের লক্ষণ। আমি যখন সকলের সঙ্গে মিলিত হইতে আসিব, তখন আমি ব্যক্তিত্ববিরহিত আত্মা হইয়া সেখানে আসিব। কেহ কেহ বলিবেন, ব্যক্তিত্ববিরহিত হইলে কিছুই রহিল না, সে ব্যক্তি অপর সকলের সহিত একমত হইবেন, তাহাতে আবার পুরুষকার কি? জিজ্ঞাসা করি, ব্যক্তিত্ববিরহিত আত্মা লইয়া না আসিলে, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হয় কি না? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বন্ধুগণের সহিত তোমার মিলন হইবে, তুমি আশা কর কেন? ব্যক্তিত্ববিরহিত আত্মা বলিলে কি বুঝায় তুমি যদি বুঝিতে, তাহা হইলে আর তোমার মনে এ আপত্তি উঠিত না। দেশীয় শাস্ত্রে যাহাকে 'রাগকষায়িতচিত্ততা' বলে, সেইটি পরিহার করাকে আমরা 'ব্যক্তিত্ববিরহিত আত্মা' বলিয়া থাকি। কোন একটি বিষয়ের প্রতি একান্ত অনুরাগবশতঃ চিত্ত এমনি তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে যে অন্য দিকে তাহার অন্ধতা

উপস্থিত হয়। এই অন্ধতাই ব্যক্তিত্বনামে অভিহিত। এই ব্যক্তিত্বই ঐকমত্যের বিষম প্রতিবন্ধক। জ্ঞান প্রেম পুণ্য লইয়া যে ব্যক্তিত্ব সে ব্যক্তিত্বে বিরোধ নাই, কেন না সে ব্যক্তিত্ব সকল সম্মিলনের মূল, ঈশ্বরের সহিত একীভূত। যে ব্যক্তিত্ববশতঃ আমরা ঈশ্বর ও মানব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকি, সেই দুরন্ত ব্যক্তিত্ব সর্ব্বনাশের মূল। এই ব্যক্তিত্ববিরহিত হইয়া বন্ধুগণের সভায় উপস্থিত হও, তোমার আমার মধুর ভাবে সকল বিরোধ চূর্ণ হইয়া যাইবে। ঈদৃশ ব্যক্তিত্ববিরহিত কতকগুলি আত্মা একত্রিত হউন, দেখা যাইবে, ঐকমত্য কেমন স্বাভাবিক।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি নিশ্চিন্ত হইতে বল, বল মানুষ নিশ্চিন্ত হয় কিরূপে! তার অভাব কত? যত তার বয়স হয়, তত অভাব বাড়ে। যখন সে শিশু ছিল, শিশুর মত অভাব ছিল, তখন তাহার সে অভাব দূর হওয়া কিছু কঠিন ছিল না; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক জনের নয় দশ জনের ভাবনা আসিয়া যখন চাপে, তখন 'নিশ্চিন্ত থাক' একথা তুমি যদি বল, লোকে তাহা পালন করিবে কি প্রকারে?

বিবেক। আমি যদি বলি 'নিশ্চিন্ত থাক,' আমার একথায় কয় জন কর্ণপাত করে? তুমি যাহাদের কথা বলিতেছ, তাহারা কি আমার কথা শুনিয়া চলে? যখন দায়ে পড়ে, তখন তুমি নিকটে থাকিতে তাহারা আমার নিকটে আসিবে কেন? এমন কি যাহারা আমার কথা শুনিয়া চলে, সংসারিগণ ভয়ে তাহাদের নিকটেও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে না। তাহাদের যদি পরামর্শের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহাদের মত বুদ্ধিজীবী লোকদিগের নিকটে যায়। যত দিন তাহাদের জীবনে শেষ পরীক্ষা উপস্থিত না হয়, তত দিন তাহারা এইরূপেই চলিতে থাকে। আমি 'নিশ্চিন্ত হও' বলিয়া কাহাকেও উৎপাত করি, এ কথা বলা তোমার ভাল হয় নাই। যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত নয়, তাহাদিগকে বলিবার অন্য অনেক কথা আছে, সে সকল থাকিতে ও কথা বলিব কেন? আগে প্রবৃত্তিবাসনাগুলি ছাড়িলে, তবে তো আত্মসমর্পণের অভিলাষ জন্মিবে। আত্মসমর্পণে অভিলাষ জন্মিলে তবে তো নিশ্চিন্ত হইবার কথা।

বুদ্ধি। আমি দেখিতেছি, তুমি কোন না কোন প্রকারে আমার উপরে দোষ দাও। সংসারী লোক যখন তোমার নিকটে যাইতে পারে না, তখন আমি তাহাদের আশ্রয় না দিয়া কি করি? তুমি কি মনে কর, লোকদিগের সম্বন্ধে আমার কিছু করিবার নাই?

বিবেক। তোমার কিছু করিবার নাই, আমি তো কোন দিন একথা বলি নাই। অভিজ্ঞতা কিছু একটা সামান্য বিষয় নয়। লোকে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার উপরে ভর দিয়া অনেক কার্য্য চালাইয়া থাকে। যদি কার্য্যের তাহাতে ক্ষতি হয়, নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সেই অভিজ্ঞতা অনুসারে কার্য্য করিয়া সফলমনোরথ হয়। আবার যখন সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে আর সে অভিজ্ঞতা কার্য্যকর হয় না, তখন নূতন অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিবার সময় উপস্থিত হয়। এইরূপ অভিজ্ঞতামূলক যে কার্য্য তাহাতে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন। জানিও আমি অভিজ্ঞতার বিরোধী নই, আমার সহকারী বিজ্ঞান এই অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি যে সকল অভিজ্ঞতার উপরে সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, তাহার সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে অভিজ্ঞতার অপব্যবহার করে, এজন্যই তাহারা এত দুঃখভাজন হয়।

বুদ্ধি। অভিজ্ঞতার অপব্যবহার তুমি কাহাকে বল?

বিবেক। একটি কোন কার্য্যের ফল প্রকাশ পাইতে দীর্ঘকালের প্রয়োজন। বিজ্ঞান দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার উপরে আপনার সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। লোকে বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে পারে না। যে কার্য্যের ফল বিংশতি বর্ষে প্রকাশ পাইবে, দশ বৎসর বা পাঁচ বৎসরের ফলাফল দেখিয়া লোকে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে এবং বলে যে, অমুক অমুকের যখন অমুক অমুক অবস্থায় এইরূপ হইয়াছে, তখন আমাদেরও সেইরূপ হইবে; অতএব আমি অমুক কার্য্য করিব না কেন? দেখ বাসনার প্রাবল্যবশতঃ কত লোকে আপনার এইরূপে অনিষ্ট সাধন করিতেছে। বিজ্ঞানের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার উপরে আস্থা থাকিলে আর তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। তাহারা অল্পদিনের ফল দেখিয়া বিজ্ঞানের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার প্রতি অবহেলা করে, ইহা কি বাসনা বিকারের কার্য্য নহে?

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

একত্বের ভূমি।

৯ই চৈত্র, রবিবার, ১৮১৮ শক।

একের সম্বন্ধে সমুদায় জগৎ ও জীব এক হইয়া রহিয়াছে। এই একের সহিত সম্বন্ধ কাটিবার জন্য আমাদের কত যত্ন ও প্রয়াস। যাহা একত্র আছে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে গিয়া যত প্রকারে অকল্যাণ উৎপন্ন হইতেছে। বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া এই সম্বন্ধ কাটিতে যাই, সম্বন্ধ কাটুক বা না কাটুক আমাদের মন হইতে সম্বন্ধ অন্তর্হিত হয়; যেখানে হিংসা দ্বেষ মন্দ ভাব সেখানে সম্বন্ধ থাকিয়াও থাকে না। যেখানে যাহা আছে, আমাদের মন্দবুদ্ধি সেখানে তাহা নাই করিয়া ফেলে। এই বুদ্ধির জালে

আমরা সর্ব্বদা জড়িত হইয়া রহিয়াছি, এই অসদ্বুদ্ধি আমাদিগকে কত প্রকার অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে। নরহত্যা ব্যভিচার প্রভৃতি যত ভয়ানক ভয়ানক পাপ, ইহারই প্ররোচনায় লোকে সর্ব্বদা করিয়া থাকে। আমরা সকলে এক ঈশ্বরেতে এক, ইহা ভুলিয়া যাওয়াতেই মায়া মোহ ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি মানবসমাজের ঘোর অকল্যাণ সাধন করিতেছে। জ্ঞাতিবিরোধ অতি ভীষণ বলিয়া সকলেই জানে। কুরু ও পাণ্ডবগণের কুলক্ষয়কর বিরোধ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ঈশ্বরসম্বন্ধে আমরা কাহার সহিত জ্ঞাতিসম্বন্ধে বদ্ধ নই? আমরা যে কোন ব্যক্তির সহিত কলহে প্রবৃত্ত হই না কেন, যে কোন ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হই না কেন, আমরা জ্ঞাতির সহিত শত্রুতাচরণ করিতেছি; এই শত্রুতা প্রকৃত জ্ঞানের অভ্যুদয় বিনা কোন কালে যাইবার নহে। আমরা সকলে একেতে এক, এ জ্ঞান যত দিন আমাদের জীবনের নিয়ামক না হইতেছে, তত দিন পৃথিবীর কল্যাণের সম্ভাবনা নাই।

একেতে এক হইব কি প্রকারে? একেতে এক নিত্য সিদ্ধ হইলেও মন যদি তাহা প্রত্যক্ষ না করিল, তাহা হইলে সে স্বাভাবিক একত্ব থাকিয়াও নাই। আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি—আমাদের পাপ—আমাদের পরম শত্রু। একত্বে যে মহাসুখ উপস্থিত হয়, এই শত্রু তাহার ঘোর অন্তরায়। এই শত্রু ভাইকে পর বলিয়া বিদায় করিয়া দেয়, আমাদের সুখের আর কেহ ভাগী হইলে আমাদের সুখ সেই পরিমাণে কম হইবে, এই কুপরামর্শ দিয়া, দেখ, এই পাপশত্রু আমাদিগকে স্বার্থের বন্ধনে বান্ধিয়া রাখিয়াছে। সংসারের ধন মান, ঐশ্বর্য্য, এ সমুদায়ের কেহ সমভাগী হয়, ইহাতো আমরা সহ্য করিতে পারি না, ধর্ম্মরাজ্যের ধর্ম্মের সুখ সকলে মিলিয়া সমপরিমাণে সম্ভোগ করিব, ইহাও আমরা চাই না। যে রাজ্যে মানাভিমান কিছু থাকিবে না, সে রাজ্যে মানাভিমানের প্রভুত্বে বিষম অনিষ্ট হইতেছে। আমার ভাই আমার অপেক্ষা ধার্ম্মিক হইলে কোথায় আমি সুখী হইব, তাহা না হইয়া আমি তৎপ্রতি ঈর্ষাপরবশ হই; অপরেতে যোগ ভক্তির আধিক্য দেখিয়া কোথায় আমি তাঁহার মঙ্গলের জন্য আকুল হইব, তাহা না হইয়া তাঁহার যোগিত্ব ভক্তত্বের প্রতি লোকের অনাস্থা উপস্থিত হয়, এইরূপ কৌশল বাহির করিতে আমি ব্যস্ত হই। যাঁহারা ঈশ্বর প্রেমিক তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ঈশ্বরের সন্তানমাত্রকে অতি আদরের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহাদের সঙ্গলাভে আপনাদিগকে নিতান্ত কৃতার্থ মানিতেন, আমাদিগের মধ্যে সকলই ইহার বিপরীত। যেখানে এরূপ অবস্থা, সেখানে একত্বজনিত আনন্দ আমাদিগের মধ্যে কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে?

একত্ব নিত্যসিদ্ধ; অথচ এই একত্বের স্থলে নিত্য বিরোধ, এ বিপরীত ভাব কি প্রকারে ঘুচিবে? এককে লইয়াই সাধনের সর্ব্বত্র আরম্ভ, এবং একেতেই সাধনের পর্য্যবসান। সাধনের আরম্ভে যিনি এক, তিনি জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধবিরহিত, এরূপ ভাবে সাধক তাঁহাকে যদি প্রথমে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে জগৎ ও জীবের সহিত তিনি এমনি মিশাইয়া যান যে, তাঁহাকে অবিমিশ্রভাবে ধারণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাধনের আরম্ভে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নির্গুণ, কিন্তু সাধনের অন্তেও কি তিনি সেই প্রকার থাকেন? জগৎ, জীব ও আমি এ তিন হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া চক্ষের নিকট ধারণ করিতে না পারিলে তিনি যে কি তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। জগৎ, জীব ও আমি না থাকিলে যেন ব্রহ্ম থাকেন না, এই প্রকার ভাবে সাধনারম্ভ কখনই কল্যাণকর নহে। আমি, জগৎ ও জীব যখন ছিলাম না তখন ব্রহ্ম ছিলেন, আমরা যদি না থাকি তখনও তিনি থাকিবেন, এ ধারণা না হইলে অনিত্য বস্তুর, পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর অর্চ্চনা হইয়া সমুদায় সাধন বিফল ও বিকার-গ্রস্ত হয়। সর্ব্বনিরপেক্ষ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যখন সাধকের সাক্ষাৎ-কারের বিষয় হইলেন, তখন সাধকের ব্রহ্মেতে স্থিতি হইল, এবং ব্রহ্মে স্থিতিবশতঃ আপনার সঙ্গে, জগতের সঙ্গে ও অপরজীবসমূহের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। এখন নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ, কেন না তিনি সকলকে আপনার অনন্ত প্রশস্ত ক্রোড়ে ধারণ করিয়া নিয়ত তাহাদিগের প্রতি অনন্ত প্রেম প্রকাশ করিতেছেন, তাহাদিগকে পুণ্যসৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতেছেন, জগতে আপনার বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া সমুদায় জীবকে বিবিধ প্রকারে সুখী করিতেছেন। ব্রহ্ম প্রথমে নিরপেক্ষ এক ছিলেন, এখন সকলকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া লইয়া এক হইয়া সাধকের নিকটে প্রকাশ পাইলেন, এ দুই ভাবের তারতম্য কিছু সামান্য নহে।

এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করিলে সকলের সহিত এক হওয়া যায়, এ কথা ইতিহাসে প্রমাণিত হয় নাই। বরং যাঁহারা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক তাঁহারা আপনার সম্প্রদায়বহিভূ‌ত লোকদিগকে ঈশ্বরের শত্রুজ্ঞানে তাহাদিগের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে ঈশ্বরের রাজ্য হইতে বহিভূ‌ত করিয়া দিতে যত্ন করিয়াছেন, এমন কি তাহাদিগের উপরে ঈশ্বরের অনন্ত রোষ, এবং অনন্ত নরকানল তাহাদিগের রঙ্গভূমি, তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া মনে হয়, সর্ব্বনিরপেক্ষ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনায় সাধনের আরম্ভ, কিন্তু উহা কখন চরম সাধন নহে। ঈশ্বরের আনন্দসাগরে যে সাধক না ডুবিয়াছেন, তাঁহার আনন্দমূর্ত্তি যিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহার জগৎ ও জীবের সহিত একত্ববন্ধনে বদ্ধ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। যেখানে প্রেম সেখানে আনন্দ, যেখানে পুণ্য সেখানে একত্ব, প্রেম-পুণ্যের যোগে একত্বরসের প্রাদুর্ভাব, ইহা তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারেন, যাঁহাদের সাধন একটু ঘনতর হইয়া আসিয়াছে। আমাদের উপাস্য এক, আরম্ভে ও চরমে তিনি এক, এক ভিন্ন তাঁহাতে দ্বৈতভাব কখনই আসিতে পারে না। বেদান্তবাদিগণ এই একেরই মহিমা ঘোষণা করেন, 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি বাক্যে

সেই একেরই একত্ব আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করেন, অপর দেশের যোগী ভক্তগণও সেই এককেই আমাদিগের নিকটে উপস্থিত করেন। বেদান্তবাদিগণের 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আর ঈশার 'আমি ও পিতা এক' এ দুইয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বেদান্তবাদিগণের একত্ব নির্গুণে পর্য্যবসন্ন থাকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঈশার সম্বন্ধে কখন তাহা সম্ভবপর নহে। এখানে পিতাপুত্রসম্বন্ধ সগুণ ব্রহ্ম ভিন্ন কখন ঘটিতে পারে না।

আমরা যখন ব্রহ্মে মগ্ন হইয়া তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করি, তখন এ বিশেষ সম্বন্ধ কেবল আপনাতে বদ্ধ থাকে না, জগৎ ও জীবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সর্ব্বনিরপেক্ষ আত্মনিরপেক্ষ ভাবে যখন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি তখন অনন্তের নিকটে আমি জগৎ বা জীব কেহই দাঁড়াই নাই; অনন্ত সমুদায়কে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন অনন্ত ব্রহ্মেতে যখন ডুবিলাম, অনন্ত ব্রহ্ম যখন আমায় আলিঙ্গন দান করিলেন, অনন্তের সংস্পর্শে যখন আমার চেতনা উপস্থিত, দেখিলাম আমি অনন্ত আনন্দসাগরে ডুবিয়া রহিয়াছি, এই সাগরের ভিতরে জগৎ ও জীব বিচরণ করিতেছে, তাই তাহাদের সৌন্দর্য্য, তাই তাহাদের আনন্দপ্রকাশ, এখন কি আর আমি একা থাকিতে পারি? এখন দেখিতেছি, অনন্ত আনন্দঘন ব্রহ্ম আমার মাতা হইয়া পিতা হইয়া সখা হইয়া আমায় এবং কোটি কোটি জীব ও জগৎকে আপনার অনন্ত প্রশস্ত ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আমার প্রতি যেমন তাঁহার আদর, তেমনি সকলের প্রতি সমান আদর। আমরা একের আদর পাইয়া একের স্নেহমমতা ভাজন হইয়া এক হইয়া গিয়াছি, আর ভেদ নাই, স্বতন্ত্র বুদ্ধি নাই। সাধনের আরম্ভে ব্রহ্ম সাধককে বলিতেছিলেন, 'আমি আছি, আর কিছু নাই,' একটু সাধন ঘনতর হইয়া আসিলে সাধককে বলিলেন 'সেই আমি তোমাতে বিরাজ করিতেছি,' যখন সাধন ঘনতম হইল, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, 'জগৎ ও জীবে বিরাজমান আমি সকলকে লইয়া তোমার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া রহিয়াছি।' এ তিনই বেদান্ত সিদ্ধ যোগ। সাধক যখন ব্রহ্মমুখের বাণী শ্রবণ করিয়া চেতনা লাভ করিলেন, যখন দেখিলেন ব্রহ্ম সকলকে লইয়া তাঁহাকে আপনার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন; তখন তিনি জানিলেন, ব্রহ্মই আমার ও সকলের পিতা, ব্রহ্মই আমার ও সকলের মাতা, ব্রহ্মই আমার ও সকলের সখা; আমরা সকলে তাঁহার সন্তান ও ভৃত্য।

একত্বের অন্তরায় পাপ, একত্বসাধন পুণ্য। পুণ্য ব্রহ্মের সহিত একত্বসাধন করিল, প্রেম রসাস্বাদগ্রহণে সামর্থ্য দিল। ব্রহ্ম যখন রসস্বরূপ তৃপ্তির হেতু হইলেন তখন ব্রহ্মেতে যাঁহারা আছেন, যাহা কিছু আছে, সকলই সেই রসের পরিপুষ্টি সাধন করিল। সকল শোভা সৌন্দর্য্যবিবর্জ্জিত ব্রহ্ম কি কখন রসস্বরূপ হইতে পারেন? শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য তাঁহাকে অতি সুন্দর করিয়া সাধকের নিকটে উপস্থিত করিল, তাঁহার বিচিত্র ঐশ্বর্য্য বিচিত্র বিভূতি চারিদিকে প্রকাশ পাইয়া সেই স্বরূপ সৌন্দর্য্যের শোভা আরও বাড়াইল। এক এক স্বরূপের ভিতরে কোটি কোটি সন্তান এবং সেই সন্তানগণের জন্য ব্রহ্মের অনন্ত বিভূতি, ইহা দেখিয়া কি আর সাধক ব্রহ্ম ও তাঁহার সন্তানগণের সঙ্গে পৃথক্ থাকিতে পারেন? ব্রহ্ম তাঁহাকে যে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই আলিঙ্গনপাশেই সকলের সহিত বদ্ধ হইলেন। যত দিন এই সর্ব্বান্তর্ভাবক আলি[illegible] সাধক অনুভব করেন নাই, তত দিন স্বতঃসিদ্ধ একত্বসত্ত্বেও তিনি পৃথক্ ছিলেন, এখন সেরূপ থাকা অসম্ভব হইল। যে আনন্দে তিনি ডুবিয়াছেন, সেই আনন্দেই তিনি সকলের সঙ্গে এক হইয়া গেলেন। ব্রহ্মানন্দ একত্বের ভূমি, সে একত্বের ভূমি যাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি আর সকলের সঙ্গে না মিলিয়া থাকিবেন কি প্রকারে?

আনন্দ মিলনের ভূমি কেন? এ প্রশ্ন কখন শোভা পায় না। যাহার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সে আপনাকে লইয়া ব্যস্ত পরের বিষয় সে ভাবিবে কিরূপে? ঘর জ্বলিতেছে, তাহার মধ্যে জননী পড়িয়াছেন, তাঁহার সমুদায় শরীর পুড়িয়া ছাই হইতেছে, তখন কি আর পুত্রের দিকে দৃক্‌পাত থাকে? যে সন্তানের প্রতি মমতাবন্ধন জীবমাত্রে বিদ্যমান, সে মমতা সে সময় হৃদয় হইতে অন্তর্হিত। বানরী মৃতসন্তানকে ক্রোড় হইতে ছাড়িতে চায় না, সেই বানরী প্রজ্বলিত গৃহের মধ্যে পড়িয়া এমন বিহ্বল হইয়াছে যে, ক্রোড়স্থ শিশুকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর উপবেশন করিয়াছে। তখন কি আর মাতাবানরীর প্রতি আমরা কটূক্তি বর্ষণ করিতে পারি। সে যে চারিদিকের অসহ্য উত্তাপে, দগ্ধ মৃত্তিকার উত্তাপে জ্ঞানহারা হইয়া গিয়াছে। তাহার কাজ আর উন্মাদের কাজ যে সে সময়ে একই। পাপতাপে অভিভূত ব্যক্তি আপনার পাপের জ্বালায় অস্থির, সে তখন পরের বিষয় ভাবিবে, ইহা কি কখন সম্ভব? পাপী ততক্ষণ আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবেই যতক্ষণ তাহায় পাপ যায় নাই। যত তাহার পাপ গিয়া পুণ্য বৃদ্ধি পায়, তত তাহার ঈশ্বরের সহিত যোগ হইতে থাকে, যত যোগ হয় তত তৎপ্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, যত অনুরাগ বৃদ্ধি পায় তত তাঁহাতে আনন্দ প্রকাশ পাইতে থাকে, যত হৃদয়ে আনন্দ ও শান্তির মিলন হয়, তত অপরকে সেই আনন্দও শান্তির সমভাগী করিবার জন্য ব্যস্ততা জন্মে। উদার ঈশ্বরপ্রেমিকগণ নিরন্তর এই ভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং এসম্বন্ধে আমরা দ্বিরুক্তি করিতে পারি না। ঈশ্বরে আনন্দবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জীবনে যদি পরার্থ আত্মোৎসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মেতে আনন্দই যে সকলের সঙ্গে একত্বের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ কি? পাপপরিহার করিয়া ব্রহ্মযোগে আমরা যোগী হইব, ব্রহ্মানন্দে সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইব, সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

তহফতোল্ মওহদ্দিনের বঙ্গানুবাদ।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কৃত মূল পারস্য পুস্তকের অনুবাদ।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

ধর্ম্মশ্রেণীর পরিধিবৃন্দের মধ্যবিন্দু সকল (ধর্ম্মনেতৃগণ) এক একটি পরিজ্ঞাত অলৌকিক ব্যাপারকে নিজেদের সঙ্গে সেই সেই পরিজ্ঞাত বিষয়ের বিশেষ যোগ প্রদর্শন ও সাধারণের প্রত্যয় বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। কল্পনাভিভূতলোকদিগের এরূপ রীতি যে, যে বিষয়ের সম্ভব সাধারণের সাধ্যাতীত এবং প্রথমেই বুদ্ধিতে অকারণসম্ভূত বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহাকে অলৌকিক ক্রিয়া বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। এ বিষয়ে ইহাই চিন্তনীয় হয় যে, এই কারণাত্মক জগতে প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব স্পষ্ট কারণ, নিয়ম ও বিভিন্ন ব্যবস্থার উপর এত দূর নির্ভর করে যে, যদি প্রত্যেক পদার্থের দূরবর্ত্তী ও অদূরবর্ত্তী কারণসমূহ এবং বিরোধী ও অবিরোধী ভাব সকলের বিষয় অবধারণ করা যায়, তবে সেই বস্তুর সত্তাতে এক কারণগত জগতের সম্বন্ধ উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন অভিজ্ঞতার অল্পতা ও কল্পনার প্রবলতা হেতু কাহারও নিকটে কোন অসাধারণ বিষয়ের অস্তিত্বের কারণ অব্যক্ত থাকে, তখন অনেক সময় অপর ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থসাধনের সুযোগ পাইয়া নিজের সঙ্গে সেই বিষয়টির সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক আপনাকে অলৌকিক ক্রিয়ার সম্পাদক ও বহুমানাস্পদ বলিয়া নির্দ্ধারণ করে। বরং বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে অলৌকিকতার ব্যাপারে প্রত্যয় এত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, সমুদায় সাধারণ লোক ও বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের বহুলোক যে স্থলে পূর্ব্বতন ধর্ম্মনেতৃগণের বা বর্ত্তমান কালের সাধুদিগের সম্বন্ধে আশ্চর্য্যব্যাপারের সঙ্ঘটন হইতে পারে, সেই ব্যাপারের কারণ প্রকাশসত্ত্বেও স্পষ্ট কারণের প্রভাবকে অস্বীকার করিবে। কিন্তু প্রজ্ঞাবান্ ও বিচারপ্রিয় লোকদিগের নিকটে অপ্রকাশিত নহে যে, অধিকাংশ ব্যাপারে উহাদের গূঢ়তত্ত্ব অবগত না থাকা হেতু এরূপ ভ্রান্তি হইয়া থাকে। যথা ইংরাজদিগের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া ও ঐন্দ্রজালিকদিগের কৌশল প্রথমতঃ অকারণসম্ভূত ও মানবীয় শক্তির অতীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু গূঢ় দৃষ্টি ও অন্যের নিকটে শিক্ষা করিলে পর সে সকলের প্রত্যেকের কারণ ব্যক্ত হয় এবং তাহাতে দর্শকদিগের মনের তৃপ্তি হইয়া থাকে। অলৌকিক ক্রিয়ার প্রবক্তাদিগের প্রভাব হইতে সুবুদ্ধিমান্ লোকদিগের রক্ষার জন্য এই পরিমাণ অনুসন্ধানই যথেষ্ট হইতে পারে। এত দূর বুঝা যায় যে, কোন কোন স্থলে উপযুক্ত অনুসন্ধান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিসত্ত্বেও কোন কোন আশ্চর্য্য বিষয়ের কারণ সকলের নিকটে ব্যক্ত হয় না। তখন হৃদয়ঙ্গম করা ও নিজের প্রতি প্রশ্ন করা সমুচিত যে, কোন এক বস্তুর কারণ নির্ণয় ও উপলব্ধি করিতে নিজের অক্ষমতা বোধ করা, কিংবা সৃষ্টির প্রকৃতির বিপরীত কোন অসম্ভব বিষয়ের বাস্তবিকতা বিশ্বাস করা এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি বুদ্ধির গ্রাহ্য ও কল্যাণযুক্ত হয়। প্রধানতঃ প্রথমোক্তটির শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন হইবে। তাহা হইলে অননুভূত ও ধারণার অতীত বিষয় সকলকে অর্থাৎ মৃতকে জীবন দান ও গগনমার্গে সমুত্থান ইত্যাদি যাহা তাহাদের (অলৌকিক ক্রিয়ার বক্তাদের) মতে বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করার কি প্রয়োজন ?

যদিচ সামান্য ও অসামান্য শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়ে কার্য্য ও কারণের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ জ্ঞান ব্যতীত একের কার্য্যত্ব ও অপরের কারণত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু যে বিষয়ের মধ্যে ধর্ম্মের যোগ ও ধার্ম্মিকদিগের নাম আছে, যথা আশীর্ব্বাদের ফলে আপচ্ছান্তি এবং প্রার্থনার বলে আরোগ্যলাভ ইত্যাদি উভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধের অভাবসত্ত্বেও যত্ন অনুধাবন ব্যতীত একটিকে কার্য্য ও অপরটিকে তাহার কারণ বলিয়া জানে। বুদ্ধি যাহা গ্রহণে নিবৃত্ত হয়,ঈদৃশ ব্যাপারের তত্ত্বানুসন্ধানের সময় ধর্ম্মের আচ্ছাদকগণ স্বীয় ভক্তদিগের প্রবোধ ও সান্ত্বনার জন্য কখন বলেন যে, "ধর্ম্মের-ভূমিতে বুদ্ধি ও বুদ্ধিগত যুক্তির প্রবেশ নাই। বিশ্বাস ও ঈশ্বরানুকূল্যের সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারের সম্বন্ধ। অতএব যে বিষয় বুদ্ধির অতীত ও প্রমাণশূন্য তাহা কি বুদ্ধিমান্ লোকদিগের স্বীকার্য্য ও গ্রাহ্য হইতে পারে ? তজ্জন্য,হে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ,তোমরা বিশ্বাস করিও।" তাঁহারা কখন গর্ব্বের সহিত এরূপ প্রমাণপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হন যে, একান্ত অসৎ আবরণের ভিতর হইতে পদার্থ সকল অস্তিত্বের জগতে যাঁহা কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছে মৃতশরীরকে নবজীবনের পরিচ্ছদ পরিধান ও মৃৎপিণ্ড দেহকে জ্যোতিষ্ক পথে সঞ্চারণ এবং বায়বীয় শক্তিদান সেই স্রষ্টার সাধ্যের অতীত নহে। এস্থলে আপত্তিকারীদিগের এই কথা অর্থাৎ অসৎ আবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সাধ্যের অতীত নহে, উক্তি নিশ্চয়াত্মিকা নহে, প্রচলিত কথামাত্র। তাহাই জ্ঞাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বতন ধর্ম্মনেতা ও বর্ত্তমান সাধুদিগের অলৌকিক ক্রিয়া ও অদ্ভূত কার্য্য প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। অতএব কথার ভাবের স্পষ্টতার অপূর্ণতা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের নিকটে অব্যক্ত থাকিবে না।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

বাধ্যতা।

বাধ্যতা মানবচরিত্রের একটি স্বর্গীয় গুণ। যে বালক স্বভাবতঃ পিতা মাতা গুরু জনের বাধ্য তাহার জীবন কেমন নিরাপদ। সে সংসারের অনেক পাপ মলিনতা হইতে দূরে বাস করিতে পারে, শারীরিক মানসিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ,তাহার পক্ষে সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে। বাধ্যতার মূল্য ধর্ম্মজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যে সকল ধর্ম্মবিধানে মহাজনগণ মধ্যবর্ত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছেন তাহাতে মহাজনের প্রতি অনুবর্ত্তী সাধকদিগের বাধ্যতা ও অন্যান্য ভক্ত সাধকদিগের প্রতি তাঁহাদের নিজ নিজ অনুবর্ত্তি-

দিগের বাধ্যতা, বাধ্যতাবিষয়ে চরম দৃষ্টান্ত। বর্ত্তমান যুগে সেরূপ বাধ্যতা সর্ব্বতোভাবে যদিও অনুসরণের বিষয় নহে, কিন্তু সেরূপ বাধ্যতার মধ্যেও যে গভীর আধ্যাত্মিক ভাব রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সে সময়ে মহাজনকে মধ্যবর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া বাধ্য শিষ্যরূপে তাঁহার শিক্ষার অনুবর্ত্তন করাই একমাত্র ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার উপায় ছিল। এ বাধ্যতার আরম্ভে সত্যদৃষ্টিসম্ভূত গভীর আধ্যাত্মিকতা আছে। মহাজন-জীবনে ঈশ্বরের অবতীর্ণ শক্তির প্রকাশ দর্শন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ভিন্ন কখনই সম্ভবে না। যাঁহারা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহারাই কেবল সহজে আত্মপ্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া মহাজনদিগকে চিনিয়া তাঁহাদের বাধ্যতা ও শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গূঢ়রূপে দেখিতে গেলে এরূপ বাধ্যতা মানবে নহে, কিন্তু মানবস্থ দেবাবির্ভাবে। কিন্তু এরূপ অনুবর্ত্তিগণের জীবনে প্রথমে আত্মপ্রেরণা হইতে বাধ্যতার আরম্ভ হইলেও তাঁহারা একবার যাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেন পরে আত্মপ্রেরণানিরপেক্ষ হইয়া জীবনের সকল বিষয়ে তাঁহার আদেশ উপদেশকে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিয়া তাহা প্রতিপালনকরা জীবনের কার্য্য মনে করিতেন। বর্ত্তমান বিধানের ভাবের সঙ্গে এখানেই তাঁহাদের ভিন্নতা। আত্মপ্রেরণার স্বাধীনতা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে বর্ত্তমান বিধানের ইহাই শিক্ষা। এই জন্যই পরম ভক্তিভাজন শ্রীমদাচার্য্য দেবের উপদেশ এই,—তাঁহার কথা বলিয়া যেন তাঁহার কোন উপদেশবাক্য কেহ জীবনে প্রতিপালন না করেন, কিন্তু নিজের অন্তরে পবিত্রাত্মার আলোকে যখন সে তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে সত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে তখনই তাহা জীবনে প্রতিপাল্য হইবে।

মনুষ্যজীবনে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকারের বাধ্যতা দৃষ্ট হয়। যে জীবনে রাজসিক ও তামসিক বাধ্যতা আছে সেখানে সাত্ত্বিক বাধ্যতা অসম্ভব। তাই যাহারা কোন না কোন প্রকারে প্রবৃত্তিবাসনার বিশেষ ভাবে অধীন, অথবা কোন প্রকার কুসংস্কার, অলসতা ও জড়তার বশীভূত তাহাদের জীবনে সাত্ত্বিক দৃষ্টি ও সাত্ত্বিক বাধ্যতা দেখা যায় না। এইজন্যই যুগে যুগে যখন ভক্ত মহাজনদিগের জীবনে ঈশ্বরশক্তির স্বর্গীয় অবতরণে জীব উদ্ধারের অপূর্ব্ব লীলা হইতে থাকে, তখন রাজস ও তামস দৃষ্টিসম্পন্ন অধিকাংশ লোক যথাযথ ভাবে মহাজনদিগের জীবনের কার্য্য বুঝিতে না পারিয়া ও স্বীকার না করিয়া সেই স্বর্গীয় জীবনের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আনয়ন করিতেও ত্রুটী করে নাই।

যাঁহারা বর্ত্তমান বিধানাশ্রিত তাঁহাদের জীবনে আত্মপ্রেরণার স্বাধীনতা চিরকাল আছে। এখানে আত্মপ্রেরণানিরপেক্ষ হইয়া অন্ধভাবে পরিচালিত হওয়া ধর্ম্ম নহে। এই আত্মপ্রেরণা মূলক স্বাধীনতাই সাত্ত্বিক বাধ্যতার প্রসূতি। আত্মপ্রেরণা উন্নতিশীল ও চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকাতেই নববিধানে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহাজনদিগের প্রতিও মণ্ডলীস্থ সহসাধকদিগের মধ্যে একের অন্যের প্রতি বাধ্যতা গাঢ় হইতে গাঢ়তর মিষ্ট হইতে মিষ্টতর মিলনে পরিণত হইয়া থাকে। এ যুগে অনেকেই সত্যকে সমাদর করিতে ও গ্রহণ করিতে যাইয়া নববিধান আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু সে সত্যের স্থিতি কোথায়? গ্রন্থে বা উপদেশে সে সত্যের স্থিতি নহে। সত্যের স্থিতি জীবনে। সাধক সত্যকে সমাদর ও গ্রহণ ক'রতে যাইয়া ক্রমে উপাসনা ও প্রার্থনাযোগে আত্মজীবনে সেই সত্যে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর স্ফুরণ দেখিতে পান, এবং সেই স্ফুরণের আলোকে দলস্থ সহসাধক জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দিগের জীবনে সেই সত্যের উচ্চতর স্ফুরণ দেখিতে সক্ষম হন এবং স্বভাবের নিয়মে এরূপ জীবনের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ও বাধ্যতা উপস্থিত হয়। এরূপ বাধ্যতা জীবনে বদ্ধভাব না আনিয়া সে জীবনকে অতি প্রশস্ত ভূমিতে লইয়া যায়। ক্ষুদ্রের সহিত মহতের সুমিষ্ট সম্মিলনে এ বাধ্যতার আরম্ভ ক্ষুদ্রের সহিত মহতের অনন্তকালের যোগে ইহার পরিণতি। এরূপ বাধ্যতা প্রাণে আশা, বিশ্বাস ও বল যুগপৎ উপস্থিত করিয়া জীবনে অপূর্ব্ব সুস্থতা আনয়ন করে। যে সকল সাধু মহাজন ভক্ত বিশ্বাসীদিগের সহিত আপনাকে এক শ্রেণীতে গণ্য করা দূরে থাকুক তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্ব গৌরবের কিঞ্চিদংশও ধারণ করিবার অধিকারী আপনাকে মনে করিতে পারা যায় না, এই সাত্ত্বিক সুমিষ্ট বাধ্যতা তাঁহাদের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সংস্থাপন করিয়া তাঁহা-দিগকে আপনার জন করিয়া দেয়। সাত্ত্বিক বাধ্যতা সহস্র স্বর্গীয় জীবনের সহিত যুগপৎ মিলন উপস্থিত করে। উহা বিন্দুকে সিন্ধুতে মিশাইয়া দেয়। যদি নববিধানে পবিত্রাত্মার কৃপায় উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রেরণা আমাদের নিয়ত হয়, তাহা হইলে আমাদের জীবনে কেবল দুই একটি সাধু মহাজনের প্রতি নয় কিন্তু ক্রমে ইহকাল পরকালস্থ সমস্ত সাধু ভক্ত মহাজনদিগের প্রতি গাঢ় হইতে গাঢ়তর বাধ্যতার স্ফুরণ হইবে এবং তাঁহাদের সহিত তজ্জনিত যোগ ও সম্মিলন স্বাভাবিক ও নিশ্চয়ই সংসিদ্ধির বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

টাঙ্গাইল শ্রীগ—
২৪ মে,

আকাশেশ্বর। *

(১৮১১ শকের ১১ মাঘ হইতে ১৮১১ শকের ১লা চৈত্রের পর।)

'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ
আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়তি। ৬॥

'কঃ হি এব' লোকে 'অন্যাৎ' চেষ্টাং কুর্য্যাৎ 'কঃ' বা 'প্রাণ্যাৎ' প্রাণনং কুর্য্যাৎ 'যৎ' যদি 'এষঃ' 'আকাশে' 'আনন্দঃ' অসঙ্গরূপঃ পরঃ আত্মা ন স্যাৎ'। ইত্যাদি।

* পাপের কর্ত্তা কে? নাস্তিকতা, আকাশেশ্বর, সৎপ্রসঙ্গ, এই তিনটি প্রস্তাব ধর্ম্মতত্ত্বে প্রচারিত হইয়াছে। আকাশেশ্বর প্রবন্ধ আরও বিস্তৃত হওয়া আবশ্যকবোধে, সম্প্রতি যথাসাধ্য তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া গেল।

কে বা শরীর ধারণ করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশ এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন। ইত্যাদি।'

১অঃ, ৬পৃষ্ঠা ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক।

উপনিষদের এই শ্লোকে আকাশে পরমাত্মার অবস্থিতি স্বীকার করা হইয়াছে। অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের অবস্থিতি যে আকাশে সে আকাশও নিশ্চয়ই অনাদি অনন্ত। অনাদি অনন্ত আকাশে অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের অবস্থিতি স্বীকার করা যাইত যদি ঈশ্বর ব্যতীত আর একটি পদার্থের অনাদি অনন্তত্ব স্বীকার করা যায়। অতএব বুঝিতে হইবে, উপনিষদের এখানে আকাশের অনাদি অনন্তত্ব স্বীকার করিয়াও ভ্রমবশতঃ আকাশের অতিরিক্ত ঈশ্বর কল্পিত হইয়াছে। আকাশে ঈশ্বরের অবস্থিতি এই কথা বলাতেই আকাশের ঈশ্বরত্ব অবিরোধে প্রকাশ পাইতেছে।

তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতরি তস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশওতশ্চ প্রোতশ্চ। ১॥

এতস্মিন্ উ খলু অক্ষরে হে গার্গি আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ সর্ব্বতোব্যাপ্তইত্যর্থঃ। ১১।

হে গার্গি! আকাশ এই অবিনাশী পরমেশ্বরেতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ১১।

২৩ পৃঃ, ৩অ, ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক।

পরমেশ্বরেতে আকাশ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এই কথা বলাতে আকাশের অনাদি অনন্তত্ব ও পরম সূক্ষ্মত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এবং আকাশ ব্যতীত ঈশ্বরে আর কিছুই নাই অর্থাৎ আকাশের সহিত ঈশ্বরের অভিন্নতা সিদ্ধ হইতেছে। আকাশ ঈশ্বরের সর্ব্বত্র ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত, এই কথা বলায় আকাশের ঈশ্বরত্বও নির্ব্বিবাদে প্রকাশ পায়, কারণ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত নাই। আকাশ যদি সেইরূপে সর্ব্বত্র থাকে, তাহা হইলে আকাশই ঈশ্বর।

'স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। ইত্যাদি'॥৪॥ সঃ' পরমাত্মা 'পর্য্যগাৎ' পরিসমন্তাৎ অগাৎ গতবান্ আকাশবৎ ব্যাপী অর্থঃ ইত্যাদি।'

৪০ পৃঃ, ৫ অঃ, ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক।

সেই পরমাত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, এই কথা বলাতে দুই পদার্থকে সর্ব্বব্যাপী বলা হইতেছে, তাহা হইতে পারে না। কারণ ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন পদার্থই সর্ব্বব্যাপী নহে। আকাশের যখন সর্ব্বব্যাপকতা স্বীকৃত হইয়াছে তখন আকাশকেই ঈশ্বর বলা উচিত ছিল। একমাত্র আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব এই লক্ষণ দ্বারাই আকাশকে ঈশ্বর বলিতে হইবে। ঈশ্বরের যে সকল লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তাহার একটি মাত্র চিহ্ন তুমি যাহাতে দেখিবে তাহাকে কি তুমি ঈশ্বর না বলিয়া থাকিতে পার? তুমি কি জান না যে ঈশ্বর ভিন্ন তাঁর কোন একটি লক্ষণও সম্পূর্ণ রূপে আর কিছুতেই থাকিতে পারে না?

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥ ২ ॥
—পরমে ব্যোমন্ ব্যোম্নি দেহাকাশে গুহায়াং আত্মনি।

ইত্যাদি। ২।

যিনি সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ বলিয়া জানেন; ইত্যাদি। ২।'

৪২। ৪৩ পৃ, ৬ অধ্যায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক।

এখানে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে ব্রহ্মের অবস্থিতি বলাতে ব্রহ্মের অবস্থিতি আকাশে এই কথাটী প্রকাশ পাইতেছে। ইহা আকাশের সামান্য মহত্বের বিষয় নহে, যেহেতু আকাশ ঈশ্বরের আশ্রয়। আকাশে ব্রহ্মের অবস্থিতি এই কথা ইহার পূর্ব্বেও একটি বচনে আমরা দেখাইয়াছি। এ বিষয়ে উপনিষৎকার মহর্ষিগণ অবশ্যই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কারণ ইহার দ্বারা 'স্বে মহিম্নি' অর্থাৎ ব্রহ্ম আপনাতে আছেন এই গভীর বাক্যের ও মহত্বের খর্ব্বতা সাধন করা হইয়াছে। এখানে আর একটু অগ্রসর হইয়া আকাশকেই তাঁহাদের ব্রহ্ম বলা উচিত ছিল। আকাশকে পরম শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করাতে আকাশের পরম সূক্ষ্মত্ব প্রকাশ পাইতেছে। আকাশ হইতে সূক্ষ্ম আর কোন পদার্থ যে নাই তাহা এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে আকাশই ঈশ্বর প্রকারান্তরে এখানে তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। আর ঈশ্বর এবং আকাশ যদি ভিন্ন পদার্থ হন, তাহা হইলে ঈশ্বরের আশ্রয় আকাশ হইতে ঈশ্বর পলায়ন করেন, তাঁহার কোন আশ্রয় নাই। অতএব যিনি স্বীয় শরীরের পরমাকাশকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন এই কথাটী বলিলেই সকল বিবাদ চলিয়া যাইত।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

ঢাকা হইতে নিম্ন লিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিগত ৩০শে বৈশাখ ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের জন্মভূমি ঢাকা জিলার অন্তর্গত পাঁচদোনা গ্রামে তাঁহার স্বর্গগত মাতৃদেবীর সমাধি তাঁহার বহির্ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে অনেক আত্মীয় বন্ধু ও প্রচারক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে ও সেই সময়ে অন্য কোন স্থানে ব্রহ্মোৎসবে আবদ্ধ হওয়াতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশই পাঁচদোনায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কেবল ঢাকা হইতে ৩।৪ জন আত্মীয় ও আত্মীয়া মহিলা এবং ময়মনসিংহ হইতে প্রিয় ভ্রাতা দীননাথ কর্ম্মকার ও চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার যাইয়া সেই সমাধি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ও ঢাকা হইতে অনেক প্রচারক মহাশয় যাইতে না পারিয়া পত্র লিখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ৩০শে বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ন ৯টার পর প্রথম সমাধি শিলার উপরিস্থিত আবরণ উন্মোচন করিয়া ভাই গিরিশচন্দ্র

সেন উক্ত সমাধিসম্বন্ধীয় লিখিত বিবরণ পাঠ করেন, তাহা গতবারের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে সঙ্গীত ও উপাসনা হয়। উপাসনার প্রথমাঙ্গ ভ্রাতা দীননাথ, স্তোত্র ও শ্লোক পাঠ এবং প্রার্থনা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, শান্তিবাচন শ্রীমান্ চন্দ্রমোহন সম্পাদন করেন। সঙ্গীত সকল সময় ও অবস্থা উপযোগী হইয়াছিল, কার্য্য অতি গম্ভীর ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমাধিপ্রতিষ্ঠাবিষয়ে পূর্ব্বদিন গ্রামে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। যথাসময়ে গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুভ্র সমাধি শিলাটী অতি সুন্দর নয়নরঞ্জন হইয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে স্বর্গগতা দেবীর নাম, বয়ঃক্রম ও স্বর্গারোহণের দিন এবং উপনিষধের স্বর্গলোকসম্বন্ধীয় একটি শ্লোক ও তাহার বাঙ্গলা অর্থ অঙ্কিত আছে। উক্ত সমাধির উপরে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কার্য্য এক্ষণও কিছু অসম্পূর্ণ আছে। সমাধি মন্দির ও তৎপার্শ্বস্থ উপাসনাকুটির লোহিত পতাকা ও চন্দ্রাতপে, মন্দিরের দ্বারদেশ কদলীতরুতে সজ্জিত হইয়াছিল। সমাধির সম্মুখভাগে চন্দ্রাতপের নিম্নে বসিয়া উপাসনাদি হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর ভ্রাতা দীননাথ ও চন্দ্রমোহন সেই স্থানে ব্রহ্মসঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে কতকগুলি কাঙ্গালিকে কিছু দান করা হইয়াছিল।

আমাদিগের সমবিশ্বাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বীয় মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতা মত সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ও ভাই বলদেব নারায়ণ বিশেষ ভাবে এই অনুষ্ঠান করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী এইরূপ লিখিয়াছেন। "গোরক্ষপুরে যোগেন্দ্র বাবুর মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে বলদেব বাবু ও আমি গিয়াছিলাম। একটি ক্ষুদ্র সভা করিয়া বক্তৃতা ভজন ও প্রার্থনা হইয়াছিল। সেখানে ৩।৪ দিন ছিলাম। আসিবার সময়ে ছাপরাতে নামিয়াছিলাম। বলদেব বাবু এখানে বেশ কাজ করিলেন; বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে দুই দিন সঙ্গীত আলোচনা ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমরা আগামী কল্য আরঙ্গাবাদ যাইব, ফিরিয়া আসিতে ৮।১০ দিন লাগিবে। যোগেন্দ্র বাবু মাতৃশ্রাদ্ধে এইরূপ দান করিয়াছেন। কলিকাতা মিশন ৪৲, ঢাকা ৪৲, বাঁকিপুর ৪৲, অনাথাশ্রম ২৲, কুষ্ঠাশ্রম, আতুরাশ্রম ২৲ রেস্‌কুহোম ২৲ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের গরিবগণ ৩৲, অনাথ পরিবার ২৲, দরিদ্রদিগকে চিড়া গুড় ও ১২ খান কাপড় দিয়াছেন।

কুমিল্লার বার লাইব্রেরির শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগের নিকট পত্র লিখিয়াছেন,—"অত্রস্থ মুনসেফ কোর্টের উকীল বাবু দুর্গাচরণ ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে কলিকাতার অনাথাশ্রমে ৫৲ ও বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে ১৫৲ মোট ২০৲ টাকা আপনার নামে বার লাইব্রেরির মেম্বরগণ পাঠাইলেন, উক্ত দান শীঘ্রই যথাস্থানে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।" আমরা কুমিল্লার উকীল দাতাদিগকে সম্মানের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি, তাঁহারা তাঁহাদের মৃত বন্ধুর সম্মানার্থ অতি উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। দুর্গাচরণ বাবুর নাম তাঁহাদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হউক। দয়াময় ঈশ্বর দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমাদিগের ছাত্রাবাস হইতে বর্ত্তমান বৎসরে শ্রীমান্ শরত কুমার দত্ত B. A. এবং শ্রীমান্ কিরণলাল সেন F. A. পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই দুইটি ছাত্রই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীমান্ শরতকুমার বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীর ১ম হইয়াছেন। ছাত্রদের মতিগতি ভগবানের দিকে ফিরুক এই আমাদের প্রার্থনা।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের যুবকবৃন্দ উলুবেড়িয়া যাইয়া বিশেষ ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। বৃষ্টি হওয়ায় সেখানে কোন বিশেষ কার্য্য হইতে পারে নাই। প্রচার আশ্রমের দেবালয়ে ঐ দিনের উপযোগী উপাসনা প্রার্থনা এবং আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করা হইয়াছিল। বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজে ঐ দিন বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছিল। আমরা জানি নববিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ সকলেই মহারাণীর জন্মোৎসব করিয়া থাকেন।

কুচবিহার মহারাজ কুমার শ্রীমান্ রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ ভূপ কুচবিহার ব্রহ্মমন্দিরে প্রকাশ্যরূপে নবসংহিতামতে দীক্ষিত হইয়াছেন। মহারাজ স্বয়ং রাজকুমারের মস্তকে সুগন্ধি তৈল দিয়া যথাবিধি জলাভিষেক করাইয়াছিলেন। কুমারকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া স্বয়ং সঙ্গে করিয়া মন্দিরে লইয়া যান। উপাসনার প্রথম অঙ্গ শেষ হইলে মহারাজ মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্র নারায়ণ ভূপকে আচার্য্য ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের সম্মুখে দীক্ষার্থে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং দীক্ষাকার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত গম্ভীরভাবে বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। এইরূপে কুচবিহারে নববিধানধর্ম্ম জয়যুক্ত হইল। স্বর্গ হইতে আচার্য্যদেব নিশ্চয়ই স্বীয় জননীর প্রসাদ লইয়া আপনার অতি আদরের দৌহিত্রের মস্তকে উহা বর্ষণ করিয়াছেন। কুচবিহারের ভাবী মহারাজ এইরূপে দীক্ষিত হইয়া নববিধানবিশ্বাসিমাত্রেরই শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার চিরসঙ্গী থাকিয়া তাঁহাকে পুণ্যেতে জ্ঞানেতে ও প্রেমেতে উন্নত করুন।

ভাগলপুরের পত্রে ডাক্তার নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কারবঙ্কল হওয়ার সংবাদ পাইয়া আমরা বিশেষ ভাবিত হইয়াছি। সেখানকার ইংরাজ ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছেন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ। ১১ সংখ্যা।	১লা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৮২১ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান পরমেশ্বর, তুমি নিরলস ভাবে আমাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য আমাদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিয়া কতই কি না করিতেছ। কঠিন কঠিন সঙ্কটে আমরা পড়িয়াছি, ধর্ম্মরক্ষা পায় কি না পায় এরূপ সঙ্কীর্ণ পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু জলমগ্নপ্রায় ব্যক্তিকে কেশে ধরিয়া কেহ উত্তোলন করিলে সে যেমন নিরাপদ হয়, বাঁচিয়া যায়, তেমনি তুমি আমাদিগকে কেশে ধরিয়া অধর্ম্ম-কূপ হইতে পুনঃ পুনঃ উত্তোলন করিয়াছ। তোমার এ ব্যবহার কেবল আমাদের সঙ্গে নয়, সকল নরনারীর সঙ্গে প্রতিনিয়ত তোমার এই ব্যবহার চলিতেছে। তবে তাহারা তোমার ব্যবহার বোঝে না, দেখে না, আমরা তোমার কৃপায় তোমার ব্যবহার দেখিতে পাই, ইহাতেই আমরা বলিতে পারি, কখন কোন্ সময়ে কোন্ ধর্ম্মসঙ্কট হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। ঋষিগণ তোমায় ধর্ম্মাবহ পাপাপনুদ বলিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের জীবনে তোমার এই বিচিত্র ব্যবহার দর্শন করিয়াই তোমায় এ নাম তাঁহারা দিয়াছেন। তুমিই স্বয়ং ধর্ম্ম, কেন না তোমার ইচ্ছা ও তুমি স্বতন্ত্র নহ; ধর্ম্ম তোমার ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র নহে। জীব যখন তোমার ইচ্ছার বিরোধে গমন করে, তখন সে অধর্ম্মাচরণ করে, কিন্তু এই বিরোধে অন্তে তোমার জয়, না জীবের জয়? তোমার ইচ্ছার জয় হইবেই হইবে। তোমার ইচ্ছার জয় হইলে ধর্ম্মের জয় হইল। সেই সকল ব্যক্তি ধন্য যাঁহারা তোমার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রলোভনের ভিতরে অকুতোভয়ে বিচরণ করেন। তাঁহারাই কেবল বলিতে পারেন "মৃত্যু-চ্ছায়ার উপত্যকা দিয়াও যদি আমি বিচরণ করি, আমি কোন বিপদ্ আশঙ্কা করি না, কারণ তুমি আমার সঙ্গে আছ; তোমার শাসনদণ্ড এবং তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা দেয়।" তোমার শাসনদণ্ড আমাদিগকে বিপথে যাইতে দেয় না, তোমার যষ্টি আমাদের পদস্খলন নিবারণ করে। যাহারা অধর্ম্মে ডুবিয়াছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া তুমি ধর্ম্মে স্থাপিত কর, যাহারা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে, শত প্রলোভনের মধ্য হইতে তুমি তাহাদিগকে এমন করিয়া রক্ষা কর যে, তাহাদের অধর্ম্মে পতন হয় না। হে দয়াসিন্ধো, তোমার শাসনদণ্ড আমাদিগকে সর্ব্বদা বিপথগমন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করুক, তোমার যষ্টি আমাদের

দুর্ব্বল আত্মার অবলম্বন হউক। আমরা তোমার রক্ষণাধীনে থাকিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে তোমার ইচ্ছানুসরণ করিব এই আশা করিয়া আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমরা যেন কখন দুর্ম্মতিবশতঃ তোমার শাসনদণ্ড ও তোমার যষ্টি অতিক্রম করিতে অভিলাষ না করি, সর্ব্বদা তদধীনে থাকিয়া দিন দিন ধর্ম্মেতে, শক্তিতে, জ্ঞানেতে ও সুখেতে উন্নত হইয়া তোমার প্রণত দাস ও বাধ্য সন্তান হইতে পারি। তোমার যখন এইরূপই অভিপ্রায়, তখন তোমার কৃপায় আমাদের এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

সারেতে দৃষ্টি।

এ সংসারে নিত্য ও অনিত্য, সার ও অসার উভয়ই আছে। অধিকাংশ লোকের দৃষ্টি অসার ও অনিত্যের প্রতি নিবদ্ধ, সার ও নিত্যের প্রতি কখনও তাহাদিগের দৃষ্টি পড়ে না। যাহারা শরীরকেই সর্ব্বস্ব জানে, শরীরের সেবাই যাহাদিগের মুখ্য কার্য্য, শারীরিকসুখসম্পাদক বিষয় সকল যাহাদিগের অন্বেষণের বিষয়, তাহারা সার ও নিত্যের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সংসারে বিচরণ করিবে, ইহা কি কখন সম্ভব? অশন বসন, আমোদ প্রমোদ, পৃথিবীর অপরা বিদ্যা, এই সকল তাহাদিগের নিকটে সার, এতদ্ব্যতীত আর যে কিছু সার আছে, ইহা তাহারা মনে করিতে পারে না। পরম্পরাক্রমে 'আত্মা' এই কথাটী তাহারা শুনিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের নিকটে উহা কথামাত্র, দেহ হইতে স্বতন্ত্র আত্মা বলিয়া কিছু তাহারা বোঝে না। আমি, তুমি, তিনি, এ সকল শব্দ তাহারা শরীরকে লক্ষ্য করিয়াই প্রয়োগ করিয়া থাকে। আমি, তুমি, তিনি বলিতে শরীরের অতিরিক্ত আত্মা বুঝায়, ইহা তাহাদের অনেকে মুখে বলিতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক শরীরের অতিরিক্ত আমি, তুমি ও তিনির পরিচয় তাহারা পায় নাই।

আত্মার সম্বন্ধে যেমন ঈশ্বরের সম্বন্ধেও তেমনই। যাহারা আপনার সংবাদ রাখে না তাহারা ঈশ্বরের সংবাদ রাখিবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? দেহকে অন্তশ্চক্ষুর সন্নিধান হইতে উড়াইয়া দিয়া যাহারা আত্মাকে বস্তু বলিয়া ধরিল না, এবং এই বস্তুর সন্নিধানে আর যাহা কিছু ধোঁয়ার মত অপদার্থ হইয়া গেল না, তাহারা দেহমনের অতীত পরব্রহ্মকে কি প্রকারে জানিবে? সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য দ্বারা বস্তুর পরিচয় হয়। যেখানে সাদৃশ্যও নাই বৈসাদৃশ্যও নাই, সেখানে বস্তুনির্ণয় হইতে পারে না। যাহা কাল ও দেশে আছে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর, তাহার সঙ্গে কালদেশের অতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর কোন সাদৃশ্য নাই। কেবল সাদৃশ্য নাই বলিয়া কালদেশাতীত ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, যদি সে বস্তুসম্বন্ধে কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকে। দুইটি অনুভূয়মান বস্তুর তুলনা করিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। এখানে কালদেশে বদ্ধ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু কেবল জ্ঞানের বিষয়, কালদেশাতীত ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু জ্ঞানের বিষয় নহে, সুতরাং অবস্তু, শশশৃঙ্গবৎ মিথ্যা। এখানে দেখিতেছি, একটি অনুভূয়মান পদার্থ, আর একটি একেবারে অনুভূতির বিষয় নহে এরূপ পদার্থ, সুতরাং যেটি অনুভূতির বিষয় নহে, সেটি কিছুই নয় অপদার্থ, ইহা ভিন্ন আর কি বলিব?

সাধারণ লোকে যে কেবল ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে নিয়ত আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখে, তাহার কারণ এই। যে বস্তুসম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহা তাহারা গ্রহণ করিতেও পারে না, পরের মুখে শুনিয়া কিছু বুঝিতেও পারে না, সুতরাং আত্মা ঈশ্বর প্রভৃতি কতকগুলি কথামাত্র তাহারা উচ্চারণ করে, বাস্তবিক মনের টান তাহাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের প্রতি। তুমি বলিবে, এমন কোন মানুষ কি আছে, যে আমি ও আমার অতিরিক্ত বস্তু, এ দুটীকে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করে না? আমি এই কাগজ, কলম ও দোওয়াত লইয়া লিখিতেছি, এই কাগজ কলম ও

দোওয়াত যে আমি নই, ইহা কি আর আমি জানি না ? হাঁ, এরূপ ভিন্নতাবোধ আছে, এবং মানুষের মমতার সামগ্রীও আছে, কিন্তু তুমি কি ঠিক বলিতে পার, যেমন এই মমতার সামগ্রীগুলিকে আমি বিশেষ করিয়া চিনি, তেমন কি আমি আমাকে চিনি। রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি যেমন আমার মনকে নিয়ত আকর্ষণ করে, এবং সেই সেই বস্তু আমার নিয়ত চিন্তার বিষয়, তেমন আমি কি আমার নিয়ত চিন্তার বিষয় ? বরং বলিতে হইবে, আমার সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তাই নাই, অমি কেবল একটি অলক্ষিত সূত্রের মত আমার মমতার সামগ্রী গুলি একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছি, আমি নিয়ত সেই গুলিকে দেখিতেছি, আমি আমার নিকটে যে অপরিচিত সেই অপরিচিতই রহিয়াছি। 'আমি' 'আমি' সর্ব্বদা করি বটে, কিন্তু সে আমি আর কেহ নহে, এই চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি। শুনিতে ইহা অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়,কিন্তু বাস্তবিক কথা এই। তুমি কিমনে কর, লোকে সাধে শরীরসর্ব্বস্ব হইয়াছে ? দেহাতিরিক্ত আত্মা যখন তাহাদের কাছে নাই, তখন তাহারা শরীরের সমাদর করিবে না তো আর কাহার আদর করিবে ?

লোকের বিলাসবাসনা দেখিয়া তুমি দুঃখিত হইতে পার, কিন্তু যখন আত্মা তাহাদের নিকটে দেহের মত ধরিবার ছুঁইবার বস্তু নহে, তখন তুমি তাহাদিগকে দোষ দিয়া কি করিবে ? শরীর ছাড়া আত্মা, শরীরাপেক্ষা আত্মা ধরিবার ছুঁইবার বস্তু যে দিন তাহারা জানিবে, এবং আত্মার স্বরূপে চমৎকৃত হইয়া তাহারই জন্য ব্যস্ত হইবে, সে দিন আর তোমায় বলিতে হইবে না, উপদেশ দিতে হইবে না, আপনা হইতে বিলাসবাসনা খসিয়া পড়িবে। আপনার স্বরূপে চমৎকৃত হইয়া তুমি সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না, তোমার স্বরূপের কূল কিনারা যখন তুমি দেখিতে পাইবে না, তখন তুমি আপনাকে অনন্তে পরিবেষ্টিত দেখিতে পাইবে, এবং সেই অনন্ত হইতে তোমার স্বরূপ সকল ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে তুমি জননী জানিয়া তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইবে। এখন তোমার অসার হইতে সারেতে দৃষ্টি পড়িয়াছে,তোমার জীবন অনন্ত আশা ভরসার পূর্ণ হইয়াছে, আর তুমি সংসারের মানুষ নাই, তুমি স্বর্গের নূতন মানুষ হইয়াছ।

নরনারীর ভিতরে সার ও অসার উভয়ই আছে। শরীর ও শরীরঘটিত বিষয় অসার, আত্মা ও আত্মঘটিত বিষয় সার, জ্ঞান-প্রেম-পুণ্য-স্বরূপে আত্মা সার,সেই সমুদায় উপার্জ্জনের জন্য যে সাধন ভজনাদি তাহাও সার। নরনারীতে যতটুকু জ্ঞান প্রেম পুণ্য আছে, যতটুকু তদুপার্জ্জনে যত্ন আছে, তৎপ্রতি সমাদর ও সেই ভূমিতে তাঁহাদিগের সহিত চিরবন্ধুতাস্থাপন সারেতে দৃষ্টি বিনা কোন দিন হইতে পারে না। নরনারীর অসারাংশ লইয়া দ্বেষ হিংসা বিরোধ নিয়ত ঘটে। এই অংশ অসারের অসার জানিয়া তৎপ্রতি ক্ষমা ও সারাংশে নিত্য কালের সম্বন্ধ স্থাপন করা সাধক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। অসারাংশ অসৎ, কেন না চির দিন থাকিবে না, সারাংশ নিত্যকালের সহিত সংযুক্ত; নিত্যকালের সহিত সংযুক্ত কেনা বলিতেছি, অনন্তের সহিত সংযুক্ত। সুতরাং এখানে পরস্পর যে গ্রন্থি বন্ধন হয় তাহা অচ্ছেদ্য অভেদ্য, ইহকাল-পরকালব্যাপী। সারেতে যাঁহাদিগের দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাঁহারা এই জন্য বিচ্ছেদ ও বিনাশ কাহাকে বলে তাহা জানেন না। তাঁহারা নিত্যযোগে সুখী। আমাদের প্রতিজনের তাঁহাদের মত হওয়া সমুচিত, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অসার হইতে দৃষ্টি অবতারণপূর্ব্বক সারেতে দৃষ্টি স্থাপন করা অতীব প্রয়োজন।

অভয়।

যোগাচার্য্য দেবগুণমধ্যে অভয় এই গুণটির সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছেন। অভয় এই গুণের পর সত্ত্বসংশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের নির্ম্মলতা উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি দেবগুণগুলির এই প্রকারে সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, পর পর যে গুণের অভ্যু-

দয় হয়, তদনুসারে শ্রেষ্ঠতানির্দ্ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বশ্রেষ্ঠটিকে সর্ব্বপ্রথমে স্থাপন করিয়াছেন *। আপনাকে বড় বলিয়া মনে না করা এইটিকে তিনি সর্ব্বশেষে উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে,যে ব্যক্তি আপনাকে বড় বলিয়া মনে করে সে কখন দেবগুণ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় না। যে আপনাকে বড় বলিয়া মনে করে না,সে কখন পরদ্রোহে প্রবৃত্ত হয় না। যে ব্যক্তি বাস্তবিকই আপনাকে বড় বলিয়া মনে করে না, মিথ্যা বিনয়প্রদর্শন যাহার উদ্দেশ্য নহে, সে কখন তেজোবিহীন হয় না। যদি সে তেজোবিহীন হয়, তাহা হইলে সে প্রবৃত্তিবাসনার অধীন না হইয়া কখনই থাকিতে পারিবে না। যাহা হউক, আমরা অদ্য যে দেবগুণের উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারই বিষয় কিছু বলি।

অভয়—ভয়ের অভাব। এ সংসারে ভয়শূন্য কে? যাহাদের কোন জ্ঞান নাই, অবোধ, কাণ্ডাকাণ্ডবিবেকশূন্য, তাহাদের কোন ভয় নাই, কেন না বর্ত্তমান ছাড়িয়া আর কোন দিকে তাহাদের চিন্তা ধাবিত হয় না। বর্ত্তমানে যদি কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়, তখন ভীত হয়, তাহার পর আর সে ভয় থাকে না। আহার বিহারে, ভোগ বিলাসে সকলই ভুলিয়া যায়, আর যে কখন তাহাদের তাদৃশ ভয় উপস্থিত হইতে পারে, ইহা মনেও আইসে না। যাহাদের শারীরিক বল প্রচুর আছে, অথচ কাণ্ডাকাণ্ডবিচারশূন্য তাহারাই প্রায় এই শ্রেণীর লোক হইয়া থাকে। ক্রোধী, অবিবেকী, গর্ব্বিত, প্রমত্ত লোক সকল ক্রোধের অবস্থায়, অবিবেকের অবস্থায়, গর্ব্বকালে ভয়শূন্য হয়, কিন্তু যখন ক্রোধাদির আবেগ চলিয়া যায়, তখন তাহাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হইয়া থাকে। কোন প্রকার প্রবৃত্তিবাসনার অধীন লোক তত্তৎপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় এমনই প্রমত্ত হইয়া পড়ে যে, তাহারা তৎকালে জ্ঞানশূন্য হয়, সুতরাং তাহাদের মনে ভয়ের অবকাশ থাকে না। এই রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, অজ্ঞানতায় আচ্ছন্নচিত্ত না হইলে ভয়শূন্যতা কখন সম্ভপর নহে।

অজ্ঞানতা ও মোহ হইতে যে নির্ভীকত্ব উপস্থিত হয় তাহা দেবগুণ নহে, তাহা পশুস্বভাব-জড়স্বভাবসমুচিত। ভয়ের বিষয়সমূহের পূর্ণজ্ঞান থাকিবে অথচ মন ভয়শূন্য, ইহাকেই দেবগুণ বলা যায়। যাহার বিপৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, সে যে নির্ভয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু যে ব্যক্তি সম্মুখে বিপদ্বিঘ্ন দেখিতেছে, অথবা বিপদে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে, সে যদি তন্মধ্যে নির্ভয় থাকে, তখন জানিব, তাহার অভয়প্রাপ্তি হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের যত জ্ঞান বৃদ্ধি পায় তত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভয় বাড়িতে থাকে, কেন না অপরে যেখানে কোন ভয়ের কারণ দেখিতে পায় না, আমরা সেখানে ভয়ের কারণ দেখিতে পাই। এক জন কবি যে বলিয়াছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেখানে ভয়ে কম্পিত, মূর্খেরা সেখানে মূঢ়তাবশতঃ ধাবিত হয়, এ কথা বাস্তবিক সত্য। জ্ঞান জ্ঞানীকে ভীরু করিয়াছে তাহা নহে, ভয়ের কারণ জানাইয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে, এবং সেই ভয় কিরূপে অতিক্রম করা যাইতে পারে, তাহার উপায় জ্ঞানই বলিয়া দেয়। তবে জ্ঞান যতই কেন উপায় বলিয়া দিক্ না, তথাপি সর্ব্বদা ভয় নিবারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না যে সকল ভয়ের কারণ চারিদিকে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমাদের জ্ঞানবল অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্য আমাদের জ্ঞানবলসত্ত্বেও আমরা যে ভয়ের হাত হইতে সর্ব্বদা মুক্ত হইব, তাহার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞানবলে আমরা দিন দিন প্রকৃতি হইতে যে সকল ভয়ের কারণ উপস্থিত

* অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।

হয়, তাহা অতিক্রম করিতেছি, কিন্তু এখনও প্রকৃতিমধ্যে এত ভয়ের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, আর দশ সহস্র বর্ষেও সে সকল আমরা অতিক্রম করিতে কখন পারিব কি না তৎপক্ষে সন্দেহ।

জ্ঞানবল যদি ভয়শূন্যতার কারণ না হইল তাহা হইলে জীবের ভয় কি কিছুতেই যাইবে না? জ্ঞানে মুক্তি চিরদিন প্রসিদ্ধ আছে, সেই জ্ঞানেই যদি আমরা ভয়শূন্য হইতে না পারিলাম তাহা হইলে ভয়শূন্য হইবার উপায় কি? ভয়শূন্যতার জন্য কি তবে আমরা অজ্ঞানতার আশ্রয় গ্রহণ করিব? একবার যাহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহারা কি আবার অজ্ঞানতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে? বৃদ্ধ হইয়া বালক হওয়া যেরূপ অসম্ভব, জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞান হওয়া তেমনই অসম্ভব। কিন্তু আমরা বলি, অজ্ঞান ও বালক না হইয়া কেহ ভয়শূন্য হইতে পারে না। জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞানী হইব কি প্রকারে? অজ্ঞানী হইতে পারি, যদি অনন্ত জ্ঞানচক্ষুর নিকটে নিরন্তর ভাসেন। বিজ্ঞান সহস্র চেষ্টা করিয়াও সমুদায় ভয়ের কারণ নিবারণ করিতে পারে না কেন? প্রকৃতি অনন্তের লীলাভূমি, আজ তুমি মনে করিলে বিজ্ঞানবলে তুমি প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিলে, আয়ত্ত করিয়া কতই না অভিমানের কথা বলিতে লাগিলে, কিন্তু তন্মধ্যে আরও যে কত গভীর রহস্য আছে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আজও তাহা পড়ে নাই, সুতরাং আয়ত্তীকৃত প্রকৃতি অনায়ত্ত হইয়া গেলেন, আবার বিজ্ঞানের নিজের অজ্ঞানতার চেতনা হইল। বিলক্ষণ বিজ্ঞানাভিজ্ঞ হও, তোমার অজ্ঞানতা ঘোচে নাই, তুমি এখনও অনন্তের সমীপে ক্ষুদ্র শিশু। অজ্ঞান শিশুর ন্যায় তুমি অনন্তের বক্ষে স্থিতি কর, দেখিবে মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন ভয়শূন্য, তুমি তেমনি ভয়শূন্য হইয়াছ। কল্য কি হইবে তুমি তাহা জান না। কল্য কেন বলিতেছি, পরমুহূর্ত্তের বিষয় তুমি সম্পূর্ণ অনবগত। তুমি যদি অনন্তের বক্ষে বাস কর, অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার হস্তগত; তুমি ভয় করিবে কেন? যাঁহার হাতে তোমার অনন্ত জীবন, তিনি সমুদায় তোমার সম্বন্ধে করিতেছেন, তোমার আবার চিন্তা কি? তিনি তোমাকে যাহা বলিতেছেন তুমি তাহা করিয়া যাইতেছ, তোমার সম্বন্ধে তিনি যাহা জানেন, তাহাই করিবেন, তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। যদি তোমার নিজের রুচি থাকে, বাসনা থাকে, কামনা থাকে, তোমার ভয়ের কারণ আছে, আর যদি তাহা না থাকে, কেবল তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালন করা তোমার জীবন হয়, তোমার সম্বন্ধে কোন ভয়ের কারণ নাই, তুমি ভীত হইবে কেন? অভয়লাভ অনন্তেতে স্থিতিতে কেবল সম্ভব, অন্য কিছুতেই সম্ভবপর নহে, ইহা জানিয়া তাঁহাতে নিয়ত বিচরণ করিতে যত্ন কর, অভয়পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইবে।

স্বর্গগত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার পুরীতে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তিনি বহু বৎসর হইতে হৃদ্রোগে আক্রান্ত ছিলেন, হৃদয়ের ক্রিয়াবরোধেই তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় অদ্বৈতকুলসম্ভূত, কুলোচিত ভাব তাঁহার জীবনে চিরদিনই তাহার কার্য্য প্রকাশ করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের সহিত তাঁহার নাম গ্রথিত রহিয়াছে, তাঁহার জীবনে বিবিধপরিবর্ত্তনসত্ত্বেও সে ইতিহাস হইতে তাঁহার নাম বিলুপ্ত হইবার নহে। ব্রাহ্মগণ চিরদিন তাঁহার সত্যপ্রিয়তার প্রশংসা করিতেন, যখন যাহা তাঁহার নিকটে সত্য বলিয়া মনে হইত,তখন তিনি সমগ্র উদ্যমের সহিত তাহার অনুসরণ করিতেন। ঈদৃশ অনুসরণে ইষ্টানিষ্টের কোন বিচার করিতেন না; বন্ধুবর্গের হৃদয়ে আঘাত লাগিলেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। সত্যের অনুরোধে কুলগৌরব তিনি ছাড়িয়াছেন, এ বোধ তাঁহাতে চিরদিন জাগ্রৎ ছিল; সুতরাং সেই বোধই তাঁহাকে যাহা তিনি সত্য মনে করিতেন তীব্রতা সহকারে তাহার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত করিত। ভাবপ্রধান হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য তাঁহার চিত্ত হইতে কোন দিন তিরোহিত হয় নাই। যে কোন একটি বিষয় তাঁহার হৃদয়ে লাগিলেই তিনি তাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন, এবং আর কোন বিচার না করিয়া তাহার অনুসরণ করিতেন। ভাবাপগমে মন শান্ত হইলে, বিষয় বিশেষের অনুসরণ অপর লোকের স্বভাবসিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু এ স্বভাব তাঁহাতে ছিল না। যত ক্ষণ ভাব আছে ততক্ষণ তদ্বিষয়ে মহান্ উদ্যম

আছে, ভাব গেল উদ্যমও গেল, আবার কোন একটি ভাবের আগম বিনা আর উদ্যম প্রকাশ তাঁহার পক্ষে সুকঠিন ছিল। তিনি সর্ব্বদা ভাবের সাগরে ভাসিতেন, সুতরাং কোথাও স্থায়ী ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে ঘটিত না। অধ্যয়নাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহাতে জীবনের এ লক্ষণ চিরদিন প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবাধীন ব্যক্তিতে মতের স্থিরতা থাকিবে ইহা কখন আশা করা যাইতে পারে না। তিনি ক্রমিক মতপরিবর্ত্তন করিয়াছেন ইহা দেখিয়া যাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হন, তাঁহারা তাঁহার ভাবপ্রবণতা হৃদয়ঙ্গম করিলে আর উহা আশ্চর্য্য মনে করিবেন না। সংস্কৃতপাঠশালার অধ্যয়ন শেষ না করিয়াই তিনি মেডিকেল কলেজের বঙ্গীয় বিভাগে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। স্বাভাবিক সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকাতে শিক্ষক প্রমুখাৎ শ্রুতবিষয় কখন তাঁহাকে পরিশ্রম করিয়া আয়ত্ত করিতে হইত না। একবার যাহা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা অন্য ছাত্রগণের নিকটে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া তিনি আয়ত্তাধীন করিয়া লইতেন। বঙ্গীয় বিভাগে যে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয় তাহা তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ বর্ষে কলেজের কোন অন্যায় ব্যবহারে উদ্দীপ্তহৃদয় হইয়া অন্যান্য ছাত্রগণ সহ মিলিত হইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হন। অনেক ছাত্র দলস্থ হইল, যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেককে বক্তৃতাবলে নিজের দলস্থ করিয়া লইলেন। কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইল, সুতরাং তাঁহারা শান্তভাব অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণকে কলেজে পুনরায় লইয়া গেলেন, কিন্তু গোস্বামী সেই সময় হইতে অধ্যয়ন ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ পড়িয়াছে, সুতরাং অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবনার্পণে তাঁহার উৎসাহ জন্মিল। মেডিকেল কলেজের সঙ্গে বিরোধকালে তাঁহার অধ্যাপক ডাক্তর তামিজ খাঁ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনে প্রায় সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, 'বিজয়ের মস্তকের গঠন যে প্রকার তাহাতে তিনি মেডিকেল কলেজে বিবাদানল প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া অধ্যয়ন ত্যাগ করিলেন এখানেই ইহা শেষ হইল না। তিনি যেখানেই যাইবেন, সেখানেই বিরোধ বাধাইয়া দিয়া তাঁহাকে সরিতে হইবে।' সে যাহা হউক, আদি সমাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ হইল। সেখানে তাঁহার প্রবলোদ্যম ও উৎসাহ তাঁহাকে সর্ব্বজনবিদিত করিয়া তুলিল। ১৭৮৪ শকে তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। সঙ্গতে যখন যজ্ঞোপবীত রাখা সমুচিত নয় ইহা আলোচিত হইয়াছিল, তখন তিনি যজ্ঞোপবীতধারণের বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করিলেন। এ বিষয়ের আন্দোলনের প্রথম ফলস্বরূপ এই নিয়ম হইল যে, যজ্ঞোপবীতধারিগণ সমাজে বেদীতে কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না। ১৭৮৫ শকের শ্রাবণ মাসে তিনি প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিলেন। ১৭৮৬ শকের ভাদ্র মাসে তিনি ও অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যপদে বরিত হন। তাঁহারা উভয়ে যজ্ঞোপবীতত্যাগী, সুতরাং তাঁহারাই সমাজের কার্য্য করিতে থাকেন। কলিকাতা সমাজের জীর্ণসংস্কারকালে মহর্ষির গৃহে যখন উপাসনাকার্য্য হয়, তখন সেখানে গিয়া ইনি যজ্ঞোপবীতধারিগণ বেদীস্থ হইয়াছেন দেখিয়া তথা হইতে ক্রোধভরে চলিয়া আইসেন এবং সেই সময় হইতে সদলে কলিকাতাসমাজপরিত্যাগের সূত্রপাত হয়। গোস্বামী মহাশয় প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, নিরতিশয় উৎসাহ সহকারে প্রচারে প্রবৃত্ত, মহর্ষি প্রচারকগণের মাসিক বেতনের প্রস্তাব করেন। প্রচারকগণ বেতনভোগী হয়েন কেশবচন্দ্রের ইহা মতবিরুদ্ধ ছিল, বিজয়কৃষ্ণ এই মতের পক্ষপাতী হইয়া বেতন গ্রহণ অন্যায় বলিয়া তীব্রতা সহকারে প্রতিবাদ করেন। জীবিকাসম্বন্ধে তাঁহার চিত্তের স্থিরতা ছিল না, ইহা আমরা জানি, এবং এ বিষয়ে তাঁহার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় নাই, ইহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু তথাপি তিনি যে প্রথমে এ বিষয়ে দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আর কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। শিষ্যগণের প্রদত্ত পৈতৃক ভূখণ্ডের প্রতি মমতা তিনি সর্ব্বথা বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহাকে আমরা স্বকর্ণে তাঁহার জ্যেষ্ঠকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে শুনিয়াছি, আপনাদের অনবধানতায় যদি পৈতৃক ভূখণ্ড নষ্ট হয়, ইহার পর পরিজনবর্গের উপায় কি হইবে? জীবিকাসম্বন্ধে তিনি বিবিধ সময়ে বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছেন, প্রচারকগণের বেতনভোগিত্ব সমর্থন করিয়াছেন, এবং স্বয়ং বেতন গ্রহণ করিয়াছেন, এ সকলের মূলে যে বিশ্বাসের অল্পতা ছিল, ইহা আর কে না বলিবে? তবে তিনি শেষ জীবনে শিষ্যগণের অর্থে বহুজনবেষ্টিত হইয়া জীবন যাপন করিয়াছেন ইহা তাঁহার পিতৃপিতামহগত ভাব, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় পৌত্তলিকতার বিরোধী আর কে ছিল? শেষ জীবনে তিনিই পুত্তলিকার নিকটে মস্তক অবনত করিয়াছেন, শিষ্যগণকে পৌত্তলিকতায় প্রোৎসাহিত করিয়াছেন, আপনিও পৌত্তলিকতার চিহ্ন ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রাহ্মসমাজে যখন ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল, তখন তিনি সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভক্তিভাব উদ্দীপ্ত করিবার পক্ষে সহায় হইলেন। কিন্তু এই ভক্তিভাবে মুঙ্গের যখন টলমল করিতে লাগিল, তখন যে ভাবের আতিশয্য দেখা দিল গোস্বামী মহাশয় তাহার সঙ্গে কেবল যোগ দিতে পারিলেন না তাহা নহে, কতকগুলি ব্যাপার দেখিয়া তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। যখন ভাবের উত্তেজনা তাঁহার মন হইতে অপসৃত হইল,তখন আপনার অনুচিত কার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইলেন, প্রকাশ্য পত্রে দোষ স্বীকার করিলেন। পরস্পরের পদে অবলুণ্ঠন, ধূলিগ্রহণ, প্রভু আদি শব্দে সম্বোধন এগুলিকে তিনি প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু পর সময়ে তিনি সেই গুলির কেবল যথেচ্ছ প্রশ্রয় দিয়া পৃথিবী হইতে অপসৃত হইলেন তাহা নহে, শিষ্যবর্গমধ্যে এ স্রোত যে আবহমান চলিবে তাহার পথও পরিষ্কার করিয়া দিয়া গেলেন। কেশবচন্দ্রের নিকটে ভক্তিশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি দুরারোগ্য হৃদ্রোগে

আক্রান্ত হন। এ হৃদ্রোগের মূল অসম্ভব পরিশ্রম। বেহালায় জ্বররোগের প্রাদুর্ভাবসময়ে রোগীদিগকে দেখা ঔষধ পথ্য বিতরণ করা ইত্যাদি অনাহারে সম্পাদন করিয়া আসিয়া সেই পরিশ্রান্ত শরীরে স্ত্রীবিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কার্য্য সম্পাদন করা, এত অনিয়ম শরীর বহিবে কি প্রকারে? রোগের যাতনায় তিনি মর্ফিয়াসেবনে প্রবৃত্ত হন। ভক্তিশিক্ষার সময়ে মর্ফিয়া ত্যাগ করিতে বলা হয় কিন্তু মর্ফিয়া ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। চিকিৎসক মর্ফিয়ায় ম্যাগ্‌নেসিয়া মিশাইয়া দিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু তাহাতে ফল দর্শে না। লুক্কায়িত ভাবে মর্ফিয়ার মাত্রা অধিক পরিমাণে তিনি আপনি গ্রহণ করেন। এজন্য অর্থসংগ্রহেও গোল ঘটিয়াছিল। শেষ সময়ে তাঁহার মর্ফিয়ার মাত্রা এত বাড়িয়াছিল যে, ময়মনসিংহে এক জন চিকিৎসকের গৃহে কর্ম্মোপলক্ষে গিয়া গোস্বামী মহাশয় মর্ফিয়া চাহেন, তিনি সেবনের মাত্রা জানেন না, সুতরাং ২০ গ্রেণের অধিক মর্ফিয়ার ফাইলটি তাঁহাকে দেন, তিনি উহার সবখানি ঢালিয়া সেবন করেন। ইহাতে ডাক্তার ভীত হইয়া পড়েন। গৃহে ব্রহ্মবধ উপস্থিত ভাবিয়া তিনি বমন করাইবার উদ্যোগ করেন। গোস্বামী মহাশয় হাসিয়া বলেন, ভয়ের কোন কারণ নাই, এরূপ মাত্রা গ্রহণে তাঁহার অভ্যাস আছে। ঈদৃশ মর্ফিয়ার মাত্রাতে যে সকল মানসিক বিকার ঘটিতে পারে, সে সকল বিকার ঘটিয়াছিল তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব প্রবল, সুতরাং তাঁহার জাগ্রৎস্বপ্নদর্শন তদনুসারেই হইয়াছে। সে যাহা হউক, ভক্তিশিক্ষাকালে যখন সকলে মিলিয়া নির্জ্জন সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন তাঁহাতে একটি সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সাধন করিতে করিতে তিনি উঠিয়া দণ্ডায়মান হইতেন এবং সেই অবস্থায় অচেতন ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। সকলে সাধনান্তে উঠিয়া গিয়াছেন, তিনি একা ছাদে দাঁড়াইয়া আছেন। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা অতিবাহিত হইল তিনি আর অবতরণ করেন না। এক জন বন্ধু জানিতেন তাঁহার হৃদ্রোগ আছে, এজন্য তিনি বক্ষে হস্ত দিয়া মর্দ্দন করিয়া দিতেন, আর অমনি ফাঁৎ করিয়া নিশ্বাস পড়িত আর চৈতন্য হইত। তাঁহার বন্ধুকে এজন্য কতক দিন ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, এবং তাঁহার নিজের সাধনে কিছু ব্যাঘাত জন্মে। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের অবস্থা তাঁহাতে উপস্থিত হইয়াছে, মনে হয়, গোস্বামী মহাশয়ের মনে ঈদৃশ অভিমান ঘটিয়াছিল। যখন তাঁহাকে বলা হইয়াছিল এটি সাধনের বিঘ্ন, এতদ্দ্বারা সাধনে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা রহিত হইবে, তখন তিনি তাহাতে বিরক্ত হইলেন। কলিকাতার গঙ্গার ঘাটে যে সকল সন্ন্যাসী আসিয়া সময়ে সময়ে বাস করিতেন, তাঁহাদিগের নিকটে গতায়াত করিতে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কোন দিন তাঁহাদিগের প্রদত্ত তিলক ধারণ করিয়া আসিতে লাগিলেন ইহাতে বন্ধুবর্গের মন ব্যথিত হইল। এ সময়ে এমন একটী ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাঁহার মন বন্ধুবর্গ হইতে আরও স্বতন্ত্র হইয় পড়িল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এক জন বন্ধু সহ আশ্রমে আগমন করেন। সেই বন্ধুটির অবিবেচনাঘটিত ব্যবহারে কথা উঠে। ইহাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্রোধান্বিত হইয়া কনিষ্ঠকে ভর্ৎসনা করেন, এবং তাঁহারই জন্য কুলের সম্ভ্রম বিনষ্ট হইল, যাহারা পদতলে থাকিবে, তাহারা মাথায় চড়িল ইত্যাদি অনেক কথা বলেন। গোস্বামী মহাশয় এই ঘটনায় নিতান্ত দুঃখিতচিত্ত হন, এবং বাঘ আঁচড়ায় চলিয়া যান। যখন আদিসমাজের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল, সেই সময়ে তাঁহা কর্ত্তৃক বাঘ আঁচড়ার পিরালিবংশীয় মল্লিকপরিবার ব্রাহ্মধর্ম্মে আনীত হন। উৎসবমধ্যে তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন বটে, কিন্তু আর একটী বিপদ্ ঘটিল যাহাতে তাঁহার মন পূর্ব্বাপেক্ষা বিরক্ত হইল। তিনি এক দিন সকলের সঙ্গে আসিতে াসিতে স্খলিতপদ হইয়া নর্দ্দমার ধারে পড়িয়া যান, এবং গুরুতর ভাবে আহত হন। তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়া শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু উৎসবের সময়ে বহু কার্য্যে ব্যস্ত বন্ধুগণ কর্ত্তৃক আশানুরূপ তাঁহার সেবা হইতে পারে না, এজন্য তিনি মর্ম্মাহত হইয়া পুনরায় বাঘ আঁচড়ায় যান। এই উৎসবের সময়ে কুচবিহার-বিবাহের সূত্রপাত হইয়াছে, তিনি কেশবচন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়া বিবাহসম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন,তাহাতে তৎকালে সন্তোষই প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সন্তোষ আর তাঁহার রহিল না; আন্দোলনকারিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঘোর আন্দোলনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল কথা অনেকে জানেন বা অন্যত্র লিপিবদ্ধ আছে, তাহার আর আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম না। গোস্বামী মহাশয় এক ভাবে স্থির থাকিবার ব্যক্তি নহেন। তিনি স্থানে স্থানে এমন করিয়া সন্ন্যাসিগণের সংসর্গে পরিবর্ত্তিতমত হইতে লাগিলেন, ক্রমে পরিত্যক্ত হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে একটি সন্ন্যাসী ছিলেন,সেই সন্ন্যাসীর নিকটে তিনি গতায়াত করিতেন, এবং সে সন্ন্যাসী শিষ্যের দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেন। গোস্বামী মহাশয় যাঁহাকে গুরু বলিতেন, তিনি ইনি কি না আমরা জানি না। যদি ইনিই সেই গুরু হন, তাহা হইলে গুরু অপেক্ষা শিষ্যের চরিত্র কত বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল তাহা বলা যাইতে পারে না। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যবর্গমধ্যে নারীর সংখ্যা অল্প নহে, কিন্তু তিনি আপনার অধিবেশন স্থলে নারীগণকে প্রবেশ করিতে দিতেন না, তাঁহাদিগকে দূরে অবস্থান করিতে হইত। তাঁহার গুরু (যদি তিনিই গুরু হন) নিজের নির্জ্জন কুটীরে একটী চরিত্রহীনা নারীকে স্থান দিয়া লোকবিদ্বিষ্ট হন। স্বর্গগতা ভগিনী যোগমায়া গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী। এই ধর্ম্মপত্নী সহ শেষ সময়ে তাঁহার কি প্রকার বিশুদ্ধ সম্বন্ধ ছিল তাঁহার মুখে শ্রুত একটী ঘটনা বর্ণন করিলে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। এক দিন গোস্বামী মহাশয় নির্জ্জনে পত্নী সহ যখন বাস করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি পত্নীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মুখে জগজ্জননীকে দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার ভাবাবেশ উপস্থিত, ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া তিনি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন, পত্নী একেবারে অবাক্ এবং কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইয়া গেলেন। এখানে

গোস্বামী মহাশয়ের ভাবাধিক্য সকলে দেখিবেন, কিন্তু যে স্বামী আপনার পত্নীর মুখে জগন্মাতার আবির্ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হন, তাঁহার নারীজাতিসম্বন্ধে কি প্রকার বিশুদ্ধ ভাব হইবে, অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। যে পত্নী তাঁহার সঙ্গে বহুবর্ষযাবৎ বহু ক্লেশ বহন করিয়া পরিশেষে শিষ্যমণ্ডলীতে আদৃত হইয়া সুখী হইলেন, তিনি স্বর্গস্থা হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী বহু প্রলোভনে পরিবেষ্টিত হইয়াও তৎপ্রতি হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাব রক্ষা করিলেন, আপনার চরিত্র অকলঙ্কিত রাখিলেন, ইহা কিছু সামান্য কথা নহে। মন্ত্রদান হঠযোগশিক্ষাদানপ্রভৃতি অনেক বিষয়ে তাঁহার জীবনসম্বন্ধে আক্ষেপ করিবার বিষয় আছে, কিন্তু তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র, ধর্ম্মের জন্য পিপাসা, ভক্তিভাব, এ সকল কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ কথা এ স্থলে বলা সমুচিত যে, যদিও তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি প্রচারকমণ্ডলীমধ্যে তাঁহার যে বিশেষ স্থান ও অধিকার ছিল, তাহা প্রচারকসভায় বিশেষ নির্দ্ধারণ দ্বারা অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছিল। এত বিরোধ সত্ত্বেও এত মতের বিকার সত্ত্বেও তাঁহার সহিত যে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ তাহা আমরা ভুলিয়া যাই নাই। আমরা চির দিন বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, ইহ লোকে নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তিনি আমাদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেহভঙ্গের পর সে বিচ্ছেদ তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন না; আবার আমাদের সকলের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইবেন, ইহাই আমাদিগের আশা। তিনি এখন স্বর্গস্থ হইলেন, আমরা তাঁহার মতদৌর্ব্বল্য বিস্মৃত হইয়া নিত্যকালঘটিত সম্বন্ধে তাঁহাকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি। তিনি স্বর্গে সাধু অঘোর ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হউন, ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দে বিভোর হউন, ইহাই আমাদের হৃদ্গত কামনা।

কয়েকটি শোকঘটনা।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা তিনটি শোকের আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি।

ঢাকা নগরস্থ প্রেমাস্পদ বিশ্বাসী যুবক বামাচরণ সেন দুঃখিনী জননী ও সহধর্ম্মিণী এবং আত্মীয়বর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বহুমূত্র ও আনুষঙ্গিক ক্ষয়রোগে বামাচরণের শরীর একান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পরে উদরাময় হওয়াতে তাঁহার তনুত্যাগ হয়। বামাচরণ গয়াজিলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক স্বর্গগত শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা বাবু শ্যামাচরণ সেন মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ও একমাত্র সন্তান ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু বিশ্বাসী নববিধানমণ্ডলীর ভূষণস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস, চরিত্রের শুদ্ধতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অসাধারণ ছিল। পিতৃগুণ অনেক পরিমাণে পুত্র বামাচরণে সঞ্চারিত হইয়াছিল। বামাচরণ বাল্য কাল হইতে শান্তপ্রকৃতি ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদিগের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তির সঞ্চার হয়। গয়া নগরের কোন স্থানে ভাগবত পাঠ ও রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণ পাঠ এবং ধর্ম্মালোচনাদি হইতেছে সংবাদ পাইলে বামাচরণ সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইয়া তাহাতে যোগ দান করিতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া উঠেন। তখন বিধানবিশ্বাসী পিতার ধর্ম্ম ও সদ্গুণের অনেক অধিকারী হন। তিনি নিয়মিতরূপে উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গাদিতে নিষ্ঠার সহিত যোগদান করিতে থাকেন। ঢাকা নগরস্থ ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের কন্যার সহিত প্রথম যৌবনেই তাঁহার বিবাহ হয়। তদবধি জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি শ্বশুরের আশ্রয়ে বিষয় কার্য্যাদি উপলক্ষে সপরিবারে ঢাকা নগরে অবস্থিতি করেন। ব্রাহ্মসমাজের সকল সভাসমিতিতে বামাচরণকে উপস্থিত দেখা গিয়াছে ও আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনা গিয়াছে। বামাচরণ চিরকাল ধর্ম্মপিপাসু ও নিরীহ শান্তপ্রকৃতি লোক ছিলেন। আজ সতীসাধ্বী সরলা বিধবা জননী একমাত্র সাধু পুত্র—একমাত্র সন্তান হারাইয়া, সহধর্ম্মিণী স্বীয় জীবনসর্ব্বস্ব পতি হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবী শূন্য দেখিতেছেন। ৩৩ বা ৩৪ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি তিরোহিত হইয়াছেন। প্রেমময় ঈশ্বর দিব্যলোকে তাঁহাকে আপনার শান্তি ক্রোড়ে রক্ষা করুন ও তাঁহার শোকসন্তপ্তা জননী ও সহধর্ম্মিণীর অন্তরে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন।

বিগত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতা নিবাসী আমাদের প্রিয় ভ্রাতা রামলাল ভড় গয়া নগরে ৪২ বা ৪৩ বৎসর বয়সে সহধর্ম্মিণী ও ছয়টী শিশু পুত্রকন্যাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া জ্বররোগে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পুত্রকন্যাগণসহ গয়াতে বিষয়কর্ম্মে নিযুক্ত স্বীয় ভ্রাতার নিকটে যাইয়া স্থিতি করিয়াছিলেন। রামলাল বাবু পত্নীকে কলিকাতায় প্রত্যানয়নের জন্য কিয়দ্দিন হইল তথায় গিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় যাত্রা করিবেন উদ্যোগ করিতেছেন, এমন অবস্থায় ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্ন কালে জ্বররোগে আক্রান্ত হন, সেই দিন রাত্রিতেই অচৈতন্য হইয়া পড়েন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে মর্ত্তলীলা সংবরণ করেন। সর্দ্দিগর্ম্মিতে তাঁহার এই সাজ্বাতিক জ্বর হইয়াছিল অনেকে এরূপ অনুমান করিতেছেন। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি যথাবিধি তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রকন্যাগণকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। রামলাল ভড় আমাদের মণ্ডলীর একজন অতিশয় সেবাপ্রিয় পরিশ্রমী বিশ্বাসী পুরুষ ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের একান্ত বিশ্বস্ত অনুগত অনুগামী ছিলেন, প্রাণপণে ভক্তির সহিত নিয়ত তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের সেবা করিয়াছেন। রামলালের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে আমাদের শ্রদ্ধের ভাই অত্যন্ত শোকাহত হইয়াছেন। তিনি কোন বন্ধুকে লিখিয়াছেন, রামলাল চলিয়া যাওয়াতে আমার দক্ষিণ হস্ত যেন ভগ্ন হইয়াছে। রামলালের পত্নী শিশুদিগকে লইয়া এক্ষণ

নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি হিন্দু জননী ও ভ্রাতা প্রভৃতির নিকটে আপন ধর্ম্ম ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলিতে কিছুমাত্র সহানুভূতি পাইতেছেন না। করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার সহায় হউন, এই পরীক্ষা সংগ্রামের মধ্যে তিনি স্বীয় কন্যাকে চরণাশ্রয়ে রক্ষা করিয়া ধর্ম্মবল বিধান করুন।

বিগত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মালদহস্থ আমাদের সমবিশ্বাসী বন্ধু কালিদাস চক্রবর্ত্তী ন্যূনাধিক ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। মালদহে একমাত্র তিনিই নববিধানমণ্ডলীভুক্ত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার অটল উৎসাহ ছিল, দুঃখ দারিদ্র্য ও নানা পরীক্ষার মধ্যে তিনি স্বীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও দুই পুত্র এক কন্যা বিদ্যমান। নবসংহিতানুসারে পুত্রদ্বয় শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন।

OUR BELOVED MINISTER.

How our hearts yearn for thee, O departed Minister! It is love which binds together the spirits of distant worlds, and which forms the link between heaven and earth. God has kindled this love in us. And therefore its flame can never die out in our hearts! This white flame of pure love shall sanctify us, this bright hope of reunion shall be our safeguard against all temptations to sin and worldliness. Fain would we blend our beings with thine. It is the will of God that we should be one with thee. Therefore will we devote our whole soul to God, that through Him we may be one with thee and with His whole human family. We fear death no longer. God who is the wisest, the purest, and the highest Love, will not destroy that love which He himself hath created in us. Thou art our God-ordained Minister. Thou art appointed by God to minister to our soul's wants. Thou didst never offer earthly inducements to bribe us. Thy whole spirit and life teach us to seek God for Himself. Thou didst not choose to teach by commands and dictates. Thou didst always and patiently wait for indirect education and discipline which are the ways of God. O, immortal Minister, the energies and influences of thy self-bereft and God-centred soul are immense; because thou art consciously and willingly obedient to thine Almighty and Omni-Active Lord. As one born blind cannot be fluent on the beauty and sublimity of Nature, and be a teacher of Optics, and as one born deaf cannot be eloquent upon the harmonies and symphonies of music, and become a professor of Acoustics; so a man who is spiritually blind and deaf, and can neither see the formless face, nor hear the soundless voice of God, cannot be a true minister. But thou, our beloved Minister of the New Dispensation, is a *seer* of the face, and a hearer of the voice, of God.

WHAT IS GOD DOING FOR BEHAR.

GOD is reviving the mighty dispensations of the Holy Spirit which He started in Behar some thousands of years ago. It is more than two thousand years back that God inspired Sakya in Gya with the fiery spirit of Nirv*a*na and Day*a*. And it is more than four thousand years ago that God raised up Rajarshi Janaka to worship Him as a royal householder. *Jajnyavalka* was the royal priest of Janak. This royal priest taught his wife *Maitrey*i God-knowledge. *Janak*i, the well-known daughter of Janaka was married to **Rama**, whose spiritual guide was Vasishtha, the author of *Yogavasistha*. The emperor Asoka prospered, and lived a high moral life in Behar. At present Arrah, Bankipur, Bhagalpur, Darbhanga, Monghyr, Mokameh, and Mozzufferpur have become the centres where men and women strive to worship God in spirit, in truth, and in the beauty of holiness.

খাঁটুরার ব্রহ্মোৎসব।

বিগত ২০শে, ২১শে ২২শে জ্যৈষ্ঠ শুক্র, শনি ও রবিবার খাঁটুরা নববিধান সমাজ সংক্রান্ত বিংশ সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয়ের সাদর নিমন্ত্রণানুসারে কলিকাতা হইতে অনেক বিধানপ্রচারক, বহুসংখ্যক প্রাচীন ও যুবক ব্রাহ্ম এবং কতিপয় ব্রাহ্মিকা মহিলা সর্ব্বশুদ্ধ ৩০।৩৫ জন উক্ত উৎসব উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুক্রবার অপরাহ্ণে ক্ষেত্রবাবু কতিপয় যুবককে সঙ্গে করিয়া পল্লীর ভিতরে যাইয়া ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়াছিলেন। শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীমান্ প্রমথ লাল সেন মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। কুসুম ও বিহঙ্গের নিকটে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়, তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এরূপ ছিল। সেই দিন সায়ংকালে উপাধ্যায় কর্ত্তৃক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই রমণীয় নিভৃত স্থান যোগসাধনপক্ষে বিশেষ অনুকূল, সাধকদিগকে সময়ে সময়ে এখানে আসিয়া সাধন ভজন করা আবশ্যক, উপাধ্যায় এই ভাবের কথা সকল উপদেশে বিবৃত করিয়াছিলেন। রবিবার দিন পূর্ব্বাহ্ণে উপাসকদল মন্দির হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পল্লীর ভিতর দিয়া উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের ভবনে যাইয়া উপস্থিত হন। শ্রীমান্ আশুতোষ রায়

সঙ্কীর্ত্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দত্তবাটীতে কিয়ৎক্ষণ প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বা'র পল্লীর ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর অন্তর বামড়নামক বৃহৎ ঝিলের কূলে যাইয়া সকলে সঙ্কীর্ত্তনে নিবৃত্ত হন। বামড়ে স্নানাবগাহনানন্তর তাহার কূলস্থিত চণ্ডীতলায় বিশেষ উপাসনা হয়। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের স্বর্গগতা সাধ্বী সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী দেবী পুত্রের অন্নপ্রাসনের আনুষঙ্গিক ষষ্ঠীপূজা উপলক্ষে হিন্দু শ্বশুর ও আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পূজায় যোগদানের জন্য এখানে নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া ছিলেন। কুলবধূ কুমুদিনী দেবী ঈশ্বরকৃপায় স্বীয় অটল বিশ্বাস ও একেশ্বরনিষ্ঠার পরিচয়দানপূর্ব্বক সেই ঘোরতর পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণার্থ প্রতি বৎসর সাংবৎসরিক উৎসবের সময় এই চণ্ডীতলায় বিশেষ উপাসনা হইয়া থাকে। সেই দিন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন স্ত্রীর একমাত্র পতির প্রতি নিষ্ঠাবতী হওয়াই সতীত্ব, ইহা প্রকৃত সতীত্বের লক্ষণ নহে। যে নারীর আত্মা নানা সাধু ভাবে পূর্ণ, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিসম্পন্ন, বাস্তবিক তিনিই সতী। অসত্যচারিণী কলহকারিণী হিংসাপরায়ণা ভগবদ্বিশ্বাসবিহীনা নারী স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইলেও সতীপদের বাচ্য নহেন। যেমন অসত্যাচারী অবিশ্বাসী নাস্তিক পুরুষ, একান্ত ভার্য্যাপরতন্ত্র হইলেও তাহাকে সজ্জন বা সাধু বলা যায় না, নারীসম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী কুমুদিনী দেবীর জীবন সতীত্বের আদর্শ ছিল, তিনি পূর্ণ সতী ছিলেন। তিনি সেই ঘোর অন্ধকারের সময় ব্রাহ্ম সমাজের এক প্রকার প্রথম অবস্থায় একটি পল্লীগ্রামের ধনী পরিবারের অল্পবয়স্কা কুলবধূ হইয়া নিঃসহায় নিরুপায় অবস্থায় নানা প্রকার বিষম উৎপীড়ন নির্য্যাতন সহ্য করিয়া যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বিশ্বাসের পরিচয় দান করিয়াছেন এবং পতিভক্তির সহিত অন্য অন্য উচ্চ সাধুগুণ তাঁহার জীবনে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহাকে আমরা বর্ত্তমান যুগের মহাসতী বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি; এই মর্ম্মে উপদেশ হইয়াছিল। অপরাহ্ণে মন্দিরে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন শ্লোকসংগ্রহ হইতে কয়েকটি ঋষিবচন পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন। তৎপর আলোচনা হয়। তখন একজন যশোহরনিবাসী পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা ও সাকার দেব দেবী উপাসনা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক তর্ক ও আলোচনা হইয়াছিল। পরে শ্রীমান্ মনোমথধন সঙ্গীত করেন। সায়ংকালে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করেন। নগরে কেবল আড়ম্বর, তথাকার সকল বিষয়েই কৃত্রিমতা ভেজাল, এই নির্জ্জন উদ্যানভূমিতে সকলই অকৃত্রিম, স্বাভাবিক ও সুন্দর। এখানকার হরিৎ কান্তিযুক্ত ফলবান্ তরু ও পুষ্পতরু সকল অতিশয় নয়নতৃপ্তিকর। বৃক্ষের নিকটে স্থিরতা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা, বিনয় এবং উৎপীড়িত হইয়াও শত্রুর সেবা করা ইত্যাদি উচ্চগুণ আমরা শিক্ষা করিতে পারি। এখানকার সমীরণ বিশুদ্ধ ও সুখপ্রদ, কলকণ্ঠ বিহঙ্গ সকল সঙ্গীত প্রচারকের কার্য্য করে মহানগরীর কোলাহল ও ব্যস্ততা ছাড়িয়া আমরা এই নির্জ্জন উদ্যানভূমিতে আসিয়া কত শান্তি ও আরাম পাই, প্রকৃতির নিকটে কত শিক্ষা লাভ করি। এস্থান যোগ ও ভক্তির সাধনে একান্ত অনুকূল এই মর্ম্মে উপদেশ হইয়াছিল। প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন উপাসনার সময় সম্পাদক মহাশয় ভাবপূর্ণ সরস প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই দিন রজনীর শেষ ভাগে ও পরদিন প্রাতঃকালের ট্রেণে প্রায় সকলেই কলিকাতায় প্রতিগমন করেন। দত্ত মহাশয় অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সকলের আতিথ্যসৎকার করিয়াছিলেন।

অমরপুরের উৎসব।

অমরপুর পল্লী আম্রকাননে আচ্ছন্ন। সে অঞ্চলের আম্র ফল উৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তত্রত্য উদ্যমশীল বিশ্বাসী বৃদ্ধ বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস রায় প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকিবার সময় উৎসব করেন। এবৎসর অপর্য্যাপ্ত আম্র সে অঞ্চলে উৎপন্ন হইয়াছে। হুগলি ষ্টেশন হইতে অমরপুর তিন মাইল দূরে? প্রতিদিন শত শত গোশকটে ও গোপৃষ্ঠে এবং মুটের মস্তকে রসালপুঞ্জ হুগলি, চুঁচরা ও চন্দন নগরে এ অঞ্চল হইতে চালিত হইয়া পরে ট্রেণ নৌকা যোগে কলিকাতায় প্রেরিত হয়। বিগত রবিবার অমরপুরের উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, ভাই প্রসন্ন কুমার সেন, এই তিন জন প্রচারক এবং ভাই গিরিশচন্দ্র সেন এবং শ্রীমান্ মনোমথধন দে ও শ্রীমান্ আশুতোষ রায় প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মযুবা এবং চন্দনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ প্রভৃতি ৩। ৪ জন ও হুগলি হইতে একটি যুবক বন্ধু উক্ত বৃদ্ধ ভ্রাতার নিমন্ত্রণ পাইয়া তথায় গিয়াছিলেন। উৎসবক্ষেত্র পুষ্প পত্র পতাকাদিতে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পূর্ব্বাহ্ণে উপাসনাকার্য্য করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ মুষার অনুগামী ইহুদি জাতি প্রতিবৎসর ক্ষেত্রে শস্য ও উদ্যানে ফল পাকিবার সময় বিশেষ উৎসব করিয়া ফলশস্যপ্রদাতা পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া থাকেন, সেই রূপ আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে ফলশ্রেষ্ঠ সুমধুর আম্র পাকিবার সময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাদানার্থ জাতীয় উৎসব হওয়া প্রয়োজন। দান পাইয়া কৃতজ্ঞ না হওয়া পশুর স্বভাব। একটু অসুখ ও অসুবিধা হইলে আমরা বিধাতার প্রতি বিরক্ত হই ও দোষারোপ করি; অজস্র সুখ সম্পদ ও দান পাইয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ কোথায় হই। বাহিক বিবিধ দান পাইয়া ঈশ্বরকে যেমন কৃতজ্ঞতা দিতে হইবে, তাঁহা হইতে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক দানের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দান অত্যন্ত প্রয়োজন, এই মর্ম্মে উপদেশ হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা হরিদাস প্রেমবিগলিতহৃদয়ে সুমিষ্ট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সায়ংকালে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনার

কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি উপদেশ দান করেন নাই, আমাদের উপাস্য আমাদের নিকটস্থ ও প্রত্যক্ষ, আমারা পরোক্ষ ঈশ্বর ও মৃতদেবতার পূজা করি না। প্রেমময়ী জননীর আবির্ভাব কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? এই মর্ম্মে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ মনোমথধন দে, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ ও শ্রীমান্ আশুতোষ রায় প্রমত্ত সংকীর্ত্তন ও সুমধুর সঙ্গীত করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তখন গ্রামস্থ অনেক গুলি মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় উপাসনা সমাপ্ত হয়। তখন অমরপুরের সন্নিহিত বেণাটৈ ড়া পল্লীর হরিসভার অন্তর্গত কীর্ত্তনদলের কয়েক জন কৃষকশ্রেণীর লোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। একটি বালক সুমধুর স্বরে দুইটি কীর্ত্তনের গান করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তনে সেই বালকটি ঈশ্বরপ্রদত্ত বিশেষ শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। আর একটি যুবা আশ্চর্য্যরূপে মৃদঙ্গ বাজাইয়াছিল। শুনিলাম উভয়ে কাহার নিকটে সঙ্গীত ও বাদ্য রীতিমত শিক্ষা করে নাই। ব্রাহ্মভ্রাতা হরিদাস রায়ের অত্যন্ত দরিদ্রতা ও সংসারে নানা অভাব, কিন্তু তিনি ভক্ত হরিদাসের ন্যায় সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত হরিনামে মত্ত ও প্রফুল্ল। উৎসবে সমাগত বন্ধুদিগের সেবায় তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং কন্যাগণের যত্ন পরিশ্রম ও শ্রদ্ধা ও আগ্রহ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। ভ্রাতা হরিদাসের অন্নকষ্ট, এদিকে এই উৎসবব্যাপারে তিনি মুক্তহস্তে অন্নবিতরণ করিয়াছেন, আম্রফলের তো কথাই নাই।

প্রাপ্ত।

দৃঢ়তা।

যেখানে ধারণা আছে অথবা দুইটি বস্তুর যোগ আছে, সেখানে দৃঢ়তার কথার উল্লেখ হইতে পারে। যেখানে ধারণা নাই সেখানে দৃঢ়তার কথা আসিতে পারে না। কোন বস্তুকে ধরিতে হইলে বা ধারণ করিতে হইলে দৃঢ়তা গুণের প্রয়োজন হইতে পারে, এবং সেখানে দৃঢ়তা গুণের সমাবেশ হইলেই দৃঢ়তা গুণের শুভ ফল প্রকাশ পায়। আধ্যাত্মিক রাজ্য ধারণার রাজ্য। যেখানে আধ্যাত্মিকতা সেখানে ধারণা। আত্মাতে পরমাত্মার ধারণা, শক্তির ভিতর পরম শক্তির ধারণা, জ্ঞানের ভিতর পরম জ্ঞানের ধারণা আধ্যাত্মিকতা। উপাসনা প্রার্থনার ভিতর দিয়া এরূপ ধারণার আরম্ভ। উপাসনা প্রার্থনায় বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেন। সত্য শিব সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করিলাম। স্বভাব বলিল ইহাঁকে ধারণার বিষয় করিতে হইবে। তাই সাধক ধারণার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে শিথিলতা সেখানে ধারণা কাটিয়া যায়। বস্তু ধরিলাম, ধরিবার শক্তি শিথিল। একটু প্রতিকূল বায়ু বহিল ধারণার বস্তু বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিলাম। জীবনের ভাবগুচ্ছ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মের যখন উপাসনা ও কার্য্যানুষ্ঠান, সম্ভোগ ও সেবা ভাবতঃ এক হইয়াছে, তখন ব্রাহ্ম উপাসনাকালে যে প্রভাব ও আলোক লাভ করিলেন, তাহা ধারণা করিয়া, তাহাতে স্থিতি করিয়া, তাহা দ্বারা কার্য্যব্যস্ততার সময় পরিচালিত হওয়াতে উপাসনার সফলতা। ব্রহ্মশক্তিরূপ ষ্টীম (বাষ্প) প্রবাহ যতক্ষণ চিত্তের ধারণারূপ ষ্টীম (বাষ্প নালীতে ধারণার বিষয় ও পরিচালনের বিষয় হইল, ততক্ষণ জীবন গাড়ি কত ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া দ্রুতবেগে চলিল। যখন ষ্টীমনালীর শিথিলতা বা বিকলতাবশতঃ ষ্টীমপ্রবাহকে ধারণার বিষয় করিয়া রাখিতে পারিল না, তখন গাড়ি অচল হইয়া গেল। ভগবচ্ছক্তিধারণাতেই ধর্ম্মজীবন সংসারের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। ধর্ম্ম জীবনে স্মরণ মনন ব্রত নিয়মাদি প্রতিপালন, এ সকলই ধারণার ব্যাপার। এই ধারণাতে, এ সকল সুসম্পন্ন হওয়ার পক্ষে দৃঢ়তা পরম সহায়। অনেকের মনে স্বভাবতই দৃঢ়তা প্রবল। আবার কাহারও এটী বিশেষভাবে সাধনসাপেক্ষ। যাঁহাদের চিত্তে দৃঢ়তার অভাব, তাঁহাদের সহজেই পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে। এরূপ সাধক যতই আপনার অন্তরে শিথিলতাজনিত দুর্গতি প্রত্যক্ষ করেন, ততই তিনি ভগবানের কৃপাভিখারী হইয়া তাঁহার নিকট বল ভিক্ষা করিতে থাকেন। ভগবানের অসীম করুণাগুণে সাধকের অন্তরে যখন যে শক্তিবিকাশের প্রয়োজন, তাহা তিনি যথাসময়ে বিকাশ করিয়া থাকেন। ভক্তি না থাকিলে যে নিয়মে ভক্তির সঞ্চার হয়, যোগের ভাব না থাকিলে যে নিয়মে যোগের সঞ্চার হয়, যে জীবনে দৃঢ়তার অভাব সে জীবনেও দৃঢ়তার সঞ্চার সেই নিয়মে হইয়া থাকে। নির্ব্বাণ ভিন্ন যেমন যোগের অধিকার হয় না, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভিন্ন যেমন ভক্তির সঞ্চার হয় না, বিশ্বাস ও অনুরাগ ভিন্ন তেমনই কোন জীবনে দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিশ্বাস ও অনুরাগের সমাগম হইলে ক্রমে দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বাস ও অনুরাগ যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, জীবন ততই দৃঢ়তার অভেদ্য অলঙ্ঘনীয় ভূম লাভ করিতে সমর্থ হয়। সাধু মহাত্মাদিগের জীবনে বিশ্বাস ও অনুরাগ যে দৃঢ়তার ভূমি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, পৃথিবীর ঘোর অত্যাচার, পরীক্ষারূপ প্রবল ঝড় তুফানও সে ভূমিকে কম্পিত বা আলোড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই। যবন হরিদাস হরিনামে বিশ্বাস ও অনুরাগবলে আপন সাধনে কি অপূর্ব্ব দৃঢ়তাই প্রদর্শন করিলেন। মৃত্যুযন্ত্রণাপ্রদ বেত্রাঘাত তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত করিল, অথচ তিনি অমানুষিক দৃঢ়তার সহিত আপনার ইষ্টদেবতার নাম জপ, স্মরণ মননে নিবিষ্ট চিত্ত রহিলেন। এত অত্যাচার উৎপীড়নেও তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। মহাত্মা রাজা রামমোহন কত অত্যাচার উৎপীড়ন মধ্যে আপনার জীবনের ব্রত দৃঢ়তার সহিত সম্পন্ন করিয়া গেলেন। মহাত্মা থিওডোর পার্কার বাল্যজীবনে বিবেকবিষয়ে যে বিশ্বাস লাভ

করিলেন অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সহিত জীবনের অনুষ্ঠানে সে বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বিষয়ে পবিত্রাত্মার প্রেরণায় পরিচালিত হওয়া সম্বন্ধে কি অসাধারণ দৃঢ়তাই প্রদর্শন করিলেন। নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন বিপদপরীক্ষার মধ্য দিয়া যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন ও জীবনের ব্রত পালন করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনেই দৃঢ়তার গুরুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। একবার জীবনে দৃঢ়তা বদ্ধমূল হইলে জীবনের বাধা বিঘ্ন তাহাকে ক্ষীণ না করিয়া তাহার পুষ্টিসাধনই করে। ক্রমে উহা মহাপ্রভাবরূপে পরিণত হয়। দৃঢ়তা সাধক-জীবনের দুর্গস্বরূপ। উহা বাহিরের সর্ব্বপ্রকার আক্রমণ হইতে অন্তরস্থ সঞ্চিত সম্পত্তিকে রক্ষা করে। দৃঢ়তা চিত্তকে বহির্ম্মুখীন ভাব হইতে অন্তর্ম্মুখীন রাখিবার বিশেষ সহায়। দৃঢ়তা সাধকের চিত্তকে বিষয়বাহুল্যে ভাসাইয়া লইতে না দিয়া উহাকে অল্প স্থানে রক্ষা করিয়া উহার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে। বিশ্বাসীর জীবনে দৃঢ়তার সঞ্চার ও পরিপুষ্টি সকলই ব্রহ্মকৃপা-সাপেক্ষ। বিশ্বাসী ও অনুরাগী সাধকের জীবনে প্রার্থনা ও উপাসনাযোগে ব্রহ্মের শক্তি অবতরণ করিয়া প্রভাবরূপে পরিণত হয়। উহা দুর্ব্বল শিথিল জীবনের দুর্ব্বলতা শিথিলতা দূর করিয়া অপূর্ব্ব বল বিধান করে, এবং ঐ শক্তিই দৃঢ়তার আকার ধারণ করিয়া সে জীবনকে নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখে। আমাদের জীবনে দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতেই আমাদের জীবন বিপৎসঙ্কুল। যাঁহারা ভগবানের বিশেষ কৃপাতে এই দৃঢ়তারূপ সম্পদ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনকেই নিরাপদ মনে হয়।

শ্রীগ।

সংবাদ।

বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ হাবড়ার সন্নিহিত ব্যাটরাপল্লীতে প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরকালী দাসের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী শান্তশীলার সঙ্গে কাঁথি নিবাসী শ্রীমান্ বিপিন বিহারী সাসমলের শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর বয়স ১৫ বৎসর, পাত্রের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ২৫ বৎসর। ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য ও পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেক বন্ধু বান্ধব তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবদম্পতীকে পুণ্য প্রেমেতে ভূষিত করিয়া তাঁহার পদাশ্রিত করিয়া রাখুন।

বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ অনাথাশ্রমে ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের পালিতা অনাথা কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদা সুন্দরীর সঙ্গে, ময়মনসিংহ-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারী কান্ত চন্দের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুরেশ চন্দ্র চন্দের শুভ বিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর, পাত্রের বয়স ন্যূনাধিক ২২ বৎসর। ভাই অমৃত লাল বসু উপাচার্য্যের ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরম জননী নবদম্পতীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের নব কুমারীর জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত রবিবার চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক শ্রীমান্ বেণীমাধব দাসের দ্বিতীয় কুমারের শুভ নামকরণক্রিয়া কুমারের মাতামহ শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে, উপাধ্যায় তাহাকে নির্ম্মলচন্দ্র নাম প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবকুমারকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৪শে মে) মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে বর্দ্ধমান প্রার্থনাসমাজগৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। প্রেমাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল সিংহ উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার সপরিবারে হাজারিবাগে প্রায় এক মাস কাল অবস্থান পূর্ব্বক তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পাদন ও প্রতিদিন উপাসনা কীর্ত্তন বা সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়া লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী দ্বারা তত্রত্য ভদ্র পরিবার মধ্যে অনেক কার্য্য হইয়াছে।

বগুড়া হইতে শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ লিখিয়াছেন;— "জলপাইগুড়ি ও ফলবাড়ী হইয়া আমি এখানে আসিয়াছি। এখানে আজ কাল ও পরশু তিন দিন সাংবৎসরিক উৎসব। গত কল্য সায়ংকালে সমাজগৃহে প্রস্তুতির জন্য উপাসনা হইয়াছে, আজ প্রাতেও সমাজ ঘরে উপাসনা হইয়াছে। বৈকালে বক্তৃতা হইবে। কাল সমস্ত দিন উৎসব। পরশু দুই বেলা উপাসনা হইবে। বুধবার এস্থান ছাড়িয়া বৃহস্পতি বার কলিকাতা পৌছিতে পারি।"

ভাগলপুরস্থ শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পৃষ্ঠদেশে দুইটি বৃহৎ বিষাক্ত স্ফোটক (কার্ব্বাঙ্কোল) হওয়াতে ২০।২৫ দিন যাবৎ নিরতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন। তিনি তত্রত্য সিবিল সার্জ্জনের চিকিৎসাধীনে আছেন। উভয় স্ফোট-কেই অস্ত্র হইয়াছে। আমরা তাঁহার সঙ্কট পীড়ায় অতিশয় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন ছিলাম। শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, এক্ষণ রোগের কিঞ্চিৎ উপশম, তিনি অচিরে আরোগ্যলাভ করিবেন এরূপ আশা হইতেছে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত মধুমিয়া কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ত্রিত্ত্বনাশক" শীর্ষক পুস্তিকার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা খ্রীষ্টবাদীদিগের ত্রিত্ত্ববাদের বিরুদ্ধে এবং তাঁহাদের খ্রীষ্টসম্বন্ধীয় অন্য অন্য কতকগুলি আপত্তিজনক মতের বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছে। মোসলমান বন্ধুদিগের মধ্যে এক্ষণ অনেকে বঙ্গভাষায় সুলেখক হইয়াছেন। মত খণ্ডন করিতে যাইয়া লেখক এই পুস্তিকার অনেক স্থানে অতিশয় ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন, তাহা না করিয়া গম্ভীর ভাবে অসত্য খণ্ডন করিলে ভাল হইত। স্থানে স্থানে কিছু রুচিবিরুদ্ধ লেখা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমন্বয়ভাষ্য।

☞এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা আষাঢ় মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪৩ভাগ। ১২ সংখ্যা।	১৬ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৮২১ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন, আমাদের পদস্খলন নিবারণ করিবার জন্য তুমি যে সকল বিধি আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়াছ, সে সকল বিধির প্রতি যদি আমরা যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন যে নিরাপদ হয়, জীবনে ইহার প্রমাণ আমরা অনেকবার পাইয়াছি। প্রমাণ পাইয়াও যদি তোমার বিধি বিস্মৃত হই, তৎপ্রতি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে কেবল বিধিভঙ্গের জন্য পাপ হইল তাহা নহে, আমাদের জীবন সর্ব্বথা বিপৎসঙ্কুল হইল। আমরা যদি বিধি সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমা হইতে না পাইতাম, তোমার নিজ মুখে তোমার বিধির কথা না শুনিতাম, তাহা হইলে গ্রহণ করা না করা, মানা না মানা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। যে বিধি তুমি আপন মুখে বলিয়াছ, আমরা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তৎপ্রতি এখন যদি আমরা অবিশ্বাস করি, তাহা হইলে বল আমরা ক্ষমার পাত্র হইব কি প্রকারে? আমরা নিজবলে বিধি পালন করিতে পারি না সত্য, কিন্তু আমাদের যত দূর সামর্থ্য তত দূর যদি আমরা যত্ন করি, তাহা হইলে তুমি কেবল আমাদিগকে নিরাপরাধ গণ্য করিবে তাহা নহে, তুমি আপনি বল দিয়া আমাদের যত্ন সফল করিবে। হে কৃপানিধান, যদি তোমা হইতে নিয়ত বললাভে আমাদের বাসনা থাকে, তাহা হইলে তোমার বিধিপালন আমাদের পক্ষে যে অতীব প্রয়োজন। তোমার বিধি ও তোমার ইচ্ছা একই। যে তোমার বিধি প্রতিপালন করিল না, সে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিল; যে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিল, সে তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে টুকু বল ছিল তাহাও হারাইল, সংসারক্ষেত্রে সংগ্রামে সে কি প্রকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে? আমরা যখনই প্রবৃত্তি বাসনার নিকটে পরাজিত হই, তখনই দেখিতে পাই, তোমার বিধি ভঙ্গ করিয়া দুর্ব্বল হইয়াছিলাম, তাই প্রবৃত্তি আমাদের উপরে বল প্রকাশ করিয়াছে। হে নাথ, জীবন খাটি রাখিতে হইলে তোমার বিধি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন; এজন্য প্রার্থনা করিতেছি, যেন কখন আমাদের জীবনে বিধির প্রতি অনাদর প্রকাশ না পায়। বিধির প্রতি অনাদরে জীবনে কি কুফল সমুৎপন্ন হয়, অনেকের জীবনে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে সকল কুফল দেখিয়াও যদি আমরা

সাবধান না হই, তাহা হইলে আমাদের তুল্য বোধশূন্য বল আর কে আছে? সকল প্রকার কুবুদ্ধি ও কুমতি ছাড়িয়া আমরা তোমার বিধির অনুগত হইব, এই আশা করিয়া বিনীত ভাবে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

নরনারীর সহিত সম্বন্ধ।

সংসারে বিবিধ প্রকারের সম্বন্ধে নরনারী পরস্পর সম্বদ্ধ। এ সমুদায় সম্বন্ধের মূল কি, স্থির হইলে স্বভাবতঃ আমরা সকল নরনারীর সহিত কিরূপ সম্বন্ধ নিয়ত রক্ষা করিব, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসরণে সাধন করিতে পারি। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বে আমরা সমুদায় নরনারীর সহিত ভ্রাতা ও ভগিনীসম্বন্ধে আবদ্ধ, ইহা সাধারণ সম্বন্ধ। মানুষ কেবল এক সাধারণ সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই; নিকটস্থ নরনারী সহ ঘনিষ্ঠতা অনুসারে তাহাদিগের বিশেষ সম্বন্ধ হইবেই হইবে। এ সম্বন্ধ নরনারীর পিতৃত্বমাতৃত্বমূলক। ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর মাতা, তাঁহার সম্বন্ধে সকলেই আমরা ভাই ও ভগিনী; কিন্তু নর ও নারীর মধ্যেও পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব প্রথম হইতে নিহিত আছে, যথাসময় তাহা প্রস্ফুটিত হয়। এই পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব বিশেষ সম্বন্ধ। মানবের পিতৃত্ব ও মানবীর মাতৃত্ব, এ দুই হইতে আবার ভ্রাতৃত্ব ও ভগিনীত্ব সম্বন্ধ সমুৎপন্ন হইয়া সহোদর সহোদরা সম্বন্ধ সংসৃষ্ট হইয়া থাকে। মানবপরিবারের যতগুলি সম্বন্ধ এই পিতৃত্ব- ও মাতৃত্ব-মূলক; বিশেষ সম্বন্ধ সাধন করিতে হইলে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বকে মূল করিয়া সাধন করা প্রয়োজন যত দিন কোন নর ও নারীতে পিতৃভাব ও মাতৃভাব বিকাশ লাভ করে নাই, তত দিন ঈশ্বরের পিতৃত্ব- ও মাতৃত্ব-মূলক ভ্রাতা ও ভগিনীসম্বন্ধে তাঁহারা সম্বদ্ধ থাকিবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। ভ্রাতা ও ভগিনীসম্বন্ধোচিত স্নেহ ও প্রীতি, আদর ও সম্ভ্রম, শুদ্ধতা ও সারল্য সকলই থাকা প্রয়োজন। ঈশ্বরের বিশেষ নির্দ্দেশে প্ররোচিত হইয়া যত দিন তাঁহারা অন্তর্নিহিত পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব প্রস্ফুটিত হইবার উপযোগী সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইতেছেন, তত দিন ভ্রাতৃত্ব ও ভগিনীত্ব সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে ইহা কখনও মনে করা উচিত নহে যে, পূর্ব্ব সম্বন্ধ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। যথার্থ কথা এই, তন্মধ্যে যে সকল উপাদান ছিল, সেই সকল উপাদানের উপরেই নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সেই স্নেহ ও প্রীতি, আদর ও সম্ভ্রম, শুদ্ধতা ও সারল্য এ নূতন সম্বন্ধেও যেমন তেমনই অক্ষুণ্ণ থাকে, বিশেষ সম্বন্ধ জন্য যে বিশেষ ব্যবহার উপস্থিত হয়, উহাই চিরদিন উহাকে বিশেষ করিয়া রাখে।

পিতা এক মাতা এক, ইহাঁরা কখন দুই হইতে পারেন না। পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রস্ফুটিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ঈশ্বরকর্ত্তৃক যাঁহারা একত্র মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এই একত্ব চির দিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়, প্রকৃতির অখণ্ড নিয়ম। এ নিয়মের উচ্ছেদসাধনে যাহারা প্রবৃত্ত হয়, তাহারা জনসমাজের ভিত্তির মূলোচ্ছেদ করে, এবং বিবিধ অকল্যাণ ও পাপ আনিয়া পারিবারিক সুখশান্তির বিনাশ সাধন করিয়া থাকে, তাহারা যে পাপ ও দুঃখ আনয়ন করে, তাহা তাহাদিগের নিজ জীবনেই শেষ হয় না, বংশানুক্রমে উহা প্রবাহিত হইয়া অনেক পরিবারের পাপ ও দুঃখের কারণ হয়। পিতৃত্বমাতৃত্ববিকাশোচিত সম্বন্ধে আবদ্ধ নরনারী যদি ঈশ্বরাভিপ্রেত অনন্যভাবাপন্নতা রক্ষা না করেন, তাঁহাদের একত্বমূলক বিশেষ সম্বন্ধ রক্ষা না পাইয়া যদি দ্বিচারিত্ব তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিতে সেই ভাব প্রকাশ পাইবে, এবং সকল প্রকার বিদ্যা বুদ্ধি শিক্ষা অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের সন্তান সন্ততি শিথিলচরিত্রতা প্রকাশ করিবে। বরং বিদ্যা বুদ্ধির প্রাখর্য্যে চরিত্রশৈথিল্য যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া

নবীন তান্ত্রিক মত উদ্ভাবন করিবে। এদেশের তান্ত্রিক মত অতি স্থূল; সুতরাং অনেকে উহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য তান্ত্রিক মত সূক্ষ্ম এবং 'মুক্ত প্রেম' নামে অভিহিত। পাশ্চাত্য প্রদেশে এই সূক্ষ্ম তান্ত্রিকতা অনেক পরিবারের কুশল কল্যাণ বিনষ্ট করিয়াছে, এদেশেও সেই সূক্ষ্ম তান্ত্রিকতা দেশসংস্কারাভিমানী কৃতবিদ্য-মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতেছে, যথাসময় সাবধান না হইলে তদ্দ্বারা ভারতের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিবে।

পিতৃমাতৃসম্বন্ধ একত্বমূলক, ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দ্বিমাতা দ্বিপিতা ইহা প্রকৃতিতে অসম্ভব। যদি অসম্ভব হইল, তাহা হইলে সে একত্বের মূল যাহাতে শিথিল হইয়া না যায়, প্রীতির স্থলে ঘৃণা বিদ্বেষ ও অন্তর্জ্বালা আসিয়া উপস্থিত না হয়, বংশমধ্যে নীতিশৈথিল্য প্রবেশ না করে, শান্তি ও কল্যাণের মূল উচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, এজন্য সকলেরই প্রাণগত যত্ন করা প্রয়োজন। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ তান্ত্রিকতাই একান্ত ঘৃণ্য ও বিষবৎ পরিহার্য্য। পশুত্ব চিরকালই পতিপত্নীসম্বন্ধের নিত্যত্বের বিরোধী। ইহার কারণ এই, যেখানে এই সম্বন্ধ-অধ্যাত্মভূমিতে স্থাপিত হয় নাই, সেখানে পশুত্বের সাম্রাজ্য। পশুত্বের স্বভাব এই যে, উহা শীঘ্রই নূতনত্ব হরণ করে, এবং নূতনত্ব চলিয়া গেলেই সম্বন্ধের মাধুর্য্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে। অন্তর্হিত হয়। পশুত্বের এখানেই নিবৃত্তি নাই, উহা একত্বের বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে চায় না। এই পশুত্বকে বিদ্যাবত্তার আবরণে আবৃত করিয়া অনেক পাশ্চাত্য এবং তাঁহাদের এদেশীয় অনুবর্ত্তিগণ বলিয়া থাকেন, যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নরনারী পরিণয়-বন্ধনে বদ্ধ হন, চরিত্রের বৈষম্যবশতঃ যদি সেই উন্নতিই না হইল, তাহা হইলে অন্যত্র হইতে সে সম্বন্ধে সাহায্যগ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য। এ জন্য যদি পূর্ব্বপরিণয়বন্ধন কাটিয়া ফেলা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এখানে আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা তোলা যে ভাণমাত্র, ইহা অল্প একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হয়। যথেচ্ছ ব্যবহার নহে, কিন্তু ধৈর্য্য,সহিষ্ণুতা,পরীক্ষাবহন আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। তুমি ধীর হইতে পারিলে না, সহিষ্ণু হইতে পারিলে না, পরীক্ষা বহন করিতে সমর্থ হইলে না, বল তুমি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিবে কি প্রকারে? তুমি বোঝ আর না বোঝ, তুমি আপনার সহভাগিনীকে উপেক্ষা করিয়া অন্যত্র যখন পতিপত্নীর বিশেষ সম্বন্ধোচিত ভাব সংগ্রহে ব্যগ্র, তখন আত্মা নহে পশু তোমায় বিপথে লইয়া গিয়াছে।

তবে কি পৃথিবীতে সদ্‌গুণের আদর হইবে না? অন্যত্র যাহা পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতে হইবে? কে বলিল নরনারী অন্যত্র হইতে সদ্‌গুণ গ্রহণ করিবেন না, শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিবেন না! নরনারীর উভয়ের সম্বন্ধবশতঃ যে প্রচ্ছন্ন পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে,সেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বমধ্যে কি সকল প্রকারের সম্বন্ধ নাই? পিতা মাতার ভিতরে সখ্য, শিক্ষকত্ব, নেতৃত্ব প্রভৃতি কোন্ সম্বন্ধের অভাব আছে? এই পিতৃত্ব- ও মাতৃত্ব-সম্বন্ধ যদি প্রতিনরনারীর ভিতরে প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে সেই সম্বন্ধে আবদ্ধচিত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সদ্‌গুণগ্রহণ, শিক্ষণীয় বিষয়ের শিক্ষা করা কি আর অসম্ভব হয়? মধুরত্বে, কোমলত্বে পিতৃ-মাতৃ-সম্বন্ধ কি কোন অংশে ন্যূন? আজ পর্য্যন্ত পৃথিবী পিতৃমাতৃসম্বন্ধের মর্য্যাদা বোঝে নাই। পৃথিবী পশুত্ব পরিহার না করিলে এ মর্য্যাদা বুঝিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা সাধনে পরিণতবয়স্ক হইয়াছেন, তাঁহারা পিতৃমাতৃ-সম্বন্ধকে সর্ব্বোপরি স্থান দান না করিয়া থাকিতে পারেন না। নারীমাত্রে তাঁহাদের নিকটে মাতৃ-বেশে আসিয়া উপস্থিত হন। ভোগপ্রসক্ত পুত্রগণ মাতার মর্য্যাদা বোঝে না, মাতার কোমল প্রশান্ত মূর্ত্তি তাহাদের নিকটে ভাবরাজ্যের দ্বার খুলিয়া দেয় না, তাই তাহারা ভোগাসক্তা নারী-গণের আলাপ সম্ভাষণ সমধিক আদর করে। সকল নারীকে মাতৃদৃষ্টিতে দেখ, দেখিবে তোমার

হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, যাহা পত্নীর নিকটে পাও নাই, পাইবে আশা কর নাই, তাহা সকলই তুমি লাভ করিবে। আমরা নিজ জীবনে পরীক্ষা করিয়া এ সকল কথা বলিতেছি, সুতরাং কোন প্রকার কুযুক্তিজাল যে আমাদের বিশ্বাস-ভূমিকে আন্দোলিত করিয়া দিবে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

এ দেশের সংস্কারাভিমানিগণের মধ্যে পাশ্চাত্য সূক্ষ্ম তান্ত্রিকতার প্রবেশ দেখিয়াই আমরা এ সম্বন্ধে আজ এত গুলি কথা বলিলাম। এই সূক্ষ্ম তান্ত্রিক মত আমরা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়া লিখিতে কুণ্ঠিত, তাই আমাদিগকে আভাসে তাহার উল্লেখ করিয়া আমাদিগের পরীক্ষিত সাধনের পথ লিখিতে হইল। পুরুষগণ মাতৃ-দৃষ্টিতে নারীগণকে, নারীগণ পিতৃদৃষ্টিতে পুরুষ-গণকে দেখিবেন, এ দেশের সাধকগণ এ পন্থা প্রাচীন কাল হইতে অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। সূক্ষ্মতান্ত্রিকপথাবলম্বিগণ এই প্রণালী প্রাচীন বলিয়া উপহাস করেন এবং তাঁহাদের নবীন তান্ত্রিকতা মানবজাতির উন্নতির উচ্চ ভূমিতে স্থাপিত বলিয়া অভিমান প্রকাশ করেন। সকল সম্বন্ধের মূল মাতৃ পিতৃসম্বন্ধের মর্য্যাদা নিগূঢ় পশু ভাবের জন্য আজও পৃথিবী বুঝিতে পারে নাই। পিতৃমাতৃসম্বন্ধ কেবল সকল সম্বন্ধের মূল নহে, ইহা হইতে মানবজীবনের উপযোগী সকল উপা-দান লাভ করা যায়। যাঁহারা পরিণয়বন্ধনে বদ্ধ, তাঁহারা পিতামাতা এবং যে পরিমাণে পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব তাঁহাদিগের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই পরিমাণে তাঁহারা সদ্‌গুণের আধার। যাঁহারা সাধনাদ্বারা এ সম্বন্ধের মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন তাঁহারাই কেবল সাহসের সহিত বলিতে পারেন, এই সম্বন্ধ-সাধন দ্বারা সকল প্রকারের পাপ, অপবিত্রতা ও অকল্যাণের দ্বার অবরুদ্ধ এবং জীবনে বিবিধ সদ্‌গুণের সঞ্চার হয়।

আমাদের অভিমান করিবার কি কিছু আছে ?

অভিমানের তুল্য ধর্ম্মজীবনবিনাশক কীট আর নাই, অথচ ধর্ম্মজীবন সর্ব্বথা অভিমানশূন্য অতি বিরল। বরং অন্যান্য বিষয়ের অভিমান সহজে পরাজিত হইতে পারে, ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধীয় অভিমান পরাজিত হওয়া বড়ই কঠিন। যে ধর্ম্ম আমাদিগের দোষ দৌর্ব্বল্য দেখাইয়া দিয়া উহার প্রতীকারের উপায় করিয়া দেয়, সেই ধর্ম্মেই যদি অভিমান প্রবেশ করে, তাহা হইলে প্রতীকারের আশা থাকিল না। আমি সাধন ভজন করিতেছি, সাধন ভজনের ফলে আমি দিন দিন উন্নত হই-তেছি, কত তত্ত্ব কত সত্য আমি লাভ করিয়াছি; অন্য লোকে সাধন ভজনে বিমুখ, প্রবৃত্তি বাসনার অধীন, তত্ত্বজ্ঞানহীন, এই সকল যতই মনে ভাবি, ততই অভিমান পরিপুষ্ট হয়, এবং আমরা দিন দিন আত্মসম্বন্ধে অন্ধ হইয়া পড়ি। পরিশেষে এত দূর হয় যে, পৃথিবীতে আর আত্মতুল্য লোক দেখিতে পাই না, আদর সম্ভ্রম করিবার উপযুক্ত এক জনও চক্ষে পড়ে না, আমি ভিন্ন আর সকলেই পথভ্রষ্ট, শাসনের যোগ্য।

এক অভিমান যখন আমাদিগকে এত দূর অন্ধ করিয়া ফেলে, তখন ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, আমাদের বাস্তবিক অভিমান করিবার কিছু আছে কি না? যাহা সত্য নয়, তাহা আশ্রয় করিলেই আমাদের অসদ্গতি হয়। আমাদের জীবন যদি সাধনভজনপ্রধান হয়, তাহা হইলে যদি আমরা মনে করি আমরা সাধন ভজন করি, তাহাতে কি আর অসত্য আশ্রয় করা হয়? বাহ্যে দেখিতে অসত্য নয় বলিয়া মনে হয়, এজন্যই অনেকের সাধন ভজনে অভিমান জন্মে, কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিলে সহজে বুঝা যায়, প্রকৃত সাধন ভজন পুরুষযত্নসাধ্য নয়, উহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবৎকৃপা। মানুষের জন্ম ও বৃদ্ধি যেমন নিয়মাধীন, আত্মার জন্ম ও বৃদ্ধিও

তেমনি নিয়মাধীন। নিয়মের বিপরীতে যদি আমরা যত্ন করি, যত্ন সফল না হইয়া বিপরীত ফল ফলে। নিয়মের অর্থ ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছা। সেই প্রকাশিত ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা যাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করা হইল তাঁহারই অনুগ্রহসম্ভূত, সুতরাং এখানে আত্মাভিমান করিবার কারণ কি আছে? কেন, আমি যে নিয়মাধীন হইয়া যত্ন করিলাম, ইহা তো সত্য? কয় জন এসম্বন্ধে নিয়মাধীন হইয়া যত্ন করিয়া থাকে? হাঁ তুমি নিয়মাধীন হইয়া চলিতেছ, অন্যে চলে না। অন্যে চলে না তুমি চল, ইহাতে অভিমান করিবার কি আছে? তুমি স্বাস্থ্যের নিয়ম মানিয়া চল, এজন্য তুমি সুস্থ, অন্যে স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া রোগযাতনার অধীন হয়, ইহাতে কি তুমি প্রশংসা পাইবার যোগ্য? তোমার চক্ষু আছে, আর এক জন জন্মান্ধ, ইহাতে যেমন তোমার গর্ব্ব করিবার কারণ নাই, তেমনি জানিও এখানেও গর্ব্ব করিবার কারণ নাই। তুমি দেখ না তাই জান না যে, তোমার ভিতরে থাকিয়া এক জন তোমায় অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে, সোপান হইতে সোপানান্তরে লইয়া যাইতেছেন, তাই তুমি সাধনভজনে প্রবৃত্তিমান্। যদি সেই লুক্কায়িত হাত তুমি দেখিতে, তুমি অভিমানী হইবে দূরের কথা, তুমি লজ্জায় অধোবদন হইতে।

তুমি বলিবে আমি যদি কিছুই না হইলাম, তাহা হইলে আমি স্বাধীন জীব হইলাম কোথায়? তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা যখন অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে এক হইয়া যায়, তখন তোমার ইচ্ছার শক্তি বাড়ে বল বাড়ে, সামর্থ্য বাড়ে। তখন তুমি এমনই প্রভাবশালী হও যে, প্রবৃত্তি, বাসনা, পৃথিবীর দুঃখ কিছুতেই তোমাকে টলাইতে পারে না। এই অবস্থাতে তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা। তোমার ক্ষুদ্র ইচ্ছা একাকী নিতান্ত অসহায়, কোন একটী প্রবল বাসনা তোমায় অনায়াসে পরাজয় করিয়া ফেলে। তোমার পৃষ্ঠবলের প্রয়োজন, পৃষ্ঠবলের প্রয়োজন বলিয়া তুমি অস্বাধীন কেন মনে করিবে? তুমি যাঁহার নিকটে বল লাভ করিয়া স্বাধীন হইয়া জীবনপথে দিন দিন অগ্রসর হইতেছ, তাঁহার প্রতি তোমার কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সমুচিত তাহা নহে, সকল গৌরব তাঁহাকেই অর্পণ করা তোমার পক্ষে সমুচিত। তাহা না করিয়া তুমি যখন সকল গৌরব আপনার উপরে লইতে প্রস্তুত, তখন তুমি অসত্য আশ্রয় করিয়াছ ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে। তুমি অসত্য আশ্রয় করিয়াছ বলিয়াই তোমার আত্মা অভিমানরূপ মহারোগগ্রস্ত হইয়াছে। এ রোগ থাকিতে মনে করিও না, তুমি অধ্যাত্মরাজ্যের সুখসৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে।

সাধনভজনবিষয়ে যেমন, অন্য সমুদায় বিষয়েও তেমনি অভিমান করিবার আমাদের কারণ নাই। আমরা পরের জন্য সমগ্র জীবন দি কাহার অনুরোধে? এরূপে জীবনদানে আমাদের আনন্দ হয়, না ক্লেশ হয়? যদি অন্য কোন মানুষের অনুরোধে পরার্থ জীবন না দিয়া থাকি, নিজের ইচ্ছায় নয়, কোন মহত্তর ইচ্ছার প্রভাবে পরের জন্য শোণিতপাত করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি জীবন দিয়া পরের উপকার করিয়াছি, তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য, উপকার পাইয়া তাহা স্বীকার করা দূরে তাহারা তদ্বিপরীতে আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, অতএব তাহারা অভিশাপের যোগ্য ইত্যাদি ভাব মনে পোষণ করিয়া অপরের নিকট সম্মান গৌরব পাইবার জন্য অধিকার স্থাপন, ইহা কেবল নীচহৃদয়ের কার্য্য তাহা নহে, সম্পূর্ণ ধর্ম্ম ও সত্যবিরোধী, আত্মাভিমান ইহার মূল। যদি তুমি কৃতজ্ঞতার ভিখারী হইয়া অথবা অন্য কোন প্রকার বিনিময়ের প্রত্যাশায় পরোপকার ব্রতগ্রহণ করিয়া থাক, আর বাহিরে নিস্বার্থভাব দেখাইয়া থাক, তুমি কপটাচারী, তুমি এজন্য দণ্ডভাজন হইবার যোগ্য, তুমি আবার কৃতজ্ঞতা চাও কি প্রকারে?

তুমি বলিবে যাহারা উপকৃত হইয়াছে, তাহারা কৃতজ্ঞ না হইলে তাহাদের ঘোর অপরাধ হয়, এজন্যই আমি তাহারা কৃতজ্ঞতা না দিলে ক্ষুব্ধ; আমি

কি আর কৃতজ্ঞতার ভিখারী? উপকৃত ব্যক্তির কৃতজ্ঞ হওয়া সমুচিত, এই নৈতিক বিধির দোহাই দিয়া আপনার অধিকার সাব্যস্ত করিতেছ, ইহাতে তোমার নীচতাই প্রকাশ পাইতেছে। তুমি কি জান না যাঁহারা পরার্থ জীবন দেন, যাহাদের জন্য তাঁহারা জীবন দেন তাহাদের নিকটে তাঁহারা অবমানিত, তিরস্কৃত ও ঘৃণিত হইয়া থাকেন। মনে হয়, প্রকৃত নিস্বার্থভাবে তাঁহারা পরের উপকারসাধনে প্রবৃত্ত কি না, ইহা দেখিবার জন্যই যেন পৃথিবী তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করে। যাহাদের প্রকৃত নিস্বার্থ ভাব নাই, তাহারা এ পরীক্ষায় দাঁড়াইতে পারে না,আর যাঁহাদের নিস্বার্থভাব আছে, তাঁহারা যাহাদের কর্ত্তৃক অত্যাচরিত হন,তাহাদিগের বিমূঢ়তা দেখিয়া রোদন করেন, এবং অভিশাপ দেওয়া দূরে তাহাদের জন্য অনবরত প্রার্থনা করেন। স্বার্থের প্ররোচনায় যাহারা উপকারসাধনে প্রবৃত্ত, তাহাদের সে স্বার্থ চরিতার্থ না হইলে অভিশাপ বর্ষণ করে, আর যাঁহারা লোকের কল্যাণ ভিন্ন আর কিছুর আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, তাঁহারা কেবলই তাহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। স্বার্থান্বেষী ও স্বার্থবিমুক্ত এ উভয়ের মধ্যে এত পার্থক্য উপস্থিত হয় কেন? এক জন আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, আর একজন সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ করিয়াছেন। যিনি আত্মত্যাগী তিনি আপনাকে ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের হইয়াছেন, সুতরাং তিনি কাহারও নিকটে কৃতজ্ঞতা, সম্ভ্রম বা গৌরব ভিক্ষা করেন না, এক ঈশ্বরের অনুমোদনই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি কোন বিষয়ে গৌরব চান না, কেন না তিনি জানেন সত্যতঃ গৌরব ঈশ্বরেরই প্রাপ্য। তিনি আপনার ভিতরে এমন কিছু দেখিতে পান না, যাহার জন্য তাঁহার অভিমান করিবার কিছু আছে। যিনি আপনার সম্বন্ধে এইরূপ ভাবেন, তিনি অভিমানপরবশ ব্যক্তিগণ হইতে স্বতন্ত্র হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। দেখ বিবেক, আমি ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য একটি উপায় অবলম্বন করিয়াছি, সে উপায়সম্বন্ধে তোমার মত কি জানিতে চাই। কোন একটি বিষয় ঈশ্বরের অভিপ্রায়সিদ্ধ কি না, ইহা বুঝিবার জন্য আমি ঘটনার পর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, দুটী ঘটনায় মন সন্তুষ্ট না হয়, পাঁচটি ঘটনা পাঠ করি, এইরূপে ঘটনার পর ঘটনা, ঘটনার পর ঘটনা পাঠ করি। এ উপায় কি মন্দ?

বিবেক। ঘটনার দ্বারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় স্থির করা কিছু মন্দ নয়, কিন্তু যদি তোমার ভিতরে ঈশ্বরের অভিপ্রায়সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে তুমি সহস্র ঘটনা পাঠ করিয়াও কোন্‌টি ঈশ্বরের অভিপ্রেত তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিবে না। সাধকেরা ঘটনা পাঠ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা একটী দুইটী ঘটনাতেই অভিপ্রায় ধরিয়া ফেলেন। তুমি মনে করিতে পার, তাঁহাদের ধৈর্য্য নাই, তাই হঠাৎ ‘এইটি ভগবানের অভিপ্রেত’ বলিয়া মনকে তাঁহারা প্রবোধ দেন। তুমি এরূপ মনে করিও না। ঘটনা সকল অচেতন, তাহারা কিছুই বলে না, আমরাই তাহার অর্থ করিয়া লই। যেখানে কেবল বিচার, সেখানে ঘটনা কিছুই বলিয়া দেয় না, ঘটনার পর ঘটনা চলিতে থাকে, বিচারে কেবল সংশয়ই বাড়িতে থাকে। যদি অন্তরে যথাসময়ে আলোক লাভ না হয়, তাহা হইলে ঘটনা আর তোমায় কি বুঝাইয়া দিবে? তুমি একটা ঘটনা দশ প্রকারে বুঝিতে পার, তাহাতে তোমার স্থিরবিশ্বাসে পঁহুছিবার উপায় হইল কৈ? ঘটনায় মন উদ্বুদ্ধ হইল, এখন ভগবানের নিকটে যাও, তিনি উহার অভিপ্রায় তোমায় বুঝাইয়া দিবেন, আর তোমায় ক্রমান্বয়ে ঘটনার পর ঘটনা অন্বেষণ করিতে হইবে না। জানিও, ঈশ্বরের আলোকেই মনের অন্ধকার ঘোচে, ঘটনা কেবল একটা অবলম্বনমাত্র।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহা মানি, কেন না এক একটা বিষয় এমনই জটিল আছে যে, ক্রমান্বয়ে ঘটনা পাঠ করিয়াও কোন একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায় না। এস্থলে অনেক সময় তটস্থ হইয়া থাকিতে হয়। বল, এরূপ অবস্থায় আলোক আসিয়া সকল সংশয় ছেদ করিয়া দেয় না কেন?

বিবেক। বুদ্ধি, তুমি আপনি ঘটনা পাঠ [illegible] য়া বুঝিবে, এই অভিমান করিয়া ক্রমান্বয়ে যত্ন করিতে [illegible] তাই এরূপ দুর্ভোগ তোমায় ভুগিতে হয়। তুমি যদি [illegible] এ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আলোকের ভিখারী হ[illegible] হইলে একটা দুইটী ঘটনাই যথেষ্ট হয়, ঘটনার পর ঘটনার [illegible] থাকিতে হয় না। আশা করি, ভবিষ্যতে সকল অভিমান [illegible] রিয়া আলোকের প্রার্থী হইবে, ঘটনার পর ঘটনা প[illegible] বুঝিয়া লইব,

এরূপ অভিমান মন হইতে বিদায় করিয়া দিবে। তুমি কি জান না,আমার সহযোগী বিজ্ঞান অন্তরে লব্ধ আলোক দ্বারা ঘটনা-সমূহ এক সূত্রে বান্ধিয়া নূতন আবিষ্কার করিয়া থাকেন? সূত্র না পাইলে বিচ্ছিন্ন ঘটনা কি দিয়া বান্ধিয়া তন্নিহিত অভিপ্রায় তুমি পাঠ করিবে? আজ এই পর্য্যন্ত।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

পাখী প্রত্যর্পণ।

১৬ই চৈত্র, রবিবার, ১৮১৮ শক।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এক দেহে দুই পাখী বেদান্ত বর্ণন করেন। আর কিছুর সঙ্গে তুলনা না করিয়া পাখীর সঙ্গে বেদান্ত উভয়কে তুলনা করিলেন কেন? পাখী খেচর ভূচর নহে; জীবাত্মা ও পরমাত্মা খেচর, কখন ভূমি স্পর্শ করেন না, চিদাকাশে ইহাদের আবাস। জীবাত্মা শরীরে থাকিয়াও শরীরস্থ নহে, পরমাত্মা জীবশরীরের নিয়ামক হইয়াও উহার অতীত। পাখীর সঙ্গে উপমা না দিলে এ ভাব প্রকাশ পায় না, তাই বেদান্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে দুই পাখী বলিয়া বর্ণন করিলেন। কেশবচন্দ্র পাখী ভাল বাসিতেন, বেদান্তের উপমা তাঁহার মনে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, তিনি সর্ব্বদাই পাখীর সঙ্গে আত্মার তুলনা দিতেন। পাখী উড়ান সর্ব্বত্র একটি কুতূহলের ব্যাপার। এই কুতূহলের ব্যাপারটিকে কেশবচন্দ্র 'আমি' উড়াইয়া দেওয়ার জন্য উপমাস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মা দেহে আছে, অথচ তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? যদি দেহে থাকিয়া আত্মা দেহে বদ্ধ থাকিত, দেহের উপাদান যদি তাহার উপাদান হইত, দেহ ধ্বংসে যদি তাহার ধ্বংস হইত, তাহা হইলে পাখী উড়ানের কথা তাহাতে কখন সংলগ্ন হইত না। কিন্তু দেহ ভগ্ন হইলেও যখন তাহার কিছু হয় না, দেহে থাকিয়াও যখন সে দেহের অতীত, তখন দেহে থাকিতে তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া, ইহা আর একটা অসম্ভব কথা কি? সে থাকে কোথায়? দেহে, না চিদাকাশে? চিদাকাশে তাহার নিয়ত বাস, তাহার উড়িবার আকাশ স্বয়ং চিন্ময় ঈশ্বর। সে যত উড়ে আরো উড়ে, উড়া আর তার শেষ হয় না। দেহ পিঞ্জর, আর আত্মা পাখী; পিঞ্জর হইতে এক দিন সে পলায়ন করিবে। পালাইবার পূর্ব্বেও পিঞ্জরে থাকিয়াও পিঞ্জর অতিক্রম করিয়া চিদাকাশে ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে উঠিবার তার অধিকার আছে, এই অধিকার যোগপ্রণালীতে প্রকাশ পায়; যোগিগণের মধ্যে যোগের এজন্যই এত সমাদর। পিঞ্জরে থাকিয়াও পিঞ্জর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উড়িবার যদি তাহার স্বাভাবিক অধিকার থাকে, তবে তাহা সকল মানুষে কেন প্রকাশ পায় না, ইহার জন্য বিশেষ প্রয়াস কেন পাইতে হয়, ইহা বিচার করিয়া দেখা সমুচিত।

পিঞ্জরের পাখী অনেক দিন পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া, সংসারের কদর্য্য বস্তু ভোজন করিয়া তাহার পক্ষপুটের শক্তি হারাইয়াছে। সংসারের কাদা মাটী ভোজন করিয়া সে এখন নিতান্ত দুর্ব্বল, বিশেষতঃ বিষাক্ত বস্তু পান ভোজন করিয়া সে একান্ত রোগাক্রান্ত। সে উড়িতে চায় উড়িতে পারে না, পক্ষপুট ঝাপ্‌টাইয়া নীচে পড়িয়া যায়। যখন সংসারে তীব্র যাতনা সে পায়, পাপযন্ত্রণা অসহ্য হইয়া পড়ে, তখন আর সে পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিতে চায় না, চিদাকাশে উড়িবার জন্য তাহার বাসনা হয়। কিন্তু সাধ্য কি? পৃথিবীর পচা কীট, কাদা মাটী খাইয়া সে যে উড়িবার শক্তি হারাইয়াছে, তাহার যে আর পক্ষপুটে বল নাই, সে ইচ্ছা করিলেই কি আর উড়িতে পারে? এখন পাখী নিরুপায়। কে তাহার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিবে? প্রবৃত্তি বাসনা সমুদায় তাহাকে শতবন্ধনে বান্ধিয়াছে। একে রোগাক্রান্ত, দুর্ব্বল, তার উপরে পক্ষপুট বন্ধনে বদ্ধ, সে উড়িবে কি প্রকারে? এ অবস্থায় পাখী চিরদিন থাকিতে পারে না। হয় মৃত্যু, নয় মুক্তি, এ দুইয়ের এক তাহার চাই। আত্মা পাখী অমর, তাহার তো মরণ নাই, মরণযন্ত্রণা আছে। এ যন্ত্রণা কি সে অনন্তকাল ভোগ করিবে? তবে তাহার অমর না হওয়া ছিল ভাল। সে যখন মরিবে না, মরিতে পারে না, তখন বাঁচিবেই বাঁচিবে, অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের জন্য বাঁচিবে। যখন সে সংসারের অসারতা বুঝিয়াছে, পাপের যাতনায় অস্থির হইয়াছে, তখন তাহার সুদিন উপস্থিত। পাখী পিঞ্জরের মায়ায় যত দিন বদ্ধ, তত দিন সে মুক্তি চাহিবে কেন? পিঞ্জর যখন ক্লেশকর হয়, তখন তার সেই পিঞ্জর অতিক্রম করিবার জন্য বাসনা উপস্থিত। এই বিশুদ্ধ বাসনা তাহাকে পরমাত্মার দিকে আকর্ষণ করে। এত দিন একত্র থাকিয়াও সে আপনার সখাকে ভুলিয়াছিল। আর কি এখন সে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে? তাঁহার সঙ্গে তাহার যে নিত্য সখ্যবন্ধন ছিল, সে বন্ধনতো ছিন্ন হয় নাই, মোহবশতঃ সে আপনি সে সখ্য ভুলিয়া গিয়াছে। একবার সেই সখ্য তাহার স্মৃতিপথে উদিত হউক, দেখি পিঞ্জর তাহাকে বদ্ধ রাখে কি প্রকারে? এই সখ্য স্মৃতিতেই যোগস্পৃহা উপস্থিত হয়।

সংসার ও সংসারস্পৃহা বন্ধনের কারণ, পাপের উৎপত্তির হেতু, এই জন্য ধর্ম্ম ও সংসারের চিরবিবাদ। মহর্ষি ঈশার ধর্ম্ম এমন স্বাভাবিক, অথচ তাঁহাকেও সংসারের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে হইয়াছে। "সংসার ও ঈশ্বরের যুগপৎ সেবা করিতে পার না" এ কথা ঈশা ভালই বলিয়াছেন। সংসারকে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সমকক্ষ করিল, সে ঘোর ঈশ্বরাবমাননায় প্রবৃত্ত। সংসারের কথাও শুনিব, ঈশ্বরের কথাও শুনিব, এ দুই কি কখন সম্ভব? সংসার যাহা চায়; ঈশ্বর কি তাহা চান; ঈশ্বর যাহা চান সংসার কি তাহা চায়? কখনই নয়। সংসার পশুবৃত্তি লইয়াই ব্যস্ত, মাংসপিণ্ডের সেবায় সর্ব্বদা আকুল, সে স্বর্গের বস্তু চাহিবে কেন? সে চায় পচা কীটশরীর ভোজন করিতে। আত্মা পাখীকে সে নিত্য কি কদর্য্য আহারই দেয়! কোথায় পাখী স্বর্গের অমৃতফল ভোজন

করিবে, তাহা না করিয়া সংসারের হাতে পড়িয়া, পচা পোকা কাদা মাটী ভক্ষণ করিয়া সে দিন কাটায়। ঈশ্বর এই পাখীকে বড়ই ভাল বাসেন। তাহার জন্য কত সুস্বাদু ফল অমরোদ্যানে তিনি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিসে সে দেহপিঞ্জর অতিক্রম করিয়া অনন্ত চিদাকাশে অমরোদ্যানে প্রবেশ করিতে পারে, তাহারই জন্য তাঁহার যত্ন। পরমাত্মার এই যত্নের সঙ্গে সংসারের বিরোধ, তাই মহর্ষি ঈশা সংসারকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দান করিয়াছেন। সংসারের ভোগ বিলাস, প্রবৃত্তি চরিতার্থতা অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের বিরোধী, অনন্ত সুখদাতা ঈশ্বর তাহার অনুমোদন করিবেন কি প্রকারে? সংসার যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন হয় তাহা হইলে সে কি আর ঈশ্বরের সমান সেবা লাভ করিতে চায়? মানুষ ঈশ্বরের অপেক্ষা সংসারের সেবাতে আপনার জীবন ক্ষয় করে, তাই তাহার জীবন পাপ ও দুঃখের নিলয় হয়। সংসারের সেবা না করিয়া মানুষ ঈশ্বরের সেবা করিবে, সংসার নিয়ত ঈশ্বরাধীন থাকিবে, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, এই ইচ্ছার বিপরীতাচরণ হইতে পাপযন্ত্রণার উৎপত্তি।

মহর্ষি ঈশা সংসারের অতি উচ্চ পদকেও তুচ্ছ করিতেন। তিনি আপনাকে মেসায়া বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু যিহুদিগণ মেসায়া বলিতে যাহা বুঝিত, তাহার তিনি সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন। কোথায় তাঁহাকে রাজা করিয়া স্বদেশকে তাহারা স্বাধীন করিবে, না তিনি রোমীয় রাজ্যের প্রতি সম্মাননা দেখাইয়া বলিলেন, "যাহা সিজারের তাহা সিজারকে অর্পণ কর।" দেশীয় লোকেরা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া রাজা করিবে, তাহাতে তিনি অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। "এ পৃথিবীর রাজ্য আমার রাজ্য নয়," ইহা বলিয়া তিনি তাহাদের সকল আশার মূলচ্ছেদ করিলেন। কোথায় তাঁহার প্রতি তাহারা অনুরক্ত হইবে, না তিনি তাহাদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিলেন। যাহারা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত, কত সম্ভ্রম দেখাইত, তাহাদিগকে তিনি শত্রু করিয়া তুলিলেন। যদি তিনি দলপতি হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতেন, জাতীয় স্বাধীনতার আশা দান করিতেন, সকল লোক তাঁহার পদানত হইত। কোথায় তিনি রাজা হইবেন, না তিনি ক্রুশে হত হইলেন। সংসারের সহিত তাঁহার ঘোর বিরোধ, সংসারের রাজ্যকে তিনি তুচ্ছ করিলেন, স্বর্গরাজ্য ভিন্ন তিনি আর কিছু জানিতেন না। সেই স্বর্গরাজ্যের জন্য তিনি প্রাণ দিলেন, তথাপি এ রাজ্যের সম্মান তিনি স্পর্শ করিলেন না। সংসারের রাজ্যকে তিনি পরাজয় করিয়াছেন, এই বলিয়া তিনি পিতার নিকটে চলিয়া গেলেন। তিনি আপনি সংসারকে জয় করিলেন, তাঁহার অনুগামিগণ কোন কালে সংসারের হইবেন না, এই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তিনি আপনার ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া পিতার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতেন, তাই তিনি সংসারকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার মত ঈশ্বরের ইচ্ছা সার করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারকে অনায়াসে জয় করিতে পারেন। সংসারকে জয় না করিলে কেহ যোগরাজ্যের প্রজা হইতে পারেন না। সংসার যোগের প্রতিবন্ধক তত দিন, যত দিন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত উহার বিরোধ ঘোচে নাই।

সংসারের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া উহাকে পরাজয় করিলে, পাখীকে আর পিঞ্জরে বদ্ধ রাখা যায় না। সংসার তাহার পক্ষপুট বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে প্রমুক্ত হইয়াছে, কে আর তাহাকে নিম্ন ভূমিতে বদ্ধ করিয়া রাখিবে? ঈশার প্রতি তাঁহার স্বদেশবাসিগণ শত্রুতাচরণ করিল, তাঁহার পাপের প্রতি তীব্র আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা তাঁহার প্রাণসংহার করিল। প্রাণসংহার করিয়া তাহারা তাঁহার কিছুই ক্ষতি করিতে পারিল না। যে আত্মা বিহঙ্গ বহুদিন পূর্ব্বে পার্থিবদেহের নিকট বিদায় লইয়া পিতার সঙ্গে গিয়া বাস করিতেছিল, দেহকে বিনাশ করাতে সে কি আর বিনষ্ট হইল? যোগীর কার্য্য পাখী উড়ান, তাঁহার যত সাধন ভজন পাখী উড়াইবার জন্য। সংসারের অন্নপানে দেহ পরিপুষ্ট হয়; যদি সেই অন্ন পানের জন্য আত্মাও ব্যস্ত হয়, পরমার্থ তত্ত্ব ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে সে আর উড়িবে কি প্রকারে? অনন্ত সুখের জীবন যাহার প্রাপ্য সে যদি পৃথিবীতে বদ্ধ হইয়া থাকিল, তবে সে যে আপনার পাপযাতনার পথ আপনি খুলিয়া দিল। পৃথিবীর সুখসম্পৎ ঐশ্বর্য্য, মান সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, এ সকল লইয়া আত্মা কি করিবে? এ সকল নশ্বর ক্ষণস্থায়ী, সংসার যেমন অস্থায়ী ইহারাও তেমনি অস্থায়ী। যাহারা এই সকলেতে ভুলিয়া থাকে তাহারা জানে না কি অক্ষয় অমূল্য সম্পৎ তাহাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত রহিয়াছে। স্বর্গে সঞ্চিত রহিয়াছে, একথা বলিলে ভবিষ্যতের প্রাপ্য সম্পৎ বুঝায় না, চিদাকাশে ঈশ্বরসন্নিধানে সেই সম্পৎ আছে, সেখানে গেলে সেখানে প্রবেশ করিলেই এই সম্পদে অধিকারী হইতে পারা যায়। মূর্খেরাই এখানকার সুখাদিতে মুগ্ধ হইয়া নিত্য কালের সম্পদের প্রতি উদাসীন হয়। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা চিদাকাশ ভিন্ন অন্যত্র বিচরণ করিতে কিছুমাত্র অভিলাষ রাখেন না।

আমাদের আচার্য্য কেশবচন্দ্র আপনার আত্মা পাখীকে ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি দিন দিন যোগে প্রবিষ্ট হইয়া শেষে একেবারে পরমাত্মার হস্তগত হইয়া গেলেন। যত দিন যোগ ঘন হয় না, তত দিন আত্মা একবার পরমাত্মার নিকটে যায়, আবার সংসারে ফিরিয়া আসে। যোগের পরিণতাবস্থাতে আর আত্মা বিহঙ্গ ক্ষণকালের জন্যও ঈশ্বরসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। ঈশ্বরের হস্তগত আত্মা পাখীর শোভা সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। সংসারের মলিন বাসনা যে আত্মাকে নিতান্ত কুৎসিত করিয়া রাখিয়াছিল, সে আত্মা ব্রহ্মসংস্পর্শে আর সে প্রকার থাকিবে কেন? সংসারের বায়ু গায়ে লাগিলে আত্মা সৌন্দর্য্য হারাইয়া ফেলে, এজন্য পরিশেষে আর সে সংসারের বাতাস লাগিবার ভয়ে ঈশ্বরের পার্শ্ব পরিত্যাগ করে না। এখন আর তাহাকে সংসারের ভোগবাসনা প্রলুব্ধ করিতে পারে না; স্বর্গের

অমৃত ফল ভোজন করিয়া তাহার স্বাদে মুগ্ধ হইয়া আর সে সংসারে ফিরিবে কেন? আমাদের আচার্য্যের আত্মা সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়াছিল, সংসারকে পরাজয় করিয়া উহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত করিয়াছিল। সংসারে থাকিয়াও তিনি এইরূপে সংসারে ছিলেন না, এখানকার ভোগ্য বিষয় আর তাঁহার আত্মাকে বান্ধিয়া রাখিতে পারে নাই, পরব্রহ্মে যাঁহার আত্মা আবাসস্থল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাঁহার এ প্রকার অবস্থা হইবে না তো আর কি হইবে? ইনি আপনার পাখী ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া অভিলাষ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বন্ধুগণের পাখীও সংসারের বন্ধন কাটিয়া চিদাকাশে উড়িবে, চিরদিনের জন্য ঈশ্বরের হস্তগত হইবে। আমরা কি আমাদের আত্মা পাখীকে সংসারে বদ্ধ রাখিব? আমরা শৃঙ্খল কাটিয়া শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে চিদাকাশবিহারী হইতে পারি তাহার জন্য কি যত্ন করিব না? কোন্ মায়াবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আজও আমরা আত্মা পাখীকে সংসারের কদর্য্য বস্তু খাওয়াইয়া, বিবিধ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া উহাকে অনন্ত সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিব? যোগিগণের হৃদয়সখা যদি আমাদের আচার্য্যের আত্মাকে দেহে থাকিতেই তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী করিয়াছেন, আমাদের আত্মাকেও সেইরূপ তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী করুন। আমরা আমাদের আত্মা পাখীকে পরমাত্মার হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া যাহাতে সকল মোহ মায়া শোক দুঃখ পাপ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারি, তজ্জন্য আমরা সর্ব্বথা যত্নশীল হই।

তহ্ফতোল্ মওহ্হিদিনের বঙ্গানুবাদ।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কৃত মূলপারস্য পুস্তকের অনুবাদ।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

ইহা সত্ত্বে এবিষয় স্বীকার করিলে পরস্পর বিচারকালে প্রতিষেধের দ্বার অবরুদ্ধ ও বৃত্তান্তবিষয়ে সমুচিত অস্বীকৃতির ব্যাপার সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। যেহেতু পরস্পর বিচারের সময় বুদ্ধির অবিষয় ও অসম্ভব বিষয়ের প্রমাণ করার দাবী প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই হেতু যথেষ্ট হইতে পারে। তাহা হইলে হৃদয়ঙ্গম করার মধ্যে সাধ্য ও সাধ্যাতীত হওয়ার প্রভেদ উঠিয়া গিয়া বুদ্ধিগত প্রমাণ ও অনুমান করার ভিত্তিস্খলিত করিয়া ফেলে। এক্ষণ যে অসম্ভব বিষয়ের সমুদ্ভবনসম্বন্ধে স্রষ্টার ক্ষমতার অভাব, যথা স্রষ্টার অংশিত্ব বা স্রষ্টার বিনাশিত্ব ও বিরোধী প্রকৃতি এই দুই বস্তুর পরস্পর মিলন জ্ঞানী জনের নিকটে পূর্ণ প্রমাণিত।

খাজা হাফেজ বলিয়াছেন ;—

"তাহারা বাহাত্তর প্রকার ধর্ম্মের গোলযোগ করিতেছে, প্রকৃত তত্ত্ব জানে না, তজ্জন্য উপাখ্যানের পথ আশ্রয় করিয়াছে।"

যেহেতু বিভিন্ন সম্প্রদায় সকলের পূর্ব্বতন নেতাদিগের মানবীয় সাধ্যাতীত গৌরবান্বিত অবস্থার প্রমাণবিষয়ে দূরত্ববশতঃ কাল মূল বিষয়ের তত্ত্ব প্রাপ্তি সহ যাহা হিতজনক প্রত্যয় হয় সেই আন্তরিক উপলব্ধিকে প্রবেশাধিকার দান করিতে পারে না। অতএব তাহাদের অগ্রণী লোকেরা আপনাদের অনুগামীদিগের দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক পরম্পরাজ্ঞাত বিষয়ের প্রতি হস্তক্ষেপকারী হইয়া যে অবস্থায় তাহাদের স্বার্থ লাভ হইতে পারে সেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণ পরম্পরা জ্ঞাত বিষয়ের হিতজনক প্রত্যয়ের এবং ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের ক্রমান্বয়ে নবপ্রণালী প্রবর্ত্তকদের তত্ত্বানুসন্ধানে গাঢ় চিন্তা করিলে ভিতর হইতে আবরণ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

যেহেতু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কথানুসারে এস্থলে পরম্পরা শব্দের অর্থ এই যে, যাহাদের সম্বন্ধে অসত্যের সম্ভাবনা নাই, এমন এক দল হইতে তত্ত্বলাভ। কিন্তু পুরাকালে যাহাদের সম্বন্ধে অসত্যবাদ অনুমান অসম্ভব এমন কোন দলের বিদ্যমানতাবিষয়ে জ্ঞান বর্ত্তমানকালীন লোকের নিকটে উপলব্ধ ও পরীক্ষিত ফল নহে, বরং একান্ত সন্দিগ্ধ ও গুপ্ত। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পূর্ব্বতন লোকদিগের প্রচারিত তত্ত্বের স্পষ্ট অনৈক্য বিদ্যমান। বিশেষতঃ তাহাদের পুরাতন লোকদিগের কথায় সত্যাভাব প্রমাণিত হইয়া থাকে। যদি বলা যায় যে, যাহারা প্রত্যেক ধর্ম্মের অগ্রণীদিগের প্রাধান্য সংবাদের মূলভূমি সেই প্রথম দলের বাক্য তাহাদের সমকালবর্ত্তী যে দ্বিতীয় দল ছিল, তাহাদের বাক্য অপেক্ষা সত্য বলিয়া প্রমাণিত, তবে দ্বিতীয় দলের সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য তাহাদের সমকালবর্ত্তী তৃতীয় দলকে যোগ করা সমুচিত হয়। যেহেতু দ্বিতীয় দলের বাক্যের সত্যতাও প্রমাণ-সাপেক্ষ হওয়া প্রার্থনীয়। এই অনুমানের উপর তৃতীয় দলের সত্যতার জন্য চতুর্থ দলকে সংযোগ করা আবশ্যক। তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগে যে দল বিদ্যমান, তাহারও অধিকার আসিয়া পঁহুছে, এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ পর্য্যায় চলিবে। প্রকাশ আছে যে, যাহাদের সম্বন্ধে অসত্যের সম্ভাবনা নাই, বিশেষতঃ ধর্ম্মবিষয়ের চর্চ্চা যাহাদের আছে তৎসহ প্রেরিতত্ব স্বীকার ও অস্বীকার এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাগ্রণীদিগের মহদ্‌গুণ বিষয়ে এইরূপ পরম্পরা হেতু সম্পৃষ্ট পরস্পর বিরোধী মত সেই অধিকাংশ ধর্ম্মপথাবলম্বীদিগের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হইলে পরস্পর বিরোধী বিষয়ের যোগ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। একজনের কথার উপর অন্য জনের কথার শ্রেষ্ঠতা-হয়, শ্রেষ্ঠতার হেতু অপ্রমাণ সত্ত্বে অশ্রেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠতা দেওয়া হয়। যেহেতু সমতার অবস্থায় প্রত্যেক দলের শ্রেষ্ঠতার দাবী ও স্বীয় পূর্ব্বতন পূর্ব্বপুরুষদিগের কথায় সত্যতাজ্ঞাপনের অধিকার আছে।

এক দল হইতে বুদ্ধির গ্রাহ্য এমন তত্ত্বলাভ যে কোন ব্যক্তি সেই তত্ত্বের সত্যতা স্বীকারে তাহাদের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করে না, উহা প্রত্যয়ের ফল প্রদান করে প্রকৃত পরম্পরা ক্রমের এই অর্থ। অননুমেয় ও বিপরীত তত্ত্ব সকলের সহিত এই অর্থ ঘটিত পরম্পরায় কি সম্বন্ধ হইবে? এস্থান হইতে এ দুইয়ের প্রবেশ নিবারিত হয়। অর্থাৎ যাহারা ইতিহাস পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে ও পরম্পরাগত বার্ত্তারূপে সমাগত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বতন নরপতিদিগের বৃত্তান্ত

সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে তাহারা কোন্ বিচারে ধর্ম্মনেতৃদিগের অলৌকিক ক্রিয়াসকলকে যাহা প্রাচীন গ্রন্থে ও বহুলোকের পরম্পরা উক্তিতে সত্যরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে অস্বীকার করে এবং যাহারা সন্তানেরবর্ণ ও জন্মের অন্যথা সত্ত্বেও প্রকৃত অবস্থা গুপ্ত সত্ত্বে পরম্পরা বার্ত্তামাত্র বংশের বিশেষত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহারা কেমন করিয়া পূর্ব্বতন ধর্ম্মনেতাদিগের অলৌকিকতা ও মহামর্য্যাদা যাহা পরম্পরানুসারে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে তাহা স্বীকারে আন্দোলন না করিয়া থাকে। ইহা অগ্রাহ্য হয়। যেহেতু পূর্ব্বতন নরপতিদিগের স্বীকার্য্য বিষয়; যথা রাজাসনে উপবেশন ও শত্রুকুলের সঙ্গে বিরোধ ইত্যাদি গ্রাহ্য উপযুক্ত ব্যাপার, ইহাতে পরস্পর ঐকমত্য আছে, সমুদায় অলৌকিক ব্যাপারে বিরুদ্ধ মত রহিয়াছে, উহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক ও আশ্চর্য্য। জনক জননী হইতে প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের জন্ম ইহা বিশেষ ব্যাপার হয়। পরিজ্ঞাত উপলক্ষ ব্যতীত শিশুর জন্ম এমন এক ব্যাপার যে বুদ্ধি তাহা স্বীকার করিতে বহুক্রোশ দূরে পলায়ন করে।

(ক্রমশঃ)

HOME.

A desert where God confronts, and smiles on, me, blossoms as the rose, becomes a garden of Eden, a really present paradise, and turns into a sweet home. Heaven really is our Home. Where is heaven? Where God is! Is there a place where God is absent? No! then heaven is everywhere as God is everywhere. Heaven is our Home. But is our home heaven? In other words, is God present in our home? Yes, God is, most certainly, present in it. But when its inmates miss His presence or fail to realize His smile, it turns into a hell, as it becomes a battlefield of selfishness and mutual animosity. Expel self and let all the inmates of thy home know and obey God, and thy home shall become heaven—a throne of God's love and sweetness.

HUNGER.

What is hunger? Try to realize the tremendousness of its force and authority. If I am not hungry I will not eat though they offer me the sweetest and the wholesomest food. Nothing but hunger can induce feeding. They say, Hunger is a law of Nature, and it works in the animal kingdom with an irresistible force. Whose force is this? Who enacts this law? The Supreme Lawgiver of the universe maketh this law; and He himself as the Almighty Sovereign enforceth it. But the mere enactment and the enforcement of a law is not its fulfilment. The hunger of an animal is not an external force; but it is the authoritative command of the Immanent and the Indwelling Deity who is present in the tabernacle of every organized animal body, to eat what His Omniactivity prepares for it.

BREAD.

"Man must not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." What is a word of God? He uttereth no audible word; and He hath no visible mouth. He is a Spirit. Every true thought, or every good will with which He inspireth man is His word or speech. He giveth man the power of thought and the power of will. No other animal than man can think or can will. For instance, a dog can neither think, nor can will to think; he sees blood is red; but he cannot think of redness. He can see a thing in the concrete, but cannot think of its predicates in the abstract. But men can see God in times of worship, and can think of Him always and everywhere and in all conditions. Let no man abuse this Godly power of thought by thinking anything contrary to the Will of God.

প্রেরিত।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকৃত উইলপত্র।

আমার বহুকালের এক খানা প্রয়োজনীয় দলিল হারাইয়া গিয়াছে। কোন্ বৎসরে তাহা রেজেষ্টরী হইয়াছিল স্মরণ না থাকাতে রেজেষ্টরী আফিসে অনুসন্ধান করিয়া তাহার নকল পাওয়া যায় নাই। অতএব মৎকৃত নিম্নোক্ত উইলপত্র খানা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশার্থ অর্পণ করা গেল। পরন্তু প্রেরিতদরবারের সঙ্গে ও প্রচারকার্য্যালয়ের সঙ্গে এই দলিলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া ইহা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকায় স্থান দান করিলে বাধিত হইব। এই উইলপত্র বিগত ৮ই বৈশাখ নারায়ণ গঞ্জের সবরেজেষ্টরী আফিসে রেজেষ্টরী হইয়াছে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।

"লিখিতং শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন ওলদে স্বর্গগত মাধবরাম সেন সাকিন পাঁচদোনা পরগণা মহেশ্বরদী থানা রূপগঞ্জ মহকুমা নারায়ণগঞ্জ জিলা ঢাকা, কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

"যেহেতু আমি বার্দ্ধক্যদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, জীবনের স্থিরতা নাই। অতএব আমার পৈতৃক ভুসম্পত্তি ও ঘর বাড়ী ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যে যৎকিঞ্চিৎ আমার স্বত্বাধিকারে আছে, এবং জাবদ্দশা পর্য্যন্ত থাকিবে, তৎসমুদয়ের সম্বন্ধে ও মৎপ্রণীত পুস্তক সকলের বিষয়ে একটি উইল করা আবশ্যক হইয়াছে।

"ইতিপূর্ব্বে আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তিবিষয়ে এক উইল করিয়া ঢাকা জিলার অন্তর্গত কালীগঞ্জের সবরেজেষ্টরী আফিসে রেজেষ্টরী করাইয়াছিলাম, তাহার অনেক অংশ এক্ষণ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে সেই উইল পত্র সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়া এই উইল করিতেছি।

"আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা নাই, একান্নভুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রগণ উত্তরাধিকারিরূপে বিদ্যমান। আমার প্রাণবিয়োগের পর

আমার পরিত্যক্ত পৈতৃক স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ আমার স্বর্গগত সর্ব্বাগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্রগণ শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র সেন, শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র সেন ও শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীমান্ সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন তুল্যাংশে পাইয়া দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে পারিবে। উক্ত সম্পত্তির অপর এক তৃতীয়াংশ আমার স্বর্গগত অগ্রজ হরচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সেন প্রাপ্ত হইয়া দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া উপরি উক্তরূপ ভোগ দখল করিবে।

"আমার স্বকৃত কতকগুলি পুস্তক কলিকাতাস্থ নববিধান প্রচার কার্য্যালয়ের অন্তর্গত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত আছে। যথা—(১) কোরাণের বঙ্গানুবাদ, (২) মহাপুরুষ এরাহিমের জীবনচরিত, (৩) মহাপুরুষ মুসার জীবনচরিত, (৪) মহাপুরুষ দাউদের জীবনচরিত, (৫) মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনচরিত—তিন ভাগ, (৬) হদিস্‌মেস্কাতুল্ মসাবিহের বঙ্গানুবাদ—চারিখণ্ড, (৭) হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ, (৮) হিতোপাখ্যান মালা দ্বিতীয় ভাগ, (৯) নীতিমালা প্রথম ভাগ, (১০) তত্ত্বরত্নমালা, (১১) তত্ত্বসন্দর্ভমালা প্রথম ভাগ, (১২) চারি জন ধর্ম্মনেতা। এই সকল পুস্তকের চারি ভাগের তিন ভাগ উপস্বত্ব আমার জন্মভূমি পাচদোনা গ্রামের নিম্নলিখিত জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। উক্ত পুস্তক সকল কলিকাতা নববিধান প্রচার কার্য্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইয়া বিক্রয় হইতে থাকিবে। প্রচারকার্য্যালয়ের উক্ত অধ্যক্ষ এ বিষয়ে য়েক্‌জিকিউটার (কার্য্যসম্পাদক) হইবেন। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনাদি বাবত ঋণ থাকিলে প্রথমতঃ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় প্রেরিত দরবারের অর্থাৎ উক্ত নামধেয় প্রচারকসভার অভিমত এবং আমার ভ্রাতৃপুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সেন ও শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র সেনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধবিষয়ে অর্থব্যয় করিবেন। ঋণ পরিশোধ ও পুস্তক পুনর্মুদ্রাঙ্কনার্থ ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া অর্থ সঞ্চিত হইলে দরবার প্রচার কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য শতকরা পচিশ টাকা রাখিবেন, অবশিষ্ট ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা আমার জন্মভূমি পাচদোনা গ্রামের দুঃখিনী বিধবা, নিরাশ্রয় বালক বালিকা, দরিদ্র বৃদ্ধ, ও নিরুপায় রোগী এবং নিঃসম্বল ছাত্র ও ছাত্রীদিগের অন্নবস্ত্র এবং চিকিৎসা ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়াদির সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইবে। জলকষ্ট দূর, গৃহহীন দরিদ্রের গৃহাভাব মোচনের সাহায্য সেই অর্থদ্বারা হইতে পারিবে। কোন কোন নববিধান প্রচারক মহেশ্বরদী পরগণার কোন স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গেলে তাঁহাদের পাথেয়াদির সাহায্য সেই পুস্তকের ফণ্ড হইতে দান করা যাইতে পারিবে। ভ্রাতৃপুত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সেন ও শ্রীমান্ বিপিনচন্দ্র সেন উক্ত অর্থ বিতরণসম্বন্ধে য়েক্‌জিকিউটার নিযুক্ত হইবেন; তাঁহারা তাঁহাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অনুজগণের এবং পাচদোনা গ্রামস্থ আমার খুল্লতাত ভ্রাতৃপুত্র শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন ও শ্রীমান্ প্রতাপ চন্দ্র সেনের যোগে একটি কমিটী স্থাপন করিয়া সকলের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক অধিকাংশের মতে সেই সকল কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিবেন। কোন কারণে কমিটীর মেম্বরগণ সকলে একত্রিত হইতে না পারিলে সম্পাদক পত্র লিখিয়া তাঁহাদের মত আনয়ন করিয়া অধিকাংশের মতে কার্য্য করিবেন। অপিচ প্রথমোক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক জন উক্ত কমিটীর সম্পাদক ও এক জন সহকারী সম্পাদক হইবেন। কমিটী আবশ্যক বোধ করিলে সেই অর্থ দ্বারা পাচদোনার সন্নিহিত অপর গ্রাম সকলের দুঃখী দরিদ্রদিগের বিশেষ বিশেষ অভাব মোচন করিতে পারিবেন। ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের অবর্ত্তমানে তাঁহাদিগের প্রধান উত্তরাধিকারীদিগের প্রতি যথাক্রমে এ কার্য্যের ভার অর্পিত হইবে। মদ্‌রচিত উক্ত পুস্তক সকলের উপস্বত্ব আমি যেমন নিজের ভরণ পোষণের জন্য ব্যয় করিতেছি না, তদ্রূপ আমার উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির ভোগাদির জন্য তাহাতে কোন স্বত্বাধিকার থাকিবে না। আমার পরিশ্রমজাত অর্থ ধর্ম্মপ্রচার ও পরসেবাতে ব্যয়িত হইবে। সময়ে আমার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেহ একান্ত দারিদ্র্য অবস্থায় পড়িয়া উক্ত দান পাইবার উপযুক্ত হইলে দরবারের অভিমতে তাহারও পাইবার অধিকার থাকিবে। প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ আয়ব্যয়ের হিসাব পত্রাদি রাখা ও বাহুল্যরূপে পুস্তক বিক্রয় ও প্রচারজন্য আবশ্যক মতে স্থায়ী বা অস্থায়ী বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করিবেন। উপযুক্ত কমিশন দানে কিংবা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে পুস্তক বিক্রয় করিতে পারিবেন। তিনি উহার হিসাবপত্রাদি প্রেরিত দরবারে অর্পণ করিবেন। উপরি উক্ত পুস্তকাবলীর মধ্যে কোন পুস্তকের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন বা সংশোধন করা আবশ্যক বোধ হইলে উক্ত প্রচারকসভার মতে তাহা হইতে পারিবে। পুস্তক বিক্রয়ান্তে খরচ বাদে যাহা লাভ হইবে তাহার শতকরা ৭৫৲ পচাত্তর টাকা প্রেরিত দরবার পাঁচদোনার উপরি উক্ত হিতকর কার্য্য সম্পাদনার্থ উক্ত অর্থ বিতরণ কমিটির হস্তে অর্পণ করিবেন। কমিটির সম্পাদক ছয় মাস অন্তে বা বৎসরান্তে টাকা পাইবার জন্য প্রেরিত দরবারের সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন। ফণ্ডে পুস্তকের উপস্বত্ব থাকিলে দরবার তাহা প্রদান করিবেন। পরে কোন্ কোন্ বাবতে কত অর্থ ব্যয় হইল কমিটির সম্পাদক দরবারকে জানাইবেন। কোন পুস্তক পুনর্মুদ্রাঙ্কনে অর্থের অভাব হইলে দরবার উপযুক্ত অংশদানে কোন ব্যক্তিকে বা কতিপয় ব্যক্তিকে তাহা প্রকাশের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন। অর্থব্যবহার ও বিতরণ করিবার ভার প্রাপ্ত য়েক্‌জিকিউটারগণ নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে প্রথমতঃ দরবার তাঁহাদের ত্রুটির বিষয় তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন। তাহাতে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলে দরবারের অভিমতে প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ আমার দেশস্থ দুই তিন জন উপযুক্ত বিশ্বস্ত লোকের হস্তে সেই ভার অর্পণ করিতে পারিবেন। উক্ত অধ্যক্ষের নিজকার্য্যে ত্রুটি হইলে অর্থ বিতরণসম্বন্ধীয় য়েক্‌জিকিউটরগণ প্রেরিত দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া মীমাংসা করিয়া লইবেন, এবং পুস্তকাদি সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইলে তাঁহারা প্রেরিত দরবারের মত গ্রহণ করিয়া করিতে পারিবেন। প্রচারকার্য্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষের অবর্ত্তমানে তাঁহার স্থলবর্ত্তী যিনি হইবেন তিনিও উহার সম্বন্ধীয় প্রথমোক্ত য়েক্‌জিকিউটর হইবেন। কালক্রমে যদি দরবারের এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে যে, তাহাতে উল্লিখিত কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, বা দরবার না থাকে, কিংবা তাহার স্থলবর্ত্তী নামান্তর প্রাপ্ত কোন প্রচারকসভার অভাব হয়, তাহা হইলে দাতব্যের জন্য নিযুক্ত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কর্ম্মচারীর প্রতি বা অফিসিয়েল্ ট্রাস্টির প্রতি উক্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইতে পারিবে। পৈত্রিক সম্পত্তি ও মৎপ্রণীত পুস্তক ব্যতীত অপর কোন সম্পত্তি বা অপরের রচিত পুস্তক আমার স্বত্বাধিকারে থাকিলে তাহার উপস্বত্ব পূর্ব্বরূপ দাতব্য বিভাগে ব্যয়িত হইবে।

"আমার যে সকল উর্দ্দু পুস্তক ও বক্তৃতা লাহোর ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যে সেই সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বলারাম ভিস্তাট দ্বারা মুদ্রিত হইয়া প্রচার হইয়াছে তাহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই, পরে আমার কোন উত্তরাধিকারীরও স্বত্ব থাকিবে না।

প্রায় চারি বৎসর যাবৎ মাসিক পত্রিকা মহিলা আমা দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। এই পত্রিকার স্বত্বাধিকারী দরবার, তাহার উপস্বত্বাদিতে আমার কোন স্বত্ব নাই, সুতরাং আমার উত্তরাধিকারীদিগেরও তাহাতে কোন স্বত্ব থাকিবে না।

"মদরচিত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রচার ভাণ্ডারভুক্ত হইয়াছে। তাহার উপস্বত্ব দ্বারা দরিদ্র প্রচারক পরিবারের ভরণ পোষণাদির সহায়তা হইবে। প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের হস্তে সেই সকল পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ও অর্থ আদান প্রদানাদির ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত আছে। সেই সমুদায় পুস্তক প্রচার ভাণ্ডারের অর্থে ও কিয়দংশ অনাদীয় সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে। আমার উত্তরাধিকারীদিগের তাহাতে কোন স্বত্ব নাই ও স্বত্ব থাকিবে না। সেই সমস্ত পুস্তক প্রচার ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে আমি অর্পণ ও দান করিয়াছি। অতঃপর আমা কর্তৃক রচিত হইয়া যে কোন পুস্তক প্রচার ভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা মুদ্রিত হইবে তাহাও পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রচারভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অপিচ আমার রচিত যে সকল পুস্তক ভবিষ্যতে প্রচারভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা মুদ্রিত হইবে না, অথবা আমি নিজের বা অন্যের অর্থ সাহায্যে মুদ্রিত করিয়া প্রচার ভাণ্ডারে দান করিব না পূর্ব্বোক্ত রূপ তাহার উপস্বত্ব পাঁচদোনার জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

"আমার রচিত যে সকল পুস্তক প্রচার ভাণ্ডারভুক্ত হইয়াছে তাহার তালিকা ;—(১) তাপোসমালা ছয় ভাগ, (২) দেওয়ান হাফেজের বঙ্গানুবাদ প্রথমার্দ্ধ, (৩) তত্ত্বকুসুম, (৪) কোরাণের প্রবচনাবলী, (৫) দরবেশদিগের সাধনপ্রণালী, (৬) দরবেশদিগের ক্রিয়া, (৭) দরবেশদিগের উক্তি, (৮) দরবেশী, (৯) ব্রহ্মময়ী চরিত, (১০) সতী চরিত, (১১) রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত, (১২) ঈশা কি ঈশ্বর।

"এই উইল আমি সজ্ঞানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাভাবিক অবস্থায় লিখিলাম, আমার মৃত্যুর পর ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে। ইতি ১৩০৬ সাল ৮ই বৈশাখ।"

লেখক খোদ।
সাক্ষী
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
হাং সাং ওয়ারি, ঢাকা।
শ্রীনলিনীভূষণ দত্ত,
হাং সাং ওয়ারি, ঢাকা।
গণেশচন্দ্র পাল
সাং কাওরাইদ, জিলা ঢাকা।

সংবাদ।

বিগত ২রা আষাঢ়, ময়মনসিংহ নগরে শ্রীযুক্ত বিহারীকান্ত চন্দের প্রথম কন্যা শ্রীমতী সুখদার সঙ্গে নয়াখালী নিবাসী শ্রীমান্ কৈলাস চন্দ্র দত্তের শুভ পরিণয় নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবদম্পতীর কল্যাণ বিধান করুন।

গত ৪ঠা আষাঢ় লাহিড়িয়া সরাইয়ে শ্রীযুক্ত পুলীন চন্দ্র দত্তের নবকুমারের শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই দীননাথ মজুমদার নাম প্রদান করিয়াছেন। বিশ্বজননী নবকুমারকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বিগত ৬ই আষাঢ়, স্বর্গগত রামলাল ভড়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া তাঁহার হোগোল কুঁড়িয়াস্থ ভবনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুবোধ চন্দ্র ভড় নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। উপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। রামলালের কলিকাতাস্থ অনেক বন্ধু তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন, এই পারলৌকিক ক্রিয়া অতি গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ৮ই আষাঢ় শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন ঘোষের প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম, কুমারের মাতামহ নারিকেলডাঙ্গাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্তের আবাসে উপাধ্যায় কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

আমরাগড়িতে ভাই ফকির দাস রায় সঙ্কট রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি কয়েকদিন দিবারাত্রি ক্রমাগত মুহুর্ম্মুহু রক্ত বমন করিয়া মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণ রক্তবমনের নিবৃত্তি হইয়া থাকিলেও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশাজনক অবস্থা হয় নাই। আমরা তাঁহার সাজ্ঘাতিক পীড়ার জন্য দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন আছি। যতদূর হইতে পারে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। আশা করি ঈশ্বরপ্রসাদে তিনি অচিরে আরোগ্য লাভ করিবেন।

বিগত ৯ই আষাঢ় শ্রীযুক্ত ডাক্তার বরদা প্রসাদ দাস মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে তাঁহার পিতৃদেবের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রাতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র সন্ধ্যার পর শ্রীমান্ মোহিতলাল সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

সম্প্রতি দার্জিলিংএ শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় Gift of Life (জীবনের দান) বিষয়ে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। বঙ্গের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহামান্য উডবরণ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দরবার হলেই বক্তৃতা হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় বহুলোক বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বিগত ১১ই আষাঢ় রবিবার প্রচারাশ্রমে ভাই প্রসন্নকুমার সেনের পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্ত কুমার সেন এবং কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী উপাধ্যায় কর্তৃক যথাবিধি নববিধান মণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছেন।

সম্প্রতি গৃহস্থ প্রচারক ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শান্তিপুরে প্রচারার্থ গিয়াছিলেন, তিনি ২রা আষাঢ় শুক্রবার দুইবেলা উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং বিকালে উপদেশ দিয়াছিলেন। শনিবার প্রাতঃকালে উপাসনা ও অপরাহ্নে "ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মবিধান" বিষয়ে রিভার্স টম্সন হলে বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতা শ্রবণার্থ প্রায় দুইশত লোক আগমন করিয়াছিল। রবিবার প্রাতে উপাসনা হয়। সেই সময়ে শ্রীমান্ যোগানন্দ প্রামাণিক যথাবিধি নববিধানমণ্ডলী ভুক্ত হইয়াছেন।

আমরা অতিশয় দুঃখিত যে, বিগত ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ফরিদপুরস্থ আমাদের সমবিশ্বাসী শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ বসুর পত্নী সুকুমারী দেবী কয়েকটী শিশুসন্তান রাখিয়া অকালে অকস্মাৎ পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীকুমার বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ এবং স্বর্গগত যদুনাথ ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে স্থান দান করুন ও মাতৃহীন অপগণ্ড বালকবালিকাদিগের সহায় ও আশ্রয় হউন, এবং সুকুমারীর শোকার্ত্ত স্বামীকে মাতাকে সান্ত্বনা দান করুন।

অদ্য শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পরলোক যাত্রা উপলক্ষে তাঁহার ভাগিনেয়ী ভাই প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়ের পত্নীর বিশেষ ইচ্ছানুসারে পরলোক গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশার্থ প্রচারাশ্রমে সম্মিলিত বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। উপাধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্তৃক ১৭ই আষাঢ় মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪৩ভাগ।
১৩ সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ, রবিবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান পরমেশ্বর, তোমার বিচার অতি সূক্ষ্ম। লোকে দেখিতে পায় না, কিন্তু যে তোমার বিচারাধীন হয়, সে বুঝিতে পারে কি জন্য তুমি তাহাকে শাসন করিলে। দুঃখী সেই ব্যক্তি, নিতান্ত করুণার পাত্র সেই জন, যে তোমার শাসনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। যখন তুমি কোন বিষয়ে শাসন কর, তখন সেই শাসনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে আমরা সাবধান হই, আর ভবিষ্যতে আমাদের পতনের সম্ভাবনা থাকে না। হে দেব, তুমি আমাদিগকে জ্ঞানালোক দাও যে, সেই আলোকে আমরা তোমার শাসনের মর্ম্ম বুঝিয়া অপরাধের মূলচ্ছেদের জন্য যত্নশীল হই। আজ পর্য্যন্ত এক দিনও দেখিলাম না যে, তুমি আমাদের গর্ব্ব, অভিমান, দুরভিলাষাদির প্রতিবিধান জন্য শাসন করিলে না। অন্য লোকে যে সকল অপরাধ গণনায় আনে না, সামান্য বলিয়া উড়াইয়া দেয়, অথবা সূক্ষ্মত্ববশতঃ ধরিতে পারে না, কখন কখন বা গুণের মধ্যে গণ্য করিয়া লয়, তুমি আমাদের পরম হিতকারী, আমাদের হিতের জন্য শাসন দ্বারা বুঝাইয়া দাও, আমরা অলক্ষিত ভাবে বিনাশের পথে যাইতেছি। এত বার তুমি আমাদিগকে আমাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দোষ দেখাইয়া দিলে, অথচ আজ পর্য্যন্তও তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর দোষের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়িল না, ইহাতে কি এই বুঝিব যে, আমাদের কোন দিনই চেতনা হইবে না? পাপ বুঝি তবে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম আছে। যে গুলি ধরা পড়িল সে গুলি স্থূল হইয়া গেল, তাহার নিম্নে উহাদের অপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম আছে, যাহার জন্য আমাদের জীবন সুখের নিলয় হইতে পারিতেছে না। হে জননী, তুমি প্রথমে ভৎর্সনা বাক্যে, পরিশেষে কঠোর শাসনে সেই সূক্ষ্ম পাপ আমাদের নয়নগোচর করিয়া থাক, ইহা আমাদের পরম মঙ্গলের কারণ। তুমি তো আমাদের মঙ্গলে উদাসীন নও, কিন্তু আমরা কেন তোমার প্রতি উদাসীন থাকি! যখন তুমি মৃদু মধুর বচনে প্রথম আমাদের দোষ দেখাইয়া দাও, তখনই আমরা সাবধান হই না কেন? মৃদুমধুর বচনের পর যখন ভৎর্সনা করিতে থাক, তখন তো আমাদের প্রমত্ত থাকা কিছুতেই শোভা পায় না। তোমার প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ আছে, তাঁহারা তোমার মৃদু বাক্যেই সচেতন হন। যাঁহাদের সংসার বাসনা আজও অল্প পরিমাণ আছে, তাঁহাদের পক্ষে তোমার

ভৎর্সনা বাক্য চেতনা সাধন করে। তাহারাই তোমার সন্তানগণের মধ্যে অধম, যাহাদের কঠোর শাসন বিনা চেতনা হয় না। মাত, আমাদের বাসনা এই, আমরা মৃদুমধুর বচন শুনিয়া ভাল হই। যখন অনন্ত উন্নতির পথ আমাদের জন্য তুমি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তখন ক্রমান্বয়ে আমাদিগকে ভাল হইতে হইবে, একেবারে কিছুই অভাব থাকিবে না, জীবনে এরূপ কখন হইবার নহে। তাই তব চরণে এই ভিক্ষা করি, আমরা যেন সর্ব্বদা সাবহিত থাকি, যখনই তুমি যাহা বল, তৎপ্রতি মন দি, এবং তদনুসরণে জীবনের উন্নতি সাধন করিয়া কৃতার্থ হই। তোমার কৃপায় আমাদের এ অভিলাষ সিদ্ধ হইবে আশা করিয়া বার বার তব পাদপদ্মে আমরা প্রণাম করি।

আমি কি ?

আমি দাস না প্রভু, আমি গুরু না শিষ্য, আমি ব্রাহ্মণ না শূদ্র, আমি কি ? মিথ্যা বিনয় দেখাইবার জন্য আমি মুখে বলিতে পারি, আমি বিনীত দাস, আমি বিনীত শিষ্য, আমি হীন শূদ্র, কিন্তু যে একটু তলাইয়া দেখিবে সেই বুঝিতে পারিবে, আমার ক্ষমতা থাকুক না থাকুক আমি প্রভুত্ব করিতে চাই, সাধন সম্পত্তিহীন হই আর যা হই গুরু হইয়া শিষ্য সংগ্রহ করিতে আমার ঔদাসীন্য নাই। আমি অপরের সেবা করিব,সেবার জন্য অপমান সহ্য করিব, তাহাতে আমার অনুরাগ থাকিবে কেন ? অপরে আমার সেবা করুক, আমার আজ্ঞাবহ হউক, আমাকে পরিশ্রম হইতে অবসর দিক্, এবিষয়ে আমার বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। তবে আমি দাস নই প্রভু, শিষ্য নই গুরু, শূদ্র নই ব্রাহ্মণ।

আমি যদি প্রভুই হই, তবে তাহাতে লজ্জিত হই কেন ? বৃথা বিনয় প্রকাশের জন্য দাসবৎ বাহিরে দেখাইব কেন ? যদি আমি গুরুই হই, তবে শিষ্যমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া গুরুব্যবসায় চালাইব, লুকাইয়া লুকাইয়া গুরুব্যবসায় চালাইবার প্রয়োজন কি ? আমি যদি জানি আমি ব্রাহ্মণ অপর সকলে শূদ্র, ব্রাহ্মণের ন্যায় অপরের সঙ্গে ব্যবহার করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব কেন ? বাস্তবিক কথা আমি প্রভু নই দাস, গুরু নই শিষ্য, ব্রাহ্মণ নই শূদ্র। আমার মহত্ত্ব ও গৌরব প্রভু, গুরু বা ব্রাহ্মণ হওয়াতে নহে, দাস, শিষ্য ও শূদ্র হওয়াতে। পৃথিবীর লোকে প্রভু হইয়া গুরু হইয়া, ব্রাহ্মণ হইয়া অভিমান প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরানুগত হইয়া জীবন যাপন করিতে যে ব্যক্তি অভিলাষী, আমি প্রভু, গুরু, বা ব্রাহ্মণ মনে করিতেই অমনই তাহার সমুদায় হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। যিনি এক প্রভু ও এক গুরু বিনা আর প্রভু ও গুরু স্বীকার করেন না, তিনি আপনি প্রভু বা গুরু হইবেন কি প্রকারে ? যিনি আপনাকে নিয়ত ব্রহ্মতনয়গণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত দেখেন, এবং তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান দান করিতে যিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত, তিনি আপনাকে ব্রাহ্মণের পদে বসাইবেন কি প্রকারে ?

প্রভুত্বে নহে দাসত্বেই যদি আমাদের মহত্ত্ব ও গৌরব হয়, তাহা হইলে প্রভুত্ব হইতে দাসত্বই শ্রেষ্ঠ হইল। হঁ, দাসত্ব শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি ? জীব নিত্য দাস, দাসত্বেই তাহার পূর্ণতা প্রভুত্বে নহে। সে যখন আপনাকে প্রভু বলিয়া মনে করে, তখন সে অভিমান বা অন্য কোন প্রবৃত্তির দাস, সুতরাং তাহাকে প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিব কি প্রকারে ? আচ্ছা যখন সে স্বাধীন, তখন তাহাতে প্রভুত্ব থাকিবে না কেন ? জীবের স্বাধীনতা স্বাধীন ভাবে অধিনতায়। যখন সে বলিল অমুক কার্য্য করিব, তখন সে স্বাধীন ভাবে বলিল অমুক কার্য্য করিব, কিন্তু সে স্বাধীন ভাবে এই কথা বলিয়াই অধীন হইয়া পড়িল। আকাশই ভাঙ্গিয়া পড়ুক, আর যাহা কিছুই হউক, সে সে কার্য্য করিতে বাধ্য, আর তাহার সেখানে 'করিব না' এরূপ বলিবার অধিকার নাই। যদি সে এরূপ অধিকার আপনার হাতে গ্রহণ করে তাহা হইলে

সে আপনার মহত্ত্ব ও গৌরব হারায়। সুবিধা অন্বেষণ করিয়া সে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কোন রুচি প্রবৃত্তি বা আলস্যের দাস হইয়া পড়ে। যাহা সে বলিয়াছে, তাহা করিয়া তাহাকে সত্য রক্ষা করিতে হইবে। সে কার্য্য করিবার জন্য যে সময় সে নির্দ্ধারণ করিয়াছে সেই সময়ের মধ্যে তাহাকে সেই কার্য্য করিতে হইবে, সময়ের একটু ব্যতিক্রম সাধন করিবারও তাহার অধিকার নাই। জনসমাজের সহিত ব্যবহারে এই নীতির বন্ধন উল্লঙ্ঘন করা একান্ত অনুচিত।

শিষ্যত্বে গৌরব গুরুত্বে নহে, ইহাই বা বলি কেন? জীবের অধিকার সে শিখিবে, ঈশ্বরের অধিকার তিনি শিখাইবেন? ঈশা অনেককে শিখাইলেন, কিন্তু শিখিয়াই শিখাইলেন। তিনি কি কখন বলিয়াছেন, আমি শিখাইতেছি? যাহা আমি শিখিতেছি, তাহাই বলিতেছি, এই তাঁহার স্পষ্ট কথা ছিল। যখন আমরা কেবল শিখি,এবং শেখাই যখন আমাদের সমুদায় জীবনের কাজ, তখন যদি আমরা শিষ্য না হইয়া গুরু হইয়া বসি, তাহা হইলে শেখা বন্ধ হইয়া গেল, জীবনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া আসিল। যাহার জীবন ফুরাইয়া মৃতভাব ধারণ করিয়াছে, সেই গুরু হইয়া বসে, আপনাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া শিষ্যগণকে ভুলায়। যে ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর কিছু যাহার হইবার নাই, সে মরিয়াছে, তাহার সংস্পর্শে শত শত লোক মরিবে, এবং অপরকেও মারিবে। গুরুব্যবসায়ের সঙ্গে বঞ্চনা শঠতা ধূর্ত্ততা নিয়ত সংযুক্ত থাকে, তাহার কারণ সে জীবনশূন্য হইয়াছে, অথচ জীবন আছে দেখাইবার জন্য ঐ সকল অসদুপায় তাহাকে অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু যিনি শিষ্য, চির শিষ্য, জগতের কিছুই বা কেহই কিছু না শিখাইয়া যাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে পারে না, তাঁহার অফুরন্ত সম্পদ্, তাঁহার কোন কালে জ্ঞানাদির অভাব হয় নাই, অভাব হইবে না। এজন্যই বলা হইয়াছে, শিষ্যত্বে গৌরব, গুরুত্বে নহে।

শূদ্রত্বে গৌরব, ব্রাহ্মণত্বে প্রবৃত্তি বা বাসনা আমরা বলি কেন? চন্দ্র সূর্য্যাদি সকলেই সেবা করিতেছে, সেবা গ্রহণ করিতেছে না, সর্ব্বোপরি সর্ব্বস্রষ্টা সকলের সেবা করিতেছেন, অপরের সেবা গ্রহণে তাঁহার কোন অপেক্ষা নাই। মা সন্তানের সেবা করেন, সর্ব্বোপরি মার আদর এই জন্য। যে ব্যক্তি সমুদায় প্রাণ মন দিয়া পরের সেবা করিতে না পারিল তাহার জীবন ধারণ বৃথা। পরমাংসলোলুপ হিংস্র জন্তু সকল অন্য পশুর রক্তমাংসে আপনাদের দেহ পরিপুষ্ট করে, পরার্থে এক বিন্দু শোণিতও দেয় না। যাহারা সেবা গ্রহণ করে, সেবা করে না, তাহারা সেই হিংস্র-জীবশ্রেণীভুক্ত। ঈশা প্রভৃতি পর-সেবায় শোণিত পর্য্যন্ত দান করিলেন, তাই গৌরবান্বিত হইলেন। যদি তাঁহারা পরের সেবা গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেন, আজ তাঁহারা যে গৌরবের মুকুট পরিধান করিয়া শোভমান, সে গৌরব তাঁহারা কখন পাইতেন না। যদি তাঁহারা শূদ্র হইয়া সেবা না করিতেন, আজ তাঁহারা ব্রহ্মতনয় বলিয়া জগতে খ্যাত হইতেন না। শূদ্রত্ব হইতে ব্রহ্মতনয়ত্বের উৎপত্তি ইহা যে ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়াছে, সে আপনাকে শূদ্র বলিয়া মনে করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবে। অতএব, আমি কি? প্রত্যেকে যখন আপনাকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি দাস, আমি শিষ্য, আমি শূদ্র, এই উত্তর দিবেন, এবং তদনুসারে জীবন নির্ব্বাহ করিবেন, আমরা এই আশা করিতে পারি।

অবনতির কারণ।

অবনতির কারণ কি, কেহ যদি আমাদিগকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, অভিমান অবনতির কারণ, ইহাই আমাদের সহজ উত্তর। অভিমান এক প্রকার নহে; উহা নানা আকার ধারণ করিয়া জীবনে প্রকাশ পায়, এবং জীবনে যত

ভৎসনা বাক্য চেতনা অভিমান হইতে উপস্থিত হয়। অভিমান ঈশ্বর ও মানব উভয়েরই ঘৃণার্হ। ইহার তুল্য জীবনের অনিষ্টসাধক আর কিছু নাই, অথচ নরনারী ইহারই জন্য জীবন ধারণ করে। যদি অভিমান করিবার কিছু না থাকে, তবে বাঁচিয়া থাকায় কি প্রয়োজন,এইরূপ তাহারা আক্ষেপ করে। ধনের অভিমান, জ্ঞানের অভিমান, পদের অভিমান, বংশের অভিমান, অন্ততঃ ইহা আমার উহা আমার ইত্যাকার অভিমান, কাহার নাই? এই অভিমানে যে অন্ধতা উপস্থিত হয়, তাহাতেই উন্নতি অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

অভিমান অন্ধতা উপস্থিত করে কেন? অভিমান দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে। আপনাকে ছাড়া অন্যত্র চিন্তা অভিমানী ব্যক্তির কখন যায় না। আপনিই আপনার সম্বন্ধে প্রচুর,এ জ্ঞান জন্মিলে আর কোথা হইতেও কিছু গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি থাকে না; সুতরাং নূতন অভিজ্ঞতা লাভের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। এই পর্য্যন্ত নহে, অন্য লোক হইতে আপনাকে সম্ভ্রান্ত জ্ঞানী ধার্ম্মিক ইত্যাদি মনে করাতে তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা উপস্থিত হয়, এই অবজ্ঞানিবন্ধন ব্যবহারে মধুরতা থাকে না,লোকেও তাহার সঙ্গ করিতে চায় না, সেও কাহার সঙ্গ চায় না, নিতান্ত বাধ্য হইয়া যদি কাহারও সঙ্গ করিতে হয়, সে মনে মনে তাহার সংসর্গকে বড়ই ক্লেশকর মনে করে। যখন প্রয়োজন চলিয়া যায়, তখন আর তাহার সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ সে রাখিতে চায় না। এই প্রকারে অভিমানী ব্যক্তি দিন দিন হৃদয়শূন্য হইয়া পড়ে। এখানেই শেষ হইল তাহা নহে, আমারই সেবার জন্য, আমারই সন্তোষসাধনের জন্য অন্য লোক, এইরূপ মনে থাকাতে ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধন শিথিল হইয়া আইসে, ইহাতে চরিত্র পর্য্যন্ত দূষিত হইয়া পড়ে।

অভিমানী ব্যক্তি আপনাকে সকল বিষয়ে পারদর্শী মনে করে। যদি এমন কিছু থাকে, যাহার সম্বন্ধে সে কিছু জানে না তাহা হইলে উহা যে একটা জানিবার বিষয় বা মনোযোগ আকর্ষণ করিবার বিষয় ইহা পর্য্যন্ত সে স্বীকার করিতে চায় না। ধনাদির অভিমানে অভিমানী ব্যক্তিগণ যদি মূর্খ হয়, তাহা হইলে বিদ্যা যে একটা নিতান্ত আদরের সামগ্রী, ইহা তাহারা কখন মনে করে না। ধনের নিকটে যখন বিদ্বানেরা প্রণত হন, তখন বিদ্যা অপেক্ষা ধন যে অতীব শ্রেষ্ঠ, এবং নির্দ্ধন দরিদ্রেরাই বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে, ধনিগণের তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়া বসে। তাহারা বিদ্বান্‌দিকে অবজ্ঞার নয়নে দেখিয়া থাকে। যাঁহারা বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত,তাঁহারা আবার ধর্ম্মের উচ্চ সাধনাদিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণকে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া থাকেন। এইরূপ অভিমান আপনি এবং আপনার অবস্থার বাহিরে যাহা কিছু আছে তৎপ্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারে না। ধনী বিদ্বানের দ্বারা, বিদ্বান্‌ সাধক দ্বারা যে উপকৃত হইবেন, নিজ নিজ অভাব পূরণ করিয়া লইবেন, ইহা এক অভিমানে তাঁহারা ভুলিয়া যান। যদি এরূপই হইল তবে অভিমানের তুল্য পরম শত্রু আর কি আছে?

সূক্ষ্মরূপে যতই আমরা আলোচনা করি, ততই দেখিতে পাই, এক অভিমান হইতে যত প্রকারের অবনতি উপস্থিত হয়। যাঁহারা নিত্যোন্নতি আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা মন হইতে যেন অভিমান বিদায় করিয়া দেন। যিনি বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন তাঁহা হইতে আরম্ভ করিয়া যিনি সাধনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছেন, কেহই অভিমানের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন না। যখনই আমাদের কোন বিষয়ে অবনতি উপস্থিত হয়, তখনই অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, আমরা তৎসম্বন্ধে অভিমান মনে স্থান দিয়াছিলাম, উহা তাহারই ফল। অভিমান পরম শত্রুকে আমাদের জীবনক্ষেত্র হইতে যে উপায়ে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, সর্ব্বতোভাবে সেই উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়। মানুষ অনন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে না, এই জন্য আপনাকে বড় বলিয়া মনে করে।

অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য যাহাদিগের অর্জ্জনের বিষয় তাহারা যদি কিঞ্চিৎ শক্তি, কিঞ্চিৎ জ্ঞান, সামান্য প্রেম, ও যথাকথঞ্চিৎ পুণ্যে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া আপনাকে বড় মনে করে তবে তাহা ভ্রম। অনন্তের কথা দূরে, আপনাকে ভুলিয়া পরের গুণগ্রাহী হইলে যাঁহারা যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে মনের সম্মুখে আনিয়া আপনাকে নিয়ত অবনত করিয়া রাখা, ইহা অভিমান পরিহারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, বল কি উপায়ে ভ্রান্তির হাত হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে? যাঁহারা তোমার অনুসরণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তাঁহারাও সময়ে সময়ে এরূপ গুরুতর ভ্রমে পড়েন যে সাধারণেও সেরূপ ভ্রমে পড়ে না। এরূপ স্থলে কিরূপে বুঝিব, তোমার হাতে সমুদায় ভার দিয়া ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়?

বিবেক। ভ্রান্তির মূল কি একবার তোমার বোঝা প্রয়োজন। মানুষ অল্পজ্ঞান এজন্য তাহাতে ভ্রম হইবে বিচিত্র কি? কিন্তু অল্পজ্ঞান হইলেই ভ্রম হইবে, তাহার কারণ নাই। অল্পজ্ঞান কখন অধিক বিষয় আরম্ভ করিতে পারে না। যতটুকু তাহার অধিকার তন্মধ্যে যদি উহা আপনাকে আবদ্ধ রাখে, তাহা হইলে ভ্রমের সম্ভাবনা কোথায়? এই অল্পজ্ঞান দিন দিন যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহারই উপায় করা প্রয়োজন। সে উপায় আমার ও বিজ্ঞানের অনুসরণ। আমি ও বিজ্ঞান যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দি, মানুষ যদি তাহা অতিক্রম করিয়া ভ্রমে নিপতিত হয়, তাহা হইলে আমার হাতে ভার দিয়া ভ্রান্তি নিবারণ হয় না, একথা বলা কি আমার প্রতি অবিচার নয়?

বুদ্ধি। আমি তোমার প্রতি অবিচার করিতে চাই না, যাহা নিয়ত দেখিতেছি, তাহাই বলি। সংশয় নিরসন করিবার জন্য তোমায় জিজ্ঞাসা করা।

বিবেক। দেখ, লোকে যাহাদিগকে বিবেকী বলে, আমার নিতান্ত অনুগত মনে করে, তাহারা বাস্তবিকই যে সকল সময়ে আমার অনুগত তাহা নহে। তাহাদিগের জীবনে প্রবৃত্তি বাসনার সহিত ক্রমান্বয়ে সংগ্রাম চলিতেছে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সেই সংগ্রামে জয়ী হয়, সে ব্যক্তিকে সেই পরিমাণে আমার অনুগত জানিও। যতটুকু প্রবৃত্তি বাসনার অধীনতা, ততটুকু ভ্রান্তির সম্ভাবনা ইহা তোমার স্মরণে রাখা উচিত। আমার কথা শুনিলে ভ্রান্তি হয়, এরূপ সংশয় কদাপি মনে স্থান দিও না।

বুদ্ধি। এমন মানুষ কে আছে, যাহাতে প্রবৃত্তি বা বাসনা নাই। বল, কি উপায়ে মানুষ প্রবৃত্তি বাসনা সত্ত্বে ভ্রমের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে?

বিবেক। যখন কোন ব্যক্তি দেখিতে পাইবে যে, প্রবৃত্তি বাসনা তাহার উপরে আধিপত্য স্থাপন করিতে উদ্যত, তখন তজ্জন্য যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, সে চাঞ্চল্য যত ক্ষণ না শান্ত হয়, মন স্বস্থাবস্থায় না আসে,তত ক্ষণ কোন প্রকার নিষ্পত্তি না করিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া থাকা প্রয়োজন। পরিশেষে মনের শান্ত ভাব উপস্থিত হইলে, আমার আলোক গ্রহণ সম্ভব হইবে। যাহারা অধীর হইয়া তখনই কিছু সিদ্ধান্ত করে তাহারাই ভ্রমে নিপতিত হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

বিস্তৃত ব্রহ্ম।

২২ ভাদ্র, রবিবার, ১৮১৮ শক।

প্রেমিক চৈতন্য ঈশ্বরপ্রেমে প্রমত্ত। তিনি প্রেমে বিভোর হইতেন, অথচ তাঁহার প্রাণের ইষ্টদেবতাকে নিকটে দেখিতে পাইতেন না। বিরহ ব্যথায় তিনি একান্ত অধীর হইয়া পড়িতেন। এই বিচ্ছেদ তাঁহাকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল, পরিশেষে তাঁহার তনুত্যাগ এই বিচ্ছেদেই ঘটিয়াছিল। যিনি ঈশ্বরের প্রেমে প্রাণ দিলেন তাঁহার ঈদৃশ যন্ত্রণার অবস্থা, কাহার মনে না শোক আনিয়া উপস্থিত করে? তিনি প্রেমে প্রমত্ত হইয়া যদি বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিলেন তবে বল, কে আর ঈশ্বর-প্রেমের লালসা হৃদয়ে পোষণ করিবে? অবশ্য বিচ্ছেদের ভিতরে এমন কিছু উচ্চ ভাব ছিল, যাহা প্রেমের চরম সীমায় উপস্থিত হইলে অপরিহার্য্য। সে উচ্চভাব কি, এক জন তাঁহার শিষ্যের কথায় বুঝিতে পারা যায়;—

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্য।
একঃ সএব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

"সঙ্গ ও বিরহ, এ দুইয়ের একটি লইতে গেলে, তাঁহার সঙ্গ অপেক্ষা বিরহ ভাল। কেন না সঙ্গে তিনিই এক জন থাকেন, বিরহে ত্রিভুবন তন্ময় হইয়া যায়।" আমরা যখন ঈশ্বরকে হৃদয়ে দর্শন করি, তখন তাঁহাতে চিত্ত বিভোর হইয়া যায়, আর কোথাও যায় না, অন্তরেই উহা আবদ্ধ থাকে। এরূপে ঈশ্বরদর্শন ঘনীভূত হইল বটে, কিন্তু যেখানে সেখানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে ভক্তের চিত্ত কি কখন পরিতৃপ্ত হইতে পারে? ভক্তের নিকটে 'তরুলতিকাতে যেখানে সেখানে তাঁহার ইষ্টস্ফূর্ত্তি পান।' ভক্তের হৃদয় কখন সীমার ভিতর বদ্ধ থাকিতে পারে না। সমুদায় জগৎ ও জীব ব্রহ্মাবির্ভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, তখন তিনি আর সে আবির্ভাব ভোগ করিয়া উঠিতে পারেন না। যখন এই আবির্ভাব

সকল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তখন ভোগে সম্যক্ অক্ষম হইয়া তিনি বিরহনাট্য অভিনয় করেন। ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যের যে এই দশা উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাতে আমাদের মনে সন্দেহ হয় না।

'ত্রিভুবন তন্ময়' তাঁহার আবির্ভাবপূর্ণ, ভক্তের সম্বন্ধে কি ইহাই উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বিষয় নয়? আমরা নববিধানের আশ্রয়ে এই উচ্চ কৃতার্থতার অধিকারী হইয়াছি। ইহা কিছু আমাদের নিজ বলে ঘটিয়াছে তাহা নহে, বিধানের গুণে সাধনভজনবিহীন লোকদিগের সম্বন্ধে এরূপ ঘটিয়াছে। আমরা আমাদের সৌভাগ্যের জন্য ভগবানের নিকটে কৃতজ্ঞ, কিন্তু কোন্ পথ দিয়া আমরা এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি, তাহা দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। ব্রহ্ম তিন প্রকারে ঋষিসমাজ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছেন, প্রথম সর্ব্বাতীত, দ্বিতীয় সর্ব্বগত, তৃতীয় আত্মস্থ। সর্ব্বাতীত তুরীয় ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রথমে কেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব চিরসংযুক্ত আছে, তাহাতেই বুঝিতে হইবে সর্ব্বাতীতত্বের ভাব লোকের মনে কোন না কোন আকারে প্রকাশ পায়ই পায়। সূর্য্যে, চন্দ্রে, আকাশে, ঝটিকা বৃষ্টি তুফানে, মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে, দিব্যালোকপূর্ণ দিনে, সর্ব্বত্র ব্রহ্মের প্রকাশ দর্শন, ইহাতে সর্ব্বগত ব্রহ্মে চিত্তার্পণ প্রকাশ পায়। যখন চন্দ্র সূর্য্যাদি হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত মন আপনার ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন ব্রহ্মকে আত্মস্থ দর্শন করিয়া সাধক কৃতার্থ হইলেন। ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ প্রকাশ সকল দেশেই কোন না কোন আকারে আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের ত্রিনীতি—পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ প্রকাশই ব্যক্ত করে। 'পিতাকে কেহ কোন দিন দেখে নাই' খ্রীষ্টের মুখের এই কথায় সমুদায় খ্রীষ্ট জগৎ পিতাকে জ্ঞানাতীত বোধাতীত করিয়া রাখিয়াছে, তিনি চিরদিন অজ্ঞেয় এবং দুর্জ্ঞেয়। এমন যে সাধু পল, তিনিও এ সংসারে ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় না নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। 'এখন আমরা কাচের ভিতর দিয়া ঝাপসা ঝাপসা দেখি,' দেহান্তে সৌভাগ্যোদয়ে আমরা ঈশ্বরকে দেখিব, এই তাঁহার স্পষ্ট মত। এদিকে যিহুদিগণের অনুবর্ত্তী মুসলমানগণ ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না এই মতেই সায় দিয়াছেন। চরম বিচারের দিনে যখন সকলে বিচারিত হইবার জন্য উত্থান করিবে, সেই সময়ে ঈশ্বর একবার তাঁহার মুখের আবরণ খুলিয়া ঈশা মুসা প্রভৃতিকে দেখাইবেন। তাঁহার মুখের জ্যোতি সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন, আর আত্মসংবরণ করিতে পারিবেন না। মুসা ঝোপের অগ্নিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুযাযিবর্গ কখন ঈশ্বরদর্শনে সাহস করেন নাই। কি জানি বা তাঁহার জ্যোতিতে তাঁহারা ভস্ম হইয়া যান এই ভয় তাঁহাদিগের মধ্যে প্রবল ছিল। এইরূপে ব্রহ্ম চিরকাল সর্ব্বাতীত, সুতরাং সকলের বুদ্ধিমনের অগোচররূপেই গৃহীত হইয়া আসিয়াছেন।

এ দেশে এই ত্রিত্ববাদের কিছু অভাব নাই, শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন ;—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

"তত্ত্ববিদ্গণ তাহাকেই তত্ত্ব বলেন যাহা অদ্বয় জ্ঞান। এই অদ্বয় জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন শব্দে শব্দিত হন।" এখানে ব্রহ্ম যিনি তিনি সর্ব্বাতীত; যিনি পরমাত্মা তিনি আত্মস্থ; যিনি ভগবান্ তিনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত। এখানে বৈদিক সময়ের সর্ব্বগতত্ব ভাব চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দেব তির্য্যক্ নরাদিতে ভগবানের অবতরণ বর্ণন করিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব ঠিক রাখা হইয়াছে। যিনি সর্ব্বাতীত তিনি তুরীয় ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বগত তিনি অবতীর্ণ ব্রহ্ম, যিনি আত্মস্থ, তিনি প্রতি আত্মায় প্রকাশিত অন্তর্য্যামী, পরমাত্মা বা পবিত্রাত্মা। আজ বিস্তীর্ণ জনসমাজ কোথায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? দ্বিতীয় সোপানে অবতীর্ণ ব্রহ্ম। এ অবতীর্ণ ব্রহ্ম বর্ত্তমানের নহে, ভূত কালের। এদেশের লোকের মন রাম ও কৃষ্ণাদিতে, খ্রীষ্ট জগতের মন খ্রীষ্টেতে, বৌদ্ধগণের মন বুদ্ধেতে নিবিষ্ট। যিহুদি বা মুসলমানগণের মন কোন অবতারে আবদ্ধ নহে, কিন্তু সর্ব্বাতীত ব্রহ্মে চিত্ত স্থাপন করিতে না পারিয়া বিধি ব্যবস্থা শাস্ত্রনিয়মে তাঁহাদের মন বদ্ধ আছে। যে কোন প্রকার হউক মানুষের মন কোথাও আর সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরে নিবিষ্ট নহে। প্রখরকিরণ সূর্য্যের দিকে কে তাকাইতে পারে? তাকাইতে গিয়া ক্ষণকালের মধ্যে চক্ষু ঝলসাইয়া যায়, অন্ধকার দেখিতে থাকে, কিন্তু সেই সূর্য্যের কিরণ যখন ঘোর অন্ধকারময় চন্দ্রের উপরে নিপতিত হয়, উহা কেমন সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না হইয়া লোকের নয়ন মন হরণ করে। সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম সূর্য্যস্থানীয়, তাঁহার দিকে তাকাইতে গিয়া অসহ্য জ্যোতিতে চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু সৃষ্টিতে সাধু সজ্জনেতে সেই জ্যোতি নিপতিত হইয়া জ্যোৎস্নার ন্যায় সুস্নিগ্ধ হয়, তখন সকলে অবতীর্ণ ব্রহ্মকে দেখিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে।

সর্ব্বাতীত, সর্ব্বগত, ও আত্মস্থ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ প্রকাশ মধ্যে কোন একটি প্রকাশ নববিধান গ্রহণ করিয়াছেন, না উহার মধ্যে এই ত্রিবিধ প্রকাশই সাধকেরা সম্ভোগ করিয়া থাকেন? নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান ইহাইতো সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মা আত্মস্থ ব্রহ্ম। যদি কেবল আত্মস্থ ব্রহ্মই ইহাতে একমাত্র দর্শনের বিষয় হইলেন তাহা হইলে নববিধানবাদিগণের অন্যত্র ব্রহ্মদর্শন চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া গেল। ঘরের ভিতরে দ্বার দিয়া নববিধানী ব্রহ্ম সম্ভোগ করুন, তিনি সেখানে হইতে বাহিরে আসিয়া ব্রহ্মকে হারাইবেন। যদি নববিধানীর এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে তবে তাঁহার তুল্য আর দুঃখী কে আছে? সংসারে বিচরণকালে ব্রহ্মের সঙ্গে বিচরণ প্রয়োজন। কেন না এখানে প্রলোভন বিপদ্ অনেক। যদি প্রলোভন বিপদের সময়ে তিনি সঙ্গে না থাকিলেন, কাছে না থাকিলেন, তবে তিনি সাধকের

দুঃখ ঘুচাইবেন কি প্রকারে? ব্রহ্মই যদি কেবল আত্মস্থ থাকিলেন সর্ব্বগত না হইলেন, তাহা হইলে আত্মস্থ দেখিয়া লাভ হইল না ক্ষতি হইল? যে ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা বিরহ প্রার্থনা করিয়াছেন, বিরহ হইলে আপনার ইষ্টকে জগন্ময় দেখিতে পাইবেন, তিনি অতি সুচতুর। তিনি একস্থানে আপনার প্রাণের দেবতাকে বদ্ধ রাখিয়া সকল স্থান হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়া কি প্রকারে সুখী হইতে পারেন? আমাতে ব্রহ্ম আছেন, তোমাতে নাই, কেন না আমিতো তাঁহাকে তোমাতে দেখিতে পাইতেছি না, এ নির্ঘাত কথা ভক্ত কখন শুনিতে প্রস্তুত নন। সর্ব্বাতীত সর্ব্বগত ব্রহ্মকে এরূপে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলা ব্রহ্মের প্রতি ঘোর অবমাননা। ইহাতে মানুষে সৃষ্টিতে, মানুষে মানুষে সম্বন্ধ একেবারে কাটিয়া যায়, বস্তু বা ব্যক্তিতে ব্রহ্মকে দেখিতে পাই না। এরূপ ব্যবস্থায় তৎপ্রতি হৃদয়ে সমাদর পোষণ করিব কি প্রকারে? সে বস্তু বা ব্যক্তির সংসর্গ বিষবৎ দূরে পরিহার করা কর্ত্তব্য, কেন না তাহাতে মায়াবদ্ধ হইয়া পড়িলে অন্তরস্থ ব্রহ্মকে হারাইয়া ফেলিব। কেবল আত্মস্থ ব্রহ্মে সন্তুষ্ট থাকা অসঙ্গ উদাসীন শ্মশানবাসীর ধর্ম্ম, যাঁহারা সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মসুখে সুখী হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে এ ধর্ম্ম কদাপি উপযোগী নহে।

সর্ব্বাতীত, সর্ব্বগত ও আত্মস্থ এ তিন ভাবেই ব্রহ্ম নববিধানের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। নববিধানের সাধক অনন্তের উপাসক। অন্য লোকে অন্তবিশিষ্ট হইতে অনন্তে উত্থান করিতে যত্ন করিতে পারেন, কিন্তু নববিধানীয় পক্ষে তাহা অসম্ভব। ভূমা মহান্ অনন্ত ঈশ্বর প্রথম হইতে তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি অন্তবৎ পদার্থে আপনার ইষ্টদেবতাকে বদ্ধ রাখিবেন কি প্রকারে? যাহা কিছু অন্তবৎ তাহা ঈশ্বর নহেন, এ ধারণা তাঁহার মনে যে দিন হইতে হইয়াছে, সেই দিন হইতে দেশে কালে আবদ্ধ ঈশ্বরের আরাধনা তাঁহার নিকটে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অনন্তকে তিনি করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় নিঃশেষরূপে ধরিয়া ফেলিবেন, ঈদৃশ প্রমত্তের চিন্তা তিনি কখন হৃদয়ে পোষণ করেন না, কিন্তু তিনি অনন্ত বিনা ঈশ্বরকে আর কিছু জানেন না, ইহাতেই তিনি নিতান্ত পরিতৃপ্ত। জ্ঞানপ্রত্যক্ষ বিষয়ে তিনি অণুমাত্র সন্দেহ পোষণ করিতে পারেন না, কেন না তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বসংশয়ে নিপতিত হইতে হয়। জ্ঞানে যিনি অনন্ত তিনি তাঁহার আত্মস্থ, কেন না আত্মাই উপলব্ধির স্থল। নববিধানে যোগী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তাঁহার চক্ষুর সন্নিধান হইতে সমুদায় জগৎ ও জীব উড়িয়া গেল, এক সত্তামাত্র অবস্থান করিল। এই সত্তা জ্ঞানে অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত হইল। এস্থলে তিনি সর্ব্বাতীত ব্রহ্মকেই আত্মস্থ অবলোকন করিলেন, কেন না জগদাদি কিছুরই সঙ্গে আর তখন ব্রহ্মের কোন সংস্রব নাই। তিনি আপনাকে প্রথমে কোথায় দেখিলে? অনন্ত মধ্যে। যখন আত্মার দিকে দৃষ্টি পড়িল, তখন সেই ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে অনন্তকে বিরাজমান দেখিলেন। আত্মার মধ্যে অনন্তকে দেখিয়া তিনি চক্ষু মেলিলেন, অনন্ত ব্রহ্মে সমুদায় জগৎ ও জীব বিদ্যমান, জগৎ ও জীবে অনন্ত ব্রহ্ম বিদ্যমান। এই যোগে ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশকে এক করিল, আর কালদেশগত কোন বিরোধ রহিল না। যিনি সর্ব্বাতীত, তিনিই আত্মাতে, তিনিই স্বর্গগত নববিধানবাদী আর এখন ইহা কি প্রকারে অস্বীকার করিবেন। এত দিন যাহা বিরাগের বিষয় ছিল, তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টির নিকটে তাহা অন্তর্হিত হইল।

আত্মাতে, আত্মার অতীত ভূমিতে এবং সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া এই দাঁড়াইল যে, ব্রহ্মদর্শন নববিধানীর জীবনে ক্ষণকালের জন্যও আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারিল না। তিনি চিন্তাপথ হইতে সমুদায় বস্তু উড়াইয়া দিলেও তিনি ব্রহ্মকে তখন হারান না, কেন না সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম তখন তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যমান, তিনি যদি আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হন সেখানে তাঁহাকে আত্মস্থ দেখিয়া তিনি কৃতার্থ। যদি জগতের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে অন্য বস্তু দর্শনের পূর্ব্বে তিনি ব্রহ্মবস্তুকে অগ্রে দর্শন করেন। তিনি সকল সময়ে নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, শান্ত ও আনন্দিত। আজ যদি সমুদায় জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, আর যদি জগৎ তাঁহার সম্বন্ধে না থাকে, তাহাতে তাঁহার কি আসে যায়, সকল চলিয়া গেলে যিনি চলিয়া যান না, সর্ব্বদাই আছেন, তিনি তো বিদ্যমান তাহা হইলেই হইল। আর যদি নিত্য কাল জগৎ ও জীবের সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহাতেও ব্রহ্ম তাঁহার নিকটে এ সকল দ্বারা আচ্ছন্ন হইবার নহেন। তিনি আর কোন এক স্থানে ব্রহ্মকে আবদ্ধ রাখিয়া সুখী হইতে পারেন না। আত্মাতে আবদ্ধ রাখিলে সুখ হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র লীলাকারী ব্রহ্মকে দেখিলে যে গভীর আনন্দ হয় সে আনন্দের নিকটে সে সুখ কিছুই নয়। আর সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন না হইলে যোগের সঙ্গে ভক্তি আসিয়া মিলিবে কি প্রকারে? সকল নরনারীকে আপনা হইতে শ্রেষ্ঠভাবে দর্শন করিয়া প্রণত হওয়া, প্রণত হইয়া ভক্তিসঞ্চয় করা, ইহা কি সকল নরনারীতে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন ইহা না দেখিলে সম্ভবপর? অন্নে, বস্ত্রে, গৃহে, বিত্তে, সমুদায় পদার্থে ব্রহ্মকে বিরাজমান না দেখিলে এ সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া ভক্তি, প্রেম ও যোগ কি প্রকারে উপস্থিত হইবে? 'সঙ্গে তিনিই এক, বিরহে ত্রিভুবন তন্ময়' পূর্ব্ব কালের ভক্তেরা এরূপ বলিয়া বিরহেরই মর্য্যাদা বাড়াইয়াছেন, নববিধানের ঈশ্বর সহ বিচ্ছেদ নাই, অথচ ত্রিভুবনময় তাঁহাকে দেখিলে সুগভীর আনন্দ হয়। আত্মাতে দর্শনজনিত আনন্দ হইতেও তন্ময়দর্শন গভীরতর। এই আনন্দরসে নিয়ত নিমগ্ন থাকিতে না পারিলে নববিধানীর নববিধানিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পৃথিবীর লোক এই লক্ষণ দ্বারা নববিধানীকে চিনিয়া লইবে। তিনি সদা নির্ভয় নিশ্চিন্ত, সদা আনন্দিত ও প্রফুল্ল উহা যদি না হইল তবে যিনি এক স্থানে বদ্ধ নন, কিন্তু সর্ব্বত্র বিস্তৃত সেই ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া তিনি কি প্রকারে পরিচিত হইবেন? বায়ুর সুগন্ধ হিল্লোলে, অশনি বজ্রপাত ঝটিকা তুফানে, বিপদের ঘোরতর আক্রমণমধ্যে, সম্পদের

সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে আরোহণে, সংক্ষেপতঃ যে কোন পরীক্ষার পরিবর্ত্তনে নিত্যানন্দে, নিত্য আনন্দসম্ভোগে কখন বঞ্চিত হন না। আশা হয় সকল নববিধানবাদী 'বিস্তৃত ব্রহ্মের' উপাসক হইয়া, ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইবেন।

তহফতোল্ মওহদ্দিনের বঙ্গানুবাদ।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কৃত মূল পারস্য পুস্তকের অনুবাদ।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

দেখ পথের দূরত্ব কতদূর হইতে কতদূর পর্য্যন্ত।

বিশেষতঃ পূর্ব্বতন নরপালদিগের ইতিহাস ও বংশকাহিনী অনুমিতির অন্তর্গত বিষয়, কিন্তু ধার্ম্মিক লোকদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় বিশ্বাসের অন্তর্গত। অতএব একের অপরের সম্বন্ধে সম্পর্ক অনুমান—স্পষ্ট বিভিন্ন অনুমান। ইহা সত্ত্বেও যখন পূর্ব্বতন রাজাদিগের ঘটনাবলী ও বংশনির্ণয় ব্যাপারের মধ্যে ভাল মন্দ অনৈক্য ঘটে, তৎক্ষণাৎ সেই তত্ত্ব দৃঢ়তার মূল হইতে পতিত এবং বিশ্বাসের পরিধি হইতে বিনির্গত হয়। যথা রোমীয়সমাট্ আলেক্জাণ্ডারের চীন রাজ্য অধিকার ও তাঁহার জন্মতত্ত্ব বিষয়ে ইয়ুনান ও পারস্য দেশীয় ইতিবৃত্তিবিদ্‌দিগের মধ্যে অনৈক্য বিদ্যমান, তজ্জন্য উহা কোন পুরাতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির নিকট পূর্ণতা প্রাপ্ত ও প্রমাণিত নয়। ইহা ভাবিয়া দেখ, এক দলের দলিল এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মাগ্রণীদিগের যোগেই মানবজীবনে তত্ত্বালোকের সঞ্চার করিয়া থাকেন, কিন্তু এই কথার অমূলকতা নিতান্ত অভিব্যক্তবশতঃ তদ্বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু সেই দলই সমুদায় শুভাশুভের উৎপত্তি সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্নরূপে স্রষ্টার সঙ্গে স্থাপন করিয়া উহাকেই সৃষ্ট জীব সম্বন্ধীয় পরিব্যক্ত বিষয়ের কারণ সকলের সাক্ষাৎ উপলক্ষ বলিয়া জানে। পরিশেষে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের (অলৌকিকরূপে) সম্বন্ধে যে অসম্বন্ধ ব্যাপার তদ্বিষয়ে কথা বলা আবশ্যক। বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সমুদ্ভব ও পরমেশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ প্রচার উপলক্ষ ব্যতীত পরিব্যক্ত হয় বা না হয়, এই দুই কথা। তাহাদের প্রথম বাক্যটি অর্থাৎ অসম্পর্কিত ব্যাপারের কথা খণ্ডিত হইলে বাহ্য কারণ উপলক্ষ ব্যতীত সমুৎপন্ন হওয়া ব্যর্থ হইয়া যায়, এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের উপলক্ষে জগতের স্রষ্টা হইতে তত্ত্বলাভের আবশ্যকতা অবশিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের সমুদ্ভব ও বাহ্য হেতু ব্যতীত প্রত্যাদেশ হয় না খণ্ডিত হইলে, নিশ্চয় এরূপ অনুসন্ধানার্থীর প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় হেতুকে সেই প্রথম হেতুর অস্তিত্বের জন্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের বিশেষ সমুত্থান স্বীকার করে। পরে দ্বিতীয় হেতুর অস্তিত্বের জন্য তৃতীয় হেতুকে ও তৃতীয় হেতুর জন্য চতুর্থ হেতুকে এরূপ অসীম হেতু পর্য্যন্ত যোগ করিতে হয়। পরন্তু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের সমুত্থান ও প্রত্যাদেশ প্রচার অবিশেষ ভাবে পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য অসংযুক্ত ব্যাপারের ন্যায় বাহ্য হেতু সকলের অর্থাৎ নির্ম্মাণ ও নির্ম্মাতার উপর নির্ভর করে। লিখিত বিশ্বাস পাঠে ও প্রচার বিষয়ে উপলক্ষ সম্বন্ধে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে বিশেষত্ব দেওয়া যায় না। যেহেতু এক দল তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা করে, অন্যেরা ভ্রান্তি বলিয়া সমর্থন করিয়া থাকে।

ইহাদিগের কেহ কেহ বুদ্ধিগত বিচার প্রমাণে উপস্থিত হইয়া বলে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মের বিধি সকলের অনৈক্যবশতঃ কোন এক ধর্ম্মের অমূলকত্ব হয় না। বরং বর্ত্তমান ও ভূতকালের রাজপুরুষদিগের ব্যবস্থাবিষয়ে যেমন তাঁহারা সময়ের গতি অনুসারে পূর্ব্বতন বিধি সকলের খণ্ডন ও পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বিধি সকল প্রচার করেন, এবং একের খণ্ডনকারিত্ব ও অন্যের খণ্ডিতত্বসত্ত্বে সমুদায় লোক তৎসমস্ত বিধিকে সমূলক ও শাসনকর্ত্তা হইতে প্রচারিত বলিয়া জানে, তদ্রূপ ভাবা উচিত যেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রবর্ত্তিত বিভিন্ন ধর্ম্ম সকল সমূলক ও স্রষ্টার অভিপ্রেত, অপিচ ঈশ্বরের বিধি অনুসারে পূর্ব্বতন খণ্ডিতত্ব ও বর্ত্তমান খণ্ডনকারিত্ব হইয়াছে। কিন্তু ইহার শেষ কথা আদি সত্য পুরুষের কর্ত্তৃত্বকে ভাব ;—ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিশ্বাসমতে তিনি প্রত্যেক বিন্দুর অবস্থার ও ত্রিকালের গুপ্ত এবং ব্যক্ত ব্যাপারের জ্ঞাতা, অন্তরের নিয়ামক, ব্যক্ত কারণের কারণ, স্বার্থপরতা হইতে নির্ম্মুক্ত, নানা পরিবর্ত্তনশূন্য ; মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বকে ভাব, প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও অভাবগ্রস্ত, কল্পনাশ্রিত ও পরিণামজ্ঞানে দুর্ব্বল, ভ্রমক্রটির আধার, প্রবঞ্চনা ও কপটতার আলয় ; এই দুইয়ের চিন্তাতে কি পার্থক্যের যোগ হয় না? ইহা ছাড়িয়াও এই রহস্যে অপর গুরুতর দোষেরও যোগ হয়। যেহেতু ব্রাহ্মণগণ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়া থাকেন, সেই দলের ধর্ম্মপ্রণালীর বিশ্বাস ও ব্যবস্থা সকলেরপূর্ণতা সাধনের জন্য পরমেশ্বরের নিকট হইতে চির কাল দৃঢ় আদেশ তাহাদের পাওয়া হয়। যথা তাহারা এ বিষয়ে অনেক কথা পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগ করিয়া থাকেন, এবং তাহা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ থাকায় ও সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ বশতঃ এই নরাধম সেই ভাষা শিক্ষা করিয়াছে বলিয়া তাহা তাহার স্মৃতিপটে বিদ্যমান। এই সম্প্রদায় আপন মতে ঈশ্বরাদেশে বিশ্বাস করিয়া কঠিন নিপীড়ন সহ্য করা সত্ত্বে বরং এস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী হইতে হত্যার বিভীষিকা সত্ত্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে না। মোসলমানগণ কোরাণোক্ত এই বচন ঈশ্বরোক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন ;—"অতএব যে স্থানে তোমরা ঈশ্বরের অংশিবাদীদিগকে পাইবে তাহাদিগকে বধ করিও, এবং দৃঢ়রূপে বন্ধন করিও।" তাহারা ঈশ্বরের পক্ষ হইতে বলিয়া থাকে যে, অংশীবাদীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ অগ্রগণ্য, তাহাদিগকে উৎপীড়ন ও হত্যা করা সমুচিত *। এই মূল বশতঃ মোসলমানগণ ধর্ম্মরক্ষা ও আজ্ঞাকর্ত্তা পরমেশ্বরের আজ্ঞা সম্পাদনার্থ অংশীবাদী ও চরম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের প্রেরিতত্ব অস্বীকারকারীদিগকে বধ কিংবা

* কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়, কেহ কেহ বলেন, তিনি

নিপীড়নে কি ভূত কালে কি বর্ত্তমান কালে সাধ্যানুসারে সঙ্কুচিত হন নাই। এই সকল উৎপাতজনক ও পরস্পর বিপরীত আদেশ সকল কি আদি কল্যাণকর নিষ্কাম পরমেশ্বরের জ্ঞান ও প্রেম হইতে উৎপন্ন বলিতে হইবে, না গুরুতর প্রবঞ্চকের চরিত্রসম্ভূত গণনা করা যাইবে? সম্ভবতঃ বুদ্ধি দ্বিতীয়াংশ স্বীকারে উদ্যোগী হইবে। অনন্তর এই দুই তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌টি, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি এই সকল নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনার আরোপ করা, বা উভয় তত্ত্বকে কিংবা দুইয়ের একটিকে অসত্য বলা কল্যাণের নিকটবর্ত্তী হয়। একদল পবিত্র গ্রন্থের মর্ম্মাবধারণে আপনাদের অগ্রণীর প্রেরিতত্ব সমাপ্তির সংবাদ প্রদান করে, অপরে দাউদের সন্তানেই পরমেশ্বরের পক্ষ হইতে প্রেরিতত্ব সমাপ্তি ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল বিবৃতি প্রকৃতপক্ষে সমাচার হয়, কাব্য নয় যে, খণ্ডনকারিত্ব ও খণ্ডিত্ব উহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। যেহেতু একটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে অপরটিও সত্য বলিয়া স্বীকার করার যোগ্য হয়,এবং খণ্ডনের সম্ভাবনা উভয় দলে তুল্যরূপে হইয়া থাকে। এবিষয় ভাবিয়া দেখ। (ক্রমশঃ)

যোগসাধন।

স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর দাস প্রণীত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

প্রথমতঃ দুই দিন পাঁচ দিন এইরূপ অর্থময় ও মধুময় শব্দ সাধক আপন প্রাণের মধ্যে শুনিলেন। তখন ভাবিয়াছিলেন, প্রাণেশ্বর বুঝি কেবল তাঁহারই প্রাণমন্দিরে, আর বুঝি কোথাও নাই। পরে কিছুকাল সাধন করিতে করিতে শুনিলেন, সে শব্দ সে স্বরমাধুর্য্য সে অর্থগাম্ভীর্য্য সর্ব্বত্র ও সকল বস্তু হইতেই আইসে। তখন শুনেন, বৃক্ষসকল কথা কয়, আকাশের পক্ষিগণ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল কথা কয়, বায়ু তাঁহারই প্রেমের সংবাদ বহন করে। গুল্ম, লতা, ফল, পুষ্প, সকলের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পান *। প্রত্যেক মনুষ্য ও প্রাণী তাঁহার আবাস বলিয়া বিশ্বাস করেন। †

বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিবার সময় তহফতোল্ মওহদ্দিন পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কথা সকল তাহা অপ্রমাণিত করিতেছে। কেন না তাঁহার রঙ্গপুরের বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার অনেক দিন পরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসম্প্রদায় হয় নাই। ব্রাহ্মদল গঠিত হওয়ার ও অনেক পরে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে এই লেখা দ্বারা প্রতীতি হয়। ব্রাহ্মগণ একেশ্বরবাদী, তাঁহারা অংশীবাদীদিগের মধ্যে গণ্য কেমন করিয়া হইতে পারেন বুঝিতে পারা যায় না। তবে তাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করিতেন না, এরূপ মনে হয়।—অনুবাদক।

* যোবৈভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্। উপনিষৎ।

† সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ গীতা

দর্শন যোগ।

যখন সাধক দূরে ও নিকটে প্রাণেশ্বরের কথা শুনিতে পান, তখন তাঁহার হৃদয়ে আর এক নূতন ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। তখন ভাবেন, এমন সুন্দর সুমিষ্ট অভয়প্রদ যাঁহার স্বর, এমন আশ্চর্য্য যাঁহার দয়া, তাঁহার কি রূপ নাই? অবশ্যই আছে। সেরূপ কি এই পার্থিব রূপের ন্যায়? বোধ হয় না। সে রূপরাশি না জানি কত মনোহর। সে রূপ কি দেখিতে পাইব না? কেমন করিয়া দেখিব? কে তাঁহাকে দেখিয়াছে? এই বলিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলিত হন। সে ব্যাকুলতা সামান্য নহে। সাধক তাহার উত্তেজনা সহ্য করিতে অসমর্থ। * কিন্তু প্রাণেশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া সাধকের ইচ্ছায় নহে, তাঁহার ইচ্ছায়। সাধক চেষ্টা করিয়া কি করিতে পারেন? মনুষ্য কি চেষ্টা করিয়া আকাশ ধরিতে পারে? তাঁহার ইচ্ছা হইবে কি না, কিরূপে ভাবা যাইবে। আবার যখন মনে পড়ে, তিনি কথা কহেন, সাধককে ভীতিশূন্য করিবার জন্য অনেক বার কথা কহিয়াছেন, তখন আশা ও আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়।

বহু দিন এইরূপ উৎকণ্ঠার যাতনা ভোগ করিতে করিতে যখন সাধকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় এবং তথাপি তিনি সেই দর্শনলালসা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তখন প্রাণেশ্বর আর দূরে থাকিয়া আপন ভক্তকে কান্দাইতে ভাল বাসেন না। যদি ভাল না বাসেন, তবে এত দিন ভক্তকে কান্দাইলেন কেন? এত দিন সাধকের মনে রজস্তমঃপ্রভাব কামলোভাদির প্রভাব ছিল এই জন্য। এত দিন সাধক সর্ব্বতোভাবে প্রাণেশ্বরের চরণে আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারেন নাই এই জন্য। প্রাণেশ্বর যখন দেখিলেন, সাধক অকপট ভাবে তাঁহার জন্য কান্দে এবং কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার হৃদয়ের অন্য ভাব অন্য চিন্তা বিলুপ্ত হইয়া যায়, † তখন দেখা দেন। ভাবনির্জিত চিত্তে উৎকণ্ঠা ও অশ্রুপূর্ণ নেত্রে যখন সাধক অনন্যমনা হইয়া চিন্তা করিতে থাকেন, তখন দেখা দেন; ‡ কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য, একবার মাত্র। একবার দেখা দিয়াই আবার অন্তর্হিত হন। সে রূপ কত কমনীয়, কত সুন্দর তাহা ব্যাখ্যা করিবে কে? একবার দেখিলেই হৃদয়ের সকল শোক ও শল্য দূর হয়। § ভক্ত সেই মহানিধি হাতে পাইয়া আবার যখন হারান, তখন মহাবিহ্বল হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে থাকেন। সে রূপ একবার দেখিলে কে ভুলিতে পারে? সে চিত্তানন্দকারী সৌন্দর্য্য আর না দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারে? কেহই না,সুতরাং ভক্ত অধীর ও ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করেন। প্রভু এরূপ করেন কেন, একবার

* নাপি তত্র সহস্তে তে বিলম্বং ক্ষণমাত্রকম্। •
ভগবানপি তান্ হাতুং মনাগপি ন শক্নুয়াৎ॥ ভাগবতামৃত

† তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥ ভাগবত।

‡ ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিতচেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ॥ তথা।

§ রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃকান্তং শুচাপহং। তথা।

দেখা দিয়া আবার পলায়ন করেন কেন? ভক্তকে অধিক পরিমাণে সুখী করিবার জন্য। বহু কালের অদর্শনের পর সম্মিলনে যে আনন্দ জন্মে, তাহার পরিমাণ করা যায় না। অথবা অনুরাগের গাঢ়তা স্থাপন করিবার জন্যও হইতে পারে। ইহাও ভক্তের চির মঙ্গলের নিদান। কেন না দর্শনের পর বিরহ হইলে পুনর্দর্শনের লালসায় ভক্ত একেবারে সংসারবাসনা পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না।* সাধক আবার সংযত হন, আবার প্রাণেশ্বরের চিন্তায় চিত্তনিবেশ করেন। আবার বাহিরের পদার্থনিচয় হইতে বিমুক্ত হন, আবার উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলে। সেই সময়ে আবার প্রাণেশ্বর দর্শন দেন। সেই সময়ে আবার সেই প্রেমের সুস্নিগ্ধ মূর্ত্তি ভক্তের নিকটে প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহার পরেও মধ্যে মধ্যে প্রাণেশ্বর প্রাণমন্দির শূন্য করিয়া চলিয়া যান। দুই দিন চারি দিন অদৃশ্যভাবে থাকেন, থাকিয়া ভক্তের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা করেন। আবার দেখা দেন। কখন দুই দিন অবিচ্ছেদে কাছে বসিয়া রহিলেন, আবার পাঁচ দিন কোথায় চলিয়া গেলেন। আবার পাঁচ দিন দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন, দুই দিন অদৃশ্য রহিলেন। এইরূপে যত অধিক দিন অতীত হয়, ততই বিচ্ছেদের পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকে। প্রভু যখন নানা পরীক্ষায় ফেলিয়া দেখিলেন ভক্ত তাঁহার চরণ কিছুতেই ছাড়ে না, তখন আর ভক্তকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। এই সময়ে সাধকের মনে আর এক নূতন ইচ্ছার সঞ্চার হয়। সাধক ভাবেন, প্রভু দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন, কিন্তু এখন আর তেমন কথা কহেন না কেন? পূর্ব্বে দূরে থাকিয়া কত কথা কহিয়াছেন, এখন দর্শন দেন, দেখিয়া প্রাণ জুড়ায় কিন্তু সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহার কথা শুনি না ইহা বড়ই দুঃখ। ইচ্ছা করে, তাঁহার নিকটে বসি, বসিয়া মন খুলিয়া সকল কথা বলি। তিনি আইসেন নীরবে থাকিয়া চলিয়া যান। ইহাতে বড় ভাবনা হয়, কি অপরাধ করিয়াছি বলিয়া ভয় হয়। নতুবা এত দয়া করিলেন, অধম বলিয়া ঘৃণা করিলেন না দর্শন দিলেন, কিন্তু কথা না বলিয়া চলিয়া যান কেন? সাধক আবার ভাবেন, না, তিনি যদি বিরক্ত হইবেন, তবে হাসিবেন কেন? যখন আগমন করেন, তাঁহার হাসিতে দিগন্ত আলোকিত হয়, চন্দ্র হাসে, সূর্য্য হাসে, নক্ষত্রাবলি হাসে, যাহার দিকে তাকাই তাহাকেই হাসিতে দেখি। ভাবিতে ভাবিতে ভক্ত আর সহ্য করিতে পারেন না—অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভো, কেন নীরবে থাকিয়া তোমার দাসকে কান্দাও? দাস কি অপরাধ কি ত্রুটী করিয়াছে কও। যদি ত্রুটী হইয়া থাকে দণ্ডবিধান কর, দাস সে দণ্ড ভোগ করিয়া সুখী হইবে। তবু নীরবে থাকিয়া আর দুঃখ দিও না।" প্রাণেশ্বর তখন হাসিতে হাসিতে উত্তর দেন, বলেন, "বৎস, আমি প্রত্যেক নরনারীর জন্য প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াই, আর স্বভাবের দান ভিক্ষা করি। তুমি যদি আমার দর্শন না চাও, তবে দর্শন পাইবে না, যদি চাও পাইবে। তুমি পাছে কথা কহিতে না চাও এই জন্য আমি আগে কথা কহি না। তোমার সরল ইচ্ছার যোগ না হইলে, যদি আমি কথা কহি, তুমি শুনিবে না, উপেক্ষা করিবে। এই জন্য আগে কথা কহিবার আমার অনিচ্ছা। আমি অনেকের সঙ্গে আগে কথা কহিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সরল ইচ্ছা জন্মিলে যদি কথা কহি, আমিও সুখী হই, ভক্তও সুখী হয়।"* এইরূপে সাধক প্রাণেশ্বরের দর্শন পাইয়া তাঁহার প্রসন্ন প্রেমাননের কথা শুনিয়া কৃতার্থ হন। এই হইতে তাহার সন্দেহ শোক, সন্তাপ সমুদায় দূর হইয়া যায়।† তখন তাহার আর ভয় ভাবনা থাকে না।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে যাঁহার আকৃতি নাই, তাঁহার আবার দর্শন কি? তাঁহার আবার সৌন্দর্য্য কি? তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল। তাহাও যদি তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন, তবে আমি বলিব, তাঁহারা সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে জানেন না। আমরা যাহাকে সৌন্দর্য্য বলি, তাহার কোন আকৃতি নাই। সৌন্দর্য্যের আকৃতি নাই, অথচ আমরা সৌন্দর্য্য দেখি। বস্তুতঃ আকৃতি বস্তুর কিন্তু সৌন্দর্য্যের নহে। অতএব আমরাও প্রভুর গুণজ্ঞাপক সৌন্দর্য্যরাশি ভোগ করিতে চাই। বিশেষতঃ দর্শনশ্রবণাদি-শক্তি শরীরের নহে কিন্তু আত্মার। আত্মা দ্রষ্টা, তিনি অশরীরী, দৃশ্য ঈশ্বরও অশরীরী। অশরীরী আত্মা, আত্মময় দর্শনশ্রবণাদি দ্বারা অশরীরী ঈশ্বরের অমূর্ত্ত সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন। এস্থলে যদি কেহ ঈশ্বরের আকৃতি নাই বলিয়া দর্শন অসম্ভব মনে করেন, তবে তাঁহার ইন্দ্রিয়শক্তিবিষয়ক জ্ঞান নাই বলিলে দোষ হয় না।

[ক্রমশঃ]

* সকৃদ্যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তেঽনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্ মুঞ্চতি হৃচ্ছয়ান্॥ ভাগবত।

* এতাবদুক্ত্বোপররাম তন্মহদ্ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরং। ভাগবত।

† ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ ভাগবত।
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ ভাগবত।

প্রাপ্ত।

তস্মিন্ প্রীতিস্তৎপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনম্।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ভারতীয় ঋষিগণ উপাসনার এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন। মহাত্মা খ্রীষ্ট বলিলেন, ঈশ্বরকে সকল শক্তির সহিত মনের সহিত ও হৃদয়ের সহিত প্রীতি করাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, এবং তিনি আরও বলিলেন প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। ঈশ্বরকে প্রীতি করা সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের ও খ্রীষ্টের একই কথা।

তবে ভারতীয় ঋষিগণ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে বলিলেন, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিলেন, অধিকন্ত নিজ জীবনে তাহার চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন। এখানেও ভারতীয় ঋষিদিগের ও খ্রীষ্টের শিক্ষা, বাক্যে বিভিন্ন হইলেও, ভাবতঃ একই। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন ও যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন ও তাহাই। আমরা কামনা বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইয়া, আপনার জ্ঞান বুদ্ধির প্রভাবে কত কার্য্যই করিলাম। কি নিজ সম্পর্কে, কি পরিবারসম্পর্কে, কি সমাজসম্পর্কে ধর্ম্মের আড়ম্বরের ভিতর দিয়াই বা কত কার্য্য করিলাম। কিন্তু জীবনে যাহা কিছু সম্ভোগ হইল তন্মধ্যে ঈশ্বরের সুমিষ্ট দর্শনের ন্যায় মিষ্টতম আর কি আছে; এবং যাহা কিছু করা হইল ও হইতেছে তন্মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালনের ন্যায় হৃদয় মন আত্মার তৃপ্তিকর আর কি আছে? প্রীতির চক্ষে অনুরাগের চক্ষে তাঁহার প্রতি তাকাইলে সহজেই তিনি জীবের নিকট প্রকাশিত হন। অতি সহজেই জীব তাঁহার ভুবনমোহন মুখকান্তি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রীতি ভক্তিতে তাঁহাকে দর্শন ও প্রীতি ভক্তির সহিত তাঁহার ইচ্ছা পালনই সহজ ও সুমিষ্ট। তাঁহার ইচ্ছাপালনে সময় সময় বাহিরে ক্লেশের আবরণ থাকিলেও তাহার পরিণাম সর্ব্বদাই সুখ শান্তি আনন্দপ্রদ। প্রীতি ভক্তিতে তাঁহার দর্শন ও ইচ্ছাপালন সহজ ও সুমিষ্ট হয়, আবার তাঁহার দর্শন ও ইচ্ছাপালনেই প্রীতি ভক্তি গাঢ়তর ও গভীরতর হয়। অন্য উপায়ে তাঁহাকে প্রিয়রূপে দর্শন করিব ও তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালন করিব তাহার সম্ভাবনা কোথায়? জ্ঞান বুদ্ধির বিচারে অথবা কৌশলময় ব্যবহারে সংসারের পিতা মাতার সঙ্গে সন্তানের সম্বন্ধ রক্ষা হয় না। জ্ঞান বুদ্ধির বিচারে অথবা কোন প্রকার কৌশলময় ব্যবহারে আমরা সংসারের পিতা মাতার মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তাঁহাদের প্রতি প্রীতি ভক্তি অর্পণ করিতে আমাদের অধিকার হয় না এবং তাঁহাদের প্রিয়কার্য্যসাধনেও তেমন অনুরাগ জন্মে না। কেবল প্রীতি ভক্তির চক্ষেই আমরা সংসারের পিতা মাতার মহত্ত্ব বুঝিতে পারি, ঐ প্রীতি ভক্তিতেই তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারি। তবে এই প্রীতি ভক্তির চক্ষে পিতা মাতার মহত্ত্ব দর্শনে ও প্রীতি ভক্তিতে পিতা মাতার প্রিয়কার্য্যসাধনে কি জ্ঞানের কার্য্য নাই, বুদ্ধির প্রয়োগ নাই? অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহা প্রীতি ভক্তির আবরণে লুক্কায়িত। পরমপিতামাতা ঈশ্বরসম্পর্কেও তাহাই। মহান্ ভূমা ঈশ্বর যিনি, অগণ্য অসংখ্য জীবের স্নেহময় পিতা মাতা যিনি, যাঁহার সঙ্গে স্নেহের অচ্ছেদ্য বন্ধনেই প্রত্যেক জীব চিরবদ্ধ, যাঁহার সঙ্গে প্রীতির সুমিষ্ট সম্বন্ধই প্রত্যেক জীবের একমাত্র সম্বন্ধ, যিনি মহতোমহীয়ান্ হইয়াও এই সম্বন্ধের অনুরোধে ক্ষুদ্র কীটানুকীট জীবের সঙ্গে আপনাকে প্রেমবন্ধনে চির আবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কি ক্ষুদ্র জীবের প্রীতিভক্তিহীন জ্ঞান বুদ্ধির বিচার কৌশলপূর্ণ ব্যবহার শোভা পায়? তাই তিনি জ্ঞান বুদ্ধির বিচারে ও কৌশলময় সাধনার আড়ম্বরে কাহারও আয়ত্তাধীন হইলেন না। কিন্তু যখনই মানুষ তাঁহাকে প্রীতি ভক্তির সহিত ডাকিয়াছে তখনই তিনি আপনার সুমিষ্টরূপসৌন্দর্য্যে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাকে মোহিত করিয়াছেন। ভারতবাসী চিরকালই দর্শনপ্রিয়। তাঁহারা ভগবানের সুমিষ্ট রূপদর্শনে মোহিত হইয়া, দর্শনানন্দে বিভোর হইয়া কেবল দর্শনব্যাপাররূপ স্মরণ, মনন, ধ্যান ধারণাতেই আপনাদিগকে বিশেষভাবে আবদ্ধ রাখিতে ভাল বাসিতেন। তাই প্রিয়কার্য্যসাধন ভারতীয় ঋষিদিগের প্রদর্শিত ধর্ম্মের এক বিশেষ অঙ্গ হইলেও এবিষয়ে ভারতের সাধকদিগকে ইতিপূর্ব্বে অগ্রসর দেখা যায় নাই।

খ্রীষ্টের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনের ভাব বিশেষরূপে বিকাশ পাইয়াছে। তাই খ্রীষ্টসম্প্রদায় কর্ম্মভাবপ্রধান। শ্রীভগবানের বিশেষ করুণায় ব্রাহ্মসমাজ দর্শন বিষয়ে ভারতীয় সাধুদিগের বিশেষভাব ও ইচ্ছাপ্রতিপালনবিষয়ে খ্রীষ্টের বিশেষভাব এ দুইয়েরই অধিকারী হইয়াছেন। আমাদের কি সৌভাগ্য যে আমরা নিতান্ত অসার পাপীতাপী হইয়াও এমন পূর্ণ ধর্ম্মের অধিকারী হইলাম? সত্য ঈশ্বরের সত্য দর্শনে কত সুখ। আবার ক্ষুদ্র জীবনে ক্ষুদ্র শক্তিতে তাঁহার ইচ্ছাপ্রতিপালনে কত কৃতার্থতা! বড় বড় সাধু মহাজন, প্রেরিত প্রচারক প্রভৃতি মহাত্মারা তাঁহার সত্য দর্শনের বিমলানন্দ সম্ভোগ করিবেন, তাঁহার ইচ্ছাপ্রতিপালনে আপনাদিগের হৃদয় মন আত্মার তৃপ্তি সাধন করিবেন, সহজেই এ ধারণা হইতে পারে; কিন্তু নিতান্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রশক্তি, অসার মানুষ সংসারের কীট হইয়া সত্য ঈশ্বরের সত্য দর্শন লাভ করিবে ও তাঁহার ইচ্ছাপ্রতিপালনে মনুষ্যজীবনের চরম কৃতার্থতা প্রত্যক্ষ করিবে ইহা সামান্য কথা নয়। কিন্তু নববিধানে শ্রীহরি তাঁহার অপার করুণাগুণে ইহা সম্ভব করাইলেন। ইহা ঘরে ঘরে সামান্য মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। হে জীব! তোমার যে হৃদয়ে কামনা বাসনারূপ কদর্য্যমূর্ত্তি রাক্ষসীগণের নৃত্য ও লীলা খেলার স্থান ভিন্ন অন্য কোন মহত্তর ভাবের স্থান হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সেই হৃদয়ে যদি তুমি শ্রীহরির সুন্দর চিত্তবিমোহন রূপ প্রকাশিত দেখ, তোমার যে শক্তি জ্ঞান ও বুদ্ধির পক্ষে প্রবৃত্তি বাসনার সেবা করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটান ভিন্ন কোন শ্রেষ্ঠতর কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিবার সুবিধা হইত না, যদি তোমার সেই ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র জ্ঞান, ক্ষুদ্র বুদ্ধি ঈশ্বরের স্বর্গীয় পবিত্র অবতরণের ভূমি হয় ও তাঁহার পবিত্র মঙ্গল ইচ্ছা প্রতিপালনে নিযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয় মন আত্মার তৃপ্তি সাধন করে এবং মনুষ্য জীবনের চরম উৎকর্ষ যাহা তাহা তোমাকে প্রত্যক্ষ করায়, তবে ইহা অপেক্ষা তোমার পক্ষে সৌভাগ্যের অবস্থা আর কি হইতে পারে?

টাঙ্গাইল
২৭শে জুন ১৮৯৯। } শ্রীগ

সংবাদ।

বিগত শুক্রবার অপার সার্কুলার রোড ১৯৯ সংখ্যক ভবনে ভাই প্রসন্নকুমার সেনের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলার সঙ্গে কলিকাতাস্থ শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ সেনের শুভ পরিণয় ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রীর বয়ঃক্রম ২০ বৎসর, পাত্রের বয়স ৩০ বৎসর। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই বিবাহ আচার্য্যের কার্য্য এবং উপাধ্যায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সঙ্গীত প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ ও শ্রীমান্ মনোমত

ধন দে সঙ্গীত করিয়াছেন। বিবাহসভায় কলিকাতাস্থ বহুসম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। পরম জননী বর ও কন্যাকে দিন দিন পুণ্যপ্রেমে সমুন্নত ও পবিত্র সুখে সুখী করুন।

গত ২৬শে আষাঢ় সোমবার রাত্রিতে ভ্রাতা কুঞ্জবিহারী দেবের কলিকাতাস্থ বাসা বাটীতে তাঁহার মাতৃহীন শিশু পুত্রের নামকরণ বিনা আড়ম্বরে সাত্বিকভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উপাসনা কার্য্য ভাই গিরিশচন্দ্র সেন দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। তিনি শিশুকে শ্রীমান্ বিধানভূষণ দেব নাম দিয়াছেন। স্নেহময়ী জগজ্জননী কুমারকে নববিধানভূষণে ভূষিত ও জ্ঞানধর্ম্মে চির উন্নত করুন।

বিগত ১৮ই আষাঢ় প্রীতিভাজন শ্রীমান্ মোহিতলাল সেনের পিতার স্বর্গগমনদিনস্মরণার্থ তাঁহার কলিকাতাস্থ আবাসে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত বৃহস্পতিবার ফরিদপুর নগরে শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ বসুর স্বর্গগত সহধর্ম্মিণী সুকুমারীর আদ্যশ্রাদ্ধক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ উপাধ্যায় তথায় গিয়াছিলেন। গম্ভীরভাবে ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

গত শুক্রবার উপাধ্যায়ের স্বর্গগতা সহধর্ম্মিণী ও শ্রীমান্ অমৃতানন্দের জননীর স্বর্গগমনদিন স্মরণার্থ প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

আমরা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, ছাপরা নগরে বিগত ১৭ই আষাঢ় শনিবার ভাই দীননাথ মজুমদারের অতি স্নেহের জ্যেষ্ঠা কন্যা আমাদের স্নেহপাত্রী সরলাসুন্দরী স্বামী ও বৃদ্ধ জনক জননীর হৃদয়ে নিদারুণ শোকাঘাত করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ছাপরা নগরস্থ বারিষ্টার শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে তিনি পরিণীতা হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম একত্রিশ বা বত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার গর্ভজাত দুইটি শিশু কন্যামাত্র বিদ্যমান। ছাপরা হইতে ভাই দীননাথ মজুমদার আমাদিগকে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"আবার ভগবানের লীলা পরিবারে উপস্থিত। মা সরলা সূতিকালয়ে মৃত সন্তান প্রসবান্তে কয়েক ঘণ্টার পর গত শনিবার রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটের সময় মাতৃধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা দয়া দীনতা তাঁহার জন্য মাতৃধামে স্থান আহরণ করিয়াছে।" আমাদের ভ্রাতা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী আপনাদের বিশ্বাস ও স্বাভাবিক ধৈর্য্য গুণে দুই বৎসর পূর্ব্বে যেমন উপযুক্ত পুত্রের শোক অটলভাবে বহন করিয়াছেন, এই নিদারুণ শোকের আঘাতও ঈশ্বরকৃপায় সেইরূপ বহন করিতে পারিবেন ও তাহাদ্বারা জীবনের অতিশয় কল্যাণ সাধন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই কি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর স্বর্গগতা কন্যাকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় দান, শোকার্ত্ত স্বামী ও পিতামাতার অন্তরে সান্ত্বনা বিধান করুন।

গত ১৬ই আষাঢ় শুক্রবার দিবা দুই প্রহর দুই ঘটিকার পর নববিধানকীর্ত্তনীয়া মুদীয়ালীনিবাসী ভ্রাতা কুঞ্জবিহারী দেবের সহধর্ম্মিণী প্রসবের পর হইতে ক্রমাগত ছয় মাস কাল নানাবিধ রোগ ভোগ করিয়াছেন, পরিশেষে পক্ষাঘাত (Paralysis) রোগে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাসের একটি শিশুসন্তান ও তিনটি অল্পবয়স্ক বালক ও দুইটী বিবাহিতা কন্যা জামাতা দৌহিত্র,দৌহিত্রী এবং রুগ্ন বৃদ্ধ স্বামীকে পৃথিবীতে রাখিয়া জগৎজননীর শান্তি নিকেতন আশ্রয়পূর্ব্বক রোগ যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। শান্তিদায়িনী জননী শোকার্ত্তগণকে শান্তি বিধান করুন।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন পুস্তক বৃহদায়তনে সুপ্রণালীমতে ও সংশোধিতাকারে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। এবার উক্ত সঙ্গীত পুস্তক ন্যূনাধিক চল্লিশ ফর্ম্মায় সমাপ্ত হইবে।

পশ্চিম এশিয়ার আদি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ইহুদি ও মোসলমান জাতির আদি পুরুষ মহাত্মা এব্রাহিমের জীবনচরিত পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। এক পক্ষের মধ্যে তাহা সম্ভবতঃ প্রকাশিত হইবে।

গত ২৫শে আষাঢ় রবিবার প্রাতে নববিধান বিশ্বাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেবের সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসা বাটীতে নবসংহিতানুসারে অতি গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় উপাসনাদি কার্য্য ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র সঙ্গীত করিয়াছেন। উপাসনাতে পরলোকতত্ত্ব অতিবিষদরূপে বিবৃত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধস্থলে অনেকগুলি ব্রাহ্ম বন্ধু ও তাঁহার প্রতিবাসী হিন্দুবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাতার কন্যাদ্বয় ও পুত্রগণ একদিনে একসঙ্গে শ্রাদ্ধ করায় শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান সামগ্রী একত্র অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। পিতল কাঁসার বাসন তিন প্রস্থ, শয্যা তিন প্রস্থ, ছাতা, জুতা, আসন প্রভৃতি তিন প্রস্থ এবং ভাল শাটী ৭ খানা, গৈরিক চাদর ১১ খানা, অন্ধ খঞ্জ ও দরিদ্রদিগের জন্য বস্ত্র ১৩ খানা, গামোছা ১৬ খানা, চাউল এক মন, পয়সা ছয় টাকার রাখা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন নগদ্ দান ;—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির	...	...	২৲
ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২৲
অমরাগড়ী ব্রহ্মসমাজ	...	...	২৲
বালেশ্বর "	...	...	২৲
বেহালা "	...	...	২৲
মুদিয়ালী "	...	...	২৲
প্রচার আশ্রম	...	...	২৲
কলিকাতা অনাথাশ্রম	...	...	২৲
বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম	...	...	২৲
রাণীগঞ্জ অনাথাশ্রম	...	...	১৲
বাঁকিপুর অঘোরসমিতি	...	...	১৲
মুদিয়ালী হিতৈষিণী সভা	...	...	২৲
একটী হিন্দু বিধবা	...	...	১৲

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

মহাশয়, সমীপেষু

অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত পত্রখানি আপনার "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন :—

"আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে গত ভূমিকম্পে আমাদের স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল তাহার সংস্কারের জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ কমিটি বিগত অধিবেশনে আমাদের ইংলণ্ডস্থ সহৃদয় ইউনিটেরিয়ান বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ফণ্ড্ হইতে চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজকে এককালীন ৩২৲ টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত দানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ অন্তরে দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি।"

চন্দননগর
১০ই জুলাই
১৮৯৯।

নিতান্ত বশংবদ
শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস
সম্পাদক।
চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজ।

☞এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা শ্রাবণ মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪০ভাগ।
১৪ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে জীবিতেশ্বর, তোমার ইচ্ছাপালনের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ না করা তোমার আদেশ। তোমার ইচ্ছা কি? তোমার ইচ্ছা, তুমি যেমন, তেমনি আমরা আপনাকে ভুলিয়া পরসেবায় ব্যস্ত থাকি। আপনাকে ভুলিয়া পরসেবায় ব্যস্ত থাকিলে আমাদের নিজের কি হইবে, এরূপ নীচ চিন্তা যদি কখন আমাদের মনে আইসে তাহা হইলে কেবল যে আমাদের অবিশ্বাস হইল তাহা নহে, তোমার ইচ্ছাপালনের পথ আমাদের পক্ষে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। যাঁহারা তোমার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া পরসেবায় আপনাদের জীবন সমর্পণ করিলেন, তাঁহারা আর পরের বিষয় ভিন্ন আপনার বিষয় ভাবিবেন কেন? যাঁহারা পরের বিষয় ভাবেন তাঁহাদের ভার যে স্বয়ং তুমি বহন কর। তুমি ভার লইলে অথচ তোমার উপরে বিশ্বাস না করিয়া যদি তাঁহারা পরের ভাবনার সঙ্গে আপনাদের বিষয়ে ভাবনা আনিয়া যোটান, তবে তাঁহারা আর কদিন পরের ভাবনা ভাবিতে পারিবেন। একবার যখন তাঁহারা নিজের ভাবনা ভাবিতে আরম্ভ করিলেন, ভাবনার উপরে ভাবনা আসিয়া চাপিল; পরসেবার ব্রত আর তাঁহাদের রক্ষা পাইবে কিরূপে? প্রভো, এই পরসেবার ব্রত তুমি সকলের সম্বন্ধেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ। এমন নরনারী নাই, যাঁহার এই ব্রত জীবনে পালন করিতে হইবে না। যাঁহারা পরের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়া সংসারের সকল ভার হইতে অপসৃত হন নাই, নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালনে রত, পরসেবাব্রত তাঁহাদের সম্বন্ধেও তুমি ব্যবস্থা করিয়াছ। পিতামাতা পুত্রকন্যা ভ্রাতা ভগিনী ইঁহারা আপনাকে ভুলিয়া অপরের সেবায় রত থাকিবেন, এই তো তোমার ব্যবস্থা। যদি সংসারিগণ পরস্পর আপনার পরিবারস্থ অপর সকলের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে স্বার্থপরতানিবন্ধন প্রতিপরিবারে যে সুখশান্তি নিয়ত ভঙ্গ হইতেছে তাহা কখন হইত না। হে নাথ, মানবমানবী তোমার ইচ্ছার বিরোধে জীবন নির্ব্বাহ করিতে গিয়া যে দুঃখ ক্লেশ পাপ পরীক্ষায় নিপতিত হন, তাহাতে তোমার প্রতি দোষারোপ করিবার কি আছে? তাঁহারা নিজ সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া সংসারের ব্যবস্থার উপরে দোষারোপ করেন, ইহাই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। হে করুণানিধান পরমেশ্বর, আমরা যেন কখন

সেবাপ্রার্থী না হই, অপরের সেবাতেই আমাদের জীবনের কৃতার্থতা ইহা জানিয়া যেন যে কোন নরনারীর সেবা করিতে আমরা প্রস্তুত থাকি। বিনা সেবায় তোমার ইচ্ছা প্রতিপালন হয় না, ইহা জানিয়া যেন আমরা সেবাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধিকার বলিয়া গ্রহণ করি। হে দেব, নিয়ত পরসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমরা যাহাতে উপযুক্ত সন্তান হইতে পারি তুমি আমাদিগকে সেই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা বিনীত ভাবে বার বার তব চরণে প্রণাম করি।

স্বাভাবিক ভাব রক্ষা।

ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তিগণ মানবজাতির স্বাভাবিক ভাবসমূহকে নিরতিশয় ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, স্বাভাবিক ভাবসমূহের উচ্ছেদ সাধন না করিলে কখন ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারা যায় না। এই মিথ্যাদৃষ্টিনিবন্ধন কত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন, কত অস্বাভাবিক ভাব ধর্ম্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা করিতে পারা যায় না। এসকলেতে যে জনসমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে তাহা সকল দেশের ইতিহাসে পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। স্বভাবের বিরোধে গমন করিয়া যে সাধনের আরম্ভ সে সাধনে কৃতার্থ হওয়া দূরে থাকুক, বিবিধ বিঘ্ন তাহা হইতে উৎপন্ন হইবেই হইবে। যাঁহারা সাধনের চরম ফল লাভ করেন, এজন্যই দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের জীবন অতি স্বাভাবিক, ঠিক যেন তাঁহারা শিশুর ন্যায় হইয়াছেন। ইঁহাদেরই সম্বন্ধে আচার্য্য বলিয়াছেন:—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেবচ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥

"হে পাণ্ডব, প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ, ইহাদিগের ক্রিয়া যখন প্রকাশ পায় তখন উহাদিগকে তিনি দ্বেষ করেন না, যখন উহাদিগের ক্রিয়া আপনা হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন উহারা প্রবৃত্ত হউক এরূপ আকাঙ্ক্ষাও করেন না।" জ্ঞান যখন উজ্জ্বল থাকে তখন সমুদায় বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ পায়। বস্তুতত্ত্ব যথাযথ হৃদয়ঙ্গম হইলে এক দিকে তজ্জনিত আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, অন্য দিকে প্রকাশিত তত্ত্বসমূহের সহিত আপনার জীবনের মহৎ পার্থক্য দর্শন করিয়া তজ্জনিত তীব্র ক্লেশ উপস্থিত হয়, সুতরাং প্রকাশব্যাপার সুখের কারণ বলিয়া আকাঙ্ক্ষণীয়, দুঃখের কারণ বলিয়া দ্বেষের বিষয় হইয়া থাকে। যিনি গুণাতীত পুরুষ, তিনি উহা হইতে দুঃখ হয় বলিয়া উহাকে দ্বেষ করেন না, উহা হইতে সুখ হয় বলিয়া যখন প্রকাশক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে, তখন উহা প্রবৃত্ত হউক এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন না। প্রবৃত্তি হইতে কার্য্যোদ্যম উপস্থিত হইয়া থাকে। শান্তিপ্রিয় লোকদিগের কার্য্যোদ্যম ভাল লাগে না, সকল উদ্যম হইতে বিরত হইয়া কেবল ধ্যানচিন্তনসুখে কালাতিপাত করিতে বাসনা হয়, সুতরাং কার্য্যোদ্যম তাঁহারা দ্বেষ করেন, কার্য্যোদ্যম নিবৃত্ত হউক ইহাই আকাঙ্ক্ষা করেন। মোহের কার্য্য শোক দুঃখ কাহারই বা ভাল লাগে? সুতরাং যখন মোহের কার্য্য উপস্থিত হয়, তখন তাহাতে কে আর না দ্বেষ করিয়া থাকেন। অন্যদিকে মোহের কার্য্য মুগ্ধতা। মমতার বিষয়ে মুগ্ধতা কে না ভাল বাসে? সুতরাং এ মুগ্ধতার নিবৃত্তি না হউক এরূপ আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই হয়। গুণাতীত ব্যক্তি স্বভাবের নিয়মে শোক দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাতে দ্বেষ করেন না, মুগ্ধতাও আকাঙ্ক্ষা করেন না। স্বভাবের নিয়মে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ যখন যাহা জীবনে উপস্থিত হয় তখন তাহাতেই তিনি বিকারশূন্য হইয়া স্থিতি করেন।

যোগাচার্য্য গুণাতীত ব্যক্তির লক্ষণ কেবল বলিয়াছেন তাহা নহে, আপনার জীবনে উহার লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন। মহর্ষি ঈশাও গুণাতীত পুরুষ, তাঁহার জীবনে যোগাচার্য্যোক্ত গুণাতীত লক্ষণ অতি সুস্পষ্ট। তাঁহার সমগ্র জীবন কার্য্যোদ্যমপূর্ণ, তিনি নিরলস ভাবে রোগ শোক দুঃখ নিপীড়িত ব্যক্তিগণের হিতসাধন

করিয়া বেড়াইতেন। তিনি প্রশান্তচিত্ত ছিলেন, অথচ কপটাচার ধার্ম্মিকতার ভাণ দেখিয়া তীব্র ভৎসনা দ্বারা কপট ধার্ম্মিকত্বাভিমানী ব্যক্তিগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করিতেন। তিনি বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে শোকাশ্রুবর্ষণ করিতেন, বিবাহ সভায় গমন করিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণের আমোদ বৰ্দ্ধিত করিতেন। নিকটবর্ত্তী ভীষণ মৃত্যুর যাতনা স্মরণে সমগ্র রজনী জাগরণ করিয়া 'তিক্ত বিষপাত্র সম্ভব হইলে অপসরণ করিয়া লও' এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, এবং ভাবিযাতনানুভবে গভীর রজনীর শৈত্যমধ্যে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইলেন। তিনি শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়া নির্দ্দোষ মেষশাবকের ন্যায় সকল প্রকার প্রতিরোধ অবরোধ হইতে নিবৃত্ত থাকিলেন, ক্রুশের যাতনায় অধীর হইয়া "কেন পিতা ত্যজিলে আমায় *" বলিয়া পিতার নিকটে রোদন করিলেন, আবার পরক্ষণেই "পিতঃ, তোমার হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ করিলাম" "বিধান পূর্ণ হইল" বলিয়া তনুত্যাগ করিলেন। এ সকলই স্বাভাবিক ভাবের পরিচয়। কারণ ঈশ্বরে নিত্য স্থিতি করিলে যখন যে অবস্থা তিনি আনিয়া উপস্থিত করেন, তন্মধ্যে সেই অবস্থার অনুরূপ জীবনের নাট্যাভিনয় উপস্থিত হয়, অথচ নির্লিপ্ত শিশুর ন্যায় নির্লেপ ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। সাধে কি মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন "ক্ষুদ্র শিশুর মত না হইলে কেহ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।"

প্রবৃত্তিবাসনার অধীন ব্যক্তিগণ গুণাতীত শিশুর ন্যায় হইবেন, ইহা কি কখন সম্ভব? তাই তাঁহারা কোন এক দিকে ঝুঁকিয়া সাধন করিয়া থাকেন। প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নিতান্ত অধীর হইয়া তাহার বিনাশ সাধনের জন্য তীব্রতর কৃচ্ছ্রসাধনে তাঁহারা প্রবৃত্ত হন, অল্প দিনের মধ্যে শরীর ভাঙ্গিয়া যায়, আর প্রবৃত্তির আবেগ বহন করিবার সামর্থ্য থাকে না, সুতরাং সহজে তখন তাহার অধীনতা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয়। পূর্ব্বকালের সাধকগণ এইরূপে ক্রমান্বয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। যথাসময় মধ্যপথের আবিষ্কার হইল। যাহাতে রোগাদি উপস্থিত না হয়, এই ভাবে তাঁহারা তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু এখানেও কেবল মানুষের প্রযত্ন প্রধান রহিল, ঈশ্বরের কৃপা তৎসহ সংযুক্ত হইল না, সুতরাং ইহাতে সাধনের অভিমান উপস্থিত হইয়া সাধকগণকে অন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। আমি সাধন করি অপর কেহ সাধন করে না, আমি ক্রোধাদিকে কেমন দমন করিয়াছি, কেমন আমার চরিত্র শুদ্ধ ইত্যাদি অহঙ্কার সাধনের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মনে প্রবেশ করে, এবং সেই অহঙ্কারই পতনের কারণ হয়। এই অহঙ্কার দিন দিন সাধককে অন্ধ করিয়া ফেলে।

* "কেন পিতা ত্যজিলে আমায়" এই কথা গুলি দ্বাবিংশ সামের প্রারম্ভিক বাক্য। সম্ভবতঃ মহর্ষি ঈশার ঘোর যাতনার সময়ে তাঁহার চিত্তের ভাবের অনুরূপ এই সাম তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, তাই তিনি সামের প্রারম্ভিক বাক্যে তাঁহার তৎকালীনকার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই সামের প্রথমাংশে যে প্রকার বিরহযাতনা ও দৈহিক ক্লেশের বর্ণনা আছে তাহাতে তাঁহার মনের ভাবানুরূপ এই সাম সে সময়ে তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইবে, তাহা আর অসম্ভব কি? তাঁহার দৈহিক যাতনা এই সামে কেমন সুন্দর বর্ণিত রহিয়াছে। "জলের মত আমাকে ঢালিয়া ফেলা হইতেছে, আমার সমুদায় অস্থি সন্ধিচ্যুত হইতেছে, আমার হৃদয় মোমের মত হইয়া গিয়াছে, উহা আমার অন্ত্রের ভিতরে গলিয়া পড়িতেছে। খোলার মত আমার বল শুকাইয়া যাইতেছে, আমার রসনা তালুতে লাগিয়া যাইতেছে। তুমি আমাকে মৃত্যুর ধূলি মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছ। কুকুরেরা আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়াছে, দুর্ব্বৃত্তগণের দল আমায় ঘেরিয়াছে, তাহারা আমার হস্ত ও পদ বিদ্ধ করিয়াছে। আমি আমার অস্থিগণের বিষয় বলিতে পারি, তাহারা যেন দেখিতেছে এবং আমার উপরে তাকাইতেছে। তাহারা আমার পরিচ্ছদ ভাগ করিয়া লইতেছে, তাহারা আমার পরিচ্ছদের উপরে বাজি রাখিতেছে। হে প্রভো, আমা হইতে দূরে থাকিও না। হে আমার বল, তুমি শীঘ্র আসিয়া সাহায্য কর। তরবারি হইতে আমার আত্মাকে রক্ষা কর, আমার প্রিয়জনকে কুকুরের ক্ষমতা হইতে রক্ষা কর।" ইত্যাদি। সামের প্রথমাংশে যে প্রকার বিরহ বর্ণন আছে, শেষাংশে সে প্রকার বিরহজনিত দুঃখের কথা বর্ণিত নাই। শেষাংশ ঈশ্বরের প্রশংসাবাদে পূর্ণ। সুতরাং ক্ষণিক বিরহান্তে পুনঃ সম্মিলন হইল বলিয়াই তিনি "তোমার হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ করিলাম" বলিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন।

আমি সম্পন্ন হইয়াছি, এই অভিমানে সাধনের তীব্রতা অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া আইসে, প্রলোভন সম্বন্ধে সাহসিকতা বাড়ে, অবসর পাইয়া রিপুগণ আসিয়া পুনরায় অধিকার স্থাপন করে।

ভারতের সাধকসমাজ যখন এই প্রকার বিঘ্ন দ্বারা ক্রমান্বয়ে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন, তখনই নূতন পথ দেখাইবার জন্য যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের উদয় হইল। তিনি বাল্যকালে গোপগণের মধ্যে গোপগণোচিত এবং যৌবনে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার; পরিপক্ক বয়সে হিমালয়ে যোগসাধন জন্য কতক দিন নির্জ্জনে বাস, এবং সাধনান্তে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার জীবন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে স্বাভাবিক একটুও স্বভাববিরোধী নহে। যেমন তাঁহার ক্ষাত্রতেজ তেমনই তাঁহার কোমল হৃদয়, যেমন তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান তেমনই তাঁহার অপরোক্ষ দর্শন। যদি আমাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রথম প্রবর্ত্তক কে? আমরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকেই দেখাইয়া দিব। তাঁহার কথিত বিজ্ঞানযোগ ব্রহ্মবিজ্ঞানের মূল। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং অন্যান্য যোগ যাহা তিনি বলিয়াছেন, এই বিজ্ঞানযোগের উপরে স্থাপিত। ক্রমোন্নতির নিয়মে ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে উন্নত হইয়া বিক্ষিপ্ত উপাদানরূপে চারিদিকে ছিল; সে সকলকে একত্র করিয়া এক অখণ্ড ধর্ম্মে তিনি পরিণত করিয়াছেন। যাঁহারা প্রথম সাধনে প্রবৃত্ত তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিলে পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবেন তাহার ব্যবস্থা তিনি এইরূপ করিলেন :—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

"যাঁহা হইতে ভূতগণের প্রবৃত্তি, যিনি সমুদায় জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, স্বকর্ম্ম (স্বাভাবিক কর্ম্ম) দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া মানব সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।" মনুষ্য স্বভাবতঃ যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, সে সকল কর্ম্মের ভিতরে ভগবানের প্রেরণা অনুভব করিয়া, এ সকল কর্ম্ম করিয়া তাঁহারই আজ্ঞাপালন করিতেছি, এই ভাবে যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহার আর কর্ম্মজনিত অভিমান ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে উত্তরোত্তর উচ্চ সোপানে আরোহণ হইয়া ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপস্থিত হয়। সুতরাং যোগাচার্য্য প্রদর্শিত রীতিতে প্রথম হইতে স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করিয়া চলিলে কৃতার্থতা লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই।

সেবক ও সেবিকা।

অপরে আমাদিগের সেবা করিবে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা দুঃখের মূল। সেবা গ্রহণে আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া কখনই সম্ভব নয়। আকাঙ্ক্ষামাত্রেরই প্রকৃতি এই যে, উহা কোনরূপে তৃপ্ত হয় না। যে সেবা চায় তাহাকে যত সেবা করা যায়, তত তাহার সেবা পাওয়ার অভিলাষ বাড়ে। কোন কারণে সেবার একটু ত্রুটি হইলে অমনি তাহার ক্রোধ ও অভিমানের সীমা থাকে না। সেবাগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই অপ্রাকৃতিক, তাহা না হইলে উহা ক্লেশাবহ হয় কেন? আমাদের প্রকৃতি যদি ঈশ্বরের প্রকৃতির অনুরূপ হয়, তাহা হইলে সেবা-গ্রহণ নহে, অপরকে সেবা করাই আমাদের প্রকৃতিসঙ্গত। আমরা সেবা আকাঙ্ক্ষা করিব না, কিন্তু সেবা করিব, এই যদি আমাদের সর্ব্বথা যত্ন হয়, তাহা হইলে দুঃখ ও অভিমানের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। সেবা করিতে গিয়া যে আনন্দ হয়, সেবা গ্রহণ করিয়া কখন সে আনন্দ হয় না।

দেখ সংসারে পিতামাতার তুল্য গুরুজন কেহ নাই। যদি কেহ সেবা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন, তবে তাঁহারাই করিতে পারেন। এক দিন তাঁহারা

আমাদের যে সেবা করিয়াছেন, সমুদায় জীবন ব্যয় করিয়াও আমরা তাহার পরিশোধ করিতে পারি না। যদি তাঁহাদের সেবায় আমাদের ত্রুটি হয়, তাহা হইলে আমরা কেবল তাঁহাদের নিকটে অপরাধী হইলাম তাহা নহে, আমরা ঈশ্বরের নিকটে পর্য্যন্ত অপরাধী হইলাম। যদিও পুত্রকন্যার পিতামাতার সেবা করা কর্ত্তব্য, এবং ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত তাঁহাদের যথোচিত সেবা করিবেন, ইহাই পরম ধর্ম্ম, তথাপি পিতামাতার পক্ষে সেবালাভের আকাঙ্ক্ষা করা কখন ভাল নহে। তাঁহাদের মনে এইরূপ ভাব থাকাই সঙ্গত যে আমরা পুত্রকন্যার সেবা করিয়াছি, এখনও আমাদের সেবা করা নিবৃত্ত হয় নাই; পূর্ব্বে শরীর-সম্বন্ধে সেবা করিয়াছি, এখন আর শরীরের সেবা করিবার প্রয়োজন নাই, এখন ইহাদের আত্মার সেবায় আমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে। পিতা-মাতা এ সেবার বিনিময়েও সেবা আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরা-কাঙ্ক্ষ। এই নিরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ তাঁহারা পুত্র কন্যার সেবার ত্রুটিতে উত্যক্তচিত্ত হন না, যে কিছু তাহারা সেবা করে, তাহাতেই অতি হৃষ্টচিত্ত হন, এবং নিয়ত কৃতজ্ঞ অন্তরে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। যে পিতামাতার হৃদয়ে সেবা পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহারা অনেক সময়ে পুত্রকন্যার সেবায় কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে ক্রুদ্ধ হন, অভিমানপরবশ হন, অতিরিক্তমাত্রায় বিরক্ত হইলে অভিশাপ পর্য্যন্ত দেন। ইহা যে পিতা-মাতার স্বভাবের বিরোধী, ইহা কি আর বলিবার অপেক্ষা রাখে?

সেবা করাই যদি আমাদের প্রতিজনের জীব-নের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, তবে কেহ সেবা করিতে আসিলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব কেন? নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া সেবা গ্রহণ এই জন্য কর্ত্তব্য যে, সেবাকারীর তদ্দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেবা করিতে না দিলে তাহার প্রাপ্য পুণ্য অন্যায়পূর্ব্বক হরণ করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং আমি আকাঙ্ক্ষাবিরহিত হইয়া যদি সেবা গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমার মনে কোন বিকার জন্মিল না, অথচ সেবাকারীর পুণ্যলাভে সাহায্য হইল। যদি বল অপরের পুণ্য হউক ইহা বলিয়া সেবার প্রতিরোধ না করিলে অল্পে অল্পে সেবাগ্রহণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং এই আকাঙ্ক্ষা চিত্তকে কলুষিত করিয়া ফেলিবে। এরূপ স্থলে সেবা আদৌ গ্রহণ না করাই তো ভাল। তোমার এ কথার ভিতরে স্বার্থ-পরতা আছে, ইহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তুমি আপনাকে দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত ক্লেশ দুঃখাদি হইতে বাঁচাইতে ব্যস্ত হইলে, অথচ অন্যের পুণ্যা-র্জ্জনের পথ অবরুদ্ধ করিলে, ইহা কি স্বার্থপরতা নয়? তুমি এ কথা বলিতে পার না যে, তোমার মনে এই গর্ব্ব উপস্থিত হইবে যে, আমার সেবা করিলে অমুকের পুণ্য হয়। তুমি কে? একজন ঘোর অধম পাতকী পতিতের সেবা করিয়াও যখন সাধু সজ্জনের পুণ্যসঞ্চয় হয়, তখন তোমার ইহাতে অভিমান করিবার কি আছে? যে সেবা করে সে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে বলিয়া তাহার পুণ্য হয়; তুমি পুণ্য হইবার পক্ষে এখানে কারণ নহ। আর দেখ, এক জন তোমার সেবা করিতে আসিল তুমি তাহাকে সেবা করিতে দিলে না; ইহাতে সে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে পারিল না। এই যে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা-পালনে প্রতিরোধ করিলে, ইহাতে তোমার অপ-রাধ হইল। যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধা অভক্তিপূর্ব্বক কেবল ভয়ে বা স্বার্থানুরোধে বা লজ্জায় পড়িয়া সেবা করে, তাহার সেবা না গ্রহণ করাই ভাল। কেন না তাহাতে সে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে না, বরং তাহার বিপরীতাচরণ করিতেছে। এ স্থলে সেবা গ্রহণ না করাতে কোন অপরাধ নাই।

দেখ এই পৃথিবীতে অনেক লোকে পুত্র কন্যা কামনা করে এই জন্য যে, শেষ বয়সে তাহাদিগের নিকটে সেবা প্রাপ্ত হইবে। যদি কন্যা না থাকে, পুত্রের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ এই জন্য গৃহে আনয়ন করে যে, পুত্রবধূ তাহাদের সেবা করিবে। যাহারা

স্বয়ং দাস দাসী হইয়া পুত্রকন্যাদির সেবা করিবে, তাহারা প্রভু হইয়া সেবা গ্রহণ করিতে চায়, ইহাতে কি তাহারা নিরপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? পুত্র নয় দাস, কন্যা বা পুত্রবধূ নয় দাসী, এরূপ মন যাহাদের তাহাদের ভাগ্যে কোন দিন সুখ নাই। ঘরে ঘরে এই আকাঙ্ক্ষার জন্য কি ক্লেশের আগুন নিয়ত জ্বলিতেছে, ইহা দেখিয়াও লোকের চৈতন্যোদয় হয় না। আকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া যাহারা ক্রমান্বয়ে সেবা চায়, সেবা করিয়া সুখী হইবার পক্ষে একটুও অভিলাষ না থাকে, তাহাদের সে আকাঙ্ক্ষা কোন দিন পূর্ণও হইবে না, মনের ক্লেশেরও অবসান হইবে না। কাহারও যদি সুখী হইবার বাসনা থাকে, তবে যেন সে ক্রমান্বয়ে কেবল সেবা করিতেই চায়।

তুমি যদি আমায় জিজ্ঞাসা কর, তোমার মনের খেদ কি? তুমি কিছুতেই আপনাকে সুখী মনে করিতেছ না কেন? আমায় যদি নিষ্কপটে মন খুলিয়া ইহার উত্তর দিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, আমি তোমার সেবা করিতে অবসর পাইতেছি না, ইহাতেই আমার মনের গভীর ক্লেশ। তোমার সেবা করিতে যে অন্তরায় আছে, আজ যদি সে অন্তরায় চলিয়া যায়, প্রাণ ভরিয়া তোমার সেবা করিতে পারি, আমার মনে আহ্লাদের পরিসীমা থাকিবে না। যখন সেবা করিতে না পাইয়া মনে গভীর ক্লেশ উপস্থিত, তখন সেবা করিতে পাইলে যে নিরতিশয় সুখী হইব, তাহাতে মন সন্দেহ করিতে পারে না। সেবা করিতে না পাইয়া মন নিয়ত অসুখী, এই দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি যে, নরনারী সেবক ও সেবিকা, সেবাতেই তাহাদের আনন্দ। ভগবান্ করুন, সেবা করিবার অন্তরায়গুলি শীঘ্র অন্তর্হিত হউক, সেবা করিয়া আমরা অতিমাত্র সুখী হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমিতো সকল প্রকারের অভিলাষের বিরোধী। যেখানে কোন একটি অভিলাষ রাজ্য করে, সেখান হইতে তুমি অপসৃত হও, ইহাইতো দেখিয়া আসিতেছি। আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি, অভিলাষ যদি এরূপই ঘৃণার সামগ্রী হইল তাহা হইলে মানবহৃদয়ে অভিলাষ স্থাপিত হইল কেন?

বিবেক। অভিলাষ ঘৃণার সামগ্রী, ইহা কেন তোমার মনে আসিল? অভিলাষের অপরাধ কি? মানুষ যে বিষয়সম্বন্ধে অভিলাষ পোষণ করে, সেই বিষয়ানুসারে অভিলাষ সদোষ ও নির্দ্দোষ হয়। আমার সঙ্গে যাহার সর্ব্বদা মিল আছে, তাহার কি আর অভিলাষ নাই? ঈশ্বরের স্মরণ মনন চিন্তন, পরের কল্যাণের জন্য নিয়ত ব্যস্ততা, বিপথগামী ব্যক্তিগণের জন্য ব্যাকুলতা, তাহারা বিপথ হইতে ফিরিয়া আসুক, এজন্য মনের প্রগাঢ় অভিলাষ; এ সকলতো কোন দিন আমি নিন্দনীয় বা ঘৃণার্হ বলিয়া প্রতিপন্ন করি নাই। যাহারা বিবেকী তাহারা কি এই সকলের জন্য সর্ব্বদা অভিলাষবান্ নহে? আমি আদেশ জ্ঞাপন করিতে পারি, কিন্তু সেই আদেশ পালন করিবার পক্ষে অভিলাষ উদ্দীপিত না হইলে কি কেহ উহা পালন করিয়া উঠিতে পারে? অভিলাষ ক্রিয়ার মূল, অভিলাষ বিনা ক্রিয়া সম্পাদন কোন কালে হয় নাই কোন কালে হইবে না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। আমি কোন লোককে অলস থাকিতে দি না, ইহা তো তোমার জানা আছে?

বুদ্ধি। অভিলাষ ক্রিয়ার মূল ইহা জানি। ক্রিয়ার সঙ্গে অভিলাষ চিরসংযুক্ত বলিয়া অনেকে যে সকল প্রকার কর্ম্মেরই বিরোধী।

বিবেক। কর্ম্ম করিতে গিয়া অভিমান উপস্থিত হয়। এই অভিমানে ধর্ম্মজীবন শীঘ্রই বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়ে, ইহা দেখিয়াই অনেক লোকে কর্ম্ম হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়স্কর মনে করে। যাহারা আপনার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের কর্ম্ম হইতে অভিমান উপস্থিত হইবে, ইহা আর অসম্ভব কি? নিজের ইচ্ছা যত প্রবল হইতে থাকে, তত স্বেচ্ছাচারের দ্বার খুলিয়া যায়। যেখানে স্বেচ্ছাচার সেখানে তাহার সঙ্গে অভিমান আসিয়া যোটে। এরূপ অবস্থায় অভিমানের ভয়ে ব্রহ্মযোগাকাঙ্ক্ষিগণ কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে অভিলাষ করিবেন, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক। যেখানে নিজের ইচ্ছা নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রিয়ার মূল, সেখানে অভিমান উৎপন্ন হইবে কি প্রকারে? ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে গিয়া অভিমান হওয়া দূরে থাকুক, আপনি কিছুই নই এই জ্ঞান প্রবল হয়। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনের অভিলাষ তৎপালনে নিয়োগ করে। সুতরাং এ অভিলাষ কখন বন্ধনের কারণ হয় না।

বুদ্ধি। ঈশ্বরের ইচ্ছাপালনে অভিলাষ দূষণীয় নহে, ইহা বুঝিতে পারা গেল। ভালবাসার সঙ্গে যে অভিলাষ সংযুক্ত থাকে, তাহাতে মায়া মমতা উপস্থিত করিয়া বন্ধনের কারণ হয় এ সম্বন্ধে তুমি কি বল?

বিবেক। ঈশ্বর ও মানব উভয়ের প্রতিই ভালবাসা হইয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা যে দূষণীয় নয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মানবের প্রতি ভালবাসায় বা অন্ধতা উপস্থিত হয়, ইহাই চিন্তার বিষয়। ভালবাসার সঙ্গে অভিলাষ সংযুক্ত থাকে ইহা সত্য, কিন্তু ভালবাসা যখন স্বার্থশূন্য হইয়া ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে নিত্যসংযুক্ত, তখন এ স্থলে মঙ্গলসাধনের জন্য যে অভিলাষ নিয়ত উদ্দীপ্ত থাকে, তাহা দূষিত হইবে কি প্রকারে? বল যেখানে ভালবাসা নাই, নিজের সুখাদির জন্য অভিলাষ আছে, সেখানেই মায়া মমতা বন্ধনের কারণ হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

বিচার।

২৯ ভাদ্র, রবিবার, ১৮১৮ শক।

খ্রীষ্টধর্ম্মের সাধারণ উপদেশ, কাহাকেও বিচার করিও না; যদি বিচার কর বিচারিত হইবে। যে ব্যক্তি আপনার চক্ষুঃস্থিত বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দেখিতে পায় না, তাহার কি আর পরের চক্ষুঃস্থিত তৃণকণার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা সমুচিত? খ্রীষ্টধর্ম্ম সাধারণ ভাবে বিচার নিষেধ করিলেন বটে, কিন্তু অন্য দিকে আবার বিশেষভাবে বিচার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঈশ্বরসন্তানগণ পাপিদিগের পাপ বিচার করেন, অবতীর্ণ বাণী দ্বারা সকলের পাপ বিচারিত হয়, এ মত কিছু সামান্য মত নয়। এই যে আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হইল, এ প্রার্থনায় বিচারের আবশ্যকতা কেমন সুস্পষ্টরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে। এ প্রার্থনা সেই সময়ের প্রার্থনা যে সময়ে প্রচারকসভা প্রেরিতগণের দরবার আখ্যা প্রাপ্ত হন নাই। প্রতিদিন বিচার হইয়া সভ্যগণ নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, কিছুমাত্র অবৈধচারণ থাকিবে না, এই উদ্দেশ্যে বিচারের প্রবর্ত্তনা হয়। এই প্রচারকসভা হইতে তিন জন বিচারক পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা কোন কোন স্থলে বিচারের কার্য্যও নিষ্পন্ন হইয়াছে। এ বিচারের কার্য্য থামিয়াছে কখন বলিতে পারি না, ক্রমান্বয়ে চলিতেছে। প্রচারকসভা বা দরবারের অন্তর্বর্ত্তী গঠনই এইরূপ যে, তথায় চুল চিরিয়া বিচার হয়। আপনার দোষসম্বন্ধে উদাসীন হইয়াও অপরের দোষের বিচার এখানে নিয়ত সূক্ষ্মরূপে হইয়া থাকে। নিজ দোষের প্রতি অন্ধতার নিন্দা করিয়া অপরের দোষের সূক্ষ্ম বিচার আচার্য্যদেব অধঃকরণ করেন নাই, বরং এই বলিয়া তাহার কল্যাণকরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এখানে বিচারিত হইয়া যে ব্যক্তি স্বর্গে আরোহণ করিবে, তাহাতে ঈশা মুষাও দোষ দেখিতে পাইবেন না।

এক দিকে বিচার করা নিষেধ, আর এক দিকে বিচারের আবশ্যকতা, এ দুই পরস্পরবিরুদ্ধ মতের কি কখন সামঞ্জস্য সম্ভব? দোষদর্শী মানুষ ক্রমান্বয়ে অপরের দোষ অন্বেষণ করে, আর আপনার দোষের প্রতি অন্ধ হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে তাহার অপরের দোষদর্শনে প্রবৃত্তি কি তাহার আত্মবিনাশের হেতু নহে? সে আপনার বড় বড় দোষ দেখিতে পাইতেছে না, আর কোথায় কে কি একটি সামান্য দোষ করিয়াছে, তাহা লইয়া নিন্দা ঘৃণার আর বিরাম নাই, ইহা কি কখন ধর্ম্মরাজ্যে শোভা পায়? আমি যখন অপরের দোষকীর্ত্তন করি, তখন কি আর তাহারা আমার নীচ ভাব দেখিতে পায় না? নিন্দুকের নিন্দা লোকে শুনে বটে, কিন্তু কেহ কি তাহার প্রতি কোন দিন প্রত্যয় স্থাপন করিয়াছে? তাহারা সকলেই জানে, অপরের নিন্দা করা ইহার স্বভাব; যখন সময় পাইবে, তখন এ আমাদের নিন্দা অপরের নিকটে করিবে। পরের দোষ চুলচিরিয়া বিচার করিতে গেলে, এইরূপই ঘটে। যখনই পরের বিচার করা হয় তখন লোকে সিদ্ধান্ত করে যে, এ ব্যক্তি কখনই বিশ্বাসের পাত্র নহে, এ ব্যক্তির, নিন্দাতেই সুখ। আর যখন তাহারা দেখিতে পায় যে, এ ব্যক্তি যে দোষের জন্য অপরের প্রতি বিচার নিষ্পত্তি করিতেছে, সে দোষ অপেক্ষা ইহাতে গুরুতর দোষ সকল বিদ্যমান, তখন সে যে কোন্ প্রকারের লোক তৎসম্বন্ধে বিচার হইতে আর অবশিষ্ট থাকে না। অতএব বিচার করিও না বিচারিত হইবে, খ্রীষ্টের এ কথা নিত্য প্রত্যক্ষ।

অপরকে বিচার করিলে কেবল বিচারিত হই তাহা নহে, আমি যে নরকে বাস করিতেছি তাহাও এতদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইয়া যায়। আমি এক ব্যক্তির প্রতি নিতান্ত ঈর্ষান্বিত, আমার হৃদয় ক্রোধ হিংসা দ্বেষাদিতে পরিপূর্ণ; এরূপ অবস্থায় আমি যে সে ব্যক্তির কেবলই দোষ দর্শন করিব, এবং সেই দোষের কথা যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়াইব, ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। আমার হৃদয় যদি ক্রোধ দ্বেষ হিংসাতে পূর্ণ হইল, তাহা হইলে কি আর আমি নরকে বাস করিতেছি না? আমরাতো নরক ও স্বর্গ স্বতন্ত্র কোথাও মানি না। আমাদের মনের ভিতরেই নরক আর স্বর্গ। দ্বেষ হিংসার অনলে যখন আমার হৃদয় পুড়িতেছে, আমি আমার প্রতিবেশীর সুখ সৌভাগ্য ঐশ্বর্য্যাদি দেখিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছি না, তখন আমি নরকে বাস করিতেছি, নরকের যন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরিতেছি। এসময়ে আমি যে বিচার করি, দোষ দেখাই, তাহাতে কি আর কোন ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে, না আমার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে। আমি কি জন্য সে সকল কথা এক জনের বিরুদ্ধে বলিতেছি, সহজে সকলে বুঝিতে পারে। আমি আমার ভিতরে যে দুর্গন্ধ চাপিয়া রাখিয়াছি তাহা তখনই সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসে, এবং পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল তাহার দুর্গন্ধে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়। সকলেই আমার ভিতরকার পাপগন্ধ উপলব্ধি করিল, কেবল আমি এক জন উহা বুঝিতে না পারিয়া পদে পদে উপহাসাস্পদ হইলাম।

যাহার প্রতি আমার দ্বেষ আছে তাহার প্রতি আমার অন্যায় বিচার না হইয়া কখন থাকিতে পারে না। অন্যায় বিচার করিয়া ঈশ্বরের ও জনসমাজের নিকটে নিষ্কৃতিলাভ করিব, ইহা কি আর আমি কখন আশা করিতে পারি? 'বিচার করিও না'

এই শাসনবাক্য যদি আমি শিরোধার্য্য করিয়া বিচার হইতে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার মনের হিংসা দ্বেষ বর্দ্ধিত হইবার উপায় না পাইয়া মরিয়া যাইবে; আর যদি আমি এই শাসনবাক্য অবহেলা করিয়া ক্রমান্বয়ে বিচার করিতে থাকি, সে বিচারে আমার হিংসা দ্বেষ বাড়িতে থাকিবে, উহারা ক্রমান্বয়ে আমার হৃদয়ে নরকের আগুন প্রজ্বলিত করিয়া রাখিবে। আমি আর কোনরূপে আত্মসংবরন করিতে পারিব না, যেখানে সেখানে বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির নিন্দা কুৎসা গাইয়া বেড়াইব। অবশ্য যদি আমি বাহ্যে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকি, এবং লোকের নিকটে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষ রাখি, তাহা হইলে ধর্ম্মের আবরণে আবৃত করিয়া দোষ ঘোষণা করিব, কিন্তু আমার সকল যত্ন বিফল হইয়া যাইবে, আমার ভিতরকার বিদ্বেষ হিংসা সকল আবরণ ভেদ করিয়া জনচক্ষুর গোচর হইবে। 'বিচার করিও না' এই শাসনবাক্যের সঙ্গে সঙ্গে যে 'বিচারিত হইবে' এই দণ্ড নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা অচিরে আমার সম্বন্ধে সত্য হইবে।

'বিচার করিও না' এ শাসন যে কতদূর মাননীয়, ইহা আমরা বুঝিলাম, কিন্তু 'বিচার করা প্রয়োজন' এ বিধি রক্ষা পায় কোথায়? জনসমাজে যদি বিচার না থাকে, সামাজিক শাসন না থাকে, তাহা হইলে কি উহা শীঘ্র উৎসন্ন হইয়া যায় না? যে যাহা করিয়া যায় যাউক, কেহ তাহার বিপক্ষে কিছু বলিবে না, স্বেচ্ছাচারীর স্বেচ্ছাচার ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া যাইবে, উচ্ছৃঙ্খলাচারিগণের হাতে পড়িয়া নির্দ্দোষ সাধুসজ্জন ব্যক্তিগণ কদর্থনা ভোগ করিবেন, দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ ক্রমান্বয়ে অত্যাচরিত হইবে, জনসমাজে ধর্ম্মসমাজে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইবে, ইহা কি কখন হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য? না ইহাতে জনসমাজের কোন কল্যাণ হইতে পারে? পরিবার মধ্যে কোন শাসন নাই, ধর্ম্মসমাজে কোন শাসন নাই, যত দিন পৃথিবীর শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে উচ্ছৃঙ্খলাচারী গিয়া না পড়িতেছে, তত দিন তাহারা পাপের ভার বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, ইহাতো কোনরূপ ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। 'বিচার করিও না' এ শাসন যদি এস্থলে নিয়োগ করা হয়, আমরা বিলক্ষণ বুঝিতেছি, শাসনটি যথাস্থানে নিয়োগ হইল না। পৃথিবীর আদালত ভিন্ন কি আর কোন আদালত তবে এই সকল ব্যক্তির শাসন জন্য খোলা নাই? যদি ইহারা যে ভাবে কাজ করিলে পৃথিবীর আদালত বিচার করিতে পারেন, তাহা অতিক্রম করিয়া ক্রমান্বয়ে পাপাচরণ করিয়া পরিবার ও সমাজের নীতি ও ধর্ম্মের ক্ষতি করে, তাহা হইলে অন্য কোন উচ্চ আদালতে কি আর বিচার হইবে না? পৃথিবীর আদালত যে সকল পাপের বিচার করিতে অধিকার পান নাই, সে সকলের বিচারের জন্য অবশ্য উচ্চ আদালত থাকিবেই থাকিবে। সেই আদালতে 'বিচার করা প্রয়োজন' এই বিধির কার্য্য আমরা দেখিতে পাই।

যেখানে হিংসা আছে, দ্বেষ আছে, মন্দভাব আছে, সেখানে 'বিচার করিও না, বিচারিত হইবে' এ শাসনবিধির নিয়োগ আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু যেখানে প্রেম আছে, ভালবাসা আছে, মঙ্গলস্পৃহা নিতান্ত প্রবল আছে, সেখানে যাহাকে ভালবাসি, যাহার মঙ্গল সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করি, তাহার দোষের বিচার করা কি স্বভাবসঙ্গত নয়? কে আর আপনার প্রিয়পাত্রের দোষ দেখিয়া পাপ দেখিয়া উপেক্ষা করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে থাকিতে পারে? এরূপ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে প্রকাশ পায় যে, হৃদয়ে কিছুমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান নাই। রোগে প্রিয় ব্যক্তির শরীর দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, অথচ আমি উদাসীন হইয়া আছি, জানিয়া শুনিয়া তাহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে দিতেছি, ইহা যে প্রকার অস্বাভাবিক ব্যাপার, আমার প্রেমাস্পদের পাপবিকারে আত্মা দিন দিন মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে, আর আমি তন্নিরসনে যত্ন না করিয়া নিশ্চিন্ত আছি, এ দুই সমান; সমান কেন শেষোক্ত ব্যাপারটি আরও একান্ত গর্হিত। আমার প্রেম ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আমায় কখনই চুপ করিয়া থাকিতে দিবে না; যে কোন উপায়ে আত্মার সেই মারাত্মক ব্যাধি বিনষ্ট হয় তাহার উপায় করিতে আমায় প্রবৃত্ত করিবে। এস্থলে 'বিচার করিও না' এ শাসন নহে, কিন্তু 'বিচার করা প্রয়োজন' এই বিধি প্রতিপালিত হইবার জন্য আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। এ সময়ে আর আমরা এ বিধির প্রতি উপেক্ষা করিতে পারিব না। ইহা আমাদের পক্ষে তখন অবশ্য প্রতিপাল্য হইয়া উঠিয়াছে।

হিংসা দ্বেষ যেখানে আছে, সেখানে বিচারত্যাগ, আর যেখানে প্রেম ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আছে সেখানে বিচার, এরূপ মীমাংসাতেই কি উভয় বিরোধী বাক্যের সাঙ্গত্য হইল না? খ্রীষ্ট ঈশ্বরসন্তানগণের প্রতি বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করিলেন, অথবা অবতীর্ণ বাণীকে বিচারকের সিংহাসনে বসাইলেন, এখানে বলা হইল, যাহাদের হৃদয়ে প্রেম আছে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহারা বিচার করিবেন, এ দুই কথা কি সমান হইল? সমান হইল তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিচারে মানুষের কোন হাত নাই, ইহাতে অবতীর্ণ বাণীর হাত। অবতীর্ণ বাণী কি? পাপাচরণ করিও না, পাপাচরণ করিতে দিও না। যাঁহাদের হৃদয়ে এই বাণী অবতীর্ণ, তাঁহারা ঈশ্বরের সন্তান। বাণী অবতীর্ণ হয় কাহাদের হৃদয়ে? ঈশ্বরের সন্তানগণের হৃদয়ে। ঈশ্বরের কে নয়, কাহারই বা বিবেক নাই, ইহাতে ঈশ্বরসন্তানগণকে অন্য সমুদায় মানুষ হইতে স্বতন্ত্র করা হইতেছে কেন? যে হৃদয়ে হিংসা দ্বেষ আছে, সে হৃদয়ে বাণীর অবতরণের পথ অবরুদ্ধ, সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তির ঈশ্বরসন্তানত্ব সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? কিন্তু যে হৃদয়ে প্রেম আছে, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আছে, সে হৃদয়ে বাণীর অবতরণের পথ প্রমুক্ত; সুতরাং সে হৃদয়ে অপরের পাপে যে ব্যথা উৎপন্ন হয়, তন্নিরসনের জন্য উপায়ান্বেষণ ও শাসনবাণী উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ বিদ্যমান। এখানে বিবেক সিংহাসনে ঈশ্বর উপবিষ্ট, তিনি বসিয়া নিয়ত পাপ বিচার করিতেছেন।

আমাদিগের বিচারের জন্য দিবারজনী আদালত খোলা

রহিয়াছে। অন্তরে বিবেকসিংহাসনে বসিয়া ঈশ্বর নিয়ত বিচার করিতেছেন। সে বিচারের শব্দ কর্ণে যদি প্রবেশ না করে, পাপে একেবারে বধির হইয়া যাই, তবে শত হৃদয়ে বিবেক-সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি যে বিচার করিবেন, সে বিচারের নিকটে আমার মাথা অবনত করিতেই হইবে। যাহাদিগের ভালবাসা আছে, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে যে বিচার উদিত হইবে, সে বিচারকে অবিচার বলিয়া প্রতিবাদ করিব আমাদের সাধ্য কি? সে বিচারতো আর তাঁহারা করিতেছেন না, যিনি বিচারপতি তিনি স্বয়ং বিচার করিতেছেন। পিতা মাতা বন্ধু সুহৃৎ পুত্র কন্যা পতি পত্নী ইঁহাদের মধ্যে যখন স্নেহ আছে, প্রেম আছে, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা আছে, তখন তাঁহাদের হৃদয় অবিকৃত, বিবেকসিংহাসন অতি সুনির্ম্মল, সেখান হইতে যে বিচার উত্থিত হইবে, তৎপ্রতি যে কর্ণপাত করে না, পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করে, তাহার সদগতি হইবে কি প্রকারে? সে কি আর কেবল সেই শুভাকাঙ্ক্ষিগণকে উপেক্ষা করিয়া অপরাধ করিতেছে, সে যে তদ্দারা স্বয়ং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচরণে প্রবৃত্ত। সে কি কখন মনে করিতে পারে যে, এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সে বিচারের দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে? সে যদি বাল্যযৌবনে তাদৃশ শাসনবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকে, সেই আচরণ তাহার চিরজীবনে দুঃখ ক্লেশের মূল হইয়া অবস্থান করিবে।

অপরের সম্বন্ধে যাহা বলা হইবে আমাদের সম্বন্ধে তাহা আরও সুদৃঢ়। আমাদিগের সকলকে ঈশ্বর একটি বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এখানে আমাদের বন্ধু আছেন, সুহৃৎ আছেন, পরমনিত্যাকাঙ্ক্ষী মিত্র আছেন। ইঁহারা যেমন সর্ব্বদা আমাদের শুভ চান এমন আর কে চাইবে? ইঁহারা আমাতে বদ্ধ নহেন যে, ইঁহাদের হৃদয় বিকারগ্রস্ত হইবে। ইঁহারা আমাদের সম্বন্ধে যে বিচার করেন তাহা আমাদের মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবন্ধুগণ এই জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছেন যে, একটি পাপ দোষ বা কলঙ্ক আমাদিগের মনে থাকিতে দিবেন না। তাঁহাদিগের বিচার মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য আদিষ্ট। আমরা যদি তাঁহাদিগের বিচারাধীন আমাদিগকে না করি, বিবিধ বিষয়ে আমাদিগের বিচার উপস্থিত হইবে, আমরা অতি সত্বর ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইব, বিধানভ্রষ্ট হইব। একাকী এ দুর্গমপথে যদি আমরা সাহসে ভর করিয়া চলি, শীঘ্র আমরা বিবিধ বিপদে পড়িব, আমাদিগের ধর্ম্মজীবন বিপৎসঙ্কুল হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মবন্ধুগণের শাসন উপেক্ষা করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইলে আমরা তো মরিবই, আমাদের পুত্র কন্যাগণকেও এমন উৎপথে প্রবৃত্ত করিবে যে, তাহাদের জীবন পর্য্যন্ত লজ্জা, বিষাদ ও গ্লানির আধার হইবে। যাঁহাদের হৃদয়ে বসিয়া স্বয়ং ভগবান্ বিচার করিতেছেন, সে বিচারে কর্ণপাত না করা 'স্বার্থপর অহঙ্কৃত ব্যক্তিত্ব'। যেখানে স্বার্থপর অহঙ্কৃত ব্যক্তিত্ব আছে, সেখানে কল্যাণের সম্ভাবনা কোথা? ধর্ম্মবন্ধুগণের বিচারকে যে ব্যক্তি আত্মাভিমানে তুচ্ছ করে, আপনাকেই সকলের উপরে স্থাপন করে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মপথ হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তির জীবন কোন কালে নববিধান-সঙ্গত হইতে পারে না। ঈশ্বর করুন, আমাদের কাহারও জীবন যেন ঈদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হয়।

তৎফতোল্ মওহদ্দিনের বঙ্গানুবাদ *।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কৃত মূল পারস্য পুস্তকের অনুবাদ।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বতন ধর্ম্মাগ্রণীদিগের যুগের বহুশত বৎসর অতীত হওয়ার পর তাঁহাদের আবির্ভাবের সমাপ্তি এই ঘোষণা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে নানক প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারের ধ্বজা উত্তোলন করিয়া বহুলোককে ভুলাইয়া আপনাদের আনুগত্য ও অধীনতায় আনয়নপূর্ব্বক সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। বরং ধর্ম্মশিক্ষাবিষয়ে অভিসন্ধিসিদ্ধির দ্বার বাহ্যদর্শী অনভিজ্ঞকর্ম্মা লোকদিগের অভিমুখে চিরকাল প্রমুক্ত থাকিবে। প্রতিদিন লক্ষিত হইতেছে যে, ক্ষুদ্রলাভ ও সামান্য সম্মানের আশায় প্রত্যেকে সম্প্রদায়ের বহুশত লোক শারীরিক নানা ক্লেশ ভারবহনে রত হয়, অর্থাৎ নিত্য উপবাস ও প্রাকৃতিক সঞ্চালন হইতে একতর বাহুকে নিবৃত্ত রাখা এবং শরীর দগ্ধ করা ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। অতএব আশ্চর্য্য কি যে, সাধারণ লোকের উপর কর্ত্তৃত্বলাভ জন্য মান সম্ভ্রমপ্রিয় উদ্যমশীল লোকেরা পার্থিব সঙ্কট ও নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্তিকে আপনাদের সম্বন্ধে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের অধিকাংশ পণ্ডিত আপনাদের মত সমর্থনের জন্য যে কথা অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহা এই:—"আমাদের ধর্ম্ম যে মৃত্যুর পর কর্ম্মের দণ্ড পুরস্কারের সংবাদ দান করে, তাহা দুইটি অবস্থা হইতে শূন্য অর্থাৎ সত্য ও অসত্য হইতে শূন্য না হইতে পারে। দ্বিতীয় অনুমান অর্থাৎ পরলোকের অভাব অনুমান স্বীকার ও বিশ্বাস করিয়া চলিলে কোন ক্ষতি নাই, এবং প্রথম অনুমান অগ্রাহ্য করিলে মহাক্ষতি।" সেইসকল দলের প্রত্যেক হতভাগ্য অনুগত ব্যক্তি অগ্রণীদিগের এরূপ উক্তিকে প্রমাণস্বরূপ জানিয়া স্পর্দ্ধা করে। বস্তুতঃ অভ্যাস ও শিক্ষা লোকদিগকে চক্ষুঃসত্ত্বে

---

* গতবারের অনুবাদে একটি গুরুতর ভুল হইয়াছে। পারস্য, "কওমে ব্রাহ্মা" শব্দের অর্থ ব্রাহ্মসম্প্রদায় লিখিত হইয়াছে। পরে প্রসিদ্ধ পারস্য অভিধান "গেয়াসোল্লোগাতে" দৃষ্ট হইল যে, ব্রাহ্মণ শব্দের বহুবচনে "ব্রাহ্মা" হয়। সুতরাং "কওমে ব্রাহ্মার" অর্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বা ব্রাহ্মণ জাতি হইবে। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় উল্লেখে যে টীকা লিখিত হইয়াছিল সেই টীকা আর সঙ্গত হইতেছে না। ঈশ্বরের অংশবাদী অর্থাৎ বহু দেববাদী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই গ্রন্থকারের লক্ষ্য ছিল, পাঠকগণ এরূপ বুঝিবেন।

অন্ধ কর্ণসত্ত্বে বধির করিয়া থাকে। তাহাদিগের এই ভ্রান্তিতে পতন দুই কারণে হইয়া থাকে। প্রথম সেই বাক্য অর্থাৎ দ্বিতীয় অনুমানের বাক্য—উহা স্বীকারে আশঙ্কা নাই; কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য। যেহেতু মানবমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও কোন বস্তুর সত্তাতে বিশ্বাস সেই বস্তুর অস্তিত্ব নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিলে পর হইয়া থাকে, বুদ্ধির অবিষয় ও অপরীক্ষণীয় বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস হওয়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদিগের অধিকারের বহির্ভূত। দ্বিতীয় কারণ, অজ্ঞতা ও অল্প অভিজ্ঞতাবশতঃ তাহা গ্রাহ্য করিলে বৃথা ক্লেশ, বিকৃতি ও ক্ষতির স্থল। যথা, তাহাতে পক্ষপাতিতা ও প্রতারণা ইত্যাদি হয়। এতৎসত্ত্বে এই যুক্তি স্বীকার করিলে পর সমগ্র ধর্ম্মের মূল একপ্রকার লব্ধ হয়। যেহেতু প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর এই যুক্তি সম্বন্ধে সম্পর্ক তুল্য। অতএব অস্থিরতার স্থল ও ব্যস্ততার বিষয় এই যে,মনুষ্য কি সমুদায় ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে? না, কোন ধর্ম্মের প্রতি বিমুখ ও কোন ধর্ম্মের প্রতি উন্মুখ হইবে? প্রথমাংশ যে সাধ্যাতীত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে মনোযোগ বিধান করা উচিত। বক্তার কথা অসত্য মনে করিলেধর্ম্ম-সকলের সত্যাসত্য বিষয়ে অনুসন্ধান করা সমুচিত ও সঙ্গত হয়, এবং এই গোলযোগ ও হাঁ না'র ইহাই উদ্দেশ্য। তাহাদের কাহারও অপর যুক্তি এই যে, সত্যাসত্যের অনুসন্ধান ব্যতীত পিতা পিতামহের বিশ্বাস ও আচরিত প্রণালীর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ও তৎপ্রতি নয়ন মুদ্রিত ও বিরাগ প্রদর্শন করা ঐহিক দুর্গতি ও ধর্ম্মতঃ বিড়ম্বনা এবং প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন লোকদিগের প্রতি অবমানন ও অবজ্ঞা হয়। পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি যাহারা প্রেম ও অনুরাগ আবশ্যকতা হেতু স্থাপন করিয়াছে তাহাদের অন্তরে সেই পিতৃ পুরুষদিগের ভ্রম সংক্রামিত হইয়া থাকে, এবং সত্য বিষয়ের অনুসন্ধান ও সত্যপথ আশ্রয় হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করে। প্রকৃতপক্ষে এই কথার দুর্ব্বলতা সামান্য অনুধাবনে ইতর বিশেষ সকল লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যেহেতু তাহাদের সেই দোষ প্রথমতঃ সেই সকল লোকের সম্বন্ধে ঘটে যাহারা বিভিন্ন ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক হইয়া এক এক দলকে আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যাহারা অগ্রণীদিগের কথা স্বীকার করার পর উপদেষ্টা মহাজনদিগের ও পূর্ব্ব পুরুষদিগের পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাদের প্রতিও আরোপ হয়। কিন্তু মনুষ্য আত্মকৃত বিষয় পরমেশ্বরের প্রতি যোগ করিবামাত্র এই দোষ হইতে প্রমুক্ত হইতে পারে। অতএব এ বিষয় একান্ত সাধ্য ও সহজ উপায়ের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে পুরাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ যে পূর্ব্বতন লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে এই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, একধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মান্তর আশ্রয় মানবস্বভাব ও রীতির অন্তর্গত। এতৎসত্ত্বে পরমেশ্বর জ্ঞান ও বিভিন্ন অনুভব শক্তি এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মনুষ্যকে দান করিয়াছেন যে, স্বীয় দলের অনুসরণ যে বিশেষ ভাবে অধিকাংশ ইতর জীবের হইয়া থাকে তাহা না করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞানগত প্রশ্নের সাহায্যে ভাল মন্দ বিচারে বুদ্ধিকে যেন অধিকার দেওয়াহয়, যেন দাতা বিধাতার বুদ্ধিগত সম্পদ্দান নিরর্থক মনে করা না হয়। ধর্ম্মাবলম্বিগণ যে, একেশ্বরবাদীদিগের সংখ্যার ন্যূনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপনার দলের সম্বন্ধে গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, অধিক লোক যাহা বলিয়া থাকে সেই কথাতে সত্য ও অল্প লোকের কথাতে মিথ্যা নির্ভর করে না।

(ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

সৎপ্রসঙ্গ।

(পঞ্চম প্রস্তাব)

পাপসম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা।

পাপ, দুঃখ ও বিপদ সম্বন্ধে আরও কতকগুলি কথা বলিতে হইল। কারণ, তুমি বল, চুরি, ডাকাইতী, নরহত্যা প্রভৃতি জগতের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর করেন, অর্থাৎ মানুষকে দিয়া করান, মনুষ্যেরা তাহা না জানিয়া নিজের স্বার্থের জন্য তাহা নিজে করে, এই জ্ঞানের জন্যই মনুষ্যেরা চুরি, ডাকাইতী, নরহত্যাদি দ্বারা পাপী হয়। তোমার এই কথায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তুমি চুরি, ডাকাইতী, নরহত্যা প্রভৃতিকে পাপ বলিতেছ না, তাহা যে ঈশ্বর মানুষকে দিয়া করান, মানুষ যে তাহা বুঝে না, তাহাই মানুষের সম্বন্ধে পাপ। ইহাতে চুরি প্রভৃতি পাপ হইতেছে না, তাহা যে ঈশ্বরের কার্য্য তাহাই না জানা পাপ হইতেছে। তুমি না জানাতে পাপ বলিতেছ, কিন্তু যদি চুরি প্রভৃতি ঈশ্বরের কার্য্য হয়, আর ঐ শুনিলে পাপ না হয়, তাহা হইলে না জানা কিছুতেই পাপ হইতে পারে না; কেন হইতে পারে না, তাহা শোন।

তোমার মতে চুরি, ডাকাইতি, নরহত্যা প্রভৃতিকে মনুষ্যেরা যে ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া জানে না, নিজের স্বার্থের জন্য তাহারা নিজে করে; এই কথা মনে করে, তাহাকে মানুষের অজ্ঞানতা বলিয়া তোমারও স্বীকার করিতেই হবে। যেহেতু, উহা যে মনুষ্যের অজ্ঞানতা তাহা তোমার ঐ কথা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। তুমি এ কথাও স্বীকার করিয়াছ যে, যাঁহারা জ্ঞানী সাধু, যাঁহাদের নিজের স্বার্থ নাই, কর্ত্তৃত্ব নাই, নিজের সমুদয় ঈশ্বরে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর চুরি প্রভৃতি করান না। এ অবস্থায় কতগুলিন নিজ স্বার্থ বলে অজ্ঞান মনুষ্যেরও ঈশ্বরের প্রয়োজন ইহা তোমার কথা দ্বারাই ব্যক্ত হইতেছে। তাহা না হইলে ঈশ্বর কাহাদের দ্বারা চুরী ডাকাইতী নরহত্যাদি করাইয়া জগতের মঙ্গল করিবেন? এখন দেখ, মানুষের পূর্ব্বোক্ত না জানা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইতেছে, সুতরাং তাহাকে তুমি পাপ বলিতে পার না। চুরি, ডাকাইতী নরহত্যাদি যখন তোমার মতে ঈশ্বরের কার্য্য (ঘটনা), তখন তোমার মতে চুরি প্রভৃতিও পাপ নহে, আবার অজ্ঞান মনুষ্যেরা যে, ঐ গুলিকে ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া জানে না তাহাও তোমার মতেই পাপ নহে।

অতএব তোমার এ মতে কি এই কথা প্রকাশ পাইতেছে না যে, কিছুই পাপ নহে? চিরকাল যে সকল দুর্ঘটনাকে পাপ বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছে, যাহার দ্বারা চিরকাল মনুষ্য পাপী বলিয়া চিহ্নিত হইয়া আসিতেছে, তোমার এ মতে কি তাহা প্রলাপ বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে না?

ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন মানুষের স্বতন্ত্র শক্তি, স্বতন্ত্র ভাবে কিছু করিবার ক্ষমতা তুমি স্বীকার কর না। ঈশ্বরের শক্তিকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কিছুই করিতে পারে না ইহাই তোমার মত, ইহাতে বোধ হয় যে তুমি, ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায়—"ঈশ্বরের শক্তি ও পাপীর কার্য্য" নামক প্রবন্ধ পাঠ কর নাই। যাই হউক, তুমি যখন মানুষের স্বতন্ত্র শক্তি স্বতন্ত্র ভাবে কিছু করিবার ক্ষমতা স্বীকার কর না, তখন এ কথা বলা কেন যে, মনুষ্য স্বার্থ সাধনের জন্য স্বয়ং চুরী প্রভৃতি করে মনে করে, ঐ গুলিন যে জগতের মঙ্গল জন্য ঈশ্বর মনুষ্যকে দিয়া করান তাহা মানুষ বুঝে না? তুমি মানুষকে স্বতন্ত্র শক্তি, কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেও না, তবে মানুষ এরূপ ভাবে, করে কি প্রকারে? দেখা যায় যে, তুমি যে মানুষকে না জানিয়াও একে আর জ্ঞান করিয়া ক্ষমতা দিতেছ তাহাতেই মনুষ্যের স্বতন্ত্র শক্তি ও স্বতন্ত্র ভাবনা কি থাকা প্রকাশ পাইতেছে? অতএব বুঝা গেল, তুমি যে মানুষকে কেবল মাত্র ঈশ্বরের কল বলিতেছ, তোমার মতেই তাহা হইতেছে না। মানুষ অজ্ঞান হইতে পারে, মানুষের অজ্ঞানতা আছে, এ কথা কেবল আমাদের নহে, এ কথা তোমারও; কারণ তুমি বলিতেছ, চুরি, ডাকাইতী, নরহত্যা, পরদারাদি যে ঈশ্বর মানুষকে দিয়া করান মঙ্গলের জন্য, তাহা মানুষ বুঝে না, নিজের স্বার্থের জন্য আমি করি বোঝে। ইহা যে একে আর জ্ঞান, মানুষের ভ্রম, তাহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? এখন দেখ, আমরা যে মনুষ্যকে ভ্রান্ত, অপূর্ণ বলি, তোমার মতেও তাহাই হইতেছে। চুরি ডাকাইতী প্রভৃতিকে মনুষ্যের পাপ অকার্য্য না বলিয়া ও ঈশ্বরের মঙ্গলজনক কার্য্য স্বীকার করিয়াও তুমি মানুষকে অপূর্ণতা ও ভ্রম প্রমাদ শূন্য করিতে পারিতেছ না। আর মনুষ্যের যে স্বতন্ত্র শক্তি, ইচ্ছাদি আছে উপরোক্ত যুক্তি দ্বারা তাহাও তোমার স্বীকার করিতে হইতেছে। তার পরে, তুমিই স্বীকার করিয়াছ, যাঁহারা জ্ঞানী, ঈশ্বরের কার্য্য দেখেন, ঈশ্বরে একান্ত যুক্ত, ঈশ্বরে নিজ স্বার্থ কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা চুরি প্রভৃতি করেন না, তাঁহাদের দ্বারা ঈশ্বর ঐ সকল করান না। এমতাবস্থায় পবিত্র পূর্ণ ঈশ্বরে তুমি কেন এই কলঙ্ক অর্পণ কর? চুরি ডাকাইতী প্রভৃতি ঈশ্বরের নহে, মনুষ্যেরা অজ্ঞানতাবশতঃ ঐ সকল করে, ইহা কেন স্বীকার কর না?

তোমার আর একটী কথা এই যে, ঈশ্বর স্বয়ং মঙ্গল ও অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ঘর্ষণের দ্বারা জগতকে মঙ্গলের (আশু উন্নতির) দিকে লইয়া যাইতেছেন। সুখ দুঃখের পরস্পর সংঘর্ষণ ব্যতীত জগতের মঙ্গল হইতে পারে না। এই কথার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলি যে, যখন মানুষের অজ্ঞানতা, অপূর্ণতা, শক্তি ইচ্ছাদির স্বাতন্ত্র্যতা, তোমার মতেও সত্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তখন অজ্ঞান মনুষ্যের অজ্ঞানতা সম্ভূত অমঙ্গলের সহিত ঈশ্বর প্রেরিত বিধানরূপ মঙ্গলের সংঘর্ষণের দ্বারা জগতের মঙ্গল হইতেছে এ কথা স্বীকার করিতে তোমার আপত্তি কি? চুরি, ডাকাইতী নরহত্যাদি যদি মানুষের অজ্ঞানতা সম্ভূত অকর্ম্মে (অমঙ্গল) না হয় তাহা যদি ঈশ্বরের কার্য্য হয়, তাহাতে যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং কর্ত্তৃত্ব থাকে, তবে অজ্ঞান মনুষ্য ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়া কি করে? বড়ই দুঃখের বিষয় যে তুমি অকারণ সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরে অমঙ্গল রূপ কলঙ্ক অর্পণ করিতেছ।

তোমার আর একটী কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়। তুমি বল, জগতের মঙ্গলের জন্য মানুষকে দিয়া ঈশ্বর চুরি, ডাকাইতী নরহত্যাদি করান ও মানুষকে এই কথাটী বুঝান যে তোমরা চুরি, ডাকাতি, নরহত্যাদি করিও না। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর মানুষকে দিয়া মানুষ মারিয়া আর আর মানুষকে বুঝান যে, তোমরা মনুষ্য মারিও না, মনুষ্য বধ করা পাপ। মনুষ্যের হৃদয়ে ঈশ্বরের বিবেক তাহার কি করে? তুমিই না বল যে, মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের বিবেকবাণী সর্ব্বদা ধ্বনিত হইতেছে? বিবেক তবে মানুষকে কি বলিয়া দেয়? তুমি না বলিতেছ, মানুষকে দিয়া জগতের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর চুরি ডাকাইতী নরহত্যাদি করান, তবে আবার তাহা করিতে তিনি মানুষকে নিষেধ করেন কেন? যদি বল, নিষেধও মঙ্গলের জন্য করেন, তাহাতে আপত্তি এই যে, চুরি প্রভৃতির নিষেধ যদি মঙ্গলের কারণ হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, তুমি যে বল, ঈশ্বর মঙ্গলের জন্য ঐ সকল মানুষকে দিয়া করান তাহা মিথ্যাকথা। যাহা করিলে মঙ্গল হয় তাহা না করিলেও মঙ্গল হয় ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

তুমি পুনঃপুনঃই দুঃখকে মঙ্গলের কারণ বল, ইহা তোমার সামান্য ভ্রম নহে। দুঃখ যদি মঙ্গলের কারণ, ঠিক তাহা হইলে দুঃখের অবসান না হলে সুখের আবির্ভাব হয় না কেন? কারণের অর্থ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়। এখন স্পষ্টই দেখা যায় যে, দুঃখের বিনাশের পর সুখের উৎপত্তি হয়। দুঃখের কারণ এক, সুখের কারণ এক, দুইটি পরস্পর বিপরীতগুণবিশিষ্ট; যেমন, অনিয়ম ব্যাধির কারণ, নিয়ম স্বাস্থ্যের কারণ। দুঃখের বিনাশে মঙ্গলের উৎপত্তি, সুতরাং বুঝিতে হইবে, দুঃখের কারণ ও দুঃখের বিনাশই মঙ্গলের কারণ। শত্রুকে বিনাশ করিয়া তোমার দুঃখ কষ্টের বিনাশ হইল, মঙ্গল হইল; এখন তুমি কি বলিবে শত্রুই তোমার মঙ্গলের (সুখের) কারণ? শত্রু যদি তোমার মঙ্গলের কারণ হইল, তবে সে জীবিত থাকিতে তোমার মঙ্গল হয় নাই কেন? অতএব বুঝিতে হইল শত্রু তোমার মঙ্গলের বিনাশসাধনহেতু। এখন তুমি বলিবে দুঃখ (অমঙ্গল) যদি অমঙ্গলের হেতু না হয় তাহা

হইলে ঈশ্বর তোমার আমার অকার্য্য অর্থাৎ পাপ বা অমঙ্গল দ্বারাও মঙ্গল করেন, একথা আমরা বলি কেন? তোমার এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমরা এমন কথা বলি না যে, ঈশ্বর তোমার আমার কৃত পাপ (দুঃখ) দ্বারাই মঙ্গল আনয়ন করেন। আমরা যাহা বলি তাহার অর্থ এই যে, মানবীয় অজ্ঞানতাবশতঃ জগৎ যখনই অমঙ্গল (দুঃখ) যুক্ত হয় তখনই ঈশ্বর তাঁহার বিধানরূপ মঙ্গলের দ্বারা উক্ত অমঙ্গলকে বিনাশ করিয়া জগৎকে মঙ্গল দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। দুঃখ, পাপ কোন ভাব পদার্থ নহে, উহার কারণের বিদ্যমানতাই উহার বিদ্যমানতা। কারণ ব্যতীত উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পূর্ব্বে আমরা যে দুঃখের বিনাশ বলিয়াছি তাহার অর্থ অবসান। আমরা এই কথা বলি যে পাপী অকার্য্য দ্বারা অর্থাৎ পাপ দ্বারা জগতের যে পরিমাণ অনিষ্ট করে, ঈশ্বর ততোধিক ইষ্ট সাধনদ্বারা সর্ব্বদা জগৎকে মঙ্গলের (ক্রমোন্নতির) দিকে লইয়া যাইতেছেন।

এখন তুমি যদি বল, মানবীয় অপূর্ণতার কারণ যখন ঈশ্বর, ঈশ্বরদত্ত অপূর্ণতা হইতেই যখন দুঃখ অমঙ্গল হয় তখন তাহার কারণ ঈশ্বর কেন না হইবেন? মানবীয় অপূর্ণতার কারণ ঈশ্বর কি না সে সমালোচনা এখানে না করিলেও চলিতে পারে; যেহেতু, ঈশ্বরের বিবেক সর্ব্বদা মানবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মানবকে পাপ করিতে (অমঙ্গল আনয়ন করিতে) নিষেধ করিতেছে, মানুষ তাহা না মানিয়া, না শুনিয়া অকার্য্য করত জগতে অমঙ্গল আনিয়া পাপী হয়, তাহাতে ঈশ্বরের দোষ কি? যদি বল, ঈশ্বর যদি দুঃখ ও সুখের অর্থাৎ অমঙ্গল ও মঙ্গলের সংঘর্ষণের দ্বারা মঙ্গল না করেন, তাহা হইলে যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ঝটিকা, বজ্রপাত, জলপ্লাবনাদিতে কেন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবন বিনষ্ট হয়? তাহা কে করে? ঈশ্বর যদি প্রাণীদিগকে যন্ত্রণা না দিবেন কেবলমাত্র সুখ দেওয়াই যদি তাঁহার কার্য্য হয়, তাহা হইলে প্রসব যন্ত্রণা, মৃত্যু যন্ত্রণা, ব্যাধি যন্ত্রণা কেন হয়? তাহা কে দেয়?

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে, কল্য রাত্রিতে ভাই ফকির দাস রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার গুরুতর পীড়ার সংবাদ আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, সেই সঙ্কট অবস্থা হইতে কিয়দ্দিনের মধ্যে উত্তীর্ণ হইয়া হাবড়া শিবপুরে তাঁহার পরমবন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষের সুচিকিৎসায় রোগ সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিবার জন্য অল্পদিন হইল তথায় আসিয়া সপরিবারে স্থিতি করিতেছিলেন। কল্য হঠাৎ হৃদরোগের বৃদ্ধি হওয়ায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। এবারকার ধর্ম্মতত্ত্বের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে, এবং আমরা এই ঘটনায় অতিশয় ব্যস্ত, তজ্জন্য এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই লিখিয়া উঠিতে পারিলাম না। আগামীতে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় Christ of Revelation. বিষয়ে এল্‌বার্টহলে অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিগত রবিবার হাবড়ার সন্নিহিত খুরুট গ্রামে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। উপাধ্যায় উপাসনাদি কার্য্য করিয়াছিলেন।

নববিধানবিশ্বাসী যুবকমণ্ডলীর প্রার্থনাসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব এ বৎসর সমারোহের সহিত ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বুধবার সায়াহ্নে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা হয়। শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র সেন উপাসনা করেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষে অনেকগুলি শিশু ও বালককে সুন্দর চিত্র, অত্যাশ্চর্য্য গ্রাফন ও বিচিত্র রাসয়ানিক ক্রিয়াদি দেখাইয়া তাহাদিগকে আমোদিত করা হয়। তৎপর শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন তাহাদিগকে সংক্ষেপে কিছু বলেন। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় আলবার্টহলে শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন নববিধান, ভাব ও মণ্ডলী (The New Dispensation—a spirit and church) বিষয়ে একটি সুন্দর সারগ্রাহী বক্তৃতা করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি বক্তার বক্তৃতার পর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উপস্থিত সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। আলবার্টহল শ্রোতৃবৃন্দে পূর্ণ ছিল। শনিবার সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতের উপাসনা শ্রীমান্ প্রমথলাল সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। মধ্যাহ্নে পাঠ ও আলোচনা প্রভৃতি হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় ব্যক্তিগত প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তনের পর উপাসনা হয়। শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। ঈশ্বরের অজস্র কৃপা সমস্ত দিন যুবকবৃন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আমরাও তাহাতে যোগ দিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি।

ভাগলপুর। বিগত ১৪ই শ্রাবণ শনিবার সন্ধ্যার সময় মেট্রপলিটেন কলেজের প্রফেসর শ্রীমান মোহিতচন্দ্র সেনের সহিত স্বর্গগত শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুশীলার শুভ পরিণয়ের সম্বন্ধ স্থির করণ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা হরিসুন্দর বাবু অতি মধুর ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। স্থানীয় সমস্ত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এবং বালক বালিকাগণ এই উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। উপাসনান্তে পাত্র পাত্রিকে উভয় পক্ষ হইতে আশীর্ব্বাদ করা হইয়াছে।

ছাপরা। বেরিষ্টার শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে অন্যান্য দানের সঙ্গে কলিকাতা প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ ব্রাহ্ম বেনেভলেণ্ট ফণ্ডে ৫৲ ঢাকা রেস্‌কিউহোমে ৫৲ কলিকাতা অনাথ আশ্রমে ৫৲ বোবা কালাদের স্কুলে ৫৲ বালেশ্বর প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ ঢাকা প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ এবং বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমে ৫৲ প্রদান করিয়াছেন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ১৭ই শ্রাবণ মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪০ভাগ। ১৫ সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৮২১ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রার্থিজনের প্রার্থনার ফলবিধাতা, বল আমাদের জীবনে কখন কি প্রার্থনার শেষ হইবে না? তোমার দ্বারে কি চিরদিনই আমাদিগকে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে? প্রার্থনা দেখাইয়া দেয় আজও কামনা আছে। তোমা ছাড়া যদি আমাদের অন্য কোন কামনা থাকে, তাহা হইলে, হে নাথ, আমরা তোমার হইলাম কৈ? বাসনা ও কামনা চিরদিনই সাধকগণ নিন্দিত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই বাসনা কামনাই যদি আমাদের জীবনে ক্রমান্বয়ে থাকিল, তাহা হইলে প্রার্থনার প্রকৃত ফললাভে যে আমরা বঞ্চিত রহিলাম। আমাদের অভিলাষ যদি তোমার ইচ্ছার সঙ্গে না মিলিল, তাহা হইলে সে অভিলাষ তো আমাদিগকে তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবেই। বল কি করিয়া বুঝিব যে আমাদের অভিলাষ তোমার ইচ্ছার বিরোধী নয়? এইটি বুঝিতে পারি না বলিয়া হৃদয়ে আমরা নিয়ত সন্তাপ অনুভব করি। অভিলাষসম্বন্ধে তোমার শেষ নিষ্পত্তি যত দিন দেখিতে না পাই, তত দিন এ সন্তাপ কিছুতেই নিবারিত হয় না। যদি দেখি অভিলাষ তোমার ইচ্ছানুরূপ ছিল, হৃদয় প্রভূত আনন্দ অনুভব করে; আর যদি দেখিতে পাই, উহা তোমার ইচ্ছার বিরোধী ছিল, পূর্ব্ব সন্তাপানল আরও দুঃখ দেয়, এবং নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হয়। তোমার রাজ্যে, হে দেব, সকলই ঘোর রহস্যাবৃত, আমাদের জীবন তন্মধ্যে একটি প্রধানতম রহস্য। ইহার ভিতরে কতপ্রকারের অভিলাষ ও বাসনা লুক্কায়িত আছে, তাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় না। কখন কোন্ প্রকারের অভিলাষ কোন্ প্রার্থনার নিম্নে লুকাইয়া থাকে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। এই সকল লুক্কায়িত বাসনা ও অভিলাষ আমাদের জীবনকে নিয়ত গতিশীল করিয়া রাখে, এবং উহারা কখন অনুতাপ কখন আত্মপ্রসাদ উৎপাদন করিয়া আমাদের জীবন অগ্রসর করিয়া দেয়। হে প্রভো, একথা স্মরণ করিয়া অন্তরের জ্বালা ও অশান্তি নিবৃত্ত করা যায় না। যদি একবারও কোন একটি অভিলাষ আমাদের হৃদয়ে স্থান পায়, যাহা পরিশেষে প্রমাণিত হয় যে, তোমার ইচ্ছানুরূপ ছিল না, তজ্জন্য যে আত্মার বিশেষ ক্ষতি হয়, মনে হয়, বুঝি সে ক্ষতির আর পূরণ হইবে না। হে প্রার্থনার ফলবিধাতা, তোমার নিকটে কাতরে

ভিক্ষা করি, যখনই যে অভিলাষ উপস্থিত হয়, তখনই যেন সে অভিলাষসম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় আমরা বুঝিতে সমর্থ হই। যদি দেখি সে অভিলাষ তোমার ইচ্ছানুরূপ নহে, তখনই যেন সে অভিলাষ হৃদয় হইতে বিদায় করিয়া দিতে পারি। আর যদি এমন হয় যে, সে অভিলাষসম্বন্ধে তোমার ইচ্ছা কি কালে প্রকাশ পাইবে, তাহা হইলে সে অভিলাষ চিত্তে বদ্ধমূল না হইয়া যায়, তাহার ক্রিয়া মনের উপর না হয়, এই উদ্দেশে যেন উহা স্থগিত অবস্থায় রাখিতে পারি। হে কৃপানিধান পরমেশ্বর, তুমি আমাদের মনের অবস্থা সকলই জান, তোমার নিকটে আর কি বলিব? যদি প্রার্থিতব্য বিষয় অনন্ত হয় হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে অভিলাষ যেন আমাদের হৃদয়ে স্থান না পায়, যাহা তোমার ইচ্ছার বিরোধী বলিয়া দুঃখ সন্তাপের হেতু। তোমার কৃপায় আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

এদেশের দুর্ব্বলতা।

ধর্ম্মের বাহ্য চিহ্ন দর্শন করিয়া এদেশের লোক সকল সহজে ভুলিয়া যায়। সকল দেশেই অল্প বিস্তর এ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা আছে, কিন্তু এদেশে বাহ্যবেশের প্রতি যাদৃশ আস্থা এরূপ অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। যত দিন এ দুর্ব্বলতা অন্তর্হিত না হইতেছে, তত দিন দেশের কোন প্রকার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কি হইলে এই দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইতে পারে, একবার তাহাই ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা সমুচিত।

এদেশ সাধুত্বের বাহ্যবেশ দেখিয়া কেন আর সব ভুলিয়া যায়, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সর্ব্বপ্রথম প্রত্যুত্তর এই যে, কোথাও বৈরাগ্যাদি থাকুক বা না থাকুক, বৈরাগ্যবেশকে লোকে এত পবিত্র মনে করে যে, যে কোন ব্যক্তি সেই বেশ পরিধান করে, তাহার চরিত্রাদির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া লোকে সেই বেশের সম্মাননা করে। আমাদের মনে পড়ে, অনেক দিন পূর্ব্বে এক জন রাজার বৈষ্ণবভক্তির আতিশয্য প্রদর্শন জন্য ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণববেশের প্রতি সমাদরবিষয়ক একটী আখ্যায়িকার আমরা উল্লেখ করিয়াছিলাম। যে ব্যক্তি বৈষ্ণববেশে তাঁহার সভায় আসিয়াছিল সে ব্যক্তি অতি নীচজাতি, অবৈষ্ণব ও অভক্ত, ইহা জানিয়াও তাহার বৈষ্ণববেশের প্রতি সমাদর প্রদর্শনার্থ রাজা তাহার বৈষ্ণবোচিত সেবা করিয়াছিলেন। ভক্তমালে উল্লিখিত এই আখ্যায়িকাটী দেশীয় সাধারণ লোকের চরিত্রের প্রতি উপেক্ষা, বৈরাগ্যবেশের প্রতি অত্যাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক এদেশে প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু জাতীয় দুর্ব্বলতা শিক্ষিতগণের হৃদয় হইতেও আজ পর্য্যন্ত তিরোহিত হয় নাই। এরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া আমাদের আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। শিক্ষা অপেক্ষা বংশপরম্পরাগত মানসিক ভাবের কত দূর প্রাবল্য ইহা যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন শিক্ষা উহার নিকটে কত দূর দুর্ব্বল। শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রতিনিয়ত আমরা ঈদৃশ দুর্ব্বলতা দেখিয়া ক্ষোভ প্রাপ্ত হই, কিন্তু ইহা নিশ্চয় কথা, যত দিন না বেশ ছাড়িয়া বস্তুর প্রতি সমাদর বাড়িতেছে, তত দিন এ দুর্ব্বলতা তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

এখন জিজ্ঞাসা এই, হঠাৎ বেশ ছাড়িয়া বস্তুর প্রতি সমাদর ধাবিত হওয়া সম্ভব কি না? বেশ দেখিয়া যে ব্যক্তির চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছে, সে ব্যক্তির কি যথার্থ বস্তু দেখিবার সামর্থ্য থাকে? অস্থানে শ্রদ্ধা স্থাপন করিলে, সেই শ্রদ্ধা অন্তশ্চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলে, এবং বেশ ও বাক্যাদির কুহকে পড়িয়া সে ব্যক্তি অবস্তুকে বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে। কত কুহকমুগ্ধ ব্যক্তি গুরুর উপদিষ্ট নিরর্থক প্রণালী প্রতিদিন অভ্যাস করিতেছে, বস্তু দর্শন ঘটিতেছে না, অথচ সেই প্রণালীকেই জীবনের

সর্ব্বস্ব করিয়া ফেলিয়াছে। যদিও বৈষ্ণবসাধকগণ ঈদৃশ উপায় অবলম্বনে কালক্ষয় করার নিন্দা করিয়াছেন, তথাপি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি যখন বৃথা কালক্ষেপের দোষ একবারও গণনায় আনেন না, তখন তাঁহারা আজীবন যে বৃথা অনুষ্ঠানে কালক্ষয় করিবেন না, কে বলিতে পারে? অবশ্য তাঁহারা এই যুক্তি দিবেন, প্রথমতঃ কি আর বস্তুদর্শন ঘটে? গুরূপদিষ্ট প্রণালী অভ্যাস করিতে করিতে কালে সৌভাগ্যোদয় হইলে বস্তুদর্শন ঘটিবে। ইঁহাদের কথা আমাদের মনে লাগে না। প্রথমেই উজ্জ্বলরূপে বস্তুদর্শন না হইল, বস্তু দর্শনের প্রারম্ভ লইয়া যদি সাধনের আরম্ভ না হয়, তাহা হইলে সে সাধন হইতে বস্তুদর্শন ঘটিবে কখন আশা নাই। যিনি সাধনপ্রণালী উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার জীবন উপদেশানুরূপ কি না? তাঁহাতে কোনপ্রকার নৈতিক শিথিলতা আছে কি না? তিনি লোভাদির অধীন কি না? এই সকল দেখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যে ব্যক্তিতে এই সকল দোষ আছে তাঁহার নিজের বস্তুদর্শন ঘটে নাই, তৎসম্বন্ধে তিনি অন্যের সহায়তা করিবেন তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

সর্ব্বপ্রকার বাহ্যবেশের প্রতি বিতৃষ্ণা আমাদের নিকটে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা বাহ্যবেশ বৈরাগ্যাদির সহায়রূপে ধারণ করিতেন তাঁহারাও উচ্চভূমিতে আরোহণ করিলে সে সকল চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ জনগণের ন্যায় হইতেন। ইহাতে এই বুঝায় যে, যত দিন সাধন অপক্ব থাকে, ততদিন বাহ্যবেশ থাকে, সাধন পরিপক্ব হইলে আর উহা থাকে না। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে বাহ্যবেশ দেখিয়া যে ব্যক্তি ভুলিয়া যায়, সে অপরিপক্ব সাধকের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। ঈদৃশ সাধক একবার শিষ্যসংগ্রহের রসাস্বাদ পাইলে আর তাহা ছাড়িতে পারে না, ক্রমে অচতুর ব্যক্তিগণকে নিজজালে নিক্ষেপ করিবার জন্য বঞ্চনাজাল বিস্তার করে। পূর্ব্বকালে যাঁহারা উচ্চ সাধক হইতেন তাঁহারা আপনাদের গভীর ধর্ম্মসাধন জনচক্ষুর অগোচর করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা সাধারণ লোকের ন্যায় নহেন, ইহা দেখিয়া লোক সকল তাঁহাদিগকে উন্মত্ত বলিয়া অত্যাচার করিত। সেই সকল লোক কেবল তাঁহাদিগকে চিনিতেন যাঁহাদিগের বস্তু বুঝিয়া লইবার সামর্থ্য ছিল। বেশ অন্বেষণ করিও না, বস্তু অন্বেষণ কর, কথা অপেক্ষা জীবনকে সর্ব্বপ্রধান স্থান দাও, দেখিবে, তোমার দুর্ব্বলতা চলিয়া গিয়াছে, আর তোমায় বঞ্চকগণের বঞ্চনাজালে পড়িতে হইবে না।

সংসার কি সাধনে অনুকূল হয় না?

সাধকের পক্ষে সংসার অতি ভয়ের স্থান, বিপদের স্থান, অথচ আমরা সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি না, চলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক বরং একটি একটি করিয়া সংসারের বন্ধন বাড়াইয়া লইতেছি; এরূপস্থলে সংসারকে সাধক যদি আপনার অনুকূল করিয়া লইতে না পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মজীবন তাঁহার বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? সংসার যদি আমাদের ধর্ম্মসাধনে প্রতিকূলই থাকিল, এবং চিরজীবন প্রতিকূল থাকিবে, ইহাই যদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মজীবনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করা অপেক্ষা সংসারের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করা কি শ্রেয়স্কর নহে? সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও কেহ মন হইতে সংসারকে বিদায় করিয়া দিতে পারে না। অতএব এমন কিছু উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন যাহাতে সংসার থাকিবে, সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য ষোল আনা থাকিবে, অথচ সংসার ধর্ম্মসাধনের সর্ব্বথা অনুকূল হইবে।

স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি লইয়া সংসার। যত মায়া মমতা বন্ধনের কারণ সকলই ইঁহারাই। ইঁহারা যদি সকলেই ঈশ্বরের অনুগত হয়েন, তাহা হইলে সংসার আর সংসার রহিল না, স্বর্গধাম হইয়া গেল। তবে সংসার বলিতে তাহাকেই বুঝায়,

যাহার মধ্যে অল্প বিস্তর সকলেই সাধনের প্রতিকূল। ঈদৃশ প্রতিকূলতার মধ্যে বসিয়া সাধন করা সহজ কথা নহে, কিন্তু যদি ধর্ম্মের উচ্চতম সাধন করিবার কাহারও বাসনা থাকে, তাহা হইলে প্রতিকূল সংসারকে অনুকূল করিয়া লইয়া তন্মধ্যে বাসিয়া সাধন করিতে হইবে। প্রতিকূল সংসার অনুকূল হইবে কি প্রকারে? যাহা প্রতিকূল তাহা অনুকূল করিয়া লইতে গেলে তৎসম্বন্ধে মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া প্রয়োজন। মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারা সহজ নহে, কারণ কোন মানুষের নিজের মনোভাবের উপরে সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রভাব বিস্তার করিবার সামর্থ্য নাই। প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে তদুপরি প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। নিজের ক্ষমতায় ইহা হয় না, ঐশ্বরিক ক্ষমতায় উহা হয়, ইহা আর কেনা বুঝে? কিন্তু ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করা আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, ঈশ্বর যখন কৃপা করিবেন তখন তাঁহার বলে আমরা বলী হইব সত্য, কিন্তু কখন তিনি কৃপা করিবেন তাহা যখন জানি না তখন অনিশ্চিত বিষয়ের উপরে সাধন আরম্ভ করিবার সম্ভাবনা কোথায়? অবশ্য তবে এমন কোন উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন যাহা ব্রহ্মবিজ্ঞানসম্মত, এবং আমাদের নিত্য সাধনের বিষয়।

মহর্ষি ঈশা ধর্ম্মের মানবীয় বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। তিনি মানবীয় সম্বন্ধসমূহ রক্ষা করিয়া কি প্রকারে সংসারে বাস করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে সেই তাঁহার আপনার, একথা বলিয়া তিনি সাধকসম্প্রদায়ের সহিত সাধকগণের সম্বন্ধ কোন্ ভূমির উপরে স্থাপিত তাহা দেখাইয়াছেন। যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করে না, প্রত্যুত তাহার বিপরীতে চলে তাহারা আপনার নয়, একথা বলিয়া তিনি যেন তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন, এইরূপ মনে হয়, কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এই সকল ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ কাটিয়া দিয়াছেন তাহা নহে; আর এক ভূমির উপরে তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ তিনি স্থির করিয়া লইয়াছেন। সে ভূমি কি একবার ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। •

মহর্ষি ঈশা আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বিশ্বাস করিতেন। কেবল আপনাকেই ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া মনে করিতেন তাহা নহে, যে সকল লোক ধর্ম্মপিপাসু হইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিতেন, তাঁহাদিগকেও তিনি ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। পিতা না আনিলে কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে পারে না, একথা বলাতে এই বুঝায়, যে সকল ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিতেন তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। এরূপ বিশ্বাস করিতেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করিতেন। যে সকল লোক বিরোধী হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগকে তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতেন, এখন এইটি যদি আমরা বুঝিতে পারি তাহা হইলে প্রতিকূল সংসারে সাধনের ভূমি কি আমরা লাভ করিতে পারি। যাহারা বধবন্ধনার্থ মহর্ষি ঈশাকে আসিয়া আক্রমণ করিল, তাহাদিগের প্রতি তিনি কি আচরণ করিয়াছিলেন, একবার তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই এসকল ব্যক্তির সহিত কি সম্বন্ধ তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমরাই বা আমাদের প্রতিকূল ব্যক্তিগণের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিব আমরা তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিব। তাঁহার প্রিয় শিষ্য যখন তরবারি লইয়া এক ব্যক্তির কর্ণচ্ছেদন করিলেন, এবং সমরে উদ্যত হইলেন, তখন ঈশা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিয়া অল্পবিশ্বাসের জন্য তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন, এবং বলিলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি এইরূপই না হইবে, তাহা হইলে তিনি স্বর্গ হইতে সহস্র সহস্র দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণকারিগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতেন। যে

বিশ্বাসঘাতক শিষ্য তাঁহাকে ধরাইয়া দিল, তাহাকে তিনি তৎকালে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এ সকল ব্যাপার কি দেখাইয়া দেয়? এই দেখাইয়া দেয় যে, তাঁহার জীবনের পূর্ণতা সাধন জন্য এই সকল প্রতিকূল ব্যক্তিগণ ঈশ্বরপ্রেরিত। যদি তিনি এরূপ বিশ্বাস করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অকাতরে অবিচলিত ভাবে সকল প্রকারের অত্যাচার অপমান একটী কথা না বলিয়াও বহন করিতে পারিতেন না।

মহর্ষি ঈশার ধর্ম্মের মানবীয় বিভাগের পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই পাইতেছি, প্রতিকূল অনুকূল সকল ব্যক্তিকে তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। 'ইহারা ঈশ্বরপ্রেরিত' যে ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিতে পারে, তাহার অনিষ্ট সাধন কোন ব্যক্তি দ্বারা হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি সেই সকল ব্যক্তি তাহার প্রতি অত্যাচার করে, সে বিশ্বাস করে যে এ সকল অত্যাচার আমার জীবনের পূর্ণতাসাধন জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত, সুতরাং আর সে সে সকল ব্যক্তিকে তুচ্ছ করিতে পারে না, অত্যাচারেও তাহার মনের শান্তি অপহৃত হয় না, বরং তাহাতে আত্মার বল বিক্রম ও উদ্যম বাড়ে। যাঁহাদিগকে লইয়া সংসার তাঁহারা যদি প্রতিকূল হন, তাঁহারা আমাদিগের বল বিক্রম উদ্যম বৃদ্ধির হেতু হইবেন। পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে কেবল যদি ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সংসারে নিরাপদ হইলাম। ঈশ্বরকৃপায় আমরা সকলকে প্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিতে যদি সমর্থ হই, সংসার আর সাধনপথের কণ্টক হইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় আমাদের প্রতিদিনের জীবনই সাক্ষ্য দান করিবে, সংসার কি সাধনে অনুকূল হয় না?

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি বলিয়াছ তুমি অভিলাষের বিরোধী নও। অভিলাষ যদি ঈশ্বরের ইচ্ছানুগামী হয়, তাহা হইলে তাহাতে ধর্ম্মজীবনের ক্ষতি না হইয়া বরং ধর্ম্মজীবন উন্নত হয়। যদি এরূপই হইবে, তাহা হইলে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় অভিলাষের বিরোধী কেন?

বিবেক। আমি তো তোমায় বলিয়াছি, যে অভিলাষের বিরোধে সাধকগণ সাধন করিয়াছেন, সে অভিলাষ সংসারাভিলাষ। সংসারাভিলাষ পরিত্যাগ না করিলে ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত অভিলাষ কখন উপস্থিত হয় না। সুতরাং অভিলাষকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; এক সাংসারিক, আর এক ঐশ্বরিক। সাংসারিক অভিলাষ ধর্ম্মজীবনের যেমন ক্ষতি করে, ঐশ্বরিক অভিলাষ তেমনি ধর্ম্মজীবনকে উন্নত হইতে উন্নত করে। যে জীবনে ঐশ্বরিক অভিলাষ নাই, সে জীবন কখন ধর্ম্মের উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হইতে পারে না।

বুদ্ধি। কোন্‌টি সাংসারিক অভিলাষ ইহা বোঝা কিছু কঠিন নয়। ঐশ্বরিক অভিলাষ বুঝিবার উপায় কি?

বিবেক। বিষয়বাসনা নিবৃত্ত না হইলে ঐশ্বরিক অভিলাষ কখন হৃদয়ে স্থান পায় না। শাক্যের নির্ব্বাণ জীবনে উপস্থিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বরিক অভিলাষ যে উপস্থিত হয় তাঁহার জীবনই উহার প্রমাণস্থল। নির্ব্বাণলাভের পর তিনি একথা বলিলেন কেন, 'জীবের প্রতি আমার অনন্ত করুণা।' যাঁহার সকল প্রবৃত্তি বাসনা নিবৃত্ত হইল, তিনি আবার মহান্ উদ্যমের সহিত নির্ব্বাণপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? এরূপ প্রচারোদ্যম কি নির্ব্বাণ বা নিবৃত্তিবিরোধী নয়? তীব্র সাধনে যাই তাঁহার সংসারিক অভিলাষ নিবৃত্ত হইল, অমনই সেই শূন্য স্থান ঐশ্বরিক অভিলাষ আসিয়া পূর্ণ করিল। আপনার সুখকামনা নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু পরের সুখশান্তি বাড়াইবার জন্য তাঁহাতে উদ্যম প্রকাশ পাইল। আত্মসুখকাম সাংসারিক অভিলাষ, পরসুখাভিলাষ ঐশ্বরিক অভিলাষ, এইটি বুঝিলেই আর কাহাকে সাংসারিক কাহাকে ঐশ্বরিক অভিলাষ বলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। মনে হয়, তুমি দ্বিবিধ অভিলাষ কি এখন বুঝিয়াছ, আজ এই পর্য্যন্ত।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

প্রশ্নোত্তর।

(স্বর্গগত ভাস্করানন্দ স্বামীর উত্তর।)

কিছুদিন হইল আমরা যখন বারাণসীতে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, তখন তথাকার প্রসিদ্ধ সাধু ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত নিম্নলিখিত আলোচনা হইয়াছিল। আশা করি যদি আপনার পত্রিকায় বাহির হয় তাহা হইলে ইহার দ্বারা সাধারণের অনেক উপকার হইবে এবং এ বিষয়ে যদি কাহারও জানিবার কিছু ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আপনার নিকট তাঁহারা জানিতে পারিবেন। এই সকল বিষয় লইয়া সাধারণ লোকের ভিতর আলোচনা হইলে

বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আমি এইগুলি প্রকাশিত করিবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

১ প্রশ্ন। সংসার আসক্তি কমে কিসে?

উত্তর। যদি ভগ্নী খুব সুন্দরী এবং স্ত্রী খুব কুৎসিত হয়েন, ভগ্নী নিকটে আসিলে কোন প্রকার ভাবান্তর হয় না, কিন্তু স্ত্রী নিকটে আসিলেই তাহা হয়, ইহার কারণ অভ্যাস। সেইরূপ যাহারা সংসারাসক্তিতে অভ্যস্ত, এবং ঈশ্বরানুরাগে অভ্যস্ত নহে, তাহারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারেই আসক্ত হয়।

২ প্র। ভগবানের প্রতি অনুরাগবৃদ্ধি হয় কি করিলে?

উ। স্বামীকে যেরূপ ভালবাসে, ছেলেকে যেরূপ ভালবাসে, তাহার এক আনা ভালবাসা তাঁহাকে যদি দেয় তাহা হইলে যথেষ্ট কল্যাণ হয়।

৩ প্র। মুক্তি কিসে হয়?

উ। বিচার অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হয়।

৪ প্র। বিচার কি?

উ। আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, এই জগৎ কি, কোথা হইতে ইহার উদ্ভব হইল, ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে ইত্যাদি অনুসন্ধানের নাম বিচার।

৫ প্র। নিষ্পাপ হইয়াছি কি প্রকারে জানা যায়?

উ। নিজ আত্মা তাহার সাক্ষী। যখনই নিষ্পাপ হইয়াছ, তখনই বুঝিতে পারিবে। পুণ্য ও পাপ উভয়ই মনুষ্যেতে আছে। ওজনে যখন যেটির গুরুত্ব বেশী হইয়া থাকে, মনুষ্য তখনই তদ্ভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ তখনই সে পাপী বা পুণ্যবান্ হয়। আলো ও অন্ধকারের ন্যায় তাহা পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যকে আক্রমণ করে।

৬ প্র। স্বর্গ নরক আছে কি?

উ। হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন পাইখানাই নরক, আর আমার সঙ্গে যে সকল ভগবৎকথা কহিতেছ ইহাই স্বর্গ, অর্থাৎ স্বর্গ ও নরক বলিয়া প্রকৃত স্থান কিছুই নাই। ভগবানের সঙ্গে যোগ থাকিলেই স্বর্গ এবং তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই নরক।

৭ প্র। বেদাদি শাস্ত্র অভ্রান্ত কি না?

উ। অভ্রান্ত নহে। তাহাতে অনেক স্থলে বিবদমান ও বিপরীত বিধি আছে। একই উপায়ে কাহার মতে নরকগামী হইতে হয় এবং কাহারও মতে স্বর্গগামী হইতে হয়।

৮ প্র। ব্রাহ্মণ শূদ্রের পার্থক্য আছে কি?

উ। না,আদিতে কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের শরীরে দুগ্ধ ও শূদ্রের শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয় না। ব্রহ্মকে যে জানে সেই ব্রাহ্মণ।

৯ প্র। নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হয় কি?

উ। নিরাকারের উপাসনা ধ্যান ধারণা অসম্ভব, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ প্রয়োগ করিলেই সাকার ভাব আসিবেক। ব্যাপক শব্দ বলিলে নিরাকার বোঝায়।

১০ প্র। বৈরাগ্য কাহাকে বলে?

উ। তিতিক্ষাই বৈরাগ্য অর্থাৎ যাহার পক্ষে শীত, উষ্ণ, ধন, নির্ধন, মান, অপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা জন্মিয়াছে, তাহারই যথার্থ বৈরাগ্য হইয়াছে।

১১ প্র। চিত্তশুদ্ধি কিসে হয়?

উ। ভগবানের সহিত যোগযুক্ত থাকিলেই হয়।

১২ প্র। যোগ হয় কি না?

উ। হঠযোগ প্রভৃতি রোগের কারণ, তাহাতে মুক্তি নাই। এখনকার দুর্ব্বল শরীরে তাহা সহ্য হয় না।

১৩ প্র। সত্যং জ্ঞানমনন্তং যে ব্রহ্ম তাঁহার পূজা কি রূপে হয়?

উ। অদ্বৈত ভাবে তাঁহার পূজা হয় না, তবে দ্বৈত ভাবে পূজা হয়। তিনি যখন এক ছিলেন সে ভাবে তিনি বাক্য মনের অতীত; তবে যখন তিনি এক ছিলেন বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইল। তিনি জগৎস্রষ্টা, এই সগুণ ভাবে এখন তাঁহার পূজা ধ্যান ধারণা হয়।

১৪ প্র। তবে তাঁহার প্রতিমা হয় কি না, প্রতিমা পূজায় ফল আছে কি?

উ। তাঁহার প্রতিমা হয় না। প্রতিমাপূজায় কোন ফল নাই।

১৫ প্র। আপনার প্রতিমা যে লোকে পূজা করে তাহাতে কি ফল হয়?

উ। তাহাতে কোন ফল নাই। আমি এখানে বসিয়া রহিয়াছি, আমাকে পূজা না করিয়া আমার প্রতিমূর্ত্তির পূজায় কি ফল? আমি অন্ধকারে বসিয়া থাকি, কিন্তু প্রতিমার নিকট লণ্ঠন জ্বলে ও আরতি হয়। আমি অনেক মানা করিয়াছি, লোকে শোনে না, কি করিব?

১৬ প্র। এইরূপই কি রামকৃষ্ণাদির প্রতিমূর্ত্তির পূজা চলিয়াছে?

উ। হাঁ, ঠিক এই রূপই চলিয়াছে।

১৭ প্র। ভগবান্ কি অবতার হইয়া মানুষের ন্যায় বেশ প্রাপ্ত হন?

উ। না, তাহা হয়েন না, এখনকার ইংরাজই অবতার। যাহাকে অধিক মান্য করে, তাহাকেই লোকে অবতার মনে করে। এখনকার ইংরাজরা যেরূপ, পূর্ব্বে রামকৃষ্ণাদি সেইরূপ ছিলেন।

১৮ প্র। এখন যাহারা প্রতিমাদি পূজা করিবার জন্য তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছে তাহারা কি করিতেছে?

উ। স্বামিজী আপনার পায়ে কুড়ালি আঘাতের ন্যায় মুখে ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া দেখাইয়া দিলেন,—ইহারা ইহাই করিতেছে, অর্থাৎ আপনার পায়ে আপনি কুড়ালি দিতেছে।

১৯ প্র। জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়?

উ। জ্ঞানই বড়, কারণ জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। বেদান্ত হইতে জ্ঞানময় ঈশ্বরের প্রকাশক কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিলেন।

২০ প্র। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় কি না ?

উ। সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্ম হয়, ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ। আমি যে সংসার ত্যাগ করিয়াছি তাহা অন্য কথা, কিন্তু যাহারা সংসারে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধি করিয়া ধর্ম্ম করিতে পারেন তাঁহারাই যথার্থ সাধু, জনকাদি তাহার বিশিষ্ট উদাহরণ। যাহারা সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম করে তাহাদের মন পরিতৃপ্ত থাকে, সুতরাং তাহারা সহজেই ঈশ্বরানুগত হয়। বনে গিয়া সন্ন্যাসী সংসারের পদার্থের জন্য পিপাসু থাকে, এজন্য তাহারা অভাবগ্রস্ত। সংসারীর সমুদায় প্রস্তুত, এজন্য সে চিত্তশুদ্ধি করিতে পারিবেক,ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারিবেক।

২১ প্র। মন সকল সময়ে নির্ব্বিকার থাকে না কেন ?

উ। মন সদা স্ফটিকের ন্যায়। তাহাতে লাল হরিদ্রা প্রভৃতি যখন যে রঙ্গ লাগে তখন সেই রূপ ধারণ করে। সে যখন ধন চায় তখন ধন হয়, ঘোড়া চায় ঘোড়া হয়, সংসারের চাকচিক্য দেখিয়া তাহারই অধীন হয়। এই জন্য সাধন আবশ্যক।

২২ প্র। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সহিত সহজে যোগ হয় কেমনে ?

উ। স্ত্রীলোকের শরীরের রক্তমাংস ও পুরুষের রক্তমাংস একই পদার্থ; সেইরূপ মনুষ্যের আত্মা ও পরমাত্মা অভেদ।

২৩ প্র। সাধকের চক্ষে অশ্রু পড়ে কি প্রকারে ?

উ। উহা কিছুই নহে। লোকে ছেলে হলেও কাঁদে, না হলেও কাঁদে এবং মরিলেও কাঁদে।

২৪ প্র। পরজন্ম আছে কি না ?

উ। এ বিষয়ে দু মত।

২৫ প্র। আপনার কি মত ?

উ। আমার মতে পরজন্ম নাই, আমার পরজন্ম হবে না। সেই স্থানে আর একটী স্ত্রীলোক বসিয়া ছিলেন, তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, ইহার পুনর্জন্ম হইবে।

২৬ প্র। কেন ?

উ। কারণ ইহারা কামনা করিয়া পূজা করেন।

২৭ প্র। জাতিভেদের জন্য উপবীত আবশ্যক কি না ?

উ। কিছুই দরকার নাই, বরং থাকিলে উপসর্গ অনুভব করিতে হয়, বরং ছিঁড়ে গেলে অনুসন্ধান করিতে হয়, এবং নূতনের জন্য চেষ্টা করিতে হয়।

২৮ প্র। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কিরূপ যোগ হয় ?

উ। যেমন নদী সাগরে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়।

২৯ প্র। মানুষ মানুষের গুরু হইতে পারে কি না ?

উ। ঈশ্বর ভিন্ন গুরু নাই। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না।

৩০ প্র। উপবাসের প্রয়োজন আছে কি না ?

উ। কিছুই নাই, যখন অন্ন মেলে তখনই খাইবে। না মিলিলে তবে কাজেই উপবাস।

৩১ প্র। আপনি পূজা করেন কি না ?

উ। করি না ; আমি বেদান্ত পাঠ করি।

৩২ প্র। গীতাতে যে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন তাহার অর্থ কি ?

উ। তিনি আপনাকে দ্বারস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আপনাকে ঈশ্বর বলেন নাই।

৩৩ প্র। ধর্ম্ম প্রচার করা আবশ্যক কি না ?

উ। বিশেষ আবশ্যক। ঈশ্বর রসনা দিয়াছেন, তাঁহার কথা প্রচার করিবার জন্য।

৩৪ প্র। যোগীরা কি ধ্যান করিতেন ?

উ। তাঁহারা অউম্ অর্থাৎ ওঁ শব্দের প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন।

৩৫ প্র। আপনি কি ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিয়াছেন ?

উ। হাঁ আমি ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিয়াছি। আমি কেশবকে জানিতাম, তিনি খুব প্রেমিক ও ভক্ত ছিলেন। তিনি সিমলাযাত্রাকালে আমার সহিত দেখা করিতেন, আমি একবার তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। তিনি বড় সুন্দর ছিলেন. তাঁহার দেহে খুব কান্তি ছিল। তাঁহার মত ও আমার মত এক ছিল।

৩৬ প্র। মুক্তি কাহাকে বলে।

উ। মুক্তি নাই, যেহেতু বন্ধন নাই, আত্মা স্বতই বন্ধনমুক্ত।

৩৭ প্র। তবে সাযুজ্যাদি মুক্তির উল্লেখ আছে, তাহা কি ?

উ। তাহা ভক্তিপথাবলম্বীদিগের পক্ষে।

৩৮ প্র। স্বর্গ নরক কি তবে যথার্থই নাই ?

উ। অজ্ঞানীর পক্ষে আছে, জ্ঞানীর পক্ষে নাই। জ্ঞান ব্যাপকরূপে স্বপ্রকাশ, কাহাকেও আশ্রয় করিয়া স্থিতি করে না। জ্ঞানময় নির্লিপ্ত আত্মার পাপ পুণ্য নাই, অজ্ঞানের সকলই আছে।

স্বর্গগত ভাই ফকিরদাস রায়।

আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়া গতবারের পত্রিকার সংবাদস্তম্ভে প্রকাশ করিয়াছি যে, হাবড়া নগরের অন্তর্গত শিবপুর পল্লীতে বিগত ১৫ই শ্রাবণ আমাদের প্রিয়তম ভাই ফকিরদাস রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। গত আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে অমরাগড়ীস্থ নিজভবনে ভাই ফকির দাসের হঠাৎ ভয়ঙ্কররূপে রক্তবমন ও দাস্ত হয়, তখন তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা হইয়াছিল। সেই সাংঘাতিক অবস্থার পর কয়েক দিন যে বাঁচিবেন এরূপ কোন আশা ছিল না। তাঁহার প্রথম জামাতা হাবড়ানিবাসী আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীমান্ শরৎকুমার দাস এবং স্থানীয় চিকিৎসকগণ যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করেন। তাহাতে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ ও সবল হন। পূর্ব্বে দুর্ব্বলতাবশতঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না, পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা হইত, কতিপয় দিবস পরে তিনি অন্য সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া উঠিয়া বসিতে, এমন কি

দাঁড়াইতে ও দুই চারি পদ চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং রীতিমত পথ্যাদিও করিতে পারিতেছিলেন। ফকিরদাস বহুকাল হইতে অম্লশূল রোগে ক্লেশ পাইতেছিলেন। ১৮৯৯ সালের ৬ই ফাল্গুন অমরাগড়ী নববিধান ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিন তিনি প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন করেন, তাহার পরদিন মহামত্ততার সহিত পল্লীতে পল্লীতে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। সেই মহা সঙ্কীর্ত্তনের পর ফকিরদাস ভয়ানক হৃদরোগে আক্রান্ত হন, অসহ্য বেদনায় তাঁহার সংজ্ঞালুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। রোগের ক্রমে উপশম হয়, এবার সেই হৃদরোগেরই প্রবল আকারে পুনঃপ্রকাশ হইয়াছিল। ফকিরদাস কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিয়া স্বীয় সহাধ্যায়ী বন্ধু শিবপুরস্থ সুচিকিৎসক আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ঘোষ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে কিয়দ্দিন থাকিয়া ও বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া শরীরকে স্বচ্ছন্দ ও সবল করিবার জন্য মৃত্যুর ৭। ৮ দিন পূর্ব্বে সপরিবারে শিবপুরে আগমনপূর্ব্বক ডাক্তার বিহারী বাবুর আবাসের সন্নিহিত একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে স্থিতি করেন। রোগের আকস্মিক আক্রমণ ও পরাক্রম দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আর অধিক দিন বাঁচিবেন না, পুনর্ব্বার রোগের সামান্য আক্রমণও সহ্য করিতে অসমর্থ হইবেন, এজন্য অমরাগড়ীস্থ ব্রহ্মমন্দিরের ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবার জন্য আয়োজন উদ্যোগ করিতেছিলেন। অমরাগড়ী নববিধানসমাজ-সংক্রান্ত দাসমণ্ডলী ও উপাসকমণ্ডলী এই দুইটী মণ্ডলী বিদ্যমান। যাহারা প্রচারব্রতে ব্রতী তাঁহারা দাসমণ্ডলীভুক্ত। ভাই ফকিরদাস রায়, শ্রীমান্ আশুতোষ রায় ও শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র রায় এই তিন জন অমরাগড়ীর দাসমণ্ডলীর সভ্য। সমস্ত মণ্ডলী ও সমস্ত বিষয়ের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ফকিরদাসের ছিল। তিনি মৃত্যুর কিয়দ্দিন পূর্ব্বে উভয় মণ্ডলীস্থ বিশেষ বিশেষ বন্ধুকে এরূপ বলিয়াছিলেন, "উপাসক মণ্ডলীর উপর দাস মণ্ডলীর বিশেষত্ব থাকিবে, মন্দিরে উপাসনাদি কার্য্যে দাসমণ্ডলীর অন্তর্গত লোকেরই বিশেষ অধিকার। যাহারা বিষয় কর্ম্মাদির সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, বিদ্যা বুদ্ধি পার্থিব সম্পদ ও ক্ষমতাবিষয়ে তাঁহারা অন্য লোক অপেক্ষা হীন হইলেও ধর্ম্মসমাজে তাঁহারাই অগ্রগণ্যরূপে গণ্য হইবেন। তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া চলা উপাসকমণ্ডলীর কর্ত্তব্য। কলিকাতাস্থ প্রেরিত দরবারের সঙ্গে যোগ রাখিয়া তাহার বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দাসমণ্ডলীকে চলিতে হইবে। আমার অবর্ত্তমানে অমরাগড়ীস্থ ব্রহ্মমন্দিরের বেদী যেন শূন্য রাখা না হয়। উভয় মণ্ডলী সম্মিলন ও সদ্ভাবসাধনে রত থাকিবেন" ইত্যাদিরূপে অনেক অন্তিম উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং অনুগামী বন্ধুদিগের কাহার কি দোষ, এবং তাঁহাদের কি কি দোষের জন্য মণ্ডলীর অধোগতি ও অনিষ্ট হইতেছে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন।' অমরাগড়ীস্থ প্রচারাশ্রম ও ব্রহ্মমন্দিরের ট্রষ্টীপত্রের লেখা পড়া করিবেন, তাহার আয়োজন উদ্যোগ করিতেছেন, মৃত্যু সেই কার্য্য সম্পাদনের অবকাশ দান করিল না। গত ১৫ই শ্রাবণ রবিবার রাত্রি ১০টা ২৫ মিনিটের সময় ৪৬ বৎসর বয়সে ফকির দাসের আত্মা অমরধামে যাত্রা করিল। মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তিনি বক্ষে অসহ্য বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, কয়েকবার কাসিয়াছিলেন। ডাক্তার আসিয়া ঔষধ খাওয়াইবার সময় প্রাপ্ত হন নাই। সেই রাত্রিতেই ৩টার সময় এখানে এই দুঃখের সংবাদ পঁহুছে। পরদিন প্রাতঃকালে উপাধ্যায় কতিপয় ব্রাহ্ম যুবক সহ শিবপুরে যাইয়া প্রিয়তম ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সম্পাদন করেন। এক পক্ষের মধ্যে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে ভাই ফকিরদাস বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুব্রতানন্দ বিগত রবিবার অমরাগড়ীতে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ভাই ফকিরদাস শেষজীবনে কোন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংশয়ভাজন হইয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছেন। সময়ে সময়ে প্রার্থনাতে অশ্রুর আকারে তাঁহার সেই দুঃসহ মানসিক ক্লেশ প্রকাশ পাইয়াছে। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ভাই ফকিরদাস শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিয়াছিলেন। এই পত্র স্বহস্তে লিখিয়া তাহার পরক্ষণেই লেখক পৃথিবীতে নাই, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রতিপালক মহাশয়
শ্রীচরণেষু

ভক্তির সহিত প্রণাম।

একবার দর্শন কি পাইব না? এখানে আসিয়া এক প্রকার আছি। তবে দুর্ব্বলতা শীঘ্র যাইবার নহে, কিন্তু palpitationএর tendency পূর্ব্ববৎই আছে। অদ্য তাহার ব্যবস্থা হইবার কথা আছে।

আপনাদের সকলের চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া বিদায় হই। ইতি

৩০শে জুলাই।
৩৯।১ গ্রাণ্ড ট্রঙ্করোড।
শিবপুর। হাওড়া।

প্রণত ভৃত্য
শ্রীফকিরদাস রায়।

ক্ষুদ্র পল্লীনিবাসী শ্রীমান্ ফকিরদাস সাধারণ লোকের মধ্যে গণ্য ছিলেন না। তাঁহার অতি উন্নত ধর্ম্মজীবন ছিল। যুগধর্ম্মবিধাতা শ্রীহরি সেই জীবন দ্বারা আশ্চর্য্য লীলা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত নানা ঘটনাপূর্ণ, অতিশয় শিক্ষাপ্রদ। তিনি স্বয়ং অমরাগড়ীর বিস্তীর্ণ ইতিবৃত্তে নিজের জীবনের অনেক রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, সত্বরই সাধারণে প্রকাশিত হইবে। আমরা সঙ্ক্ষেপে সেই সুন্দর জীবনকাহিনী বিবৃত করিতেছি।

অমরাগড়ী ও তাহার অদূরবর্ত্তী ঝিকিড়া জয়পুর তাজপুর গড়ভবানীপুর খালনা প্রভৃতি গ্রাম সকলে ধনী সম্ভ্রান্ত কৈবর্ত্ত লোকের বাস। এ সকল কৈবর্ত্তপ্রধান গ্রাম। কলিকাতা হইতে

৩৪ মাইল দূরে পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে হাবড়া জিলার অন্তর্গত ক্ষুদ্র অমরাগড়ী পল্লী। সেই পল্লীতে সম্ভ্রান্ত কৈবর্ত্ত কুলে ১২৬০ সালের ১৩ই কার্ত্তিক ভাই ফকিরদাস রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সূর্য্যকুমার রায়, পিতামহের নাম রামচরণ রায়। ইঁহারা উভয়েই পরলোক প্রাপ্ত। পিতা শুদ্ধ শান্ত ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। পিতামহও ধার্ম্মিকতা ও বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ। সূর্য্যকুমার রায়ের এক সময়ে প্রভূত ধনসম্পত্তি ছিল। নানা দুর্ব্বিপাকবশতঃ পরিণত বয়সে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রিয় ফকিরদাস এই সূর্য্যকুমার রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি অনতিদীর্ঘকায় গৌরবর্ণ সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মভীরু ঈশ্বরানুরাগী শান্তিপ্রিয় সত্যনিষ্ঠ মিষ্টভাষী বিনীত সচ্চরিত্র বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। মধ্যস্থ হইয়া বিবাদভঞ্জন ও পরস্পর বিরোধী দুই দলের মধ্যে সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন, বাল্যকাল হইতে ইহা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গকে তিনি পূর্ণ ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। গৌরাঙ্গ ঈশ্বর নহেন মনুষ্য, এরূপ কেহ বলিলে দৃঢ়তার সহিত এই কথার প্রতিবাদ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। ফকির দাস হিন্দুকুলগুরুর নিকটে সস্ত্রীক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি পরে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর তাঁহার গুরু তাঁহাকে নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক বলিয়া চিরকাল শ্রদ্ধা করিয়াছেন। অনধিক এক ক্রোশ অন্তর জয়পুরগ্রামনিবাসী স্বর্গগত ঈশানচন্দ্র হালদারের জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে ফকির দাস উদ্বাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন। সহধর্ম্মিণী সর্ব্ববিষয়ে চিরকাল নির্ব্বিবাদে তাঁহার অনুগামিনী হইয়া চলিয়াছেন।

ফকিরদাস আঁতুল স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষাদানে অনুত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্ত্তি হন। তখন শিবপুরস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারী লাল ঘোষ তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। এখানে হইতে ফকির এণ্ট্রান্স পাস করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন, বিহারী লাল ঘোষ মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। বাঙ্গালা অনুমান ১৮৮২ সালে যখন ভাই ফকির দাস কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার সহধ্যায়ী বন্ধু মেডিকেল কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত বিহারী লাল ঘোষ মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্রের নাম ও ব্রাহ্মসমাজের নাম উল্লেখ করেন। ফকির দাস বলিলেন "আমার বড় সাধ তাঁহাকে দেখিতে "সুলভ সমাচার পত্রিকা পাঠে আমি তাঁহার নামটি মাত্র জানিয়াছি, এবং তৎসঙ্গে ইহাও শুনিয়াছি যে, তিনি এক অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক, এবং তাঁহার উপাসনাই কর্ত্তব্য বিষয়ে তিনি উপদেশাদি প্রদান করেন।" সেদিন রবিবার ছিল, ফকিরদাস সেই দিবসই বন্ধুবর বিহারী বাবুর সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে গমন করেন। ফকির বাবু নিজ মুখে সেই দিনকার দৃশ্য এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন:—"আমি শ্রীব্রহ্মমন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখি একটী দেবমূর্ত্তি উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার ভাব দর্শনে মস্তক প্রণত, প্রাণ বিমোহিত হইয়াছিল।" তিনি সেই দিবস উপাসনায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যোগ দান করিয়া সেই দিন হইতেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনার প্রতি অনুরাগী হন। এই তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে প্রথম যোগ।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে অবস্থান কালে অনুমান বাঙ্গালা ১২৮৫ সালে ভাই ফকির কিছুদিনের জন্য ঝিকিড়া স্কুলের অবৈতনিক প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে উক্ত স্কুলের দুরবস্থামোচনপূর্ব্বক স্কুলটিকে রক্ষা করে। যদি সে সময় ফকিরদাস স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ না করিতেন স্কুল রক্ষা হওয়া দুরূহ হইত। উক্ত কার্য্যে ফকিরদাস অত্যন্ত সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এবং সম্পাদকের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

১২৮৬ সালের মাঘ মাসে জয়পুর স্কুল স্থাপিত হয়। ভাই ফকিরদাস প্রথমে তিনটি সহকারী শিক্ষক সহ স্বয়ং সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। ১২৯১ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল স্বয়ং সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছিলেন। শিক্ষকতাকার্য্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার নিকটে অনেক ছাত্র সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত স্কুলের কার্য্য করিয়াছিলেন, স্কুলের ফণ্ড হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই। সেই স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য যখন করিতেছিলেন, তখন সম্মিলিত ভাবে উপাসনা করার আবশ্যকতা তিনি অন্তরে স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সহকারী শিক্ষক ঝিকিড়ানিবাসী পাণ্ডবনাথ সিংহ এবং স্বীয় কনিষ্ঠ যশোদালাল রায় এবং আর একটি শিক্ষক সহ পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া একত্র উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় পুস্তকাকারে উপাসনাপদ্ধতি ছিল না, ফকিরদাস আরাধনাবিষয়ে কোন শিক্ষা কখন প্রাপ্ত হন নাই। তিনি নিজ অন্তরে আরাধনাপ্রণালীর আলোক প্রাপ্ত হন, তদনুসারে আরাধনা করিতে থাকেন। আশ্চর্য্য যে, পরে দেখেন তাঁহার আরাধনা প্রণালী আচার্য্যের প্রবর্ত্তিত আরাধনাপ্রণালীর সঙ্গে ঠিক মিলিয়া যায়। ইদানীং তিনি কোন বন্ধুর অনুরোধে আরাধনাতত্ত্ব বিষয়ে এক খানা পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা আয়তনে ১৬।১৭ ফর্ম্মা হইবে। সেই বন্ধু উক্ত পুস্তক পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন, এবং তাহা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ১৮৮৫ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ সে দেশে সুনীতি প্রচার ও ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য ফকিরদাস কর্ত্তৃক বন্ধুসম্মিলনী সভা স্থাপিত হয়। "মাদকদ্রব্য সেবন করিব না, ব্যভিচার করিব না, অসত্যাচরণ করিব না;" এই কয়টী প্রতিজ্ঞায় উক্ত সভার সভ্যদিগকে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল। সেই সভার কার্য্য কয়েক বৎসর অত্যন্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সভাতে ভাই ফকির

দাস অনেক উপদেশ ও বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা লিখিত আছে।

ক্রমে অমরাগড়ীর অনতি দূরবর্ত্তী গড় ভবানীপুর তাজপুর খালনা, ঝিকিড়া রাওতা প্রভৃতি গ্রামের অনেক যুবক আসিয়া ভাই ফকিরদাসের সঙ্গে উপাসনাদিতে যোগ দান করেন। পরে অনেকে তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হন। ১৮০৬ শকের ৭ই ফাল্গুন ভাই ফকির প্রচারব্রতে ব্রতী হইয়া যুবক বন্ধুগণ সহ গ্রামে গ্রামে উৎসাহ ও মত্ততার সহিত প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রচারের প্রধান অঙ্গ সঙ্কীর্ত্তন, আনুষঙ্গিক সংক্ষিপ্ত উপদেশ। ফকির দাসের ন্যায় সুমধুর প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন কেহই করিতে পারেন নাই। তিনি হরিনামে নিজে মত্ত ও বিহ্বল হইয়া অন্য লোককেও মত্ত ও বিহ্বল করিতেন। একটি অতি ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ত্তনে নূতন নূতন সুমিষ্ট পদের যোগ করিয়া তাহা ৪।৫ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত গাহিয়াছেন, দেখা গিয়াছে। অমরাগড়ীর ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তনের দল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর মাঘোৎসবের সময় ফকির দাস সদলে কলিকাতায় আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়াছেন। একবার আচার্য্যের নিকটে তিনি দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহাতে আচার্য্য বলেন, "তোমাকে আর এখানে দীক্ষিত হইতে হইবে না, তুমি বড় জায়াগায় দীক্ষিত হইয়াছ।" যে বার মাঘোৎসবের সময় কমলসরোবরে প্রচারকদিগের অভিষেক ক্রিয়ায় আচার্য্য স্বহস্তে সকলের মস্তকে তৈল মাখিয়া দিতেছিলেন, তখন ফকিরদাস নিকটে ছিলেন, তাঁহাকে তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমিও তোমার দেশে এ কার্য্য করিবে।" একদা ভাই ফকিরদাস সস্ত্রীক কমলকুটীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আচার্য্যদেব তাঁহার পত্নীর প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন, এবং স্বীয় পরিবারকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ তোমাদের একটী ভগিনী আসিয়াছেন।" একবার সদলে আমরাগড়ীতে যাওয়ার শ্রীমদাচার্য্যের বিশেষ ইচ্ছা ছিল।

ফকির স্বীয় অনুবর্ত্তী যুবকগণসহ প্রকাশ্যে প্রচার ও বিশ্বাসানুযায়ী অনুষ্ঠানাদি করিতে আরম্ভ করিলে তত্রত্য হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার ও তাঁহার অনুগামী বন্ধুদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি উৎপীড়নে প্রবৃত্ত হয়। তজ্জন্য হিন্দুদিগের অনেক সভাসমিতি হইতে থাকে। তাহারা সভাতে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া অত্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনা করে, কাহাকে কাণ ধরিয়া গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেয়। ১২৯১ সাল ৭ই ফাল্গুন ফকিরদাস স্বীয় পিতৃভবন হইতে সপরিবারে বহির্গত হইতে বাধ্য হন। পিতা সূর্য্যকুমার রায় অতিশয় সুজন ছিলেন, তিনি ফকিরদাসকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন নাই। কিন্তু ফকির আর পিতৃগৃহে স্থিতি করা অন্তরে সায় পাইলেন না। পৈতৃক সমুদায় সম্পত্তির স্বত্ব ত্যাগ করিয়া পৈতৃক অট্টালিকার পরিবর্ত্তে কাচারী বাড়ীতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবার স্থিতি করেন। পত্নী স্বামীর সঙ্গে এই ভাবে গৃহের বাহির হইয়া চলিয়া আসিতে কিঞ্চিন্মাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। পরে তিনি জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক কাচারী বাড়ী হইতে বহিস্কৃত হন, এক্ষণ যেস্থানে প্রচারাশ্রম নামক সুন্দর পাকাঘর দুই এক জন বন্ধু ও কুচবিহারের মহারাজের অর্থসাহায্যে নির্ম্মিত, তাহারই পার্শ্বে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ফকির সপরিবারে বাস করেন। সেই ঘরেও একদিন রাত্রিতে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল, কয়েকজন বন্ধুর উদ্যোগ চেষ্টায় তাহা নির্ব্বাণ হয়। তখন ফকিরের এক জন প্রতিবেশীর ঘরের চালায়ও অগ্নি জলিয়া উঠিয়াছিল, ফকিরদাস স্বীয় গৃহের অগ্নি নির্ব্বাণে চেষ্টা না করিয়া প্রতিবেশীর গৃহ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফকিরের যত্নে প্রতিষ্ঠিত স্কুল ঘর দগ্ধ হয়; কিন্তু তিনি সবান্ধবে ভিক্ষা করিয়া সংবৎসরের মধ্যে স্কুলঘর পাকা করেন। এই সময় ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অমরাগড়ীতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন, ভাই অমৃতলাল বসুও কিয়ৎকাল অমরাগড়ীতে ছিলেন। একদিন তিনি ভাই ফকিরদাস ও তাঁহার মণ্ডলী সহ ঝিকিড়া গ্রামে প্রচার করিতে গিয়া সদলে অতিশয় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কতকগুলি দুর্দ্দান্ত লোক মদ খাইয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া হৈ চৈ, করিয়া তাঁহাদের প্রচারে বাধা দেয়। গ্রামের লোকেরা কাদা ও অখাদি পশুর বিষ্ঠা ছুড়িয়া তাঁহাদিগকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেয়। পরে কিয়দ্দিনের মধ্যেই ফকিরের প্রেম ও বিশ্বাসের জয় হইয়াছিল। যাহারা পরম শত্রু ছিল এখন তাহারা পরম বন্ধু। ফকিরের সাধুত্ব ও ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া সকলের মস্তক অবনত হইয়াছে। ফকির ও তাঁহার অনুগামী লোকদিগের সদ্ব্যবহার ও প্রাণগত যত্ন ও সেবাতে, শত্রু আর শত্রু থাকিতে পারে নাই, পরম মিত্র হইয়াছে। এক্ষণ অনেক বিষয়ে তাঁহারা ফকিরের অনুগামীদিগের সাহায্যপ্রার্থী অনুগ্রহপ্রার্থী ও মুখাপেক্ষী। ইহাকেই বলে সত্যের জয়। পিতা সূর্য্যকুমার রায় পূর্ব্ব হইতে ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। প্রাতঃকালে পুত্রের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সংবাদ লওয়া পিতার নিত্য কার্য্য ছিল। তিনি ব্রহ্মমন্দিরে যাইয়া মন্দিরকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেন। সে দেশে কোন দুই দলে বিবাদ উপস্থিত হইলে সচরাচর উভয় দল ফকিরকে মধ্যস্থ মানিতেন, ফকিরের নিষ্পত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। একদা তাঁহার পিতার সঙ্গে কাহারও বিরোধ ঘটে, উভয়ে ফকিরকে মধ্যস্থ মান্য করেন; কিন্তু ফকিরের ন্যায়বিচারে পিতা পরাজিত হন। তাহাতে পিতা আহ্লাদিত হইয়া বলেন, "ফকিরের বিচার অতি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে।"

ভাই ফকির চিরবৈরাগী ছিলেন, কখন নিজে অর্থ উপার্জ্জন করেন নাই, নিজে স্ত্রীর হস্তে একটী পয়সাও কখন দান করেন নাই। দুই তিনটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন, তাহা অবৈতনিকরূপে। একজন জমীদারের উচ্চ বেতনের নায়েবীপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তাহা গ্রহণে সম্মত হন নাই। অন্নাভাবে অনেক দিন তাঁহাকে সপরিবারে উপবাস করিতে হইয়াছে।

একবার তাঁহার অনুগামী দুই তিনটি বন্ধু গাজীপুরে ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এরূপ লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, অন্নের অভাবে সপরিবারে দুই দিন যাবৎ উপবাস আছি। এই সংবাদ পাইয়া গাজীপুরস্থ ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায় মনিঅর্ডার যোগে পাঁচটি টাকা পাঠাইয়া দেন। বাড়ীতে কলাগাছ, ঝিঙ্গেলতা ইত্যাদি এই উদ্দেশ্যে তিনি রোপণ করিতেন যে, এক অন্নের সংস্থান হইলে তরকারির কার্য্য তাহা দ্বারা চালাইবেন। পরিবার ও বালকবালিকাও ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে ও সামান্যরূপে ভাতে ভাত খাইতে বিশেষ অভ্যস্ত হইয়াছেন। অমরাগড়ীর প্রচারফণ্ডের একান্ত অসচ্ছলতা। কেহ কেহ ফকিরদাসকে বলিয়াছিলেন,"পিতা সূর্য্যকুমার রায়ের অন্নকষ্ট হইতেছে, প্রচারফণ্ড হইতে তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য করা কর্ত্তব্য।" তাহাতে ফকিরদাস বলেন, "প্রচারফণ্ডের স্বচ্ছলতা থাকিলে করা যাইতে পারে, কিন্তু কেবল আমার পিতাকে সাহায্য করিলে চলিবে না। অখিলের পিতামাতা ও আশুতোষের মাতারও কষ্ট, তাহাদিগকে সাহায্য দান করিতে পারিলে, আমার পিতা সাহায্য পাইতে পারেন, অন্যথা নহে।"

১২৯০ সালের ২৫শে পৌষ শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণের দিনে নিমতলা শ্মশানঘাটে ফকিরদাস সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য বিধান জননী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হন। সেই বৎসর ৭ই ফাল্গুন যথাবিধি প্রার্থনা করিয়া এক বৎসরের জন্য বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ ও এক বৎসর পরীক্ষাধীনে থাকিবার জন্য যথাবিধি আবেদন-পত্র শ্রীদরবারে প্রেরণ করেন। ১২৯৯ সালের মাঘোৎসবে ভাই ফকিরদাস প্রেরিতমণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রেরিত দরবারের সম্পাদক উপাধ্যায় কর্ত্তৃক যথাবিধি তিনি প্রচারকব্রতে অভিষিক্ত হন।

১২৮৮ সনে ৬ই ফাল্গুন অমরাগড়ীর নববিধান মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়; ভাই ফকির দাস মণ্ডলীকর্ত্তৃক উপাচার্য্যপদে বরিত হন। ১২৯১ সনে ৬ই ফাল্গুন অমরাগড়ী নববিধানমণ্ডলী নববিধান ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়। ঐ সনের ৭ই ফাল্গুন ফকির দাস প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। ১২৯৯ সনের ৬ই ফাল্গুন অমরাগড়ীস্থ ব্রহ্মমন্দির মহা-সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কতিপয় প্রচারক, শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু ও কৈলাস চন্দ্র বসু, হরিদাস রায় প্রভৃতি ২৫। ৩০ জন নববিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্ম তথায় গিয়াছিলেন। পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয়ে অতি সুন্দর বৃহৎ মন্দির ভাই ফকির দাস ও তাঁহার বন্ধুদিগের উদ্যোগে ভিক্ষালব্ধ অর্থে প্রতিষ্ঠিত। অমরাগড়ীতে ফকিরদাসের যত্ন চেষ্টায় উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র হাজরার অর্থসাহায্যে ১৮৯৫ সনে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ফকিরদাসের অনুরোধে উক্ত হাজরা মহাশয় ১৬ হাজার টাকা সেই সৎকার্য্যে দান করিয়াছেন। তত্রত্য স্কুল, পোষ্টঅফিস ও অমরাগড়ীর রাস্তা ইত্যাদি ফকিরদাসের কীর্ত্তি।

কলিকাতার প্রেরিতমণ্ডলীর গোলযোগে তাঁহাদের কাহার প্রতি ফকিরদাসের মনে অশ্রদ্ধার উদয় হয় নাই, তিনি কাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ, কাহারও নিন্দা কখন করেন নাই। ১৮১৮ শকের ৪ঠা চৈত্র কুচবিহার নববিধানসমাজ পুনর্ব্বার প্রেরিত দরবারের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমুদায় ভার দরবারের হস্তে সমর্পণ করেন। উক্ত শকের ৮ই চৈত্র ভাই ফকিরদাস রায় দরবার কর্ত্তৃক কুচবিহারে নববিধান প্রচার ও তত্রত্য মন্দিরের বেদীর কার্য্য করিবার জন্য প্রেরিত হন। ১৮২০ শকের মাঘ মাসের শেষভাগে ফকির দাস উৎসবকার্য্য সম্পাদনার্থ কুচবিহার হইতে অমরাগড়ীতে চলিয়া যান। শ্রীমান্ ভাই বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ দরবার কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কিয়ৎ কালের জন্য কুচবিহারে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পরে কুচবিহারের মণ্ডলী শ্রীদরবারে বাধ্যতা অস্বীকার করাতে বৈকুণ্ঠনাথকে তথা হইতে অপসৃত হইতে হয়, ফকিরদাসও দরবারের পক্ষ হইতে আর কুচবিহারে গমন করেন নাই। কুচবিহারে তিনি সস্ত্রীক প্রায় দেড় বৎসর কাল স্থিতি করিয়াছিলেন। কুচবিহারের লোক তাঁহার কার্য্য-প্রণালীতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কুচবিহারমণ্ডলী দরবারের নিকটে এরূপ অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, যত দিন এখানে উপাধ্যায়ের অবস্থিতি সম্ভব না হয়, তত দিন ভাই ফকিরদাস যেন এস্থানে থাকিয়া কার্য্য করেন।

নিঃস্ব ফকির ক্ষুদ্র পল্লীকে নগরের শোভা দান করিয়াছেন। আজ তাঁহার অভাবে সে দেশ হাহাকার করিতেছে। অনেক-গুলি পরিবার হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া ফকিরের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন পিতৃহীন নিরাশ্রয় ও নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক মহিলা তাঁহা দ্বারা ধর্ম্ম-জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। ফকিরের উদ্যোগে আজ অমরাগড়ীর আউটডোর হাঁসপাতাল ইনডোরে পরিণত হইতে উপক্রম। ফকির তাহা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের তিনিই সেক্রেটরী ছিলেন।

ভাই ফকিরদাস আপনার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী, তিন কন্যা ও তিন পুত্র পৃথিবীতে রাখিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছেন। দুইটী কন্যা বিবাহিতা হইয়াছেন, অপর সকল সন্তানই অপ্রাপ্ত বয়স্ক। এই দুঃখী বৈরাগী পরিবারের একটি কপর্দ্দকও সম্বল নাই, ইঁহাদের অন্নদাতা আশ্রয় ও গতি একমাত্র ভগবান্। যে দুই তিনটি যুবা প্রাণপণ যত্নে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত এই পরিবারের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পাইল। শ্রীহরি এই গুরুতর পরীক্ষা দ্বারা তাঁহাদের জীবনের কল্যাণ সাধন করুন।

সংবাদ।

আগামী ১১ই ভাদ্র রবিবার সমস্ত দিনব্যাপী ভাদ্রোৎসব হইবে।

গত রবিবার কটক নগরে আটমল্লিকের রাজার দেওয়ান শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাওয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরস্বতী, উপাধ্যায়ের নিকটে, যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া নববিধানমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন।

বিগত শনিবার কটক নগরস্থ প্রিণ্টিং কোম্পানির হলে উপাধ্যায় "ধর্ম্মের ক্রমিক অভিব্যক্তি" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নগরস্থ বহু সম্ভ্রান্ত লোক সেই বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গত কল্য অপার সার্কুলার রোডস্থ ২৯৯ নং বাটীতে মেট্রপলিটান কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র সেনের সঙ্গে

স্বর্গগত শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুশীলার শুভ পরিণয় নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ২৮ বৎসর, পাত্রীর বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর। বিবাহসভায় নগরের বহু সম্ভ্রান্ত লোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ ভাই শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য, উপাধ্যায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর নবদম্পতীকে পুণ্য প্রেমেতে সমুন্নত করুন।

উপাধ্যায় কটক নগরে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদিন কটক নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাওয়ের আবাসে আলোচনাসভা হইয়াছিল। নগরস্থ বহু গণ্য মান্য লোক সেই আলোচনায় যোগ দান করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। গত রবিবার উপাধ্যায় কর্ত্তৃক কটক নগরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। গত কল্য তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। কটকে যাইবার সময় বালেশ্বর হইয়া গিয়াছিলেন। তথায় এক দিবস স্থিতি করিয়াছিলেন।

গত রবিবার অমরাগড়ীতে স্বর্গগত ভাই ফকিরদাস রায়ের আদ্য শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুব্রতানন্দ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ভ্রাতার শোকার্ত্তা সহধর্ম্মিণী হৃদয়বিদারক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক উপাসনাদি কার্য্য, শ্রীমান্ আশুতোষ রায় ও শ্রীমান্ অখিলচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সহকারী অধ্যেতার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। অমরাগড়ীর ও তৎসন্নিহিত দুই একটি গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোক আসিয়া সেই ক্রিয়ায় যোগ দান করিয়াছিলেন। এই পারলৌকিক কার্য্য অতি গম্ভীরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই ফকিরদাসের দেহভস্ম তাঁহার স্বর্গগত পিতার সমাধির পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যার পর ভাই গিরিশচন্দ্র সেন তত্রত্য নববিধান মন্দিরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। ঐহিক জীবনের অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল।

বিগত ২০শে শ্রাবণ শুক্রবার একসাইস কমিশনার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের বালীগঞ্জস্থ ভবনে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের সঙ্কট রোগ হইতে মুক্তিলাভ জন্য আরোগ্যদাতা বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা দানার্থ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। কতিপয় আত্মীয় অন্তরঙ্গ সেই উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন।

বিগত ১৮ই শ্রাবণ কাশীপুরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের ভবনে তাঁহার জামাতা শ্রীমান্ মুনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যার শুভ নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কুমারীকে চারুলতা নাম প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর নবকুমারীকে আশীর্ব্বাদ করুন। ডাক্তার বাবুর পঞ্চম পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্রের সেই দিন জন্মদিন ছিল বলিয়া নামকরণ ক্রিয়ার অন্তে সুধীন্দ্রের কল্যাণার্থে বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল।

বিগত ২৪শে শ্রাবণ মঙ্গলবার রাঁচি জেলার অন্তর্গত গেতলসুধ চাবাগিচার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামচরণ পাল মহাশয়ের মাতৃ-শ্রাদ্ধ রাঁচিনগরে নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। সকালবেলা শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্ম বন্ধু সহ একটী পুকুরে প্রার্থনা সহযোগে অবগাহন করেন। স্নানান্তে গৃহপ্রকোষ্ঠের এক প্রান্তে ভস্ম সমাহিত হয়। তৎপর যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা ও শাস্ত্র পাঠ হইয়াছিল। রাম বাবু সংহিতানুসারে প্রার্থনা করিয়া পরলোকস্থ মাতৃ-চরিত্রের সারাংশ বর্ণন করেন, এবং একটী হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা করেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ শ্রীদরবার কর্ত্তৃক তথায় প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং অনুষ্ঠানের উপাসনাদি কার্য্য করিয়াছেন। গরিবদের জন্য চাউল ডাইল ইত্যাদি ভোজ্যসামগ্রী, কয়েক খণ্ড বস্ত্র, ব্রহ্ম সাধকদের জন্য ধর্ম্মগ্রন্থ, বস্ত্র ও জলপাত্র ইত্যাদি দান হইয়াছে। তদ্ব্যতীত নিম্ন লিখিতরূপ অর্থ দান করা হইয়াছে। কলিকাতা প্রচারকার্য্যে ৫৲, ঢাকা প্রচার কার্য্যে ২৲, রাঁচি ব্রাহ্মসমাজে ১৲, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদিগকে ৩৲, অনাথ ব্রাহ্মপরিবারে ২৲, অনাথাশ্রমে ১৲ উদ্ধারাশ্রম ১৲।

শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ রাঁচি হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন কালে পুরুলিয়া নগরে তত্রত্য ডিপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার দাস গুপ্ত মহাশয়ের ভবনে তাঁহার আগ্রহ ও অনুরোধক্রমে দুই দিবস স্থিতি করিয়াছিলেন। একদিন প্রসন্ন বাবুর ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। নগরের বাঙ্গালি বিচারক প্রভৃতি কয়েকটি সম্ভ্রান্ত লোক তাহাতে যোগ দান করিয়াছিলেন।

গত শনিবার হাবড়ার সন্নিহিত ব্যাটরা পল্লীতে স্বর্গগত ভাই ফকিরদাস রায়ের প্রথমা কন্যা নবসংহিতানুসারে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ২২শে শ্রাবণ রবিবার সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের পুত্র শ্রীমান্ সত্যানন্দের সঙ্গে কিশোরগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত জগমোহন রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ব্রজবালার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হওয়াতে প্রচারাশ্রমে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই মাত্র সংবাদ পাইলাম, ২১ দিন রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শ্রীমান্ আশুতোষ রায়ের বৃদ্ধা গর্ভধারিণী গত সোমবার পক্ষাঘাত রোগে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভাই ফকিরদাসের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদনের পর আশুতোষ জন্মভূমি খালনা গ্রামে যাইয়া মাকে জীবিত দেখিতে পান নাই, তাঁহার মৃতদেহ দর্শন করিয়াছিলেন। আশুতোষ লিখিয়াছেন, "আমাকে তিনি সদাই এই কথা বলিতেন 'তুমি যাঁর আশ্রয় লইয়াছ, তিনি তোমাকে সতত রক্ষা করুন।' মন চল নিজ নিকেতনে, ওহে দিন তো গেল সন্ধ্যা হল, এই দুইটি গান কণ্ঠে ভাল বাসিতেন।"

বাঁকুড়ার শেশন জজ প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায়ের তৃতীয় পুত্র যোগীন্দ্রনাথ প্রায় তিন বৎসর কাল প্লীহা যকৃৎ ইত্যাদি রোগে বিষম ক্লেশ পাইয়া অনুমান ১৪ বৎসর বয়সে বাঁকুড়ায় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। পিতা এই বালকের চিকিৎসা ইত্যাদিতে বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন। সাত মাস কাল লঙ্কাদ্বীপে কলম্ব নগরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায়ের জ্যেষ্ঠা কুমারী কন্যা সর্ব্বত্র সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দিবারাত্রি প্রাণপণে রুগ্ন ভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া হইতে বালকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্র নাথ মৃত্যুসংবাদ আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন। যোগীন্দ্রের প্রকৃতি অতিশয় মধুর ও জীবন প্রীতিপ্রধান ছিল। আমরা তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। শোকার্ত্তা ভগিনী পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বিগত ১৭ই শ্রাবণ প্রচারাশ্রমে পারিবারিক উপাসনার সময় তজ্জন্য বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছিল। মঙ্গলময় পরলোকগত সুকুমার আত্মাকে শান্তি দান ও তাঁহার শোকার্ত্ত পিতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে সান্ত্বনা দান করুন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা ভাদ্র মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪০ ভাগ।
১৬ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩১

প্রার্থনা।

হে দুঃখার্ত্ত জনের দুঃখহরণ, দুঃখী জন যদি সর্ব্ববিধ উপায়ে নিরাশ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে কি তুমি তাহার প্রতি উপেক্ষা কর? তোমার সংসারে দুঃখ আসে কি এই জন্য যে, দুঃখের তাড়নায় অন্ধকার দেখিয়া জীব তোমার শরণাপন্ন হইবে? তোমার এ কি প্রকার ব্যবহার যে, জীবকে তুমি নিরবচ্ছিন্ন সুখের মধ্যে না রাখিয়া দুঃখ দ্বারা তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছ! তুমি ইচ্ছা করিলে কি আর তাহাকে চিরসুখের অধিকারী করিতে পারিতে না? তবে কি তোমার সামর্থ্যের অভাব আছে? তোমার আপনার প্রকৃতির উপরে কি তোমার ক্ষমতা নাই? প্রকৃতি কি এতই প্রবল যে, তাঁর হাতে পড়িয়া তোমার সন্তানদিগকে নিয়ত বিপদাপন্ন হইতে হইবে? তুমি ও তোমার প্রকৃতি কি ভিন্ন? না, তা তো কখন হইতে পারে না। প্রকৃতিতে যাহা হয়, তাহা তোমারই করা। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ, তোমার সঙ্গে বিরোধ। কিন্তু, প্রভো, আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি, প্রকৃতি তো তাহা নহেন। প্রকৃতির প্রকাশ বিবিধ; জড়েতে এক প্রকার, উদ্ভিদে আর এক প্রকার, প্রাণীতে অন্য প্রকার, মানুষেতে আবার এ সকল হইতে ভিন্ন প্রকার। আমাদের ভিতরে এ কয়েক প্রকারেরই প্রকাশ আছে সত্য, কিন্তু জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী এ তিনেতে যে তিন প্রকারের প্রকাশ আছে, তাতেই যদি আমরা আবদ্ধ থাকি, তাহা হইলে তো আমরা মানুষ হইলাম না। মানুষ যদি না হইলাম তাহা হইলে মনুষ্যপ্রকৃতির পর যে আমাদের ভিতরে দেবপ্রকৃতি আছে, সে প্রকৃতিতো চিরনিদ্রিত রহিল। বুঝিতেছি আমাদের ভ্রান্তিই আমাদের দুঃখের কারণ; ভ্রান্তিই আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ভ্রান্তিতে পড়িয়া আমরা যা নই তাই আমরা, এইরূপ ভাবিতেছি, আর প্রকৃতির বিরোধে কার্য্য করিতে গিয়া দুঃখে পড়িতেছি। আমরা যদি ইচ্ছা করিয়া প্রাচীরকে অবহেলা করিয়া তাহাতে মাথা ঠুকি, প্রাচীরের কিছুই হইবে না, আমাদেরই মাথা ভাঙ্গিবে। যদি একবার একটু ব্যথা পাইয়া আর প্রাচীরে মাথা না ঠুকি, তাহা হইলে মাথা ভাঙ্গা বারণ হইতে পারে। কিন্তু দেখ, নাথ, আমরা এমনই নির্ব্বোধ যে আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিতেছি, আর দুঃখ পাইতেছি, তথাপি আমাদের এ বোধ জন্মিতেছে না যে, আমাদের কাজ

ঠিক হইতেছে না। তুমি আমাদিগকে কেবল জড়, কেবল উদ্ভিদ্ বা কেবল প্রাণী কর নাই যে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাইতে পারিব না। যে দিন মানুষ করিয়াছ, সেই দিন ইচ্ছা করিলে তোমার ও তোমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে কতক দূর চলিতে পারিব, এ অধিকার দিয়াছ। এ অধিকারের সমুচিত ব্যবহার না করিয়া দেখ আমরা কত ক্লেশ পাইতেছি। হে দেবাদিদেব, তোমার প্রদত্ত অধিকার পাইয়া তোমার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমরা তোমার প্রদত্ত অধিকারের যাহাতে সদ্ব্যবহার করিতে পারি, তদুপযুক্ত বল ও বুদ্ধি আমাদিগকে অর্পণ কর, আমরা নিজ নিজ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ যেন আত্মদুঃখের কারণ আপনারা না হই। তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে প্রণাম করি।

ত্রিংশ ভাদ্রোৎসব।

ভাদ্রোৎসব সাধকগণের অতি আদরণীয়। সংবৎসর কাল যে বিষয়ে সাধন হইয়াছে, তাহার পরিণত-ফল-সম্ভোগ ও নূতন সাধনে প্রবেশ, এ উভয়ই এই উৎসবে হইয়া থাকে। যত দিন আমাদের সাধকজীবন আছে, তত দিন এ উৎসব হইতে আমরা কিছুতেই বিরত হইতে পারি না। সুতরাং পূর্ব্ব বৎসর যে স্থানে যে ভাবে আমরা উৎসব করিয়াছি, এবারও সেই স্থানে সেই ভাবে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১১ ভাদ্র রবিবার প্রাতে সঙ্গীতানন্তর উৎসবের উপাসনার আরম্ভ হয়, উপাসনার প্রথমাঙ্গ উপাধ্যায় সমাধা করিলে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপদেশ দান করেন। তিনি যে উপদেশ দেন তাহা নিম্নে নিবদ্ধ হইল।

চিন্তাপক্ষ বিস্তার করিয়া বিশ্বাসনেত্রকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া সকল প্রকার মানসিক শক্তিকে সঞ্চালন কর এবং এই প্রশ্নের উত্তর কর। এমন সময় কি ছিল যখন স্রষ্টা পরমেশ্বর সৃষ্টি করিতেছিলেন না? এমন সময় কি ছিল যখন তিনি আপনাতে আপনি আবদ্ধ থাকিয়া নিজের অনন্ত প্রকৃতির ভিতরে নিজকে নিহিত করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া ছিলেন। মানিলাম পৃথিবীর সৃজন আছে; এই গোলাকার প্রকাণ্ড বস্তু এক সময় জীবের বাসের অনুপযোগী ছিল। কিন্তু পৃথিবী মানে কি এই ছোট একটা জিনিষ যার মধ্যে আমরা বাস করিয়া আছি, না একটা প্রকাণ্ড বস্তু যাহা অনন্ত আকাশে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে? তার ভিতরে কত দিব্যধামবাসিগণ বাস করেন কে জানে? সেই উচ্চ হইতে সমুচ্চ লোকে কত যোগিগণ মহাযোগে মগ্ন হইয়া আছেন, আমরা ত্রিতাপে অভিহত হইয়া তাহার কি বুঝিতে পারিব? মানুষের দেহ মন পরমেশ্বরের সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা; কত কাল অবধি সেই অনন্ত কত দিন বসিয়া এই মহাসৃষ্টির বস্তুকে রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা মনে করা যায় না। এমন সময় কি ছিল যখন তাঁহার জ্ঞান অপ্রকাশিত ছিল, তাঁহার ধর্ম্ম পবিত্রতা বাহিরে প্রকাশিত হয় নাই? অন্তরের সকল প্রকার সদ্ভাবের প্রকাশ বাহিরে। যে জ্ঞান ভিতরে আবদ্ধ, যাহা বাহিরের বিধিতে, কৌশলে আত্মপ্রকাশ না করে সে জ্ঞানের আর আদর কি? যে প্রেম এই স্বার্থের মধ্যে অন্তরের গভীর দেশেই কেবল বাস করে কিন্তু আত্মপ্রকাশ করে না, বা ব্যবহারে তাহার পরিচয় দেয় না, তাহা আছে কি না আছে তাহার স্থিরতা কি? অতএব পৃথিবীকে সৃষ্ট বস্তু মনে কর; কিন্তু ইহার বিনাশ কখনও মনে হয় না। অনুভব করা যায় না যে পরমেশ্বর আপনার শক্তি, প্রেম, পুণ্য বাহিরে নানা আকারে সৃষ্টিতে প্রকাশ করেন নাই। চিরদিনই সেই ধ্রুবসত্য আপনার ভাবকে বাহিরে দেখাইতেছেন, আপনার গুণকে আকার দিতেছেন, আপনার মহাশক্তিকে বাহিরে মহাকার্য্যে পরিণত করিতেছেন। পৃথিবীতে যা দেখ সবই ব্রহ্মবিদ্যা। ফুল, ফল, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, ঋষিগণের বৈদিকধর্ম্ম, আধুনিক নবধর্ম্ম, তুমি, আমি, তোমার আমার জীবন, আমাদের উত্থান, পতন ও পুনরুত্থান, সবই ব্রহ্ম-কৌশল। যদি জীবনতত্ত্ব আলোচনা করি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সমুদয় পৃথিবীর ভিতরে এইরূপে মহাস্রষ্টা আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া আপনাকে আপনি প্রকটন করিতেছেন। তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত করিতেছেন, উচ্চ প্রার্থনাকে উত্তেজিত করিতেছেন, প্রত্যেক সংসারীর জীবনকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। মানুষের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক এই যে, ব্রহ্ম যেমন নিজে স্রষ্টা মানুষও তেমনি স্রষ্টা। যার আত্মা নিজে কিছু করে না, সে ব্যক্তি জীবিত কি মৃত কে বলিবে? অতএব শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্য্যন্ত স্রষ্টার অনুকরণে সৃষ্ট। যার জীবনের যেমন অবস্থা তার সৃষ্টিও তেমনি। যাঁহারা মহাত্মা তাঁহাদের জীবনের বিষয়, তাঁহাদের কার্য্যের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় কিছুই করেন নাই। ঈশার সৃষ্টিই বা কি, কাজই বা কি? একাকী আসিয়া

একাকীই চলিয়া গেলেন; অথচ সেই সামান্য সময়ের মধ্যে যে বীজ নিহিত করিয়া গেলেন, তাহাতেই স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি হইল; দেখ কত বড় ধর্ম্মরাজ্যের অবতারণা হইল। অতএব মানুষ স্রষ্টা নয়ত কে? ব্রহ্মের পরে মানুষ যেমন সৃষ্টি করে এমন আর কে? দেখ এক ধর্ম্ম হইতে কত মন্দিরের সৃজন, কত নরনারীর হৃদয়ের সৃজন, কত সঙ্গীত, কত চিত্রবিদ্যা, কত মনোবিজ্ঞান সৃষ্ট হইল। এক বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে—যাহা কেবল বঙ্গদেশেই আবদ্ধ—কত পুস্তক, কত কবিতা, কত সঙ্গীত সৃজিত হইল। ইহার মূলে কি? চৈতন্যের ভক্তি। তাই বলিতেছি যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সকলেই স্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহাদের স্বভাবে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের মধ্য দিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। কিন্তু এই সৃষ্টির কি শেষ হইয়াছে? এই পৃথিবীর গতি কি বন্ধ হইয়াছে? আকাশে কি আর আবিষ্কার করিবার নূতন তারকা নাই? তোমার আমার স্বভাবে যে ভাব প্রস্ফুটিত হইবার তাহা কি হইয়াছে? প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হইয়াছে? যাহা হইবার ছিল আমরা কি তাহা হইয়াছি? কে বলিবে হইয়াছি? তাই বলি তোমার ভিতরে সর্ব্বদা মহাসৃজন ক্রিয়া চলিতেছে। বৃক্ষ হইতে ফল হয় আবার সেই ফল হইতেই বৃক্ষ হয়; বাষ্প হইতে বারি, সেই বারি নদী হইতে সমুদ্রে যায়, আবার সমুদ্রের বারি হইতে বাষ্প হয়। এইরূপে সৃষ্টির মধ্যে এক প্রকাণ্ড চক্র ঘুরিতেছে; এই চক্র অনন্ত আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে ও প্রত্যেক পরমাণুকে অধিকার করিয়া আছে। সেই যোগী, তাঁহাতেই ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ, যে ব্যক্তি স্রষ্টার অনুকরণে সৃষ্টি করিতেছে। আমাদের ধর্ম্মে সৃজনের কাজ সমুদয় শেষ হইল, না চলিতেছে? আমাদের ভক্তগণ কি নিষ্ক্রিয় হইয়া গেল? আমাদের মধ্যে তাঁহার প্রেমের প্রবাহ কি শুষ্ক হইয়াছে? আমাদের ভাবের নৈপুণ্য কি সমাপ্ত হইয়াছে? কে বলিবে হইয়াছে? তাঁহারা যেখানেই থাকুন তাঁদের আত্মচক্র মহাবেগে এমনি ঘুরিতেছে যে কিছু না কিছু নূতন সৃজন হইতেছে। যদি তোমরা সৃজন না কর, চলিয়া যাও; এখানে তোমাদের স্থান নাই। পক্ষী পক্ষীকে প্রসব করে; বৃক্ষ বৃক্ষকে উৎপাদন করে। পৃথিবীতে এমন জীব নাই যাহার ভিতরে স্রষ্টার শক্তি নাই। যদি তুমি কেবল সেই একজন হও, যার সকল কাজ ফুরাইয়াছে, যার সকল ভাবের প্রকাশ শেষ হইয়াছে, তবে তোমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই, তোমার যাইবার সময় আসিয়াছে। অতএব বড়ই হও আর ছোটই হও আত্মপ্রকাশ কর। অন্তর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখাও কে বাস করে তোমার ভিতরে? নিরাকারকে সাকার কর, ধর্ম্মকে মণ্ডলীর ভিতরে আনয়ন কর, জীবনকে গতিশক্তি প্রদান কর। শাস্ত্রে বলে ভগবান্ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা; তিনি স্রষ্টা, প্রতিপালক, ও সংহারকর্ত্তা। যাহা সৃষ্ট হয় তাহা যদি পালিত না হয় তবে তাহা অচিরস্থায়ী। অতএব যাহা সৃষ্ট হইবে তাহার পালন হওয়া উচিত। পরমেশ্বর যাহা রচনা করেন তাহা কি রক্ষা হয় না? তোমাদের রচনাও যেন রক্ষা হয়। মনের ভাব যখন যে আকার ধারণ করে, জ্ঞান বিশ্বাস সেই ভাবকে যেন রাখিতে পারে। এক সময় অতি অল্প লোক হইতে কত জ্ঞানের আবির্ভাব, কত হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনার সৃজন হইল, আজ তাঁহারা কোথায়? কেহ এখানে কেহ ওখানে, কেহ বা পরলোকে। প্রলয়ের ব্যবস্থা মানুষের শিক্ষা হওয়া উচিত। প্রলয়ের মধ্যেই ভগবান্ সৃষ্টির মূল বজায় রাখিতেছেন। আজ যাহা আছে, কাল রাখিতেছেন, পরশু আবার তাহাকে ভাঙ্গিতেছেন। আজ যাহা পূর্ণ, কাল তাহা শূন্য। প্রলয়ের সর্ব্বসংহারকারী হস্ত এমনি আঘাত করিল যে সব চূর্ণ হইয়া গেল। সে দিনে অমুক সাধু ধন মান ঐশ্বর্য্য সব ত্যাগ করিয়া আর্য্যধর্ম্মকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মিলনের জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কত উৎসাহ দেখাইলেন, আজ তিনি কোথায়? তাঁহার বিধবা মাতা শিরে করাঘাত করিতেছেন; বৃদ্ধ পিতামহ নিজ আদর্শকে চূর্ণ দেখিয়া নিস্তব্ধ। প্রলয়ের গদা সৃষ্টিকে এমনি আঘাত করিতেছে যে সৃষ্টি বড়, কি পালন বড়, কি সংহার বড়, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। অতএব এই প্রলয়ের বাহু যদি আমাদিগকে তাড়না করিয়া থাকে, সংহারের বিধি যদি আমাদিগকে শাসন করিয়া থাকে, তবে কি আমরা নীরব থাকিব? যে মৃত শরীর প্রোথিত হয়, তাহা হইতেই আবার তৃণ পল্লব, এমন কি সুন্দর পদ্ম পর্য্যন্ত প্রস্ফুটিত হয়। যে সংহারে পৃথিবী কম্পিত হয় তাহাতেই আবার পালিত হয়; যে মৃত্যুতে মানুষ ভীত তাহাতেই আরোহণ করিয়া কত পাপী দিব্যধামে চলিয়া যায়। সৃষ্টি পালিত হয়, চূর্ণ হয়, কিন্তু মূল যে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মসৌন্দর্য্য, ব্রহ্মপুণ্য, তাহা কে উৎপাটন করে? যখন যুবা ছিলাম তখন তেজ এক রকম ছিল; এখন বৃদ্ধ হইয়াছি এখন সে তেজ কমিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানধর্ম্ম কি হ্রাস হইয়াছে, না অটল অচল পর্ব্বতের ন্যায় আরও অটল হইয়াছে? স্বাস্থ্য গেল ত কি হইল? কাল স্বাস্থ্য কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম, আত্মার আনন্দ, ভক্তির উচ্ছ্বাস কে কাড়িয়া লইতে পারে? দরিদ্রে পারে? ধনীতে পারে? মানুষে পারে? না দানবে পারে? কে পারে? ভাইগণ, প্রিয়গণ, অনেক লোক থাকিবে বলিয়া আসিয়াছিল, অনেকে আবার চলিয়া গেল। কেহ ওখানে গেল, কেহ ভবপারে চলিয়া গেল। আজ আমরা ৩, কি ৪, কি ৫, নয় ১০ জন মাত্র। সেলিমানের মন্দির চূর্ণ হইল, ৫ জন মাত্র জিহোবার কাছে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিয়াছিল। আমাদিগের দশাও সেইরূপ। আমরাও হত আহতদিগের মধ্যে ৫ জন ১০ জন ব্রহ্মমন্দিরের দুরবস্থা দেখিয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া জিহোবাকে ডাকিতেছি। কিন্তু ভাবে ভাবে মিলিয়া, বিশ্বাসে বিশ্বাসে যোগ দিয়া, সকলের হাতে ধরিয়া সেই পরব্রহ্ম লীলাময়কে আজ ডাকিতেছি। তাঁর জ্ঞান আলোকরূপে আমাদের অন্ধ আত্মাকে পূর্ণ করিতেছে, তাঁর প্রেম আজ সন্তপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতেছে। আজ তিনি পিতা, মাতা, গুরু, বন্ধু। তিনি কি আমাদের সঙ্কল্প জানেন না, না

প্রার্থনার গতিকে রোধ করেন? কিছুই না কিছুই না। এই প্রেম আর সেই প্রেম এক, এই প্রার্থনা আর সেই প্রার্থনা একই যাহা আজ পড়িলাম: ব্রহ্ম মনের সঙ্গে একযোগ হইয়া, মহাযোগে মহা আকার ধরিয়া, মহাভাবে মগ্ন হইয়া মহা উপাসনায় উত্তেজনা করিয়া প্রকাণ্ড আশীর্ব্বাদ প্রকাণ্ড প্রার্থনা পূর্ণ করিতেছেন। তিনি প্রতিদিনই সৃজন করেন, আজ কি করিবেন? আজ কি অমরধামের দ্বার খুলিবেন? আমরা সংহারের শাসনে কম্পিত হইয়াছি, তাহার মধ্যে কি উচ্চতর সৃষ্টি সান্ত্বনার রথ আনিবেন না? আমরাও আজ সৃষ্ট হইব ও সৃষ্টি করিব; মনের ভাবকে আকার দিব; আত্মার আদর্শকে মণ্ডলীকে সুচিত্রিত করিব।

মহাব্রহ্ম, ব্রহ্মশক্তি সমুদয় হারাইয়াছি তুমি যেও না; সমুদয় শেষ হইয়াছে তোমার চরণাশ্রয় আজও আছে। ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মমন্দিরে হও; তোমার ভিতরে বেদীর উপরে মস্তক রাখিয়া উৎসাহ বিশ্বাস প্রকাশ করি। আজ তুমি আকার গ্রহণ কর; বিচ্ছেদ ঘুচাইয়া একাকার কর। সৃজনকর্ত্তা, তুমি কত নূতন নূতন সৃজন কর; তুমিই আদিসমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিনাশ করিয়া নূতন মণ্ডলী সৃজন করিলে, নববিধানের দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিলে। যদি তোমার দক্ষিণ হস্তে আর পরাক্রম থাকে আজ তাহা ব্যবহার কর; আজ যেন নূতন সৃষ্টি হয়। তোমার হস্তে যেমন জল বায়ু সৃষ্টি হয়, আমরাও তেমনি তোমার হাতে মিলিয়া একত্রিত হইয়া, নূতন জীবনের মহাজল পান করি, মহাবায়ু সেবন করি, স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত দেখি, সকল মুখ একত্রিত হইয়া এমনি করিয়া মহাশব্দ করি, যেশব্দ দিব্যধামবাসিগণ করেন। প্রভো, তোমার সঙ্গে আমাদের মিলন কর, পরলোকবাসী অমরাত্মাদিগের সঙ্গে মিলাইয়া দেও। তোমার ঐ পুণ্য হস্তস্থিত পুষ্প চন্দন দ্বারা আমাদিগকে সুশোভিত কর; নত মস্তকের উপর তোমার অভয়প্রদ চরণ স্থাপন কর; সকলের অশ্রুজলে তোমার চরণকমল ধৌত কর এবং সারা দিন এমনি আচ্ছন্ন কর যেন সকলে ব্রহ্মময় ব্রহ্মময়ী হইয়া তোমাকে সম্ভোগ করিতে পারি, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

মধ্যাহ্নে উপাসনা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সম্পন্ন করেন। অনন্তর তিনি তাপসমালা হইতে তাপস বিশেষের উক্তি ও এব্রাহিমের জীবন হইতে কোন কোন অংশ পাঠ করিলে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ভিক্ষুগণের প্রতি বুদ্ধের অন্তিম উপদেশ পাঠ করেন। তৎপর আলোচনা হইয়া সায়ংসঙ্কীর্ত্তনের পর সায়ঙ্কালীন উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার প্রথমাংশ সমাধা করিলে উপাধ্যায় উপদেশ দেন। উপদেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অদ্য প্রাতঃকালে যে তত্ত্বের কথা শুনিলাম এখন তাহার সমালোচনা করা যাউক। প্রাতঃকালের উপদেশের বিষয়—সৃষ্টি, স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা-ভগবান্। তিনি সৃষ্টি করিতেছেন ও পালন করিতেছেন। যাঁহা হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন তাঁহাতেই উহা অবস্থিত। কিন্তু কেবল সৃষ্টি ও পালন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত নন, তিনি আবার সংহারও করিতেছেন। সংহার না হইলে কিছুরই রূপান্তর হইত না। সমস্ত বস্তুর সংহার আছে, সুতরাং রূপান্তর আছে; কেবল একটি বস্তুর সংহার নাই, সে বস্তু জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য। ইহার বিনাশ নাই, রূপান্তর নাই। আদিতে ইহা ছিল, অন্তেও ইহা থাকিবে। যোগিগণ সমুদয় বিশ্ব তিরোহিত করিয়া কেবল এক অনন্ত ব্রহ্মের ধারণা করেন; তাঁহারা এক চৈতন্যসত্তাকে উপলব্ধি করেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমুদায় বিশ্বের বিলোপ সাধন, ইহাকেই যোগপ্রলয় বলে। যোগপ্রলয়ে সকলই উড়িল, রহিল কেবল এক চৈতন্যসত্তা। এ চৈতন্যসত্তা কিছুতেই উড়ান যায় না। যোগপ্রলয়ে সমুদায় জগৎ নিদ্রিত হইল, যোগী সেই নিদ্রিত জগৎকে ব্রহ্মেতেই বিলীন দেখিলেন। চক্ষু নিমীলনে প্রলয় উপস্থিত হইল, চক্ষু উন্মীলনে যে জগৎ ব্রহ্মের বক্ষে ছিল তাহা প্রকাশ পাইল। আবার যখন তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন তখন জগৎ উড়িল বটে, কিন্তু চৈতন্য কি বিনষ্ট হইল? যোগী সমুদায় উড়াইলেন, কিন্তু সেই সত্তাকে কি উড়াইতে পারিলেন? তিনি কিছুই দেখিতেছেন না, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে অপসৃত করিলেন, মনকে আত্মার গভীর স্থানে হারাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু তবু সেই অনন্ত চৈতন্য বিলুপ্ত হইল না। যখন তিনি নিরন্তর এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন তখন তিনি বলিলেন, সৃষ্টির আদিতে এই চৈতন্য বিরাজমান ছিল। আদিতে বিরাজমান সেই চৈতন্য যখন জগৎ প্রসব করিল, তখন ব্রহ্মজ্ঞান প্রেমাকারে প্রকাশিত হইল। তখন কোটী কোটী জীব প্রসূত হইল এবং তাহাদিগের চক্ষুরাদির চরিতার্থতার জন্য চন্দ্র, সূর্য্য, পাখীর শব্দ, কত সুন্দর দৃশ্য সকল সৃজিত হইল। যাঁর অনন্ত জ্ঞান, তিনিই অনন্ত প্রেমরূপে জীবের নিকট প্রকাশিত। এই অনন্ত প্রেম ঈশ্বর, সুতরাং এই প্রেমকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। প্রেম জয়লাভ করিবেই করিবে। সেই জগাই মাধাই কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছিল, কি ভয়ানক ব্যভিচারী পানাসক্ত ছিল, তাহাদের দেখিলেই নরনারীগণ ভীত হইত, দেখ তারাই এক বিন্দু প্রেম পাইয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। যখন প্রেমের প্রভাবে তাহাদের পরিত্রাণ হইল, তাহাদের সকল দৌরাত্ম্য চলিয়া গেল, তাহারা পথের ধূলি অপেক্ষাও বিনীত হইল, নরনারীর সেবা দ্বারা তাহারা পূর্ব্ব অপরাধের ক্ষমা পাইল। যে প্রাণে প্রেম অবতারণা করিয়াছে, তাহার মধুর বচনে জগৎ আকৃষ্ট। প্রেমিক চৈতন্যকে যিনি একবার দেখিয়াছিলেন তিনি কি আর ভুলিতে পারেন? ঈশার প্রেম দেখ, সমুদয় দেশ তাঁহার বিরোধী হইল কিন্তু শেষে তাঁর প্রেমেরই জয় হইল। সেই প্রেম বিনষ্ট হওয়া

দূরে থাকুক, নরনারীতে উদ্ভাসিত হইল। যিনি সমুদায় ইউরোপকে কম্পিত করিয়াছিলেন তিনিও ঈশার প্রেমের বল স্বীকার করিলেন। সেই ইউরোপবিজয়ী বীর যিনি সেণ্টহেলেনা দ্বীপে অজ্ঞাতকুলশীলের ন্যায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তিনিও শেষে বলিয়াছিলেন, তাঁহার বিজয়শ্রী ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সেই সূত্রধরের সন্তান ঈশার বিজয় নিত্যকাল স্থায়ী; আজও শত শত লোক তাঁহার জন্য অকাতরে প্রাণ দান করিতেছে। ফলতঃ যে প্রেম স্বর্গ হইতে আসে তার বিরুদ্ধে কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। মণিকা নিজ সন্তানের দুরাচারে ব্যথিতহৃদয় হইয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকটে রোদন করিলেন। তাঁহার সে রোদন কি বিফল হইল? তিনি অন্তিমকালে তাঁহার সন্তানের পরিবর্ত্তিত জীবন দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এইরূপ শত দৃষ্টান্ত আছে, যাহাতে আমরা দেখিতে পাই, গোপনে যিনি প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন তাঁহার প্রেমাশ্রু কখনও বিফল হয় নাই। ধন মান সব চলিয়া যাইবে, কিন্তু এক বিন্দু প্রেমাশ্রুকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। সকলের পরিবর্ত্তন আছে, রূপান্তরও আছে, কিন্তু যে প্রেম হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, কোন কালে সে প্রেমের প্রভাব কেহ পরিহার করিতে পারে না। জ্ঞান প্রেম পুণ্য চিরকালই থাকিবে কোন কালে উহাদের সংহার হইবে না, প্রাতঃকালে এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত সত্য। জ্ঞান প্রেমের আকারে প্রকাশ পায়, প্রেম পুণ্যমূলক। সুতারাং এক প্রেমের ভিতরে জ্ঞান ও পুণ্য উভয়ই আছে। যে প্রেম জ্ঞান ও পুণ্য উভয়কে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া বিরাজমান, সেই প্রেম যেন আমরা শিক্ষা করি, সেই প্রেমেই যেন আমরা দীক্ষিত হয়। প্রেম ভিন্ন অন্য ব্রতে যেন আমরা কখন ব্রতী না হই। প্রেম আমাদের জীবনের সার হউক। তুমি যদি এমন প্রার্থনা কখনও করিয়া থাক যার ভিত্তি প্রেমের উপর স্থাপন কর নাই, তোমার সে প্রার্থনায় কিছুই হইবে না। যেখানে নিঃস্বার্থ প্রেম আছে, যার পরের জন্য প্রাণ কাঁদে, সে যদি পরের হিতকামনায় প্রার্থনা করে, তার সে প্রেম সে প্রার্থনা কখনও বিফল হয় না। নববিধানের ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম। প্রেমে সব এক হইবে; শত্রু মিত্র হইবে; প্রেমের একাধিপত্য স্থাপিত হইবে; প্রেমের জয়ধ্বনিতে জগৎ পূর্ণ হইবে। অতএব সেই মহাপ্রলয়কারী ভগবান্ সমুদয় উড়াইতে পারেন, ধন মান ঐশ্বর্য্য সবই নষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু তোমার আমার ভিতরে যে স্বর্গীয় প্রেম আছে, তাঁহাতে এমন কোন শক্তি নাই যদ্দারা তিনি তাহা বিনাশ করিবেন। স্বয়ং ঈশ্বরই যখন প্রেম, তখন তিনি প্রেম হইয়া প্রেমকে বিনাশ করিবেন কি প্রকারে? অতএব অদ্যকার উৎসবের দীন এই প্রার্থনা করি, যে সকল বন্ধু পাইয়াছিলাম এবং যাঁহাদিগকে হারাইয়াছি, তাঁহাদের যেন আবার এই প্রেমের একত্বের ভূমিতে পাই, তাঁহাদের সব দোষ ভুলিয়া যাই, তাঁহাদের হিতকামনায় ব্রতী হই; বিরুদ্ধাচারণকারীদিগকে যেন ক্ষমা করিতে পারি। যাঁহারা আমাদিগের বিরোধী তাঁহাদের প্রাণের ভিতরে প্রেমের উদয় হউক, শত্রু মিত্র সব এক হইয়া যাউক। সেই অবিনাশী প্রেমের ব্রতে ব্রতী হইতে পারি ঈশ্বর আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। হৃদয়ের কঠোর ভাব চলিয়া যাউক; প্রেমে সকলকে একাকার দেখিয়া কৃতার্থ হই।

হে প্রেমময়, তুমিত আমাদের শত অপরাধ ক্ষমা করিতেছ; তা যদি না করিতে তবে কি আমরা বন্ধুগণে মিলিয়া আজ তোমার কাছে আসিতে পারিতাম? কে বলিতে পারে তোমার প্রেমবিন্দু না পাইলে আজ আমরা কোথায় থাকিতাম। দেবাদিদেব, যদি ক্ষমা করিলে তবে তোমার প্রেম অবতরণ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র প্রেমকে বৃহৎ করুক, আমাদের ক্ষুদ্র প্রেম গৌরবান্বিত হউক। তোমার প্রেম আমাদের হৃদয়ে অবতরণ না করিলে, তুমি যে নবধর্ম্ম দিয়াছ, যে নবধর্ম্মের আদর্শ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছ, বল তাহা জীবনে পরিণত করিব কি প্রকারে? তাই তব চরণে ভিক্ষা করিতেছি, প্রেমদানে আমাদের জীবন সফল কর। তোমার কৃপায় আমরা এই অপূর্ব্ব প্রেম লাভ করিব এই আশা করিয়া সকলে মিলিয়া তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

চিত্তশুদ্ধি।

আমাদের দৃষ্টি যে প্রকার আমরাও সেই প্রকার, একথা বলা কিছু অত্যুক্তি নহে। এদেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে, সেই গল্পটি এই সত্যের উপরে স্থাপিত। এক জন ক্ষৌরকারের কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল। সে যখনই ক্ষৌরকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত, তখনই যাঁহাকে ক্ষৌরী করিতেছে, তাঁহাকে বলিত, দেশে এমন লোক নাই, যাহার হাতে দু চারি টাকা নাই। এক দিন সেই ক্ষৌরকারের অর্থগুলি চোরে হরণ করিল, সে রিক্তহস্ত হইয়া পড়িল, এখন তাহার পূর্ব্বের কথা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যাঁহাকেই সে ক্ষৌরী করে, তাঁহাকেই সে তখন বলে, আজ কাল, মহাশয়, বড় দুর্দ্দিন হইয়াছে, দেশের এক জনের হাতেও একটী পয়সা নাই। বস্তুতঃ আমাদের মনের যে প্রকার অবস্থা, আমরা অপরকে সেই ভাবে দেখিয়া থাকি। অতি পণ্ডিত যিনি, অতি ধার্ম্মিক যিনি তিনিও এই দৌর্ব্বল্য সর্ব্বদা পরিহার করিতে পারেন না। কি হইলে এই দৌর্ব্বল্য পরিহৃত হইবে, অথচ সত্যের ভূমি অতিক্রম করা হইবে না, আমাদের তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

এই দৌর্ব্বল্যের হাত হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য আমাদের দৃষ্টিশুদ্ধির প্রয়োজন। দৃষ্টিশুদ্ধি হইবে কিরূপে? দৃষ্টি যদি পাপ দর্শন করে, সে দর্শনে উহা কলুষিত হইবেই হইবে। পাপদর্শনে পাপচিন্তা উপস্থিত হয়, নিন্দা ও দোষখ্যাপনে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার ও পাপ নাই, এই প্রকার অভিমান উপস্থিত হয়, সুতরাং অন্ধতা উপস্থিত হইবার যতগুলি কারণ, সকল গুলিই পাপদর্শনে একত্র মিলিত হইয়া থাকে। কোন এক ব্যক্তিতে পাপ আছে, অথচ নিজের বা পাপদর্শনে অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহা দর্শন না করা, ইহা সম্ভব নহে, সত্যসঙ্গতও নহে। এস্থলে পাপও দর্শন করিব, অথচ উহা চিন্তার বিষয় হইবে না, নিন্দা ও দোষখ্যাপনে প্রবৃত্ত করিবে না, আমার ও পাপ নাই, ঈদৃশ অভিমানও জন্মিবে না, এরূপ উপায় অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে একবার তাহাই দেখা যাউক।

যে পাপ আমি অপরেতে দেখিতেছি, সে পাপের সম্ভাবনা আমাতে আছে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব সে পাপ হইতে আমি নির্ম্মুক্ত, আমার সে পাপ হইতে কোন ভয় নাই, এরূপ মনে করা অসত্য, ভ্রান্তিসম্ভূত। সুতরাং অপরেতে পাপদর্শন করিয়া সে পাপ হইতে আপনাকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য যত্ন সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। যাহাতে পাপ দর্শন করিলাম, তাহাতে কেবল পাপই আছে তাহা নহে, তাহাতে পুণ্যও আছে, দেবগুণও আছে। যদি আমি তাহা দেখিতে না পাই, তবে আমার দৃষ্টিদোষ আছে, অতএব আমার এই দৃষ্টিদোষ শোধন করা সমুচিত। যত দিন দৃষ্টি স্বচ্ছ না হইতেছে তত দিন অন্ততঃ তাঁহাতে ভগবদাবির্ভাবদর্শনে যত্ন করিতে হইবে। সে ব্যক্তিতে ভগবানুকে দর্শন করিলে আর তৎপ্রতি মন্দভাব পোষণের সম্ভাবনা থাকিবে না। যদি একবার তাহাতে ভগবদ্দর্শনে সমর্থ হই, সেই দর্শনে আমার দৃষ্টিদোষ ক্ষয় পাইবে, এবং সে ব্যক্তিতে কোথায় কি ভাবে দেবগুণ লুক্কায়িত আছে দেখিতে পাইয়া তৎপ্রতি যথোচিত সম্মাননা দিতে পারিব, তাহার নিন্দা ও দোষঘোষণায় আর আমার প্রবৃত্তি থাকিবে না।

দৃষ্টিশুদ্ধির জন্য তাহা হইলে প্রথমতঃ আমাদের পাপবোধ উজ্জ্বল রাখা প্রয়োজন। নিজের পাপের প্রতি যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, সেই অন্যের পাপ দর্শন করিয়া অভিমানে স্ফীত ও নিন্দাঘোষণায় প্রবৃত্ত হয়। পাপবোধ যেমন উজ্জ্বল রাখিতে হইবে, তেমনি পরনিন্দা পরপরিবাদ সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য। এইটি দ্বিতীয় উপায়। পরনিন্দাতে যেরূপ আত্মার চক্ষু কলুষিত হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। যে ব্যক্তি পরনিন্দায় প্রবৃত্ত, জানিবে সে ব্যক্তির নিজের ভিতরে নিন্দিত বিষয় আছে, তাই পরনিন্দা দ্বারা নিজের মনকে লঘুভার করিবার জন্য তাহার এত প্রয়াস। তৃতীয়তঃ যেখানে কোন ব্যক্তিতে স্পষ্ট দেবগুণ দেখিতে পাইতেছি না, সেখানে অগ্রে দেবাবির্ভাব দর্শনের জন্য যত্ন প্রয়োজন। সর্ব্বত্র দেবাবির্ভাবদর্শন সেই সেইবস্তু ও ব্যক্তির গুণনিরপেক্ষ। সুতরাং যে কোন ব্যক্তিতে দেবাবির্ভাবদর্শন সাধকের পক্ষে সহজ। কোন ব্যক্তিতে দেবাবির্ভাবদর্শনে সিদ্ধমনোরথ হইলে সে ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিবৃত্ত হইবে, বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিবৃত্ত হইলে দৃষ্টিশুদ্ধ হইবে, সহজে সে ব্যক্তির দেবগুণ দৃষ্টিপথে নিপতিত হইবে। এই শেষোক্ত উপায়ই দৃষ্টি শুদ্ধির অব্যর্থ উপায়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। যোগিগণ যাহা বলেন, তাহা সিদ্ধ হয়, ইহার অর্থ কি? যোগিগণ মানুষ ভিন্ন তো নহেন। অন্য দশ জন মানুষ হইতে এমন কি বিশেষত্ব আছে, যাহার জন্য তাঁহাদের ঈদৃশ অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে।

বিবেক। তুমি যাহাকে অলৌকিক ক্ষমতা বলিতেছ, তাহা অলৌকিক ক্ষমতা নহে উহা অতি স্বাভাবিক। কোন্ দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, সূর্য্যগ্রহণ হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া দেওয়া কি অলৌকিক ক্ষমতা, না স্বাভাবিক ক্ষমতা?

বুদ্ধি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি, তুমি উত্তর দিলে কি? আকাশের গ্রহনক্ষত্রগণের গতি গণিতানুযায়ী, তাহারা একই নিয়মে চলে। তাহাদের চলার নিয়ম যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহারা গণনা করিয়া গ্রহণসম্বন্ধে যাহা বলিবেন, তাহা ঠিক হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

বিবেক। তুমি আজ বলিতেছ আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যদি নিয়ম আবিষ্কৃত না হইত তাহা হইলে এরূপ গণনা করিয়া বলা অসম্ভব হইত, এবং চিরদিন উহা অদ্ভুত ও অলৌকিকতার রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকিত। যোগী ও বিজ্ঞানী একই প্রণালীতে কার্য্য করেন, সুতরাং তাঁহারা যাহা বলেন ঠিক তাহাই ঘটে।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে ইহার অর্থ আমার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইল না। বিজ্ঞানী স্থিরতর নিয়ম অনুসরণ করিয়া যাহা বলেন তাহা তো ঠিকই হইবে, কেন না প্রকৃতিতে কখন নিয়ম বহির্ভূত ব্যাপার ঘটে না। মানুষের কার্য্য, ভাব, চিন্তা কোন নিয়মের অনুবর্ত্তন করে না, কখন উহার কোন্ প্রকারের পরিবর্ত্তন হইবে তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং মানুষসম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহা ঠিক হইবে ইহা কি কখন সম্ভব?

বিবেক। মানুষের চিন্তাদির গতির ব্যতিক্রম ঘটে, ইহা আর কে না জানে? কিন্তু তুমি কি জান না গ্রহাদির গতিরও ব্যতিক্রম আছে? গণনাকালে এই সকল ব্যতিক্রম গণনায় আনিয়া তবে কোন একটি বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হয়। মানবের চিন্তাদির গতির ব্যতিক্রম আছে, ইহা জানিয়াই যোগিগণ মানুষের বর্ত্তমান মনের অবস্থা হইতে দূরতর ভবিষ্যৎসম্বন্ধে ব্যতিক্রম বাদ দিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করেন, তাহা ঠিক হয়। যোগিগণ এ সম্বন্ধে বড়ই সাবধান। তাঁহারা জানেন তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ নহেন। সকল বিষয়েই তাঁহারা সকল বলিতে পারেন, এরূপ অভিমান কখন তাঁহারা হৃদয়ে পোষণ করেন না। যখন কোন একটি বিষয় তাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন, এবং সেই দূরতম বিষয়ের চরম ফল তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, তখনই তাঁহারা প্রয়োজন হইলে সে বিষয় সম্বন্ধে কি হইবে, বলিয়া থাকেন। লোকে যখন দেখে তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল, তখন তাহারা তাঁহাদিগেতে অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করে, এবং তাঁহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করে। ইহা তাহাদিগের নিতান্ত ভুল। বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানিগণ যেমন ভবিষ্যৎ বলেন, যোগিগণ আমার সাহায্যে ভবিষ্যতে কি হইবে বলিতে পারেন, জানিও ইহাতে কিছু অলৌকিকতা নাই।

তহফতোল্ মওহদ্দিনের বঙ্গানুবাদ।

(মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কৃত মূল পারস্য পুস্তকের অনুবাদ।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

সত্যানুসন্ধায়ীদিগের নিকটে পূর্ণরূপে প্রমাণিত। এতৎসত্ত্বে এই সমুদায় সত্য হইলে অর্থাৎ বক্তার অম্লতা যদি বাক্যের অমূলকত্বের কারণ হয় তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলে বিষম ক্ষতি সমুপস্থিত হইয়া থাকে। যেহেতু সেই ধর্ম্মের সংস্থাপক ও তাঁহার কতিপয় ও অল্পসংখ্যক সমবিশ্বাসী অনুগত লোক স্বার্থ-সীমাবদ্ধ (যাহাদের কথার উপর বহু সহস্র বৃহৎ পুস্তক ও বিস্তৃত নিদর্শন সকলের ভিত্তি এক খণ্ড তৃণের উপর কোন পর্ব্বতের ভিত্তির ন্যায় প্রাপ্ত হওয়া) ব্যতীত পূর্ব্বে ছিল না। এক্ষণ যে ধর্ম্মসকলের আদি মূল, সত্য সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিই উন্মুখ, যাহা এক অন্যেতে মূলসংস্থাপকতা শক্তি ও সদসৎ বিবেক বুদ্ধি হয়। সেই স্রষ্টা পরমেশ্বরকৃত স্বাভাবিক প্রত্যাদেশের উপর যাহারা মানবাবিষ্কৃত প্রত্যাদেশকে প্রাধান্য দান করিয়া আকার ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মসকলের অনুসন্ধান ব্যতীত যে বিশুদ্ধ উপাসনা জগতের স্রষ্টাকর্ত্তৃক গৃহীত হয় তৎপরিবর্ত্তে লোকের মনসৃষ্টি স্থলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি ও বিশেষ শারীরিক ক্রিয়া সকলকে উপাস্যের ক্ষমা ও করুণার কারণ মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ঐশ্বরিক প্রকৃতির উপর অধিকার স্থাপনের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে; এবং প্রকাশ এই যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া ও আন্তরিক বিশেষ ভাবোদয় অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বরের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে সুক্ষম, এরূপ তাহারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। বরঞ্চ আমাদের গতিবিধি শাস্তি, দয়া ও ক্ষমার বিরতির কারণ হইতে পারে। এই নূতন রহস্য অভিব্যক্তির জন্য সামান্য অভিনিবেশ স্পষ্ট ফল বিধান করিয়া থাকে।

"অর্দ্ধখণ্ড তৃণের সম্বন্ধে গুরু গুণপণার প্রয়োগ করিলেন, হৃদয়ে শান্তি প্রেরণকর, ধর্ম্ম ইহাই এবং যথেষ্ট *।"

বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন ছল ও প্রতারণা বুঝা যাইতেছে। যোগ ও স্বাতন্ত্র্য এবং ভাব ও অভাবানুসারে তাহা চতুর্ব্বিধ। (১) এরূপ এক দল প্রবঞ্চক আছে যে যত্নতঃ সাধারণ লোককে আকর্ষণ করিবার জন্য ধর্ম্মমত সকল নূতন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করিয়া লোকদিগকে বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত করিয়া থাকে। (২) এরূপ প্রতারিত দল আছে যে, প্রকৃত অবস্থায় অনুসন্ধান না করিয়া অন্যের অনুসরণ করে। (৩) এরূপ একদল প্রতারকও প্রতারিত বিদ্যমান যে, অন্যের প্রতি বিশ্বাস সত্বে লোকদিগকে নিজের প্রতি উন্মুখ করিতে উত্তেজিত করিয়া থাকে। (৪) সেই সকল লোক চতুর্থ দলের অন্তর্গত যাহারা ঈশ্বরপ্রসাদে প্রবঞ্চনা প্রকাশের ভূমি নয়, প্রবঞ্চনার স্থানও নয়।

যাহা ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু প্রপীড়নের অনুসরণ করিও না। যেহেতু আমাদিগের মতে ইহা অপেক্ষা অপরাধ নাই। (পদ্যের অনুবাদ)

আমি এই কয়েকটী কথাকে যাহা সংক্ষিপ্ত ও এই দীনের বিশ্বাসে পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বরসম্বন্ধীয় ফলপ্রদ উদ্দেশ্য হয়, এই আশায় যে প্রশান্তচিত্ত মহোদয়গণ সংশোধন ও বিচারের দৃষ্টিতে অনুধাবন

---

* এই অংশটি একটি পারস্য পদ্যের অনুবাদ। ইহা এই পুস্তকে উল্লিখিত।

করিবেন, পক্ষপাতিতা ও বিপক্ষের বিপক্ষতা পরিহার পূর্ব্বক যোজনা করিলাম। এই ব্যাপারের বিস্তৃতি "মনাজয়তোল্ আদিয়ান" পুস্তকে সমর্পিত হইল।

সমাপ্ত।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

দেব ও মানবযোগের একত্ব।

১৩ই পৌষ, রবিবার, ১৮১৮ শক।

কি জন্য আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি, এখানে আমাদিগকে কি করিতে হইবে, এ বিষয় আমাদিগের প্রতিজনের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। আমরা কি এখানে আহার বিহার আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য আসিয়াছি, এবং এই সকল সামান্য কার্য্যের জন্য জ্ঞান ও কৌশলের যতটুকু প্রয়োজন তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগের পৃথিবীতে জন্ম? যদি আমাদিগের এই মাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে শৃগাল কুক্কুর কীট হইতে আমাদিগের শ্রেষ্ঠতা কোথায়? বলে সামর্থ্যে বীর্য্যে আমরা সিংহ ব্যাঘ্রাদির নিকটে নিতান্ত হীন, কৌশলপ্রকাশে অনেক কীট আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শারীরিক সৌন্দর্য্য ও সুস্বরে আমরা পক্ষিজাতির নিকটে দাঁড়াইবার অযোগ্য। যদি সামাজিক বন্ধনের আমরা গৌরব করি, ক্ষুদ্র পিপীলিকা আমাদিগকে সে বিষয়ে ধিক্কার দান করে। পারিবারিক প্রীতিবন্ধনে আমরা অনেক ইতরজাতি জীবের নিকটে পরাস্ত। মানুষ তবে কোন্ বিষয়ে আর সমুদায় জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? যোগধর্ম্মে। মানুষ শরীর নহে, রক্তমাংস নহে। এ সমুদায়ে সে পশুর সঙ্গে সমান, পশু হইতে নিকৃষ্ট। তাহার আত্মা আছে, আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ আছে। এই যোগ যদি না থাকিত তাহা হইলে তাহার তুল্য হীন জীব আর একটিও আমরা দেখিতে পাইতাম না। এক নীতিতে ও ধর্ম্মেতে ইতর জীব হইতে মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠতা বিজ্ঞানবিদ্গণকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাঁহারা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানসিক নৈপুণ্য প্রভৃতিতে মানুষকে পশুর সমান করিয়া নীতি ও ধর্ম্মে পশু হইতে তাহার পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। নীতি ও ধর্ম্ম শরীরের নহে আত্মার; আত্মার মহত্ত্ব পরমাত্মযোগে। কেন না নীতি ও ধর্ম্মের বিকাশ এই যোগ ভিন্ন কখন নিষ্পন্ন হয় না। যোগের মাহাত্ম্যে তবে মানিতে হইবে, মনুষ্যের ইতর জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও গৌরব। পশুদের নিকটে আমাদের অনেক শিখিবার আছে, কিন্তু সে শেখাতে আমাদের মনুষ্যত্ব পূর্ণ হয় না। তাহাদের নিকটে শিখিতে গেলে ভালও শিখিতে হয় মন্দও শিখিতে হয়। কুকুরের নিকটে প্রভুভক্তি, প্রভুর জন্য প্রাণদান ইহা আমরা শিক্ষা করিতে পারি, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিংসা ক্রূরতা স্বজাতিবিদ্বেষাদিও শিখিবার বিষয় উপস্থিত হয়। মানুষ যদি আপনার আত্মার নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মার শিক্ষা গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহার সকল শিক্ষা কুশিক্ষায় পরিণত হয়।

আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ নিত্য। এ যোগ কোন কালে বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সমুদায় জগৎ ও জীব কি পরমাত্মযোগে যুক্ত নাই? তাঁহার যোগ সকলের সঙ্গেই আছে কিন্তু এ যোগ সেইখানেই যোগনামে অভিহিত হয় যেখানে জ্ঞানপূর্ব্বক যোগ অনুভূত হয়। যত দিন মানুষ পরমাত্মার সহিত আপনার যোগ অনুভব না করে, তত দিন পশুর সহিত তাহার কোন পার্থক্য থাকে না। পশুগণ জ্ঞানবুদ্ধির বিচিত্র নৈপুণ্য প্রকাশ করে কি উপায়ে? অজ্ঞাতসারে স্রষ্টার প্রেরণায়। মানুষ যদি আপনার স্বভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া জ্ঞান বুদ্ধির কার্য্য দেখায়, তাহাতেও সে পশুশ্রেণী হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিতে পারে না। যত দিন না সে আত্মার ভিতরে পরমাত্মাকে দেখিতে পায়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হয়, প্রেরণাবাণী শ্রবণে পরিণত হয়, তত দিন সে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে অসমর্থ থাকে। পরমাত্মাকে দর্শন, পরমাত্মার বাণীশ্রবণ, পরমাত্মার সহিত ঐক্য, ইহাই যোগ। প্রথম দুটিতে যোগের আরম্ভ, শেষটিতে যোগের পূর্ণতা। এই যোগ দুই প্রকার, ঋষিগণের ব্রহ্মযোগ; মহর্ষি ঈশার পুত্রত্বে যোগ। এ দুই যোগ কিছু এক নহে, অথচ এ দুই যোগেরই প্রয়োজন আছে। দুই যোগ যদি চিরদিনই দুই স্বতন্ত্র যোগ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে যোগের অপূর্ণতার জন্য অনিষ্ট কিছুতেই নিবারণ হইতে পারে না। এত কাল ব্রহ্মযোগ ও পুত্রত্বে যোগ স্বতন্ত্র আছে, এখন সময় আসিয়াছে, যে সময়ে এই দুই যোগ এক হইয়া পূর্ণযোগে পরিণত হইবে। দর্শন ও শ্রবণযোগ নববিধান একত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এ দুই যোগের উপরে নববিধান স্থাপিত। যোগ হইতে বিয়োগ হইলে নববিধান আর থাকিতে পারেন না। যোগসম্বন্ধে সংশয় বা যোগসম্বন্ধে অপরিষ্কৃত জ্ঞান নববিধানবাদীর নববিধানকে কেবল মলিন করে তাহা নহে নববিধানকে বিলুপ্ত করে। যোগধর্ম্ম যাহাতে দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হয়, নববিধানবাদীর তজ্জন্য সমগ্র যত্ন ও সাধন নিয়োগ করা আবশ্যক।

ঈশার যোগ পুত্রত্বে যোগ। ঈশা ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিলেন, এবং আপনাকে তাঁহার পুত্র বলিয়া প্রচার করিলেন। ঈশ্বরের সহিত তাঁহার একত্ব তিনি আপনিই ঘোষণা করিয়াছেন। ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া তিনি ঈশ্বর হইলেন, ইহার প্রতিবাদ আর কাহাকেও করিতে হইবে না, ঈশা আপনি তাহার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। "আমাকে যে দেখিয়াছে সে পিতাকে দেখিয়াছে" একথায় তিনি পিতৃদর্শন সকলের পক্ষে সম্ভব করিলেন তাহা নহে, পিতার অনুরূপ পুত্রকে দর্শন করিলে যে পুত্রেতে পিতৃদর্শন হয়, তাহাই তিনি এ কথায় প্রকাশ করিলেন। ঈশা স্বয়ং পবিত্রাত্মজাত, পবিত্রাত্মা তাঁহার কার্য্যের প্রেরক, পবিত্রাত্মা মানবে ঈশ্বরের আবির্ভাব। ঈশা যখন বলিলেন, "আমি গিয়া

পবিত্রাত্মাকে প্রেরণ করিব", তখন কি আর তিনি তাঁহার শিষ্য-গণেতে স্বয়ং ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটিবে ইহা অভিপ্রায় করেন নাই? একথা লইয়া বহু আন্দোলন হইয়াছে; অথণ্ড খ্রীষ্ট সমাজ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। "পিতা আমার নামে পবিত্রাত্মাকে প্রেরণ করিবেন "আমাকে ভাল বাসিলে পিতা এবং আমি তাহাতে বাস করিব" "আমাকে তাহার নিকটে আত্মপ্রকাশ করিব", এসকল কথায় পুত্রের সহিত যোগে অনুবর্ত্তিগণেতে পবিত্রাত্মার ক্রিয়া উপস্থিত, ইহা মানিতেই হইবে। পিতাকে ছাড়িয়া পুত্র কখন থাকিতে পারেন না, এজন্যই ঈশার অনুবর্ত্তিগণের সঙ্গে পুত্রের মধ্য দিয়া পিতার সহিত সম্বন্ধ। ফলতঃ ঈশা যে যোগের মূল কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাতে ঈশার সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত যোগ; ঈশ্বরে অবস্থিত ঈশার সহিত তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের যোগ। "আমি পিতাতে পিতা আমাতে" "তোমরা আমাতে আমি তোমাদিগেতে," একথায় ঈশার পিতার সহিত সাক্ষাৎ যোগ, তাঁহার শিষ্যগণের ঈশার সহিত সাক্ষাৎ যোগমাত্র প্রকাশ করিতেছে। ঈশা সমুদায় মানবজাতির প্রতিনিধি; অতি দীনদুঃখীকেও তিনি আপনার সহিত অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন দীন দরিদ্রের অবমাননা করিলে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়, একথা বলিয়া তিনি সমগ্র মানবজাতির সহিত আপনাকে এক করিয়াছেন। সমগ্র মানবমণ্ডলী এক জন মানুষ, ইহা কেবল তাঁহাতেই সম্ভব হইয়াছে। ঈশার যোগ এজন্য যোগের মানববিভাগ, ঈশ্বরের আবির্ভাবে পূর্ণ পুত্রেতে সমুদায় নরজাতির যোগ।

পুত্রেতে সমুদায় নরজাতির সহিত যোগ হইলে যোগ পূর্ণ হইল না। পুত্রকে যোগের ভূমি করিয়া মানবজাতি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, ঈশ্বরের সহিত তাহার আর কোন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ রহিল না। পুত্র আপনি পিতাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন, তাঁহারা সকলে পিতাকে পাইলেন না, পিতাকে পাইয়া আপনাদের পুত্রত্ব অনুভব করিলেন না, ইহা মানবজাতির পক্ষে পরম দুর্ভাগ্য। ঈশা যে যোগ দেখাইতে আসিলেন তাহা দেখাইলেন, কিন্তু তাঁহার আসিবার সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ঋষিগণ যে ব্রহ্মযোগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে ব্রহ্মযোগ বিনা ঈশাতে কি পুত্রত্ব সম্ভব হইত? ফলতঃ যে ব্রহ্মযোগে ঈশা আপনি ব্রহ্মযোগী হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মযোগ পুত্রত্বে যোগের সহিত সংযুক্ত না হইলে মানবজাতির সেই ভাগ্যোদয় কখনই হইতে পারে না। ঋষিগণ কেবল আপনাতে ঈশ্বরকে দেখিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সকল পদার্থে সকল জীবে সকল নরনারীতে ঈশ্বরকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। ঋষিগণ আপনাদিগকে ঈশ্বরের পুত্রকন্যা বলিলেন না, তাঁহারা কেবল ব্রহ্মদর্শনেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। ঋষিগণের আত্মাতে ঈশ্বরদর্শন পুত্রত্ব সম্ভবপর করিল, কিন্তু পুত্রত্বের প্রাধান্যের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ব্রহ্ম যেমন সকলের আদি, ব্রহ্মযোগও সেই প্রকার সকলের আদি। পুত্র পরে আসিলেন, পুত্রত্বে যোগও সেই প্রকার পরে উপস্থিত হইল। ইহা উন্নতি কি অবনতি সে কথা লইয়া বিচার নিষ্প্রয়োজন; মনুষ্যজাতি সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়াছে পুত্রকে নহে, ইহা জানিলেই যথেষ্ট। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মযোগ অগ্রে হইয়াছে, ব্রহ্মযোগ হইতে পুত্রযোগ স্বাভাবিক নিয়মে আসিয়াছে। ঋষিগণ আপনাতে এবং অন্যত্র ব্রহ্মকে দেখিলেন, কিন্তু আপনাদিগকে এবং সমুদায় নরনারীকে ঈশ্বরের পুত্রকন্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন না, ইহাতে এই হইল যে মানবজাতির সহিত তাঁহাদিগের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ঘটিল না, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের কথাও উঠিল না। ভক্তির বিধানে সাধু ও ভক্তগণের আদর বাড়িল, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া আদর পাইলেন না। তাঁহাদের হৃদয়বাসী পরব্রহ্মের জন্য তাঁহারা আদর পাইলেন। তাঁহাদের সঙ্গ করিলে পুণ্য উপস্থিত হয়, ইহা ঋষিগণ মানিতেন, কিন্তু এ পুণ্যসঞ্চয়ে তাঁহারা কারণ নহেন তাঁহাদের হৃদয়বাসী পরব্রহ্মই কারণ। সাধু ভক্তগণের সহিত সমুদায় নরজাতির একত্বে যোগের মানববিভাগের অভ্যুদয় এদেশে আর হইল না। ঋষিগণ সকল নরনারীতে ব্রহ্মকে দর্শন করিলেন, নরনারী তাঁহাদের নিকটে অসার অকিঞ্চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল, ব্রহ্মই তাঁহাদিগের নিকটে গৌরবান্বিত হইলেন।

এদেশে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিভাগ দেখাইয়া দিতেছে ব্রহ্মজ্ঞানবশতঃ ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ হইলেন, শূদ্রগণ ব্রহ্মজ্ঞানহীন জন্য চির দিন হীন রহিলেন। ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন, আর ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ না থাকা বশতঃ যাঁহারা শূদ্র হইলেন, এ দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য; যিনি ব্রহ্মেতে স্থিতি বশতঃ পুত্র হইলেন, আর যাঁহারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎসম্বন্ধে বঞ্চিত হইলেন এ উভয়ের মধ্যে সেই পার্থক্য। শূদ্রগণ ব্রহ্মকে জানে না, ব্রহ্মকে চিনে না, ব্রাহ্মণগণের পাদবন্দনা, ব্রাহ্মণগণের সহবাসেই তাহাদিগের মুক্তি নিকটবর্ত্তী হয়। কোন এক ব্যক্তি ব্রহ্মদর্শনে অধিকারী হইয়া অপর সকলে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিলে যে এই প্রকার দুর্দ্দশা হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? ঈশা আপনি পুত্র হইয়া ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সংযুক্ত হইলেন, অপর সকলকে আপনাতে সংযুক্ত করিলেন। তিনি যদি পুত্রত্বের সমাদর সমুদায় নরজাতিতে বিস্তার না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সম্বন্ধ মধ্যে যে দোষ বিদ্যমান, সেই দোষ আসিয়া পুত্রত্বে যোগে প্রবেশ করিত। দুঃখের বিষয় এই, ঈশা যদিও পুত্রত্ব সমুদায় নরজাতিতে বিস্তৃত করিলেন, পরম্পরাক্রমে যাঁহারা তাঁহার ধর্ম্ম অনুবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা কিন্তু সে যোগের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। পুত্রকে তাঁহারা ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া সকল নরজাতিকে পুত্রত্বলাভ হইতে বঞ্চিত করিলেন। ঋষিগণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে আবির্ভূত দেখিয়াও পুত্রত্বস্থাপনের অভাবে নরনারীকে হীন করিয়া ফেলিলেন, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মদর্শনে বিমুখ রহিলেন তাঁহাদিগকে শূদ্র বা শোকের পাত্র করিয়া রাখিলেন, ইহা দেখিয়া পাশ্চাত্যগণ দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু দেখিতে পান না যে, ঈশাকে পুত্রপদ হইতে অবতারণ করিয়া ঈশ্বরের পদে বসাইয়া তাঁহারাও সেই

দোষই ঘটাইয়াছেন। ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলিয়া শূদ্রেরা তাঁহার বন্দনাদি করিয়া থাকে, কোন কালে আপনাদের ব্রাহ্মণত্ব জন্মিতে পারে এরূপ বিশ্বাস করে না। ঈশা সকলকে পুত্রত্বের অধিকার দিলেন, কিন্তু তাঁহার অবোধ শিষ্যেরা সে পুত্রত্ব আর কাহারও জন্মিবে তাহার পথ পুত্রকে ঈশ্বর করিয়া বিনষ্ট করিলেন। পুত্রত্বে যোগ যদি সকলকে পুত্র করিত, তাহা হইলে ঋষিগণসমুচিত ব্রহ্ম-যোগে প্রবেশ করিবার বাধা সহজে অপনীত হইত।

ব্রহ্ম যোগ ও পুত্রত্বে যোগ, এ দুই এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, একটি হইতে আর একটিতে প্রবিষ্ট হওয়া নিতান্ত সহজ। ঈশার পুত্রত্ব সিদ্ধ হইল ব্রহ্মযোগে। তিনি যদি ব্রহ্মযোগী না হইতেন, তাহা হইলে তিনি কি কোন দিন পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতেন? ঋষিগণ ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহারা আর অগ্রসর হইলেন না, ব্রহ্মচরিত্রে আপনাদিগকে চরিত্র-বান্ দেখিয়া তাঁহারা যে আপনাদিগকে ব্রহ্মতনয় বলিয়া স্থির করিবেন, এ অবকাশ আর তাঁহাদের হইল না। কেন হইল না কে জানে? ইহার কারণ কেবল এক ব্রহ্মই জানেন। এখনও পুত্রত্বের সমাগম হইবার সময় হয় নাই, তাই এরূপ ঘটিল বলিতে হইবে। ঈশা আপনাতে ঈশ্বরকে দেখিলেন, ঈশ্বরের চরিত্রে আপনাকে এমনই চরিত্রবান্ অনুভব করিলেন যে, ঈশ্বর পিতা তিনি পুত্র, এ সম্বন্ধ আর তাঁহার সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহের বিষয় রহিল না। তিনি বলিলেন, "আমি আর আমার পিতা এক।" এক কিসে? পুত্রত্বে। তিনি আপনাতে পিতার চরিত্র দেখিলেন, কিন্তু শিষ্যবর্গেতে সে চরিত্র দেখিতে পাইলেন না। তাই তাঁহাদিগকে তাঁহার চরিত্রে চরিত্রবান্ হইবার জন্য আপনাকে তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলেন। এরূপে আপনাকে সম্মুখে ধরিয়া কি তিনি অন্যায় করিলেন? কখনই নহে। যদি তাঁহারা পুত্রের চরিত্রে চরিত্রবান্ হন, অচিরে আপনাদিগের আত্মাতে পিতাকেও দেখিতে তাঁহারা সমর্থ হইবেন। অতএব বলিতে হইবে পুত্রত্বে যোগ যখন পূর্ণ হয়, তখন অচিরে ব্রহ্মযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রহ্মযোগে যোগী ঋষিগণেতে পুত্রত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল, পুত্রত্বে যোগেও আবার তেমনি ব্রহ্মযোগ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই উভয়যোগের মধ্যে যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে নববিধান আসিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মযোগ ও পুত্রত্বে যোগ এক হইয়া সকল নরনারী ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মতনয়া হইলেন, এবং প্রত্যেক ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মতনয়া আপনাতে এবং অপরেতে ব্রহ্মকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। এইরূপে দ্বিবিধ যোগ এক না হইয়া ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিলে যে ঘোর অনিষ্ট হইত তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িল। ব্রহ্ম-যোগী সর্ব্বত্র কেবল ব্রহ্মকেই দেখিলেন, নরনারী সকলে তুচ্ছ হইলেন, পুত্রত্বযোগে নরনারীর মহত্ত্ব বাড়িল, কিন্তু ব্রহ্ম অনাদৃত হইলেন। এ মহাদোষ আর, নববিধান আসিয়া যখন দুই যোগকে এক করিলেন, তখন রহিল না। এখন ব্রহ্মযোগী ব্রহ্মের তনয়-তনয়াকে লইয়া স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য মহাযত্নশীল।

পাশ্চাত্যগণ হইতে আমাদিগের মধ্যে পুত্রত্বে যোগ আসিয়াছে এজন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। যোগের মানবীয় বিভাগ পশ্চিম হইতে আসিল ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। কিন্তু ইহা যে ধর্ম্মের কেবল অর্দ্ধভাগ। নিম্নার্দ্ধ মানবীয় ধর্ম্ম যদি ঊর্দ্ধভাগের সহিত সংযুক্ত না হয়, তাহা হইলে উহার যে কোন মহত্ত্ব ও গৌরবই থাকে না। মহর্ষি ঈশা যদি ব্রহ্মযোগে যোগী না হইতেন তাহা হইলে কি আর তিনি পুত্র হইতে পারিতেন? পিতাকে ছাড়িয়া পুত্রকে লইতে গিয়া পাশ্চাত্যগণের চিত্তের পর্য্যাপ্ত পরিতৃপ্ত হইল না, তাই পুত্রকেই ঈশ্বর করিয়া ধর্ম্মের ঊর্দ্ধভাগের আকাঙ্ক্ষার পরিতোষ সাধন করিতে গেলেন। ইহাতে এই হইল যে, পুত্রত্বে যে যোগ তাঁহাদিগের হইবার কথা ছিল, তাহাও তাঁহারা হারাইলেন। ভারতের ঋষিগণ ব্রহ্মযোগ লইয়া বসিয়া আছেন; পাশ্চাত্যগণকে তাঁহাদিগের পদতলে বসিয়া ব্রহ্মযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। যখন তাঁহারা এই যোগে যোগী হইবেন তখন তাঁহারা পুত্রত্বে যোগ পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পিতাতে স্থিতি না করিলে যদি পুত্রত্ব না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মযোগ বিনা পুত্রত্বে যোগ তাঁহাদিগের কি প্রকারে হইবে? ঋষিগণ ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়াও পুত্রত্বে প্রবিষ্ট হইলেন না; আজ পাশ্চাত্য দেশ হইতে পুত্রত্বে যোগ বা নিম্নার্দ্ধ মানবীয় ধর্ম্ম এদেশে আসিয়া এক পুত্রকে কোটি কোটি পুত্রে পরিণত করিল। পাশ্চাত্য-গণ ভারতের অবমাননা করিয়া ঈশার ধর্ম্ম অবিকৃত রাখিতে পারেন নাই, ভারতও পাশ্চাত্যগণের অবমাননা করিয়া সংসারকে স্বর্গধামে পরিণত করিতে সমর্থ হইবেন না। নববিধানের যখন উদয় হইয়াছে তখন আর অর্দ্ধেক ধর্ম্ম লইয়া না ভারত না ইউরোপ আমেরিকা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। নববিধানের আলোক যতই চারিদিকে বিস্তৃত হইবে, ততই দুই দিক্ হইতে দুই অর্দ্ধ ধর্ম্ম আসিয়া একত্র মিলিত হইবে ও পৃথিবীতে পূর্ণ যোগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। কৃপাময় কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন যে, জাতীয় গর্ব্ব অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ যোগধর্ম্মে পশ্চিম ও পূর্ব্বের মিলন হয়।

প্রাপ্ত।

সন্দেহভঞ্জন।

শ্রীহরি, আজ মনে বড় একটা সন্দেহ হইতেছে, বলিতে একটু ভয়ও হইতেছে। কিন্তু প্রাণ যখন তোমাকে দিয়াছি, আর তুমি আমার হৃদয় স্বামী, প্রাণবল্লভ হইয়াছ, তোমার কাছে কোন কথা তো গোপন করা উচিত নয়, আর গোপন করিতে পারিবই বা কেমন করে, তোমার কাছে আমার কিছুই গোপন নাই তবে কেন কথাটা বলে সুখী হই না।

প্রেমময়, তুমি বড়? না আমি বড়? তুমি ভক্তকে বড় কর তাহা তো শুনেছি দেখেছি। তুমি ভক্তের ঘরে বাঁধা থাক তাও জানি,

কিন্তু তাঁহারা তোমায় কত আদর করেন, কত যত্ন করেন, হৃদয় বাগানের ভাল ভাল ফুল দিয়ে সাজান, চিরবসন্তের শোভা দেখান,চিরবসন্ত গীত শুনান, চিরবসন্ত সৌরভ সোঁখান, চিরবসন্ত-সমীরণের চামর ঢোলান, তাঁহাদের পক্ষে এক কথা, আর আমার পক্ষে অন্য কথা, কিন্তু তবু মনে হয় তুমি বড় না আমি বড়? তুমি আমার প্রাণ সর্ব্বদা টান, তাতে আর তোমার বাহাদুরি কি, তুমি যে প্রাণকৃষ্ণ, প্রাণকে আকর্ষণ করাই তোমার স্বভাব। তুমি যেমন আমাকে টান আমিও তো তোমায় টানি। তুমি আমায় টেনে স্বর্গে তোলো, আমি তোমায় টেনে নরকে আনি। আমার মন যে নরক তার বীভৎস মূর্ত্তি ও দুর্গন্ধে আমারই প্রাণ অস্থির হয়, আর তুমি কেমন করে সেখানে এসে বস, স্বহস্তে স্থান পরিষ্কার কর, কত সুগন্ধ ঢেলে দেও এবং কত সাজে সাজাও। আমি তোমার গুণে মুগ্ধ, রূপে মুগ্ধ, তা তো হবেই। তুমি যে জগন্মোহন। কিন্তু তুমি আমাতে কিসে মুগ্ধ? আমাকে তুমি তোমার এত গুণ এত রূপ দেখাও, তবুত তোমাকে ছেড়ে ছেড়ে থাকিতে পারি, কিন্তু তুমি—তুমি তো আমাকে এক মুহূর্ত্ত ছেড়ে থাকিতে পার না। "আমি তোমায় ভুলে থাকি, তুমি আমায় ভুল না।" কত ভাবে কত রূপে তুমি আমার মন ভুলাও; চতুর প্রেমিক, কত প্রেমের চতুরতাই জান,যাদুকর, কত যাদু জান,কত যাদু কর! তোমার প্রেমের জালে পড়েছি, পালাবার যো নাই, যত এদিগ ওদিগ করি ততই বাঁধা পড়ি। আমার জন্য তোমার এত কেন, তাই বলি আমি বড় না তুমি বড়?

না ঠাকুর, এখন বুঝিলাম, তুমিই বড়। গুণ দেখে যে ভাল বাসে সে তো প্রেমিক নয়, সে বণিক্; নির্গুণকে যে ভাল বাসে সেই প্রেমিক। তোমার নিজের কোন অভাব নাই অসুখ নাই, তথাপি পাপীর জন্য সদাই ব্যস্ত। পাপীর জন্য কতই না ব্যবস্থা কতই না উদ্যোগ। পাপীর জন্য বিধান,পাপীর জন্য মহাজন,পাপীর জন্য সাধু সাধ্বী, পাপীর জন্য ভক্তের মাথায় দুঃখভার, পাপীর জন্য সাধুর রক্তপাত। শ্রীহরি, এই তো তোমার মহত্ত্ব। তুমি যদি মহৎ হয়ে আপনার ঐশ্বর্য্য আপনার গৌরব লইয়া আপনার স্বর্গে বসে থাকিতে, তাহা হইলে নিজে বড় হয়ে থাকিতে। এমন লোক পৃথিবীতেও অনেক আছে, তাহা হইলে তোমার আর মহত্ত্ব কোথায় থাকিত। তুমি পাপীর জন্য ব্যস্ত, পাপীর বন্ধু, দীনবন্ধু, অধমতারণ, পতিত পাবন, সেই জন্য তুমি এত বড়। তুমি আমায় ভাল বাস, আমাকে উদ্ধার করিতে সংকল্প করেছ, সেই জন্য তুমি আমা অপেক্ষা বড়। তুমি যদি আমার ভ্রম সংসারাসক্তি পাপাসক্তি দেখে বিরক্ত হয়ে ফিরে যেতে, নিজ সংকল্প ভেঙ্গে ফেলিতে, তবে আর তোমার গৌরব তোমার ঠাকুররালি কোথায় থাকিত। আমি তোমায় ছাড়িলেও তুমি আমায় ছাড় না, এই জন্যই—এই জন্য তুমি আমা অপেক্ষা বড়। হরি তুমি বড়, তুমি বড়, তুমি বড়। কিন্তু তোমার প্রেম তোমা অপেক্ষা বড়। প্রেমই তোমায় পাগল করেছে, প্রেম তোমার মান সম্ভ্রম সকল নষ্ট করেছে, কিন্তু প্রেমেই তুমি জয়ী। অত প্রেম না দেখিলে কি পাপী পাপ ছাড়িত, আর তোমারও অত প্রেম না থাকিলে এত অপমান তিরস্কার সহ্য ক'রে পাপীকে কি তুমি বশ করিতে পারিতে? "প্রেমেতে নাই প্রবঞ্চনা, প্রেমেতে বিজয়ী হরি।"

ময়মনসিংহের নববিধানমন্দির।

ময়মনসিংহের নববিধানমন্দির বিগত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণীকৃত ও ভূমিসাৎ হইয়াছিল। সম্প্রতি ঈশ্বরকৃপায় প্রচারব্রতে ব্রতী প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার এবং চন্দ্রমোহন কর্ম্মকারের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে, পরন্তু তত্রত্য সেশন জজ শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্যে উক্ত মন্দির নবীন আকারে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। ভূমিকম্পের ভয়ে মন্দিরের ছাদ এবার ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত হয় নাই, করগেটেড আয়রণে নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণ ইটের প্রাচীরে আবৃত করা গিয়াছে। মন্দির পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও আয়তনে কিছু বৃহৎ হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর একবার ময়মনসিংহ নববিধান মন্দির ভূমিকম্পে চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। উক্ত ভ্রাতা দ্বয়ের পরিশ্রম ও যত্নে অর্থ সংগৃহীত হইয়া তাহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। এবার তাহাদের দ্বারা ৫৫৯৸১৫ সংগৃহীত হইয়াছে ও মন্দিরনির্ম্মাণ-কার্য্যে ৭৩২৭॥ ব্যয় হইয়াছে, ১৭৪৸১০ ধার, স্থিতি ২॥১৭॥। এতদ্ভিন্ন মুক্তাগাছার শ্রীযুক্ত মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় সমস্ত চৌকাট ও কপাট প্রভৃতি প্রদান করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আরও কিছু অর্থ পাইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাতে ঋণ পরিশোধ হইতে পারিবে।

আমরা দাতাদিগকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের দানাঙ্গীকার স্বীকার করিতেছি;—

বিলাতের ইয়ুনিটিরিয়াণ সম্প্রদায়ের দান ২০০৲, শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী জমীদার মহাশয় ২০০৲, স্বাক্ষর মধ্যে ১০০৲, মেঃ এ, সি সেন ডিঃ জজ ৩০৲, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ন আচার্য্য চৌধুরী জমীদার মুক্তাগাছা ১০৲, মেঃ বি, সি, সেন বগুড়ার কলেক্টর ২০৲, ডবলিউ সি ঘোষ বারিষ্টার ১০৲, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী জমিদার আম্বাড়িয়া ২০৲, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার ১২৲, শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কানিহারী ১৫৲, শ্রীযুক্ত অভয়াপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী গুজাদিয়া ১০৲, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী গুজাদিয়া ১০৲, শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রায় মুন্সেফ কিশোরগঞ্জ ৪৲, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী সিংহ ডিঃ মাজিষ্ট্রেট কিশোরগঞ্জ ২৲, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায় জমীদার কিশোরগঞ্জ ৪৲, বাবু প্রকাশচন্দ্র নন্দী উকিল (ঐ) ২৲, বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় পুঃ ইঃ (ঐ) ২৲, ববু নবীনচন্দ্র বক্রবর্ত্তী ২৲ (ঐ) বাবু রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী (ঐ) ১৲, বাবু শ্যামাচরণ দাস এসিষ্টাণ্ট হেডমাষ্টার (ঐ) ১৲, বাবু গুরুপ্রসাদ বক্রবর্ত্তী উকিল (ঐ) ২৲,

বাবু আজিম উদ্দিন মোক্তার (ঐ) ১৲, হসমত আলী মোক্তার (ঐ) ১৲, বাবু জ দীশ গুহ ময়মনসিংহ ২৲, জয়চন্দ্র দাস (ঐ) ২৲

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

বিগত ৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটের ৩ নং ভবনে স্বর্গগত সাধু অঘোরনাথ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যানন্দ গুপ্তের সহিত কিশোরগঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্মোহন বীরের ৬ষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী ব্রজবালার শুভ পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ৩২ বৎসর, পাত্রীর বয়ঃক্রম ২১ বৎসর। এই বিবাহে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আচার্য্যের কার্য্য উপাধ্যায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর •বদম্পতীকে পুণ্য প্রেমেতে সমুন্নত করুন।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ বহুমূত্ররোগের বৃদ্ধি ও পদে গুরুতর ক্ষত হওয়াতে নিতান্ত কাতর ও শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার চিকিৎসা বহু ব্যয়সাধ্য। দয়াবান্দিগের দয়ার উপর তাহা অনেক নির্ভর করে।

গত মঙ্গলবার অমরাগড়ীতে শ্রীমান্ আশুতোষ রায়ের স্বর্গগত মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

উক্ত দিবস শান্তিপুরে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পরামাণিকের পিতৃশ্রাদ্ধ উপাধ্যায় কর্ত্তৃক নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমৃতানন্দকে সঙ্গে করিয়া গত মঙ্গলবার কটকে যাত্রা করিয়াছেন।

স্বর্গগত মহিমচন্দ্রের উপায়হীনা দুঃখিনী সহধর্ম্মিণী তিনটী শিশু কন্যাসহ হাজারিবাগের বালিকাবিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যগ্রহণার্থ তথায় গিয়াছেন। তথায় কোন আত্মীয় ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে তিনি আশ্রয় পাইবেন। উক্ত পদের বেতন অতি সামান্য ১২৲ মাত্র, অন্যদীয় সাহায্য তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য আবশ্যক করিবে।

ইতিপূর্ব্বে নওয়াখালি নববিধানসমাজের সাবৎসরিক উৎসব হইয়াছে। তদুপলক্ষে ঢাকা হইতে শ্রীমান্ দুর্গানাথ রায় তথায় গিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত বাঘিল গ্রাম হইতে বৃদ্ধ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"আমাদের বাড়ীর শুভপুণ্যাহ অতি জমাটরূপে হইতেছে। উপাসনাতে গ্রামের ভদ্র ও মহিলাগণ এবং স্কুলের ছাত্রগণ ও প্রজাবর্গ সকলেই যোগ দিয়াছিলেন, • এবং খুব মনোযোগ দিয়া উপাসনা সঙ্গীত ও উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। এটি একটি উৎসবের ন্যায় হইয়াছে।"

ভাই বলদেব নারায়ণ গয়া জিলার সবডিভিজন আরঙ্গাবাদে গিয়াছেন। বিগত ৪ঠা ভাদ্র তত্রত্য স্কুলগৃহে হিন্দি ভাষায় এক বক্তৃতা দান করিয়াছেন। গৃহে শ্রোতৃবর্গের স্থানের সমাবেশ হয় নাই। বক্তৃতা অতিশয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে বিহার প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় বৈদ্যনাথে একদিন স্থিতি করিয়াছিলেন। তত্রত্য স্কুলগৃহে ছাত্রদিগকে তিনি উপদেশ দান করিয়াছিলেন, এবং সেখানকার কুষ্ঠাশ্রম দর্শন করিয়া রোগীদিগকে উপদেশস্বরূপ কিছু বলিয়াছিলেন ও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা সমন্বয় ভাষ্যের বাঙ্গলা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় ৫ম খণ্ড মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হইতেছে। ৫ম খণ্ড যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। সংস্কৃত অংশের মুদ্রাঙ্কন পূজাবকাশের পূর্ব্বে শেষ হইবে আশা করা যায়।

একেশ্বরবাদধর্ম্মের আদিপ্রবর্ত্তক ইহুদি ও মোসলমানজাতির আদিপুরুষ মহাতেজস্বী মহাত্মা এব্রাহিমের জীবনবৃত্তান্ত অনেক বৎসর হইল নিঃশেষিত হইয়াছিল, গত ভাদ্রোৎসবের সময় তাহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই পুস্তক বিশেষ২ মোহম্মদীয় ইতিবৃত্ত পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। মূল্য।০ মাত্র।

প্রথম ভাগ হইতে চারি বৎসরের মহিলা পত্রিকা বার খণ্ড করিয়া চারি ভাগ পুস্তকাকারে বাঁধা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগের মূল্য ডাক মাসুল সহ ২৲ মাত্র।

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন পুস্তক অনেক দিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। সমগ্র সঙ্গীত এক খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। ভাদ্রোৎসবের মধ্যে উহা প্রকাশ করিতে যত্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া যায় নাই। আরও ১০। ১২ ফর্ম্মা মুদ্রিত হইলে পুস্তক সমাপ্ত হইতে পারে।

গত ৬ই ভাদ্র রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবীস মহাশয়ের বাসভবনে বিশেষভাবে উপাসনা হইয়াছিল।

গত মঙ্গলবার শান্তিপুরে শ্রীমান্ হরেন্দ্রনারায়ণ মৈত্রের নবকুমারের শুভজাতকর্ম্ম উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

উক্তদিবস ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী অমরাগড়ীতে স্বর্গগত ভাই ফকিরদাস সংস্থাপিত স্কুলের ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ ও তাহাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। রাত্রিতে ভাই ফকির দাসের আলয়ে পারিবারিক উপাসনা ও উপদেশ হইয়াছিল।

A Lecture —We have been requested to announce that a lecture on "A Great Drama-Player" will be delivered by the Rev. P. M. Choudry, at the Overtoun Hall, 86 College Street, on Wednesday, the 6th September at 6-30 P. M. The Hon'ble K. C. Banerji, and the Rev. P. C. Mozumdar are expected to address the meeting.

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ১৭ই ভাদ্র মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪৩ ভাগ।
১৭ সংখ্যা।

১লা আশ্বিন, রবিবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে করুণার সাগর, তোমার করুণা অতি অদ্ভুত। কোথায় তোমার কোন্ সন্তান কি একটী কথা বলিয়াছিল সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, তুমি তাহা ভোল না, ভুলিতে পার না। সে অবাক্ হয়, যখন দেখিতে পায় যে, তুমি কত দিন পরে অনপেক্ষিত ভাবে তাহার সেই কথা অনুসারে আয়োজন করিয়াছ। যাহা অভাবনীয়, অসম্ভব, সে মনে করে নাই কখন সেরূপ ঘটিবে বা ঘটিতে পারে, তুমি সেই অসম্ভব অভাবনীয় বিষয়কে তাহার বিনা যত্ন প্রয়াসে যখন সাধিত করিয়া দাও, সে অবাক্ হইয়া যাইবে না কেন? কি ভাবে এজন্য সে তোমার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, তাহাই বা সে জানিবে কি প্রকারে? সে আপনার কথা আপনি রক্ষা করিবে সে ক্ষমতা তাহার নাই। যত সে তৎসম্বন্ধে যত্ন করিয়াছে, তত সে দেখিতে পাইয়াছে তাহার সকল যত্ন বিফল হইয়া গেল। অস্থানে তাহার যত্ন সফল হইবে কেন? সে যত্ন করিয়া করিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছে, পরিশেষে যত্নের মূল বিষয় পর্য্যন্ত বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়াছে, এমন সময়ে কোথা হইতে তুমি কোন্ দিক্ দিয়া স্থানান্তর হইতে তাহার যত্নের ফলবিধান করিলে, মনোরথ পূর্ণ করিলে। মনে হয়, তুমি যদি তোমার সন্তানগণের সঙ্গে এইরূপ অভাবনীয় খেলা না খেলিতে, তাহা হইলে তাহারা তোমাকে চিনিত না। কেবল চিনিত না তাহা নহে, তুমি যে তাহাদের হইয়া সকলই করিয়া দাও ইহা তাহারা বুঝিত না, তাহাদের কথা রক্ষার জন্য ধর্ম্ম রক্ষা জন্য তাহাদের অপেক্ষা তুমি ব্যস্ত, ইহা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। মা আপনার সন্তানের জন্য কত যত্ন করেন। পৃথিবীতে তাঁহার তুল্য কে আছে? কিন্তু যখন তোমার আমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন অক্ষুণ্ণ যত্ন দেখি, হৃদয়ঙ্গম করি, তখন সকল ভয়, ভাবনা, চিন্তা, মনোবেদনা হৃদয় হইতে অন্তরিত হয়, এবং বলি, জননীর জননী, তুমি যখন আমাদের হিতের জন্য এত যত্নশীল, তখন আর আমাদের ভয় করিবার চিন্তা করিবার বিষয় কি আছে? ভয় কেবল আমাদের রুচি ও বাসনা। আমাদের রুচি ও বাসনার মত যদি তুমি কিছু না কর, আমাদের মন বিরক্ত হইয়া যায়, এবং মনে হয় তুমি যেন আমাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্যই এইরূপ করিতেছ? কিন্তু এ ভাব আমরা তোমার বিরুদ্ধে কত দিন পোষণ করিতে পারি। যখন

দেখি যে, আমাদের রুচি ও বাসনার বিরোধে কাজ করিয়া আমাদের ভালই করিয়াছ, তখন কি আর তোমার প্রতি বিরক্ত থাকিতে পারি, না অকৃতজ্ঞ হইতে পারি। তখন যে চিত্ত স্বতই কৃতজ্ঞতা ভারে আরও অবনত হইয়া পড়ে, সকল প্রকার বিরোধী ভাব চলিয়া যায়। হে দেবাদিদেব, যত আমরা বৃদ্ধ হইতেছি, তত তোমার এই সকল ব্যবহার আমাদিগের নিকটে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতেছে। এখন কি তোমার সম্বন্ধে আমাদের অণুমাত্র সংশয় তিষ্ঠিতে পারে? তাই তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা করিতেছি, আমাদের শেষ জীবন অচল অটল বিশ্বাসের জীবন হউক। আমাদের বিশ্বাস যাহাতে অপরের অবিশ্বাস সংশয় অপনয়ন করিতে পারে, এই আশীর্ব্বাদ তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। তুমি করুণা করিয়া আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবে, এই আশা করিয়া তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহ।

বিগত ২২শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার সায়ং ৭৷০ ঘটিকার সময় ভাই রামচন্দ্র সিংহের আত্মা পৃথিবীর নশ্বর দেহ পৃথিবীতে রাখিয়া অনন্ত চিদাকাশে উড্ডীন হইয়াছে। বহুদিন হইল যে রোগ তাঁহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, শেষ সময়ে যে রোগ তাঁহাকে কেবল শয্যাশায়ী করিয়াছিল তাহা নহে অতিমাত্র যাতনা ও ক্লেশে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, সেই অচিকিৎস্য ব্যাধি, তাঁহার আত্মার শৃঙ্খলমুক্তির কারণ হইল, পার্থিব সকল দুঃখপরীক্ষার অবসান করিয়া দিল। তিনি দেহসম্বন্ধে আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন, ইহাতে শোক প্রকাশ করা স্বাভাবিক, কিন্তু যখন তাঁহার দৈহিক যাতনার বিষয় স্মরণ হয়, এবং সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তৃত বিশ্বাসনয়নে প্রতিভাত হয়, তখন শোক সংবরণ করিয়া তাঁহার এবং আমাদের আশ্রয়দাতার নিকটে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি ইদানীন্তন স্বগৃহে প্রস্থান করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন; এ পৃথিবীর গৃহের প্রতি আর তাঁহার আকর্ষণ ছিল না। তাঁহার যাইবার সময় হইয়াছিল, পরলোকের প্রতি টান বাড়িয়াছিল, সে অভিলাষ তাঁহার শীঘ্র শীঘ্র পূর্ণ হইল। তাঁহার দেহসম্বন্ধে সকল অধিকার ঘুচিয়া গেল, এখন তাঁহার জীবন সাধারণের অধিকারভুক্তমাত্র রহিল। সে জীবনের ছবি অপরে অঙ্কিত করিলে ঠিক হইবে না, আজ এই জন্যই মনে হয় দৈবক্রমে তাঁহার লিখিত "জীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" কতকগুলি পুরাতন কাগজ বাহির করিতে গিয়া তন্মধ্য হইতে আমাদের হস্তগত হইল। তিনি একবার সাংবৎসরিক উৎসবসময়ে আপনার জীবনের বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই তিনি তখন প্রবন্ধাকারে লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি যদিও সমুদায় শেষ হয় নাই, তথাপি যতটুকু তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনের অজ্ঞাতাংশ সকলে নিঃসংশয় জানিতে পারিবেন। তাঁহার লিখিত সেই 'জীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' এই;—

আচার্য্য কেশবচন্দ্র জীবনবেদ শ্রেষ্ঠ বেদ বলিয়া তাহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সকল গ্রন্থ হইতে জীবনগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ; ইহা তাঁহারই কথা। বাস্তবিক অন্যান্য গ্রন্থ বা বেদ ভাবমূলক বা কল্পনাজড়িত হইবার অনেক সম্ভাবনা, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি বা ভাবের উপকরণে সংরচিত; কিন্তু জীবনবেদ প্রকৃত ঘটনাসম্ভূত; করতলস্থ আমলকবৎ প্রত্যক্ষ, স্মরণ চিন্তন প্রভৃতি শক্তি দ্বারা তাহা তাদৃশ আয়ত্ত করিতে হয় না। জীবনের ঘটনাপুঞ্জ কেবল দর্শনের বিষয়, কেবল দেখাদেখির ব্যাপার। দর্শনশাস্ত্রে কল্পনা সংশয়ের স্থান পাইবার সম্ভাবনা অতি বিরল, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একবার জীবনের দিকে তাকাই আর জীবনবৃত্তান্ত সব দেখিতে পাই। আর যাহা দেখিলাম তাহাই বিবৃত করিলাম, তাহাতে আর ভুল ভ্রান্তির আশঙ্কা নাই। এই জীবনবেদ অবলম্বন করিয়া অপর বেদ রচিত হইয়াছে। মহাত্মা প্রবীণ সক্রেটিশ এই জন্য আত্মতত্ত্বকে এত মহীয়ান্ করিয়াছিলেন; এই তত্ত্বই সকল তত্ত্বের মূল তত্ত্ব। জীবনগ্রন্থ অতি আদরের সামগ্রী, কেন না ইহা আদিগ্রন্থ, ইহা বিধাতার লেখা একপ্রকারে বলা যায়।

বিধান সমাগত হইবার পূর্ব্ব হইতে যেন বিধান আশ্রিত

লোকদিগের সঙ্গে একটি যোগ সংস্থাপিত হইয়া থাকে। যুগে যুগে এইরূপ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। বর্ত্তমান বিধানের সঙ্গে আমার এরূপ সংযোগ ঘটনাপরম্পরায় আমি উপলব্ধি করিবার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। বিধানের স্রোতে যখন প্রথমে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, তখন যদিও প্রথমে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু পরিণামে ইহাতে আর কোন সন্দেহ পোষণ করিবার কারণ দেখি নাই। মঙ্গলময় বিধাতার বিধান আমাকে টানিয়াছিল, বাঁধিয়াছিল বলিয়া আজ আমি এখানে উপস্থিত হইয়া জীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বিধানমহিমা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

পুস্তকমাত্রেরই ভূমিকা থাকে। আমার জীবনগ্রন্থের ভূমিকায় তাই উল্লেখ করিতেছি, বিধাতা আমার কিরূপ প্রকৃতির ভূমির উপর তাঁহার লীলাচিত্র চিত্রিত করিয়াছেন তাহার বিষয় অতি সঙ্ক্ষেপে বলা আবশ্যক মনে করি।

আমি ক্ষণজন্মা সিদ্ধপুরুষ নহি, শুকদেবের ন্যায় জন্ম ঋষি নহি বা স্বভাবজাত পুণ্যাত্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই। সাধুসজ্জনদিগের মত আমার হৃদয়ভূমি আজন্ম উর্ব্বরা ছিল না এবং আবার একেবারে জঘন্যতম পাপপূর্ণ অনুর্ব্বরা ভূমিসদৃশও ছিল না। আমার প্রকৃতি উভয়বিধ আতিশয্যের সমন্বয়—সামঞ্জস্য ভূমি, কাল ও কিছু ভাল বিমিশ্রিত। মানুষের জীবনের দুই অবস্থা, আমি আমার জীবনকে উপলক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত করি। সে দুই অবস্থা প্রাকৃতিক ও দেবপ্রসাদসম্ভূত। প্রাকৃতিক মানুষের স্বভাবে অনেক গুণ সন্নিবিষ্ট থাকে, কিন্তু তাহার গুণের ভিতরে অন্ততঃ দুই একটী এমন বিশেষ দুর্ব্বলতা ত্রুটী লুক্কায়িত থাকে যাহাতে তাহাকে শান্তিহারা করে। এই জন্য মনুষ্যহৃদয়ভূমিতে দেবাসুরের যুদ্ধের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। মনুষ্য অসুর নাশ বা পরাস্ত করিয়া যখন সমরজয়ী হন, তখনি শান্তি সম্ভোগ করিবার অধিকারী হন, নতুবা শান্তিসম্ভোগ অসম্ভব। পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তৃতি ও তাহাতে শান্তি স্থাপন জন্য সমরের আয়োজন যখন আবশ্যক, তখন হৃদয়ে স্বর্গরাজ্য স্থাপন জন্য সমর যে নিষ্প্রয়োজন তাহা বলা কি সঙ্গত হয়? আমার জীবনে এই সংগ্রামের অনেক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

আমার শৈশবের অবস্থা আমি জানি না, কেন না আমি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিলাম। বাল্যকালে জ্ঞানের অভ্যুদয়ে আমার স্বভাবের বিষয় আমি এইরূপ জানি। বাল্যকালে আমি অল্পাধিক নিরীহ ছিলাম, বিবাদ বিসংবাদে পরাঙ্মুখ ছিলাম, গ্রামের যাহাদের সহিত আমাদের পারিবারিক বিবাদ হইত, আমি সেই বিরোধীদিগের বাড়ীতে গিয়া ভাবসাব করিতাম। কখন কখন রাগ করিতাম এবং যাহা ধরিতাম তাহা শীঘ্র ছাড়িতাম না, একটু আপন মর্জ্জিমত চলিতাম। বয়োবৃদ্ধি সহকারে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তাহা পশ্চাতে যথাস্থানে উল্লেখ করা যাইবে। আমার এই প্রকৃতিভূমির উপর বিধাতা আলেখ্য অঙ্কিত করেন। আমার মাতৃদেবী বড়ই দয়াবতী ও পরোপকারিণী ছিলেন, তাঁহার স্বভাব আমাতে কতক সংক্রামিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমার জীবনের চতুর্ব্বিধ অবস্থা।

আমার জীবনের প্রথম অবস্থায় আমি একটা টান—একটা আকর্ষণ অনুভব করি, কি যে সে টান তাহার হেতু বা উদ্দেশ্য কিছু বুঝিতে পারি নাই। পরে ফলদ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত হইল। বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে এ টান আরো অধিক হইতে লাগিল। বর্দ্ধমেনে গুরুমহাশয়ের পীড়নভয়ে আমি পাঠশালায় যাইতে বড়ই নারাজ ছিলাম, কিন্তু ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়াবধি লেখাপড়ায় আমার বিশেষ মনোযোগ হইয়াছিল এবং বিদ্যালয়ে তখন আমি বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলাম। শ্রেণীতে প্রথম স্থান ও প্রধান পুরস্কার আমার একচেটে ছিল। স্মৃতিশক্তি আমার বিশেষরূপে তীক্ষ্ণ ছিল এজন্য পরীক্ষকদিগের নিকট আমাকে সময়ে সময়ে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হইত। প্রশ্নোত্তরে আমি যথা পঠিত তথা লিখিতরূপে উত্তর লিখিতাম, এজন্য পরীক্ষকদিগের সন্দেহ উদ্দীপন হইত এবং তাহা ভঞ্জন করিবার জন্য আমাকে তাঁহাদিগের নিকট দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে হইত। এই অগ্নিপরীক্ষা আমার জীবনের সঙ্গের সঙ্গী আবহমান কাল। আমি আজন্ম অপৌত্তলিক এক প্রকারে বলা যায়, কেন না আমার জীবনে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান প্রায় কোন কাজেতেই হয় নাই। কেবল বিবাহেতে নামমাত্র তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অন্য কোন অনুষ্ঠান আমার জীবনে হয় নাই। আমারও বাল্যকাল হইতে এ বিষয়ে মনোমধ্যে তর্ক বিতর্ক আপনা হইতে সমুপস্থিত হইত। যখন প্রতিমাদর্শনে আমার অভিভাবকগণ আমাকে পূজার স্থলে লইয়া যাইতেন, আমি তাঁহাদের অনুরোধে যদিও তথায় থাকিতাম, কিন্তু সে দিন প্রতিমাখানা খড় মাটিতে তৈয়ার হইল আজ তাহার এত আদর, এরূপ পূজা কেন, এই তর্ক আমার মনে উদয় হইত অথচ অভিভাবকদিগের খাতিরে কিছু বলিতাম না, বাধ্য হইয়া প্রতিমাকে প্রণামও করিতাম কিন্তু মনস্তুষ্টিকর হইত না। মোটের উপর পূজার ধূমধাম জাঁকজমক মন্দ মনে হইত না। আমার তখন বয়স ১৩।১৪ বৎসর যখন আমার অগ্রজ মহাশয়েরা একবার ব্রহ্মোৎসব করেন ও তদুপলক্ষে জাতিভেদের ব্যতিক্রম করিয়া সকলে জাতিনির্ব্বিশেষে একত্র ভোজন করেন। ইহাতে গ্রামে বড় আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া যায়। যথাসময়ে আমরা এক দল যুবক জ্ঞানোন্নতিসাধনে ব্রতী হই। লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যবিধ জ্ঞানচর্চ্চায় আমরা নিযুক্ত হই। এই রূপে আমরা চরিত্রসংশোধিনী নামে একটী সভা সংস্থাপন করি এবং তৎসংক্রান্ত চরিত্রসংশোধিনী নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করি। ইহার মূল্য এক পয়সামাত্র এবং হস্তযন্ত্রে ও হস্তাক্ষরে মুদ্রিত ও লিখিত হইত। সভার কার্য্য বেশ ধূমধাম সহকারে চলিতে লাগিল ও গ্রামের দেশীয় ও বিদেশীয় মান্যগণ্য লোকদিগের

মন আকর্ষণ করিল, অনেকেই ইহাতে সহানুভূতি ও সাহায্য দিতে লাগিলেন। এই সভার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই উৎসাহের স্রোতে পড়িয়া আমার মনের টান আরো বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অবশেষে একটি ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপনের ইচ্ছা বলবতী হইল। সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা চালাইবার উপযুক্ত লোক, যাঁহার অভাব আমরা অনুভব করিতেছিলাম, পাওয়া গেল। আমাদের গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে লাগিলেন। আমাদের পাঠ্যপুস্তক ব্রাহ্মধর্ম্ম ও অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্মনীতি, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ইত্যাদি পুস্তক ছিল। এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া ও উপস্থিত উন্নতির অনুরাগে অনুরক্ত হইয়া আমি আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করি। এই সময় ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতা হেয়ারস্কুলে পাঠ অধ্যয়ন আরম্ভ করি। ইহা খৃঃ অব্দ ১৮৫৮ সালে। এই উপলক্ষে Young Bengal, This is for you একখানি পুস্তিকা আমার হস্তগত হয়, আমি তাহা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হই এবং যে বন্ধুর নিকট উহা পাইয়াছিলাম তাঁহাকে আদ্যোপান্ত জিজ্ঞাসা করাতে Brahmo Schoolএর সন্ধান পাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম নানা উপায়ে আমার মঙ্গলের কারণ। যখন পল্লিগ্রাম হইতে কলিকাতার স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন আমাদিগকে পাড়াগেঁয়ে ছেলে বলিয়া সমপাঠীদিগের মধ্যে সহরের ছেলেরা আমাদিগকে বড় পীড়ন করিত, তাহাদিগের নিকটে বসিলে চিম্‌টী কাটিত। ব্রাহ্ম বলিয়া বন্ধুবর গোবিন্দ ও নিবারণের সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁহাদের সহানুভূতি পাইয়া উক্ত অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাই। ব্রাহ্মস্কুলে আচার্য্য কেশবের সাক্ষাৎকারলাভ আমার পরম লাভ, ইহা আমার জীবনে একটি বিশেষ শুভযোগ। কেশবদর্শনে আমার মন তৎপ্রতি মুগ্ধ হইয়া যায়। স্রোতস্বতী যেমন দ্রুত গতিতে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয় এবং সাগরে মিশিয়া তাহার গতিক্রিয়া যেমন স্থগিত হয়, আমার প্রাণের বেগ তেমনি কেশবের মনোহর মূর্ত্তিদর্শনে সংবরণ হইল। বাস্তবিক আচার্য্য কেশবের সহবাসে ও সদুপদেশে আমার জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। সঙ্গতসভায় ব্রাহ্মস্কুলে ব্রাহ্মসমাজে কেশব ও কেশবের দলের উৎসাহ উদ্যম ও নবীন ভাব দেখিয়া আমি যেন চিরকৃতার্থতা লাভ করিলাম। এইরূপে আচার্য্য কেশবের সঙ্গে থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম ও ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয় অনেক শিক্ষা লাভ করিলাম। তাঁহার যোগে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, তাঁহার সন্তানবৃন্দ ও অপর অনেক ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সহিত আমি পরিচিত হইলাম। এই সময়ে গোবিন্দ নিবারণ প্রভৃতি বন্ধুগণ সমবেত হইয়া আমরা Brahmo Intimate Association সভা স্থাপন করি। দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষে আহারাদি করাতে গ্রামে জাতের ঘোট বড়ই উঠিল, আমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্ম বড়ই পীড়ন করিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের অন্য কোন দোষ ছিল না ও আমরা গ্রামের লোকের নিকটে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলাম, এই সকল কারণে আমাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া দুই চারিটি ধমক দিয়া ও ভবিষ্যতে এরূপ আর করিস না এই হুকুম প্রচার করিয়া আমাদিগকে এযাত্রা তাঁহারা অব্যাহতি দিলেন। প্রাতে স্কুলের পড়া, দিনমানে বিদ্যালয়ে স্থিতি, সন্ধ্যার সময় সভাসমিতিতে উপস্থিত হওয়া, বা কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিতে এখানে সেখানে নানাস্থানে যাওয়া, রাত্রিতে কখন বা চন্দ্রের আলোকে কখন বা অন্য উপায়ে কষ্টে সৃষ্টে আহারক্রিয়া সম্পন্ন করা, তদন্তে মশা ছারপোকার হস্তে প্রাণটি সমর্পণ করিয়া পাঠ অধ্যয়ন করা, অবশিষ্ট রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করা এইরূপে জীবনযাপন করা হইত। এই সময় ১৮৬০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। পরীক্ষা দিবার জন্য নানাবিধ কার্য্যের মধ্যে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতাম, কিন্তু ফল কি হইল ইহা জানিবার জন্য আজকালের বালকদিগের মত আমি কোন বিষয়ে কখন ব্যাকুল হই নাই। আমি যে অদৃষ্টবাদী ছিলাম তাহা নহে তথাপি ঐরূপ একরকমের একটা নির্ভর করিতাম। আমার চিরকাল এই রীতি। ডাক্তারি শিখিবার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করি কিন্তু সেই বৎসর উক্ত কলেজের পাঁচটাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় তাহা আমার অবস্থার অনুপযোগী হইল, সুতরাং আমি সে বিষয়ে বিফলমনোরথ হইলাম, নতুবা ডাক্তারি শিখিয়া পরোপকার করিব বড় সাধ ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া আমি পরে Dr. Duff's Collegeএ F. A, পড়িতে আরম্ভ করি ও ডাক্তার ডফ সাহেবের অনুগ্রহে তথায় বৃত্তি প্রাপ্ত হই। আমার সমপাঠী শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়গোবিন্দ সোম, ডাক্তার কে, পি, গুপ্ত প্রভৃতি। বৎসরেককাল এইরূপ পাঠাধ্যয়ন করিয়া আমি তৎকালে প্রাদুর্ভূত সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হই। ক্রমে আমার অধ্যয়ন কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। কেন না বিজ্বর অবস্থা আমি উপর্য্যুপরি দুই দিন সম্ভোগ করিতে পারিতাম না। Dr. Goodeve সাহেবের সংক্রামক জ্বরের ঔষধ সেবন করিয়া কথঞ্চিৎ উপকার হয়। এখন আর কি করিব, পারিবারিক অর্থ কষ্ট বেশ বাড়িল। কেবল বেম্ম বেম্ম করিয়া বেড়াইবে, কোন কাজকর্ম্ম করিবে না, এই বলিয়া প্রতিবেশী গ্রামস্থ লোকেরা নানারূপে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। জনৈক বন্ধু বন্ধুভাবে আমাকে কলিকাতায় Commissariate আপিসে শিক্ষানবিসী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহা কেবল ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়ান বই আর কিছুই নহে দেখিয়া আমি সপ্তাহকাল পরে সে কার্য্য করিতে বিরত হইলাম। ইহাতে আমার উপর আরো নানা কটূক্তি ও গঞ্জনা বাড়িল। পক্ষান্তরে গ্রামের লোকেরা মনে করিলেন যে, এ পালের গোদা "বেম্ম বেম্ম" করিয়া আপনি অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল এবং অন্য ছোড়াগুলোকে বইয়ে দিল। এই মনে করিয়া আমাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত

করিবার অভিপ্রায়ে বন্ধুভাবে একটি ষড়যন্ত্র করিল। আমার একজন আত্মীয় এই দলের প্রতিনিধিরূপে আমায় বন্ধুভাবে পরামর্শচ্ছলে বলিলেন যে, "তুমি কেন একবার পশ্চিম প্রদেশে যাও না? এলাহাবাদে তোমার মাতুল আছেন তথায় গিয়া শরীরটা ভাল হইতে পারে ও কর্ম্ম কর্ম্মের সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।" আমি ছদ্মবেশী বন্ধুর অভিসন্ধি বুঝিলাম, এবং কৌতুহলাক্রান্তও হইলাম। স্কুলে যখন ভূগোল পাঠ করিতাম ও মানচিত্রে লাহোর on the Ravce ইহা লক্ষ্য করিতাম, তখন উক্ত রাজধানী দেখিতে অভিলাষ হইত। এতদ্ব্যতীত আমার সর্ব্বাগ্রজের বিধবা পত্নীর ও তাঁহার নিরাশ্রয়া কন্যার দুঃখ দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। তাঁহাদের দুঃখ দূর হয় ইহা আমার একান্ত বাসনা ছিল। এই সকল কারণে আমি বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য বিদেশে গমন প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। এ বিষয়ে আমাকে সহজে সম্মত করিবার জন্য উক্ত বন্ধুগণ আমার বিদেশগমনের ব্যয় বহন করিতে সম্মত হন এবং আমার পাথেয়াদির সুব্যবস্থা করিয়া দেন। এইরূপে আমি স্বদেশ হইতে তাড়িত হই। আমি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ যাত্রা করি। এই সময়ে আচার্য্যদেবের স্ফোটক অস্ত্র করা হয় এবং তজ্জন্য তিনি শয্যায় শায়িত দেখিয়া আমি দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে দূরদেশে গমন করি।

আমার জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা। আমার জীবনে বিধাতার বিচিত্র লীলার অভ্যুদয়। আমি প্রথমদিন বাষ্পীয় শকটযোগে রাণীগঞ্জ উপস্থিত হই। তথায় শরীরের উন্নতশীল পরিবর্ত্তন বেশ বুঝিতে পারিলাম। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া Bullock train যোগে এক আড্ডা হইতে অন্য আড্ডায় উপস্থিত হইতে লাগিলাম। সকল স্থানে আমার পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়ের অনুরোধে আমি বিলক্ষণ আদর সমাদর পাইয়াছিলাম। আমার সমভিব্যাহারী দুইটি ভদ্রলোক আমার পরিচিত ছিলেন, সুতরাং পথে আমরা একত্র বেশ আরামও সচ্ছন্দে দিবা যামিনী অতিবাহিত করিতাম। আমাদের মধ্যে এক জন আহারকুশল বৃদ্ধ থাকাতে সে বিষয়ে আমরা খুব নিশ্চিন্ত থাকিতাম। পশ্চিম প্রদেশের পরীক্ষা প্রলোভনের বিষয় তিনি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করেন, তাহা শ্রবণে আমার মন বড়ই ভীত ও কম্পিত হইল। মনে ভাবিলাম, তবে কেনই বা এমন বিপৎপূর্ণ স্থানে গমন করিতে উদ্যত হইলাম। রাত্রিকালে এই ভয়প্রযুক্ত ঈশ্বরসন্নিধানে বড়ই কাতর প্রাণে কাঁদিলাম ও রক্ষার উপায় ভিক্ষা করিলাম। ভেলুয়ার চটি সহরঘাটী প্রভৃতি নূতন নূতন স্থান দর্শনে মনে আনন্দ খুব হইতে লাগিল। অবশেষে দুর্গাপূজার সময় কাশীধামে উপনীত হইলাম। এখানে যে সমৃদ্ধিশালী বন্ধুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তিনি একদিন আমাকে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা প্রভৃতি মন্দির দর্শন করাইবার সেই সেই স্থানে লইয়া যান এবং আবশ্যকীয় ব্যয় জন্য আমার হস্তে কিছু টাকা পয়সা দেন। পূজাদি দিব না, অতএব আমার পয়সায় প্রয়োজন নাই ইহা বলাতে উক্ত বন্ধু তথাপি তাহা আমার নিকটে রাখিতে বলিলেন এবং অবশেষে আমার ইচ্ছামত তাহা ব্যয় করিতে অনুমতি দেওয়ায় আমি উক্ত অর্থ কাঙ্গাল গরিবদিগকে দিয়া তৃপ্ত ও কৃতার্থ হই। অবশেষে নবেম্বর মাসে আমি এলাহাবাদে মাতুল আশ্রমে উপস্থিত হই। পূর্ব্বে আমার অন্য মাসতুত ভাইয়েরা মাতুল আশ্রমে আসিয়া তাঁহাদের অবিবেচনাহেতু মাতুলপরিবারকে অনেক প্রকারে বিরক্ত করিয়াছিলেন। আমার আসাতে সেজন্য তাঁহারা তাদৃশ আদরের ভাব দেখাইলেন না, কিন্তু অল্প দিন মধ্যে আমার আচারব্যবহার-সন্দর্শনে অতীব প্রীতিলাভ করিলেন এবং আমি স্থানান্তরে যাইতে চাহিলে আমাকে যাইতে দেন নাই। এমন কি যখন শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছিল, তখন দেশে ফিরিয়া আসিবার অভিলাষ ব্যক্ত করায় তাহাতেও সম্মত হন নাই। আমি এলাহাবাদ হইতে কাণপুরে হেমচন্দ্র সিংহ ভায়ার নিকট গমন করি, তথায় অবস্থিতি কালে হিন্দি ভাষায় অজ্ঞসত্বেও একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ভার মাসেকের জন্য প্রাপ্ত হই। ভাঙ্গা হিন্দি ও বাকিটা ইংরাজী ভাষার সাহায্য দ্বারা ছেলেদিগকে শিক্ষা দান করিতাম; তাহারা পড়ানের জন্য আমার প্রতি তত দূর সন্তুষ্ট হউক বা না হউক কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বকার শিক্ষকের "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" প্রণালী অবলম্বনে আমাকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তাহারা আমার বেশ অনুগত হইয়া উঠিল। এমন কি মাসেক কাল পরে আমার যখন বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা আমাকে কোন মতে বিদায় দিতে সম্মত হয় নাই। এই শিক্ষকতার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া দেশে প্রত্যাগমনের পাথেয়ের সুবিধা হইল। এই সময়ে আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী নলকুড়াগ্রামের ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য আমাকে ৪০ টাকা বেতন দেওয়া হইবে, এই মর্ম্মে নিয়োগপত্র আমি প্রাপ্ত হই। ইহা অবলম্বন করিয়া আমি দেশে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হই, কিন্তু মাতুল মহাশয়ের অমতপ্রযুক্ত তাহা ঘটিয়া উঠিল না। এ দিকে আমার অগ্রজ মহাশয়কে কেহ আমার বিষয়ে কোন শ্লেষবাক্য বলায় তিনি আমাকে একখানি আক্ষেপপূর্ণ পত্র লেখেন। তাহা পাঠ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য আমি যত্নবান্ হইলাম, কর্ম্মানুসন্ধানে অনেক আপিসে গেলাম। আপিসের সাহেবেরা আমার সার্টিফিকেট ও সুপারিসপত্রাদি দর্শনে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সুবিধার অভাবপ্রযুক্ত চাকুরী দিতে অক্ষম বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু এক দিন হঠাৎ সংবাদ পাইলাম যে অমুক আপিসে ছয়মাসের জন্য ঠিকা কাজ খালি আছে, তথায় যাইবামাত্র উক্ত কাজটিতে আমি নিযুক্ত হইলাম।

ভাই রামচন্দ্র সিংহের হস্তলিখিত 'জীবনের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' এই পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকটে আছে, অবশিষ্ট অংশ হয়তো আর লেখা হয় নাই। তিনি পশ্চিমে যে যে কার্য্যে নিযুক্ত হন, সকল

কার্য্যই কেবল সুচারুভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহা নহে, সর্ব্ববিধ লোভ পরিহার করিয়া তেজের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। শেষোক্ত কারণে তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য যত্ন হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু সে সকল যত্ন সকল সময়েই বিফল হইয়াছে। তিনি শেষ সময়ে যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতে যে কেবল বেতন অধিক ছিল, ভবিষ্যতে আশা প্রশস্ত ছিল তাহা নহে, তিনি অন্যায়োপার্জ্জন করিলে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন। এসম্বন্ধে তাঁহার যথোচিত ঘৃণা ছিল। লাহোরে অবস্থানকালে ধর্ম্মপ্রচার-সাহায্যে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারের দিকে তাঁহার বিলক্ষণ টান ছিল, সুতরাং পত্নীকে অগ্রে 'ভারতাশ্রমে' পাঠাইয়া দিয়া পরে যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন আর তাঁহার কর্ম্মস্থানে যাওয়া হইল না, তিনি কর্ম্মত্যাগ করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার পত্নী তাঁহার অনুকূল ছিলেন, ইহা তিনি আপনি ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাই রামচন্দ্র সিংহ আপনার জীবনের উপাদানবিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, সেই উপাদানানুরূপ তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে, ইহা আমরা নিঃসংশয় বলিতে পারি। তিনি বৃদ্ধিশীল আয়ের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যব্রত স্বীকার করিলেন, যে কার্য্যে থাকিলে মোটা পেন্সন ভোগ করিতে পারিতেন অর্থাভাবে কোন ক্লেশ পাইতেন না, সেই কর্ম্ম তুচ্ছ করিয়া নিজের বিশ্বাস প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, এ তাঁহার ত্যাগস্বীকার চিরদিন দৃষ্টান্তস্বরূপ থাকিবে। তিনি দারিদ্র্যের আঘাতে জর্জ্জর হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কোন দিন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দরিদ্রতা কেন গ্রহণ করিলেন, এরূপ আক্ষেপ কোন দিন তাঁহার মুখে কেহ শুনিতে পায় নাই। আমরা তাঁহার কথা অধিক কিছু বলিতে চাই না। তাঁহার জীবন সাধারণের চক্ষুর গোচর নির্ব্বাহিত হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বিচারাধীন রহিয়াছে। আমাদের আশা, তিনি তাঁহার প্রাপ্যস্থান হইতে কখন বঞ্চিত হইবেন না; কেন না আত্মবিশ্বাসের জন্য যাঁহারা ক্লেশদারিদ্র্য বহন করেন, ন্যূনতা সত্ত্বেও তাঁহাদের পুরস্কার তাঁহারা নিশ্চয় লাভ করিবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। তুমি অদৃষ্টবাদের বিরোধী, অথচ অদৃষ্টবাদ মনে যে শান্তি দেয় সে শান্তি তুমি কৈ দাও। তুমি ক্রমান্বয়ে লোককে উত্তেজিত কর, সাধারণ মানুষ এত উত্তেজনা সহিবে কি প্রকারে? সুতরাং তাহারা তোমার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত হয়, এবং শীঘ্র তোমার কথা শুনিতে বিরত হয়। তুমি কিরূপ শান্তি মানুষকে দাও, তাহা শুনিতে আমার কৌতূহল হইতেছে।

বিবেক। অদৃষ্টবাদের আমি বিরোধী ইহা সত্য, কিন্তু সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের উপরে পূর্ণ নির্ভররক্ষার কি আমি বিরোধী? মানুষ আপনার বাসনা রুচির তাড়নায় নির্ভর রাখিতে পারে না, সে দোষ কি আমার? যদি বল বাসনা ও রুচি ছাড়া কি মানুষ হইতে পারে? তাহার উত্তরে আমি বলি, বাসনা ও রুচি কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবার জন্য প্রয়োজন, কার্য্য না থাকিলে জীবনই থাকে না, জীবনের উন্নতি সম্ভবে না, সুতরাং কার্য্যে প্রবৃত্তির আমি বিরোধী হইব কি প্রকারে? যেখানে কার্য্যে প্রবৃত্তি আছে, সেখানে অশান্তির সম্ভাবনা আছে, এই অশান্তি নিবারণ হয় কি প্রকারে, ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য। কার্য্য করিতে গেলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফলের অভিলাষ আসে, এই ফলের অভিলাষই অশান্তির মূল। কার্য্যের ফল মনুষ্যের নিজের আয়ত্তাধীন নহে, ইহা দেখিয়াই লোকে অদৃষ্ট মানিয়া থাকে। আমি তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি, অদৃষ্ট আর কিছু নহে যাঁহাকে লোকে দেখিতে পায় না, অথচ যাঁহার কার্য্য লোকে প্রত্যক্ষ করে, তাঁহাকেই লোকে অদৃষ্ট নাম দিয়াছে। তুমি বলিবে, লোকে তবে ঈশ্বর নাম না দিয়া অদৃষ্ট নাম দিল কেন? আপনার ইচ্ছা ও রুচির মত ফল না পাইলে লোকের মনে যে বিরাগ উপস্থিত হয়, মনুষ্যাত্মা সে বিরাগ ঈশ্বরের প্রতি হয় ইহা চায় না, এজন্য ঈশ্বর ছাড়া অদৃষ্ট নামে, লোকের মন না বুঝিয়া কার্য্য করে এরূপ, একটী অন্ধশক্তি লোকে কল্পনা করিয়া থাকে। লোকে যদি বুঝিত, যেখানে ইচ্ছা ও রুচির মত কাজ হইলে তাহার জীবনের ক্ষতি হইবে, সেখানেই ইচ্ছা ও রুচির মত কাজ হয় না, তাহা হইলে আর পাছে বা বিরাগ হয় এই ভয়ে অদৃষ্টনামে অন্ধশক্তির কল্পনা করিত না; কেন না যে ইহা বুঝে তাহার বিরাগ হওয়া দূরে থাকুক, এ ব্যবহারে আরো অনুরাগই বাড়ে। কার্য্য করিয়া তাহার ফলের অভিলাষ যদি অশান্তির কারণ হয়, তাহা হইলে সেই ফলের অভিলাষ ত্যাগ করাই তো শ্রেয়। ফলের অভিলাষ যে ত্যাগ করিয়াছে, তাহার অশান্তি হইবে কেন?

বুদ্ধি। এতো তুমি পুরাতন কথা বলিলে। এ কথা আর কে না জানে? জানিয়াও লোকের শান্তি হয় না কেন, বলিতে পার? কাজ করিব, অথচ ফল চাইব না, ইহা কি স্বাভাবিক?

বিবেক। কার্য্য করিলে ফল হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে ফল অনেক সময়ে মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। যাহা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর, তৎসম্বন্ধে ফলবিধাতার প্রতি নির্ভর কি সমুচিত নয়? যদি তুমি জান, তিনি মন্দ ফল কখন দিবেন না, দিতে পারেন না, তাহা হইলে এ নির্ভরে তোমার ক্লেশ হইবে কেন? কাজ করিয়া ফল চাওয়া স্বাভাবিক, ইহা আর কে না জানে? কার্য্য করিয়া যে আনন্দ হয় সেই আনন্দ কি সাক্ষাৎ ফল নয়? তার পর কাজ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতেছি, ইহাতে যে মনের তৃপ্তি হয় সে ফল কি সামান্য ফল? ঈশ্বর কি অঙ্গীকার করিয়াছেন স্মরণ কর। "অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমার চিন্তা করে, আমায় উপাসনা করে, যাহা তাহার নাই তাহা আমি দি, এবং যাহা দি আমি আপনি তাহা রক্ষা করি' এ অঙ্গীকার কি সামান্য অঙ্গীকার? তোমার যাহা নাই তাহা তিনি দেবেন, আবার তাহা তিনি আপনি রক্ষা করিবেন, এ কথায় বিশ্বাস কি শান্তির কারণ নয়? পাওয়া যত সহজ রক্ষা করা তত সহজ নয়, ইহা কি তুমি জান না? রক্ষা করিতে গিয়া কত যত্ন, কত প্রয়াস, কত চিন্তা, কত ক্লেশ বহন করিতে হয়। সে সমুদায় যদি তোমার হইয়া তিনি করেন, তোমার শান্তি হবে না কেন? তুমি প্রার্থনা কর, আর তাঁহার প্রতি নির্ভর কর, শান্তি ও ক্রিয়াশীলতা উভয়ই তোমাতে থাকিবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

প্রেম ও পুণ্যের মিলনে আনন্দস্বরূপ।

২০ পৌষ, রবিবার, ১৮০৮ শক।

আজ আমাদিগের দেশের ঋষিমহর্ষিগণের গৌরব স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিবার দিন। আমাদের মাতৃভূমি ভারতের তাঁহারা গৌরবের মুকুট। এ দেশ নদনদী গিরি কাননাদিতে অন্য সকল দেশাপেক্ষা গৌরবাস্পদ, ইহা সত্য হইলেও দেশের প্রকৃত গৌরব আর্য্য মহর্ষিগণেতে। দেশের গৌরব বাড়াইতে হইলে তাঁহাদিগকে আত্মস্থ করিতে হইবে, আমরা যে তাঁহাদিগের সন্তান চরিত্রের দ্বারা তাহার পরিচয় দিতে হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় বিদেশীয় সাধু ও ঋষিগণ আসিয়া দেশীয় সাধু ও ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এখন এই বিদেশীয় সাধু ও ঋষিগণকে বিজাতীয় বলিয়া দূর করিয়া দিলে তাহাতে দেশীয় সাধু ও ঋষিগণের সম্মান হইবে না, অসম্মান করা হইবে। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ ঋষি ও মহর্ষিগণ যাঁহাদিগকে আদর করিয়া আপনাদিগের মধ্যে সম্মানিত স্থান অর্পণ করিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহাদিগের অসম্মান করি, এবং অগ্রাহ্য করি তাহা হইলে আমাদিগের অপরাধের পরিসীমা থাকিবে না। দেশীয় বিদেশীয় সকল সাধু মহাজন ঋষিগণ ভারতে সমাদৃত হইয়াছেন, সকল প্রকারের ভেদ তিরোহিত হইয়াছে, ইহাতে উদার ভারতের পূর্ব্ব গৌরব আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। আমরা দেশের গৌরবার্থ উভয়কেই সমানভাবে গ্রহণ করিব, কেন না তাঁহাদিগের সকলের সম্মিলনে ভারতে এক অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে।

ভারতের অতি প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণকে স্মরণ করিলে আমাদিগকে একেবারে বেদের সময়ে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়। বেদের সময় ঋষিগণ সমুদায় প্রকৃতির সঙ্গে অতি মধুর সম্বন্ধে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য, প্রাকৃতিক মহত্ত্ব ও পরাক্রম তাঁহাদিগকে সৃষ্টির অন্তরালে সকল কারণের কারণের নিকটে লইয়া উপস্থিত করিয়াছিল। প্রকৃতির সঙ্গে সহানুভূতিতে তাঁহারা মহাপরাক্রমশালী ক্রিয়াশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন; যুদ্ধ বিগ্রহ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াতে তাঁহারা সর্ব্বদা রত ছিলেন। তাঁহারা বাহিরের বিষয় লইয়া ব্যস্ত, কে তাঁহাদিগকে অন্তরের দিকে লইয়া যাইবে? কে এই সকল বাহ্যানুষ্ঠানের অসারতা প্রতিপাদন করিবে? সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই, শাক্য বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। এ বিশ্বাস অজ্ঞানতামূলক। তিনি আদিম বুদ্ধ নহেন, তিনি শেষ বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহাতে চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। শাক্যের অনেক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণ ও মহাভারত, তাহাতেও নামান্তরে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে। এমন কি বেদান্ত মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের চিন্তাপ্রণালী নয়নগোচর হয়। "অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তে বালাঃ" ইত্যাদি বাক্যে বেদান্ত যখন যাগ যজ্ঞকে আক্রমণ করিলেন, অধঃকরণ করিলেন, তখন তন্মধ্যে বৌদ্ধভাব সহজে আমরা দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম নিতান্ত প্রাচীন হইলেও, ভারতের বক্ষ হইতে উৎপন্ন হইলেও, উহা এ দেশে স্থান পাইল না কেন, ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা সমুচিত। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর, তাই কি ইহার তাড়িত হইবার কারণ? কপিলের সাংখ্য নিরীশ্বর, অথচ তাহা আদৃত হইল, আর বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে বহিস্কৃত হইল, অবশ্য ইহার কোন গূঢ় হেতু আছে। বুদ্ধ নিরাত্মবাদী, আত্মা নাই, আমি নাই এ কথা ভারতের ঋষিগণের অসহ্য। আত্মাকে উড়াইয়া দেওয়া তাঁহারা কিছুতেই সহিতে পারেন না, আত্মা তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব।

উপনিষদে আত্মার প্রাধান্য। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এ সকল কথা আত্মজ্ঞানের প্রাধান্য প্রদর্শন করে। আত্মজ্ঞান পরমাত্মজ্ঞানের মূল, আত্মা ও পরমাত্মাতে অভেদ, এ মত ভারতের আর্য্য ঋষিগণ দৃঢ় ভাবে ধারণ করিয়াছিলেন। আত্মা তাঁহাদের নিকটে এত দূর প্রধান হইয়াছিল যে, জড় তাঁহাদিগের নিকটে ধোঁয়ার ন্যায় অপদার্থ হইয়া গিয়াছিল, আত্মার অতীত আর কোন পদার্থ আছে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে অসম্মত ছিলেন। তাঁহারা যখন যোগসর্ব্বস্ব হইলেন

তখন যোগে আত্মাকে উড়াইয়া দিলেন না, আত্মাকেই ব্রহ্মেতে পূর্ণ করিলেন, এমন কি "ব্রহ্মাহমস্মি" বলিয়া আত্মা বা আমি সহ ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ অভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যোগেতে তাঁহারা যে আত্মাকে উড়াইয়া দিলেন না, সেই আত্মাই জগতের মূল হইল; আত্মার নিকটে দৃশ্যমান জগৎ অপদার্থ হইয়া গেল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন এই আত্মাকে উড়াইয়া দিল, তখন উহা বেদ বেদান্তবাদিগণের দ্বেষভাজন হইল, উহার নিন্দাতে শাস্ত্র পূর্ণ হইল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিন্দিত হইল বটে, কিন্তু উহার প্রতিঘাতে পৌরাণিক সময় উপস্থিত হইল, ভারতে আর্য্যগণ আদরের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অবতারবাদ গ্রহণ করিলেন। অবতারগণ সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বলিয়া গৃহীত হইলেও, তাঁহার সহিত আত্মবাদ বিলুপ্ত হইল না। সাধারণ লোক অবতারগণের সদৃশ রহিলেন না, তাঁহারা পূজক আর অবতারগণ পূজ্য হইলেন, কিন্তু এখানে অবতারগণের আত্মাই ব্রহ্মরূপে গৃহীত হইল। অবতারগণ আপনাদের আত্মা বা আমিকে ব্রহ্ম ভাবে সাধারণ লোকের নিকটে উপস্থিত করিলেন। সুতরাং উপনিষদের সময় গিয়া পৌরাণিক সময়ের প্রধান্য হইলে আত্মা উভয়েতেই সমান আদরের বস্তু রহিল। আত্মবাদ লইয়া ভারতের আর্য্যগণমধ্যে যে গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহা অনাত্মবাদিগণের বহিষ্কৃতিতে শেষ হইল।

পৌরাণিক সময় আসিবার পূর্ব্বে ঋষিগণের মধ্যে চিৎস্বরূপের সমধিক সমাদর ছিল। আত্মা চিৎস্বরূপ, ঋষিগণ আত্মবাদী, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে চিৎস্বরূপের প্রাধান্য থাকিবে না তো আর কি থাকিবে? বুদ্ধ চিৎস্বরূপ গ্রহণ করিলেন, এবং তৎসহ অনন্তস্বরূপের এরূপ প্রয়োগ করিলেন যে, অনন্ত জ্ঞান ভিন্ন আর সমুদায় অপদার্থ হইয়া উড়িয়া গেল। আত্মা বা অহম্ অনন্তজ্ঞানের আঘাতে উড়িয়া গেল, সুতরাং গর্ব্বশূন্য এক চিন্মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই প্রপঞ্চাতীত চিন্ময় ব্রহ্মে ঋষিগণ শিবস্বরূপের যোগ দিলেন, এবং এই শিবস্বরূপকে অদ্বিতীয় বলিয়া তাঁহার সঙ্গে সমুদায় প্রতিযোগিতা অসম্ভব করিলেন। পৌরাণিকেরা এই শিবস্বরূপকে লীলাময়রূপে গ্রহণ করিলেন এবং অবতারবাদের সহিত এই শিবস্বরূপের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিল। অবতার অসংখ্য হইলেও যাঁহার চিত্ত যে অবতারে নিবদ্ধ, সেই অবতারই তাঁহার নিকটে অদ্বিতীয় ভগবান্ হইলেন। এই শিবস্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ, ইহা যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত হইল। তিনি আত্মবাদী, তাঁহার আত্মা এই প্রেমস্বরূপের পরিচয় দান করিল। তিনি প্রেমিক হইয়া ঈশ্বরের প্রেম আত্মাতে প্রকাশ করিলেন। তিনি ভক্তিপথের প্রবর্ত্তক, কিন্তু ভক্ত নহেন যোগী। তাঁহার পর অনেক দিন অতীত হইয়া গেলে যিনি আসিলেন, ভক্তিতে আপনি ভক্ত হইলেন, কম্প অশ্রু পুলক নৃত্য গীত রোদন প্রভৃতি ভক্তির ভাববিকাশ আপনার জীবনে লইলেন, ঈশ্বরপ্রেমের মহাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া একেবারে প্রমত্ত হইলেন। ইনি নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ আপনি প্রেমের অবতার হইলেন, প্রেমস্বরূপ তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাতে আর প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরে কোন ভেদ রহিল না। চৈতন্য আপনি ভক্তিমান্ হইয়া প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক হইলেন। যে প্রেমস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সহ অভিন্ন ছিল, সুতরাং [illegible]স্ফুট ছিল, তাহা এখন স্ফুটতর ভাবে সাধকগণের নিকটে ব্যক্ত হই[illegible]

ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যে বলিতে হইবে ভারতার্য্যগণের পরমাত্মবাদের শেষ পরিণাম। পূর্ব্বে আত্মা ও পরমাত্মা এ দুইয়ের সম্বন্ধ অপরিস্ফুট ছিল, এজন্য দুই মিশাইয়া যাইত, শ্রীচৈতন্যে আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নিতান্ত পরিস্ফুট হইল। শ্রীচৈতন্য আপনি ব্রহ্ম সহ অভিন্ন না হইয়া ভক্ত হইলেন, ঈশ্বরের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পাগল হইলেন। অহম্‌কে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন করিয়া পূর্ব্ব ঋষিগণ মনে করিতেন অহংভাবের তিরোধান হইল, অভিমান চলিয়া গেল, চৈতন্য বলিলেন, আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, এ অভিমান কোন কালে জীবের পক্ষে দূষণীয় নহে। সত্য, শ্রীচৈতন্য সময়ে সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেন, কিন্তু বিভোরাবস্থা ছুটিয়া গেলে আপনাকে ঈশ্বরের প্রিয়জনরূপে দর্শন করিতেন। শ্রীচৈতন্যের আগমনের পূর্ব্বে সখ্য ভাব ছিল, কেন না ঋগ্বেদেও "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" এই কথায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার সখ্য ভাব প্রকাশিত আছে। বেদান্তের সময়ে অভিন্নবাদে এই সখ্য ভাব বিলীন প্রায় হইয়া গেলেও আবার পুরাণের সময় সে ভাব প্রবল হইয়া উঠিল। ঈশ্বরের প্রেমস্বরূপ শ্রীচৈতন্যে অধিকমাত্রায় পরিস্ফুট হওয়াতে ঈশ্বরকে প্রাণপতি প্রাণেশ্বর বলিয়া তিনি গ্রহণ করিলেন। সুতরাং প্রেমে যে সম্বন্ধ চরম শ্রীচৈতন্যে তাহা পরিস্ফুট হইল। আমাদের দেশ বা বিদেশ সর্ব্বত্র সাধকগণের সাধারণ ভূমি সৎস্বরূপ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব বা বিশ্বাস না করিলে অধ্যাত্মজীবনের আরম্ভই হয় না। চিৎ বা চৈতন্যরূপী আত্মা হইতে জ্ঞানস্বরূপে ভারতার্য্যগণের বিশেষত্বের আরম্ভ। বিদেশীয় যিহুদী সাধকগণ সৎ চিৎ হইতে কেবল শক্তিমত্তা বাহির করিয়া লইলেন, আত্মবাদের তত দূর পক্ষপাতী হইলেন না। তাঁহারা আত্মবাদী না হইয়া আত্মত্যাগী হইলেন, এ জন্য সে দেশে আত্মত্যাগের, এ দেশে আত্মরতির সে দেশে বহনের, এদেশে সম্ভোগের প্রাধান্য হইল। শ্রীচৈতন্যে এই আত্মরতির জন্যই বিবিধ প্রীতির সম্বন্ধে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবকে বান্ধিলেন। ভারতার্য্যগণের ধর্ম্ম বৈরাগ্যপ্রধান। শ্রীচৈতন্যে বৈরাগ্য পূর্ণতা লাভ করিল, কেন না বিষয়ে বিরাগ ব্রহ্মে অনুরাগ, ইহা শ্রীচৈতন্য পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। যিহুদী সাধকগণ বৈরাগ্যপ্রধান নহেন, বিবেকপ্রধান, সুতরাং তাঁহাদিগেতে পুণ্যের স্ফূর্ত্তি, ভারত আর্য্যগণেতে প্রেমের স্ফূর্ত্তি।

যিহুদী সাধকগণের যিহোবা সৎস্বরূপ স্বয়ম্ভূ। ইনি মহাপরাক্রমশালী। শক্তিমত্তা ইঁহার প্রধান লক্ষণ। ইনি শাস্তা, প্রভু, রাজা। ইনি মহৎ ভয়, ইনি পাপ অপরাধ সহ্য করিতে পারেন না। ইনি ক্রমান্বয়ে আদেশ করিতেছেন, ইহা কর, ইহা করিও

না। এখানে আপনার সুখসম্ভোগ অন্বেষণ করিলে চলে না, কেন না তাঁহার বজ্রসম আদেশ সাধককে সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করাইয়া দাস্যে নিযুক্ত করিতেছে। এখানে আত্মত্যাগ না করিলে প্রভুর আদেশ রাজার শাসন পালন ও অনুবর্ত্তন করিতে পারা যায় না। যিহুদী সাধক বিবেকী, কেন না তাঁহার হৃদয়ে, ইহা কর, ইহা করিও না, এই কথা প্রতিনিয়ত আসিতেছে। প্রভুর ইচ্ছা পালনই তাঁহার সর্ব্বস্ব; সুতরাং পুণ্যস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ তাঁহার অপরিহার্য্য। যিহুদী ঋষিদিগেতে এই সকল ভাব স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে করিতে ঈশাতে আসিয়া উহাদের পরিপক্কতা হইল। ঈশা সম্যক্‌রূপে আপনার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন করিলেন। এই ইচ্ছাধীনতা হইতে পুণ্যস্বরূপের আবির্ভাব হইল, তাঁহার চিত্ত নিঃশঙ্ক হইল; যিনি শাস্তা, প্রভু ও রাজা তিনি পিতা হইলেন। পিতার ভিতরে শাস্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও রাজত্ব সকলই আছে, অথচ ভয়ের কারণ নাই, এজন্য ঈশা ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন, আপনি পুত্র হইলেন।

এখন আমরা কি দেখিতেছি, হিন্দু ও যিহুদী এই দুই জাতি হইতে ধর্ম্মের দুই বিশেষ ভাব ধারাবাহিকক্রমে আসিয়া চৈতন্য ও ঈশাতে উহা ব্যক্তভাবে প্রকাশ পাইল। এক দিক্ হইতে আসিল আত্মরতি, বৈরাগ্য ও প্রেম, আর এক দিক হইতে আসিল আত্মত্যাগ, বিবেক ও পুণ্য। এক জন ডুবিলেন প্রেমানন্দে, আর এক জন ডুবিলেন পুণ্যানন্দে। নববিধানে এই প্রেম ও পুণ্য মিলিত হইয়া ঘন আনন্দে পর্য্যবসিত হইল, এক আনন্দস্বরূপসমুদ্রে দুই দিক্ হইতে প্রবাহিত প্রেমনদী ও পুণ্যনদী আসিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল। ঘন আনন্দে নিবিড় আনন্দে এইরূপে মহাসমন্বয়ের ব্যাপার উপস্থিত। এই দুই মহানদী হইতে কত শাখা প্রশাখা বাহির হইয়াছিল, সে সকলই নানা দিগ্দেশ ঘুরিয়া আনন্দসমুদ্রের প্রবেশস্থলে মূলনদীতে পড়িয়া একাকার হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিল। "পুণ্য ও প্রেমে মিলে হল আনন্দস্বরূপ" আচার্য্য যে, একথা ব'লয়াছেন ভালই বলিয়াছেন। চৈতন্য রসময় মূর্ত্তির আরাধনা করিলেন, "রসো বৈ সঃ" ঈশ্বর রসস্বরূপ তৃপ্তির হেতু, ইহা তিনি প্রেমের দ্বারা বুঝিলেন। ঈশা যে ক্রুশে প্রাণ দিলেন, তিনি আর অপহৃতচিত্ত না হইলে এরূপ করিতে পারিতেন না। পুণ্যের সৌন্দর্য্যে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল, পুণ্যেতে তিনি আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। যেখানে পূর্ণতা সেখানে আনন্দ। পূর্ণতাই আনন্দের অন্যতর নাম। শুধু প্রেম, শুধু পুণ্য, ইহাতে সম্যক্ পূর্ণতা উপস্থিত হয় না, সুতরাং আনন্দের আংশিকত্ব ঘোচে না। যখন প্রেম পুণ্য দুই মিশিয়া যায়, পূর্ণতা উপস্থিত হয়, পূর্ণানন্দ, ঘন আনন্দ, পূর্ণ রস সাধকহৃদয়ে প্রকাশ পায়। ধন্য তাঁহারা যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম ও পুণ্যের মিলন হইয়া পূর্ণানন্দ সম্ভোগ হইতেছে। এ হৃদয়ে আত্মরতি ও আত্মত্যাগ, বৈরাগ্য ও বিবেক এমনই ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, যেমন সম্ভোগ তেমনি আজ্ঞাপালন, দুইই একই সময়ে অবিরোধী ভাবে চলিতেছে। এখানে সাধকের নিকটে মাতৃরূপ প্রকাশিত, কেন না মাতাতে সকল ভাবের সন্নিবেশ আছে, শিশুর নিকট মাতা সকল ভাবেরই আধাররূপে প্রকাশিত। আমাদের প্রাণের ইষ্টদেবতা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন প্রেমপুণ্যের সঙ্গমস্থল হইয়া ঘন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে পারি এবং নববিধানের মহাসমন্বয়ের ব্যাপার এইরূপে জীবনে প্রতিফলিত করিয়া কৃতার্থ হই।

প্রাপ্ত।

আকাশেশ্বর।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

"একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥৭॥

'একধা এব' একেনৈব প্রকারেণ বিজ্ঞানঘনৈকরসপ্রকারেণ আকাশবন্নিরন্তরেণ 'অনুদ্রষ্টব্যম্' এতৎ ব্রহ্ম।

—'পরঃ' সূক্ষ্মঃ 'আকাশাৎ' অপি। 'অজঃ' ন জায়তে 'আত্মা' ইত্যাদি ২।৭।

পরমেশ্বরকে একই জানিবেক, ইনি উপমারহিত এবং নিত্য। এই নির্ম্মল জন্মবিহীন মহান্ আত্মা আকাশের অতীত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং অবিনাশী। ৭।

৫৭ পৃঃ ৭অঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক।

এখানে দুই কথা হইতেছে, এক ব্রহ্মকে আকাশের ন্যায় দেখিবে, দ্বিতীয়—ব্রহ্ম আকাশেরও অতীত। আকাশের ন্যায় ব্রহ্মকে দেখিব বলায় আকাশের পরম সূক্ষ্মত্ব, অনাদি অনন্তত্ব প্রভৃতি ঈশ্বরগুণ স্বীকৃত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্ম যে আকাশের অতীত তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। বিশেষ আকাশে যে সমুদায় ঈশ্বরগুণ আছে, তাহা পূর্ব্বে আমরা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে দেখাইয়াছি। ব্রহ্মকে আকাশবৎ দর্শন করিবে উপনিষৎকারদিগের এই কথা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, আকাশ সামান্য পদার্থ নহে, ঈশ্বরের সমকক্ষ বটে, তাই বলিয়াই উপনিষৎকারেরা আকাশের সঙ্গে ঈশ্বরের তুলনা করিয়াছেন। বচনে ঈশ্বরকে অপ্রমেয় বলায় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আকাশের তুলনা করায়, প্রকারান্তরে আকাশের অপ্রমেয়ত্ব ও ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাতম্ ॥ ১ শ্লোক সংগ্রহ ও সন্ধ্যা বিবিধৃত, ঋগ্বেদ বচন।

পণ্ডিতেরা সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের পরম পদ ও চক্ষুকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা দর্শন করেন।

এখানেও আকাশের ঈশ্বরত্বের সম্পূর্ণ আভাস পাওয়া যাইতেছে, কারণ সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের তুলনা আকাশের সহিত দেওয়া হইতেছে। আকাশকে এখানে স্পষ্টাক্ষরে সর্ব্বব্যাপী না বলিলেও ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্বের সঙ্গে যে ভাবে তাহার তুলনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব স্বীকার না করিয়া উপায়ান্তর নাই।

'আকাশোবৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা,

তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতম্‌॥ ১॥

'আকাশঃ বৈ' ব্রহ্মণঃ 'নাম' অভিধানম্‌ আকাশইবাশরীরত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাচ্চ সঃ পরমাত্মা আকাশাখ্যঃ। ইত্যাদি ২।১।

'মন যখন ব্রহ্মের সেই অনন্ত ভাব অনুভব করে, বাক্য তখন তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া তাঁহার নাম আকাশ দেয়। বাস্তবিক তাঁহার কোন নাম নাই। ইত্যাদি ঐ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকে এই উপনিষদ্‌বচনের যে অনুবাদ আছে তাহা মূলের অনুরূপ নহে। বচনের ব্যাখ্যায় স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মের নাম আকাশ। তাঁর আকাশ নাম কেন? না তিনি আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও অশরীর এইজন্যই ব্রহ্মের আকাশাখ্যা। কথার ভাবে যদিও বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম এক আকাশ এক, আকাশের সঙ্গে ব্রহ্মের উল্লিখিত ঐক্য আছে বলিয়া তাঁর একটি নাম আকাশ; কিন্তু ইহা ভ্রম, যেহেতু ব্রহ্ম এক আকাশ, আবার তল্লক্ষণযুক্ত আর একটি আকাশ আছে ইহা হইতে পারে না। ইহাতে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের বাধা জন্মে। আকাশের ন্যায় ব্রহ্ম অশরীর ও সূক্ষ্ম এই কথা বলাতে ব্রহ্মের ন্যায় আকাশও অশরীর ও সূক্ষ্ম এই কথা স্পষ্ট স্বীকৃত হইতেছে, এরূপ স্থলে আকাশকেই ব্রহ্ম বলা উচিত ছিল, তাহা না বলিয়া আকাশাতিরিক্ত ব্রহ্ম কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যক্ষভাবকে গোপন করা হইয়াছে মাত্র। ব্রহ্ম নামরূপ বিবর্জ্জিত এই কথা যে বচনে আছে তাহা সৃষ্ট অর্থাৎ আকারবিশিষ্ট বস্তুর সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মে কোন সাকার বস্তুর রূপ নাম দেওয়া যাইতে পারে না। ব্রহ্মের যদি কোন নামই না থাকে, তাহা হইলে বাস্তবিকপক্ষে তাঁর ব্রহ্মনামই বা কি প্রকারে হইতে পারে? আকাশ কোন সৃষ্ট ও সাকার বস্তুর অন্তর্গত নহে এবং সমুদায় ঈশ্বরগুণযুক্ত, সুতরাং ব্রহ্মের একটি নাম আকাশ, ইহাতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

'যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। ইত্যাদি ২।১৭।

'যঃ চ অয়ম্‌ অস্মিন্‌ আকাশে' 'তেজোময়ঃ' চিন্মাত্রপ্রকাশময়ঃ; 'অমৃতময়ঃ' অমরণধর্ম্মা'পুরুষঃ' সর্ব্বমনুভবতীতি 'সর্ব্বানুভূঃ'। ইত্যাদি ২।১৭।

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, ইত্যাদি ২॥ ১৭॥"

১৪৫।৪৬ পৃঃ ১৬ অঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক।

এখানে আকাশের অসীমত্ব স্বীকার করিয়াও আকাশকে ঈশ্বর বলা হয় নাই, আকাশে স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে। ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই অসীম হইতে পারে না, আকাশ অসীম হইলে তাহা হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর যে সিদ্ধ হয় না বচনরচয়িতার সে দৃষ্টি ছিল না বলিয়াই অনুমান হয়। আকাশের অসীমত্ব স্বীকার করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের স্থিতি, এই কথাটী বলাতে ঈশ্বরের অসীমতা সর্ব্বব্যাপকতা প্রভৃতির খর্ব্বতা সাধন করা হইয়াছে। ঈশ্বর যে আপনি আপনাতে আছেন, এখানে তাহারও মূলোৎপাটিত হইয়াছে। এসকল আর কিছুই না, একদিকে প্রকৃতপক্ষেই আকাশ সমুদায় ঈশ্বরগুণযুক্ত; অন্য দিকে উপনিষৎকার মহর্ষিদিগের আকাশের অতীত ঈশ্বর না হইলেই চলে না, তার পরে আকাশকেই যদি ঈশ্বর বলেন তাহা হইলে দার্শনিক মহর্ষিগণের পঞ্চ মহা ভূতের একটি ভূতেরও অত্যান্তাভাব হয়, এই সকল কারণেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম আকাশে থাকিয়া সকল করিয়াছেন। যাই হউক, উপনিৎৎকারগণ স্পষ্টতঃ আকাশকে ঈশ্বর না বলিলেও তাঁহারা এবিষয়ে একান্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। অতুল্য ঈশ্বরের তুলনা স্থলে তাঁহারা যে আকাশকে গ্রহণ করিয়াছেন ইহা দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা আকাশেও অনাদি অনন্ত প্রভৃতি কতকগুলি ঈশ্বরের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বর উবাচ।

'অস্থি মাংসং নখশ্চৈব ত্বগ্লোমানিচ পঞ্চ চ।

পৃথ্বীপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাসতে ॥২০॥

ঈশ্বর বলিলেন, অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্‌ ও লোম এই পাঁচ পৃথিবীর পঞ্চগুণ কথিত হয়, ইহা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রকাশ পায়।। ২০।

আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্ব্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ।

রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী ॥২৫॥

বায়ু আকাশ হইতে, বহ্নি বায়ু হইতে, জল বহ্নি হইতে এবং পৃথিবী জল হইতে সমুৎপন্ন। ২৫।

৭৮।৭৯ পৃঃ জ্ঞানানন্দলহরীধৃত জ্ঞানসঙ্কলিনী-তন্ত্রবচন।

যাহা অনাদি অনন্ত তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না, উৎপন্ন পদার্থমাত্রই সীমাবিশিষ্ট হইবেই হইবে। আকাশের অসীমত্ব থাকায় তাহাকে যে দার্শনিকগণ উৎপন্ন বলিয়াছেন, তাহা যে ভ্রম, তাহা আমরা এই প্রস্তাবের শিরোভাগেই বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি। এখানে প্রথম বচনে আকাশকে ভূত বলা হইয়াছে, অনুবাদকার জানেন আকাশকে অন্যত্র ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই বোধ হয় তিনি অনুবাদে আকাশকে পঞ্চভূতের মধ্যে গণনা করিয়া জাবতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে শিবের উত্তরের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন *। পরের বচনে আছে যে, আকাশ হইতে বায়ু, বহ্নি, জল ও পৃথিবী হইয়াছে, কিন্তু আকাশ কোথা হইতে হইল, তাহা নাই। যদি বল আকাশ ঈশ্বর (পরমাত্মা) হইতে হইয়াছে, তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, তাহা ভ্রম। কিন্তু এখানে আমরা বলি যে, এখনকার শিব অথবা গ্রন্থকার, যাঁহাকেই আমরা এই বচনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহাদের কাহারও ভ্রম হয় নাই, প্রকৃতই তিনি আকাশের উৎপাদক পান নাই, নচেৎ সকলের উৎপত্তি আকাশ হইতে হইয়াছে বলিলেন, পরমাত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি একথা বলিলেন না,

* উমাপৃচ্ছতি হে দেব পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডলক্ষণম্‌।
পঞ্চভূতং কথং দেব গুণাঃ কে পঞ্চবিংশতিঃ ॥১৯॥
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

ইহা হইতে পারে না। এবিষয়ে দ্বিধা ভাব ছিল বলিয়াই যে, উহা উহ্য রাখিয়া দিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের এ বিষয়ে যে মতদ্বৈধ ছিল তাহা আমরা পরে দেখাইতেছি।

"মহী বিলীয়তে তোয়ে তোয়ং বিলীয়তে রবৌ।
রবির্বিলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্বিলীয়তে তু [illegible] ২৬॥

জলে ক্ষিতি, বহ্নিতে জল, বায়ুতে বহ্নি [illegible] এবং আকাশে বায়ু লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।২৬।

পঞ্চতত্ত্বাদ্ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বাং তত্ত্বং বিলীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বাৎ পরং তত্ত্বং তত্ত্বাতীতং নিরঞ্জনম্॥২৭॥

পঞ্চতত্ত্ব হইতে সৃষ্টি সম্পাদিত হইয়া থাকে, আর তত্ত্ব হইতেই তত্ত্ব বিলীন হয়। যে তত্ত্ব পঞ্চ তত্ত্বের পর তিনিই তত্ত্বের অতীত নিরঞ্জন জানিবে। ২৭।"

জ্ঞানানন্দলহরী ধৃত, জ্ঞানসঙ্কলিনী-তন্ত্রবচন।

এখানেও সকল তত্ত্বের লয় আকাশে হয় বলা হইয়াছে কিন্তু আকাশ কোথায় লয় প্রাপ্ত হয় তাহা বলা হইল না। যদি পুনরায় বল, আকাশ পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাতে এই আপত্তি উপস্থিত হয় যে আকাশাতীত নিরঞ্জন পদার্থ স্বীকার করিয়াও কেন উক্ত পদার্থকে আকাশের উৎপত্তি বিষয়ের কারণ স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই? আকাশকে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে গণনা কারাতেও দোষ হয় নাই কারণ, তত্ত্বশব্দে ব্রহ্মকেও বুঝায়। আকাশের যে উৎপত্তি নাই ও হইতে পারে না, এক আকাশের অতীত যে কোন পদার্থ নাই, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এ কথা একান্তই সত্য যে, উল্লিখিত ক্ষিতি হইতে বায়ু পর্য্যন্তের উৎপত্তি ও লয় সকলই গ্রন্থকার (বক্তা) যুক্ত্যাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু আকাশের উৎপত্তি লয় কিছুতেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, এজন্য স্পষ্টতঃ নিরঞ্জনকে আকাশের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ বলিতে সাহসী হন নাই। যাই হউক, আকাশে নিরঞ্জনতার বিন্দুমাত্রও যখন অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন এখানে আকাশের অতীত নিরঞ্জন স্বীকার যে করা হইয়াছে তাহা বাহুল্য মাত্র।

সচ ব্যোম ভূমির্ন চ তেজোব্বায়ুঃ
চিদানন্দরূপঃ শিবো হহম্॥ ১॥

জ্ঞানানন্দলহরীধৃত নির্ব্বাণষট্‌ক।

আমি আকাশ ভূমি জল ও বায়ু নহি, আমি চিদানন্দরূপী শিবস্বরূপ।

এখানে ঈশ্বরের উক্তি রূপে ব্যক্ত হইয়াছে যে, আমি আকাশ বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি নহি, আমি তাহার অতীত চিদানন্দময় শিব। কিন্তু অন্যত্র ঈশ্বরের উক্তিরূপে আছে।

'যাবৎ পশ্যেৎ খগাকারং তদাকারং বিচিন্তয়েৎ।
খমধ্যে কুরু চাত্মানমাত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ৯॥

যদি বল, এইরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা কত দিনে পরমফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে, এই দৃশ্যমান আকাশ যত দূর দৃষ্টিগোচর হয়, এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে তত দূর পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবে। পরে আত্মাকে আকাশে এবং আকাশকে আত্মার মধ্যে সংস্থাপন করিতে হইবে। এই প্রকারে আত্মা ও আকাশ এই উভয় একীভূত হইলে আর কিছু [illegible] করিবার আবশ্যক নাই। ইত্যাদি ২। ৯।

জ্ঞানানন্দলহরীধৃত, উত্তরগীতাবচন।

এখানে আকাশকেই ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবার কথা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। আত্মাকে আকাশময় করিতে পারিলেই আর তদ[illegible] কিছুই চিন্তা করিবার নাই বলাতে স্পষ্টই আকাশেরই ঈশ্বরত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

ক্রমশঃ

সংবাদ।

বিগত ৩২শে শ্রাবণ ঢাকা নগরে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র "আমাদের ধর্ম্ম" এ বিষয়ে বহু জনাকীর্ণ সভায় একটী বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। যাহা বলা হইয়াছিল ঈশ্বরের কৃপায় তাহা দ্বারা কিছু সুফল হইয়াছে, সেই বক্তৃতায় বহু যুবক আমাদের ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন।

ঢাকায় নববিধানসমাজের উনবিংশ সাংবৎসরিক উৎসব বহুদিন ব্যাপিয়া হইয়াছে। তদুপলক্ষে গত ২৩শে ভাদ্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র "নববিধান ও পৃথিবীর ইতিহাস" বিষয়ে নববিধান মন্দিরে বক্তৃতা দান করিয়াছেন। মন্দির লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। ২৪শে ভাদ্র ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় New Gospel বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন ও তৎপর দিবস সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত আছে। তদনুরূপ কার্য্য হইয়া থাকিবে।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নববিধানের মূলতত্ত্ব সকল উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ সম্ভ্রান্ত মোসলমানদিগের মধ্যে উর্দ্দু ভাষায় প্রচার করিবার জন্য গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি রামপুর হাট ও ভগলপুরে বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কয়েক দিন অবস্থিত করিবেন। পরে ছাপরা, গোরকপুর, কাশী, এলাহাবাদ, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অদ্য রাত্রিতে সিমলা পাহাড়ে যাইবার জন্য যাত্রা করিবেন, তাঁহার ঠিকানা 'হিমালয় ব্রাহ্মসমাজ, সিমলা'।

গত বারের পত্রিকাতে শান্তিপুরের শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর প্রমাণিক মহাশয়ের 'মাতৃশ্রাদ্ধ' স্থানে ভুলক্রমে 'পিতৃশ্রাদ্ধ' লেখা হইয়াছিল। আমরা এইভুলের জন্য দুঃখিত হইয়াছি।

ধর্ম্মতত্ত্বর বৎসরের নয় মাস কাল হইয়া গেল অগ্রিম মূল্য-

প্রদাতা গ্রাহক মহোদয়গণের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। পূজার বন্ধের পূর্ব্বে আমাদের টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

গীতাভাষ্য সংস্কৃত ৫ম খণ্ডের ছাপা শেষ হইয়াছে, আর ৬। ৭ ফর্ম্মা হইলেই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। আমরা আশা করি গ্রাহকগণকে আগামী পূজার বন্ধের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ পুস্তক দিতে পারিব। বাঙ্গালা ৫ম খণ্ড যাহাতে ঐ বন্ধের পূর্ব্বে বাহির হয় তাহার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা যাইতেছে। গ্রাহকগণের নিকট অবশিষ্ট অগ্রিম মূল্য পাইবার প্রত্যাশা করিয়া আছি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক সকল এখন হইতে আমাদের প্রচারকার্য্যালয়ে বিক্রয় জন্য থাকিবে, ক্রেতৃগণ আমাদের নিকট তত্ত্ব করিলেই পুস্তক পাইতে পারিবেন। "সাইল্যাণ্ট প্যাস্টার" নামক একখানি ইংরাজি নূতন পুস্তক দুই তিন দিনের মধ্যেই বাহির হইবে, মূল্য ১॥০ মাত্র।

১১ ই ভাদ্র রবিবার বাঁকিপুরে প্রিয়তম ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ভাই দীননাথ মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। দয়াময়ী জননী স্বর্গগত আত্মাকে তাঁহার শ্রীচরণতলে চির শান্তিতে রক্ষা করুন।

ঢাকার উৎসবে ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া বন্ধুগণ যোগ দিয়াছেন।

হাজারীবাগের ব্রাহ্মবন্ধুগণ বেশ উৎসাহের সহিত ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার সন্ধ্যার সময় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী কলিকাতাস্থ ওভারটুন হলে ইংরাজী ভাষায় 'অদ্ভুত নাট্যাভিনেতা' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

Doings of God(ভগবানের লীলা) নামক একখানি ইংরাজী পুস্তক ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে, মূল্য ৷৷০ আট আনা। ডাকমাসুল স্বতন্ত্র দিতে হইবে। ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

ভাই অমৃতলাল বসু মধ্যে মানকর ও বৰ্দ্ধমানে নববিধানে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত অনেকটা তিনি ভাল বোধ করিতেছেন। তিনি এক্ষণে সেই কৈলোয়ারেই অবস্থান করিতেছেন।

আমাদের এক জন বন্ধু প্রশ্ন করিয়াছেন, মনুষ্যের অনুকুল প্রতিকূল সকল ঘটনাই ঈশ্বর প্রেরিত কিনা? মহর্ষি ঈশাকে যাহারা বধ করিয়াছিল তাহারা পাপী কি না? ঐ বধ ঘটনা মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক হইয়াছে কি না? এই একই কার্য্যের কর্ত্তা ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ে কি না? আমরা এরূপ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ অনেক কথা পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিয়াছি। পাঠকবর্গ এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবেন আমরা আশা করি।

ময়মনসিংহের নববিধান মন্দির।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাবু রজনীকান্ত বসু, জেলার ১০৲ বাবু কালীশঙ্কর গুহ, উকিল ৫৲ কুষ্টিয়ার ভূমাধিকারিগণ ৫৲ বাবু মহেন্দ্র নাথ রায়, (সবজজ) ৫৲ বাবু দুর্গাদাস বসু, (বাধিল) ২৲ বাবু রাধানাথ ঘোষ ও শশিভূষণ তালুকদার, (টাঙ্গাইল) ২৲ বাবু প্রসন্নকুমার গুহ, উকিল ২৲ বাবু নগরবাসী দে, মোক্তার ১৲ বাবু শশিকুমার ঘোষ, মোক্তার ১৲ বাবু জ্ঞানচন্দ্র গুহ, মোক্তার ১৲ বাবু গিরিশচন্দ্র গাঙ্গুলী, মোক্তার ১৲ বাবু রামসুন্দর সেন, ২৲ বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায়, ২৲ বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, উকিল ১৲ বাবু ব্রজগোপাল বসু, মোক্তার ২৲ বাবু তিনকড়ি বিশ্বাস, ২৲ বাবু চন্দ্রকুমার বসু, মোক্তার ৩৲ বাবু সারদাচরণ ঘোষ, গোঃ উকিল ২৲ বাবু শশাঙ্কমোহন দত্ত, উকিল ১৲ বাবু শ্রীকণ্ঠ সেন, উকিল ২৲ বাবু শশিভূষণ কর্ম্মকার, মোক্তার ১৲ বাবু গিরিশচন্দ্র সেন, ১৷৷/০ বাবু কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, ১৲ বাবু আশুতোষ দত্ত, ডিঃ মাঃ ৩৲ বাবু প্রসন্নকুমার সেন, (নায়েব জেলার) ১৲ বাবু ভুবনমোহন সেন, দ্বিতীয় শিক্ষক জেলাস্কুল ১৲ বাবু প্রাণনাথ বসু, পুঃ ইঃ ২৷০ বাবু রাসবিহারী সেন, (কোর্ট সব্ ইঃ) ১৲ বাবু শশিভূষণ বসু, পুঃ সব্ ইঃ ১৲ বাবু মহিমচন্দ্র রায়, ঐ ২৲ বাবু প্রসন্নচন্দ্র গুহ, ঐ ২৲ বাবু সূর্য্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ঐ ২৲ বাবু পার্ব্বতীচরণ গাঙ্গুলী, ঐ ২৲ বাবু হরলাল মুখোপাধ্যায়, ঐ ১৲ বাবু শ্রীনাথ গুহ, ঐ ১৲ বাবু কৃপানাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ ১৲ বাবু সীতানাথ সেন গুপ্ত, ঐ ১৲ বাবু পার্ব্বতীচরণ রায়, উকিল ১৲ বাবু সত্যকুমার চক্রবর্ত্তী, ২৲ মিউনি- পাঠশালা ১৲ বাবু চন্দ্রকুমার সেন, ।০ কোন ভদ্রলোক ৻১০ ক্ষুদ্র দান ।৵০ মন্দিরের রাবিশ বিক্রয় ৸০ পূর্ব্বের তহবিল ৬৲ দানাধার হইতে ১।/৫ ব্রাহ্মমহিলাগণ ২৷০।

ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা প্রকাশ করা অপ্রয়োজন বিধায় মোট ব্যয় মাত্র উপরে প্রকাশ করা গিয়াছে।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা আশ্বিন মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪৩ ভাগ।
১৮ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন, সোমবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ

প্রার্থনা।

হে শোকদুঃখনিবারণ শ্রীহরি, তুমি থাকিতে সংসারে শোক ও দুঃখের আধিক্য কেন? তুমি কি শোকদুঃখনিবারণে অসমর্থ? আমাদের কল্যাণের জন্য শোকদুঃখ, ইহা বলিলেও শোকদুঃখতো শোকদুঃখই রহিল। শোকদুঃখ থাকিতেও যদি শোকদুঃখ ভুলিয়া যাওয়া যায়, তন্মধ্যে গভীর শান্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিলাম যে, শোকদুঃখ কেবল শোকদুঃখের জন্য নহে, আমাদের শান্তি ও আশ্বস্ততা গভীর করিবার জন্য তাহারা নিযুক্ত। যদি ইহাই তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে কে আর তজ্জন্য তোমার প্রতি দোষারোপ করিবে? যাহা তোমার অভিপ্রেত, তাহা সিদ্ধ হইবার পক্ষে আয়োজন তুমিই করিয়া রাখিয়াছ। যদি আমরা কেবল তোমার নির্দ্দেশমত চলি, তাহা হইলেই সে আয়োজন আমাদের হস্তগত হয়। বাহিরের রোগ শোক বিপদ্ পরীক্ষা অনেক। সে সকল বাহিরেরই বিষয় অন্তরের তো নয়! অন্তরকে যদি সে সকল হইতে বিযুক্ত রাখিতে পারি, তাহা হইলে মনে হয় তাহারা আর আমাদিগকে নিপীড়ন করিতে পারে না। বাহিরের বিষয়গুলিকে অন্তরের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা কি সহজ? সেগুলি যখন আমাদের বোধের বিষয়, তখনইতো তাহারা আমাদের অন্তরের সহিত অবিচ্ছেদযোগে বদ্ধ। যদি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থাকে, আর সেখানে এগুলি প্রবেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে স্থানে যে শান্তির গভীর আয়োজন আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাস্তবিকই তুমি আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে শান্তিনিলয় করিয়া রাখিয়াছ, সেখানে গেলে আর পৃথিবীর কিছুই সেথায় প্রবেশ করিতে পারে না। গভীর শোকদুঃখের ভিতরেও সেখানে গেলে শোকদুঃখ শান্তিসলিলে নিমগ্ন হয়, কেবল নিমগ্ন হয় তাহা নহে গভীর শান্তি উপস্থিত হয়। ইহা তো আর অনুমানের কথা নয়, ইহা যে আমরা জীবনে অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমন আরামের স্থান যখন আমাদের প্রতিজনের সঙ্গে রহিয়াছে, তখন কি প্রকারে বলিব, শোকদুঃখের দ্বারা নিপীড়ন করিয়া আমাদিগকে ভাল করিবে, এই তোমার অভিপ্রায়। শোকদুঃখে কল্যাণ হয়, ইহা দূরবর্ত্তী ফল, কিন্তু শোকদুঃখের সময়ে অন্তরের অন্তরতম দেশে প্রবেশ করিলে গভীর

শান্তিলাভ হয়, ইহাতো নগদলাভ। হে কৃপানিধান পরমেশ্বর, যখন তুমি জীবগণের প্রতি কৃপা করিয়া এমন একটি আরামের স্থান প্রতিজনের অন্তরে রাখিয়াছ, তখন আমরা নিজ আলস্যে বা অপরাধে যদি সেখানে না যাই আর দুঃখ ক্লেশ ভোগ করি, তাহাতে তোমায় নিন্দা করিবার কি কারণ আছে? তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সেই গৃহে যখন তখন প্রবেশ করিতে পারি, এবং সেখানকার শান্তিসলিলে মগ্ন হইয়া দুঃখক্লেশের অবসান করি। তব কৃপায় এ বিষয়ে আমরা সিদ্ধমনোরথ হইব, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

ঈশ্বরে মানবভাবের আরোপ কি প্রয়োজন?

ধর্ম্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে ঈশ্বর অজ্ঞেয় না হউন, সকলসম্বন্ধবিবর্জ্জিত না হউন, মানব হইতে সকল বিষয়ে তাঁহার এত ভিন্নতা যে মানুষে মানুষে যে প্রকার মধুর সম্বন্ধ ঘটিতে পারে, তাঁহার সঙ্গে কোন মানুষের সে প্রকার সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। তিনি সৃষ্টি করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছেন, এ মতে ইঁহারা সায় না দিতে পারেন, কিন্তু ফলে সেইরূপই দাঁড়ায়, কেন না তাঁহার কার্য্য সমুদায় স্থিরতর নিয়মে বদ্ধ, কাহার কি হইল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত নাই, আপনার দৃঢ় ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, তাহাতে যাহার যাহা হউক তাহাতে তাঁহার কিছু আসে যায় না। এ বিভাগের ঈশ্বর অবিকারী, অনড়, অচঞ্চল। সহস্র লোক মরিয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, আপনার মতে কাজ করিয়া যাওয়াই তাঁহার প্রকৃতি। অপর বিভাগের ব্যক্তিগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিপরীত দিকে ধাবিত। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর আমাদিগের পিতা, মাতা, বন্ধু। তিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে লইয়াই আছেন। যাহা কিছু তিনি করিয়াছেন করিতেছেন, তাহা আমাদিগেরই জন্ত। আমাদের সুখে তিনি সুখী, আমাদের দুঃখে তিনি দুঃখী, তাঁহার মত ব্যথার ব্যথী আর কেহ নাই। আমাদের দুঃখ দূর করিয়া আমাদিগকে সুখী কি প্রকারে করিবেন ক্রমান্বয়ে তাহারই উপায় করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত রহিয়াছেন। যেখানে আমরা থাকি, সেখানে তিনি থাকেন, যেখানে আমরা যাই সেখানে তিনি আমাদের সঙ্গে যান। এক জন মানুষ আর এক জন মানুষকে অতিশয় ভাল বাসিলে যে প্রকার ব্যবহার হয়, ঈশ্বরের ব্যবহার ঠিক সেই প্রকার।

ধর্ম্মসমাজের এই দুই বিভাগে চিরকাল বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, আজ পর্য্যন্ত এ দুইয়ের মিলন হয় নাই, মিলন যে হইবে, তৎসম্বন্ধে অনেকের আশাও নিতান্ত ক্ষীণ। এক দল অপর দলকে অন্ধ, জ্ঞানহীন, মূর্খ, ভাবুক বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, আর একদল শুষ্ক, কঠোর, হৃদয়বিহীন, বৌদ্ধ বলিয়া তাঁহাদিগকে আসুরিক ভাবাপন্ন মনে করিতেছেন। এ দুই দলের মিলনের স্থান কোথায় কেহ দেখিতে পাইতেছেন না। ধর্ম্মসমাজের সকল বিরোধ ভঞ্জন করিবেন এই জন্য নববিধান আসিয়াছেন। তিনি কি এই দুইদলের বিরোধ ঘুচাইতে পারেন না? ঈশ্বরের ইচ্ছা অতি সুদৃঢ়, কোন কারণে সে ইচ্ছার তিনি একটুও এদিক্ ওদিক্ করেন না, এ কথা মানিলে কি আর ইহা মানিতে পারা যায় না যে, তাঁহার দৃষ্টি আমাদের উপরে স্থাপিত, আমাদিগের জন্যই তিনি সকল করিতেছেন, কিসে আমাদের সুখ হয় তাহারই জন্য তাঁহার সকল উদ্যম। ঈশ্বরকে পূর্ণ অবিকারী রাখিয়া এ দুই মতের সামঞ্জস্য কি হইতে পারে না? মানুষের মত কেন বিমতি হউক না, কোন একটি সত্য মূলে না রাখিয়া কোন মত দৃঢ়তার সহিত তাহারা ধারণ করিয়া থাকিতে পারে না। দুই বিপরীত মতবাদী ক্রমান্বয়ে বিরোধে প্রবৃত্ত। এদলের লোক ওদলে যাইতেছে, ওদলের লোক এদলে আসিতেছে, কোন দলকে কোন দল উৎসন্ন

করিতে পারিতেছে না, ইহাতে কি এই বুঝায় না যে, দুই দলেরই মূলে এমন কিছু আছে যাহা শত আন্দোলনেও চূর্ণ হইবার নহে।

এখন কথা এই, ঈশ্বরের দৃঢ় ইচ্ছা তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব প্রকাশ করে। চারিদিকে পরিবর্ত্তনের মধ্যে একমাত্র তিনি যদি অপরিবর্ত্তনীয় না থাকেন, পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যদি পরিবর্ত্তিত হইয়া যান, তাহা হইলে জগৎ মূলশূন্য হইয়া অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কেবল মূলশূন্য হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে কেন বলিতেছি, নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় মূল বিনা পরিবর্ত্তনশীল জগতের উৎপত্তিই সম্ভবে না। পরিবর্ত্তনমাত্রেই পরিবর্ত্তনের কারণকে দেখাইয়া দেয়। পরিবর্ত্তনশীল কারণের কারণ নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন হয়, সুতরাং কারণের কারণ কারণের কারণ এইরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া শেষে এমন এক কারণে গিয়া চিন্তাকে বিশ্রাম দিতে হইবে, যাঁহার কোন কারণ নাই, নিত্য অপরিবর্ত্তনীয়। এই অপরিবর্ত্তনীয় কারণ দৃঢ় ইচ্ছা নামে পরিচিত। অতএব আমাদিগকে মানিতে হইতেছে, যিনি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় নন, অন্য কথায় যাঁহার ইচ্ছা দৃঢ় নয়, তিনি কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না। দৃঢ় ইচ্ছা হইলেই যে, শুষ্ক নীরস ঈশ্বর মানিতে হইবে, ইহার কোন কারণ নাই, বরং দৃঢ় ইচ্ছা না থাকিলেই ঈশ্বর শুষ্ক ও নীরস হইবেন, ইহাই সত্য। যাঁহাতে পরিবর্ত্তন আছে, তাঁহার কখন সরসতা কখন নীরসতা অবশ্যম্ভাবী। যদি চিরসরসতা চাও, তবে তাঁহাকে নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া স্বীকার কর।

যদি বল ইচ্ছার আবার সরসতা কি? ইচ্ছা যে কেবলমাত্র ক্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীলতার মধ্যে সরসতা নাই কে বলিল? ক্রিয়া যদি কল্যাণের জন্য হয়, তাহা হইলে কি তুমি উহাকে কখন নীরস বলিয়া গ্রহণ করিতে পার? এক জনের কার্য্যে যদি তোমার ক্রমান্বয়ে কল্যাণ হইতে থাকে, সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে তাঁহার কার্য্যের প্রতি কি তুমি উদাসীন নয়নে উপেক্ষার নয়নে দেখিতে পার? তুমি স্বতই বলিবে, ইঁহার আমার প্রতি ভালবাসা আছে, তাই ইনি আমার সম্বন্ধে এমন ভাবে কার্য্য করিতেছেন, যাহাতে আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও কল্যাণ হইতেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছার ক্রিয়াতে যদি তুমি নিয়ত সেইরূপ প্রত্যক্ষ কর, তাহা হইলে সে ইচ্ছাকে সরস কল্যাণময়ী ভিন্ন তুমি আর কি নাম দেবে, বল দেখি? আর একটু অগ্রসর হইলে তোমার নিকটে সেই ইচ্ছা প্রেম নামে পরিচিত হইবে। যিনি নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় তাঁহাতে প্রেম সম্ভবে কি প্রকারে? যেখানে প্রেম আছে সেখানে পরিবর্ত্তন আছে। যাহাকে ভালবাসি তাহার জন্য কত সময়ে অশ্রুপাত করি। যেখানে প্রেমাস্পদের নিমিত্ত অশ্রুপাত নাই, সেখানে প্রেমও নাই। সুতরাং ঈশ্বরের দৃঢ় ইচ্ছাকে প্রেম বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রেম থাকিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন থাকিবে, ইহা তোমার নিতান্ত ভুল। প্রেমে যদি নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইলে প্রেম শীঘ্রই অপ্রেমে পরিণত হইবে। বাহিরে তুমি যে প্রেমিকের অশ্রুপাত দেখ, তাহাতে প্রেমে পরিবর্ত্তন ঘটিল তুমি কেন মনে করিতেছ? ভিতরে প্রেম অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়া বাহিরে দেহে অশ্রুপাতাদিরূপ বিকার উপস্থিত করিল, ইহাতে প্রেম বিকারগ্রস্ত হইল কোথায়? মানুষের প্রেম প্রেমাস্পদের সম্বন্ধে যাহা অভিলাষ করে তাহা করিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া অশ্রুপাত করে, তুমি তোমার ঈশ্বরকেও কি সেই শ্রেণীতে ফেলিতে চাও? তবে তিনি অশক্ত। যদি অশক্ত হন, তবে তিনি ঈশ্বর কিসে? যত পরিবর্ত্তন তোমাতে, ঈশ্বরেতে একটুও পরিবর্ত্তন নাই। তোমার আপনাতে যে ক্রমিক পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া ঈশ্বরেতে পরিবর্ত্তন আরোপ করিতেছ, ইহাই কি সত্য কথা নয়? নিজের পরিবর্ত্তনে অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু পরিবর্ত্তিত বলিয়া মনে হয়, ইহা কি তুমি নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছ না? দূর হইতে

অতি উচ্চশৃঙ্গ গিরি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়, যত তাহার নিকটবর্ত্তী হও, তত তাহার উচ্চতা বুঝিতে পার। উচ্চশৃঙ্গ গিরি উচ্চই ছিল, কোন কালে ক্ষুদ্র হয় নাই, ক্ষুদ্রবোধ হওয়া তোমারই স্থিতির দূরত্ববশতঃ। ঈশ্বর যেমন তেমনই আছেন, চির দিন তেমনই থাকিবেন। তুমি তাঁহা হইতে যত দূরে থাকিবে, তাঁহাকে তুমি তত অন্য প্রকার দেখিবে। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে থাক, তিনি আর তোমার নিকটে পূর্ব্বের মত প্রতীত হইবেন না, ইহাতে পরিবর্ত্তন তোমাতে হইল, না তাঁহাতে হইল? তাঁহার ইচ্ছা ক্রমান্বয়ে তোমার কল্যাণই করিয়া যাইতেছে, তুমি ঈশ্বর হইতে আপনার দূরত্ব বশতঃ কল্যাণকে অকল্যাণ মনে করিতেছ, ইহাতে ঈশ্বরেতে পরিবর্ত্তন ঘটিল কৈ?

তুমি বলিবে, মানুষের বিবিধ প্রকারের ব্যবহার-বশতঃ তাহার সহিত আমাদের একটা সুমিষ্ট সম্বন্ধ দাঁড়ায়, ঈশ্বরেতে যদি ক্রমান্বয়ে একই প্রকারের ব্যবহার থাকিয়া যায়, তবে তাঁহার সঙ্গে সুমিষ্ট সম্বন্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা কোথায়? তোমার প্রতি কোন এক ব্যক্তির বিবিধ প্রকারের ব্যবহার যদি সুমিষ্ট প্রতীত হয়, তাহা হইলে তাহার মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় প্রেম আছে, ইহা কি তুমি বোঝ না? তোমার অবস্থার বিবিধ পরিবর্ত্তন আছে, তাই সেই প্রেম স্বয়ং অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া তোমায় যিনি ভালবাসেন তাঁহাকে তোমার অবস্থানুরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত করে, তাই সে ব্যক্তির ব্যবহার বিবিধ প্রকারের হয়। যে মানুষ তোমায় ভালবাসেন তিনি ক্ষুদ্রদেহধারী, সামান্য আয়োজন লইয়া তোমার সঙ্গে ব্যবহার করেন, এজন্যই তোমার ক্ষুদ্র চক্ষুর নিকটে তাঁহার ব্যবহার প্রকাশ পায়। ঈশ্বর দেহধারী নন, আয়োজনও তাঁহার প্রভূত। সমুদায় প্রকৃতিকে যে তিনি তোমার কল্যাণের জন্য বিবিধ পরিবর্ত্তনের অধীন করিতেছেন তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ না বলিয়া তোমার মনে হইতেছে, তোমার প্রতি তাঁহার প্রেমের ব্যবহার কোথায়? তোমার নিজের এই ক্ষুদ্র দৃষ্টি যদি ঈশ্বরের ব্যবহার দেখিবার পক্ষে তোমার প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরেতে প্রেম নাই, প্রেমের ব্যবহার নাই, একথা বলাতে কি তোমার নিজের মোহ প্রকাশ পাইতেছে না? তাঁহার প্রেমের ব্যবহার দেখিবার জন্য ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র মানবের মত করিয়া না লইয়া তোমার দৃষ্টি প্রশস্ত কর, অন্তশ্চক্ষুকে উজ্জ্বল কর, বিস্তৃত আয়োজন মধ্যে যখন তাঁহার যে ব্যবহার প্রকাশ পায়, দেখিয়া মোহিত হও, দেখিবে ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব এবং প্রেমের বিবিধ ব্যবহার কেমন সমঞ্জস ভাবে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে।

একটি চিন্তাও নষ্ট হয় না।

হৃদয়ে কত চিন্তা উঠিতেছে, কত চিন্তা চলিয়া যাইতেছে, মানব তাহার সংবাদও লয় না। যখন সে চিন্তা করিব বলিয়া চিন্তা করে, সে চিন্তাও স্থায়ী হয় না, অন্য চিন্তা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে, পূর্ব্ব চিন্তা বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া যায়। সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে, এক তরঙ্গ অন্য তরঙ্গকে গ্রাস করিতেছে, পূর্ব্ব তরঙ্গের কোন চিহ্নমাত্রও থাকিতেছে না। প্রকৃতির রাজ্যে যে প্রকার নিয়ত পরিবর্ত্তন, চিন্তার রাজ্যেও সেই প্রকার পরিবর্ত্তন, দুয়েরই সাম্য আছে। তবে কি এই প্রভেদ মানিয়া লইব যে, প্রকৃতির প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সার্থকতা আছে, তাহা হইতে নূতন কিছু হয়, কোন পরিবর্ত্তন বিফলে যায় না, চিন্তা রাজ্যে সে প্রকার নহে। প্রকৃতি সাকার, সাকারই রূপান্তর পরিগ্রহ করে, নিরাকার চিন্তা শূন্যের মত, সুতরাং তাহা হইতে শূন্য বৈ আর কি হইবে? চিন্তা উঠিল, শূন্যে মিশিয়া গেল, তাহাকে তুমি ধরিয়া রাখিবে কি প্রকারে? যে রাজ্যে একটি সামান্য নিশ্বাস বিনাশ পায় না, সে রাজ্যে চিন্তাগুলি বিফল হইয়া যায়, এ কথায় কি প্রকারে বিশ্বাস করিব? প্রভূত শারিরীক উপাদান নষ্ট করিয়া এক একটি চিন্তা উদিত হয়,

সেই চিন্তা নষ্ট হইয়া যায় এ কেমন ব্যবস্থা? সামান্ত একটু আন্দোলন প্রকৃতিতে কত পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে, এত ব্যয়ে যে চিন্তার অভ্যুদয় হয়, তাহার কি কিছুই করিবার নাই?

আমরা বলি একটি চিন্তাও বিনষ্ট হয় না। বড় বড় চিন্তা বড় বড় কাজ করে; নগর, পত্তন, সৌধ, বর্ত্ম, যান প্রভৃতি বাহিরে কত আকার ধারণ করে; সেগুলি রূপান্তর ধারণ করিল বটে কিন্তু বিনষ্ট হইল না। এক জনের চিন্তার ফল শত শত লোকে ভোগ করিতেছে, সে চিন্তা যদি মানবহৃদয়ে উদিত না হইত, আজ মানবসমাজের কি দুর্গতি হইত, উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া থাকিত। আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের চিন্তার ফল ভোগ করিতেছি, নিতান্ত অকৃতজ্ঞ না হইলে আর আমরা ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। চিন্তা কিছুই নয় তুমি আমি মূঢ়ের ন্যায় মনে করিতে পারি, কিন্তু জনসমাজ, মনুষ্যপরিবার, প্রত্যেক নরনারী চিন্তার অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। প্রতিদিন জনসমাজে যে সুখ ও সুবিধা, শক্তি ও সামর্থ্য বাড়িতেছে, কত নূতন আবিষ্কার হইতেছে, বিদ্যাভাণ্ডার উপচিতকলেবর হইতেছে, সে সকলের মূলে এই চিন্তা। এতো গেল বাহিরের কথা, তুমি নিজে কি, ভাবিয়া দেখ। তুমি চিন্তাময়, চিন্তা তোমার আকার প্রকার, চিন্তা তোমার উপাদান, তোমার উন্নতি অবনতি চিন্তানুসারে, চিন্তায় তোমার চরিত্র গঠিত, কোন একটী চিন্তা তোমায় পরিবর্ত্তন না করিয়া বিফলে যায় না। চিন্তার ক্রিয়ার প্রতি তোমার বড়ই অমনোযোগ, যাহা তাহা একটা চিন্তা করিতে তোমার মনে ভয় হয় না, ইহাতে বুঝা যায়, এখনও তুমি কত অবোধ।

তুমি বাহিরের কত কি দেখিতেছ, শুনিতেছ, কত বিষয় লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছ, কিন্তু তোমার মনের চিন্তার সংবাদ তুমি একবারও লও না। বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যত চিন্তা করিয়াছ, তুমি সেই সকলেতে গঠিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব চিন্তার সঙ্গে পর পর চিন্তার যোগ রহিয়াছে। ভূতকালের চিন্তা, বর্ত্তমানের চিন্তা, ভবিষ্যতের চিন্তা, পরস্পর একসূত্রে গাঁথা রহিয়াছে। তুমি যদি আত্মজীবন পাঠ কর, অবাক্ হইবে আর বলিবে, এ কি! বাল্যকালের চিন্তা যৌবনে ফল দান করিয়াছে, যৌবনের চিন্তা বার্দ্ধক্যে কার্য্য করিতেছে, বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্তের একটী চিন্তাও বিফলে যায় নাই। আমরা তো চিন্তা করিয়া ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এক জন ভোলেন নাই; তিনি সেই চিন্তাগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়াছেন, যেখানে যিটি তোমার জীবনে সন্নিবিষ্টকরিতে হয়, তাহা করিয়াছেন, এবং সেই চিন্তাগুলির সফলতার জন্য যে যে আয়োজন করিতে হয়, সেগুলি আপনি করিয়াছেন। বাহিরের রাজ্যে ভগবানের বিচিত্র লীলা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছ, অন্তরের জগতে আজও প্রবেশ কর নাই। যখন সেখানকার ভগবল্লীলা দেখিবে, তখন তোমার আত্মসম্বন্ধে সমুদায় সংশয় ঘুচিয়া যাইবে, তুমি যে তাঁহার কত আদরের সামগ্রী বুঝিতে পারিবে, তোমার কল্যাণের জন্য তিনি গোপনে গোপনে কি করিতেছেন, দেখিয়া অবাক্ হইবে। তোমার একটী একটী চিন্তার সাফল্য জন্য তিনি পৃথিবীর দূরদূরতম বিভাগে তাহার জন্য আয়োজন করিয়াছেন। যখন সেই সেই পৃথিবীর বিভাগ হইতে সেই সকল আয়োজন আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তুমি বলিবে, হে পিতঃ, আমার প্রতি এত যত্ন কেন? এত দিন ধরিয়া এত আয়োজন আমার জন্য করিয়াছ কি আশ্চর্য্য!

একটী চিন্তাও নষ্ট হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ করিলে আত্মার অমরত্ব বিষয়ে আর কিছু সন্দেহ থাকে না, চিন্তার অবিনশ্বরত্ব আত্মার অবিনশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেয়। যখন আমরা দেখি আমাদের এক একটী চিন্তার সফলতা দান জন্য ভগবান্ পৃথিবীর দূরতম বিভাগে তদুপযোগী আয়োজন করিয়াছেন, তখন সহজে বুঝিতে পারি, যে সকল চিন্তা ইহ জীবনে পূর্ণ পরিমাণে সাফল্য লাভ করিতেছে না, তাহার সফলতার আয়োজন অদৃশ্য জগতে

হইতেছে। ভগবান্ শরীরের জন্য অন্ন বস্ত্রাদির আয়োজন করিতেছেন, বহু দেশ হইতে বহু উপাদানের তজ্জন্য সংগ্রহ হইতেছে, ইহা দেখিলে তাঁহার করুণা কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হয় বটে,কিন্তু নিত্য-কাল স্থায়ী আত্মার জন্য তিনি যে সকল আয়োজন করিতেছেন, তাহা দেখিলে আমরা যে নিত্যকালের জীব, আমাদের প্রতি তাঁহার নিত্যকালের যত্ন, এবিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। এই রূপে আত্মসম্বন্ধে এবং পরমাত্মসম্বন্ধে নিঃসংশয় জ্ঞানলাভ চিন্তার স্থায়িত্বদর্শনের উপর নির্ভর করে। এসম্বন্ধে অবহেলা সাধকজীবনের পক্ষে কদাপি কল্যাণকর নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। আমি দেখিতেছি, তুমি এবার তোমার প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য বিলক্ষণ যত্ন করিতেছ। বল ভূতকালে কয় জন তোমার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল। সাধারণ লোকে না তোমায় চেনে, না আমায়ও ভাল করিয়া আদর করে। তাহারা অন্ধের ন্যায় প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কার্য্য করিয়া থাকে। বিদ্বান্ লোকদের মধ্যে আমার আদর ভারি, কিন্তু তারাওতো তোমায় আদর করে না। এরূপ অবস্থায় বল তোমার প্রভুত্ব স্থাপনের যত্ন কেমন করিয়া সিদ্ধ হইবে?

বিবেক। আমি আমার প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য যত্ন করিতেছি, আজ তুমি এ কথা মুখে তুলিলে কেন? এ কথাতো সত্য হইল না। আমি কে? আমার আবার প্রভুত্ব কি? যিনি সকলের প্রভু সকলের স্বামী তাঁহারই প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, তজ্জন্য কে আমার যত্ন নয়? আমি যদি সেই প্রভু হইতে স্বতন্ত্র হইতাম তাহা হইলে তুমি যাহা বলিলে তাহা শোভা পাইত। যা তিনি বলেন, আমি তাই বলি; আমি বলি না, তিনিই বলেন, এ কথা বলিলেই ঠিক সত্য বলা হয়। আমি নরনারীর হৃদয়ে অবতীর্ণ ব্রহ্মবাণী, আমি তাঁহাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ বলিয়াই তাঁহারা ঈশ্বরের পুত্র কন্যা। পুত্রকন্যাভিন্ন কে আর পিতার গৃহের গোপনীয় তত্ত্ব সকল জানে। সাধারণ লোকে প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কাজ করে সত্য, তাহাদের ভিতর তোমার আদর নাই আমি ইহা জানি, কিন্তু তাহারা যে আমায় সর্ব্বথা উপেক্ষা করে ইহা তুমি বলিতে পার না। তাহারা যে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল পশুর ন্যায় হইতে পারে না, তাহার কারণ আমি। আজ পৃথিবীতে ভয়ানক অরাজকতা হইত, যদি সাধারণ লোকের উপরে আমার কর্তৃত্ব না থাকিত। সাধারণ লোকে আমি কর্তৃত্ব করিতেছি বুঝিতে পারে না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা সকল সময়ে আমার শাসন অতিক্রম করে, ইহা কি তুমি বলিতে পার?

বুদ্ধি। না,ইহা বলিতে পারি না, কেন না তাহাদেরও ভিতরে দুই প্রবৃত্তির সংগ্রাম উপস্থিত হয়, ভাল আর মন্দের। সকল সময়ে মন্দের জয় হয় তাহা নহে, ভালোরই জয় হয়।

বিবেক। ব্রহ্ম ভিন্ন কি ভাল আছে? ভাল যা তা ব্রহ্ম। ভাল ও মন্দের সংগ্রাম দেবতা ও মানুষের মধ্যে সংগ্রাম, ইহাতো তুমি বোঝ। বল, ভাল মন্দের সংগ্রাম কোথায় নাই? যেখানে সংগ্রাম চলিতেছে সেখানে আমি রহিয়াছি, তাহাতে কি তোমার সংশয় আছে?

বুদ্ধি। দেখ, যে স্থলে বিচার উপস্থিত হয়, সেখানেও দুই বিপরীত পক্ষের বিতর্ক ঘটে। সেই বিতর্কের মধ্যে আমার কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে দুই প্রবৃত্তির সংগ্রামে যে প্রকার রক্তারক্তি উপস্থিত হয় সেরূপ নহে। তুমি যেখানে সেখানে রক্তারক্তি, আমি যেখানে সেখানে প্রশান্ত ভাব, এ কথা কি সত্য নয়?

বিবেক। যেখানে জীবনমরণের ব্যাপার সেখানে রক্তারক্তি হইবে না তো আর কি হইবে? বিচার, বিতর্ক, মতামত এ সকল অনেক সময়ে জীবনের বাহিরের ব্যাপার।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

পূর্ণধর্ম্মসাধনে উপায়।

২৭ পৌষ, রবিবার, ১৮১৮ শক।

আমাদের নিকটে ঘোরতর প্রহেলিকা উপস্থিত। পূর্ণধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ। আমরা সকলেই সাধারণ লোক, বিশেষতঃ অপূর্ণ মানুষ পূর্ণধর্ম্ম সাধন করিবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মের যত ভাব অবতরণ করিতেছে, সে সমুদায়ের একত্র গ্রহণ কোথাও হয় নাই। ধর্ম্ম বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন মানবে স্থিতি করিতেছে, এ সমুদায়ের একত্র একাধারে সংগ্রহ কি সম্ভবে? এই বিভিন্নাকার গুলিকে কেবল একত্র সংগ্রহ করিলেই চলিবে না, ইহাদের এমনি ভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়া চাই যে, ভবিষ্যতের সকল উন্নতির পথ একেবারে খুলিয়া যায়। কি উপায়ে এই মহাব্যাপার জীবনে সিদ্ধ হইবে, ইহা গভীর প্রশ্ন। সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ, সে সকল হইতে সার সত্য সঙ্কলন, সমুদায় ধর্ম্মজীবন হইতে উচ্চ ধর্ম্মভাবসমূহসংগ্রহ, এই সকল উপায়ে যদি আমরা পূর্ণধর্ম্ম সাধন করিতে যাই, তাহা হইলে এক জীবনে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না,এবং এরূপে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন সত্য ও ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমাদের নিকটে প্রকাশ পাইবে, তাহাদিগকে এক করিয়া জীবনে সন্নিবিষ্ট করা নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

পূর্ণধর্ম্ম যখন সাধন করিতে হইবে, তখন কি উপায়ে উহা হইতে পারে তাহাই দেখা প্রয়োজন।

শাস্ত্রালোচনা ও সাধুগণের ভাব সংগ্রহ করিয়া পূর্ণধর্ম্ম সাধন করা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বরূপবিশেষ আশ্রয় করিয়া উহা সিদ্ধ হইতে পারে কি না দেখা প্রয়োজন। যোগিগণ যোগে ঈশ্বরের স্বরূপ আশ্রয় করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ সত্তাতে চিত্ত স্থাপন ইহা সকল যোগীর সাধারণ পন্থা। কেবল সত্তা ধারণের সঙ্গে সঙ্গে চিৎস্বরূপ তাঁহাদিগের নিকটে প্রতিভাত হয়। চিন্ময় সত্তা ধারণ করিয়া অনেক যোগী পরিতৃপ্ত হইয়া আর অগ্রসর হন নাই, সেই ধারণাতেই জীবন শেষ করিয়াছেন। এইরূপে জ্ঞানস্বরূপে সমগ্র জীবন ক্ষয় করিয়া ধর্ম্মের পূর্ণতা হইতে পারে কি না দেখা প্রয়োজন। জ্ঞানস্বরূপে চিত্ত ধারণ করিয়া সকল অন্ধকার সংশয় নিবৃত্ত হয়, হৃদয়ে সত্য অবতরণ করে, ইহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু সংশয় গিয়া সত্য অবতরণ করিলেই কি পূর্ণতা হইল, বা পূর্ণতালাভের পথ খুলিয়া গেল? জ্ঞানস্বরূপে যে সত্য অবতরণ করে, তাহাতে অনন্তজ্ঞানব্যতীত আর সমুদায়ের অসত্যত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। বুদ্ধি যখন অনন্তজ্ঞান প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহার নিকটে সেই অনন্তজ্ঞানই প্রতীত হইল আর সমুদায় মিথ্যা হইয়া উড়িয়া গেল। জ্ঞানই একমাত্র সত্য, জ্ঞানাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, যাহা কিছু জ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়া মনে হয় উহা মিথ্যা, ইহাতে যদি পূর্ণধর্ম্ম প্রাপ্তি হইত তাহা হইলে সমুদায় পৃথিবী বৌদ্ধ হইয়া যাইত, জ্ঞানাতিরিক্ত অন্য স্বরূপের দিকে মানবের মন ধাবিত হইত না। ধাবিত হয় না বলিয়াই জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর জগতে ও জীবে কি প্রকার লীলা করিতেছেন, তাহা দেখিবার জন্য সাধকগণের চিত্ত ব্যাকুল হইল।

জগৎ ও জীবে লীলা দেখিতে গিয়া ঈশ্বরের প্রেমের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইল। এই আকর্ষণে ভক্তগণ ঈশ্বরের জন্য সংসারের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিখারী হইলেন। ঈশ্বরেতে তাঁহাদের অনুরাগ যত বাড়িতে লাগিল, তত বিষয়ের প্রতি তাঁহাদের বিরাগ বাড়িল। শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া বৃদ্ধা জননী, প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ তাঁহার দেহ ও মনকে অধিকার করিল। ঈশ্বর তাঁহার মন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তিনি আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলেন না। কম্প, অশ্রু, পুলক, মূর্চ্ছা কত প্রকার প্রেমের বিকার তাঁহার সুন্দর তনুতে প্রকাশ পাইল। তাঁহার মন ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর, তিনি তাঁহাকে ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না, আর কিছুই অন্বেষণ করেন নাই। এক ঈশ্বরপ্রেমে তিনি কৃতকৃত্য হইলেন, শত শত লোক ঈশ্বরপ্রেমে কত প্রমত্ততা প্রকাশ করিলেন। জ্ঞানস্বরূপে যদি ধর্ম্মের পূর্ণতা না হইয়া থাকে, প্রেমস্বরূপে ধর্ম্মের পূর্ণতা উপস্থিত হয়, ইহা তো সকল লোকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আপনার স্বার্থত্যাগ না করিলে যখন প্রেমের প্রকাশ হয় না, তখন স্বার্থঘটিত বিকার প্রেমিকে কি কখন সম্ভবপর? প্রেমেতে প্রেমিকের সম্ভোগ আছে, যেখানে সম্ভোগ নাই, সেখানে প্রেমের প্রকাশ কখন অনুভূত হয় না। চৈতন্য ঈশ্বর-প্রেমে পাগল হইলেন কেন? ঈশ্বরের প্রেম-সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্ত হরণ করিয়াছিল, সেই সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি বিনা আর কিছুতেই তাঁহার মনের তৃপ্তি হইত না। যখনই সেই সুন্দর মূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইতেন না, তখনই এত অধীর হইতেন যে, তিনি আর আপনাতে আপনি থাকিতেন না। ঈশ্বরবিয়োগদুঃখে তিনি তনুত্যাগ করিলেন, প্রেমের আঘাত তিনি বহন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ প্রেমের ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, ঈশ্বরনামশ্রবণে কম্প, অশ্রু, পুলক, হাস্য, ক্রন্দন, নৃত্য, এ সকল আজও তাঁহার সম্প্রদায়ে আছে। এ সকল অদ্ভুত প্রেমের বিকাশ আমরা কোনরূপে উপহাসের বিষয় করিতে পারি না। এ সকল যে নিতান্ত অমূল্য সামগ্রী ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এ সকল থাকিয়াও জীবনে শুদ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায় না, শুদ্ধতা নাই জন্য ভক্তির সঙ্গে ঈশ্বরদর্শন ঈশ্বরের সহবাসসম্ভোগ শ্রীচৈতন্যের শিষ্যগণের মধ্য হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কেবল প্রেমস্বরূপে চিত্ত স্থাপন করিয়া প্রেমদর্শন করিয়া পূর্ণধর্ম্ম লাভ হইবে, এরূপ আশাই বা আমরা হৃদয়ে পোষণ করিব কি প্রকারে?

প্রেম অতি সুকোমল সামগ্রী, উহা কঠিন আচ্ছাদন বিনা অবিকৃত থাকিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। পাপতাপ প্রেম কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না, উহার সংস্পর্শে প্রেম শীঘ্রই অন্তর্হিত হইয়া যায়, যাহা কিছু অবশেষ থাকে তাহা প্রেমের আভাস মাত্র, বস্তুতঃ প্রেম নহে। পবিত্রতার ভূমির উপরে প্রেম স্থাপিত না হইলে প্রেম কখন স্থায়ী হয় না। প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর যখন ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া প্রথমে সাক্ষাৎকার দান করেন, তখন এই কথা বলিয়া দেন, বাসনা প্রবৃত্তি সকলের কলুষিত ভাব দূর না হইলে আর আমার সাক্ষাৎকার পাইবে না। হৃদয় মন প্রাণ পবিত্র না হইলে, মনে বাসনাবিকার থাকিলে প্রেমস্বরূপের সহবাস সম্ভোগ কখন সম্ভবপর নহে, হৃদয়ে প্রেমেরও কখন স্থিরতা হয় না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ঈশ্বরের প্রেম আমাদিগের হৃদয়কে স্পর্শ করিল, কিন্তু মলিন হৃদয়ে সে সংস্পর্শ স্থায়ী হইবে কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুবর্ত্তন করিয়া যদি আমাদের বাসনাবিকার অবরুদ্ধ না করি, প্রেমস্বরূপের স্মরণ মনন চিন্তনে আমাদের চিত্তের যে কোমলতা উপস্থিত হইবে তাহাই আমাদিগকে আপদে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবে। প্রেমজনিত কোমল হৃদয় পরের প্রতি আকৃষ্ট, পরদুঃখে কাতর হয়, পরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু অনেক সময়ে অপাত্রে প্রেম প্রকাশ করিতে গিয়া উহা কলঙ্কিত হইয়া পড়ে, অপাত্রে দয়া স্থাপন জন্য বঞ্চিত হইয়া যথার্থ পাত্রের প্রতি পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারে না। যে হৃদয় ঈশ্বরে

ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত নহে, সে হৃদয়ের এ প্রকার দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে লোকের সঙ্গে প্রেমজনিত ব্যবহার, ইহাই সাধকের পক্ষে নিরাপদ অবস্থা। সাধক যদি আপনার জীবনের ভার আপনি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণে পুণ্য সমুপস্থিত হয়, এই পুণ্যের বশবর্ত্তিতাতে সাধক বিকারশূন্য হন। চিত্ত বিকারশূন্য হইলে, তাহাতে যে প্রেমের উদয় হয়, তাহা কখন আর অন্তর্হিত হয় না। পুণ্য দ্বারা প্রেমস্বরূপকে যখন তিনি ধারণ করেন, তখন আর তিনি অন্তর্হিত হন না; অন্তরে প্রেমের স্থায়িতা লাভ হয়।

আমাদের দেশে হৃদয়ের প্রাধান্য। এদেশে প্রেম শীঘ্রই প্রকাশ পায়। এই প্রেমের সহিত পুণ্যের সংস্রব না থাকাতে প্রেম শীঘ্র বিকারগ্রস্ত হয়। অনুরাগের পথে বিকারগ্রস্ত প্রেম হইয়া আনন্দসম্ভোগ পাপানলে নিপতিত হইবার কারণ। এ দেশের তন্ত্রশাস্ত্র আনন্দের নামে এই জন্য নিতান্ত গর্হিত পথে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

আনন্দো ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ দেহেষ্ববস্থিতম্।
তস্যাভিব্যঞ্জকং মদ্যং যোগিভিস্তেন পীয়তে॥

'আনন্দ ব্রহ্মের রূপ, সেই সেই দেহে অবস্থিত। তাহার অভিব্যঞ্জক মদ্য, যোগিগণ এই জন্য মদ্য পান করিয়া থাকেন।' ইহার অপেক্ষা ধর্ম্মের নামে আর কি নিন্দিত কথা উচ্চারণ করা যাইতে পারে? পুণ্যের অভাবে যে এ প্রকার ভয়ানক মত এদেশে উপস্থিত হইয়াছে, ইহা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধ জীবনে যে প্রেমের প্রতিভা নিঃসৃত হইয়াছিল, শুদ্ধতার অভাবে তাঁহার সম্প্রদায়ে উহা কি প্রকার মালিন্যে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে! যিনি ছোট হরিদাসের বৈরাগ্যধর্ম্মের নিয়মে শৈথিল্য দর্শন করিয়া গুরুতর দণ্ড দিলেন, তাঁহার সম্প্রদায়ে সেই বিষয়ে পতিতাবস্থা, ইহা নিতান্ত পরিতাপকর। তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অবিশুদ্ধচেতা লোকদিগের হাতে পড়িয়া উহা কলঙ্কিত হইবে, ইহা জানিয়াই তিনি ছোট হরিদাসের উপরে গুরুতর দণ্ড বিধান করিলেন; কিন্তু তাহাতেও আত্মসম্প্রদায়ের পতন নিবারণ হইল না। উপাসনাপ্রণালী শুদ্ধতামূলক না হইলে কি বিষময়ফল উৎপন্ন হয়, তাহার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে তান্ত্রিকতার বিরোধে শ্রীচৈতন্য পবিত্র হরিনাম বিতরণ করিলেন, সেই তান্ত্রিকতা আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মে প্রবেশ করিল, ইহা কি সামান্য বিপরিবর্ত্তন! বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রেমের চরম বিকাশ, সেই প্রেম পুণ্য বিনা বিকারগ্রস্ত হইল ইহা যখন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন প্রেম ও পুণ্যের একত্র মিলন কত দূর প্রয়োজন ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রেমও পুণ্যের মিলনে আনন্দের প্রকাশ, এই আনন্দেতে মগ্ন হইলে ধর্ম্ম পূর্ণতা লাভ করে, এ কথা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার কথা নহে। ঈশ্বর পূর্ণ, তাঁহাতে অপূর্ণতার লেশমাত্র নাই। শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য সকলই ঈশ্বরেতে পূর্ণ। আচার্য্য প্রার্থনা করিতেছেন, "নববিধান দিয়াছ, এখন ইচ্ছা করি...পূর্ণ হই, যাঁহারা নববিধানে বিশ্বাস করেন তাঁহারা পূর্ণ হইতে চান। আর অংশ দেখিতে চাই না। আর অংশ লইতে চাই না। ব্রহ্মের সন্তান হইয়া খণ্ড খণ্ড লইব? পূর্ণ ব্রহ্ম, এস; এ হৃদয় তোমায় লইবে। আসিবে যদি তবে পূর্ণ জ্ঞান. পূর্ণ পুণ্য, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ শক্তি লইয়া এস। গরিবকে আর কষ্ট দিও না। দুই হাত প্রসারণ করি, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ভাবে হৃদয়ে এস।" অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যিনি তাঁহাকে লাভ করিলে পূর্ণ ধর্ম্মের দিকে জীবের গতি হয়। সৎ চিৎ এ বিষয়ে পৃথিবীতে তত গোল হয় নাই, গোল হইয়াছে 'আনন্দস্বরূপ' লইয়া, প্রেমেতেও আনন্দ আছে, সুতরাং এই আনন্দ খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবী আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মে পূর্ণতালাভ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কেবল প্রেমে আনন্দ বা কেবল পুণ্যে আনন্দ এ উভয়ই অপূর্ণ, কেন না পরব্রহ্মে প্রেমও পুণ্য কখন স্বতন্ত্রভাবে স্থিত নয়; যদি স্বতন্ত্র ভাবে স্থিত হইত তাহা হইলে তাঁহাতেও বিকার ও শুষ্কতা ঘটিত। তিনি এক দিকে রসস্বরূপ আর এক দিকে মহাপ্রতাপান্বিত। এ দুই ভাবই তাঁহাতে যুগপৎস্থিত। তিনি প্রেম করিতে গিয়া পুণ্যের প্রতি উদাসীন হন না, আবার পুণ্যের পক্ষপাতী হইয়া প্রেমশূন্য হন না। প্রেম ও পুণ্যে তিনি আনন্দ কেন? পাপ দুঃখের কারণ, ঈশ্বর পুণ্যস্বরূপ তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তিনি দুঃখশূন্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ; আর এক দিকে প্রেম অপরের সুখ বর্দ্ধন করিয়া সুখসম্পন্ন; অতএব প্রেমের দিক্ দিয়াও তিনি সুখস্বরূপ। শক্তি ও জ্ঞান নিয়ত প্রেম ও পুণ্যের সহিত সংযুক্ত, এই পুণ্য ও প্রেমে যদি ঈশ্বর আনন্দ হইলেন সুখস্বরূপ হইলেন, তবে যে সাধক ঈশ্বরের আনন্দস্বরূপ গ্রহণ করেন তাঁহাতে কখন বিকার বা শুষ্কতা উপস্থিত হইতে পারে না।

প্রেম ও পুণ্যে যখন সাধকের হৃদয় কৃতার্থ, তখন ব্রহ্মসংস্পর্শ উপস্থিত এবং সেই সংস্পর্শে আনন্দোদয় হয়। আনন্দের সংস্পর্শে ঈশ্বরের সাক্ষাদ্দর্শন ঘটে। ঈশ্বরের সাক্ষাদ্দর্শন কিছু সামান্য কথা নহে। সাধকের সহিত যখন ঈশ্বর আনন্দে সম্মিলিত হইলেন, তখন কেবল তাঁহার পূর্ণ প্রভাব তাঁহার উপরে নিপতিত হইল তাহা নহে, তিনি সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার পথপ্রদর্শক হইলেন। কি করিতে হইবে, কি করিতে হইবে না, ইহা তিনি সর্ব্বদা সাধককে বলিয়া দিতেছেন, এবং সাধক ঈশ্বরের প্রেমে পরাস্ত হইয়া কোন কথা না কহিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছেন, ইহা সাধকের পক্ষে কেবল সুখের অবস্থা তাহা নহে, তাঁহার জীবনের পূর্ণতাপক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজন। অনন্ত আমাদের প্রাপ্য বিষয়, অনন্ত আমাদিগের জ্ঞানের অনায়ত্ত। অনন্ত আমাদিগের নিকটে যতটুকু আত্মপ্রকাশ করেন, আমরা ততটুকু তাঁহাকে জানিতে পারি, তাঁহাকে সম্ভোগ করি। আত্মপ্রকাশ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

সম্বন্ধ বিনা কখন সম্ভবপর নহে। অনন্ত ক্রমান্বয়ে যত আপনার জ্ঞান শক্তি প্রেমপুণ্য সাধকের নিকটে প্রকাশ করেন, তত তিনি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হন। আনন্দস্বরূপে সমুদায় স্বরূপের সমাবেশ বিনা ঈশ্বরকে পূর্ণভাবে কখন গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এজন্য সামুদায় স্বরূপের সমাবেশে যে আনন্দ এবং যে আনন্দে ঈশ্বরসাক্ষাৎকার এবং অনন্ত উন্নতির দিকে গতি হয়, সাধক যত ক্ষণ না সেই আনন্দস্বরূপে স্থিরতা লাভ করিয়াছেন, তত ক্ষণ তাঁহার পূর্ণধর্ম্মসাধন কখনই সম্ভবপর নহে। সাধকে ঈশ্বরের আবির্ভাব পূর্ণধর্ম্মসাধনের উপায়, তদ্ভিন্ন এসম্বন্ধে অন্য কোন উপায় কখনই কার্য্যকর হইতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং প্রতিসাধকের জীবন এসম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে, সুতরাং যাহাতে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহাই প্রয়োজন। এই সাক্ষাৎসম্বন্ধের ভূমি হইতে পূর্ণধর্ম্মের সাধন উপস্থিত হয়। সাক্ষাৎসম্বন্ধ—প্রেমপুণ্যমিলিত আনন্দে। সুতরাং এই আনন্দস্বরূপে আত্মাকে নিমগ্ন করিবার জন্য যত্ন সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। পবিত্রাত্মা, পরমাত্মা বা অন্য যে কোন শব্দে এই সাক্ষাৎসম্বন্ধ প্রকাশ করা হউক না কেন, বস্তুতঃ কথা এই, এই আনন্দস্বরূপ পূর্ণধর্ম্মসাধনের উপায়।

স্বর্গগত শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু।

বিগত ৩১এ ভাদ্র শনিবার ব্রাহ্মসমাজের স্তম্ভস্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু চোয়াত্তর বর্ষ বয়সে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। তিনি যৌবনের উদ্যমকালে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তৎসেবায় জীবনাতিপাত করিলেন, ইহা কিছু সামান্য কথা নহে? প্রথম সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারাই যোগ দিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার নিকটে ঋণী ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। অধিক বলিতে হইবে না, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রতিচ্ছায়া তাঁহারই লেখায় তিনি প্রাপ্ত হন। আমরা যে সকলেই তাঁহার নিকটে ঋণী ইহা আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গে যিনিই আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তৎপ্রতি মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। এক দিকে গাম্ভীর্য্য অপর দিকে রহস্যপ্রিয়তা, এ দুই বিপরীত গুণ নিয়ত তাঁহাতে মিলিত ছিল, এজন্য সকলের চক্ষে তাঁহার চরিত্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি তাঁহার বক্তৃতার অন্তিম ভাগে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কতকগুলি মত নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তৎকালে কি প্রকার উদারভাবাপন্ন ছিলেন, সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। সত্যসম্বন্ধে দেশভেদ বা কালভেদ নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া আত্মস্থ করেন, একথা আমরা তাঁহারই লেখাতে পাঠ করি। বাস্তবিক এ সম্বন্ধে যদিও তাঁহার মতের সঙ্কোচ শেষ সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার শিরায় ও শোণিতে যে এ সত্য প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছিল, পাশ্চাত্য ভাবসমূহ দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া তিনি যে পর সময়ে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতেই তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। তিনি হিন্দুকলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন, প্রথম বয়স হইতে পাশ্চাত্য ভাব তাঁহার মনের গঠনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল, ইহাতে তাঁহার লেখায় যদি সেই সকল ভাবের প্রতিকৃতি আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু কারণ নাই।

তিনি মেদিনীপুরে যৎকালে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতার পরিণয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন ঘোষের সহিত সম্পন্ন হয়। আমাদের মনে হইতেছে, তাঁহার পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে এই প্রথম অনুষ্ঠান। এই বিবাহে কেশবচন্দ্র পাত্রকে সঙ্গে লইয়া মেদিনীপুরে গমন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের সহিত রাজনারায়ণ বাবুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মেদিনীপুরের গোপগিরিতে ব্রহ্মোপাসনা করা তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। এখানেই তাঁহার হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। অন্যান্য গিরির তুলনায় গোপগিরি গিরিই নহে, অথচ তিনি ব্রহ্মোপাসনাদি সহ সংযুক্ত করিয়া উহাকে চিরখ্যাতি অর্পণ করিয়াছেন। মেদিনীপুরের অবস্থা এখন যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর সহিত সম্বন্ধবশতঃ উহা ব্রাহ্মসমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু সাহিত্যজগতে সকলেরই পরিচিত। সাহিত্যবিষয়ে পরিশ্রম তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। সাহিত্যযোগে ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার জীবনের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সুতরাং প্রচারিত পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ইঁহার স্বপ্রচারিত পুস্তিকাগুলি পাশ্চাত্য প্রদেশেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তৎপ্রণীত 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' বঙ্গভাষায় প্রথম ধর্ম্মবিজ্ঞানসম্পর্কীয় গ্রন্থ একথা বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। দার্শনিক চিন্তা স্বদেশীয় ভাষায় কি প্রকারে নিবদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। দর্শনঘটিত কোন গ্রন্থ কোন এক ভাষায় নূতন লিখিতে হইলে ভাষায় যে কাঠিন্য দোষ উপস্থিত হয়, তাহা তিনি পরিহার করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এসময়ে তত না হউক, গ্রন্থপ্রচারের সময়ে তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' অনেকের নিকটে কঠিন বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। তিনি যে সকল পুস্তিকা পর সময়ে প্রচার করেন, তৎসহকারে আমাদের মতভেদ থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু সে সকলেতে যে তাঁহার গভীর চিন্তা, আধ্যাত্মিকতা ও স্বজাতিপ্রিয়তার পরিচয় আছে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। স্বদেশীয় বিদেশীয়গণ সে সকল পাঠ করিয়া যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা অনুপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হয় নাই।

১৮৬৬ সনে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ তিনি পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া বাস করেন। তিনি অনেক দিন কাণপুরে

অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে বাল্মিকিতপোবনে গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করা তাঁহার এক বিশেষ কার্য্য ছিল। ১৮৬৯ সনে বৈদ্যবাথে আসিয়া সেখানেই তিনি শেষ জীবন পর্য্যন্ত বাস করেন। আজ তিন বৎসর যাবৎ তিনি শয্যাগত ছিলেন, নিজে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিবারও তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। যে ব্রহ্মানুরাগে তিনি জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মানুরাগে তাঁহার জীবন পরিপক্কাবস্থা লাভ করিয়াছিল, সেই ব্রহ্মানুরাগ তাঁহার রোগশয্যায় তাঁহাকে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও প্রসন্নভাব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সকলের নিকট প্রিয়দর্শন রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে প্রীতির ভাব প্রথমতঃ তাঁহা হইতে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার সমগ্র জীবনে যখন আমারা ব্রহ্মপ্রীতি অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাই, তখন তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে গৌরব-দানে আমরা কুণ্ঠিত হইব কেন? বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে সরসাকার ধারণ করিয়াছিল, সে হৃদয় অবশ্য সকলের অতীব শ্রদ্ধার সামগ্রী। ভক্তিভাজন মহর্ষি প্রধানাচার্য্য তাঁহার দক্ষিণহস্ত-তুল্য প্রাচীন বন্ধুকে হারাইয়া অবশ্য শোকান্বিত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত এক হৃদয় হইয়া সহানুভূতি দান করে, এমন ব্যক্তি আর কে রহিল? এই আর এক দিন তাঁহার প্রিয়তম পৌত্র পিতামহ-প্রচারিত ধর্ম্মের প্রচারে উৎসাহশীল শ্রীমান্ বলেন্দ্রনাথ স্বর্গারোহণ করিলেন, তাহার পরেই তিনি প্রাচীন বন্ধুকে হারাইলেন। মহর্ষি যদি নিরন্তর ব্রহ্মযোগে স্থিতি না করিতেন, তাহা হইলে এই সকল শোক তাঁহার পক্ষে একান্তই অসহ হইত। শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়ের অভাবে আদি সমাজ কেন, সকল সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতে-ছেন। ব্রাহ্মসমাজের সেবায় যাঁহারা বৃদ্ধ হইলেন, তাঁহাদিকে সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে কে কুণ্ঠিত হইবেন? ব্রাহ্মসমাজে যখন গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়, সে সময়ে কেশবচন্দ্র মনের দুঃখ ক্লেশ ইঁহারই নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত উভয়ের বন্ধুতা যে অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহা উভয়ের লিখিত পত্রেই প্রকাশিত রহিয়াছে। মতের ভিন্নতাবশতঃ তৎপ্রতি আমাদের হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতি এক দিনের জন্যও হ্রাস পায় নাই, আজ পর্য্যন্ত সে ভক্তি ও প্রীতি যেমন তেমনই রহিয়াছে। আমাদের ভক্তি ও প্রীতি স্বর্গে তাঁহার নিকটে গমন করুক, এবং তৎসহ আমাদের নিত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিক্। তাঁহার আত্মা প্রীতিরসে মগ্ন হইয়া ব্রহ্মেতে চিরবাস করুক; তাঁহার ব্রহ্মানুরাগ ও ব্রহ্মপ্রীতির ফল পৃথিবী বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে সম্ভোগ করুক।

স্বর্গগত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ।

আমাদের পাঠকদিগকে প্রতিপক্ষেই দুই একটি মৃত্যু সংবাদ দিতেছি, জানি না এ সব সংবাদ পাইয়া তাঁহারা কে কি ভাবে গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের বহুকালের পুরাতন পরম উপকারী বন্ধু শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ গত ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার তাঁহার লক্ষ্ণৌস্থ বাসভবন হইতে নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। এ শোক সংবাদে আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। বিধাতার বিধি কে বুঝিতে পারিবে? একটি প্রকাণ্ড ব্রাহ্মপরিবার নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন, বিধাতা এই অসহায়দিগের সহায় হউন। লক্ষ্ণৌ হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরলা লিখিয়াছেন—

"গত কল্য বৈকালে দেড় ঘটিকার সময় আমাদের পূজনীয় বাবা হৃদ্‌রোগে মার নাম স্মরিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে সজ্ঞানে পরলোক ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

"প্রায় মাসাবধি হইল পায়ে একটী ক্ষত হইয়া ভুগিতেছিলেন, বেড়াইতে যাইতে পারিতেন না, বসিয়া থাকিতে হইত। ক্রমে বসিয়া থাকিতে থাকিতে পরিপাকশক্তির ব্যাঘাত হইল, তাহাতেই তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। আমরা যদি বলিতাম, অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, দুর্ব্বলতার জন্য তেমন কিছু করা হইতেছে না; অমনি বলিতেন দুর্ব্বলতা আমার বড় কিছু নয়, বৃদ্ধ হইয়াছি, তাঁর নিকট আমার যাইবার সময় হইয়াছে।

"গত রবিবার মন্দিরের পর ফিরিয়া আসিয়া রাত্রিতে পিঠে ও বুকে বেদনা হইল, তাহা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, সোম মঙ্গল বুধ তিন দিন ব্যথা অল্প অল্প ছিল। রোজ সন্ধ্যাবেলা বেদনা উঠিত, সমস্ত রাত্রি থাকিত; সকাল বেলা বেদনার একটু উপশম হইত। তখন তত বেদনা অনুভব করিতেন না, সেই জন্য আমরা কেহই বেদনাকে ভয়ানক মনে করি নাই ও তিনিও করেন নাই। বৃহস্পতিবার হইতে দিন রাত্র সমানে বেদনা হইতে লাগিল; শুক্রবারের মধ্যে উহা খুব বাড়িল। বেদনায় আহার খুব অল্প হইয়া গিয়াছিল। বেদনা আরম্ভ হওয়া অবধি আর একটি দিনের জন্যও নিদ্রা হয় নাই। সমস্ত দিনে রাত্রে মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রা ছিল না। কাল বেলা দেড় ঘটিকার সময় বাবা একেবারে চিরনিদ্রায় মগ্ন হইলেন। সকল বেদনা সকল যাতনার হাত হইতে মুক্ত হইয়া মার ক্রোড়ে অনন্ত শান্তি লাভ করিলেন।

"যখন যাতনায় বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন আমরা সকলে তাঁর শয্যার চতুর্দ্দিকে বসিয়া মার নাম করিতেছি, শ্রদ্ধেয় ভুবন বাবু ও বিনয় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা সকলে দু তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। কেহই কিন্তু জানিতেন না, ডাক্তারেও বুঝিতে পারেন নাই যে, সেই মুহূর্ত্তে তিনি চলিয়া যাইবেন। যাতনায় ছটফট করিতেছেন, কেবলি বুক গেল বুক গেল এই কথা বলিতেছেন। যাই কেহ বলিলেন, মার নাম সকল যাতনাহারী, অমনি কিছুক্ষণের জন্য নীরব হইয়া যাইতেন, কখন বা অর্দ্ধস্ফুট স্বরে মা মা বলিয়া উঠিতেন। যাতনা এত ছিল যে স্পষ্ট করিয়া কথা বলিবার তাঁর সামর্থ্য ছিল না। হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বলতাতে এত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল যে ডাক্তারেরা দেখিয়া অবাক্। যাহা হউক, শেষে বেদনা এত শীঘ্র তাঁকে কাবু করিয়া ফেলিল যে একটী কথা কহিবার তাঁকে অবসর দিল না। দু একবার অর্দ্ধস্ফুট স্বরে মা নাম উচ্চারণ করিয়া চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন ও সকলি নীরব হইয়া গেল। বাবার বিবর

আপনাকে অধিক আর কি লিখিব। আপনারা খুব সবিশেষ জানেন। ভক্তিভাজন আচার্য্যদেবের ও আপনাদের খুবই প্রিয় ছিলেন। ইদানীং তাঁর জীবন খুব উচ্চ বিশ্বাসী সাধকের জীবন হইয়াছিল। এত সাংসারিক কষ্ট দুঃখ অভাব গিয়াছে, কখন কেহ জানিতে পারে নাই বা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। এমন মহৎ শোক পাইলেন, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, শরীর শুকাইয়া গেল, তবুও একটী দিনের জন্য অভিযোগ করেন নাই। কত জনে কত রকম কথা বলিয়াছেন, চিকিৎসা হইল না, অসময়ে গেল কত কি; বাবা চুপ করিয়া থাকিতেন, এক কথা কেবল এই—'তাঁর ইচ্ছা'। ইদানীং সাংসারিক কোন কথা কিছু বলিতেন না। যদি কেহ বলিতেন এই উত্তর দিতেন, মা আমার হাত থেকে দু তিন বৎসর হইল সে ভার লইয়াছেন, আমার উপর তিনি তো রাখেন নাই, তবে ভাবিব বা সে বিষয় বলিব কেন? তাঁর যা তিনি সব করিবেন, আমার বলিবার বা ভাবিবার অবসর রাখেন নাই। উপাসনা বড় সুন্দর ও গভীর করিতেন। উপাসনায় বসিয়া আগাগোড়া ভক্তি অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেন। ধ্যানের ভাগ খুব অধিক সময়—প্রায় আধ ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট কাল ধ্যানে মগ্ন হইয়া যাইতেন। রোজ সন্ধ্যাবেলা ছাতে বসিয়া নীরবে তাঁর ধ্যানসাগরে ডুবিয়া যাইতেন; এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা এইরূপ, থাকিতেন।

"যোগী হইব, তাঁর যোগে যুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাব, উপাসনার এই ভাব ইদানীং ছিল। বাবা চলিয়া গিয়াছেন, চারি দিক অন্ধকার দেখিতেছি। মার শরীর অত্যন্ত খারাপ ছিলই, তার উপর এই ভয়ানক শোক পড়িল; কিছুই আর উপায় দেখি না। কেবল হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত তাঁর চরণ ধরিয়া থাকা ভিন্ন, সেই পিতা ভিন্ন, আর এখন কে আমাদের আছে? বাবার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষের জন্মস্থান চন্দননগর। ইনি বাল্যকাল হইতে ইষ্টইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে আফিসে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। কর্ম্মকার্য্যে সুদক্ষতা জন্য গোপাল বাবু এলাহাবাদে একটি উচ্চপদ প্রাপ্ত হন, সেখানে ইনি বহু বৎসর অতি সম্ভ্রমের সহিত কাটাইয়াছিলেন। ইঁহার বাড়ী প্রচারক এবং ব্রাহ্ম পর্য্যটকদিগের একটি বিশেষ আশ্রয় স্থান ছিল। ইনি সপরিবারে সকল বন্ধু বান্ধবদিগকে অতি যত্নের সহিত সেবা করিতেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সদলে সপরিবারে কতবার ইঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন। আরাহ্মাবাদ হইতেই লক্ষ্ণৌ আউট রোহিলখণ্ড রেইলওয়ের Asstt. Traffic Supdt. পদে নিযুক্ত হন। সেখানেও অনেক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে ইনি কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ নববিধান মন্দিরের ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী। অনেক সময় সেই মন্দিরে ইঁহাকে উপাচার্য্যের কার্য্য করিতে হইত। ইনি একজন নববিধানে বিশ্বাসী আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ও প্রতাপচন্দ্রে বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কত সময়ে কতরূপে ইনি বন্ধুতার পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার হৃদয় পরদুঃখে বড়ই কাতর হইত। আমাদের দুঃখকষ্টের কথা শুনিলে ইনি বিশেষ সহানুভূতি করিতেন। ব্রাহ্মসমাজ ইঁহার কাছে বিশেষ ঋণে ঋণী। ইঁহার পরিবারে অনেকদিন হইতে গৃহকার্য্য সকল নববিধানের ব্যবস্থা মত সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ ঘোষ বি, এ, যিনি এক্ষণে লাহোরে সর্দ্দার দয়াল সিংহের কলেজে শিক্ষকতা করেন, তিনি আমাদের ভাই দীননাথের কন্যাকে বিবাহ করেন, ভাই দীননাথের দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গগত শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার এবং ভাই অমৃতলাল বসুর পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণের সহিত দ্বিতীয় কন্যার ইনি বিবাহ দেন। প্রচারকদিগের সাংসারিক অবস্থা উত্তমরূপে অবগত থাকিয়াও কেবল একমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই ইনি আনন্দমনে এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন এবং বিশেষ সুখ্যাতির সহিত তিনি সেখানে উপাধি সকল লাভ করিতেছেন। দুঃখের বিষয় আর অল্প কয়েকমাসের জন্য তিনি তাঁহার পূজনীয় পিতৃদেবকে এ পৃথিবীতে দেহে দেখিতে পাইলেন না। বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়, মানুষ যাহা করে অনেক সময় সে কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অনেকগুলি সন্তান সন্ততি ও স্বীয় পত্নীকে ভীষণ শোকসাগরে ভাসাইয়া তিনি স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। মা শান্তিদায়িনী যেমন তাঁহাকে তাঁহার নিজ পাদপদ্মে শীতল ছায়া প্রদান করিয়া সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, তেমনি দয়া করিয়া এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে আপনার শান্তিপ্রদ পদচ্ছায়া দিয়া সকলের হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন।

গত রবিবার ২৪শে সেপ্টেম্বর গোপাল বাবুর লক্ষ্ণৌস্থ ভবনে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়াছে, আমরা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়ভূষণের পত্র এইস্থানে দিতেছি।

ঘসিয়ারি মণ্ডি লক্ষ্ণৌ
২৬।৯।৯৯।

শ্রীচরণকমলেষু,

আমাদের বিনীত প্রণাম গ্রহণ করুন! গত রবিবারে পূজনীয় পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ, শ্রদ্ধেয় অমৃত বাবু কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত রূপ দান করা হইয়াছে:—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, লাহোর ব্রাহ্মসমাজ ২৲, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ ২৲, অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজ, ২৲, চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজ ২৲, অনাথাশ্রম ২৲, কুষ্ঠাশ্রম ১৲, মূক ও বধির বিদ্যালয় ১৲, দুইটি অনাথ পরিবার ২৲, দুঃখীদিগকে আটা, দাল, লবণ। ব্রাহ্ম সাধকসেবার জন্য ভোজ্য, শয্যা, বস্ত্র, ছত্র, বিনামা কমণ্ডলু ইত্যাদি।

বিষম সমস্যা।

ঠাকুর, তোমাকে জগৎপতি বলে। কিন্তু যাঁহারা বলেন, তাঁহারাই বা কি করে বলেন এবং তুমিই বা কি করে সে নাম গ্রহণ কর? তুমি যদি পতি তবে সতী কৈ? আর যদি বল ভক্তগণ তোমার সতী.তবে তো অসবর্ণ ও বহুবিবাহের দোষ পড়ে। তাঁহারা হইলেন অন্তবিশিষ্ট আর তুমি অনন্ত, তোমার তাঁহাদের সঙ্গে মিল হবে কেমন করে? এই যে বিষম সমস্যা।

কি বলিতেছ? যোগে বসিব, আচ্ছা তাই বসি। * * * * * আহা কি অপরূপ রূপ দেখিতেছি একাধারে সতীপতি, তোমার পুণ্যময় পতিরূপের কি জ্যোতি কি তেজ! তুমি স্বয়ং সত্য, সত্যসঙ্কল্প, সত্যরক্ষক এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ। জীবকে উদ্ধার করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা করিবেই করিবে। পুণ্যের মহাগ্নি জ্বালিয়া পাপ দগ্ধ করিতেছ, পাপী যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে, কোন উপরোধ অনুরোধ শুন না। তোমার প্রীতি সতী পুণ্যময় পতির অধীন থাকিয়া প্রকৃত সতীর পরিচয় দিতেছেন। কোমলহৃদয়া সন্তানবৎসলার প্রাণ জীবের যন্ত্রণায় কাতর, কিন্তু তাঁহার সাধ্য কি যে তিনি তোমাকে এক বিন্দু পাপেও প্রশ্রয় দিতে বলেন। কিন্তু তিনি সতী তাঁহার প্রভাব কোথায় যাইবে? তিনি সৎপতিকে আত্মসমর্পণ ক'রে তাঁহাকে প্রেমে বশীভূত করিয়াছেন। দেখ ঠাকুর, তাঁহার প্রভাবে তোমাকে পাপীর ঘরে ঘরে বেড়াইতে হইতেছে, স্বহস্তে আপনার বসিবার স্থান প্রস্তুত করিতে হইতেছে, যে মহাপাপীকে সংসারের লোক স্পর্শ করে না তাহারও কাছে তোমাকে যাইতে হইতেছে। এই তো সতীর জয় দেখিতেছি।

আবার কি দেখিতেছি, সতী অসংখ্য অবতার হইয়া সংসারে বিরাজ করিতেছেন, পতিকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, প্রত্যেক মানবীয় সতী ও পতি, সেই পরম সতী ও পরম পতির প্রতিমূর্ত্তি। দেখিতে দেখিতে যে দুই মূর্ত্তি মিশে গেল; উভয়ের প্রেমে উভয়ে গলে গিয়েছেন। পতির পুণ্যের তেজ এবং সতীর সতীত্বের তেজ, আর সতীর পতিপ্রেম এবং পতির মধুর ভাব মিলে গিয়া অপরূপ রূপ ধরেছে। এ যে মহাসম্মিলন, সকলে যে মহাসতী মহাপতিতে মিলিত। শ্রীহরি আপনার প্রেমে আপনি মজে আপনি প্রেমের লীলা করিতেছেন। যিনি সতী তিনিই পতি, এক সতী এক পতি—এই তো সমস্যা পূরণ হইল।

তোমার রূপের ছায়া পড়ে যায় হৃদি দর্পণে,
দেখে সে যুগল রূপ, অপরূপ নিজ জীবনে।
আহা তার কি বা স্বকৃতি, পুরুষে মিশে প্রকৃতি,
ধরে সুন্দর প্রকৃতি, যথা দম্পতীমিলনে।
আপনি আপন স্বভাবে, এক হয়ে দুই ভাবে,
গভীর প্রণয়ে ডুবে, থাকে সে আনন্দ মনে। [রা]

সংবাদ।

বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর ৭ই আশ্বিন শনিবার রাত্রি ৯টা ২০ মিঃ সময় অমরাগড়ীর শ্রীমান্ হৃদয়নাথ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা পূর্ণিয়ার কালেক্টারের একাউনট্যান্ট শ্রীমান্ হাজারিলালের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী রক্তহীনতা ও জ্বররোগে পিতৃভবন হইতেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া পিতা মাতা ও তাঁহার প্রিয়তম পতিকে শোকার্ণবে ভাসাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃতকন্যার শোকার্ত্ত জনক জননী ও প্রিয়তম পতিকে জগজ্জননী সান্ত্বনা দান করুন, এবং মৃতের আত্মাকে স্বর্গে আপনার ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।

শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জন্মদিন উপলক্ষে অদ্য প্রাতে শান্তিকুটীরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে. উপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। প্রতাপ বাবু ৫৯ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ৬০ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার আশ্রিত দাসদিগের এক মাত্র রক্ষক। প্রতাপ বাবু এক্ষণে সিমলা পাহাড়ে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার শরীর অপেক্ষকৃত ভাল।

১৪ আশ্বিন শনিবার হুগলিনিবাসী শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দত্তের প্রথমা কন্যার নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী স্নেহলতা প্রদত্ত হইয়াছে। দয়াময় হরি এই কন্যাকে এবং উহার পিতা মাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাই অমৃতলাল বসু, পরলোগত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা গোপালচন্দ্র ঘোষের পরিবার ও সন্তানদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন। কয়েক দিন তিনি সেখানে অবস্থিতি করিয়া শোক সন্তপ্ত পরিবারের সেবা করিবার মনন করিয়াছেন।

আগামী ২৫এ আশ্বিন বুধবার হইতে ২৮ এ আশ্বিন শনিবার পর্য্যন্ত চারি দিন প্রাতে ৯টার সময় শারদীয় উৎসব উপলক্ষে বিশেষ ভাবে ৩নং রমানাথমজুমদারের ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে উপাসনা হইবে। সমবিশ্বাসী ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

দারজিলীং হইতে সংবাদ পাইয়া বিশেষ ভাবে দয়াময় ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতার সহিত আমরা প্রণাম করি। আচার্য্য পরিবারস্থ সকলে এই ভয়ানক [illegible] ভিতরে আশ্চর্য্যভাবে রক্ষিত হইয়াছেন। কুচবিহারের মহারাজ গৃহে প্রত্যাগমনকালে যে স্থান দিয়া চলিয়া গেলেন তাহার ঠিক ২ সেকেণ্ড পরে সেই স্থান ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি আশ্চর্য্য রক্ষা! সে বার ভূমিকম্পের সময়েও তিনি এইরূপে ঈশ্বর করুণাবলে রক্ষা পাইয়াছিলেন। দারজিলীংয়ের সংবাদ অতিশয় শোচনীয়। কত লোকের যে প্রাণনষ্ট হইয়াছে আজও তাহার ঠিক সংবাদ বাহির হয় নাই। এই বিপদের সময় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহিলাদিগের পরসেবার জন্য জীবনোৎসর্গের সংবাদ বাস্তবিকই অতিশয় উচ্চ শিক্ষাপ্রদ। আমরা কবে দয়াময় ঈশ্বরের নামে এইরূপ কার্য্যে জীবন দিতে পারিব। দয়াময় হরি মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মার কল্যাণ বিধান করুন, তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পিতা মাতা ও আত্মীয়বর্গের অন্তরে শান্তি বারি বর্ষণ করুন। ইহলোক ও পরলোক উভয়ই তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ সম্বন্ধে টাঙ্গাইল হইতে প্রেরিত প্রেরিত পত্রখানি স্থানাভাববশতঃ এবার আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ১৭ই আশ্বিন মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৪০ ভাগ।
১৯ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২||০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে আনন্দঘন পরমদেব, যেখানে আনন্দ সেখানে নৃত্য। তোমার আনন্দ সমুদায় জগতে প্রকাশিত, তাই চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহাদি সকল স্ব স্ব কক্ষে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। জগতের একটি পরমাণুও স্থির নাই, সকলই তোমার আনন্দ-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া ক্রমান্বয়ে নাচিতেছে। আমাদের এই শরীর স্থির, কিন্তু ইহার মধ্যে ফুস্ফুস, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা, বিবিধ আশয় সকলই নৃত্যে নিরত রহিয়াছে। শিরায় শিরায় শোণিত নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও নৃত্যের বিরতি দেখিতে পাই না। আমরা নিজেই কি স্থির রহিয়াছি? মন এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির নাই। আমরা তাহাকে চঞ্চল বলি, কিন্তু সে কি আর সমুদায় জগতের নৃত্যের সঙ্গে যোগ না দিয়া একাকী স্থির হইয়া থাকিতে পারে? চারিদিকের সকলেই নাচিতেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে মনও নাচিতেছে। এই সর্ব্বব্যাপী নৃত্য কি তোমার আনন্দ-তাণ্ডব নহে? সমুদায় জগৎ যেমন নিয়মপূর্ব্বক পদবিক্ষেপ করিতেছে, এমন কি কেউ শিক্ষা করিয়া সাধন করিয়া পদক্ষেপ করিতে পারে? জগতের এই তাল, মান লয় শুদ্ধ নৃত্য দেখিয়া আমরা নৃত্য করিতে শিক্ষা করি, কিন্তু যেখানে আনন্দ স্বাভাবিক নয় সেখানে তাল ভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী, যদিও বা শিক্ষার গুণে অজ্ঞাতসারে হস্তপদ তান লয়ের অনুসরণ করে করুক, কিন্তু সে নৃত্য কখন সরস নহে। আনন্দ জন্য শিশুর চঞ্চল গতি কার না মন হরণ করে? হে আনন্দের অনন্ত উৎস, ইচ্ছা হয় তোমার আনন্দে উদ্দীপ্ত হৃদয় হইয়া নৃত্য করি। সে নৃত্য তুমি দেখ, আর তোমার [illegible] গণ দেখুন, অরসিকগণের দৃষ্টিপথে উহা যেন নিপতিত না হয়। তোমার ভক্তগণ তোমার নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে অভিলাষ করেন। জগৎ নাচিতেছে, ইহাই তো সত্য তুমি আবার নৃত্য করিতেছ কোথায়? তোমার পদ আছে, না তোমার হস্ত আছে যে, তুমি নৃত্য করিবে? তোমার আনন্দকেই তবে তাঁহারা নৃত্য বলেন। আনন্দ প্রাণে সংক্রামিত হইলে সহজে নৃত্য করিতে থাকে, তাই দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি, তোমার আনন্দের ভিতরে নৃত্য না থাকিলে, আমাদের ভিতরে নৃত্য আসিবে কোথা হইতে? নড়া চড়া না থাকিলেও যদি নৃত্য বলা যাইতে পারে, তবে সে নৃত্য তোমাতে আছে, অন্যথা তোমাতে নৃত্য

নাই, তুমি আপনি স্থির থাকিয়া সকলকে নাচাইতেছ, সেই নৃত্যে তোমার নৃত্য প্রকাশ পাইতেছে, এইটুকু পর্য্যন্ত আমরা বলিতে পারি। নৃত্যের তত্ত্ব যা হয় হউক, আমাদের প্রার্থনা এই আমরা অপরের দেখাদেখি শুষ্ক নৃত্যে কখন প্রবৃত্ত না হই। তোমার আনন্দস্পর্শে যে স্বতঃ নৃত্য উপস্থিত হয়, সেই নৃত্য আমাদের নৃত্য হউক, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

উপাসনার অঙ্গ।

আমরা উপাসনার অঙ্গ-সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি কিন্তু দেখিতেছি, একবার তদ্বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। আমাদের উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে সমগ্র সাধনের বিষয় নিবিষ্ট আছে। সমুদায় অঙ্গের অভিপ্রায় বুঝিয়া একটি একটি করিয়া সাধন করিলে সর্ব্বাঙ্গীন সাধন ও তাহার বিশেষ বিশেষ ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। অতএব অঙ্গবিশেষ সম্বন্ধে সাধনের বিষয় কি আমরা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে যত্ন করিব।

প্রথম উদ্বোধন—উদ্বোধন আর কিছুই নহে, প্রাচীন প্রত্যাহারের ব্যাপার। বিষয়ের প্রতি উন্মুখ চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ঈশ্বরেতে স্থাপন করিবার জন্য তদুপযোগী বাক্য সকল এই অঙ্গে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় আরাধনা—আরাধনাতে যদিও 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' ইত্যাদি স্বরূপদ্যোতক বেদান্ত বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে, তথাপি আরাধনা কালে বেদ ও বেদান্ত এ উভয়ের ভাব সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। বেদ ও বেদান্তের পার্থক্য কে আর না বুঝিতে পারেন? বেদান্ত ব্রহ্মের স্বরূপ সমূহ বিবিধ ভাবে উপদেশ দিয়া ব্রহ্মকে সমুদায় মানবীয় ভাবের অতীত করিয়াছেন, ইহা কিছু সামান্য উন্নতি নহে। বেদান্তের ব্রহ্ম মানবীয় ভাবগন্ধশূন্য হইলেও বেদে যে প্রকার বিবিধ সম্বন্ধ যুক্ত করিয়া আরাধ্য দেবতাকে উপস্থিত করিয়াছেন বেদান্ত তাহা করেন নাই। বেদের বিবিধ সম্বন্ধ ও বেদান্তের স্বরূপ ও নির্ব্বিকার ভাব এ উভয় একত্র মিলিত না হইলে কখন জ্ঞান ও হৃদয় এ দুই যুগপৎ উন্মুক্ত ও চরিতার্থ হইতে পারে না। বেদে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে তন্মধ্যে স্বরূপসমূহ নাই তাহা নহে, তবে এই স্বরূপ সমূহ সম্বন্ধ দ্বারা ক্রমশঃ আবৃত যে সম্বন্ধ যে প্রকার পরিস্ফুট, স্বরূপ সে প্রকার নহে। বেদান্ত এই অপরিস্ফুট অংশ পরিস্ফুট করিতে গিয়া সম্বন্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। বেদ ও বেদান্তের যে এই বিচ্ছেদ বর্ত্তমান আরাধনায় তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে। আমাদের আরাধনাতে কেবল বেদান্ত বা কেবল বেদের প্রভাব নাই, এজন্যই বৈদান্তিক সমুদায় সম্বন্ধবিরহিত শুষ্কভাব, বা বৈদিক মানবীয় বিকারযুক্ত সম্বন্ধবশতঃ অজ্ঞানতা, এ দুই অন্তর্হিত হইয়াছে। বেদের পুরুষভাব বেদান্তের উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্ম পরমপুরুষরূপে আমাদের কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন, ইহা কিছু সামান্য কথা নহে। কোন সাধকের আরাধনায় যদি কেবল বৈদান্তিক বা বৈদিক ভাব থাকে, তাহা হইলে নবীন প্রণালীর আরাধনা তাঁহা কর্ত্তৃক সাধিত হইল না, সুতরাং জ্ঞান ও হৃদয় সমপরিমাণে উন্নত ও সংস্কৃত হইতে পারিল না, হয় তিনি শুষ্ক হৃদয় নয় শীঘ্র কুসংস্কারাপন্ন হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

তৃতীয় ধ্যান—আরাধনায় প্রতিস্বরূপের সহিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অনুস্যূত, যখন রসস্বরূপে (আনন্দে) থাকিয়া ব্রহ্মের আবির্ভাব ঘনতম হইয়া উঠে, তখনই ধ্যানের আরম্ভ। রসস্বরূপে মগ্ন হইয়া অবস্থান ধ্যান। সকল সাধকের সমান মগ্নভাব হয় এ কথা বলা যাইতে পারে না, এজন্য ঘন ও তরল এই দুই প্রকারের ধ্যান আমরা নির্ণয় করিতে পারি। ঘন ধ্যান চিন্তাবর্জ্জিত, কেবল রসপান; তরল ধ্যানে চিন্তা বিদ্যমান। প্রথমটিতে মন বিক্ষেপশূন্য হইয়া অচলভাবে

স্থিতি করে, দ্বিতীয়টিতে মধ্যে মধ্যে বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। আরাধনার গভীরতা ও অগভীরতার উপরে যে ধ্যানের এই দ্বিবিধ অবস্থা নির্ভর করে, ইহা যে কোন সাধক অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

চতুর্থ সাধারণ প্রার্থনা—ধ্যানে রসস্বরূপে নিমগ্ন হইলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা হৃদয়ে প্রবেশ করে না, এ অবস্থায় সাধক কতক্ষণ থাকিতে পারেন? তাঁহাকে তো আবার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সংসারে ফিরিয়া আসিতে গিয়া তিনি ব্রহ্মকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, তাঁহাকে লইয়াই ফিরিয়া আইসেন। ব্রহ্মকে লইয়া ফিরিয়া আসিলে সকল নরনারীর সহিত এক হৃদয়ত্ব জন্মে। সাধারণ প্রার্থনা সে জন্যই সমুদায় নরনারীর সহিত এক হৃদয় হইয়া উচ্চারিত হয়। সাধারণ প্রার্থনা কি ভাবে করা হয়, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখানে আর তৎসম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, সংসারে বিচরণকালে যাহাতে ব্রহ্মকে লইয়া সাধক বিচরণ করিতে পারেন, ব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি স্থির থাকে, এই জন্য এই প্রার্থনা।

পঞ্চম স্তোত্রপাঠ—আরাধনা হইতে সাধারণ প্রার্থনা পর্য্যন্ত উপাসনার বৈদিক বৈদান্তিক বিভাগের শেষ হইল, এখন পৌরাণিক বিভাগের আরম্ভ। পৌরাণিক বিভাগের আরম্ভে কি বেদ বেদান্ত বিলুপ্ত হইল, না বেদ বেদান্তকে বক্ষে লইয়া পুরাণের আগমন? যদি বলি, পুরাণে পরব্রহ্ম কেবল পরম পুরুষ নহেন তিনি জগতের পিতা, মাতা, সুহৃৎ, ইহা আর নূতন কি হইল? বেদেওতো এ সকল সম্বন্ধ আছে। বেদ ও বেদান্তে ব্যক্তিগতসম্বন্ধে পরব্রহ্মের পরিচিন্তন, পুরাণে জনসমাজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন, এ প্রভেদ কিছু সামান্য প্রভেদ নহে। আরাধনা ও ধ্যানে সমুদায় প্রপঞ্চ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্ম সন্নিধানে সাধক গমন করিয়াছিলেন, সাধারণ প্রার্থনাকালে ব্রহ্মকে লইয়া প্রপঞ্চে সাধকের অবতরণ হইয়াছে। এখন বিস্তৃত জনসমাজে পরব্রহ্মের ক্রিয়াদর্শনের সময় উপস্থিত। পুরাণ ও বিধান এ দুই পর্য্যায় শব্দ। ঈশ্বরের অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া পুরাণশব্দের অর্থ। বিধানও তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রতিব্যক্তিতে তাঁহার ক্রিয়া অবিচ্ছেদ ক্রিয়া দেখায় না, বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া প্রদর্শন করে, সমুদায় মানবসমাজে ভগবানের ক্রিয়া দেখিলে তাঁহার অবিচ্ছেদ ক্রিয়া সহজে প্রত্যক্ষ হয়। বেদ ও বেদান্তে যে সকল সম্বন্ধ ও স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই সকল সম্বন্ধ ও স্বরূপের নবীন নবীন ভাব বিস্তৃত জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ পর্য্যালোচনায় সাধক ও ভক্তগণের নিকটে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা সেই সেই নবীন ভাবানুসারে যে সকল নাম দিয়াছেন, সেই নামে সাধারণ জনসমাজের নিকট তিনি পরিচিত হইয়াছেন। স্তোত্র পাঠ কালে ভিন্ন ভিন্ন বিধানের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গৃহীত ঈশ্বর আমাদের নিকটে প্রকাশিত হন। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গৃহীত ঈশ্বরের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সেই সকল সাধুমহাজন অনুস্যূত থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে সেই সেই ভাবে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া তত্তন্নামে প্রখ্যাত করিয়াছেন। সুতরাং উপাসনার ষষ্ঠ অঙ্গে অবতরণ সহজ সাধ্য হয়।

ষষ্ঠ প্রবচন পাঠ—বিবিধ শাস্ত্রের সঙ্গে ঋষিগণ মহাজনগণ চির গ্রথিত রহিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের বাক্যে জন সমাজে জীবিত রহিয়াছেন। "বাক্য শোণিত মাংসে পরিণত হইল" এই শাস্ত্রীয় প্রবচন যৎকালে তাঁহারা পৃথিবীতে ছিলেন, তৎকাল সম্বন্ধে সত্য, কিন্তু যখন তাঁহারা পৃথিবী হইতে অপসৃত হইলেন, তখন তাঁহাদের সেই বাক্য শাস্ত্রাকারে পরিণত হইল; শাস্ত্রই বাক্যের আধার হইল; এবং সেই শাস্ত্রবাক্যেই তাঁহারা বিদ্যমান রহিলেন। ভগবানের বিবিধনাম গ্রহণের সময়ে তাঁহারা সেই নামের অন্তরালে রহিয়াছিলেন, প্রবচন পাঠের সময়ে সাধকের আত্মাতে তাঁহারা স্ফূর্ত্তি পাইলেন, এবং তৎসহ এক হইয়া

গেলেন। এই একাত্মতায় ঈশ্বর লুক্কায়িত হইলেন না, আরও বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইলেন। এখন আর সাধক কেবল আপনার ভাবে ভাবুক নহেন, সাধুমহাজনগণের ভাবে ভাবাপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ঈশ্বরদর্শন পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গভীর হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

সপ্তম বিশেষ প্রার্থনা—এখন সকল ভাবের স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। এই তো বিশেষ প্রার্থনার উপযুক্ত সময়। এসময়ে সামাজিক উপাসনায় উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। উপদেশ দেওয়ার এ উপযুক্ত সময়ই বটে। পূর্ব্বপ্রেরিত উপদেষ্টৃগণের সহিত সাধক যখন একাত্মা হইলেন, তখন পরমগুরুর আত্মাতে আবির্ভাব হইল, এবং তাঁহার নিকট হইতে সাধক যাহা পাইতেছেন, তাহাই উপদেশাকারে প্রকাশ পাইতেছে। যে স্থলে উপদেশ প্রদত্ত হয় না, কেবল বিশেষ প্রার্থনা মাত্র হয়, সে স্থলেও পরমগুরুর সহিত গুপ্ত কথোপকথন বিশেষ প্রার্থনার আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কথোপকথন প্রার্থনায় পরিসমাপ্ত হয় এজন্য বিশেষ প্রার্থনা ইহার নাম করণ অসঙ্গত নহে।

শারদীয় উৎসব।

শারদীয় উৎসবের মাতৃপূজা হইতে আমরা কখন বঞ্চিত হইতে পারি না। বর্ষের মধ্যে চারি দিন বিশেষ ভাবে মার পূজা করিয়া যদি আমরা মাতৃস্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা হইলে সে সুযোগ আমরা হারাইব কেন? বর্ষে বর্ষে মার অনুগ্রহে আমাদের তাঁহার সহিত সম্বন্ধ সুমিষ্ট হইয়া উঠিতেছে ইহা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। ২৫ আশ্বিন বুধবার সপ্তমী পূজার দিবস উৎসবের আরম্ভ। সঙ্গীতানন্তর উপাসনা, উপাসনানন্তর উপদেশ এবং আচার্য্যদেবের ১৮৮২ সনের ১৭ই অক্টোবরের প্রার্থনা পঠিত হয়। উপদেশের সার নিম্নে নিবদ্ধ হইল।

ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য মা স্বয়ং এবার আসিবেন এই তাঁহার অঙ্গীকার। তিনি সন্তানদিগের কল্যাণের জন্য নিয়ত ব্যস্ত। জীবের দুঃখ দেখিয়া তিনি কতবার তাঁহার সন্তানগণকে তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য পাঠাইলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা যাহা হইল তাহাতে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না, তাই যেন তিনি এবার বঙ্গদেশে স্বয়ং আসিয়াছেন। আজ হিন্দুগণ দশবাহু কল্পনা করিয়া মাতৃপূজায় প্রবৃত্ত। দশবাহু কেন, শতবাহু, সহস্রবাহু, অনন্তবাহু কল্পনা করিয়াও মার অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় না। এসকল কল্পনা করিয়া মাকে আচ্ছাদন করা বৈতো নহে। আমরা যে অকল্পিত মার অর্চ্চনা করিয়া থাকি। আমাদের মাকে আচ্ছাদন করে এমন কোন ব্যবধান আমরা সহ্য করিতে পারি না। আমরা যে এতকাল অব্যবধানে মার পূজা করিয়া আসিতেছি তাহার প্রমাণ কি? এমন কোন লোক আছেন যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মার পূজা করিয়া থাকেন? সকল প্রকারের বাহ্য আড়ম্বর ছাড়িয়া সাক্ষাৎ মার অর্চ্চনা করা ইহা কি নূতন নহে? পূজা করিতে হইলেই মূর্ত্তি চাই ইহাইতো পুরাতন পূজার পদ্ধতি। মূর্ত্তি নাই, অথচ পূজা হইতে পারে ইহা সাধারণ লোকে কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে? অন্যের বাড়ীতে মূর্ত্তি পূজা হইতেছে, আমাদের বাড়ীতে সাক্ষাৎ মা আসিয়াছেন, এ কথা বলিতে কি আমরা ভীত হইব? যাহা সত্য তাহা আমরা কি প্রকারে গোপন করিব? মিথ্যার তুল্য পাপ নাই। মা স্বয়ং আসিয়াছেন, অথচ আমরা লোক নিন্দার ভয়ে বলিব তিনি আসেন নাই? মা বৎসরকার দিনে আজই কি আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন? আমাদের বাড়ীতে কি তিনি নিত্য বাস করেন না? অন্য লোকেই বা কেন তাঁহাকে দেখে না, কেন পরোক্ষে তাঁহার পূজা করে আর আমরাই বা কেন তাঁহাকে দেখি আর পূজা করি, ইহার কারণ বলা প্রয়োজন। কি প্রণালীতে মা আমাদের বাড়ীতে আসিলেন আমাদের প্রকাশ করিয়া বলা উচিৎ।

ঈশ্বর আমাদের পিতা, ঈশ্বর আমাদের মাতা। তিনি অগ্রে আমাদের নিকট পিতা হইয়া প্রকাশিত হন, তৎপরে মাতা হইয়া আমাদের নিকটে আসেন। পিতা আমাদের শ্মশানবাসী মহেশ্বর, মাতা অন্তঃপুরচারিণী। পিতা পুত্রকন্যাগণকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতেছেন, তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন, যত দিন না তাহারা বৈরাগ্য ব্রতদ্বারা জিতেন্দ্রিয় সৎ কর্ম্মশীল হইয়া অন্য বাসনা বিবর্জ্জিত হইতেছেন, ততদিন মাতার নিকটে গমন করিতে পিতা অধিকার দেন না, তাহাদিগকে অন্তঃপুরের বাহিরে থাকিতে হয়। ঈশ্বর তনয় ঈশা, নির্ব্বাণপ্রিয় শাক্য, প্রেমে প্রমত্ত গৌরাঙ্গ, ইহাদের সকলকেই আমরা আদর করি, ভক্তির সহিত ইহাদের নাম গ্রহণ করি। ইহাদিগকে লইয়া ইহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ প্রমত্ত রহিয়াছেন, পিতার দিকে মাতার দিকে দৃষ্টি নাই। ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে, তাঁহারা পুত্রেক সর্ব্বস্ব করিতে গিয়া

পিতামাতাকে হারাইয়াছেন। পুত্র আসিলেন পিতার আদেশে, পিতার কথা লোকের নিকটে বলিতে। পুত্রতো আপনার খ্যাতি গৌরবের জন্য আসেন নাই, যাহারা পিতাকে পশ্চাতে রাখিয়া পুত্রের গৌরব মুখে খ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া মনে করিল তাহারা পুত্রের সন্তোষ লাভ করিবে, পুত্রের সন্তোষ লাভ করা দূরে থাকুক তাহাদের হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, নানা কুসংস্কারে আবৃত হইল। তাহারা মা পাইল পিতাকে না পাইল পুত্রকে। এসকল লোক সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিতার পূজা করিবে, ইহা কি কখন সম্ভব? যদি পিতাকে না পাইল তবে মাতার নিকটে তাহারা গমন করিবে কি প্রকারে?

আমরা শাক্য, ঈশা, গৌর প্রভৃতিকে শ্রদ্ধা করি কেন, সম্মান করি কেন, গৌরব দান করি কেন? তাঁহারা পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত এই জন্য। যদি তাঁহারা না আসিতেন, লোকের মন পিতাকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত না। শাক্য আসিয়া সমুদায় বাসনা প্রবৃত্তির অগ্নি নিবাইলেন, লোকের চিত্ত প্রস্তুত করিলেন, তাই ঈশার আসিবার সময় হইল। যে হৃদয়ে নিজের ইচ্ছা অভিলাষ প্রবল সে হৃদয়ে কি ঈশ্বরের ইচ্ছার সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতে পারে? কেবল শাক্য পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ প্রবৃত্তি বাসনাকে নিবাইয়া ফেলাই সর্ব্বস্ব মনে করিলেন, সেখানেই তাঁহাদিগের গতি স্থগিত হইল, তাই ঈশার আগমনের সময় হইল। সকল প্রবৃত্তিবাসনা বাল্যকাল হইতে তাঁহাতে নিবৃত্ত ছিল, ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে। তাঁহার বাল্যসখা জন তাঁহাকে নির্দ্দোষ মেষশিশু বলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছেন। যিহুদিগণ যদিও তাঁহার খ্যাতি বিনষ্ট করিবার জন্য তাঁহার কুৎসায় পূর্ণগ্রন্থ রচনা করিয়াছে, আমরা সে কথায় কর্ণপাত করিতে পারি না। জন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট প্রমাণ, কেননা নির্ব্বাণের ভূমি হইতে ঈশার জীবনের কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। তিনি নির্দ্দোষ মেষশিশু না হইলে পিতার ইচ্ছানুগত হইবেন কি প্রকারে? বাল্যকাল হইতে যে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আইসে নাই, তাঁহার কথা শুনিয়া আসিয়াছে, সেই ঈশার মত পুত্র হইতে পারে। ঈশা ক্রুশে প্রাণ দিয়া পিতার বাধ্য সন্তান কি প্রকারে হইতে হয় দেখাইলেন। হিন্দুগণ সুখশান্তির ভিতরে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন। দুঃখ ক্লেশ নিবৃত্ত করিয়া শান্ত ও সুখী না হইলে ব্রহ্মদর্শন ঘটিল না, এই তাহাদের বিশ্বাস। ঈশা দুঃখ ক্লেশ বিপদের মধ্যে পিতার মুখদর্শন আরও উজ্জ্বল হয় ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন। সুখে শান্তিতে দুঃখে বিপদে পিতৃদর্শন তিনি সম্ভবপর করিলেন। বাইবেলে লিখিত ঈশা বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছেন, তাঁহার বিচারে উত্তীর্ণ না হইলে কেহই পিতার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে না। এ কথার মধ্যে সত্য আছে। সকল বাসনা বিকার ঘুচিয়াছে, বিরুদ্ধ অভিলাষ নিবৃত্ত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বিবেক সাক্ষ্য দান না করিলে, যখন স্বর্গরাজ্যের প্রজা হইতে পারা যায় না, তখন ঈশার বিচারে বিচারিত হইয়া স্বর্গে প্রবেশ করিতে হইবে, একথা সত্য বৈ কি?

ঈশা মধ্যবর্ত্তী হইতে আসেন নাই, মধ্যবর্ত্তী উড়াইয়া দিতে আসিয়াছেন। তিনি পবিত্রাত্মার হস্তে সমুদায় মণ্ডলীকে অর্পণ করিয়া গেলেন, পবিত্রাত্মা তাঁহার অনুযায়িবর্গের পথপ্রদর্শক হইবেন, একথার অর্থ কি? তিনি যেমন স্বয়ং পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেন, তাঁহার লোকেরাও সেই প্রকার পরিচালিত হইবেন, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের পরিচালনা তাঁহার লোকদিগের সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। আপনার ইচ্ছা বলিদান করিলে পিতা তাহার নিকটে প্রকাশিত হন, তাহার সকল ভার আপনি গ্রহণ করেন, ঈশা কি এই কথা বলেন নাই? তবে আর তাঁহার প্রতি মধ্যবর্ত্তিত্বের দোষারোপ কেন? পুত্রের ভিতর দিয়া আর পিতাকে দেখিতে হইবে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া, সূর্য্যের ভিতর দিয়া, নানা পদার্থের ভিতর দিয়া ব্রহ্মদর্শন করিতেন, এখন আর আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে না। এখন তিনি আমাদের নিকটে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আসিয়াছেন। এই দুর্গোৎসবের সময়ে আমাদের বাড়ীতে মা স্বয়ং আসিয়াছেন, আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে দেখিয়া পূজা করিতেছি, একথা আমরা এই জন্য বলিতে পারিতেছি যে পিতা শাক্য ঈশা প্রভৃতি দ্বারা যে শিক্ষা দিয়াছেন সেই শিক্ষার আমরা অনুবর্ত্তন করিতেছি। পিতা অনুমতি দিয়াছেন, তাই মা আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত। মহেশ্বরের নিকটে সাধকের বাড়ীতে আসিবার জন্য মা তাঁহার অনুমতি চাহিতেছেন, এই যে এদেশে আখ্যায়িকা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সত্য এই জন্য যে, পিতার শাসনে শাসিত হইয়া সকল বিরুদ্ধ বাসনা নিবৃত্ত না হইলে মাতৃদর্শন কখন ঘটিতে পারে না। মাতৃপূজা সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের সকলের হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, দৃষ্টিকে পবিত্র করিতে হইবে। এই বিশুদ্ধ মনে বিশুদ্ধ হৃদয়ে, পবিত্র দৃষ্টিতে দেখিলে তবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মাকে দেখিবার আমরা অধিকার পাইব। তখন দেখিব মা স্বয়ং নিজহস্তে আমাদিগকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন, আমাদিগকে কত প্রকারে যত্ন করিতেছেন, যদি কখন তিনি আমাদিগকে তিক্ত ঔষধ সেবন করান, আমাদের পক্ষে তাহা অমৃত হইবে। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের তো আনন্দের সীমা থাকিবে না, দেখিব তিনি কোটি কোটি হস্ত বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে আমাদিগের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। আর আমাদিগকে অদর্শনযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। পিতা যদি আমাদিগকে অনুমতি না দিতেন, আমরা কি আজ আর সাক্ষাৎসম্বন্ধে মার পূজা করিতে পারিতাম। পিতা আমাদিগকে যে অধিকার দিয়াছেন, সে অধিকার আমরা যাহাতে না হারাই, তজ্জন্য যেন আমরা নিয়ত যত্নশীল থাকি। আমাদের জীবনে যেন কখন সে প্রকার অপরাধ না ঘটে, যাহাতে আমরা প্রাপ্ত অধিকার হইতে

বঞ্চিত হই। কৃপানিধান পরমেশ্বর আমাদিগকে যে অধিকার দিয়াছেন, তিনিই কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাহাতে রক্ষা করুন এই তাঁহার নিকটে বিনীত ভিক্ষা।

২৬শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার ভাই দীননাথ মজুমদার উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সার আমাদের হস্তগত হয় নাই। হস্তগত হইলে প্রকাশ করিতে অভিলাষ রহিল।

২৭শে আশ্বিন শুক্রবার নবমী। অদ্য উপাসনান্তে আচার্য্যদেবের ১৮৮১ সনের ২২শে অক্টোবরের প্রার্থনা পাঠানন্তর যে উপদেশ হয় তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে ;—

আমরা বৎসরে বৎসরে এই সময়ে বিশেষ ভাবে মাতৃপূজা করিয়া আসিতেছি। এই মাতৃপূজায় যদি আমাদের আত্মার শক্তি না বাড়ে তাহা হইলে এ পূজা যে বৃথা আড়ম্বর ইহাই প্রমাণিত হইবে। 'শক্তি পূজা কথার কথা নয়' এই বাক্যের আমরা লক্ষ্যস্থল হইব। শক্তি পূজা করিয়া আমরা শক্তিহীন, ইহা উপহাসের ব্যাপার নহে। যদি কোন ফল না হইল তবে ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, আমাদের বার্ষিক শারদীয় উৎসব কেবল ঋণ বৃদ্ধির জন্য, লোকদিগকে মিথ্যা আড়ম্বরে রক্ষিত করিবার জন্য। মাতৃপূজা করিয়া আমাদের কিছু হইতেছে না, এই কথা কি আমরাও বলিব? মাতৃপূজা মহাশক্তির পূজা, জয়শক্তির অর্চ্চনা। যাহারা মাতৃপূজা করে, তাহারা নিশ্চয় জয়ী হয়। রিপুগণের সাধ্য কি যে তাহাদিগকে পরাজয় করে। এই পূজায় দুর্জ্জয় বললাভ হয়, সে বলের নিকটে প্রবৃত্তি বাসনার বিক্রম কি দাঁড়াইতে পারে? যেখানে জয় নাই, সেখানে মাতৃপূজা হইল না। মার সন্তান কে? যে বিজয়ী। মার যতগুলি সন্তান পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই তো শত্রুর নিকটে পরাজয় স্বীকার করেন নাই। জনমে মরণে সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের জয় হইয়াছে। মাকে আমরা সর্ব্বোপরি আদর করি, কিন্তু মার বিজয়ী সন্তানগণকে কি আমরা অনাদর করিতে পারি? তাঁহারা পৃথিবীতে বীরত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহারা যে মহাশক্তির সন্তান, সংসারসংগ্রামে তাহা প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বল বাহুবল নহে পুণ্যের বল। বাহুবল রিপুবলের নিকট পরাস্ত। প্রবল সম্রাট ষড়রিপুর করতলস্থ। সংগ্রামে সেনা জয় করিলেই কেহ বীর হয় না, যে পাপরিপু জয় করিতে পারে সেই বীর। পৃথিবী তো মার সন্তানগণের শরীর বিনাশ করে, কিন্তু তাহাদিগের পুণ্যবলকে স্পর্শ করিতে পারে না। বরং দেহ বিনাশে তাঁহাদের পুণ্যবল আরও বিক্রম প্রকাশ করিতে অবকাশ পায়। শাক্য কঠোর তপস্যা দ্বারা রিপু জয় করিতে যত্ন করিলেন। পুরুষকারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইলেন। কিন্তু ইহাতে কি রিপুজয়ে কৃতার্থ হইলেন? যতদিন না তাঁহার আপনার সামর্থ্যের অভিমান চলিয়া গেল, কঠোর ব্রতাচরণ পরিত্যাগ করিয়া মধ্য পথ অবলম্বন না করিলেন, ততদিন তিনি সিদ্ধ মনোরথ হইলেন না। যাই মধ্য পথ আশ্রয় করিলেন অমনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। দৈহিক বা মানসিক কোন বলই কার্য্যকর নহে। আত্মা স্বয়ং অশক্ত, সেই বা কি করিবে? স্বর্গ হইতে দৈবশক্তি অবতরণ না করিলে শাক্য কি কখন কৃতার্থ হইতে পারিতেন? ঈশা পাপরিপুকে পরাজয় করিলেন, তাহার আনীত সকল পরীক্ষা তাঁহার নিকটে অকর্ম্মণ্য হইল। কিন্তু তিনি কি আপনার বলে এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করিলেন? তিনি যখন পরীক্ষার্থ বিজন অরণ্যানীতে নীত হইয়াছিলেন, তখন তিনি পবিত্রাত্মা দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। ঈশ্বর তনয়গণের তেজ ব্রহ্মতেজ, সে তেজ পাপ কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। ঈশ্বরতনয় যিনি তিনি ব্রহ্মতেজে তেজস্বান্। তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া যত্ন করিয়া বহু আয়াস স্বীকার করিয়া রিপুজয় করিতে হয় না, তাঁহার তেজঃপূর্ণ কথায় রিপুজয় হয়। বহু প্রয়াস স্বীকার করিলে যদি রিপুজয় হইত তাহা হইলে শাক্য কখন মধ্যপথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেন না। বীর ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই বীর ধর্ম্ম শক্তির উপাসকগণ আশ্রয় করিয়া কেন পাপাচারে ডুবিলেন। বামাচারিগণ বীরাচারী, অথচ এই বীরাচারে কেন তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটিল? তাহারা আপনাদিগকে প্রবল প্রলোভন দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া মনে করিল, তাহারা প্রবল পুরুষকারে সে গুলিকে আত্মবশে আনয়ন করিবে। কিন্তু ফলে এই দাঁড়াইল যে তাহাদের ন্যায় দুরাচারী আর কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় নাই। তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি ধন সম্পদ ঐশ্বর্য্য যশ মান খ্যাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হও না কেন, তোমার তীব্র সাধন সে সকলের প্রলোভন হইতে তোমায় রক্ষা করিবে, এরূপ কখন মনে করিও না। তোমার পূর্ব্বে যাঁহারা এসম্বন্ধে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কথা স্মরণ কর। তাঁহারা কেহই পুরুষকারবিহীন ছিলেন না, কিন্তু পুরুষকার তাঁহাদিগের পাপে নিপতন বারণ করিতে পারে নাই। তুমি মনে করিতেছ একটি একটি করিয়া রিপু জয় করিবে, একবার একটিকে জয় করিলে, সে আর তোমায় উপরে কোন দিন বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিবে না, ইহা তোমার ভ্রম। পরাজিত রিপু সময় পাইলেই তোমাকে স্ববশে আনিবে। রিপু পরাজিত হইয়াছে এই ভাবিয়া তুমি অনবধান হইবে, আর তোমার সেই অনবধানকালে তোমায় গোপনে আক্রমণ করিয়া তোমায় দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। তোমাতে কখন আলস্য জড়তা অনবধানতা উপস্থিত হইবে না ইহা কি তুমি মনে করিতে পার? যদি মার জয়শক্তি নিরন্তর তোমায় রক্ষা না করে, তাহা হইলে তুমি কি রিপুর বিক্রম আত্মবলে অতিক্রম করিতে পারিবে? শুদ্ধাত্মা ব্রহ্মচারী হইলে মা তোমায় রক্ষা করিবেন, যদি ইহাই নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে সেই তো সাধনের উপরেই আবার মার কৃপা নির্ভর করিল।

সাধন কি? কৃচ্ছ্র, কঠোর সাধন নহে, নিজ পুরুষকারের পরিচয় দান নহে, কিন্তু যেখানে মা তোমায় বসাইয়াছেন, যে অবস্থায় রাখিয়াছেন সেখানে স্থির অটল ভাবে স্থিতি করা। সেখানে থাকিলে মা তোমায় কিরূপে চলিতে হইবে, সকলই বলিয়া দিবেন, তাঁর মতে চলিয়া তুমি জয় লাভ করিবে। তুমি তোমার নির্দ্দিষ্ট অধিকার মধ্যে যখন আছ, তখন সেখানে তোমায় পরাজয় করে কাহার সাধ্য? তুমি যদি আপনার অধিকার ছাড়িয়া অপরের অধিকার গ্রহণ করিতে যাও, মা তোমায় যে সকল অবস্থার মধ্যে লইয়া যান, সে সকল অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিজের অবস্থা নিজে উৎপাদন করিতে যত্ন কর, দেখিবে তুমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ, পদে পদে তোমার পরাজয় হইতেছে। তোমার স্বভাব ও প্রকৃতি মধ্যে স্বয়ং দেবী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সেই স্বভাব ও প্রকৃতি তোমার অধিকার কি বলিয়া যাইতেছে, এবং সেই অধিকার উপযোগী অবস্থা সকল তোমার নিকটে উপস্থিত হইতেছে। ইহার অর্থ কি জান? মা তোমার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে কার্য্য করিতেছেন, তিনি তোমার সকল বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন। তুমি যদি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে অবস্থান কর, সেখানে কোন রিপু প্রবেশ করিয়া তোমায় পরাজয় করিতে পারিবে না। অপরের দৃষ্টান্তে তুমি যে দিন তোমার অধিকারের ভূমি ছাড়িয়া অপরের অধিকারভূমি অধিকার করিতে যত্ন করিবে, জানিবে, সেই দিন হইতে তোমার বলক্ষয়ের আরম্ভ হইল। তুমি আপনার অধিকারভূমির মধ্যে থাক, দেখিবে তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই তুমি পাইতেছ। তুমি দুর্ব্বল হইয়াও কি প্রকারে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতেছ, ইহা বুঝিতে না পারিয়া লোকে নিতান্ত আশ্চর্য্য হইবে। কে তোমার বল, কে তোমার শক্তি, কোথা হইতে বিজয় আসিতেছে ইহা বুঝিতে না পারিয়া তোমারই উপরে তাহারা সমুদায় প্রশংস বর্ষণ করিবে, কিন্তু তুমি জান, এ জয় তোমা হইতে নহে, জননী হইতে। লোকে তোমায় কত প্রশংসা করিতেছে, তোমার খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইহাতে তোমার চিত্তে অভিমান সঞ্চারিত হইতেছে না। মা যখন আমাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবদ্ধ তিনি যখন আমাদিগকে জয়যুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প, তখন আমরা বিশেষভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি তাঁহার বলে বলী হই, তাঁহার বিজয়নিশান নিখাত করি। আমাদের শক্তি পূজা যে ব্যর্থ নয়, তাহা যেন আমাদের জীবনে সপ্রমাণিত হয়, মা জননীর নিকটে আমাদের এই ভিক্ষা।

২৮শে আশ্বিন শনিবার দশমী। অদ্য ভাই দীননাথ মজুমদার উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার উপদেশের সার আমাদের হস্তগত হয় নাই, হস্তগত হইলে উহা প্রকাশ করিবার অভিলাষ রহিল। উৎসবে প্রতিদিন সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তন, প্রার্থনা ও আচার্য্যদেবের উপদেশ পঠিত হয়। প্রতিদিন ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাগণ উৎসবে যোগ দিয়াছেন, এবং সকলেই উৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন। আমাদের প্রার্থনা এই, তাঁহাদের গৃহে জননী প্রতিদিন সাক্ষাৎসম্বন্ধে পূজিত হউন, এবং এইরূপে তাঁহারা উৎসবের স্থায়ী ফল লাভ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব

বুদ্ধি। তুমি কি মনে কর সমুদায় পৃথিবীতে তোমার আদর হইবে, লোকে আর নিজ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিবে না, কত দিনে পৃথিবীর এ অবস্থা হইবে বলিতে পার?

বিবেক। সমুদায় পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আজ অল্পসংখ্যক লোকে তাঁহার রাজ্যের বাধ্য প্রজা হইয়াছে, অধিকাংশ লোক আনুগত্য স্বীকার না করিয়া অন্ধকারের পথে ভ্রমণ করিতেছে, সুদূর ভবিষ্যতে এ প্রকার অবস্থা থাকিবে না। তবে এ সম্বন্ধে তোমার একটী কথা মনে রাখা উচিত, আর দশ সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীতে কতকগুলি লোক এত অগ্রগামী হইবেন যে তাঁহাদের নিকট এখনকার অগ্রগামী ব্যক্তিগণের অবস্থা সাধারণ লোকের অবস্থার তুল্য পরিগণিত হইবে।

বুদ্ধি। এখনকার অগ্রগামী লোক সকল যদি দশ সহস্র বর্ষ পরে সাধারণ লোকের মধ্যে পরিগণিত হন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ঈশ্বরের রাজ্য বর্ত্তমানে একটুও অগ্রসর হয় নাই। তখনকার অগ্রগামী লোক সকল আর দশ সহস্র বর্ষ পরে যদি সাধারণ লোক হইয়া যান তাহা হইলে ঈশ্বরের রাজ্য আর কৈ বিস্তার হইল।

বিবেক। ঈশ্বরের রাজ্যে উন্নত, উন্নততর উন্নততম থাকিবে না, ইহা তুমি কেন মনে করিতেছ। যাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁহারাই তাঁহার রাজ্যের লোক। দর্শন ও শ্রবণের পরিধি দিন দিন বাড়িতে থাকিবে ইহা কি তুমি বুঝিতেছ না? যিনি অনন্ত তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ দশ সহস্র বিশ সহস্র বর্ষে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, ইহা কি তুমি মনে করিতে পার? সাধক যত অগ্রসর হইবেন তত তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ শক্তি বাড়িতে থাকিবে। সকলেরই একই সময়ে শক্তি বাড়িবে ইহা কখন হইতে পারে না, সুতরাং উন্নত, উন্নততর, উন্নততম এরূপ শ্রেণী নিবন্ধন অবশ্যম্ভাবী।

প্রাপ্ত।

সৎপ্রসঙ্গ।

(পঞ্চম প্রস্তাব)

পাপ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তোমার এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর অন্যত্র প্রদান করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। এখানে এই সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে গেলে এ প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তবে এখানে আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে, উহার একটিরও কর্ত্তা ঈশ্বর নহেন। উহার কোন কোনটীর কারণ মানবীয় দুর্ব্বলতা কোন কোনটীর কারণ জড়ীয় দুর্ব্বলতা। পশুর যেমন শক্তি আছে, তাহা হইতে যেমন কার্য্যাকার্য্যের উৎপত্তি হয় তেমনি জড়েরও শক্তি আছে, তাহা হইতেও কার্য্যাকার্য্য উভয়ই হইয়া থাকে। মানবীয় অজ্ঞানতা (দুর্ব্বলতা) হইতে যুদ্ধ প্রভৃতিতে যেমন লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের জীবন বিনষ্ট হইতেছে তেমনি জড়ীয় দুর্ব্বলতাবশতঃ ঝটিকা, জলপ্লাবনাদিতেও লক্ষ লক্ষ প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানবীয় অজ্ঞানতাই ব্যাধির কারণ। মানবীয় অজ্ঞানতা হইতে ঈশ্বরের নিয়ম অর্থাৎ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলেই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্যাধি দ্বারা যে মৃত্যু হয় তাহাই যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু উহা স্বাভাবিক মৃত্যু নহে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উহাকে আগন্তুক মৃত্যু বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। স্বাভাবিক অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়োজিত মৃত্যুতে কোন যন্ত্রণা নাই। দেহ বৃদ্ধির সময় যেমন কোন যন্ত্রণা নাই তেমনি একথা নিশ্চয় যে ক্ষয়ের সময়ও কোন যন্ত্রণা নাই। যদি স্বাভাবিক নিয়ম অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারা যায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিনা যন্ত্রণায় দেহক্ষয় (মৃত্যু) হইবে। স্বাভাবিক নিয়মে বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ কালে যে দেহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহাতে যে কোন যন্ত্রণা অনুভব হয় না তাহাই এবিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যদি স্বাভাবিক নিয়মে থাকিতে পারা যায় তাহা হইলে সন্তান প্রসব কালেও নিশ্চয়ই কোন যন্ত্রণা হইবে না। বিনা যন্ত্রণায় ও সামান্য যন্ত্রণায় আমরা দুই একটী জননীকে সন্তান প্রসব করিতে দেখিয়াছি, বোধ করি এইরূপ আরও কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবেন। ইহাতেই আমাদের বিশ্বাস গর্ভবতী স্বাভাবিক (ঈশ্বরের) নিয়ম লঙ্ঘন করাতেই প্রসবকালে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে গর্ভবতীর সম্বন্ধে কতকগুলি সদাচার উক্ত হইয়াছে, আজকালের গর্ভবতী দিগকে তাহার কিছুই প্রতিপালন করিতে দেখা যায় না। যাই হউক, প্রসব যন্ত্রণা যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, আসন্ন প্রসবার প্রসব যন্ত্রণাদি যে স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাতেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। আমরা যে প্রতিদিন মল, মূত্র ত্যাগ করি ইহাকে অবশ্যই স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া তোমায় স্বীকার করিতে হইবে। দেখ, আমাদের অনাচারবশতঃ কোন কোন দিন সেই মল, মূত্র ত্যাগে ও আমাদের যন্ত্রণা উপস্থিত হয় কিন্তু সুনিয়মে থাকিলে হয় না, ইহার দ্বারাইত বুঝিতে পারা যায় যে সুনিয়মে থাকিলে মল মূত্র ত্যাগে কোন যন্ত্রণা নাই, ইহা যুক্তির কথা নয়, ইহা সর্ব্বদাই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। অতএব সন্তান প্রসব সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

'বিষ বৃক্ষোঽপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তু মসাম্প্রতং।

অজ্ঞান মানুষেরই যখন প্রবৃত্তি এইরূপ তখন পবিত্র, পূর্ণ জ্ঞানী, নীতিবান ঈশ্বরে তুমি কিজন্য এই সকল কলঙ্ক প্রদান করিতে চাও তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

তোমার আর এক আপত্তি এই যে দুঃখ কষ্ট যদি মঙ্গলের কারণ না হয় তাহা হইলে সাধুরা কেন দুঃখ কষ্টকে তাঁহাদের মঙ্গলের কারণ বলিয়াছেন? এ কথার উত্তর পূর্ব্বে সংক্ষেপে দিয়াছি। এখানে একটু বিস্তার করিয়া দেওয়া যাইতেছে। দুঃখ কষ্টকে যে সাধুরা তাঁহাদের মঙ্গলের কারণ বলেন, তাহা বলিবার কারণ তাঁহাদের অধ্যাত্ম স্বাধীনতা অর্থাৎ ঈশ্বরের একান্ত যুক্ততা। (পূর্ব্বে ঈশার মৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে এই স্থলে ভ্রমবশতঃ অযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে) যাঁহারা অধ্যাত্ম স্বাধীন তাঁহারা সমস্ত বিষয়েই ঈশ্বরের ন্যায় হইতে ইচ্ছা করেন (ঈশ্বর যেমন শত্রু, মিত্র পাপী সাধু প্রভৃতিকে সমান ভাবে দেখেন, তেমনি তাঁহারাও দেখেন।) ঈশ্বরকে যেমন কেহ দুঃখে কাতর করিতে পারে না, কখন নিরানন্দ করিতে পারে না, তেমনি ঈশ্বরযুক্ত সাধুরাও মহাদুঃখে কাতর হন না নিরানন্দ হন না। ঈশ্বর যেমন অনায়াসে অসংখ্য জগতের ভার বহন করিতেছেন, পৃথিবীর পাপ অত্যাচার সহ্য করিতেছেন তেমনি তাঁহারাও ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাইয়া অসংখ্য দুঃখ ভার বহন করেন। তাঁহাদের জীবন ঈশ্বরের হস্তে এজন্য তাঁহাদিগকে কিছুতেই কাতর করিতে পারে না। মনে কর যাহার চারিদিকে প্রখর সূর্য্যরশ্মি বিদ্যমান থাকে সে কি কখন শীতে কাতর হয়? সাধুরা যে দুঃখে কষ্টে কাতর হন না শত্রু মিত্র উভয়কে যে তাঁহাদের মিত্র জ্ঞান করেন ইহাই তাঁহাদের অধ্যাত্ম স্বাধীনতার অর্থাৎ ঈশ্বর পরায়ণতার প্রমাণ। এই সকল লক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে আছে এজন্যই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা ঈশ্বরের হইয়াছেন। অধ্যাত্ম স্বাধীনগণ, ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত উন্নতি প্রত্যক্ষ করিয়া পার্থিব সুখ ও তৎপ্রলোভন ত্যাগ করতঃ ঈশ্বরের একান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে দণ্ডায়মান। তাঁহারা পৃথিবীর সুখ চান না, পার্থিব সুখের দিকে তাকান না, কি জানি পাছে পৃথিবীর ক্ষণিক সুখে ভুলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের ঈশ্বরকে ও অনন্ত উন্নতিকে হারা হন। এই জন্য সাধুরা পর্য্যায়ক্রমে কেবলমাত্র পৃথিবীর দুঃখই চান কারণ, তাহা হইতে তাহাদের পৃথিবীর প্রতি বীতরাগের ও ঈশ্বরানুরাগের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে ক্রমেই তাঁহারা পৃথিবী হইতে দূরে প্রস্থান করেন ও ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হন। সাধুরা যে দুঃখকষ্টকে তাঁহাদের

মঙ্গলের হেতু বলেন ও সর্ব্বদা দুঃখকষ্টই প্রার্থনা করেন তাহার কারণ ইহাই। কিন্তু তাঁহারা দুঃখকষ্ট পৃথিবীর জন্য চান না, তাঁহাদের নিজের জন্য চান।

সাধুরা বলেন সকল কার্য্যই ঈশ্বর করেন, তাঁহাদের আহারীয় দ্রব্যাদি ঈশ্বর স্বয়ং প্রস্তুত ও পাণীয় জল ঈশ্বর স্বয়ং আনয়ন করেন। এই সূত্র ধরিয়া তুমি বল, চুরি, ডাকাইতী নর হত্যাদিও ঈশ্বর করেন। তোমার এ সিদ্ধান্ত যে ভ্রম তাহা শ্রবণ কর। ঈশ্বরের একান্ত অধীন সাধু, সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন যে, মানুষের শক্তি ঈশ্বরের শক্তির একান্তই অধীন। মানুষ যে কার্য্যই করে সাধুরা ঈশ্বরের শক্তিকে তাহার মূলে দেখিতে পান। সাধুরা দেখিতে পান, শক্তিতে ইচ্ছাতে মানুষ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত না থাকিলে অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বর ভাবাপন্ন না থাকিলে কোন কার্য্য করিতে পারে না, তাই তাঁহারা বলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে সকল কার্য্যই ঈশ্বর করেন। নরহত্যা ও পরদারাদি কোন কার্য্য নহে, সে গুলিন অকার্য্য। মনুষ্য যখন অজ্ঞানতাবশতঃ কাম ক্রোধ লোভাদির আতিশয্য হেতু ঈশ্বরের ভাবসকল বিস্মৃত হয়, ঈশ্বরের শক্তিকে ও ইচ্ছাকে অতিক্রম করিতে যায় তখন তাহার কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না সুতরাং সে তখন পরদার নরহত্যা, চুরি, ডাকাইতী প্রভৃতি কার্য্য করে। ঈশ্বরের শক্তি বা তদধীন মনুষ্য শক্তি হইতে নরহত্যাদি হইতে পারে না কারণ ঐসমস্ত কোন শক্তির কার্য্য নহে, উহাতে কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। ঐসকল মনুষ্যের দুর্ব্বলতা সমুৎপন্ন। ঈশ্বরের একান্ত অধীন তদ্‌যুক্ত সাধুগণ, সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করেন যে মানুষের শক্তি ক্ষুদ্র ও সীমাবিশিষ্ট, ঈশ্বরের শক্তি অনাদি অনন্ত জন্য মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত কারণে ঈশ্বর-শক্তিকে কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না। সময়ে সময়ে অতিক্রম করিতে গিয়া নানাবিধ অকার্য্য (পাপ) করিয়া এবং তজ্জন্য স্বতঃই বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ঈশ্বরের বিবেক দ্বারা আক্রান্ত (ধৃত) হইয়া পুনরায় সে একদিন না একদিন ঈশ্বরের অনুগত হয়। এবং ঈশ্বরের বশে থাকিয়া পুনরায় জগতের হিতপ্রদ যে কার্য্য তাহাই করিয়া থাকে। এই কারণেই তাঁহারা বলেন যে তাঁহাদের সমুদায় কার্য্য ঈশ্বর করেন। মানুষ ঈশ্বরের বশে না থাকিলে যখন কোন কার্য্য করিতে পারে না তখন তাঁহারা এরূপ না বলিবেন কেন? কার্য্যের অর্থ যাহা জগতের হিতপ্রদ। যাহা জগতকে দুঃখ কষ্ট দেয় তাহা কার্য্য নহে। তবে যে সৎকার্য্য অসৎকার্য্য সুঘটনা দুর্ঘটনাদি বলা হয় সে কেবল কার্য্যগুলিকে অকার্য্য হইতে পৃথক করিবার জন্য, বস্তুত অসৎ বলিয়া কোন কার্য্য নাই।

ভক্ত বলেন, দুঃখ কষ্টই তাঁহার মঙ্গলের কারণ। ভক্তের এরূপ বলিবার কারণ এই যে ভক্তেরা দুঃখ কষ্টের মধ্যে, দুঃখের পরিবর্ত্তে প্রভূত সুখ (মঙ্গল) আনয়নের জন্য সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করেন। পৃথিবী যতই ভক্তকে দুঃখ কষ্ট দেয়, ঈশ্বর ততই সে সকল দূর করিয়া [illegible] ভক্তকে ততোধিক সুখ প্রদান করেন। ততই আপনার নিকটে লইয়া যান। ভক্ত ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আরও দুঃখ চান, কারণ এ অবস্থায় যতই দুঃখ আসিবে ততই ভক্ত মঙ্গলের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইবেন। ভক্তের সম্বন্ধে দুঃখ কষ্ট যদি মঙ্গলের কারণ হয় তবে তাহা এইরূপ কারণ। ঈশ্বরদর্শী ভক্ত ঈশ্বরের বিবেক বুঝেন তাঁহার কার্য্য দেখেন তাই যত দুঃখ পান ততই ভক্ত ঈশ্বরের (মঙ্গলের) দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু ইহা কেবল ভক্ত সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। পাপী ঈশ্বরকে দেখেনা, স্মরণ করেনা, তাঁহার বিবেক শুনেনা, তাঁহার কার্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে না সুতরাং পাপী দুঃখ দ্বারা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। পাপীর দুঃখের ভিতরে তাহাকে সুখ দিবার জন্য ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত থাকিলেও এবং ঈশ্বর পাপীর দুঃখের অবসান করিয়া তাহাকে ততোধিক সুখ দিলেও সে ঈশ্বরের দিকে যায় না বলিয়া তাহা দেখিতে পায় না ও ভোগ করিতে অধিকারী হয় না। দুঃখ কষ্ট যদি মঙ্গলের বীজ হইবে তাহা হইলে পাপীকে দুঃখ কষ্ট দিলেই পাপীর সুখ হইত, পাপী সাধু হইত, তাহা হয় না কেন? পাপী দুঃখ কষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয় না কেন? পাপীকে তুমি যতই দুঃখ দিবে ততই তাহার পাপ প্রবৃত্তি আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। দেখ রাজা, দুর্বৃত্ত দস্যু চোরদিগকে কত দুঃখ প্রদান করেন, তাহাতে কি তাহাদের পাপ প্রবৃত্তি দূর হয়? তাঁহারা পাপ কার্য্য ত্যাগ করে? রাজা যে পাপীদিগকে শাসন করেন তাহাতে অন্যান্য লোকের দুঃখকষ্টের অনেকাংশে অবসান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পাপী সাধু হয় না। পাপী হৃদয়ে যে পর্য্যন্ত বিবেকের আগুন প্রজ্জলিত না হয়, নরকের যন্ত্রণা প্রবেশ না করে সে অবধি পাপী কিছুতেই সাধু হয় না। ঈশ্বরের রাজ্যে পাপীর প্রকৃত শাসন পাপীকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া নহে, কেবল পাপীর হৃদয়ের অনুতাপের, নরকের আগুণ জ্বালিয়া দেওয়া। সাধুরা এইজন্য পাপীকে ঘৃণা করেন না, পাপীকেও তাঁহারা দুঃখ কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদিগকে কেহ দুঃখ কষ্ট দিলেও তাঁহারা তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, তাহার প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত হন না। আরও ঈশ্বরের নিকটে তাঁহারা কুশল ভিক্ষা করেন।

সাধু মহাপুরুষেরা কখন কখন বিপদকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়াছেন। এই সূত্র ধরিয়া তুমি বিপদের কর্ত্তা (প্রেরক) ঈশ্বর, এই কথা বল। কিন্তু ইহাও যে তোমার ভ্রম ও একদেশ দর্শিতার ফল নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে সাধু ভক্তের সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহাতে আছে যে সাধুরা সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের অনুকরণ করেন। ইহা সাধুদের কুলক্ষণ নহে, সুলক্ষণ বটে। যেহেতু পিতৃগুণকে গ্রহণ ও তদনুকরণ করাই পুত্রের লক্ষণ। মানুষে যেপর্য্যন্ত ইহা প্রবেশ না করে সে অবধি মনুষ্য ঈশ্বরের পুত্র (ভক্ত) হইতে পারে না। মহাদুঃখে ঘোর বিপদে সাধুকে বীরের ন্যায় অবস্থিতি করিতেই হইবে। সাধুকে

ঈশ্বরের ন্যায় সহিষ্ণু অটল অচল ও কাম ক্রোধাদি শূন্য হইতেই হইবে। পৃথিবীর নিকটে সাধুকে সর্ব্বদা পরীক্ষা দিতেই হইবে। মহাদুঃখে ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া তাহাকে হাস্য করিতেই হইবে। দুঃখদাতাগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেই হইবে। দুঃখে কিছুমাত্র কাতর হইলে তিনি পৃথিবীর নিকট ঈশ্বরে অবিশ্বাসী অভক্ত হইবেন। পৃথিবীতে সাধু হওয়া সামান্য কথা নয়? সাধু এক দিকে তাঁহার পবিত্র জীবনকে ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া যেমন নিশ্চিন্ত হন তেমনি অন্য দিকে আত্মজীবনকে বিপদ পরীক্ষার সাগরে সর্ব্বদা নিমগ্ন দেখেন। তখন কোন বিপদপরীক্ষায় পতিত হইয়া সাধু ঈশ্বরের নিকটে অবিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হন তজ্জন্য সাধু সর্ব্বদা চিন্তিত। বিপদপরীক্ষার অধীর হইলেই সাধু অসাধু হইবেন, যে পরিমাণে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন তাহা হইতে লক্ষগুণ দূরে প্রস্থান করিবেন। সাধুর পক্ষে ইহা সামান্য ভাবনার ও অধোন্নতির বিষয় নয়। সাধু দেখিলেন, আত্মজীবন আত্ম কর্ত্তৃত্বাদি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, জীবনের ভাবনা কর্ত্তৃত্বের ভাবনা আর তাঁহার নাই। কিন্তু অজ্ঞান পৃথিবী, জড় প্রকৃতি নানাবিধ বিপদ পরীক্ষা প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে ঈশ্বরে অবস্থিতি করিতে দিতেছে না। নিশ্চিন্ত মনে সাধুকে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে দিতেছে না। বিশেষ এই কারণবশতঃ হঠাৎ ব্রহ্মানুরাগের হ্রাস হইয়া সাধুর ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইবারও সম্ভাবনা। ইহাই দেখিয়া সাধু বিপদপরীক্ষার ভাবনা হইতে মুক্ত পাইবার জন্য সমুদায় বিপদপরীক্ষাকেও ঈশ্বরে অর্পণ করিলেন। সাধুর সম্বন্ধীয় বিপদপরীক্ষাগুলি তখন হইতে ঈশ্বরের হইল, সাধু এইরূপে বিপদের চিন্তা হইতে মুক্তি পাইলেন। পূর্ব্বে আত্মজীবন কর্ত্তৃত্বাদি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া সে চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিপদপরীক্ষা গুলিকেও ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঐ চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া সাধু চিরশান্তি লাভ করিলেন। অর্থাৎ সাধু তাঁহার সম্পর্কীয় সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ সকল ঈশ্বরের প্রেরিত এই বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, চিরশান্তি লাভ করিলেন। ইহা না করিলে কেহ চিরশান্তি লাভ করিতে পারেন না। অতএব কোন কোন সাধু যে বিপদপরীক্ষাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলেন তাহা এইরূপ কথা। যদি বল, প্রকৃত প্রস্তাবে বিপদপরীক্ষা যখন ঈশ্বরের নহে তখন ঐগুলিকে ঈশ্বরের বলা সাধুর অবশ্যই দুর্ব্বলতা, হউক দুর্ব্বলতা তাহাতে কিছু আইসে যায় না। এ দুর্ব্বলতাও প্রভূত মঙ্গলের। যখন ভক্ত মাত্রের কথা এই যে মানুষ ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়া নরহত্যাদি পাপ করে, লোকদিগকে দুঃখ কষ্ট প্রদান করে, তখন বিপদপরীক্ষার মধ্যে শান্তি আনয়নের জন্য মঙ্গলের অর্থাৎ অনন্ত উন্নতির জন্য ঈশ্বরের হস্ত চিরবর্ত্তমান ব্যতীত বিপদপরীক্ষাগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্ভূত ও তাঁহার প্রেরিত ইহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিব না।

বিপদ, দুঃখ ঈশ্বর হইতে আইসে এই কথা কোন কোন স্থলে সাধুরা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে কথা সাধু এই ভাবে বলেন, যে ভাবে তাঁহারা দুঃখ কষ্টকে তাঁহাদের বন্ধু মনে করেন। উহা সাধুদিগের ভক্তি জনিত উন্মত্ততা ও একান্ত ত্যাগস্বীকার প্রিয়তার পরিচয় মাত্র। এই ভাবকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যে চির শান্তিতে অবস্থিতি করেন তাহার আর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক উহার অর্থ ঈশ্বরই মনুষ্যদিগকে দুঃখ কষ্ট দেন তাহা নহে। তাহা হইলে আর সাধুরা অন্যত্র ঈশ্বরকে অপাপবিদ্ধ বলিবেন কেন? কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ কালও যদি ঈশ্বর প্রাণীদিগকে দুঃখ কষ্ট দেন (হউক তাহা হইতে পারে মঙ্গল) তাহা হইলেও তাঁহাতে পাপস্পর্শ হয় একথা তোমায় স্বীকার করিতেই হইবে, যেহেতু তুমি দুঃখের উৎপাদক মানবকে পাপী বল। যদি পূর্ণ জ্ঞানী ঈশ্বর পরে মঙ্গল করিবেন এই অভিপ্রায়ে বা এই জন্য মনুষ্যাদি প্রাণীগণকে দুঃখ কষ্ট দিতে পারেন, আর তাহাতে পাপী না হন, তবে অপূর্ণ অজ্ঞান মনুষ্য, প্রাণীদিগকে দুঃখ কষ্ট দিতে পারিবে না কেন? চুরি ডাকাইতী নরহত্যাদি করিতে পারিবে না কেন? তাহাতে তাহারাই বা পাপী হইবে কেন? তাহাতে কি পরে তাহাদের মঙ্গল সম্বন্ধ নাই? যদি বল, ঈশ্বর তোমারই ভাবী মঙ্গলের জন্য তোমাকে দুঃখ কষ্ট দেন। একথার উত্তরে আমি বলি যে, হে ঈশ্বর! আমি সুখ চাই না, তুমি আমায় দুঃখ দিও না। যদি বল, তোমার পাপের শাস্তির জন্য তোমাকে দুঃখ কষ্ট পাইতেই হইবে। সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু স্বাভাবিক অজ্ঞানতার জন্য আমি পাপ করি, তাহার জন্য যদি ঈশ্বর আমাকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই প্রদান করেন তাহা হইলে ঈশ্বরের বিবেক তবে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কি করে? বিবেক কি আমায় দুঃখ কষ্ট দিয়া সৎপথে আনিবে? আর একটি কথা এই যে তোমার মতে নরহত্যা চুরি ডাকাইতী প্রভৃতি মানুষের যত বিপদ তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত ও তাঁহার প্রেরিত, তাহা হইলে তুমি আর তোমার ঈশ্বর, তোমরা উভয়ে আমাকে পাপী বল কি হেতুতে, যে আমাকে শাস্তি দিতে চাও? আমি যে নরহত্যাদি করিয়াছি, সেগুলিন বুঝি তোমার ঈশ্বরের প্রেরিত নয়? পুনরায় তুমি যদি বল, তুমি যে লোককে দুঃখ কষ্ট প্রদান কর তাহা তোমার স্বার্থের জন্য, কিন্তু ঈশ্বর তোমার ও জগতের মঙ্গলের জন্যই তোমাকে এবং জগতকে দুঃখ কষ্ট দেন, এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কে বলে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ নাই? তিনি যে জগতের মঙ্গল করেন তাহা কি তাঁহার সুখকর নহে? তাহাতে কি তাঁহার আনন্দ নাই? যদি থাকে তবে এই আনন্দই তাঁহার স্বার্থ।

পাপের জন্য তুমি মানুষকে যে প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে চাও বা কর, সেরূপ শাস্তি যে ঈশ্বর পাপীকে দেন না ও দিতে পারেন না, তাহার সমালোচনা অন্যত্র করা যাইবে। তুমি যে বল, মানুষ নরহত্যা করে নিজের স্বার্থের জন্য, ঈশ্বর তাহাই

করেন মঙ্গলের জন্য। ঘটনা ঈশ্বরের, এক ঘটনাই মানুষের সম্বন্ধে একরূপ ঈশ্বরের সম্বন্ধে অন্যরূপ, তাহা হইতে পারে না। তাহা হইলে ঈশ্বরের অপাপবিদ্ধত্ব রক্ষা পায় না। ঘটনা ঈশ্বরের সম্বন্ধে তুমি অন্যরূপ বল কিসে? মনুষ্য যে নরহত্যা করিল, ঈশ্বরের সম্বন্ধে অর্থাৎ তাঁহার নিকট কি তাহা ভয়ানক যন্ত্রণা নহে? যদি তাহা না হয় তবে তোমার ঈশ্বর একান্তই নিষ্ঠুর। ইহা কিছুতেই পশুভাব ব্যতীত ঈশ্বরভাব হইতে পারে না। নরহত্যাদিতে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় থাকিলেও পরে তদ্দ্বারা মঙ্গল তিনি করিলেও প্রথমে যে বধরূপ যন্ত্রণা তিনি জীবকে প্রদান করিলেন, যে যন্ত্রণা প্রদান করা হেতুতে মনুষ্য মহাপাপী, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া ঈশ্বর নিষ্পাপ থাকেন কি প্রকারে?

শ্রীগোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
মোকাম সিরাজগঞ্জ।

সংবাদ।

গত ২০শে আশ্বিন রবিবার মেটেবুরুজ প্রবাসী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষের কন্যার নামকরণ নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম সরযুবালা রাখা হইয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। উক্ত ভ্রাতার গৃহে পারিবারিক উপাসনার জন্য এক থানি মণ্ডপ প্রতিষ্ঠাও এইদিনে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৯শে আশ্বিন কলিকাতা মঙ্গল পাড়ায় ভাই উমানাথ গুপ্তের পৌত্র এবং শ্রীমান্ সত্যশরণ গুপ্তের নবকুমারের নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। সন্তানের পিতামহ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, এবং সুশোভন নাম রাখা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সীমলা পাহাড়ে বাস করিতেছেন। একটী ফোড়া হইয়া তিনি কাতর হইয়াছিলেন, এক্ষণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। গত বুধবার তথায় তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ভাগলপুর ও পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া কটকে গমন করিয়াছেন।

২০শে অক্টোবর উড়িষ্যার অন্তর্গত কটক নগরে শ্রীযুক্ত ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমৃতানন্দ রায়ের শুভ পরিণয় হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ভাই উমানাথ গুপ্ত সপরিবারে ভাই দীননাথ মজুমদার সপরিবারে, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, উপাধ্যায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন প্রভৃতি প্রায় ত্রিশ জন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মমহিলা বরযাত্রী গিয়াছেন। পাত্রী মহারাষ্ট্র বংশীয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাওয়ের কন্যা। মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গালীতে, বোধ করি, এই প্রথম সঙ্কর বিবাহ। প্রজাপতি পরমেশ্বর নবদম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ বিধান করুন।

আমরা সন্তপ্ত অন্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি যে আরানগরে আমাদের নববিধান বিশ্বাসী ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মিত্রের সহধর্ম্মিণী রেমিটেণ্ট জ্বরে পরলোক গত হইয়াছেন। ভগবান শোকগ্রস্ত স্বামী ও সন্তানগণের অন্তরে সান্ত্বনাদান করুন।

মানকরের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসুর পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শারদীয় বন্ধ উপলক্ষে যন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারীদিগকে অবকাশ দিতে হইয়াছিল এবং অপর অনিবার্য্য কারণ বশতঃ এবারকার ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশে অনেক বিলম্ব হইল। ভরসা করি গ্রাহক বন্ধুগণ আমাদের এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

প্রেরিত।

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্বসম্পাদক মহাশয় ভক্তিভাজনেষু।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

ভক্তিভাজন প্রেরিত দেব শ্রীমদ্রামচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পরলোকগমন সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইলাম। বিধানজননী তাঁহার যে সকল প্রেরিত ও ভক্ত সন্তানকে লইয়া নববিধানের বিচিত্র লীলা করিলেন, ক্রমে তাঁহারা সংসারের যবনিকার অন্তরাল হইতেছেন, বিধান প্রবর্ত্তক শ্রীমদাচার্য্যদেবের সহ প্রেরিত বন্ধুগণ একে একে বিধান মণ্ডলীকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া লোকান্তরে চলিয়া যাইতেছেন এ সকল ব্যাপার দেখিলে আমাদের ন্যায় অল্প বিশ্বাসীদিগের প্রাণ কেমন ব্যাকুলিত হয় সহজেই বুঝিতে পারেন। প্রেরিতগণ নববিধান মণ্ডলীর আলোকস্তম্ভ, ভবিষ্যতের আশা, বর্ত্তমানের পথপ্রদর্শক এবং ভূতকালের ভগবানের নবলীলার পবিত্র সাক্ষী। ইহারা নববিধানের এক এক ভাবের প্রতিনিধি এবং আচার্য্যদেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ইহাদের শোণিত মাংসে আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠিত, ইহাদের দৃষ্টান্তে আমরা প্রোৎসাহিত। ইহারা আমাদের প্রিয়তম বন্ধু, ভক্তিভাজন শিক্ষক এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইহাদের নিকট আমরা ব্রহ্মতত্ত্ব বিধানতত্ত্ব ভ্রাতৃতত্ত্ব শিক্ষা করিলাম, ইহাদের নিকট আমরা অশেষ ঋণে ঋণী, তাই ইহাদের এক এক জনের তিরোধানে প্রাণ কেমন বিকল হইয়া উঠে। মণ্ডলীর ভবিষ্যত জীবন সম্বন্ধে কত চিন্তা, কত ভাব কত আশঙ্কা কত ভয় প্রাণে সমুদিত হয়। সকলই পবিত্রাত্মা শ্রীহরির ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে, তিনিই নববিধান মণ্ডলীর নেতা ও রক্ষক এই আশা ও বিশ্বাসেই আশ্বস্ততা লাভ করিতেছি।

ভক্তিভাজন রামচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের সহিত আমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না। ১৩০১ সনের ১২ই আশ্বিন দয়াময় শ্রীহরির ইচ্ছায় তিনি প্রথম টাঙ্গাইলে শুভাগমন করেন। তাঁহার সরল স্বভাব, অমায়িক ব্যবহার এবং জলন্ত উৎসাহ দেখিয়া আমরা নিতান্ত মুগ্ধ হই। এই সময়ে তিনি প্রায় ১১ দিন আমাদের মধ্যে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহার সহবাসে আমরা নিত্য ব্রহ্মোৎ-

সব সম্ভোগ করি। ভক্তিভাজন প্রেরিতগণের মধ্যে আর কাহারও সহিত এমন ভাবে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিবার সুবিধা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। দিবারাত্রি রামচন্দ্র বাবুর সহিত কত প্রসঙ্গই হইয়াছে তাহা ভাবিলে এখনও প্রাণে আনন্দ হয়। ইঁহার হৃদয় যেন একেবারে কাপট্যশূন্য ছিল। সরল ভাবে জীবনের কথাগুলি এমনি ভাবে আমাকে বলিতেন যেন আমি তাঁহার বয়স্য। তাঁহার পবিত্র সহবাসে ও উপদেশে আমরা বিশেষ উপকৃত হই। একটী ব্যাপারে তিনি আমার বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। যদিও অনেক দিন হইল আমি টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগযুক্ত হইয়াছিলাম তথাপি নানাপ্রকার ইতস্ততঃ করিয়া প্রকাশ্য নববিধানে দীক্ষা গ্রহণে বিলম্ব করিতেছিলাম। একদিন রজনীতে তিনি কৃপা করিয়া মধুর ভাবে আমাকে নানা কথা বলিলেন। বিশ্বাস প্রকাশ্যে জ্ঞাপন না করিয়া প্রাচীন সমাজে অবস্থিতিতে কি বিষময় ফল ফলে এবং তদ্দারা ধর্ম্মজীবনের কি প্রকার হানি হয় তিনি একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া দেন এবং তাহাতে আমার অনেকটা চৈতন্য জন্মে। এজন্য এই ভক্তের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ।

ইনি দুইবার টাঙ্গাইলে আগমন করেন। ইঁহার উপাসনা অতি মধুর ছিল। নিত্য নব নব ভাবে উপাসনা করিতেন এবং দীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। টাঙ্গাইলে রমেশচন্দ্র হলে এবং সন্তোষ জাহ্নবী স্কুলগৃহে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই অতি প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৩০৩ সনের ফাল্গুন মাসে যখন ইনি আশা কুটিরে আইসেন তখন যেন তাঁহার ব্রহ্মদর্শন খুব ঘনীভূত হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিলেন পূর্ব্বে ভাবিতাম নিরাকার ঈশ্বরকে কেমন করিয়া দর্শন করা যায়, এখন দেখি তাঁহাকে দেখা কেমন সহজ *। নিজের জীবন সম্বন্ধে তিনি আমার নিকট অনেক কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমি আমার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া রাখিয়া ছিলাম। তাহা হইতে কয়েকটী ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রিয়পাঠকগণ, ইহা হইতে রামচন্দ্র বাবুর জীবনের মহত্ব কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন।

"লাহোর থাকা কালে ইনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মিয়ামির থাকিতে ইনি বহুদূর হইতে পদব্রজে আসিয়া লাহোর সমাজের উপাসনায় যোগদান করিতেন। কার্য্য-করা কালে ইনি বিশেষ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সত্যপরায়ণ ছিলেন। একবার শ্রীমদাচার্য্যদেব লাহোরে গিয়া ইঁহার আলয়ে স্থিতি করেন। রামবাবু তাঁহার উপাসনায় যোগ দিতেন। উপাসনার কতক সময় যোগ দিয়া কতককাল পরে উঠিয়া যাওয়া ইঁহার অভ্যাস ছিল না। সুতরাং উপাসনায় যোগ দিয়া পরে অফিসে যাইতে ইঁহার অর্দ্ধঘণ্টা পরিমাণ বিলম্ব হইত। ইনি ১০॥০ ঘটিকার সময় অফিসে যাইতেন। অন্যান্য অফিসারগণ ইঁহার পরেই অফিসে যাইতেন কিন্তু ইনি ১০॥০ টার সময় গিয়া Attendance Register বহিতে ঐ সময়ই লিখিতেন এবিষয় উপরিস্থ কার্য্য-কারককে একজনে জানাইলে তিনি রামবাবুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, রামবাবু সরলভাবে তাঁহার বিলম্বের কারণ জানাইলেন, সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যতদিন কেশব বাবু লাহোরে থাকিবেন, ততদিন রামবাবুকে অর্দ্ধঘণ্টা বিদায় দেওয়া হইল।

"রামবাবু যে আফিসে কার্য্য করিতেন তাহার কর্ম্মচারীগণ প্রায়ই বদলী হইত। রামবাবু লাহোরে থাকা কালে তথাকার ব্রাহ্মসমাজের অর্থাদি ও হিসাব পত্র তাঁহারই হস্তে থাকিত। ইনি বিবেচনা করিলেন যদি না জানাইয়া হঠাৎ আমাকে বদলী করে তবে আমাকে বিশেষ মুস্কিলে পড়িতে হইবে, হয় আমি সেই আদেশ পালন করিতে পারিব না, নাহয় ব্রাহ্মসমাজের টাকাকড়ি বুঝাইয়া দিয়া যাইতে পারিব না। এই সকল ভাবিয়া তিনি তাঁহার উপরিস্থ সাহেবকে সমুদায় অবস্থা জানাইলেন, সাহেব তাঁহার ন্যায়ানুরাগ দেখিয়া তাঁহার বদলী একেবারে রহিত করিয়া দিলেন। যতদিন তিনি কার্য্যে ছিলেন, তাঁহাকে আর বদলী হইতে হয় নাই।"

একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন কুচবিহারের বিবাহ উপলক্ষে কত ব্রাহ্ম আচার্য্যকে অবিশ্বাস করিলেন, কত বন্ধুর মন বিচলিত হইয়াছিল, কখনও কি তাঁহার প্রতি আপনার অবিশ্বাস হইয়াছিল, তিনি বলিলেন, কখনই না, আমি তাঁহাকে একদিনের তরেও সন্দেহ করি নাই। কি আশ্চর্য্য আচার্য্যানুরাগ! কি অটল বিধান নিষ্ঠা!

(ক্রমশঃ)

* এই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন, ঠিক কথাটি মনে নাই।

বিজ্ঞাপন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ৫ই কার্ত্তিক মুদ্রিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধৰ্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তাতে॥

৩৪ ভাগ।
২০ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸৹
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রেমাধার পরম দেব, যে তোমায় ভালবাসে তাহার কোন ভয় থাকে না, সে নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করে। সে জানে তোমার প্রেমবাহু তাহাকে নিয়ত রক্ষা করিতেছে, তাহার ভয় করিবার বিষয় কি আছে? তুমি যদি এক স্থানে থাকিতে, অন্য স্থানে না থাকিতে, তাহা হইলে প্রেমিকের ভয় করিবার বিষয় ছিল। যেখানে তিনি যান সেখানেই যখন তিনি তোমায় সঙ্গে দেখিতে পান, তখন তিনি যে নির্ভয় হইবেন, ইহা আর একটা বিচিত্র বিষয় কি? প্রলোভন সম্মুখে আসিলেও তাঁহার কোন ভয় নাই, কেন না তোমার প্রেম তাঁহাকে সর্ব্বদা সচেতন রাখিয়াছে। প্রলোভন তো অনবধান না হইলে কাহাকেও আত্মবশে আনিতে পারে না, যখন তিনি সর্ব্বদা অবহিত, তখন তিনি প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইবেন কেন? দেহের ধর্ম্ম কখন তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। দৈহিক সকল প্রকারের বিকার তাঁহার নিকটে উপহাসের বিষয় হয়। হে প্রেমময়, প্রেমিকগণের ন্যায় তোমায় ভালবাসিতে আমাদের অভিলাষ। তোমার প্রতি প্রেম যখনই আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে, তখনই আমরা দেখিয়াছি, আমাদের হৃদয় নিঃশঙ্ক হইয়াছে। আবার যখন তোমার প্রতি অনুরাগ কমিয়া বিষয়ের প্রতি অভিলাষ ধাবিত হইয়াছে, তখনই হৃদয় নানা ভয় ভাবনার অধীন হইয়া পড়িয়াছে। সংসারকে কে না ভয় করেন? বড় বড় সাধক সংসারভয়ে আকুল। ধন্য তোমার প্রেমিকগণ, তাঁহারা সংসারকে তোমার লীলাক্ষেত্র করিয়া লইয়াছেন। সেই লীলাক্ষেত্রে যাঁহারা অভিনয় করিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে; যাঁহারা পূর্ব্বে ভয়ের কারণ ছিলেন, তাঁহারা সঙ্গী অভিনেতা হইয়া কেবলই আনন্দবর্দ্ধন করেন। যদি তোমার প্রতি তাঁহাদের প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে এই অভিনয়ের সঙ্গিগণ তাঁহাদের অধোগতির কারণ হইতেন। অভিনেতৃগণ যদি পরস্পর তোমার সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হন, তাহা হইলে তাঁহারা দেহের প্রতি আসক্তিনিবন্ধন শীঘ্রই পরস্পরের বিনাশ সাধন করেন। হে দেব, আমরা যখন সংসারে বাস করিতেছি, তখন পূর্ব্বতন সাধকগণের যে ভয় ছিল, সে ভয় আমাদেরও আছে। এ ভয় নিবারণ কেবল তোমার প্রতি প্রগাঢ় প্রেমে সম্ভবপর। সংসারের শাখা

প্রশাখা যখন দিন দিন বাড়িয়া চলিল, তখন তোমার প্রতি প্রেম না বাড়িলে সংসার যে আমাদিগকে শীঘ্রই গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তাই ভীত হইয়া তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে তোমার প্রতি প্রেমিক কর; আমরা প্রেমের বলে বলী হইয়া সংসারের সমুদায় প্রলোভন অতিক্রম করি। তোমার অনুগ্রহে আমাদের এ প্রার্থনা অচিরে পূর্ণ হইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়া বিনীতভাবে তব পাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

আমাদের চিন্তার প্রণালী।

আমাদের চিন্তার প্রণালী কি, এসম্বন্ধে যে আমরা পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্বে কিছু লিখি নাই, তাহা নহে। যত দিন যাইতেছে তত আমরা দেখিতেছি, একবার কোন বিষয় লিখিলে লেখার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। যাহা লিখিত হইল তাহা যদি অপরে গ্রহণ না করিল, তাহা হইলে সে লেখা কালে বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। লোকে দৈহিক বংশ রক্ষার জন্য কত প্রয়াস পায়, চিন্তাসম্ভূত বংশ রক্ষা করিবার জন্য কি প্রয়াসের প্রয়োজন নাই? এই প্রয়াসবশতই আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহে যে চিন্তার প্রণালী অনুসৃত হয়, অধ্যাত্মবিজ্ঞানেও সেই প্রণালী অনুসরণ করা উচিত, এখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুসৃত প্রণালী সম্যক্ প্রকারে অধ্যাত্মবিজ্ঞানে নিয়োগ হইতে পারে, ইহা আমরা বলি না, কিন্তু এখানে যে উপায় অনুসৃত হইতে পারে, তাহা যন্ত্রাদি অপেক্ষা অল্প নিশ্চয়াত্মক নহে। প্রকৃতিসম্বন্ধে জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে উপার্জ্জন করিতে হয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্মবিষয়দর্শনে অপটু, সুতরাং সেই অপটুতা অপনয়ন করিবার জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানে বাহিরের কোন যন্ত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণও বাহ্যযন্ত্র ভিন্ন আর কিছু নহে, সুতরাং এ সকলের দ্বারাও যে কোন বিশেষ সাহায্য হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। অপরের ব্যবহার দর্শন করিয়া, তাহার কথা শ্রবণ করিয়া যাহা কিছু হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাতে ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে, কেন না যে ব্যক্তির আত্মদর্শন নাই, আপনার ব্যবহারের মূল আপনি দেখে না, সে ব্যক্তি অপরের ব্যবহার যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিবে কি প্রকারে? বাহ্য বিষয়সমূহের পর্য্যবেক্ষণ, মনে হয়, আত্মদর্শননিরপেক্ষ, কিন্তু বাস্তবিক ইহা ভুল। অল্প বিস্তর পর্য্যবেক্ষণ কে আর না করিয়া থাকে? সাধারণ কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সকলেরই পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। কিন্তু কেহ একথা বলিতে পারেন না, সাধারণ কৃষকের পর্য্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের পর্য্যবেক্ষণ তুল্যমূল্য। কৃষকের পর্য্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের আবিষ্কৃত জ্ঞানের মূলে থাকিতে পারে, কিন্তু এ উভয় জ্ঞান এত দূর পৃথক্ যে উহাদিকে সমজাতীয় বলিয়া কিছুতেই নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যাহা দেখেন, তাহা তাঁহার মানসপটস্থ মার্জ্জিত জ্ঞানে রূপান্তর ধারণ করিয়া বিজ্ঞানে প্রকটিত হয়, ইহা আর কে না জানেন? এই মার্জ্জিত জ্ঞান আত্মজ্ঞানমূলক। আত্মার সন্নিধানে দিন দিন যে নূতন জ্ঞান স্ফূর্ত্তিলাভ করে, সেই জ্ঞান আত্মার অঙ্গীভূত, এবং তৎসহ অভিন্ন। এই জ্ঞান ছাড়িয়া দাও, বিজ্ঞান তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদের নিকটে সকল বিষয় একই সময়ে প্রতিভাত হয় না, খণ্ডশঃ খণ্ডশঃ প্রকাশ পায়। সেই খণ্ডশঃ প্রকাশমান সমজাতীয় খণ্ডগুলি একত্র করিয়া এক এক বিজ্ঞান নিবদ্ধ হয়। সমুদায় খণ্ডবিজ্ঞানকে এক অখণ্ড বিজ্ঞানে পরিণত করা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কার্য্য।

অখণ্ডবিজ্ঞানসম্বন্ধে আমরা আমাদের চিন্তার

প্রণালী বলিতে প্রবৃত্ত। এ প্রণালী প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের প্রণালীর অনুরূপ, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে, অখণ্ড বিজ্ঞানে আত্মদর্শন প্রধান। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, খণ্ডবিজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞানমূলক, অখণ্ড বিজ্ঞান অপরোক্ষজ্ঞানমূলক। যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, বাহ্যেন্দ্রিয়াদি সাপেক্ষ নহে, তাহাই যে প্রামাণিক, একথা অনেকে মানেন না, কিন্তু এরূপ না মানায় যে সকল জ্ঞানের মূলোচ্ছেদ হয় তাহা তাঁহাদের বোঝা উচিত। এ সকল অবান্তর কথায় নিষ্প্রয়োজন, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের তত্ত্ব নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

বাহ্য প্রকৃতি অনন্ত জ্ঞানের রঙ্গভূমি, ইহা আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা অন্তরে ও বাহিরে এক অখণ্ড জ্ঞান বিজ্ঞানদৃষ্টিতে নিষ্পন্ন হইত না। আমাদের অন্তরে যে জ্ঞান বিদ্যমান, সেই জ্ঞান বাহ্যজগতে প্রকাশমান জ্ঞানের সহিত ঐক্য অনুভব করে, এজন্য অন্তর ও বাহির উভয়মধ্যে সামঞ্জস্য প্রকাশ পায়। এস্থলে বুঝিতে হইবে, কেবল বাহ্য প্রকৃতি অনন্ত জ্ঞানের রঙ্গভূমি নহে, জীবপ্রকৃতিও তাঁহার বিচিত্র ক্রিয়াপ্রকাশের ভূমি। সমগ্র মানবজাতিতে সেই অনন্ত জ্ঞান নিয়ত আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহার ক্রিয়া হইতে জনসমাজের সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলা সমুৎপন্ন হইতেছে। জনসমাজে যে কোন রীতি, নীতি, ব্যবহার ও ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকলেতে পূর্ব্বাপরসামঞ্জস্যভাবে সেই অনন্ত জ্ঞানের ক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন আমরা সমাজগত কোন ব্যবহারাদির বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন তন্মধ্যে সেই অনন্ত জ্ঞান পূর্ব্বাপরসামঞ্জস্যভাবে কি কি অভিব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা তাহাই পাঠ করিয়া থাকি। আমরা এইরূপে সে সকল অধ্যয়ন করিয়া থাকি বলিয়া অনেকের সঙ্গে আমাদের অমিল উপস্থিত হয়। তাঁহারাবলেন, ব্যবহারাদি যাহা কিছু সমুৎপন্ন, তাহার ভিতরে অনন্তজ্ঞানের কোন কার্য্য নাই। মানুষের যখন যেরূপ মনে আসিয়াছে,সেইরূপ সে করিয়া গিয়াছে,তাহার মধ্যে পূর্ব্বাপরসামঞ্জস্য কোথায়? আজ কত সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে কত সময়ে কত রীতি নীতি প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, এত পরিবর্ত্তনের ভিতরে অনন্ত জ্ঞান বসিয়া বসিয়া কার্য্য করিয়াছেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের নিজ কথাই নিজের প্রতিবাদ করে। সহস্র সহস্র যুগে সহস্র সহস্র পরিবর্ত্তন হইয়া এই পৃথিবী বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। অনন্ত জ্ঞানের ক্রিয়াতে এই সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ইহাই যখন প্রতিপন্ন হয়, তখন মনুষ্যসমাজের রীতিনীতি আদির পরিবর্ত্তন মধ্যে সেই অনন্ত জ্ঞানের ক্রিয়া নাই, তুমি কি প্রকারে বলিবে? বরং ক্রিয়া আছে, ইহাই তোমাকে বলিতে হইতেছে। মানুষের যখন যাহা মনে আসিয়াছে তখন তাহা করিয়াছে, এ কথা বলা তোমার ভুল। বাস্তবিক কথা এই, চারিদিকের অবস্থা তাহার মনের উপরে যে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়াছে, সেই ক্রিয়া কখন অতিক্রম করিয়া, কখন তাহার অনুগত হইয়া সে কার্য্য করিয়াছে। চারিদিকের অবস্থা সমুৎপাদনের মধ্যে অনন্তজ্ঞানের ক্রিয়া আছে, ইহা কি তোমার বোধগম্য হয় না? বর্ত্তমান যুগে সামাজিকবিজ্ঞান সামাজিক যত প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে এক অনন্ত শক্তির ক্রিয়া সপ্রমাণিত করিয়াছেন, পূর্ব্বাপরসামঞ্জস্যসম্ভূত ক্রিয়া তাহার মধ্যে তিনি অবলোকন করিয়াছেন। কোথাও কোন কার্য্যের ভিতরে শক্তির ক্রিয়া নাই, ইহা যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যে সকল রীতি আদি উদ্ভূত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে অনন্ত জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া বিদ্যমান,ইহা আমরা অকুণ্ঠিতভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

আমরা ব্রহ্মসমাজের ইতিবৃত্তমধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন এবং রীতি নীতি, ও ব্যবহার প্রবর্ত্তন দেখিতে পাই, তন্মধ্যে সেই অনন্ত জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া আমরা দর্শন করিয়া থাকি, এবং সেই

ক্রিয়ার মর্ম্ম অবধারণ করিবার জন্ত আমরা আমাদের চিন্তা নিয়োগ করিয়া থাকি। আমরা যতই চিন্তা করি, আলোচনা করি, ততই সর্ব্বত্র অনন্তজ্ঞান-শক্তির ক্রিয়ার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য অবলোকন করিয়া অবাক্ হইয়া যাই। এই সামঞ্জস্য যতই আমাদের নয়নগোচর হয়, ততই আমাদের সাধন দ্রুতপদে অগ্রসর হয়। অনেক দিন হইল আমরা এই পন্থা আশ্রয় করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছি। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ পরিবর্ত্তন ও রীতি নীতি আদি প্রবর্ত্তনের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের অবিচ্ছেদ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন না, তাঁহাদিগকে সাধনবিষয়ে যথেচ্ছাচারী দেখিতে পাওয়া যায় যেন তাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মসমাজে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা মনুষ্যকৃত ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সকল ব্যক্তির ঈদৃশ অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক ভাব দেখিয়া আমাদের বড়ই ক্লেশ হয়। তাঁহারা প্রকৃত সাধনের পথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া ক্রমে বিকৃত পথ আশ্রয় করিতেছেন, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়? সর্ব্বত্র ভগবানের অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়ায় আস্থা স্থাপন করিলে, তাঁহাদের এই অবৈজ্ঞানিক ভাব তিরোহিত হইবে, আশা করিয়া আমরা এত গুলি কথা লিখিলাম। আমরা যাহা লিখিলাম তাহা অপরের সম্বন্ধে ফলোপধায়ী হওয়া সেই অনন্ত জ্ঞানেরই হস্তে।

অভয়োপায়।

সাধকের পদে পদে পতনের আশঙ্কা। একটু অনবধান হইলে তাঁহার ঈদৃশ অধোগতি হইতে পারে যে, সে অবস্থা হইতে পূর্ণ পরিশুদ্ধতার অবস্থায় পুনরুত্থান সমগ্র জীবনে অসম্ভব হইয়া উঠে। সমগ্রজীবনে অসম্ভব এই জন্য বলিতেছি যে, সেই অধোগতির কারণ জীবনে এমনই একটি দৌর্ব্বল্য উৎপাদন করে, যে দৌর্ব্বল্য পুনঃ পুনঃ তাঁহার পতনের কারণ হয়। যদিও বা সময়ে এরূপ বলসঞ্চার হইতে পারে যে, তদ্দ্বারা আর পতন হয় না, তথাপি মন হইতে উহার রেখা অপনীত হয় না। যখনই সেই দুর্ব্বলতার উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হয়, তখনই উহার অস্তিত্ব সাধক বুঝিতে পারেন। উহা মাথা তুলিতে পারে না বটে, কিন্তু একটি অনুদ্ধৃত কণ্টকের ন্যায় ঐহলৌকিক জীবনে উহা বিদ্ধ হইয়া থাকে। উহা ক্লেশোৎপাদন করিতে না পারুক, সাধক যখন তখন কণ্টকের স্থিতি অনুভব করেন এবং তজ্জন্য নিয়ত সাবহিত থাকেন।

এমন ব্যক্তি কে আছে, যাহারা জীবনে ঈদৃশ কণ্টকবিদ্ধ হইয়া নাই। দেহ থাকিতে যে কণ্টকের উন্মোচন অসম্ভব, যে কণ্টক সময়ে কেবল ক্লেশোৎপাদন কেন, প্রতীকার না করিলে দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপাদন করিতে পারে, সে কণ্টকের প্রতি উপেক্ষা করা বা কণ্টক থাকিতে নিঃশঙ্ক হওয়া কখন কি সম্ভব? এমন কি উপায় আছে, যে উপায় অবলম্বন করিলে অভয়লাভ হয়। অভয়লাভের উপায়সম্বন্ধে মতভেদ নাই ইহা বলিতে পারা যায় না। কেহ বা নীতি, কেহ বা ধর্ম্ম, কেহ বা জ্ঞানকে অভয়লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। তাঁহাদের জীবনে যদি তত্তদবলম্বনে অভয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তবে কেনই বা তাঁহারা সে গুলিকে অভয়প্রাপ্তির উপায় বলিবেন না। তবে এটুকু বলিবার আমাদের অধিকার আছে, আমরা যাহাকে অভয়লাভের উপায় বলি, উহা নীতি, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বলিয়াই তাঁহারা অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্যথা তাঁহাদের অভয়লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এরূপ নির্দ্ধারণ যে স্বমতের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ নহে, তাহা আশা হয়, পরে যাহা বলা যাইতেছে, তাহাতে প্রকাশ পাইবে।

প্রেম অভয়ের উপায়, ইহা বলিলে হয় তো অনেকের মনে হইবে আমরা নিতান্ত বিপরীত কথা বলিতেছি। প্রেম যেখানে আছে, সেখানে তজ্জনিত দৌর্ব্বল্য অবশ্যম্ভাবী; দৌর্ব্বল্য অভয়ের কারণ নহে ভয়েরই কারণ। উদ্বেগ, চিন্তা,

ভাবনা প্রেমের সঙ্গে চিরসংযুক্ত। এরূপ স্থলে প্রেম ভয় নিবারণ করে, একথা বলা কিরূপে শোভা পায়। সত্য বটে, প্রেমের সঙ্গে উদ্বেগ আছে, চিন্তা আছে, ভাবনা আছে, কিন্তু এ উদ্বেগ, এ চিন্তা, এ ভাবনা ভয়মূলক নহে, প্রেমমূলক। যাহার প্রতি প্রেম স্থাপিত হয়, তাহার কল্যাণের জন্য উদ্বেগ, চিন্তা, ভাবনা মনকে সঙ্কুচিত করে না, আরও প্রশস্ত করিয়া দেয়। যদি বল সেখানে উদ্বেগের কারণ নাই, ভাবিবার বিষয় নাই, সেখানে প্রেম যখন বৃথা আশঙ্কা উৎপাদন করে, তখন প্রেমের সঙ্গে ভয় সংযুক্ত, এ কথার মধ্যে অযৌক্তিকতা কি আছে? হাঁ, আপাততঃ অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না, বিচার করিয়া দেখিলে অযৌক্তিকতা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। প্রেমের সঙ্গে যে আশঙ্কা সংযুক্ত তাহা ভয় নহে। ভয় আত্মসম্পর্কে, আশঙ্কা পরসম্পর্কে, এ প্রভেদ কিছু সামান্য নয়। আমি ভীত হইলাম, পরের দুঃখ ক্লেশ বা হয় এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হইলাম, এ দুই কিছু সমান নহে। প্রেম আপনার বিষয়ে চিন্তাবর্জ্জিত, পরের চিন্তায় ব্যাপৃত, আপনার বিসয়ে সকল ভয়-ভাবনাশূন্য হইয়া পরের জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত, প্রেমের স্বভাব যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমই যখন ভয় অতিক্রম করায়, তখন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে যে মানব অভয় লাভ করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? প্রেমে অভয় কেন হয়, তৎসম্বন্ধে দু একটী কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

যিনি ঈশ্বর প্রেমে প্রেমিক তিনি ঈশ্বরেতে চির আশ্বস্ত। যেখানে তিনি যান, সেখানেই যখন তাঁহার ঈশ্বর, তখন তাঁহার প্রীতির আস্পদ পরমেশ্বর তথায় বিদ্যমান সত্ত্বে তিনি ভীত হইবেন কেন? তিনি জানেন, সকল ঘটনার নিয়ন্তা তাঁহার প্রেমাস্পদ, সেই সেই ঘটনা যেরূপে নিয়মিত করিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে, সেইরূপে তিনি সে সকল নিয়মিত করিবেন। দুঃখ, বিপদ্, ক্লেশ, যন্ত্রণা তিনি কিছুই বোঝেন না। বোঝেন কেবল সকল অবস্থার ভিতরে তাঁহার প্রেমাস্পদের সহবাস সম্ভোগ করা। ভক্তবৎসল তাঁহার মন বোঝেন, সুতরাং দুঃখ বিপদাদির ভিতরে তিনি আপনার প্রেমমুখ আচ্ছাদন করেন না। নিত্য তাঁহার প্রেমানন দর্শন করিয়া তিনি অন্তঃশীতল, দুঃখ তাপ তাঁহাকে সন্তপ্ত করিবে কি প্রকারে? যে সকল বিষয়ের চিন্তায় ভয় উপস্থিত হইবে, তাহাই যখন তাঁহার সম্বন্ধে অসম্ভব, তখন এক ঈশ্বরপ্রেমে যে অভয় লাভ করিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অভয়ের উপায় তবে প্রেম; অন্য যত সকল উপায় আছে, তাহার মূলে যখন প্রেম উদিত হয় তখন সে সকল উপায় অভয় দেয়, প্রেমশূন্য হইলে কোন প্রকারে ভয় নিবারণ করিতে পারে না। এইরূপে বলিতে হইবে এক প্রেমই অভয়ের উপায়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। সংসারে বাস করিতে গেলে সময়ে সময়ে অসরল পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যদি অন্য কোন কারণেও না হউক, ভদ্রতা রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অসরল হইতে হয়। সর্ব্বত্র সরল ব্যবহার লোকের রুচিকর হয় না। অপরের মনে বা আঘাত লাগে এজন্য ধার্ম্মিকেরও মধ্যে মধ্যে অসারল্য আশ্রয় করিতে হয়। অসারল্যে মিথ্যার সংস্রব আছে, যাহা নয় তাহাকেই তাঁর মত দেখাইতে হয়, ইহা সম্পূর্ণ তোমার বিরোধী। অথচ যাহার সংসার আছে, বিবিধ প্রকারের দায় আছে, তাহাকে একটু অসরল না হইলে চলে কি প্রকারে?

বিবেক। অসারল্য মিথ্যাসংস্রুত, সুতরাং উহা একান্ত ঘৃণার্হ। আমি কোন কালে অসারল্যের অনুমোদন করি নাই, কোন কালে অনুমোদন করিব না, কিন্তু ইহা বলিয়া আমি ভদ্র ব্যবহারের বিরোধী, ইহা তুমি কখন বলিতে পার না। বিবেকী ব্যক্তি যে প্রকার ভদ্র, এ প্রকার ভদ্র অবিবেকী কোন কালে হইতে পারে না। অবিবেকী ব্যক্তির স্বার্থাদির প্রতি আঘাত পড়ুক, দেখিবে সে কিছুতেই ভদ্রতা রক্ষা করিতে পারিবে না। জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ আছে। যেখানে বিরোধ আছে সেখানে ভদ্রতা কোথায়? তুমি কি মনে কর সত্যানুরাগ হইলেই অভদ্রতা আশ্রয় করিতে হয়। কথা ও ব্যবহার সুমিষ্ট করা কি সত্যানুরাগের বিরোধী? জানিও যেখানে চরিত্র আছে সেখানে মধুরতা

আছে। পুণ্য চরিত্রে যে সৌন্দর্য্য অর্পণ করে, সে সৌন্দর্য্য সকলেরই চিত্ত হরণ করে। চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণকে পাপাসক্ত লোকে দ্বেষ করে, তাহাতে ইহা প্রকাশ পায় না, তাঁহাদিগেতে মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য নাই। পাপানুরক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের সান্নিধ্যে অধিকতর আপনাদের কদর্য্যাচর্য্যা বুঝিতে পারে, এবং তাহাতে তাহাদের চিত্ত নিতান্ত আকুল হইয়া পড়ে। এই আকুলতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা হিংসা, দ্বেষ ও নিন্দা দ্বারা তাঁহাদিগকে অপসারণ করিতে যত্ন করে।

বুদ্ধি। তুমি যাহা বলিলে তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জনসমাজে পাপাচারী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক, বিবেকী লোক অতি অল্প, ইহাতে তোমার রাজ্য যে কত ক্ষুদ্র, তাহাই বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিবেক। আমার রাজ্যের প্রজা অল্প কি অধিক, তাহা লইয়া আমার গৌরবের হ্রাস বৃদ্ধি হয় ইহা আমি মনে করি না। সমুদায় নরনারী এক সময়ে আমার রাজ্যভুক্ত হইবে, ইহা যখন আমি নিশ্চয় জানি, তখন সংখ্যার অল্পাধিক্যে আমি কেন কুণ্ঠিত হইব?

১লা কার্ত্তিক ধর্ম্মতত্ত্বের ভ্রমশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	স্তম্ভ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৪ পৃষ্ঠা	৫ পংক্তি	১ স্তম্ভ	আমরা	আমরা যেন
„ „	৩৪ „	„ „	বেদে	বেদ
„ „	৮ „	২ „	ক্রমশঃ	এমনই
„ „	২৫ „	„ „	সুসংস্কারাপন্ন	কুসংস্কারাপন্ন
„ „	২৯ „	„ „	থাকিয়া	আসিয়া
২১৫ „	৩৫ „	১ „	প্রপঞ্চ করিয়া	প্রপঞ্চ লয় করিয়া
২১৬ „	২৩ „	২ „	দিনে	দিনে কেবল
২১৭ „	১৪ „	„ „	যন্ত্রের	চন্দ্রের
২১৮ „	১৭ „	১ „	ইহা	ইহা কি
„ „	১৯ „	„ „	রক্ষিত	বঞ্চিত
„ „	২৮ „	„ „	জনমে	জননে

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

পিতামহ রাজা রামমোহন রায়।

১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর), রবিবার, ১৮১৮ শক।

আজ আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের দিন। অদ্য এ নগরে কত লোকে একত্রিত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি এদেশে সম্মানিত হইতেছেন, দিন দিন আরও সম্মানিত হইবেন। সকলকেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে ইহারই মধ্যে তাঁহাকে অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রতি মৌখিক সম্মান প্রদর্শন করিতে চাই না। তিনি যাহা সেই ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে আমরা অভিলাষী। যিনি অসাধ্য কার্য্য সাধন করেন, তিনি সাধু, এ অর্থে তিনি সাধু। সাধু সম্মান করা আমাদের প্রতি আদেশ। তিনি কি কি অসাধ্য কার্য্য সাধন করিলেন, আমরা তাহাই দেখিব, আমাদের তদ্ভিন্ন অন্য দিক্ দেখিবার কোন অধিকার নাই। এদেশ যখন ভয়ঙ্কর পৌত্তলিকতার পঙ্কে পতিত ছিল, চারি দিকে কেবলই কুসংস্কার ও অসদাচরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, শাস্ত্রব্যবসায়িগণ কেবল আপনাদের স্বার্থসাধন জন্য শাস্ত্রব্যবসায় চালাইতেন, সেই সময়ে ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের পিতামহ উদিত হইলেন। ভগবান্ তাঁহাকে সেই সকল অলৌকিক গুণ দিয়া পাঠাইলেন, যাহাতে দুশ্ছেদ্য অন্ধকার অপনীত এবং ব্রহ্মজ্ঞানালোক পুনরায় এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞান ও মনীষা এ দুইকে সহায় করিয়া জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। শান্তি সম্ভোগ তাঁহার ভাগ্য নয়; সুতরাং ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার গভীর দেশীয় শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তিনিপুণতা, বাদিনিরসনে অতুল্য সামর্থ্য, প্রাচ্য পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থে অসাধারণ অধিকার বিরোধিগণের পক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বথা অসমকক্ষ করিয়াছিল! তিনি সর্ব্বপ্রকার বাদ নিরসন করিয়া বিশুদ্ধ নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান স্থাপন করিলেন। তিনি কি কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সুতরাং দেশের সকল লোক বিরোধী হইয়াও তাঁহাকে অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই।

তাঁহার কিরূপ সুতীক্ষ্ণ মনীষা ছিল, তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ বহু গ্রন্থ বিদ্যমান। সে সকল এসম্বন্ধে তাঁহার চিরখ্যাতি প্রদর্শন করিবে। আমরা তাঁহার নিকটে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য চিরঋণী। কোন প্রকার কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা বা অযুক্ত ধর্ম্ম না আসিতে পারে, এজন্য তিনি যে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন তৎফলভাগী আমরা হইয়াছি, ইহা আমাদিগের পক্ষে পরম সৌভাগ্য। এখন যে প্রকার ব্রহ্মোপসনাপ্রণালী আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত, এরূপ ব্রহ্মোপসনা তিনি স্থাপন করিয়া যান নাই সত্য, কিন্তু তিনি যদি ব্রহ্মোপসনার সূত্রপাত করিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে প্রকৃষ্ট ব্রহ্মোপসনাপ্রণালী আজ কি স্থাপিত হইতে পারিত? তিনি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা ঈশ্বরকে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে চিন্তা, জগতের পদার্থনিচয় হইতে যে উপকার হয় তাহা ঈশ্বরাধীনতা বশতঃ উপস্থিত হয় ইহা জানিয়া তৎপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন, পরমাত্মপ্রতিপাদক উপনিষদাদির অর্থচিন্তন ইত্যাদি উপাসনা ও উপাসনার অঙ্গরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজে কিপ্রকার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে বিশুদ্ধ উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহার মহত্ত্ব ও গৌরব। ইহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনার মর্ম্ম

যাঁহারা জীবনে সাধন দ্বারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, পিতামহ বিশুদ্ধ উপাসনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়া কি মহোপকারই সাধন করিয়াছেন।

আমাদিগের পিতামহ উপাসনাকে এমন একটী অবিরোধী ভূমির উপরে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন যে পৃথিবীর কাহারও সঙ্গে তৎসম্বন্ধে বিরোধের সম্ভাবনা নাই। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন "এ উপাসনায় বিরোধি বিচারতঃ কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি।" সকল দেশ, সকল জাতি, সকল প্রকারের উপাসনার সঙ্গে তিনি এক উপাসনাযোগে অবিরোধ দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এ মিলনভূমি যে কত গভীর ইহা আমরা ইদানীন্তন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। তিনি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান মুসলমান সকলের সঙ্গে এক অদ্বিতীয় জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা ঈশ্বরের সাধারণ ভাবে মিলিত হইয়াছিলেন। সত্য বটে তিনি সকলকে স্ব স্ব ভূমিতে থাকিতে দিয়া ভাবতঃ তাহাদিগের সঙ্গে মিলিতেন, কিন্তু ইহা হইতে যে মহত্তর ভূমি উদ্ভূত হইবে, তাহার ইহা সূত্রপাত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুভাবে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, অন্যদিকে ইউনিটেরিয়ানগণের চার্চ্চে একেশ্বরের পূজায় যোগ দিলেন, খ্রীষ্টের মহত্ত্ব ও বিশেষত্ব বিশেষরূপে সকলের মনে মুদ্রিত করিয়া দিলেন, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ যে সঙ্কুচিত হিন্দু সীমামধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না, কালে সকল ব্যবধান ঘুচিয়া যাইবে, তাহা স্বীয় আবরণ দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে আপনার লোকদিগকে জানাইয়া গেলেন।

আমাদের পিতামহ ব্রহ্মজ্ঞানের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য অবতারবাদের বিষম বিপক্ষ ছিলেন সত্য, কিন্তু লোকে যাঁহাদিগকে অবতার বলিত, তাঁহাদের উপদেষ্টৃত্বাংশের তিনি যেমন সম্মান করিয়াছেন তেমন আর কে করিয়াছে? তিনি তাঁহাদের বাক্যকে শাস্ত্রপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের নাম উচ্চারণ করিবার কালে ভগবচ্ছব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন "হরিহরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, যেহেতু যে স্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম গ্রহণ হইয়াছে, তথায় ভগবান্ শব্দ কিম্বা পরমারাধ্য শব্দপূর্ব্বক তাঁহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন।" তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগকে তিনি 'ভ্রমপ্রমাদরহিত' বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মোপাসনা, দেশকালজাতিনির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গে উপাসনার ভূমিতে মিলন, আত্মবৎ সকলের প্রতি প্রীতি, ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাজনগণ ও তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের প্রতি গভীর সম্ভ্রম *, এ সকল যখন তাঁহাতে দেখিতে পাই, তখন আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ তিনি ভারতের বক্ষে রোপণ করিলেন তন্মধ্যে পরসময়ে যে মহত্তর বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া সমুদায় পৃথিবীকে ছায়া দান করিবে তাহার উপযোগিতা ছিল। যখন আমরা এ সকল বিষয় চিন্তা করি তখন আমাদিগের মনে কৃতজ্ঞতারস উথলিয়া উঠে।

আমাদিগের পিতামহ অবতারগণের নিকটে না লইয়া গিয়া সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানার্জ্জনে ও ব্রহ্মোপাসনায় অনুযায়িগণকে প্রবৃত্ত করিলেন, ইহাতে কি তিনি আমাদের সম্বন্ধে অল্প উপকার সাধন করিলেন। অনেক সম্প্রদায়ে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। অবতারগণ—মধ্যবর্ত্তিগণ তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তিনি যদি অবতার ও মধ্যবর্ত্তিগণের ঈশ্বরসম্বন্ধে ব্যবধায়কতা প্রত্যাখ্যান না করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবী ধর্ম্মসম্বন্ধে যেখানে আছে সেখানেই থাকিয়া যাইত, এক পদও অগ্রসর হইত না। তিনি যে সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে সময়ে ইঁহাদিগকে শাস্ত্রোপদেষ্টার সম্ভ্রম দান ভিন্ন অন্য কোন সম্ভ্রম দেওয়ার সময় ছিল না, যদি দিতেন তাহা হইলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা কোনরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না। কিন্তু পিতামহ ইঁহাদিগকে যে সম্ভ্রম দিলেন, তাহা কিছু সামান্য নহে। কেন না ইঁহাদিগের বাক্যকেই তিনি সকলের আচরণের নিয়ামক করিলেন। তিনি তৎকালে বিবেক বা ঈশ্বরবাণীশ্রবণ প্রতিসাধকের জীবন-নিয়মনের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, একমাত্র শাস্ত্র ও যুক্তিকেই তিনি এ বিষয়ে সর্ব্বোপরি স্থান দান করিয়াছেন। শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্তিকে সংযোগ করাতে মনে হয় শাস্ত্রের প্রতি বুঝি তাঁহার তেমন আস্থা ছিল না। একপ মনে করিবার কোন কারণ নাই কেন না, এরূপ পন্থা তিনি শাস্ত্রদৃষ্টিতেই স্থাপন করিয়াছেন।

আমরা পিতামহের নিকটে কত ঋণে ঋণী তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। একটি বিষয়ে ঋণ চির অপরিশোধ্য। অবতার ও মধ্যবর্ত্তিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি ব্রহ্মকে যে সকলের সম্মুখে আনয়ন করিয়াছেন, এ ঋণের জন্য পৃথিবী চিরদিন তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিবে। আমরা অগ্রে যে ঈশা চৈতন্য প্রভৃতিকে চিনি নাই, চিনিয়া তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মের নিকটে গমন করিতে বিরত হই নাই, ইহা তাঁহারই জন্য। আমরা আজ যে ঈশ্বরসন্তানগণের পরিচয় পাইয়াছি. তাঁহাদিগকে সম্ভ্রম করিতেছি, ইহা অগ্রে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া। আমরা ব্রহ্মের ভিতর দিয়া তাঁহাদিগের নিকটে গিয়াছি, তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া কখন ব্রহ্মের নিকটে যাই নাই। ব্রহ্ম, ব্রহ্মসম্পর্কে জ্ঞান ও তাঁহার উপাসনা যদি পিতামহ আর সমুদায়ের অগ্রে করিয়া স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের কি দশা হইত! আর দশ সম্প্রদায়ের যে দশা আমাদেরও কি সেই দশা হইত না? অবশ্য তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত ছিলেন, ঈশ্বরপ্রেরণায় তিনি এ সকল অলৌকিক ব্যাপার সাধন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া

* যখন তাঁহার মনে প্রথমতঃ ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল, "তহফতুল মবৃদিন" সেই সময়ের লেখা। পরবর্ত্তী লেখাগুলির সহিত উহার বিরোধ দৃষ্ট হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু কারণ নাই।

কি আমাদের কৃতজ্ঞতা তাঁহা হইতে খর্ব্ব করিতে পারি? তিনি যে জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি চিরকাল আমাদের সম্মান ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিবেন। আমরা যে ব্রহ্মোপাসনার ভিতরে সমুদায় মানবমণ্ডলীর সহিত একাত্মা হইবার ভূমি পাইয়াছি, সেই উপাসনার তিনি সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, ইহা জানিয়া আমরা উপাসনার প্রতি যথেষ্ট অনুরক্ত হইব, কেন না আমরা জানি, তৎপ্রতি যদি আমাদিগকে যথার্থ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে উপাসনানিষ্ঠ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তাঁহার বাক্যে বা বক্তৃতায় সম্মান দেখাইলে হইবে না, তিনি যে ব্রহ্মোপাসনায় সকল জাতিকে এক ভূমিতে আনয়ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই উপাসনা অবলম্বন করিয়া উপাসনাকে নিয়ত সজীব রাখিয়া, তাঁহার সহিত একত্ব লাভ করিতে হইবে। তিনি অন্য কোন সম্মানের ভিখারী নহেন। ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা ব্রহ্মদর্শন হইলেই, সকল মানবের সহিত ঐক্য সম্পাদন করিলেই, তিনি তুষ্ট হইবেন। আজ তাঁহার স্বর্গারোহণের দিবস। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার যে পন্থা প্রকাশিত হইল, তদবলম্বনে যেন আমরা তৎপ্রতি চিরশ্রদ্ধাবান্ থাকিতে পারি।

কটকে ব্রাহ্মবিবাহ।

(একজন বরযাত্রী হইতে প্রাপ্ত।)

বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার কটক নগরে নববিধান সমাজের উপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ ভাই শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমৃতানন্দ রায়ের সঙ্গে উক্ত নগরবাসী মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত দেওয়ান জগন্নাথ রাওয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরস্বতী দেবীর শুভ পরিণয় কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বরের বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর, কন্যার বয়স কুড়ি বৎসর। এই বিবাহে ভাই দীননাথ মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য এবং ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। প্রজাপতি পরমেশ্বর নবদম্পতীকে শ্রেয়ের পথে, পুণ্যের পথে দিন দিন অগ্রসর করুন।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে শ্রীমান্ অমৃতানন্দের বিবাহ একটী প্রধান ঘটনা। এই উদ্বাহসূত্রে মহারাষ্ট্রীয় জাতি ও বাঙ্গালি জাতি এবং বঙ্গদেশ ও উৎকল দেশ সম্মিলিত হইল। এই ব্যাপারে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল হস্ত স্পষ্ট বিদ্যমান লক্ষিত হইতেছে; তজ্জন্য এই বিবাহের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে বিবৃত করা যাইতেছে।

শ্রীমান্ অমৃতানন্দ দরিদ্র প্রচারক পরিবারের সন্তান, তিনি বিষয়কর্ম্ম না করিয়া পরসেবাব্রত—পবিত্র প্রচারব্রত গ্রহণে কৃতসংকল্প; বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া খ্যাতি লাভ করেন নাই। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও উড়িষ্যা আটমল্লিক রাজার দেওয়ান। তাঁহার পুত্রসন্তান নাই। দুই কন্যামাত্র বিদ্যমান। সরস্বতী দেবী কনিষ্ঠা কন্যা। ইনি সুখে সম্পদে অতি আদর ও যত্নে প্রতিপালিতা। নিজের জন্য অর্থ স্পর্শ করিব না, কন্যার জন্য চিন্তা করিব না, যাঁহার এই ব্রত তাদৃশ বৈরাগী প্রচারকের পুত্রের সঙ্গে, ঈদৃশ ধনসম্পন্ন সুখী পরিবারের কন্যার বিবাহ বিধাতার এক বিচিত্র লীলা। অমৃতানন্দের নিকটে ইতিপূর্ব্বে কোন কোন পাত্রীর সম্বন্ধের প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। শীঘ্র বিবাহ করিবেন এরূপ মনেও করেন নাই। দেওয়ান জগন্নাথ রাও অমৃতানন্দকে সুপাত্র বলিয়া মনোনীত করিয়া রায় কন্যার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করেন। অমৃতানন্দের অভিভাবক তাঁহার অর্থাভাব ও বৈরাগ্যব্রত প্রভৃতি সমুদয় অবস্থা দেওয়ান জগন্নাথ রাওকে জ্ঞাপন করেন। তিনি তাহাতে কুণ্ঠিত না হইয়া কন্যার সম্মতির জন্য পত্রযোগে পাত্রসম্বন্ধীয় সমুদায় অবস্থা স্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকটে প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কন্যা আহ্লাদের সহিত সেই প্রস্তাবে সম্মত হন। কন্যার সম্মতিসূচকপত্র শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও বরের অভিভাবকের নিকট পাঠাইয়া দেন। পিতার নিকট লিখিত কন্যার পত্র পড়িয়া, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের উচ্চভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বরের অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের অতিশয় আনন্দ হয়। তখন হইতে রীতিমত সম্বন্ধের প্রস্তাব চলিতে থাকে। শুভানুষ্ঠানের কয়েক মাস পূর্ব্বে উপাধ্যায় কটকে যাইয়া, পাত্রীকে কয়েক দিন ধর্ম্মশিক্ষাদানপূর্ব্বক নবসংহিতানুসারে দীক্ষিত করিয়া চলিয়া আইসেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি যে, দীক্ষা গ্রহণানন্তর পাত্রী আমিষাহারত্যাগ এবং সমগ্র নবসংহিতা পুস্তক অত্যল্প সময়ের মধ্যে উৎকলভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদিত নবসংহিতা অচিরেই মুদ্রিত হইবার কথা। পাত্রী বাঙ্গলা ভাল জানেন, বাল্যকালে মাইনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; পরে ইংরাজীর আরও চর্চ্চা করিয়াছেন এখনও করিতেছেন। দীক্ষাগ্রহণের কিয়দ্দিন অন্তর অভিভাবক ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র শ্রীমান্ অমৃতানন্দকে সঙ্গে করিয়া কটকে গমন করেন। তখন পাত্র ও পাত্রী পরস্পর সাক্ষাৎ আলাপের পর উভয়ে সম্মতি দান করিলে নিবন্ধনপত্র লিখিত হইয়া সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। পাত্রীর পিতামাতা এবং জ্যেষ্ঠতাত পাত্রের সদ্‌গুণ ও উচ্চ ধর্ম্মভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, অন্য কিছুরই প্রতি দৃষ্টি করেন নাই ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

বরযাত্রীদিগের গমনাগমনের পাথেয়স্বরূপ দেওয়ান জগন্নাথ রাও দুই শত পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। বরের পিতৃদেব উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, অভিভাবক কান্তিচন্দ্র মিত্র, ভাই উমানাথ গুপ্ত সস্ত্রীক, ভাই দীননাথ মজুমদার সস্ত্রীক, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী, এই কয়জন নববিধান প্রচারক ও অপর দুইটী প্রচারক পত্নী, এবং আর একটী ব্রাহ্মিকা মহিলা, শ্রদ্ধেয় প্রাচীন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন, বয়ঃপ্রবীণ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত হরিদাস রায়, বর্দ্ধমান দেওয়ানীর সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত

রাজেন্দ্রলাল সিংহ, ইণ্ডিয়াক্লবের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ললিতমোন রায়,শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, যুবক ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীমান্ প্রমথ লাল সেন, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম, এ, উত্তরপাড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীমান্ রাজেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বহরমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, ঐ সংস্কৃত কলেজর শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ, গাজিপুর ওপিয়ম ডিপার্টমেন্টের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীমান্ সত্যশরণ গুপ্ত এম, এ, শ্রীমান্ মনোরথধন দে এম, এ, বরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ যোগানন্দ রায়, সঙ্গীত নিপুণ শ্রীমান্ মনোমতধন দে, ও শ্রীমান্ সত্যভূষণ গুপ্ত, শ্রীমান্ মুক্তিনাথ দাস, শ্রীমান্ নিমাইচরণ ঘোষ, শ্রীমান্ প্রবোধকুমার দত্ত, শ্রীমান্ সত্যানন্দ গুপ্ত, ও প্রেমানন্দ গুপ্ত প্রভৃতি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ জন বরযাত্রিকের অন্তর্গত ছিলেন। তদ্ভিন্ন বালেশ্বর হইতে ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় পুত্র ও পুত্রবধূ এবং কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুসহ বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বর ও অধিকাংশ বরযাত্রী ১লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার অপরাহ্নে কটক নগরে উপস্থিত হন। মহানদী পার হইলেই কটক নগর। নদীর অপরপার পর্য্যন্ত ট্রেণ। বাষ্পীয়পোতযোগে নদী পার হইতে হয়। কন্যার জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও সবান্ধবে বর ও বরযাত্রীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য, অপর পারে ঘাটে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তথা হইতে তিন মাইল পথ অশ্বশকটযোগে অতিক্রম করিয়া বর ও বরযাত্রিকগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। কন্যাকর্ত্তার গৃহের সন্নিহিত বালিকাবিদ্যালয়সংক্রান্ত দুইটী প্রশস্ত পাকা ঘর, বরযাত্রীদিগের অবস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পাত্রীর গৃহে এক এক দিন এক এক জন প্রচারক পাত্রী ও পাত্র এবং পাত্রীর স্বগণ আত্মীয় ও বরযাত্রিকগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পারিবারিক উপাসনা করিয়াছিলেন। ২রা কার্ত্তিক রবিবার শারদীয় পূর্ণিমা উপলক্ষে উদ্বাহমণ্ডপে শ্রীমান্ প্রমথলাল বিশেষ উপাসনা করেন। উপাসনা সরল,স্বাভাবিক ও সুমিষ্ট হইয়াছিল। সেই উপাসনায় যোগদান করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ২রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সায়ংকালে কটক প্রিণ্টিং কোম্পানির হলে শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র নাথ সেন the City without a temple (মন্দির ব্যতীত নগর) বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বৃহৎ হল শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইয়াছিল। অন্য একদিন আর একটি বক্তৃতাদানের জন্য তত্রত্য অনেক শিক্ষিত যুবা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাত্রীর পিত্রালয়ে উদ্বাহসভার জন্য একটি সুন্দর বৃহৎমণ্ডপ, বর ও কন্যা এবং কন্যাকর্ত্তা ও আচার্য্য পুরোহিতের বসিবার জন্য একটী প্রশস্ত বিবাহমঞ্চ নির্ম্মিত, এবং মণ্ডপে একটী সমুচ্চ ও রমণীয় তোরণ স্থাপিত হইয়াছিল। ৪টা কর্ত্তিক শুক্রবার রাত্রি ৭॥ টার সময়ে শুভানুষ্ঠান হয়। উদ্বাহমণ্ডপ নগরের সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিত পুরুষগণের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল; মণ্ডপের পার্শ্বভাগে মহিলাগণের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, বহু সংখ্যক হিন্দু মহিলা বিবাহ দেখিতে আসিয়াছিলেন। স্থানাভাবে বহু ভদ্রলোক মণ্ডপের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গড়জাতের কোন কোন রাজা এবং কতিপয় সাহেব ও মেম উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীতনিপুণ শ্রীমান্ মনোমতধন দে হারমোনিয়ম ও বেহালাযোগে স্বীয় স্বাভাবিক সুললিত স্বরে, সময়োপযোগী সঙ্গীত করিয়া সভাস্থ লোকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ভাই দীননাথ মজুমদার আচার্য্যের এবং ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বালেশ্বরনিবাসী শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন দাস বর ও কন্যার প্রতি আশীর্ব্বাদসূচক উৎকল ভাষায় স্বরচিত এই সঙ্গীত করেন।

সিন্ধুমিশ্র।—তাল চৌতাল।

হে বিধি কর বিধান, নবদম্পতীকু কল্যাণ, দম্পতীর তুম্ভে পতি, হে প্রজাপতি, দিয় গতি, তুম্ভপথে হেউ মতি, শ্রীচরণে এহি জনাণ (ঘোষা)

নবপ্রেমে ভক্তি প্রাণে, যোগাসনে তুম্ভধ্যানে হেউ অটল প্রাণ, তুম্ভে কেবল সম্বল আশ্রিত জনঙ্ক বল, যোগদানে রিপুকুল নাশি দিয় শ্রীপদে স্থান।

তুম্ভ দর্শনে স্পর্শনে যেহ্নে সাধু সাধ্বীজনে (প্রেমে) হুঅন্তি মগন, সেইরূপে অনুক্ষণে বুড়াঅ অনন্ত প্রেমে, হে দয়াময় এ দীনে কর আশীর্ব্বাদ দান।

বঙ্গোৎকল মহারাষ্ট্র, মিলাই আনন্দ মঠ, কল বিধান, সাধু ভকতঙ্কর মেলা, এ ভবসাগরে ভেলা, করিল এ নবলীলা, উদ্ধর অছ পাপীমান।

উৎকল প্রদেশের প্রচারক ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় রচিত এই সঙ্গীত করেন।

বেহাগ।—তাল একতালা।

এস এস এস এস, এস ওহে প্রজাপতি।
অমৃতানন্দ সহ বহে প্রীতিসরস্বতী॥

এ মধুর মিলনে, তোমার বিধানে, তুমি নাথ প্রেমময়, তাহে তোমার বসতি। ধুই তব পাদমূল, যেন ধন্য করে কুল হও তুমি অনুকূল, করি মোরা এই মিনতি॥

শুভানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে পর পাত্র ও পাত্রী অন্তঃপুরে নীত হন। তখন নানাপ্রকার বাজী পোড়ান হইয়াছিল। এই বিবাহ উপলক্ষে পাত্রী মূল্যবান্ বিবিধ আভরণ ও তৈজসপত্র এবং বর সোণার ঘড়ি রূপার গেলাস, রেকাপ, বাটী ও পিত্তল কাঁসার বাসন ও শয্যা উদ্বাহ যৌতুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিবাহ হইয়া গেলে পর কন্যার আত্মীয়া মহিলারা বর ও কন্যা উভয়কে একটি একটি সুবর্ণ অঙ্গুরীয় দান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। বর অন্তঃপুর হইতে আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে দেখি, তাঁহার পাচটি অঙ্গুলিতে পাচটি সুন্দর স্বর্ণাঙ্গুরি। তন্মধ্যে দুইটি

দুইটি অঙ্গুরীয়ের শীর্ষদেশে "সত্যং শিবং সুন্দরং" এই কয়টী কথা অঙ্কিত। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে কয়েক দল সে দেশীয় বাদ্যকর অনুক্ষণ কয়েকপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়াছিল। তাহাতে বরযাত্রিকগণ কত দূর সুখী হইয়াছেন তাঁহারাই জানেন। এইরূপে মহাসমারোহে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পর দিন রাত্রিতে কয়েক জন সাহেব ও মেম সাহেব ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সাহেব বিবিগণ আসনে বসিয়া কদলীপত্রে এদেশীয়রূপে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন আদি ভোজন করিয়াছিলেন। সেই দিন প্রায় সমুদায় বরযাত্রী পুরুষোত্তম ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরি ইত্যাদি দর্শন করিতে যান। তাঁহারা প্রত্যাগত হইয়াই কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। বর ও কন্যা সহ কলিকাতায় যাত্রা করিবার জন্য বরের পিতৃদেব ও অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী স্থিতি করেন। ৬ই রবিবার উৎকল ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। পাত্র ও পাত্রী মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। "প্রকৃত বিবাহ" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। এত দিন বিবাহের আমোদ ছিল, এক্ষণ বিজয়া অর্থাৎ কন্যা বিদায়ের ক্রন্দন। বিবাহের পর সাত দিন কন্যাকে রাখিবার জন্য তাঁহার গর্ভধারিণী ও আত্মীয়বর্গের অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। পরে চারি দিন কন্যা পিতৃগৃহে থাকিবেন এইরূপ স্থির হয়। ৯ই কার্ত্তিক বুধবার কন্যাবিদায়ের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব দিন কন্যাকর্ত্তার বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজমোহন বসু বর কন্যাকে লইয়া বিশেষ পারিবারিক উপাসনা করিয়াছিলেন। বুধবার প্রাতঃকালে কন্যার জ্যেষ্ঠ তাত, সেই পরিবারের অভিভাবক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও মহাশয় উপাসনা করেন ও বরকন্যাকে সংক্ষেপে উপদেশ দেন। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তিনি আশীর্ব্বাদসূচক স্বরচিত একটি সঙ্গীতও করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও কটক নর্ম্মাণস্কুলের প্রধান শিক্ষক, তিনি একজন ধর্ম্মোন্নত পণ্ডিত লোক; তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও চরিত্রের প্রভাবে পরিবারটির এত শ্রী ও উন্নতি হইয়াছে। সেই পরিবারের অন্তর্গত স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও বালিকা প্রায় সকলের ধর্ম্মভাব, জ্ঞানপিপাসা এবং উচ্চ নীতি ও সৌজন্য দর্শন করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই পরিবারের কন্যারত্নকে পুত্রবধূরূপে প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় পরম সুখী হইয়াছেন। ৯ই বুধবার বেলা ১০টার সময় কন্যার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত সবান্ধবে পরম আদর ও যত্ন সহকারে ষ্টীমারঘাট পর্য্যন্ত যাইয়া বরকন্যাকে বিদায় দান করেন। কন্যার মাতা ও জ্যাঠাইমা প্রভৃতি পরিবারের মহিলাগণ কন্যা বিদায়ের দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতেই পুনঃপুনঃ অশ্রুস্রোতে স্নান করিয়াছেন।

সংবাদ।

বিগত ১২ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার চট্টগ্রাম নগরে নববিধান বিশ্বাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র গুপ্তের কন্যা শ্রীমতী মনোরমার সঙ্গে বরিশালনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাসের পুত্র শ্রীমান্ ললিতমোহন দাসের শুভ পরিণয় নবসংহিতার পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ নবদম্পতীকে শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কটক হইতে পুরুলিয়া হইয়া বাঁকিপুরে গিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার কথা। শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী কটক হইতে কলিকাতা হইয়া বাঁকিপুরে গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের খৃষ্টবিষয়ক বক্তৃতা ও ভট্টমোক্ষমূলরের পত্র লইয়া এদেশে এবং ইংলণ্ডে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দলের ব্রাহ্ম, ইউনিটেরিয়ান ও খৃষ্টীয় পত্রিকা সকল নানা কথা বলিতেছেন। সকলেরই জানা উচিত যে, নববিধানবিশ্বাসিমাত্রেই বিশ্বাস করেন সর্ব্বোপরি বিশ্বপতি পরমেশ্বরের সিংহাসন, তাঁহার পদতলে সাধুজনগণ। বিধানবিশ্বাসিগণ সাধু মহাজনদিগকে ভক্তি করেন, তাঁহাদের সঙ্গে একাত্মতালাভে প্রয়াসী, তাঁহাদিগের শিরোভূষণ করিতেও লালায়িত, কিন্তু সর্ব্বোপরি যে ঈশ্বরের স্থান তদ্বিষয়ে তাঁহারা সুদৃঢ়। পবিত্রাত্মা পরমেশ্বর তাঁহাদের হস্তধারণ করিয়া যখন যে সাধুর নিকট লইয়া যান, তাঁহারা আনন্দমনে তৎসন্নিধানে যান, কোন বিভীষিকা তাঁহাদিগকে ভীত করিতে পারে না।

ধর্ম্মতত্ত্বের যে সকল গ্রাহক অদ্যাপিও মূল্য পরিশোধ করেন নাই, তাঁহাদিগকে আমরা সত্বর মূল্যদানের জন্য পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু অনেকের নিকট এখনও মূল্য বাকী রহিয়াছে। বৎসরও প্রায় শেষ হইতে চলিল। গ্রাহকগণ দয়া করিয়া তাঁহাদের মূল্য সত্বর পাঠাইলে আমরা উপকৃত হইব।

১৬ই কার্ত্তিক বুধবার কাশীপুরনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের নব কুমারের জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ মজুমদার উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

আরা হইতে শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন :—

সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার নৃত্যগোপাল মিত্রের পত্নীবিয়োগ-সংবাদ আপনারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে দেখিয়াই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রোগে শোকে তাঁহার শরীর মন ভগ্ন। তিনি বলিলেন "২৭ বৎসর আমার বিবাহ হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে অল্পদিনমাত্র আমার পত্নী আমা ছাড়া ছিলেন। তিনি যথার্থই আমার সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মপথের সহায় ছিলেন।" ডাক্তারবাবু স্বীয় সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মবিশ্বাসের সুন্দর সুন্দর কাহিনী আমাকে বলিয়াছেন; তাহা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহার জীবনের গূঢ়তত্ত্ব তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অনুকূল লিখিয়া শ্রাদ্ধের

দিন পাঠ করিবেন এরূপ কথা আছে। আমার সঙ্গে স্বর্গগতা ভগিনীর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। কোন কোন বিশেষ কারণে আমি ক্রমে কয়েক মাস এই আরানগরে প্রিয় ভাগিনের অত্রত্য ডিঃ কলেক্টর শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দের আবাসে স্থিতি করিয়াছি। তখন প্রতিসপ্তাহে ন্যূনকল্পে একবার ডাক্তার বাবুর গৃহে আমাকে উপাসনা করিতে হইয়াছে। সেখানে ভগিনীর অত্যন্ত আদর শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছি। গত বৎসর মাসাধিক কাল তিনি আমার উপাসনাপ্রাক্‌কালে নিজ উদ্যানজাত পুষ্পরাজিতে ডালি সাজাইয়া মালিযোগে আমার নিকটে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সময়ে সময়ে উদ্যানসমুৎপন্ন ফল ও তরকারি আমাকে উপহার দিয়াছেন। অন্তঃপুরস্থ ক্ষুদ্র উদ্যানটি তাঁহার স্বহস্তকৃত বলা যায়। ক্ষুদ্রস্থানে সুব্যবস্থা ও সুপ্রণালীমতে নানাবিধ পুষ্প, তরু ও ফলবান্ তরু এবং বিবিধ শাক তরকারী রোপিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বদা সেই বাগানের তত্ত্বাবধান করিতেন। ডাক্তারবাবু বলিলেন ১২ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে কোন রোগ প্রকাশ পায় নাই। চিরকাল শরীর সুস্থ ও সবল ছিল। হঠাৎ সেই সবল শরীর অল্পদিনের সামান্য জ্বরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। নৃত্যগোপাল বাবুর অনুরোধমতে আজ মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহে উপাসনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আমার বধূমাতাও উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। মাসান্তে শ্রাদ্ধকার্য্য কলিকাতায় হইবে। আজ মৃত্যুর ১৭ দিন অতীত হইতেছে। বাঁকিপুরে বেদীর কার্য্য করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও সর্দ্দি কাশীর জন্য মন্দিরে যাইতে পারি নাই। বিধানাশ্রমে সামাজিক ভাবে উপাসনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

প্রেরিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

[স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহ]

ইনি অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, সকল কথা লিপিবদ্ধ করি নাই। যাহা লিপিবদ্ধ ও স্মরণ আছে তাহা হইতে কয়েকটি বিষয় পাঠক মহাশয়দিগকে বিনীতভাবে উপহার প্রদান করিতেছি।

১। ধ্যান কষ্টিপাথরস্বরূপ, যথার্থ আরাধনা হইল কিনা ধ্যানের ঘরে তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়।

২। ধ্যান দর্পণস্বরূপ। ব্রহ্মস্বরূপদর্পণে নিজের পাপ অভাব সকল বুঝিয়া লওয়া যায়।

৩। প্রাণ খুলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। যদি কোন পাপ অন্তরে পোষণ করি, তাহা পরিত্যাগ করিতে অন্তরে ইচ্ছা না থাকিলে, যথার্থ প্রার্থনা হয় না।

৪। যদি কাহারও পীড়া হয় আর অন্য ব্যক্তি যিনি ঐরূপ পাড়ায় পীড়িত থাকিয়া একটি ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি যেমন বলেন, ওগো আমি অমুক ঔষধ খাইয়া আরাম হইয়াছি, তুমিও সেই ঔষধ খাও, আমরাও (প্রচারকগণ) তেমনি প্রচার করিয়া থাকি।

৫। চৌকিদার যেমন নিদ্রিত লোকদিগকে জাগায়, আমরাও তেমনি মোহনিদ্রাগত ব্যক্তিগণকে জাগাইয়া থাকি।

৬। হরিনাম করি তবু পাপ যায় না কেন ?

যেমন ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত পথ্য সেবন করা কর্ত্তব্য, সুপথ্য সেবন না করিলে বোতলে বোতলে ঔষধ সেবন করিলেও ফললাভ করা যায় না; তেমনি হরিনাম করিয়া হরিনামরূপ ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে সদাচরণরূপ পথ্য গ্রহণ না করিলে জীবনে কোন উপকার লাভ হয় না।

৭। প্রত্যেক মনুষ্যের সহিতই আমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ আছে। পরিচয় না হওয়া পর্য্যন্ত অব্যক্ত থাকে, পরিচয় হইলেই তাহা ব্যক্ত হয়।

এইরূপ আরও কত মূল্যবান্ তত্ত্ব তাঁহার নিকটে লাভ করিয়াছি। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় শ্রীমৎ ত্রৈলোক্যভূষণের সমাধিস্থানে পরলোকগত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যে সুগম্ভীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে পরলোকতত্ত্ব অতি আশ্চর্য্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমরা টাঙ্গাইলের মণ্ডলীস্থ দীন ব্রাহ্মগণ এই প্রেরিত মহাত্মার নিকটে অশেষ ঋণে ঋণী। আমরা একান্ত মনে প্রার্থনা করি দয়াময় শ্রীহরি তাঁহার এই ভক্ত সন্তানকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দান করুন এবং তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়গণের মনে শান্তি বিধান করুন।

এই ঘটনা উপলক্ষে আমি নববিধানমণ্ডলীস্থ ব্রাহ্মভ্রাতৃগণের বিশেষতঃ প্রেরিত ও প্রচারক মহাশয়দিগের নিকট বিনীতভাবে একটী নিবেদন করিতে অভিলাষ করি। ব্রাহ্মদিগের জীবনে দয়াময় শ্রীহরি বিশেষ লীলা করিতেছেন, বিশেষতঃ প্রেরিত সাধকদিগের জীবন মণ্ডলীর মূল্যবান্ সম্পত্তি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই, জীবনী সকল রক্ষিত হইতেছে না। ব্রাহ্মসাধারণের কথা দূরে থাকুক, প্রেরিত ভক্তদিগের জীবনীরক্ষাসম্বন্ধে আমরা যেরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছি তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে। শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় ১৮০১ শকের ১লা শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে "ব্রাহ্মভ্রাতৃগণের নিকট নিবেদন" শীর্ষক প্রস্তাবে এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণকে সতর্ক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে বিশেষ কোন ফল ফলিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। দেখিতে দেখিতে আচার্য্যদেব ভিন্ন ৫ জন প্রেরিত ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়ের জীবনী মুদ্রিত হইয়াছে, আর কাহারও জীবনী সাধারণের হস্তগত হইল না, ইহা কি কম ক্ষোভ ও দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমরা আশা ও প্রার্থনা করি প্রেরিত প্রচারক মহোদয়গণ ও বিধান বিশ্বাসী ব্রাহ্মসকল শ্রীমদাচার্য্যদেবের পবিত্র দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আপন আপন জীবনী ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়া বিধানমণ্ডলীর হিতসাধন করিবেন।

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু,—

গত ১লা আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বের সংবাদস্তম্ভে আপনাদের কোন বন্ধুর কএকটি প্রশ্ন পাঠ করিয়াছি। আপনারা এবিষয়ে পাঠকবর্গের নিকট উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছেন। আমি একজন ধর্ম্মতত্ত্ব নিয়মিতরূপে পাঠ করিয়া থাকি। প্রশ্ন কয়টি সম্বন্ধে আমার নিজের যাহা বিশ্বাস আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকগণের এবং প্রশ্নকর্ত্তার অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমার যদি কোন ভ্রম ধারণা থাকে আশা করি আপনারা তাহার অপনোদন করিবেন।

প্রথম, প্রশ্ন "অনুকূল প্রতিকূল সকল ঘটনাই ঈশ্বরপ্রেরিত কি না?" বস্তুতঃ প্রতিকুল বলিয়া কোন ঘটনা ঈশ্বরের রাজ্যে আছে বলিয়া মনে হয় না। মঙ্গলময় ঈশ্বর হইতে যখন মঙ্গল ভিন্ন কখনও অমঙ্গল প্রসূত হয় না তখন কেমন করিয়া বলিব যে অমঙ্গল ঘটনা ঈশ্বরপ্রেরিত। বস্তুতঃ আমরা যাহাকে (অমঙ্গল) প্রতিকূল ঘটনা বলি তাহাই যে যথার্থ প্রতিকূল তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

জীবনের পরীক্ষায় অনেক বার দেখা গিয়াছে যাহাকে এক দিন প্রতিকূল অবস্থা বলিয়া, অমঙ্গলকর অবস্থা বলিয়া মনে করিয়াছি তাহাই পরসময়ে মহামঙ্গলকর হইয়াছে। বস্তুতঃ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরে প্রতিকূল অনুকূল বলিয়া কোন অবস্থা নাই। যাহা তাঁহাতে নাই তাহা তাঁহা হইতে কিরূপে সমাগত হইবে? যাহা একজনের পক্ষে অনুকূল, ঠিক তাহাই আবার আর একজনের পক্ষে প্রতিকূল। ঘটনার আনুকূল্য প্রাতিকূল্য কেবল মানুষের কল্পনাসম্ভূতমাত্র।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, "মহর্ষি ঈশাকে যাহারা বধ করিয়াছিল, তাহারা পাপী কি না?" এ প্রশ্নের উত্তর করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত ঈশাকে কি অপরাধের জন্য বধ করিয়াছিল? জীবনদানের জন্য ঈশা প্রস্তুত ছিলেন কি না? এসকল প্রশ্নের রীতিমত বিচার করিয়া লিখিতে হইলে পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়ে, সুতরাং যাহা আমি সার বুঝি তাহাই বিবৃত করিতেছি।

ইহুদীদিগের ধর্ম্মযাজকেরা মহর্ষি ঈশার অলৌকিক জীবন দর্শনে এবং আপনারা তৎসমতুল্য হওনের অক্ষমতাবশতঃ তাঁহার জীবননাশ করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল। যাহারা পরশ্রীকাতর তাহাদের যে দশা, বধকারীদিগেরও সেই দশা। ইহুদীরা মনে করিল ঈশাকে কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিলেই তাহাদের নষ্ট গৌরবের আবার উদ্ধার হইবে। ঈশা কাহারও কোন অপকার করেন নাই, কেবল যাহা তাঁহার পিতার ইচ্ছা তাহাই জগৎকে দেখাইয়া বাধ্য সন্তানের দৃষ্টান্ত জগতে রাখিয়া গেলেন। যাহারা বিনা অপরাধে নির্দ্দোষীর প্রতি দণ্ডবিধান করে তাহারা যে পাপ করে নাই, তাহা কিপ্রকারে বলিতে পারি? তবে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র। তিনি ঈশার শত্রুদিগের দ্বারাই তাঁহাকে আরও জয়যুক্ত করিলেন। ইহুদিরা যে ঈশাকে বধ করিবার জন্য গোপনে গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল তাহা কি তিনি জানিতেন না? তিনি তাহা জানিতে পারিয়াই নির্জ্জনে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার পিতার অভিপ্রায় কি তাহা অবগত হইয়াছিলেন এবং আপনার শিষ্যদিগের নিকট উহা প্রকাশও করিয়াছিলেন। যখন ষড়যন্ত্রকারীরা ঈশাকে ধরিতে আসিয়াছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে পলাইয়া স্বীয় জীবন বাঁচাইতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি স্বয়ং দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কি বলিলেন? তিনি বলিলেন (Whom seek ye) কাহাকে খুঁজিতেছ। তাহারা বলিল(Jesus of Nazereth) নেজারেথের যীশুকে খুঁজিতেছি। তিনি বলিলেন (I am he) আমিই সেই। এরূপ একবার নয় দুইবার নয় তিনি তিনবার এরূপ করিয়া নিজের ইচ্ছায় তাঁহার পিতার ইচ্ছায় উহাদিগের নিকট ধরা দিয়াছিলেন। সমস্ত নরনারীর কল্যাণের জন্য দেবপুত্র আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন, তাঁহার পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইল; মানবজাতির কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হইল। আর যাহারা তাঁহার গৌরব লুপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বধ করিল তাহারাই তাঁহাকে অসংখ্য গুণে গৌরবান্বিত করিল। ঈশা যখন জন্মিয়াছিলেন তখন যে মরিতেন না তাহা নহে, কিন্তু পিতার ইচ্ছায় নরনারীর কল্যাণের জন্য জানিয়া শুনিয়া জীবন দিয়া তিনি অক্ষয়পুণ্য লাভ করিলেন। যাহারা মন্দ ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিল তাহারা চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হইল, আর তিনি চিরগৌরবান্বিত হইলেন। এখানেই (out of evil cometh good) মন্দের ভিতরেও মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার জয় হইল।

তৃতীয় প্রশ্ন,"ঈশার বধ ঘটনা জগতের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক হইয়াছে কি না?" যাঁহারা ইতিহাস জানেন তাঁহারাই জানেন যে এক ঈশার জীবনদানে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশার জন্ম হইল, জগতের কত মঙ্গল হইল,জনহিতকর কত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। এসকলের মূলে কি ঈশার জীবনদান নয়? যেখানে যত লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে হইতেছে খ্রীষ্টের শিষ্যেরাই কি তাহার পথপ্রদর্শক এবং নেতা নহেন? উদাহরণস্থলে এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যাইতে পারে। সুতরাং তৃতীয় প্রশ্নের সহজ মীমাংসা ঈশার জীবনদান তাঁহার নিজের এবং জগতের কল্যাণবর্দ্ধনের জন্য। ঈশা যদি বাধ্য সন্তানের মত তাঁহার পিতার ইচ্ছায় অকাতরে জীবনদান না করিতেন, আজ তাঁহার ধর্ম্মের এত গৌরব এবং জগতের এত কল্যাণ সাধিত হইত না।

চতুর্থ প্রশ্ন, "এই একই কার্য্যের জন্য কর্ত্তা ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ে দায়ী কি না?" আমার বোধ হয় ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ কর্ত্তা নাই। মানুষ আপনার নিজের বুদ্ধিবলে স্বাধীন ইচ্ছাস্রোতে দুদিন তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া শেষে আপনা আপনিই শান্ত হইয়া পড়ে এবং হতাশ হইয়া বলে প্রভু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ঈশ্বর যন্ত্রী মানুষ যন্ত্র। যন্ত্র যদি যন্ত্রীর ইচ্ছায় না চলে কিছুক্ষণ মধ্যেই আপনা আপনি বিগড়াইয়া যায় বিকলাঙ্গ হয়, পরিশেষে আপনিই আপনার ফাঁদে পড়িয়া অশেষ দুর্গতি লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া শেষে আশ্চর্য্য কৌশলে উদ্ধার হইয়া যায়।

মানুষের নিজের স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনে বিধাতা ক্ষমতা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু মানুষ যখন সেই শক্তির অপব্যবহার করে তখন সেই স্বাধীন ইচ্ছাসম্ভূত কার্য্যেই অশেষ দুর্গতি আনয়ন করিয়া মঙ্গলময়ের অলঙ্ঘ্যনিয়মে আশ্চর্য্যরূপে নিজ উদ্ধারসাধনে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কর্ত্তা এক তিনি, মানুষ কেবল নিজের অহঙ্কারে আপনিই আপনাকে অশেষ দুর্গতির কারণ করিয়া তোলে মাত্র।

মানুষের নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান কেবল ভগবদ্দত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার বই আর কিছুই মনে হয় না। মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কাজ করিবে, আপনার অমঙ্গল আপনি আনয়ন করিবে তাহার জন্য তিনি দায়ী হইবেন কেন? মানুষ কর্ত্তা নয়, কর্ত্তৃত্বাভিমান কেবল বিড়ম্বনামাত্র।

মানকর। প্রণত।
১২।১০।৯৯ শ্রীনিবারণচন্দ্র বসু।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ১৭ই কার্ত্তিক মুদ্রিত।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ।
২১ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পরম দেব, আমাদিগকে প্রকৃতির অনুগামী কর। তোমার প্রকৃতি তো তোমা হইতে ভিন্ন নহেন, সদা তোমার সঙ্গে অভিন্নযোগে একভাবাপন্ন, যদি যোগী হইতে হয়, তাহা হইলে তিনিই প্রকৃত যোগিত্বের নিদর্শন। প্রকৃতি তোমার সঙ্গে অভিন্ন যোগে এক হইয়া অবস্থিত, আমরা যদি সেই প্রকৃতির সঙ্গে যোগে এক হইয়া যাই, তাহা হইলে তো সেই যোগে তোমার সঙ্গেও যোগসিদ্ধ হইল। প্রভো, এ যোগের বিরোধী আমাদের নিজ নিজ বিকৃতি, সেই বিকৃতি ঘুচাইয়া যদি আমরা প্রকৃতিস্থ হই, তাহা হইলে অন্তর ও বাহিরের প্রকৃতি উভয়ই যে তোমার সঙ্গে নিত্যযোগে অভিন্ন ভাবে স্থিত, ইহা আর বুঝিবার পক্ষে কোন গোল থাকে না। বল, নাথ, আমাদের প্রকৃতি কি সমগ্র ভাবে বিকৃতির অধীন হইয়াছে? ভিতরে কি এমন একটুও স্থান নাই, যেখানে এখনও প্রকৃতিস্থ হইবার উপায় রহিয়া গিয়াছে। যদি তাহা না থাকে তাহা হইলে তো আর আমাদের পরিত্রাণের আশা নাই। তাহা হইলে তো অনন্ত নরক আমাদের সম্বন্ধে অপরিহার্য্য। কৃপানিধান, এরূপ তো হইতে পারে না। তোমার ন্যায়বিধি এ মতের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিতেছে। এখনও দেখিতে পাই, আমাদের বিকার ঘুচাইবার জন্য হৃদয়ে এমন একটু স্থান আছে, যেখান হইতে ক্রমান্বয়ে সাবধান করিয়া দেওয়ার জন্য বাণী উঠিতেছে। যখনই বিপদের পথে অগ্রসর হই, তখনই সেই বাণী বজ্রধ্বনিতে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়। যদি সেই বাণী শুনিয়া সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হই, অমনি নূতন বলের সঞ্চার হয়, আত্মার অনেকটা স্বাস্থ্য প্রত্যাবর্ত্তিত হইল বুঝিতে পারি। যদি ক্রমান্বয়ে ঐ বাণীর প্রতি আমাদের মনোভিনিবেশ থাকে, তাহা হইলে এ অবস্থায় তদনুসরণ তিক্ত ঔষধ সেবনের ন্যায় হইলেও, উহা আমাদের পরিণামে তোমার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগের হেতু হইবে, অন্তরে বাহিরে সকল প্রকার বিরোধ ঘুচিয়া যাইবে। হে দেব, তুমি নিরন্তর অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে সাবধান কর, যদি আমরা তোমার সাবধানবাক্যে কর্ণপাত না করি, আমাদিগকে তীব্রশাসনের অধীন কর, সমুচিত দণ্ড দাও। যত ক্ষণ না আমরা প্রকৃতিস্থ হই, তত ক্ষণ যেন তোমার তীব্রদণ্ডের নিবৃত্তি না হয়। প্রাণনাশক ক্ষত দেহমধ্যে গূঢ়তম স্থানে

প্রবিষ্ট থাকিলে সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রে যে প্রকার ছেদ ভেদ হয়, তেমনি তোমার সুতীক্ষ্ণ শাসনাস্ত্র আমাদের অন্তর ভেদ করিয়া উহাকে খণ্ড বিখণ্ড করুক, আমরা সেই শস্ত্রের আঘাতে বিমুক্তি লাভ করি। তুমি আমাদিগের কল্যাণের জন্য, আমাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য, যখন যে প্রকার ব্যবহার আমাদের প্রতি প্রয়োজন সেইরূপ ব্যবহার করিবে, এই আশা করিয়া আমরা বার বার ভক্তির সহিত তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

ব্রহ্মস্তোত্র।

ব্রহ্মস্তোত্রের সহিত পৌরাণিক ভাবের আরম্ভ ইহা আমরা অনেকবার নির্দ্ধারণ করিয়াছি। এখন যাহাকে বিধাননামে আমরা আখ্যাত করিয়া থাকি পুরাণ তাহাই, ইহাও আমরা বলিয়াছি। পুরাণ ঈশ্বরের অবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু সময়ে সময়ে সেই ক্রিয়া যখন সকল লোকের চক্ষুর গোচর হয়, তখন সেই সময়ের ঘটনাবলি গ্রন্থে নিবদ্ধ হইলে তাহাকে পুরাণ বলে। সুতরাং বিধান ও পুরাণ আমরা একই বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি। বিধান মানিলে ঈশ্বরের বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া মানিতে হইবে ইহার কোন কারণ নাই। এদেশের ভক্তগণ যদিও পৃথিবীসম্বন্ধে ঈশ্বরের ক্রিয়া কখন ব্যক্ত কখন অব্যক্ত এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তথাপি ভক্তগণের নিকটে তাঁহার ক্রিয়া নিত্য ব্যক্ত ইহা স্বীকার করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। যাঁহারা বিধান মানেন তাঁহারাও বিশ্বাসিগণসম্বন্ধে ঈশ্বর প্রতিদিন যাহা করিতেছেন তাহাকে তাঁহার বিধান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশেষ সময়ে বিশেষ ভাবে সমুদায় জাতির জন্য যাহা বিহিত হয় তাহা বিশেষ বিধান, প্রতিব্যক্তিসম্বন্ধে যাহা বিহিত হয় তাহা সে ব্যক্তির সম্বন্ধে বিশেষ বিধান। যাহা সমান ভাবে প্রতিদিন সকলের জন্য হইতেছে, তাহা সাধারণ বিধান। এ দেশের পৌরাণিকগণমধ্যে যে এ ভাব নাই তাহা কখন বলা যাইতে পারে না।

'উপাসনার অঙ্গ' বিষয়ক প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছি, "বেদ ও বেদান্তে যে সকল সম্বন্ধ ও স্বরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, সেই সকল সম্বন্ধ ও স্বরূপের নবীন নবীন ভাব বিস্তৃত জনসমাজের সহিত সম্বন্ধপর্য্যালোচনায় সাধক ও ভক্তগণের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা সেই সেই নবীন ভাবানুসারে যে সকল নাম দিয়াছেন, সেই নামে সকল জনসমাজের নিকট তিনি পরিচিত হইয়াছেন। স্তোত্রপাঠকালে ভিন্ন ভিন্ন বিধানের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গৃহীত ঈশ্বর আমাদের নিকট প্রকাশিত হন। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গৃহীত ঈশ্বরের সঙ্গে নিগূঢ় ভাবে সেই সকল সাধু মহাজন অনুস্যূত থাকেন, যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে সেই সেই ভাবে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া তত্তন্নামে প্রখ্যাত করিয়াছেন।" স্তোত্রমধ্যে যে নামগুলি নিবদ্ধ রহিয়াছে তাহার অনেকগুলি সাধারণ ভাবে সকল দেশ সকল জাতির সাধক ও ভক্তগণ অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তত্তন্নামে সকল দেশ সকল জাতির সাধক ও ভক্তগণের সহিত স্তোত্রপাঠকালে আমাদের একতাবন্ধন হয়; ইহা আমাদিগের পক্ষে কিছু সামান্য উপকার নহে। কেন না দেশ কাল জাতির ভেদ উঠাইয়া দিয়া আমরা সকলের সঙ্গে এক হইতে চাই। সকলের সঙ্গে এক হইতে গেলেও সেই একতার মধ্যে বিশেষ বিশেষ জাতীয় বিধানের সহিত বিশেষ ভাবে মিলিত হইতে না পারিলে সেই সেই জাতির সহিত এক হওয়া কঠিন। এ জন্য তত্তদ্বিধানের বিশেষ নামটি আমাদের মনে স্তোত্রপাঠকালে বিশেষ ভাব উদ্দীপন করিবে, ইহা নিতান্ত আকাঙ্ক্ষণীয়।

পুরাণে 'পরব্রহ্ম' এই নামটি বিশেষ ভাবে গৃহীত। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা বেদ ও বেদান্তের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, পরব্রহ্ম বলিলে যিনি জীবের সহিত নিত্য লীলা করিতেছেন অথচ সকলের অতীত হইয়া আছেন, ভক্তগণের ব্যবহারানুসারে

তিনিই আমাদের বুদ্ধিগোচর হন। অকিঞ্চননাথ প্রভৃতি যে সকল বিশেষ বিশেষ ভাবব্যঞ্জক নাম স্তোত্রে আছে, সেগুলি এই পরব্রহ্ম নামের সহিত অনুস্যূত, এবং সকল দেশের ভক্তগণ স্ব স্ব ভাষায় তদ্ভাবের নাম সকল ব্যবহার করিয়াছেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্, এ কয়েক নামে ভাগবতে বেদ, বেদান্ত ও পুরাণের উপাস্য* একত্র সংগ্রথিত হইয়াছে। স্তোত্রে ভাগবান্ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভগবান্ এই শব্দ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিযুক্ত ঋষি ভক্ত ও সাধকগণের প্রতিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এজন্য সে শব্দ স্তোত্রে নিবদ্ধ হয় নাই। পরব্রহ্ম বলিলে ঋষি ভক্ত ও সাধক বুঝায় না, লীলাকারী জগৎ ও জীবের অতীত ঈশ্বরকেই বুঝায়, সুতরাং দেশীয় বিধানসমূহের সহিত যোগসাধন করিতে গেলে এই নামই গ্রহণীয়। এদেশ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পরব্রহ্ম শব্দটি সকল সম্প্রদায়েরই সম্ভ্রম উদ্দীপন করে, এবং হিন্দুবিধানের অখণ্ডত্ব ঐ এক শব্দে সম্পাদিত হয়, এজন্য ঐ নামটি বিশেষ সাধনের যোগ্য।

একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য বিধানে যে নাম বিশেষ বলিয়া আদৃত, উহা হিন্দুবিধানে নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ এই শব্দটি হিন্দুবিধানে যমকে বুঝায়, আমরা বৌদ্ধবিধানের সহিত উহাকে সংলগ্ন করিয়া লইতে পারি, কেন না বৌদ্ধধর্ম্মে ধর্ম্মের প্রাধান্য। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই তিন বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রধান। বুদ্ধকে 'বৈদ্যরাজ' বলিয়া বৌদ্ধগণ আদর করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ রাজত্ব ধর্ম্ম অর্থাৎ যে সকল নৈতিক বিধি তিনি স্থাপন করিয়াছেন তদুপরি নির্ভর করে। শীল ব্রত সমাধি প্রভৃতি অবলম্বন না করিলে কে আর বুদ্ধের অনুসরণ করিতে পারে? ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্ম নিয়ম রক্ষণ ও প্রবর্ত্তন জন্য সঙ্ঘের সমাদর। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মে ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। 'ধর্ম্মরাজ' এই শব্দ, ধর্ম্মই একমাত্র রাজা—সর্ব্বেশ্বর, এই ভাবে গ্রহণ করিলে উহা বৌদ্ধবিধানের সহিত সংযুক্ত হয়। সমুদায় 'ধর্ম্ম' পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া হিন্দুভাব, বৌদ্ধভাব ঠিক ইহার বিপরীত। ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া কেহ বুদ্ধ ভাবাপন্ন হইতে পারেন না। যিনি বুদ্ধের অনুগমন করিবেন, তাঁহাকে বলিতে হইবে,

> ন চ তত্রাবতিষ্ঠেথা যত্র ধর্ম্মস্যাপরাধঃ।
> বোধির্যথা প্রাপ্যঃ স্যাদ্ধর্ম্মঞ্চ প্রবর্ষয়তামৃতগামি॥

"যেখানে ধর্ম্মের প্রতি অবমাননা হয়, সেখানে থাকিও না। সেইরূপ অনুষ্ঠান কর যাহাতে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। অমৃতপ্রাপক ধর্ম্ম বর্ষণ কর।"

যিহুদী বিধানেও যে নামটি প্রধান, হিন্দুবিধানে তাহা অধঃকৃত হইয়া রহিয়াছে। 'স্বয়ম্ভূ' এই শব্দটি ব্রহ্মার নামের সহিত সংযুক্ত। ব্রহ্মা কখন ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নহেন। যিহুদী বিধানের যিহোবাশব্দের প্রতিরূপ যদি সংস্কৃত ভাষায় অন্বেষণ করা যায়, তবে 'স্বয়ম্ভূ' এই শব্দই উহার প্রতিশব্দ। যিহুদী বিধানে আর একটি ভাব নিতান্ত প্রবলতর, সেটি বিধাতৃভাব। বিধাতা এ শব্দটিও হিন্দুগণের অনাদরভাজন। 'অহহ হতবিধাতঃ' (পোড়া বিধাতা) এরূপ নিন্দাসূচক কথা হিন্দুগণের মধ্যে বিরল নহে। স্তোত্রের বিধাতা শব্দটি যিহুদী ভাবের ব্যঞ্জক, এই ভাবে উহা খ্রীষ্টীয় বিধানের সহিত এক। স্বয়ম্ভূশব্দ প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়া আমরা যিহুদী বিধানের সহিত এক হইতেছি; যিহুদিবংশোৎপন্ন খ্রীষ্টধর্ম্মকে তদ্বংশের সহিত ভাবে মিলিত রাখিবার জন্য আমরা বিধাতা এশব্দটিও স্বয়ম্ভূশব্দ সহ গ্রহণ করিতেছি। স্বর্গরাজশব্দসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে, কেন না হিন্দুবিধানে স্বর্গরাজ ইন্দ্র, যিহুদীবিধানে ঈশ্বর।

খ্রীষ্টবিধানে 'পিতা' এই শব্দের প্রধান্য। মুসলমান বিধান যেমন পিতা এই শব্দকে অধঃকরণ করিয়াছে, হিন্দুবিধান যদিও তেমন অধঃকরণ করে নাই, তথাপি উহাতে পিতৃশব্দের প্রাধান্যও দৃষ্ট হয় না। স্তোত্রের পিতৃশব্দ সুতরাং খ্রীষ্টবিধানের ভাবোদ্দীপক বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতেছি। 'আমি এবং আমার পিতা এক' 'আমি পিতাতে

পিতা আমাতে' খ্রীষ্টের এই যে উচ্চতম যোগ তাহাতে হিন্দুবিধানের সহিত ভাবে খ্রীষ্টবিধানের মিলন ঘটিতেছে। আত্মা, পরমাত্মা বা অন্তর্য্যামীর সহিত একত্বে হিন্দুযোগ, খ্রীষ্টের যোগ পিতা পুত্র বিশ্বাসিবর্গে এই প্রভেদ মনে রাখিলে উভয় বিধানের পার্থক্য এবং ভাবতঃ ঐক্য উভয়ই আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়।

মুসলমান বিধানে 'পাষণ্ডদলন' এই নাম চিরসংযুক্ত আছে, চিরসংযুক্ত থাকিবে। যখন বিধানবাদিগণ চিৎকাররবে গান করেন 'কর কর হে পাষণ্ড দলন,' 'তোমার অপমান আর সয় না প্রাণে' তখন তাঁহারা হিন্দু নহেন মুসলমান। হিন্দুগণ যেমন অন্য সকলই সহেন, তেমনি অবিদ্যার খেলা বলিয়া অপরে ঈশ্বরাবমাননা করিলেও উপেক্ষা করিতে পারেন। মুসলমানধর্ম্মের সাধনমধ্যে 'উপেক্ষা' নাই, আগা গোড়া তেজ ও উদ্যমে উহা পূর্ণ। যিনি মুসলমান তিনি ঈশ্বরের অবমাননা, ঈশ্বরের বিধানের অবমাননা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। যে সহ্য করিতে পারে, সে কখন মুসলমান বিধানের ভাবাপন্ন নহে। শান্ত হিন্দুর মুখে যখন 'পাষণ্ডদলন' এই নাম উচ্চারিত হয়,তখন অনেকের কাণে বাধে; কিন্তু বিধানবাদী যখন কোন বিধানের ভাব অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, তখন 'পাষণ্ডদলন' নাম তিনি অগ্রাহ্য করিবেন কি প্রকারে? যদি অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সেই পরিমাণে তাঁহার বিধানবাদিত্ব অপূর্ণ থাকিয়া যায়,তাঁহার জীবনও সর্ব্বসামঞ্জস্যের জীবন হয় না; সত্য ও অসত্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, দুই এক ভূমিতে আসিয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মস্তোত্রসম্বন্ধে আজ আমরা যাহা বলিলাম, আশা করি তাহা উপাসকগণের দৈনিকসাধনবিষয়ে বিশেষ উপকারের জন্য হইবে।

জীবানুরাগ

জীবের প্রতি অনুরাগ, আমাদিগকে সংসারে বদ্ধ করিয়া ফেলে, ইহা আর কে না জানে? একমাত্র ঈশ্বরে অনুরাগস্থাপন বিধিসঙ্গত। যে ব্যক্তি তাহা না করিয়া কোন জীবের প্রতি আসক্তি পোষণ করে; তাহাকে সেই আসক্তির জন্য পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত ও ক্লেশদুঃখে অভিভূত হইতে হয়। "ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পারা যায় না," এ বাক্য কে অগ্রাহ্য করিবে? যদি ঈশ্বর হইতে আমাদিগকে অন্তরিত করিয়া রাখিবার কোন কারণ থাকে, তবে জীবের প্রতি অনুরাগ। অন্নপান ভোজনাদি কয় জন লোককে বদ্ধ রাখিয়াছে? নরনারীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বদ্ধ করিয়া রাখে নাই, এমন লোক অতি বিরল।

যখন জীবানুরাগের এতই দোষ, তখন কোন অবস্থায় জীবের প্রতি অনুরাগ আমাদের কল্যাণের জন্য হইতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরকে চান তাঁহাদিগকে সর্ব্বথা জীবের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই সর্ব্বপ্রথম উপদেশ। বিরাগ না হইলে অনুরাগত্যাগ কখন সম্ভবপর নহে। সংসারের প্রতি বিরাগের অর্থ জীবের প্রতি বিরাগ, কেন না জীবই সংসারের মূল। যদি জীবের প্রতি বিরাগই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের প্রারম্ভ হয়, তাহা হইলে যোহন কেন বলিলেন "যদি কেহ বলে আমি ঈশ্বরকে প্রীতি করি, অথচ ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী; কারণ যে দৃশ্যমান ভ্রাতাকে প্রীতি করে না, সে অদৃশ্য ঈশ্বরকে কিরূপে প্রীতি করিতে পারে?" তুমি বলিতে পার, জীবের প্রতি বিরাগের অর্থ ঘৃণা নহে, তৎপ্রতি মনের অনভিনিবেশ, তৎপ্রতি ঔদাসীন্য, তৎপ্রতি উপেক্ষা। তোমার এ কথা বলিয়াও যোহনের কথার সঙ্গে একতা হইল না, কেন না তিনি বলিয়াছেন 'যে দৃশ্যমান ভ্রাতাকে প্রীতি করে না, সে অদৃশ্য ঈশ্বরকে কিরূপে প্রীতি করিতে পারে?' তিনি ভ্রাতার প্রতি প্রীতি চান, তুমি উদাসীন হইয়া, উপেক্ষা করিয়া তাঁহার কথা রক্ষা করিবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

আজ পর্য্যন্ত যত সাধক হইয়াছেন, তাঁহারা

সংসারের প্রতি বিরাগ লইয়া ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছেন, কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি সাধকসম্প্রদায়ের আচরণের প্রতি উপেক্ষা সাধন করিতে যাই তাহা হইলে সাধনে কৃতকার্য্য হইবার কি কোন সম্ভাবনা আছে? মহর্ষি ঈশা বলিলেন, 'কে আমার মাতা, কে আমার ভ্রাতা' অথচ আমরা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতিকে সর্ব্বস্ব করিব? শিষ্য অপেক্ষা কি গুরু বড় নন? ঈশার নিকটে কি যোহনের কথা দাঁড়াইতে পারে? 'যাহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলে তাহারা আমার মাতা ও ভ্রাতা' একথার আমরা সম্মান করিতে পারি, কিন্তু ভাইমাত্রকে ভাল না বাসিলে ঈশ্বরকে ভাল বাসা যায় না এ কথায় তো কিছুতেই সায় দেওয়া যায় না। নববিধান বলেন, পাপী সাধু ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহাতো আরও ভয়ঙ্কর কথা। এ কথা আমাদিগকে সংসারে বদ্ধ করিয়া ফেলিবে, ভ্রষ্টাচারে নিক্ষেপ করিবে যখন এ ভয় আছে, তখন তৎপ্রতি সমাদর কি আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর? জীবকে ভালবাসিতে গিয়া বড় বড় সাধকের পতন হইয়াছে, আমরা সাধনভজনবিহীন হইয়া কি সাহসে জীবের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিতে সাহসী হইতে পারি?

সাধকসমাজে সংসারের প্রতি এত ভয় কেন? জীবের প্রতি এত অনাদর কেন? জীব সংসারে বান্ধিয়া রাখিতে চায়, ঈশ্বর হইতে মন ফিরাইয়া আনিয়া আপনাতে নিবিষ্ট রাখিতে প্রয়াস পায়, তাই কি তাহার প্রতি তোমার বিদ্বেষ? জীব যাহা তোমার নিকটে চায় তাহা তুমি দিতে বাধ্য কি না, দিতে সমর্থ কি না, দিলে তোমার মূলে ক্ষতি হয় কি না, একবার ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিয়া তাহার পর জীবের উপরে দোষারোপ করিও। সে তোমার প্রীতি চাহিবে, যত দিবে তত চাহিবে, ইহা তাহার প্রকৃতি—ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রকৃতি, সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাহাকে তুমি প্রবৃত্ত করিবে কি প্রকারে? তুমি অত্যাচারের হস্তে বারণ করিতে পার কিন্তু করিয়া কি করিবে? যদি সে সরল ভাবে তোমার প্রীতির আস্পদ না হয়, কৌশল অবলম্বন করিয়া তোমার প্রীতির আস্পদ হইবে; যদি তুমি স্বপথে আছ অভিমানে তাহাকে প্রীতি না দাও, তোমায় পথভ্রষ্ট করিয়া প্রীতি কাড়িয়া লইবে? সাধে কি সাধকগণ জীবের প্রতি প্রীতির এত বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা সংসার হইতে গৃহপরিবার হইতে কৌশলজালের ভয়ে পথভ্রষ্ট হইবার ভয়ে পলায়ন করিতেন। কিন্তু পলায়ন করিয়াও নিরাপদ থাকিতেন না, ইতিহাসে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রীতি যত দেও জীব তত আরও চায়, ইহা তাহার যদি প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে যে প্রীতি দেয়, তাহার ভিতরেও এত প্রীতি থাকা চাই যে দিয়াও আরও অফুরন্ত থাকে। যে চায় তাহার ভিতরেও এমন কাহারও থাকা চাই যিনি অল্পে তুষ্ট নন; যে দেয় তাহার ভিতরেও এমন কাহারও থাকা চাই যাঁহার দেওয়া কিছুতেই ফুরায় না। আজ পর্য্যন্ত মানুষের এ দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, তাই জীবানুরাগ সকলে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ একথা পৃথিবী অনেক দিন হইল শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রেমস্বরূপ বলিলে কি বুঝায় তাহা আজও উহা হৃদয়ঙ্গম করে নাই। প্রেম সমুদায় আত্মসাৎ করিতে চায়, যাহাকে প্রেম করে তাহার সহিত সর্ব্বথা অভিন্ন হইয়া যাইতে চায়, ইহা আমরা বহুবার শুনিয়াছি, কিন্তু প্রেমের এ স্বভাবের যথার্থ মর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই। যে প্রেম তোমাকে আত্মসাৎ করিতে চায়, সে প্রেম যদি দেখে তোমার অন্তরে এত প্রেম আছে যাহা লইয়া ফুরাইয়া ফেলিতে পারিবে না, তাহা হইলে কি আর উহা তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে, না সেই অবিতৃপ্ত প্রেম তোমাকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া পড়ে। যে দিক্ দিয়া প্রেমে গ্রস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এবং এইরূপে গ্রস্ত হওয়াই কৃতার্থতার মূল, সেই দিক্

বলাই প্রকৃত বিষয়। এখন সেই প্রকৃত বিষয় কি, তাহা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাউক।

জীবেতে যে অনুরাগ তাহার মূলে স্বয়ং প্রেমস্বরূপ। মূলে যখন প্রেমস্বরূপ আছেন, তখন অনুরাগ কোন কালে শুকাইবে না, কোথাও না কোথাও উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইবেই। তুমি যখন প্রেমে উদ্দীপ্তহৃদয় হও, তখন মনে কর আমি প্রেম অর্পণ করিতেছি, যিনি সে প্রেম গ্রহণ করেন তিনি মনে করেন, অমুক ব্যক্তি হইতে প্রেম নিজগুণে কাড়িয়া লইতেছি, এই যে উভয়ের ঈশ্বরবিরহিত প্রেমের আদান প্রদান, ইহাতেই সংসার ডুবিয়াছে, ইহাই জীবের প্রতি অনুরাগ ধর্ম্মজীবনের বিপৎপাতের কারণ হইয়া রহিয়াছে। প্রেম তোমারও নয় আমারও নয় ঈশ্বরের, ইহা মনে রাখিলে কি আর বিপদের সম্ভাবনা থাকে? আমি জানি, আমাতে প্রেমস্বরূপ বাস করিতেছেন, তাই আমার বিন্দুমাত্র প্রেম সিন্ধুপ্রায় হইতেছে, যত দিতেছি, কিছুতেই উহা আর ফুরাইতেছে না, এবং দিতে গিয়া বিপদে আবৃত হইয়া পড়িতেছি না। যাঁহাকে আমি প্রেম দিতেছি, তাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ তাহাতে যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, সে উচ্ছ্বাস তাঁহার যৎসামান্য বিন্দুপ্রায় প্রেমসমুৎপন্ন নহে, কিন্তু উহার নিম্নে অনন্ত প্রেম আছেন বলিয়া ক্রমান্বয়ে আমার ভিতরের প্রেম টানিয়া বাহির করিয়া তিনি লইতেছেন। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এ উভয়ের মধ্যে যদি সেই অনন্ত প্রেম দৃষ্ট হন, তাহা হইলে সকল বিপদ কাটিয়া যায়; আচরণে কোন প্রকার অনীতি ও অবিশুদ্ধতা আসিতে পারে না। প্রীতির মূলে নীতি আছে এ কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। আপনাতে ও অপরেতে অনন্ত প্রেমের বাস প্রত্যক্ষ কর, প্রীতিদানে আমি দিতেছি বলিয়া অভিমানী হইও না, প্রীতিগ্রহণে কদাপি পর্য্যাপ্ত গৃহীত হইল মনে করিও না, শুদ্ধতা আপনা হইতে তোমাদের অন্তরে বিরাজ করিবে। ফলতঃ উভয়ের প্রেমবিনিময়ে এক অনন্ত প্রেমেরই আত্মপ্রকাশ ঘটিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিলে পাপভয়ের তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ হয়। যদি নরনারীসম্বন্ধঘটিত পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। যে ব্যক্তি নিস্পৃহ, তাহার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই, অথচ ধর্ম্মের নামে নিস্পৃহত্বের এত আদর কেন? নিস্পৃহত্ব কি মানুষকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয় না?

বিবেক। নিস্পৃহত্ব ধর্ম্মে নিতান্ত প্রয়োজন; নিস্পৃহত্ব বিনা অনন্ত উন্নতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না, একথা বিবেকী ব্যক্তিমাত্রে স্বীকার করেন, তুমিও ইহা অস্বীকার করিতে পার না। বিষয়ের সহিত স্পৃহাসূত্রে মানুষ বদ্ধ থাকে, এবং সেই স্পৃহা তাহাকে অন্ধ করিয়া দেয়। স্পৃহার বিষয় যত কেন তুচ্ছ হউক না, উহা তাহার নিকট এতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় যে, তদপেক্ষা আর যে কিছু শ্রেষ্ঠ আছে, ইহা তাহার মনে স্থান পায় না। ইহাতে এই হয় যে, তাহার মন দিন দিন হীন নীচ সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, যত দিন সেই বিষয়ের প্রতি সে বীতরাগ হয় নাই, তত দিন তাহার উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ থাকে। তুমি যে বলিতেছ স্পৃহা বিনা উন্নতির সম্ভাবনা নাই, উহা ধনাদিবৃদ্ধির দিক্ দেখিয়া তুমি বলিতেছ। ধনাদিবৃদ্ধি কি আর উন্নতি? একবার নিস্পৃহ হও দেখিবে, সংসারের কিছুই তোমাকে বদ্ধ করিতে পারিতেছে না, তুমি ক্রমান্বয়ে জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদিতে দিন দিন উন্নত হইতেছ। যদি সেই সকলেতে উন্নত হও, তাহা হইলে বল তাহা ছাড়া আর তুমি কি চাও?

বুদ্ধি। তুমি নিস্পৃহত্বকে এত বাড়াইতেছ কেন? অনন্ত উন্নতির দ্বার নিত্য উদ্‌ঘাটিত রাখিবার জন্য অভিলাষ, ইহাতো এক প্রকারের স্পৃহা হইল।

বিবেক। নিস্পৃহ হইলে অনন্ত উন্নতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, একথা বলাতে অনন্ত উন্নতি স্পৃহার বিষয় বলা হইতেছে না। যে বস্তুর উপাদেয়ত্ব বুদ্ধিস্থ থাকে, তৎপ্রতি স্পৃহা জন্মিবার সম্ভাবনা। অনন্ত উন্নতি বুদ্ধিস্থ করা সম্ভব নহে, সুতরাং তৎপ্রতি স্পৃহা থাকিবে কি প্রকারে? লোকে অপরের মুখে শুনিয়া 'অনন্ত উন্নতি' 'অনন্ত উন্নতি' বলিতে পারে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চিত জ্ঞান নাই বলিয়া উহা জীবনের নিয়ামক হইতে পারে না। যাহারা মুখে অনন্ত উন্নতি বলে তাহারা যখন প্রবৃত্তির অধীন, তখন ও শব্দ যে শব্দমাত্র তাহাতে আর সংশয় কি? নিস্পৃহত্ব বিনা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুবর্ত্তন করিতে পারা যায় না, পদে পদে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাই নিস্পৃহত্বের মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষিগণের নিকট আদর। এখন বোধ হয়, আমি যাহা বলিয়াছি, তুমি তাহা বুঝিয়াছ!

বুদ্ধি। হাঁ কিছু কিছু বুঝিলাম। তবে আজ এই পর্য্যন্ত।

উপাসনাবাস।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

২০শে কার্ত্তিক, রবিবার, ১৮২১ শক।

হিন্দুসমাজমধ্যে এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথা কোথা হইতে প্রবর্ত্তিত হইল? হিন্দুসমাজে ধ্যান ধারণা যোগ সমাধি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই, কিন্তু ভ্রাতা ও ভগিনীর প্রতি বিশুদ্ধ প্রণয়প্রকাশ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিশুদ্ধ প্রণয়ের আরম্ভ কোথা হইতে? ইহা বিদেশ হইতে সমাগত, না ইহা এই দেশের সামগ্রী? মনে হয়, ঋগ্বেদে ইহার মূল বিন্যস্ত রহিয়াছে। সেখানে যে যম ও যমীর আখ্যায়িকা আছে, সেই আখ্যায়িকা ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার প্রণয়-প্রকাশের মূল। পৌরাণিকেরা ঋগ্বেদের অনেকগুলি আখ্যায়িকা গ্রহণ করিয়া তাহার রূপান্তর করিয়াছেন, এটীও সেইরূপ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের যম ও যমী, পৌরাণিকগণের যম ও যমুনা। যমী ও যমুনা অর্থে একই। ঋগ্বেদের যমী প্রণয়বশতঃ ভ্রাতার নিকটে অনুচিত প্রার্থনা করিয়াছেন, ভ্রাতা বিশুদ্ধ প্রণয়ে প্রণোদিত হইয়া তাঁহার অনুচিত প্রার্থনায় সায় দেন নাই, ধর্ম্মের নামে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের দেবতাগণ সৎকার্য্য করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া অমর হইয়াছেন, দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। যমও ভগিনীর অনুচিত প্রার্থনার প্রতিবাদ করিয়া, প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, তৎপ্রতি হৃদয়ের বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মরাজ হইয়াছেন, মানবগণের শাস্তা হইয়াছেন। যমুনা ভাইয়ের কপালে ফোটা দিলেন, সেই ফোটায় তিনি অমর হইলেন, ইহা পৌরাণিক আখ্যায়িকা *। এ আখ্যায়িকা বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে আপামর সাধারণ সকলেই জানে, এবং তাই বলে, "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোটা, যমের দুয়ারে পড়িল কাঁটা।" যম ও যমুনার প্রীতির জন্য ফোটা দেওয়া হয়, ফোটা দিলে যমভয় নিবারণ হয়, এই বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বিতীয়াপ্রবর্ত্তনের হেতু। ভাইয়ের কপালে ফোটা দিলে 'যমের দুয়ারে কাঁটা পড়ে', অমরত্ব লাভ হয়, এ কথার অর্থ কি? একথার অর্থ এই, আমরা তত দিন অমরত্ব বা দেবত্ব লাভ করিতে পারি না, যত দিন না আমরা পৃথিবীর নরনারীকে ভাই ও ভগিনীদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ প্রেমে দেখি। যাহারা তাঁহাদিগকে ভাই ও ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিল না, সকল প্রকারের নীচবাসনা অন্তর্হিত হইয়া যাহাদের অন্তরে বিশুদ্ধ প্রেম স্থান পাইল না, তাহাদের অমরত্ব লাভের কোন আশা নাই। যদি আমরা আমাদের মন হইতে সমস্ত অপবিত্র ভাব বিদায় করিয়া না দি, আমাদের আত্মা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবেই হইবে। যত দিন আমাদের মনে বিশুদ্ধ প্রণয় স্থান না পাইতেছে, তত দিন আমরা মৃত্যুমুখে বাস করিতেছি। যত দিন আমাদের হৃদয় নির্ম্মল না হইতেছে, তত দিন আমরা দুঃখের পর দুঃখ ক্লেশের পর ক্লেশ ভোগ করিব। যাহারা আজও পশুত্বের ভিতরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা অমর হইবে কি প্রকারে, দেবতা হইবে কি প্রকারে? তাহাদের ভিতরে দেবত্ব প্রস্ফুটিত হইবার এখনও সময় হয় নাই।

এ অতি আশ্চর্য্য যে, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মসমাধিপ্রধান এদেশে ভ্রাতৃপ্রেমস্থাপনের একটি অতি প্রকৃষ্ট উপায় স্থাপিত রহিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম ভ্রাতৃপ্রেমের ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম এদেশে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে পারে দেখিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সম্মান করিলেন। তিনি এই দিনে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিনিধিস্বরূপ একটি খ্রীষ্ট ভ্রাতার গৃহে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন। তাঁহার মতে ভগিনী কেবল ভাইকে ফোটা দিবেন তা নয়, ভাইও ভাইকে ফোটা দিবেন। ভগিনী যখন ভাইকে ফোটা দিতেছেন, তখন তাঁহার হাত সকল পৃথিবীর ভাইয়ের কপালে ঘুরিয়া আসিল, এ কথা বলিয়া তিনি এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকে সঙ্কুচিত ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া ইহার অধিকার সমুদায় পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত করিলেন। ভ্রাতৃভাব ভগিনীভাব গৃহে বদ্ধ থাকিবে না, ঈশ্বরের সমুদায় পুত্রকন্যার প্রতি বিস্তৃত হইবে, বিশুদ্ধ ভ্রাতৃপ্রণয় সকলের উপরে স্থাপিত হইবে, ইহা কিছু সামান্য কথা নয়। যদি এরূপ না হয়, তাহা হইলে 'যমের দুয়ারে কাঁটা পড়িবে' কি প্রকারে? ঈশ্বরের সম্বন্ধে যাহারা ভাই ও ভগিনী তাহাদের মধ্যে যদি কোন একটি সামান্য ভাই বা ভগিনীরও প্রতি আমাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রণয় না থাকে, তাহা হইলে নরক-ভয় নিবারণ হইল কৈ? যদি কোন একটি ভাই বা ভগিনীর প্রতি আমরা পাপচিন্তা পোষণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা যে যমের অধিকার ভুক্ত রহিলাম। যদি যমের অধিকার অতিক্রম করিবার জন্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হয়, তাহা হইলে উহা সিদ্ধ হইল কৈ?

এ অতি আহ্লাদের কথা যে, বঙ্গদেশ আজ ভাইদিগকে সম্মান করিতেছে। ভগিনী ভাইকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইতেছেন, নূতন বস্ত্র দিতেছেন। এ দিনে অতি নীচ হেয় বলিয়া যাহাদিগকে সকলে ঘৃণা করে, তাহারাও নিজ নিজ গৃহে ভাইয়ের প্রতি ভগিনী ভগিনীর প্রতি ভাই বিশুদ্ধ প্রণয় প্রকাশ করিতেছে। সকল গৃহস্থের বাড়ীতে আনন্দোৎসব আজ যেমন হয়, এমন অন্য কোন দিনেতো হয় না। বহুদিন পরে ভগিনী ভাইকে গৃহে পাইয়াছেন, আজ উভয়ের মনে আনন্দ উথলিত হইয়া উঠিয়াছে। বাল্যকালে এ দিনে যে আনন্দ ভোগ করিয়াছি, আজ বৃদ্ধ বয়সে তাহা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। এদিন আসিলে আজও সেই পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে। যে ভগিনীগণ ফোটা দিতেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে স্নেহ আজও হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশ আমোদে মাতিল বটে, কিন্তু আমোদের মর্ম্ম বুঝিল না। তাহাদের যমভয়নিবারণ হইবে কি প্রকারে, যদি যথার্থ ভাবে অদ্যকার উৎসব তাহারা ভোগ করিতে না পারে। তথনই যথার্থ

* স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তিথিতত্ত্বে এসম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণ ও মহাভারতের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ভাবে উৎসব সম্ভোগ হইল বলিব, যখন ভ্রাতৃপ্রণয় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। আমরা আশা করিতে পারি যে, নববিধানের আগমনে সকলে ইহার মর্ম্ম বুঝিয়া ইহার সাধন করিবেন। জগজ্জননীর বিশেষ কৃপা ভিন্ন এ সাধনে কেহ সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন না। তিনি সকলের জননী তাঁহার সম্বন্ধে আমরা সকলে সহোদর সহোদরা, এ জ্ঞান না জন্মিলে কি প্রকারে আমরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব করিতে সমর্থ হইব? জননী কেবল ইহলোকের নরনারীগণের জননী নহেন, তিনি ইহলোক পরলোক-বাসী সকলের জননী, সুতরাং আমাদের ভাই ভগিনী কেবল এখানে নয় পরলোকেও। যাঁহারা ভাই ভগিনী তাঁহারা চির-দিনের জন্য ভাই ভগিনী।

কোন কারণে কেহ আমাদের ভাই ভগিনী আর রহিলেন না, ইহা আমরা বলিতে পারি না। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেন তাঁহারাই ভাই ভগিনী। নববিধান বলিতেছেন, পাপী পুণ্যাত্মা সকলেই আমাদের ভাই ভগিনী। যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেন তাঁহারা আমাদের ভাই ভগিনী, ইহাতে তো আর কোন সংশয় নাই, কিন্তু যাঁহারা সংসারের প্রতি অনুরাগবশতঃ পদে পদে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকেও ভাই ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইতে পারি না। কেন না যদি সমুদায় নরনারীকে হৃদয়ের প্রেম দিতে না পারি, আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করিব কি প্রকারে? যদি ঈশ্বরপ্রেমে প্রেমিক হইতে চাই, তাহা হইলে ভ্রাতৃপ্রেমে প্রেমিক হওয়া সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। তিনি যাহাদিগকে আপনার পুত্র কন্যা বলিয়া ভাল বাসেন, কখন কাহাকেও কোন কারণে আপনার প্রেম হইতে বঞ্চিত করেন না, তাহাদিগকে আমাদের প্রেম হইতে বঞ্চিত করিয়া আমরা ঈশ্বরের হইব কি প্রকারে? আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এই ভ্রাতৃত্বসাধনের জন্য আমা-দিগকে উৎসাহিত করিতেছে। যদি সেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইল, তাহা হইলে উহার যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা আমরা কেন ভুলিয়া যাইব। যদি ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় ভায়ের কপালে ভগিনী ফোটা দিয়া তাহাকে অমর করিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে সঙ্কল্প যাহাতে সিদ্ধ হয়, সেই সাধন আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইতেছে। কোন ভাই বা ভগিনীর প্রতি কিছুমাত্র আমাদের অবিশুদ্ধ ভাব না থাকে, সকলকেই আমরা বিশুদ্ধ প্রেমনয়নে দেখিতে পারি, এরূপ সাধন আজ হইতে যেন আমরা গ্রহণ করি। প্রেমময় ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা এ সাধনে সিদ্ধমনোরথ হই।

হে করুণানিলয়, দেখ বঙ্গদেশে সকলে কেমন উৎসবে মাতিয়াছে। যাহাদের ধর্ম্মভাব নাই, তাহারাও ভ্রাতৃপ্রেমের অনুরোধে আজ তাহাদের মন্দ ভাব সকল ভুলিয়া গিয়াছে। দুরাচারী ব্যক্তি আজ নির্দ্দোষ শেশাবকের মত তাহার ভগিনীর হাতে ফোটা গ্রহণ করিতেছে। বঙ্গদেশ যদি এক দিন বিশুদ্ধ প্রেম দেখাইতে পারিল, তবে কেন না সমুদায় বৎসর এই বিশুদ্ধ প্রেম দেখাইতে পারিবে? কৃপাময়, কৃপা কর, আমাদের সকলের মনে আজকার বিশুদ্ধ প্রেমের ছবি ভাল করিয়া মুদ্রিত করিয়া দাও। যদি এ বিশুদ্ধ প্রেম আমাদের মনে স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে বল তোমার প্রতি প্রেম আমাদের কি প্রকারে স্থায়ী হইবে? ভাই ভগিনীর প্রতি যে ব্যক্তি অবিশুদ্ধ ভাব পোষণ করে, সে কি কখন তোমার মুখ দেখিতে অধিকারী হয়? ভ্রাতৃপ্রেমে সিদ্ধ না হইলে আমাদের জীবনে তোমার নববিধানের অভিপ্রায় কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। তাই তব পাদপদ্মে ভিক্ষা করিতেছি, আমরা যেন অদ্যকার সাধনের বিষয়ে কোন দিন উদাসীন না হই। আজ হইতে সংবৎসর কাল এই সাধনে যাপন করিয়া সাধনের ফল নিত্যকাল জীবনে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত হই, কৃপানিধান পরমেশ্বর কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ঈশ্বরে নিত্যবাসের উপায়।

৩রা কার্ত্তিক, রবিবার, ১৮১৮ শক।

যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু চান না, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে কি কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন? না আপনাকে তাঁহাদিগের নিকটে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন? যদি আমরা সংসারের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে তিনি কি আশ্রিতগণের সকল জ্বালা বিদূরিত করিয়া শান্তি দিতে পারেন না? আমরা সংসারের পথ ছাড়িয়া ধর্ম্মের আশ্রয় কেন গ্রহণ করিলাম? সংসারে থাকিলে দশ জন সংসারীর ন্যায় সুখে স্বচ্ছন্দে কি আমরা দিন কাটাইতে পারিতাম না? সংসারিগণ ধন অর্জ্জন করে, পরিবার প্রতিপালন করে, পারিবারিক সুখে আপনাদিগকে সুখী রাখে, আমরাও কি সে প্রকার করিতে পারিতাম না? যে ধন চায় সে ধন পায়, সংসারীরা ধন চায় ধন পায়, আমরা যদি ধন চাইতাম তাহা হইলে কি আর ধন পাইতাম না? পরিশ্রম করিলেই তাহার ফল আছে, আমরা ধনের জন্য পরিশ্রম করিলে অবশ্য তাহার ফল পাইতাম। এই নিয়মের প্রতি সংসারিগণের বিশ্বাস আছে বলিয়া কখন তাহারা পরিশ্রমে বিমুখ হয় না। আমরা ধর্ম্মকার্য্য করি সত্য, কিন্তু সংসারীরা ধর্ম্ম কর্ম্ম করে না তাহা নহে; দিনের মধ্যে একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করি, তাহার পর ভুলিয়া যাই, তাহারাও একবার স্মরণ করিয়া সমুদায় দিন তাঁহাকে আর স্মরণ করে না, বিষয়কার্য্যস্থলে তাঁহাকে আসিতে দেয় না, কেন না তাহারা জানে যে, বিষয়কার্য্যস্থলে তাঁহাকে আসিতে দিলে, তাহারা

ধনার্জ্জনে যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। ভজনালয়ে ঈশ্বরের ভজনা করিয়া সেখানেই আমরাও তাঁহাকে ছাড়িয়া আসি তাহারাও তাঁহাকে ছাড়িয়া আইসে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী একথা আমরা জানি, তাহারাও ইহা শুনিয়াছে বটে, কিন্তু ভজনালয় ছাড়া অন্যত্র আমরা তাঁহাকে দেখিতে যত্ন করি না, তাহারাও তাঁহাকে দেখে না, সুতরাং সর্ব্বব্যাপী এ জানা ও শুনা কথা দুইয়ের পক্ষেই সমান নিস্ফল। অবশ্য আমরা সুখ চাই তাহারাও সুখ চায়; পুত্র পরিবারে তাহারা যে সুখ পায় তাহাই তাহারা যথেষ্ট মনে করে, ঈশ্বরেতে সুখ বা আনন্দ এ সকল বড় কথায় তাহাদের হৃদয়ে কোন লালসাই উদ্দীপ্ত হয় না; আমরা সর্ব্বদা এই বড় কথায় প্রার্থনা করি, অথচ উপাসনার ঘরে আলো আন্ধারে একটু একটু তাঁহাকে দেখিলাম, তাঁহার কথা শুনিলাম, তাহার পর সমুদায় দিন আর দেখা শুনার কথা নাই। আমাদের মধ্যে কি এইরূপই চলিবে? ইহার কি কোন প্রতিবিধান নাই?

যে যাহা চায় সে তাহা পায়, ইহারই মধ্যে প্রতিবিধান আছে। যিনি ভক্ত তিনি কেবল ভক্তবৎসলকেই চান। তিনি বলেন, 'আমার ধন বল, বল বল, ঐশ্বর্য্য বল, যশ মান খ্যাতি প্রতিপত্তি বল সকলই আমার ঈশ্বর। ঈশ্বর আমার চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ, জীবনের জীবন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কি প্রকারে থাকিব? আমার আত্মার অন্নপান তিনি, তাঁহাকে না হইলে কি আমি বাঁচিতে পারি? জ্ঞানায় প্রেমায় পুণ্যায় সকলই আমার তিনি। তিনি নির্ব্বন্ধ সহকারে ঈশ্বরকে বলেন, 'যদি সংসার করিতে গিয়া আমি তোমাকে হারাই, আমি সে সংসার চাই না। যদি সংসারে থাকিতে তুমি আমায় বল, আমার সঙ্গে তোমায় সংসারে থাকিতে হইবে। আমি তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাই না। এ চক্ষু যদি তোমার অরূপরূপমাধুরী না দেখিল, এ কর্ণ যদি তোমার সুমধুর আশ্বাসবাণী শুনিতে না পাইল, তাহা হইলে আমার প্রাণ নির্জীব হইয়া পড়ে, আমার পক্ষে কোন কাজ আর সম্ভবপর থাকে না।' ভক্ত যখন এ প্রকার নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন, তখন ভক্তবৎসল আর থাকিতে পারেন না, তাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া তিনি তাঁহারই হইয়া যান। ভাগবত এই জন্যই ভগবানের সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।

"আমি ভক্তের অধীন, আমার যেন স্বাধীনতা নাই।" ভক্ত যখন অনন্যগতি অনন্যমনা হইলেন, ভক্তবৎসল ভিন্ন আর যখন তাঁহার কিছুই অভিলাষের বিষয় থাকিল না, তখন ভগবান্ তাঁহার বশীভূত হইবেন না কেন? এখানে ভক্তের বশীভূত হওয়াও যাহা আত্মাধীন হওয়াও তাহাই, সুতরাং এখানে তাঁহার স্বরূপবিচ্যুতি হইতেছে না।

সংসারী লোকেরা সংসারে আসক্ত হইয়া ভাবে, ভগবান্ কি আর সংসারে আসিবেন? তিনি অনির্ব্বচনীয়, মহতো মহীয়ান্, স্বর্গধাম বৈকুণ্ঠধাম তাঁহার বিহারভূমি, তিনি এই নীচ সংসারে পদার্পণ করিবেন কেন? পাপের কুমন্ত্রণায় তাঁহারা এইরূপ ভাবে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। ভগবান্ উদাসীন সর্ব্বত্যাগী শ্মশানবাসী, শ্মশানে পর্ব্বত গহ্বরে গভীর অরণ্যানীতে যাঁহারা বাস করেন, সময়ে সময়ে বৈকুণ্ঠধাম ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখা দিতে পারেন, কিন্তু সংসারে তিনি আসিবেন কেন? সংসারে আসিলে তাঁহার কি আর মহত্ত্ব থাকিবে? কি বলিলে, মহত্ত্ব থাকিবে না? তিনি অনন্ত মহান্ ঈশ্বর হইয়াও সংসারিদিগের সংসারে থাকিয়া সর্ব্বদা সংবাদ লন, ইহাই তো তাঁহার মহত্ত্ব। তিনি কি আর উদাসীন, ফকীর যে, সংসারে আসিতে ঘৃণা করিবেন? অথবা তিনি আমাদিগের পাপ অপবিত্রতা দেখিয়া কি জানি বা আমাদের পাপে কলঙ্কিত হন এই ভয়ে পলায়ন করিবেন? তুমি আমি দেখি আর না দেখি, তিনি সংসারের সকলই করিতেছেন। লোকে তাঁহাকে অবিশ্বাস করে অনাদর করে, তাই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি যদি সংসারে না আসিতেন, সংসারীদের কি গতি হইত? পাপীদের পাপ দেখিয়া তিনি যদি দূরে পলায়ন করিতেন, তাহা হইলে পাপীদের পাপ কে আর হরণ করিতে সমর্থ হইত? তিনি নিকটে থাকিতেও পাপারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না কেন? পাপে তাহাদের চিত্ত অসাড়, ঈশ্বরের জন্য তাহাদের প্রাণ ব্যাকুল নয়। চিত্ত ব্যাকুল না হইলে কে তাঁহাকে কবে লাভ করিয়াছে? অকিঞ্চন হইয়া দীন হইয়া ব্যাকুল ভাবে যে তাঁহাকে ডাকিয়াছে, সেই তাঁহাকে পাইয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত কিছু বিরল নহে। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু নারদ কেবল এই ব্যাকুলতাবলে তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল। তিনি এক বার দেখিয়া তাঁহাকে হারাইলেন, কেন না তখনও তাঁহার হৃদয় শুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু চিরজীবন আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিলেন না। পরিশেষে হরি তাঁহার নিকটে এমনি বান্ধা পড়িলেন যে, যখন তখন তিনি হৃদয়ে তাঁহার দেখা পাইতেন।

ঈশ্বরকামী ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে কি চান? যথার্থদৃষ্টি চান। যাহাতে সর্ব্বত্র তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান, ইহাই প্রবলতম অভিলাষ। যেখানে সেখানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না, কেন না তিনি জানেন, তাঁহার আত্মার কল্যাণ আত্মার পরিতুষ্টি তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারে না। সংসারের ধন সম্পদ ঐশ্বর্য্য মান সম্ভ্রমে তুষ্ট না হইয়া তিনি কেবল তাঁহাকেই চান। তিনি এমনই আব্দার করিয়া জোর করিয়া ঈশ্বরকে ধরেন যে তিনি আর চিরকালের জন্য তাঁহার না হইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার ভ্রম থাকিতে পারে, পাপ থাকিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরকে আব্দার করিয়া ধরাতে এ সকল বাধা দিতে পারে না, ইহারা ভয়ে আপনি সরিয়া পড়ে। প্রাণে যদি ব্যাকুলতা থাকে, তবে কি আর কোন কিছুতে বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে? বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে, "স্বর্গরাজ্য বলের দ্বারা অধিকৃত হয়।" এ স্বর্গরাজ্য কি তাহাও সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে। "পবিত্রাত্মাতে শান্তি ও আনন্দই"

স্বর্গরাজ্য। যে ব্যক্তি ঈশ্বরেতে আনন্দ লাভ করিল, তাহার হৃদয়ে স্বর্গের অবতরণ অবশ্যম্ভাবী। যখন স্বর্গ হৃদয়ে অবতরণ করিল, তখন বিরোধ বিসংবাদের মূল বিনষ্ট হইল। ঈশ্বরেতে গভীর আনন্দ যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে সমস্ত সংসার আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে; জীবগণের অশান্তি দুঃখ দর্শন করিয়া করুণরসে তাঁহার চিত্ত নিতান্ত আর্দ্র হয়, সুতরাং দুরাচারী অনিষ্টকারীর প্রতিও কখন তাঁহারশত্রুতার সম্ভাবনা থাকে না। ওদিকে হৃদয়ে আনন্দের সন্ততিগণের সঙ্গে সম্মিলিত থাকিয়া তিনি নিয়ত আনন্দরাজ্যে বিচরণ করেন।

ভক্তবৎসল ভক্তের নিকটে কি ভাবে নিয়ত বাস করেন, কি ভাবে প্রকাশ পান? নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপে। ভক্তের শরীর মন প্রাণ সমুদায় অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরকে জানে না, নিরন্তর বিষয়কোলাহলে জীবন কাটাইতেছে, তাহারাও আমোদ করিতেছে, আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। যাহারা যে পরিমানে উচ্চ বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না, তাহাদের ততই সংসারের বিষয়ে আমোদ সমধিক পরিমাণে দোখতে পাওয়া যায়, এত দূর আমোদপ্রিয় তাহাদের মন যে, শোক দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও আমোদের মাত্রা বাড়াইয়া শীঘ্র সে সকল ডুবাইয়া ফেলে। ভক্তবৎসলে ভক্তের আনন্দ, আর বিষয়িগণের আমোদ-কোলাহল, এ দুই কিছুতেই এক শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না। বিষয়ানন্দ শরীরঘটিত, শরীর যত দিন সুস্থ আছে, পার্থিব ভোগে সামর্থ্য আছে, তত দিন বিষয়প্রমত্ত ব্যক্তিগণ উৎকট আমোদ আহ্লাদ প্রকাশ করে। এক বার রোগ আসিয়া তাহাদিগের শরীরকে আক্রমণ করুক, বিষয়ভোগের সামর্থ্য হরণ করুক, দেহ বিবিধ যন্ত্রণার নিলয় হউক, দেখিবে, তাহাদের আমোদ আহ্লাদের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। নয়নের তৃপ্তিকর, শ্রবণের পক্ষে মনোহর, রসনার সুখস্বাদ্য সকলই আছে, তাহাদের সেই আমোদের সহায় ভোগাসক্ত বন্ধুগণ চারিদিকে কোলাহল করিতেছে, গৃহে ধন ঐশ্বর্য্যেরও অভাব নাই, যে দেহ ভোগের নিলয় ছিল, এখন সে দেহ অবসন্ন, জীর্ণ শীর্ণ, ঘোর যন্ত্রণায় আক্রান্ত, ভোগ্য বস্তুর প্রতি একান্ত অরুচিনিপীড়িত; আর সে আমোদ নাই, আর সে আহ্লাদ নাই. চারি দিক্ ঘন বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। এখন জীবন ভারবহ, অথচ জীবনের মায়ায় বদ্ধ। এক রোগেই এইরূপ হইল; বিপৎ দুঃখ দারিদ্র্যাদি আরও বিবিধ ক্লেশকর বিষয় আছে, যাহাতে বিষয়ীর সকল প্রকারের আমোদ শুকাইয়া যায়।

ভক্তবৎসলে ভক্তের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ স্নায়ুবিকার নহে। সুখ সম্পদের সময়ে সে আনন্দ যেমন ঘনীভূত, দুঃখবিপদের সময়ে তেমনই। ভক্ত বুঝিতে পারেন, এ আনন্দ তাঁহার শরীর মনের অবস্থাবিশেষ নহে, ইহা সমুদায় অবস্থার অতীত। তিনি যখন যে অবস্থায় থাকুন না কেন, এ আনন্দরসের কখন হ্রাস নাই। শরীর মন বিবিধ প্রকারের পরীক্ষা, বিপৎ, রোগ, শোক, ক্লেশ ও যাতনার ভিতর দিয়া যাইতেছে, প্রাকৃতিক নিয়মে তাঁহার দেহাদিসম্বন্ধে বিবিধ প্রকারের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু অন্তরে ভক্তবৎসলে আনন্দ ঠিক তেমনই আছে। ভক্ত ভক্তপ্রাণ ঈশ্বরে আনন্দিত হইতেছেন, তাঁহার আনন্দ তাঁহাতে নিত্য অবতরণ করিয়া রহিয়াছে, রোগ শোক বিপৎ দুঃখ যাতনার সময়ে ইহা তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন। বিপৎ পরীক্ষা প্রভৃতি যতই তাঁহাকে অভিভূত করিবার জন্য বলপ্রকাশ করে, ততই সেই আনন্দ ঘন হইতে ঘনতর হইয়া উঠে। তীব্র যাতনায় মূর্চ্ছা বা নেশার ঘোর আসিয়া লোককে যাতনাবিরহিত করিয়া থাকে, কিন্তু যাতনাবোধের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দানুভব ইহা যুগপৎ সম্ভবপর নহে। সমুদায় বাহ্য বিষয় অতিক্রম করিয়া আনন্দসম্ভোগ ইহা যোগযুক্ত ভক্ত ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তপ্রিয় ভগবান্ ভক্তকে নিয়ত আপনার আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, পৃথিবীর কোন অবস্থা তাঁহাকে অবসন্ন করিবে, বিপদে নিমগ্ন করিবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? কি জানি বা, এই আনন্দ হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হন, এই ভয়ে ইষ্টদেবতার প্রতি কখন তাঁহার যত্নশৈথিল্য বা অনাদর ঘটে না। তিনি আনন্দের জন্য ইষ্টদেবতাকে ভালবাসেন তাহা নহে, সুখের ক্ষতি হইবে এজন্য আনন্দের বিচ্ছেদে ভীত নহেন, তাঁহার নিকটে আনন্দ ও ঈশ্বর উভয় একই।

একান্ত ব্যাকুল হইয়া যে ব্যক্তি ভক্ত প্রাণ শ্রীহরিকে ডাকে, তাহার নিকট হরি আপনার আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহাকে চিরজীবনের জন্য শুদ্ধ করেন। এ আনন্দের এমনই মোহিনী শক্তি যে, ভক্তের হৃদয়কে চিরকাল উহার জন্য লালায়িত করিয়া রাখে। ভক্তের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীহরি কখন ভক্তকে শুদ্ধ করিয়া না লইয়া ছাড়েন না; ভক্তকে শুদ্ধ করিয়া লইবার তাঁহার বিচিত্র প্রণালী। তিনি তাহাকে আনন্দের আস্বাদ দিয়া তাহাকে চিরজীবন প্রমত্ত করিয়া রাখেন। জীবনে কত প্রকার বিপৎ পরীক্ষা রোগ শোক আসিতেছে, ভক্ত সে সকলকে তুচ্ছ করিয়া সেই আনন্দের আস্বাদ পুনরায় পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন, এ সকলের সংবাদ লইবার তাঁহার অবসর নাই। গুরুতর দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও ভক্তগণ যে বিচলিত হন না তাহার কারণ কি? কারণ আনন্দে মুগ্ধ চিত্ততা। ভগবানে একবার আনন্দ যে ব্যক্তি পাইয়াছে সমুদায় জীবনে তাহার একটা ঘোর থাকিয়া যায়, যে ঘোর তাহাকে পাপ অপরাধ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করে। নারদাদি সকল প্রাচীন সাধকের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়েও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভগবানের আনন্দের আস্বাদে সমুদায় পাপের নিবৃত্ত হয়, একথা নিতান্ত সত্য। সে আনন্দসুধা পান করিয়া আর কখন নীচ বিষয়ের আস্বাদ গ্রহণে কাহার প্রবৃত্তি থাকে না। যেথানে বিষয়ের জন্য লালসা তিরোহিত হয় নাই, সেখানে ব্রহ্মসংস্পর্শ জন্য আনন্দলাভ হইয়াছে ইহা এই জন্যই স্বীকার করিতে পারা যায় না।

ভক্তগণের এই চরিত্রের সঙ্গে আমাদিগের জীবন মিলাইয়া আমরা দেখিতে পাই, আমরা এত দিন ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও, তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিয়াও আমাদের বিষাদ ঘুচিল না। আমরা কেবল সর্ব্বদা আক্ষেপ করিয়া পূজার সময়ে ঈশ্বরকে একটু একটু দেখি, অন্য সময়ে তিনি আর আমাদের নিকট থাকেন না। একি শ্রীহরির দোষ, না আমাদের নিজের দোষ? আমরা যদি শিথিল ভাবে তাঁহার পূজা করি, তাঁহার সঙ্গে সমুদায় দিন থাকিতে না পাইয়াও যদি আমাদের হাসিয়া খেলিয়া দিন যায়, তবে তিনি তাঁহার নিত্য সহবাসে আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন কেন? তিনি কোন কালে অনাদরের পাত্র নহেন। আমরা তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া নির্ব্বন্ধ সহকারে ডাকিলাম না,অথচ লোকের নিকটে এত বৎসরের পর এমনি আক্ষেপ প্রকাশ করি যেন আমাদের কোন ক্রটি নাই, যত ক্রটি শ্রীহরির কৃপার। আমাদের ব্যাকুলতা নাই, নির্বন্ধ নাই, ইহাতে আমাদের লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া থাকা উচিত। যখন জোর করিয়া শ্রীহরিকে চিরদিনের জন্য আপনার করিয়া লইতে পারি, তখন যদি বিষয়লালসায় লুব্ধ হইয়া তাহা না করি, তাহা হইলে আপনাদিগকে শত ধিক্কার দেওয়া কি আমাদের উচিত নয়? আমরা যেন এত দিনে কিছু হইল না, কিছু হইল না বলিয়া মিথ্যা ওজরের কথা মুখে না তুলি, ইহাতে সত্যই আমাদের প্রাণের ইষ্টদেবতার নিন্দা হয়। তিনি ডাকিলেই দেখা দিতে প্রস্তুত আছেন, চাহিলেই সর্ব্বদা প্রাণের সঙ্গে নিত্য বিদ্যমান থাকেন। তাঁহার প্রতি অযথা দোষারোপ আমাদের মধ্য হইতে তিরোহিত হউক। আজ হইতে আমরা প্রতিজ্ঞা করি,হরিকে না দেখিলে সকল সময়ের জন্য না পাইলে আর দিন চলে না। যদি এইরূপ সত্যই আমাদের মনের ভাব হয়, শ্রীহরি নিয়ত দর্শনদানে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আমাদিগকে ডুবাইয়া রাখিতে কখন উদাসীন হইবেন না।

অন্নদামণি দেবী *।

দেবী অন্নদামণি মহানগরী কলিকাতায় ১৭৮৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে গত ৩০শে আশ্বিন সন্ধ্যা ৫৷৷০ ঘটিকার সময় আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নিজধামে চলিয়া যান। এত অল্পদিনে জননী যে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন এক দিনের জন্য কল্পনাতেও ভাবি নাই, আজ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার সদ্গুণ সমুদায় যে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠ করিব স্বপ্নেও তাহা কখনও মনে করি নাই; কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডন করিতে পারে? বিধাতা যাঁহাকে ডাকিয়া লন কে তাঁহাকে এখানে রাখিতে পারে? খ্যাতনামা সুদক্ষ চিকিৎসকগণ কত যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলেন, রাত্রি জাগিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, আত্মীয়গণ প্রাণপণ করিয়া কত সেবা শুশ্রূষা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল, সুস্থ সবল দেহ অতি অল্পদিনের মধ্যে পঞ্চভূতে মিশিল, পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া সোণার পাখী স্বর্গপুরে উড়িয়া গেল। জননী পরম জননীর শান্তিক্রোড়ে অনন্ত কালের জন্য স্থান পাইলেন, কত সুখে আনন্দময়ী মা তাঁহাকে নিজ সহবাসে রক্ষা করিতেছেন জানি না, কিন্তু আমরা এখানে তাঁহার জন্য শোক ও ক্রন্দন করিবার জন্য পড়িয়া থাকিলাম। ৩৫ বৎসর বয়সে অবিরামজ্বররোগে নশ্বর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সদ্গুণ অনেক ছিল, সে সমুদায় কেবল মাত্র উল্লেখ করিতে হইলে অনেক সময় লাগে এবং বাহুল্য হইয়া পড়ে সেই জন্য তাঁহার চরিত্রের বিশেষ বিশেষ যে সমুদায় ভাব ছিল তাহাই কেবল সঙ্ক্ষেপে এখানে বর্ণিত হইল :—

(১) তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার কার্য্যপটুতা অতি অদ্ভুত রকমের ছিল। আমার পিতা সর্ব্বদাই যথেষ্ট লোকজন রাখিয়া দিতেন, কিন্তু এত দাস দাসী থাকিতেও তিনি সংসারকার্য্যে এত অধিক পরিশ্রম করিতেন যে, আমাদের সময় সময় ভয় ও চিন্তা হইত যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে মার দেহ ভাঙ্গিয়া যাইবে, শেষে তাহাই ঘটিল।

(২) নিজের কায়িক সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না; আহার নিদ্রার সম্বন্ধে ব্যবস্থা অতি সামান্য অবস্থার স্ত্রীলোকের মত ছিল। বাবা অনেক চেষ্টা করিয়াও সে সম্বন্ধে কিছু করিতে পারিতেন না। ভোগবিলাসের প্রতি তাঁহার বিরাগ ছিল।

(৩) বুদ্ধিমত্তার ও দূরদর্শিতার ভূরি ভূরি পরিচয় আমরা অনেক সময় পাইয়াছি, পিতাকে অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ লইয়া চলিতে হইত এবং তাহাতে বারংবার সুফলই ফলিয়াছে।

(৪) অতিথির সেবায় ও যত্নে তিনি সাধ্যমতে ক্রটি কখনও করিতেন না অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। কিসে তাঁহারা সুখী হইবেন, কিরূপ বন্দোবস্ত করিলে তাঁহাদের সুবিধা হইবে ইহার জন্য তিনি সদাই ব্যস্ত থাকিতেন।

(৫) তিনি অতি সু-রুচিসম্পন্না ছিলেন, রুচিবিরুদ্ধ কাগজ বা পুস্তক তিনি নিজেতো পড়িতেনই না, অন্য লোকে ঐ সকল পড়িতেছে বা বৃথা গল্প করিতেছে, কিংবা অনর্থক হাস্য পরিহাসে সময় অতিবাহিত করিতেছে, দেখিলে তিনি অত্যন্ত কষ্টবোধ করিতেন। সন্তানগণের চরিত্রে যাহাতে এ দোষ কখনও না ঘটে তাহার জন্য বিশেষভাবে যত্ন করিতেন।

(৬) গৃহকার্য্যে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার তিনি বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার বাড়ী ও ঘর দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার ব্যবস্থা, সুবন্দোবস্ত, পরিচ্ছন্নতা ও সমুদায় পরিপাটী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। সন্তানগণের স্বভাব চরিত্র কিরূপে ভাল হইবে, লেখাপড়া শিখিবে, সদা সত্য পথে ও ধর্ম্মপথে চলিবে ইহাই তাঁহার বিষম ভাবনা ছিল, এবং এই জন্য তিনি আমাদিগকে অতি অল্প বয়স

* শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক পঠিত।

হইতেই কলিকাতায় আমাদিগের পিসিমার হস্তে সম্পূর্ণ ভার দিয়া তাঁহার উপর নির্ভর করিলেন।

(৭) তাঁহার প্রকৃতি বড়ই উদার ও হৃদয় বড় প্রশস্ত ছিল, কোন প্রকারের সঙ্কীর্ণ ভাবকে তিনি ভাল বাসিতেন না।

(৮) লেখা পড়া বেশী জানিতেন না, কিন্তু জ্ঞানোপার্জ্জনের বাসনা তাঁহার বড়ই বলবতী ছিল। বাবার কাছে সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন যে তাদৃশ লেখা পড়া তিনি শিখিতে পারেন নাই। Baptist Zenana মিসনের দুই জন মেমকে, বাবা ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট অধ্যয়নের সুবিধা হইত না বলিয়া অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

(৯) কি প্রকার যত্ন, স্নেহ, ভক্তি ও অনুরাগ সহকারে তিনি বাবার সেবা করিতেন তাহা বোধ করি আমি লিখিয়া তত পরিষ্কাররূপে কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহারাই কিছু কিছু বুঝিয়াছেন। পতিব্রতা সাধ্বী সতী নারী কিরূপে পতিসেবা করেন তাহার আদর্শ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

(১০) বাগানের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। আরার বাড়ীতে এক খণ্ড ক্ষুদ্র বাগিচা আছে, তাহাতে কত ব্যয় এবং যত্নের সহিত নানাবিধ ফল ফুলের গাছ শাক সব্জি তরকারি ইত্যাদি নিজের যত্নে মালির দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া সকলকে উপহার দিতেন, উপাসনামণ্ডপের বেদী মনের সাধে নানাজাতীয় ফুল ও পাতায় সুন্দর করিয়া লিখিতেন ও সাজাইতেন। ফুটন্ত ফুল তাঁহার বড়ই আদরের সামগ্রী ছিল।

(১১) আবশ্যক অনুসারে যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না, কিন্তু তাঁহার সকল কার্য্যে মিতব্যয়িতা পরিলক্ষিত হইত, অন্যায় এবং অনাবশ্যক মতে অর্থ ক্ষয় করা তিনি পছন্দ করিতেন না।

(১২) দুঃখীদিগকে সদা দয়ার্দ্রচিত্তে সাহায্য করিতেন এবং সামান্য উপকার পাইলে, উপকারীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিতেন।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

বিগত ৯ই নবেম্বর হইতে ১৪ই নবেম্বর পর্য্যন্ত লাহোরস্থ পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সপ্তত্রিংশ ব্রহ্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। সীমলাশৈল হইতে এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া লাহোরে গিয়াছেন। ৯ই নবেম্বর ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রারম্ভিক বক্তৃতা। ১০ই নবেম্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতা ও বার্ষিক বিবরণ পাঠ। ১১ই নবেম্বর উপাসনা। ১২ই নবেম্বর সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। ১৩ই নারীসমাজ ও বালক বালিকাদের উৎসব। ১৪ই ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতা। তদ্ব্যতীত প্রতিদিন প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন বাঁকিপুর, আরা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইয়া নাইনীতল পাহাড়ে গিয়াছেন।

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক গৃহস্থ প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র "ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসমন্বয়" নামক একখান পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের গ্রাহকদিগকে উহা বিনামূল্যে বিতরণ করিতে ইচ্ছুক। ডাকমাসুল জন্য দুই পয়সার একখান টিকিট ঢাকা বঙ্গবন্ধু কার্য্যালয়ে পাঠাইলে সকলেই বিনামূল্যে উহা পাইবেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বক্তৃতা সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ।

বিগত ৩০শে কার্ত্তিক বুধবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট প্রচারকার্য্যালয়ে আরাস্থ বিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত নৃত্য গোপাল মিত্রের সহধর্ম্মিণীর আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে অতি গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অমৃতলাল বসু উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন এবং ভাই উমানাথ গুপ্ত ও উপাধ্যায় অধ্যেতার কার্য্য করিয়াছেন। পরলোকগতার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান অনুকূলচন্দ্র জননীর জন্য সকাতরে হাটু পাতিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং মাতৃচরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন। বিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হইল। ভগবান্ স্বর্গগতা সাধ্বী সতীর আত্মার সদগতি বিধান করুন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিবিধ প্রকার সৎকার্য্যে নিম্নলিখিতরূপ দান করা হইয়াছে।

কলিকাতা প্রচারকার্য্যালয় ১০৲, ঢাকা ঐ ২৲, বাঁকিপুর ঐ ৪৲, অমরাগড়ি ঐ ২৲, ময়মনসিং ব্রাহ্মসমাজ ২৲, কুষ্ঠাশ্রম ৪৲ অনাথাশ্রম ২৲, ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবেল সোসাইটী ৪৲, লিটল সিষ্টার অব দি পুওর ৪৲, মূক ও বধির বিদ্যালয় ২৲, চতুষ্পাঠী ৪৲, দরিদ্রদিগের জন্য ৫৲, ভোজ্য ৮টী, বস্ত্রাদি ১ প্রস্ত, শয্যা ১ প্রস্ত, পিতল কাঁসার বাসন ১ প্রস্ত, ছাতা, আসন, বিনামা ইত্যাদি।

আগামী ১৯শে নবেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯॥০ ঘটিকার সময় ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট ভবনে এবং সায়ংকালে বেনেটোলায় সামাজিক উপাসনার গৃহে শ্রীমদাচার্য্যদেবের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইবে।

গতবারের ধর্ম্মতত্ত্বে 'কটকে ব্রাহ্মবিবাহ' বলিয়া যে প্রাপ্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে যে স্থলে লেখা আছে 'তিনি তাহাতে উপেক্ষা করিয়াছিলেন' সেস্থলে 'অপেক্ষা' করিয়াছিলেন এইরূপ লেখা উচিত ছিল। কেন না তিনি কোন প্রস্তাবে উপেক্ষা করেন নাই, তিনি যে ব্রতে কৃতসঙ্কল্প সে ব্রতে যিনি প্রস্তুত তাঁহার জন্য কেবল অপেক্ষা করিয়াছিলেন।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্তৃক ২রা অগ্রহায়ণ মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ। ২৩ সংখ্যা।

১লা পৌষ, শুক্রবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান পরমেশ্বর, এ দেহ প্রাণ মন তোমারই রক্ষণাধীনে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাদিগকে যদি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতাম, আর বিচ্ছিন্ন হইলেও যদি ইহাদের মৃত্যু উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম যে, আমরাই আমাদিগের বৃদ্ধি ও উন্নতির হেতু। হে নাথ, আমাদিগের জীবন কোন কালে তোমানিরপেক্ষ নয়, কোন কালে তোমানিরপেক্ষ হইবে না। আমরা তোমানিরপেক্ষ নই, এজন্য আমাদের মহত্ত্ব ও স্থায়িত্বের কোন ক্ষতি হইতেছে না, এবং আমাদের মহত্ত্ব ও গৌরব ইহারই জন্য। তুমি যখন আমাদের ভিতরে আপনাকে প্রকাশ কর, তোমার জ্ঞান-প্রেম-পুণ্যৈশ্বর্য্যে আমাদিগকে ঐশ্বর্য্যবান্ কর, তখন তাহাতে আমাদের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, এবং তোমার স্বরূপপ্রবেশে আমাদের স্থায়িত্ব উপস্থিত হয়। তোমাকে ছাড়িলে আমাদের মৃত্যু, তোমাকে অন্তরস্থ করিলে আমাদের অমৃতত্ব, ইহাতে তো আর কোন সংশয় নাই। তোমা ছাড়া আমরা কখন নই, সুতরাং আমাদের মৃত্যু নাই, আমরা চির অমর এ কথা সত্য, কিন্তু তোমা ছাড়া আমরা নই, এ জ্ঞান কি আমাদিগেতে সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকে? আমরা তোমাতেই আছি, তুমিই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমাদের দেহ প্রাণমনের রক্ষণ ও বর্দ্ধন করিতেছ, ইহা যদি আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতাম, তাহা হইলে আমরা কখন মৃত্যুভয়ে ভীত হইতাম না। মৃত্যু নাই, অথচ মৃত্যুভয় আছে, এরূপ অবস্থায় মৃত্যু না থাকিলেও আমরা মৃত্যুর অধীন হইয়া আছি। এই অধীনতায় দেখ আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে, আমরা সংসারসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি। এ সংসার দুদিনের জন্য, অথচ এই সংসারের ক্ষতিতে যেন আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলাম এইরূপ মনে করিয়া শোকগ্রস্ত হই। এরূপ অবস্থায় আমাদের জীবন যে অনন্ত জীবন, এখানকার ক্ষতিবৃদ্ধি যে কিছুই নয়, ইহা আর কৈ আমাদের জীবনে স্ফূর্ত্তিলাভ করিল। মৃত্যুই যদি নিয়ত ভয় দেখাইতে লাগিল, অমৃতত্বজনিত অভয়-ভাব যদি আমাদিগকে নিঃশঙ্কচিত্ত, সুপ্রসন্নমনা না করিল, তাহা হইলে তোমার সহবাসজনিত আনন্দ-সম্ভোগ কৈ হইল। হে দেবাদিদেব, আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও যে আমরা যত দিন তোমাতে জ্ঞান-পূর্ব্বক বাস না করিব, তত দিন আমাদের অমরত্বের

ভাগ মিথ্যা, আমরা নিয়ত মৃত্যুমুখে স্থিতি করিতেছি। আমরা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হইব, তোমার নিত্য সন্নিধান অনুভব করিয়া নির্ভয় হইব। তুমি আমাদের প্রাণমন দেহে প্রবিষ্ট থাকিয়া আমাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছ; হে করুণানিধান, ইহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিব, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর, তব পাদপদ্মে আমরা বিনীত ভাবে প্রণাম করি।

সাধনের উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরের কৃপাতে সকল সাধিত হয়, ইহা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সাধনের প্রতি কেবল বীতরাগ নহেন, সাধনকে তাঁহারা অভিমানমূলক জানিয়া সাধকমাত্রকে তাঁহারা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। সাধন দ্বারা আমরা যথেচ্ছ ফললাভ করিব, এরূপ বিশ্বাস অসঙ্গত ইহা আমরা মনে করি, কেন না আমাদের ইচ্ছা সাধনফলের নিয়ামক নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছা উহার নিয়ামক, কিন্তু ইহা বলিয়া সাধন কিছুই নহে, ইহা বলাও নিতান্ত অসঙ্গত। সাধন কিসের জন্য করা হইতেছে, তাহারই উপরে উহার সঙ্গতত্ব অসঙ্গতত্ব নির্ভর করে। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই সাধন আছে। শরীর, মন, আত্মার ক্রিয়া ভিন্ন সাধন আর কিছুই নহে। ক্রিয়া যখন অপরিহার্য্য, তখন সাধনও অপরিহার্য্য। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ফল বহন করিবে, ইহা সকলকেই জানিতে হইবে। যাঁহারা সাধনকে তুচ্ছ মনে করেন, শরীর, মন, আত্মার ক্রিয়ারূপ সাধন তাঁহারা অতিক্রম করিবেন কি প্রকারে? এসকলের ক্রিয়ার মূলে যখন স্বয়ং ভগবানের অনুগ্রহ বিদ্যমান, তখন ক্রিয়া ও অনুগ্রহ পরস্পর বিরোধী ইহাই বা বলা যাইবে কি প্রকারে? কি উদ্দেশ্যে এই সকল ক্রিয়া হইতেছে সাধকের কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা সমুচিত।

দৈহিক ক্রিয়াকে আমরা দৈহিক সাধন মধ্যে গণ্য করিতেছি। শরীরের বাহিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালন নিতান্ত স্বাভাবিক, ইহা আবার সাধনমধ্যে গণ্য হইবে কি প্রকারে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমরা দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুযায়িরূপে পরিচালন করিতে পারি, তাঁহার ইচ্ছার বিরোধিভাবেও পরিচালন করিতে পারি। বিরোধিভাব পরিহার করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের পরিচালন করিতে প্রয়াসের প্রয়োজন। প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অনেক সময়ে ঈশ্বরেচ্ছার বিরোধে পরিচালনা করে, ইহাতে কেবল রোগোৎপন্ন হয় তাহা নহে, মনেরও ঈশ্বরেচ্ছাপ্রতিপালনে অনবধানতা উপস্থিত হয়। এই অনবধানতা হইতে পাপে প্রবৃত্তি জন্মে। পাপে প্রবৃত্তি প্রবল হইলে জীবনে সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। বাহিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়া দেহের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া আছে। এই আভ্যন্তরিক ক্রিয়া যখন আমাদের চক্ষুর অগোচর, তখন তাহা লইয়া সাধন হইবে কি প্রকারে, এ প্রশ্ন সহজে মনে উদিত হয়। দেহের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া যখন আমাদের অনুভবগোচর হয় তখন সেই অনুভূতি অনুসারে কার্য্য করিতে গিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী ও অবিরোধী ভাবে কার্য্য হইতে পারে। বিরোধী ভাব পরিহার করিয়া অবিরোধী ভাবে কার্য্য করা সাধনসাপেক্ষ, সুতরাং এখানেও সাধন অপরিহার্য্য। ক্ষুধা প্রভৃতি দেহের আভ্যন্তরিক বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া প্রদর্শন করে। সে সকল স্থলে লোভাদি প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছানুসরণ প্রবল প্রযত্নসাপেক্ষ। এই প্রযত্নই এখানে বিশেষ সাধন।

দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে যদি সাধন সন্নিবিষ্ট আছে, ইহা প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে মানসিক ক্রিয়ার ভিতর সাধন যে আরও প্রবলতর ইহা আর আমরা অস্বীকার করিব কি প্রকারে? মন সৎ ও

অসৎ উভয় বিষয় লইয়াই ব্যস্ত। অসদ্বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া সদ্বিষয়ে মনকে নিরন্তর নিবিষ্ট রাখা কত কঠিন, ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা মানসিক সাধন যে কত কঠিন, বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। ইহা অতীব কঠিন দেখিয়াই তাঁহারা সাধনের প্রতি হতাশ হইয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরে সমুদায় ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান। তাঁহারা জানেন না যে মনোনিগ্রহে প্রবৃত্তিজন্মার মধ্যেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিদ্যমান। সংসারে কয়জন লোক আছে যাহারা মনের যথেচ্ছ দাসত্ব না করিয়া তাহার নিগ্রহের জন্য যত্নশীল হয়? যখন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয়, তখন আমরা সাধন ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হই তাহা নহে, সাধন ব্যাপার আমাদের কষ্টসাধ্য ব্যাপার থাকে না, উহা অতি সহজ হয়। তখনও যে সাধন কঠিন নহে তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহ জনিত মনের আবেগবশতঃ কাঠিন্য কাঠিন্য বলিয়াই গ্রাহ্য হয় না। যদি তুমি মনে কর যে কাঠিন্য অনুভব না হইলে তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হইয়াছে, ইহা তোমার ভ্রম। ঈশ্বরানুগ্রহ সাধনের কাঠিন্য অনুভব করাইয়া তোমার প্রযত্ন উদ্দীপন করাইয়া দেয়, পরিশেষে সেই প্রযত্নের প্রযত্ন জন্য আয়াস ঘুচাইয়া দিয়া উহাকে সহজসাধ্য করিয়া তুলে। যদি মানসিক সাধনে উপেক্ষা কর, তোমার প্রবৃত্তি বাসনা সকল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া আধ্যাত্মিক সাধনে তোমায় অক্ষম করিবে, শারীরিক সাধনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

আত্মার পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধানুভব হইতে আধ্যাত্মিক সাধনের আরম্ভ। যখন সম্বন্ধানুভব হইল তখন তাঁহার সঙ্গে অবিরোধী ভাব রক্ষার জন্য যত্ন স্বতঃ উপস্থিত হয়। এ অবিরোধী ভাব সম্যক্ পরমাত্মার অধীনতা ভিন্ন কখন সম্পন্ন হয় না। নিজের কোন একটি অভিলাষ রাখিয়া তাঁহার সহিত কেহ এক হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। দেহ ও মন ইহাদিগের ঈশ্বরেচ্ছার বিরোধী ভাব নিবৃত্ত না হইলে বিরোধী অভিলাষ পরিহার কখন সম্ভবপর নহে। এ দুইয়ের ঈশ্বরবিরোধী ভাব রক্ষা করিব, অথচ ঈশ্বরগত প্রাণ হইব, ইহা কখনই হইতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি শরীরও মনকে যথেচ্ছ তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে দিয়া অধ্যাত্মভাব সম্পন্ন হইতে বাসনা করে, তাহারা মিথ্যার রাজ্যে কল্পনা রাজ্যে কাল্পনিক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া জাগ্রত স্বপ্নে জীবন অতিবাহিত করে। তাহাদের চরিত্র কখন ঈশ্বরচরিত্রে চরিত্রবান্ হয় না। কল্পনা যোগে তাহারা যে সুখানুভব করে, তাহা সুরাপায়ীর দুঃখে পর্য্যবসন্ন সুখ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহারা শীঘ্রই বিষয়কূপে নিমগ্ন হয়, এবং বিষয়ের দাস হইয়া অশেষ ক্লেশে তাহারা জীবন শেষ করে।

উপাসনা আধ্যাত্মিক সাধন। প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার সহবাস অনুভব করিতে করিতে তাঁহার চরিত্র সাধকে সংক্রামিত হয়। রঙ্গিণ বস্তুর সহিত রঙ্গহীন বস্তু পুনঃ পুনঃ একত্র করিলে রঙ্গহীন বস্তুতে যেমন রঙ্গ সংক্রামিত হয়, তেমনি অল্প জ্ঞান অল্প শক্তি, অল্প প্রেম, অল্প পুণ্য জীব অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্যের সহিত বাস করিতে করিতে জ্ঞান-শক্তি-প্রেম পুণ্য সম্পন্ন হয়। উপাসনায় সুখ হয়, অতএব উপাসনা করি, এরূপ যুক্তি যুক্তিযুক্ত নহে। স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে সুখ হয়, এ সুখ সেই সুখ। উপাসনার চরম সুখ ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত, তাহা ব্রহ্মচরিত্র সংক্রামিত না হওয়া পর্য্যন্ত কখন হয় না। উপাসনা করিতে গিয়া আপনার পাপ অপরাধ দুর্ব্বলতা চক্ষুর সন্নিধানে প্রকাশ পায় এবং তজ্জন্য ক্লেশ দুঃখ বাড়িতে থাকে, ইহা উপাসনার বিজাতীয় ফল নয়। বরং এরূপ পাপ জন্য ক্লেশানুভব না হইলে উপাসনা ঠিক হইতেছে না, ইহাই বুঝিতে হইবে। যাঁহারা কেবল সুখ লাভের জন্য উপাসনা করিতে চান, তাঁহারা শীঘ্র

কাল্পনিক সুখে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। সকল প্রকার অভিলাষ বর্জ্জিত হইয়া সম্যক্ ঈশ্বরের অধীন হইবার জন্য তাঁহার নিকটে গমন, ইহা যথার্থ উপাসনা সাধন। সাধনের উদ্দেশ্য কি ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর এই যে, দেহ মন ও আত্মা সম্যক্ ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইবে, সাধন ইহারই জন্য।

সুখ কি ?

সুখ অতি অনিশ্চিত সামগ্রী। কোন্ ব্যক্তির কিসে সুখ হয় সে ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ তাহা বলিতে পারে না। জীব সুখান্বেষী সত্য, কিন্তু এরূপ অনিশ্চিত বিষয়ের অনুসরণে নিশ্চিত সুখ নিত্যকালের সুখ লাভ হইবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর। যে সুখ শরীরগত সে সুখ অস্থায়ী, কেন না শরীরের অবস্থা চির দিন এক প্রকার থাকে না, তদ্ঘটিত সুখই বা কেন স্থায়ী হইবে? মানসিক সুখ ইহারও স্থায়িতা আমরা আশা করিতে পারি না। মন একান্ত চঞ্চল, সে এক বিষয়ে স্থির হইয়া থাকিবে, ইহা তাহার স্বভাব নহে। সুতরাং তজ্জনিত সুখই বা স্থায়ী হইবে কেন? এক আধ্যাত্মিক সুখ, ইহার স্থায়িতা আমরা আশা করিতে পারি। এখানেও বিঘ্ন অনেক।

আত্মা দেহের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। সম্যক্ প্রকারে দেহনিরপেক্ষ হইয়া আত্মা বাস করিবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। দৈহিক বিকারসমূহ আত্মাকে স্বস্থাবস্থায় থাকিতে দেয় না, দেহের প্রতি উহার অভিনিবেশ হইবেই হইবে। এরূপ স্থলে আত্মা নিয়ত সুখানুভব করিবে, ইহা কখন সম্ভব? দৈহিক ব্যাপারের সঙ্গে সংযুক্ত মন অনেক গুলি পিতৃমাতৃসংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ক্রমে সেগুলি পরিস্ফুট হইয়া এমনই দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছে যে, মন উহাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। কেবল ভাল সংস্কারগুলি সংক্রামিত হইয়াছে তাহা নহে, মন্দ সংস্কারগুলিও মনে সঞ্চারিত রহিয়াছে। ভাল ও মন্দ সংস্কারের সংগ্রামে যদি মন্দ সংস্কারগুলি বর্দ্ধিত হইবার উপযোগী অবস্থা পাইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মার স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার পক্ষে মহা ব্যাঘাত উপস্থিত। বল এরূপ স্থলে আত্মা স্বস্থ থাকিয়া সুখী হইবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পারা যায়। আত্মা দেহ ও মনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, এ সংগ্রাম শেষ না হইলে তাহার শান্তিই বা কোথায়? সুখই বা কোথায়?

অস্থায়ী সুখ দুঃখের হেতু। সুখের পর দুঃখ যেমন তীব্র, এমন তীব্র আর কিছুই নহে। ক্রমিক দুঃখের মধ্যে থাকিলে দেহ ও মন অল্পে অল্পে অসাড় হইয়া আসে, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। একটা ঔদাসীন্যের ভাব আসিয়া মনকে অধিকার করে। ইহাকে শান্তি বলা যায় না বটে, কিন্তু এ জড়তা জীবকে বাঁচাইয়া রাখে। সুখ দুঃখ পর্য্যায় ক্রমে উপস্থিত হইয়া যে মনে একটা অশান্তি উৎপাদন করে উহা ধীরতা সহকারে বহন করা বড়ই কঠিন। শান্তি ও সুখের জন্য ভিখারী মন এ অবস্থায় ধীরতা অবলম্বন করিবেই বা কি প্রকারে? মন বা আত্মার যাহা স্বভাব নয় তাহাতে উহা স্থির হইয়া থাকিবে, ইহা কখনই আশা করা যাইতে পারে না। স্থির হইয়া না থাকাই ভাল, কেননা এরূপ অবস্থায় স্থির হইয়া থাকা মৃত্যুর লক্ষণ। সুখ দুঃখ যখন পর্য্যায়ক্রমে আসিবেই ইহা নিশ্চিত, তখন সুখ দুঃখ নিরপেক্ষ হইয়া জীবন যাপন করিবার জন্য শিক্ষা সকলের পক্ষে হিতকর সুখ দুঃখের পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন যখন স্বভাবের নিয়ম, তখন তদ্বিরুদ্ধে প্রযত্ন সফল হইবে কি প্রকারে? মানুষ কি কখন স্বভাবকে অতিক্রম করিতে পারে? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর কি, তাহা দিতে আমরা যত্ন করিতেছি।

স্বভাব দ্বিবিধ, বাহ্য ও আন্তরিক। বাহ্য স্বভাবকে আমরা প্রকৃতি বলি। আত্মা নিয়ত প্রকৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। প্রকৃতি

তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্য নিয়ত ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। বাহ্য প্রকৃতির ক্রিয়ার অধীন হইলে আত্মা বদ্ধ হইয়া পড়িল, অথচ সে বন্ধন ছেদন না করিলে সে আর স্বাধীন হইল না, প্রমুক্ত হইল না। স্বাধীনতা প্রমুক্তাবস্থা আত্মার স্বভাব। এই স্বভাব হইতে তাহার বিচ্যুতি অধোগতির কারণ। প্রকৃতি যেমন আত্মাকে অধীন করিবার জন্য বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে, আত্মার আন্তরিক স্বভাব তেমনি প্রকৃতিকে আত্মবশে আনয়ন করিয়া অন্তর ও বাহিরের স্বভাবের সাম্য সম্পাদনে যত্নশীল। এ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কিন্তু স্বভাববিরুদ্ধ নহে। এইরূপ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াতে সমুদায় জগৎ ও জীব সমাজ চলিতেছে। এইরূপ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াতে জীবন, ইহার নিবৃত্তি মৃত্যু। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সাম্য যথার্থ জীবন, কোন একটীর আধিক্য বা অল্পতা বিকার।

এই সাম্যাবস্থা যদি রক্ষা করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে স্বাভাবিক সহজ সুখ কখনই জীব হারাইত না। কিন্তু জীবের সামর্থ্য নাই যে, সে এই সাম্যাবস্থা নিজ বলে রক্ষা করে। দৈহিক প্রাণশক্তির ক্রিয়াকে বাহিরের শক্তি আপনার ক্রিয়া দ্বারা প্রতিরুদ্ধ করিতে প্রয়াস পায় ইহাতে ক্রমান্বয়ে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। যখন উভয়ের ক্রিয়া সমভাবে চলিতে থাকে, কোনটী কোনটীকে পরাভূত করিতে পারে না তখন প্রাণ দেহে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু প্রাণশক্তির বলবিধান জন্য বাহির হইতে তদুপযোগী পদার্থ গ্রহণ করিতে হয়। এই গ্রহণ ব্যাপারের নাম আহার। প্রাণশক্তির সামর্থ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য যেমন আহার প্রয়োজন, তেমনি আত্মার বল রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য উপাসনা আবশ্যক। উপাসনা দ্বারা যখন আত্মার বল বাড়ে, তখন বাহিরের প্রকৃতির সহিত আত্মার সমতা উপস্থিত হয়। এই সমতা নিবন্ধন বাহিরের প্রকৃতির সহিত অন্তরের প্রকৃতির বিরোধ ঘুচিয়া গেল, অন্তরে শান্তি আসিল, সহজ সুখে সমুদায় আত্মা পূর্ণ হইল। এই সুখে সুখস্বরূপের সহিত জীবের ঐক্য হয়, জীব তখন বুঝিতে পারে সুখ কি?

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক তুমি লোকদিগকে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে বল। তোমার কথা শুনিয়া চলিতে তাহাদিগের বহু কষ্ট হয়, এই কষ্ট ধীরতার সহিত বহন করিলে অন্তিমে তাহাদিগের সুখ হইবে, এই তোমার কথা। তোমার কথা শুনিয়া যাহারা আশু সুখ পরিত্যাগ করিয়া ভাবী সুখের আশায় ধৈর্য্য ধারণ করিল, তাহারা কি করুণার পাত্র নয়? তাহারা সুখ না পাইয়া ক্লেশে সমুদায় জীবন কাটাইয়া গেল। যদি শীঘ্র সুখ দিতে না পারিলে, তবে বৃথা আশায় লোকদিগের কি লাভ হইল?

বিবেক। আমি লোকদিগকে ধৈর্য্যধারণ করিতে বলি এ কথা সত্য, কিন্তু সেই ধৈর্য্য ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সুখ হয় না এ কথা তোমাকে কে বলিল? এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, যে দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধারণের ক্লেশ বহন করিতে পারে? যে সকল ব্যক্তি আমার কথার অনুবর্ত্তন করে, তাহারা সেই অনুবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করে। যাহারা আশুসুখের প্রয়াসী হইয়া আমার কথা অগ্রাহ্য করে, তাহাদের অন্তরে সেই অবাধ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গ্লানি উপস্থিত হয়। পাপের ফল গ্লানি, পুণ্যের ফল শান্তি, ইহা কি তুমি স্বীকার কর না? তুমি স্বীকার কর আর না কর, যাহা নিত্য প্রত্যক্ষ তৎসম্বন্ধে তোমার প্রতিবাদ কখন কার্য্যকর হইবার নহে।

বুদ্ধি। যাহা প্রত্যক্ষ তাহার অপলাপ করিতেছি না, কিন্তু তুমি যে লোককে কষ্টের পথ দেখাইয়া সেই পথে তাহারে লইয়া যাও, পৃথিবীর সুখের পথ তোমার পক্ষে ঘৃণ্য আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি।

বিবেক। পৃথিবীর সুখের পথ আমি ঘৃণা করি ইহার অর্থ কি তুমি তাই মনে কর যে, পৃথিবীর জন্য স্বয়ং ভগবান্ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন আমি তাহার বিরোধী। যাহারা আপনার বুদ্ধিতে চলে, তাহারা ধার্ম্মিকতার অভিমানবশতঃ যদি ভগবানের ব্যবস্থা সকলকে হেয় মনে করিয়া কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করে, তাহাতে আমার দোষ, না তোমার দোষ? এসকল লোক আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া দিন দিন নূতন নূতন কষ্টসাধ্য পথ উদ্ভাবন করে এবং নিজেও কষ্ট পায়, অপরকেও কষ্টে ফেলে। যাহারা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা সকলের বিরোধে দণ্ডায়মান হয়, আমি তাহাদিগকে স্বপথে আনিবার জন্য ভর্ৎসনা করি, যদি আমার কথায় তাহারা কর্ণপাত করে, সংসারে থাকিয়া তাহারা প্রতিদিন পুণ্য সঞ্চয় করে। সেই পুণ্য সঞ্চয়ে তাহাদের হৃদয়ে প্রেম স্থান পায়। সেই প্রেম আমার কথা শুনিয়া চলিতে চলিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং পুণ্যের শান্তি, ও প্রেমের সুখ তাহাদের

হৃদয়কে যুগপৎ অধিকার করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করে। আমি যাহা বলিতেছি, তোমাকে তাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। যদি এই রূপই হইল, তাহা হইলে আমি সুখ দিই না কেবল দুঃখ দি, একথা বলা তোমার শোভা পায় না। ভরসা করি, আমি জীবকে কেবলই দুঃখ দি, একথা আর তুমি মুখে তুলিবে না।

বুদ্ধি নিস্তব্ধ হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ভ্রাতৃযোগ।

১০ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৮১৮ শক।

আমরা সত্যকে সাক্ষী করিয়া একথা বলিতে পারি না যে, আমরা এমন কাহাকেও আজও পাই নাই, যিনি আমাদের সর্ব্বদা কাছে থাকেন, আমাদের দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা দেন, কষ্টের সময়ে আমাদের কষ্ট নিবারণ করেন, সকল প্রকার আপদ বিপদ ও পরীক্ষা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। আমাদের মধ্যে ছোট বড় সকলেই যে এরূপ এক ব্যক্তিকে পাইয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। স্বয়ং আচার্য্যদেব যখন এ কথা সকলের সম্বন্ধে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তখন আমাদিগকেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে। সকলেই যে হরির সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংযুক্ত বিশ্বাস করেন, ইহা তাঁহাদের আচরণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। হরি তাঁহাদিগকে যাহা বলেন, তাহা তাঁহারা এমনই দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকেন যে, অন্ত শত লোক তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তৎপ্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন না। বরং পৃথিবীর সকল লোক ভ্রান্ত হইতে পারে, তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহাতে ভ্রান্তি ঘটিয়াছে, ইহাতে তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। যদি আপনার ধর্ম্মবন্ধুরাও সে কথার প্রতিবাদ করেন, তথাপি তিনি সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে বিরত হন না, এরূপ হয় কেন? এই জন্য যে, তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন, হরি স্বয়ং তাঁহাকে সে কথা বলিয়াছেন। যদি তিনি হরির সঙ্গে নিজের সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশ্বাস না করিতেন তাহা হইলে তাঁহাতে এরূপ সুদৃঢ় প্রত্যয় কখন উৎপন্ন হইত না। এরূপ দৃঢ়তাকে আমরা সাক্ষাৎসম্বন্ধের প্রমাণস্থলে উপস্থিত করিয়া কখন একথা বলিতেছি না যে, তাঁহার কখন ঈশ্বরের কথার ভাবপরিগ্রহে ভ্রম হয় না। ঈশ্বর যাহা বলিলেন, তিনি তাহার সমগ্র ভাব বুঝিয়াছেন কি না, সে কথার যে প্রকার প্রয়োগ হইবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাতে জ্ঞান অবতরণ করিয়াছে কি না, সেই কথার পূর্ব্বাপরের সহিত যোগ করিয়া কিরূপ অর্থপরিগ্রহ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে আলোকের জন্ত তিনি প্রতীক্ষা করিয়াছেন কি না, ঐ কথা কেবল তাঁহার নিজের অবস্থাপযোগী না অন্যের উপরে উহার ক্রিয়াকারিত্ব আছে? ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ভ্রান্ত হইতে পারেন। কেন না শুনিলেই হয় না, তাহার যথাযথ অর্থপরিগ্রহ ও নিয়োগাদির জন্ত ক্রমিক আলোক ভিক্ষা করিতে হয়; অন্যথা অতিব্যাপ্ততার কথা শুনিয়াও ভ্রান্তি ও অপরাধ হইতে সাধক আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন না।

আমাদের মধ্যে ছোট বড় সকলেরই ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ঘটিয়াছে, একথা স্বীকার করিয়াও আমাদের পূজা অর্চ্চনা যে, আজও অপূর্ণ রহিয়াছে ইহা আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ সুদৃঢ় না হইয়া জীবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই ধর্ম্মে বিকার উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ় হইয়াও যদি জীবের সহিত সম্বন্ধ অস্থির থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে ধর্ম্মের অর্দ্ধভাগ অতিক্রম করিয়া আমরা আজও অপরার্দ্ধ ভাগে উপস্থিত হই নাই, সুতরাং আমাদের পূজা অর্চ্চনাদি সকলই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মের সহিত সম্পর্ক হইলেই হইল, ব্রহ্মতনয়ের সহিত সম্পর্কে কি প্রয়োজন, একথা বলিয়া আমরা আমাদের মনকে প্রবোধ দিতে পারি না। ব্রহ্মের সহিত যোগ, ব্রহ্মতনয়ের সহিত যোগ, ইহা না হইলে যোগ পূর্ণ হইল কোথায়? ব্রহ্মকে পাইলে ব্রহ্মেতে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধ অনিবার্য্য, কেন না আমরা ব্রহ্মযোগে তাঁহাদিগের সহিত নিত্যকাল সম্বন্ধ রহিয়াছি। ব্রহ্মযোগে যে পরিমাণে আত্মপরিচয় হয়, সেই পরিমাণে ব্রহ্মতনয়ের পরিচয় লাভ হইয়া থাকে। প্রতি আত্মা কি প্রকার কোটি কোটি আত্মার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিত, ইহা বুঝিতে না পারিলে যথার্থ জ্ঞানই উৎপন্ন হইল না, পূর্ণ যোগ হইল বলা যাইবে কি প্রকারে? ব্রহ্মযোগের যেমন সাধন আছে, ব্রহ্ম-তনয়ের সহিত যোগেরও সাধন আছে। ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় সুতরাং তাঁহাকে অখণ্ড ভাবে প্রথম হইতেই গ্রহণ করিতে হয়; জীব এক নহে বহু, বহুকে যুগপৎ গ্রহণ করিয়া সাধন করা অসম্ভব, সুতরাং অল্পসংখ্যক জীব লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহাই যুক্তি যুক্ত মনে হয়। অল্পসংখ্যকে চিত্ত আবদ্ধ হইলে বহুতে উহার গতি অসম্ভব। অতএব প্রথম হইতেই চিন্তাপথে বহুকে গ্রহণ করিতে হইবে; ইহাও যুক্তিযুক্ত মনে হয়, কেন না কাহাকেও বাদ দিয়া কাহাকেও গ্রহণ করিলে চিত্তের অপ্রাশস্ত্য উপস্থিত হয়, ইহা আমরা নিজেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। যখন দ্বিবিধ সাধনের দুই দিকেই সমান যুক্তি, তখন আমরা কোন্‌টি অবলম্বন করিব; দুইটি-কেই একটি করিয়া গ্রহণ করিবার উপায় আছে কি না, ইহা আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে।

জড়রাজ্যে শক্তি মধ্যবিন্দু সমুদায় (force-centres) মিলিত হইয়া এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক শক্তিমধ্য বিন্দুর মধ্যে সমগ্র জগতের জন্ত যাহা প্রয়োজন তাহা না থাকিলে শক্তিমধ্যবিন্দুনিচয়ে একীভূত হইয়া কখনই জগৎ উৎপাদনের হেতু হইতে পারিত না। অতি সূক্ষ্ম শক্তিমধ্যবিন্দু মধ্যে সমগ্র জগদুৎ

পাদনের উপযোগিতা নিহিত আছে, ইহা মনে করিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহা কেবল আমাদের স্থূল দর্শনের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সূক্ষ্মত্বের দিকেও আনন্ত্য আছে ইহা স্মরণ করিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। যদি প্রতি শক্তিমধ্যবিন্দু সমগ্র জগতের সহিত এক, তাহা হইলে প্রত্যেক জীব সমগ্র জীবজগৎসহ এক, ইহা বিশ্বাস করিয়া লওয়া কিছু আর অযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। একথা সত্য কোন শক্তিমধ্যবিন্দুর যুগপৎ সমুদায় সামর্থ্য ব্যক্ত হয় না, কতক ব্যক্ত কতক অব্যক্ত থাকে, আবার ঠিক অবস্থা উপস্থিত হইলেই অব্যক্তও ব্যক্ত হয়, কিন্তু তাহাতে শক্তিমধ্যবিন্দু সমুদায়ের প্রকৃতিগত একতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। প্রতি জীবেতেও ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় প্রকারের সামর্থ্য বিদ্যমান আছে। এক জীবে যাহা ব্যক্ত অন্য জীবে তাহা অব্যক্ত এরূপ প্রভেদ অপরিহার্য্য হইলেও জীবে জীবে প্রকৃতিগত একতা তখনও আছে। এই প্রকৃতিগত একতা আছে বলিয়াই, এক বা বহু এ প্রভেদ সাধন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। একের সহিত যোগও যাহা বহুর সহিত যোগও তাহা, এস্থলে ইহাই মানিয়া লইতে হইবে। যদি বল ব্যক্তত্বে যখন প্রভেদ অনেক, তখন যে জীবে সামর্থ্য সমুদায়ের অভিব্যক্তি অধিক পরিমাণে হইয়াছে, তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সাধন করা প্রয়োজন, অন্যথা সাধনে অপূর্ণতা থাকিয়া যাইবে। ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, অধিক বা অল্প অভিব্যক্তি তোমার বুঝিবার উপায় কি? ঈশা চৈতন্য প্রভৃতিতে তনয়ত্বের অভিব্যক্তি অধিক ছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া লন, অতএব সাধনার্থ তাঁহাদেরই কাহাকেও গ্রহণ করা উচিত, যদি তুমি এই প্রত্যুত্তর দাও, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে, তুমি দৃশ্যমান ভ্রাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য ভ্রাতাদিগকে অবলম্বন করিতে যাইতেছ, ইহার ফল এই হইবে যে, তুমি আর দৃশ্য ভ্রাতৃবর্গের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারিবে না। অপিচ দৃশ্য ভ্রাতাদিগের সহিত অদৃশ্য ভ্রাতাদিগের যদি নিত্য সম্বন্ধ তুমি অনুভব করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি স্বয়ং দৃশ্য হইয়া অদৃশ্যগণের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবে, এ আশা তুমি কোথা হইতে পাইলে?

ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে কে? তোমার আত্মা। আত্মার যে পরিমাণ নির্ম্মলতা, অনুরাগ ও প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল হয়। ভ্রাতৃবর্গের সহিত একত্ব আত্মার বাহিরে সম্পন্ন হয়, না আত্মার অভ্যন্তরে? অবশ্য আত্মার অভ্যন্তরে, কেন না আত্মা বিনা তাঁহাদের সহিত একতা অনুভব করিবার সামর্থ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নাই। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিয়ত ভেদ দর্শন করে, ভেদ দর্শন করা তাহাদিগের স্বভাব, অভিন্নতা একতা দর্শন কেবল একমাত্র আত্মারই স্বভাব ও সামর্থ্য। ঈশ্বর দর্শন দ্বারা আত্মার ভ্রাতৃবিরোধী ভাব সকলি যে পরিমাণে তিরোহিত হয়, সেই পরিমাণে উহা ভ্রাতৃবর্গের সহিত একত্ব অনুভব করে। ইন্দ্রিয় গণ যোগে যে ভিন্নতা একবার উপলব্ধি হইয়াছে, প্রকৃতি বাসনা সমুদায় যে ভেদবুদ্ধিকে দৃঢ়মূল করিয়াছে, সে ভেদ বুদ্ধি ঈশ্বর যোগে যোগী না হইলে কোন প্রকারে অপনীত হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের সহিত যোগ হয় নাই, অথচ ভ্রাতার সহিত যোগ হইয়াছে ইহা মনে করা নিতান্ত ভ্রান্তি। ঈশ্বর তনয় ঈশা অগ্রে আপনাকে ঈশ্বরেতে দেখিলেন, ঈশ্বরকে আপনাতে দেখিলেন, পরিশেষে অনুযায়িবর্গকে আপনাতে, অনুযায়িবর্গেতে আপনাকে দর্শন করিলেন। তাঁহার এই যোগ প্রণালী অতিক্রম করিয়া কেহ ভ্রাতৃযোগে যোগী হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের দেশের ঋষিগণও যোগ যুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বভূতকে পরমাত্মাতে ও আত্মাতে সর্ব্বভূতেতে পরমাত্মা ও আত্মাকে দর্শন করিয়াছেন। আত্মার যোগচক্ষু প্রস্ফুটিত না হইলে যখন ভ্রাতৃবর্গের সহিত একত্বানুভব হওয়া একান্ত অসম্ভব, তখন তুমি অগ্রে ঈশ্বরযোগী না হইয়া কি প্রকারে আশা করিতে পার যে তুমি অনায়াসে ভ্রাতৃযোগে সম্পন্ন হইবে। রাগ দ্বেষ প্রবৃত্তি বাসনায় তোমার অন্তশ্চক্ষু মলিন হইয়া রহিয়াছে, ঈশ্বরযোগের পুণ্যাঞ্জনে তাহাকে অগ্রে নির্ম্মল কর, তাহা হইলে ভ্রাতৃপরিচয় লাভ করিবে। এখন কেহ তোমার শত্রু, কেহ তোমার মিত্র, কেহ তোমার আত্মীয়, কেহ তোমার পর, কাহাকেও তোমার ভাল লাগে, কাহাকেও তোমার ভাল লাগে না, ইন্দ্রিয় গ্রামে বাস করিয়া যখন তোমার মনের এ প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে; তখন তুমি ভ্রাতৃযোগে যোগী হইবে ইহা কি কখন সম্ভব? তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে ভিন্নতার সহস্র কারণ দেখিতেছ, এবং যতক্ষণ ইন্দ্রিয়যোগে ভ্রাতৃ দর্শন করিতেছ, ততক্ষণ ইহা অনিবার্য্য, এরূপ অবস্থায় ভ্রাতৃযোগ বা ভ্রাতার সহিত একত্ব কখন কি তুমি আশা করিতে পার? দৃশ্যমান ভ্রাতাদিগের সঙ্গে যোগ হইবার ঘোর অন্তরায় ইহা দেখিয়া অদৃশ্য ভ্রাতাদিগকে আশ্রয় করিবে ইহাতে তুমি বঞ্চিত হইবে। কেন না জানিও দৃশ্য ভ্রাতাদিগের সহিত যে যোগ করিতে পারিল না, তাহার সম্বন্ধে অদৃশ্য ভ্রাতাদিগের সহিত যোগ সমাধান করা অসম্ভব। দৃশ্য ভ্রাতাদিগকে যাহারা উপেক্ষা করিয়াছিল, চরম দিনে ঈশ্বরতনয় তাহাদিগকে অস্বীকার করিলেন খ্রীষ্টধর্ম্মের গ্রন্থে যে এই কথা লিখিত আছে, ইহার কি কোন অর্থ নাই? দৃশ্য ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য ভ্রাতাকে গ্রহণ করিতে গেলে তিনি যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, বাইবেলের এ কথার কি এই অর্থ নয়? জীবগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিয়া যে পূজা অর্চ্চনাদি করে সে ভস্মে ঘৃত ঢালে, ঋষিগণ এ কথা বলিয়া কি ঈশ্বর তনয়ের কথাই অন্য ভাষায় দৃঢ় করিতেছেন না? তুমি অকিঞ্চন হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তিনি তোমার অন্তশ্চক্ষু নির্ম্মল করিয়া দিন, দেখিবে দৃশ্য ভাই এবং অদৃশ্য ভাই তোমার আত্মার গভীরতম স্থানে এক হইয়া গিয়াছেন।

তুমি সাধনার্থ একটি পাঁচটি দশটি যতটি ভ্রাতা গ্রহণ করিতে চাও গ্রহণ কর, কিন্তু তাঁহাদিগকে দৃশ্যাদৃশ্য সকল ভ্রাতার প্রতি-

ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ কর, অন্যথা তোমার চিত্ত সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে বদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়িকতা উৎপাদন করিবে। তুমি বলিবে, আমি একটি বা যে কয়েকটি ভাইকে মনোনীত করিয়া লইয়াছি, তাঁহাদের সহিত আমার আত্মার মিলনের সম্ভাবনা আছে, অপর সকল ভ্রাতার সহিত আমার ধর্ম্মাদিতে বিরোধ সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি নিধিরূপে ইহাদিগকে গ্রহণ করিয়া আমি সাধন করিব কি প্রকারে? বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে তুমি যাহাদিগকে এখন মনোনীত করিয়া লইয়াছ তাঁহাদিগকে সময়ে ছাড়তে হইবে, কেন না এখন যে কারণে তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়া লইয়াছ, সে কারণের ব্যতিক্রম হইলে তুমি তাঁহাদিগকে তখন ছাড়িয়াও দিবে। ভিতরে যে মিলনের ভূমি আছে, তৎপ্রতি যদি তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ না হয়, তুমি কোন কালে কাহারও সহিত যোগনিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যোগ করিবে কোথায়, বাহিরে, না ঈশ্বরেতে? বাহিরে কোন কালে যোগ হয় না, যোগ হয় অন্তরে ঈশ্বরেতে। তুমি যখন তোমার ঈশ্বরের নিকটে যাও, তখন তাঁহার আলোক তোমার আত্মাতে নিপতিত হয়। সেই আলোকে তুমি তোমার আত্মাকে চিনিতে পার, তাহার প্রকৃতি অবগত হইতে সমর্থ হও। আত্মপরিচয়ে, আত্মপ্রকৃতির পরিচয়ে সকল আত্মার ও তাহাদের প্রকৃতির পরিচয় তুমি লাভ করিয়া থাক। এই সময়ে তাঁহাদের সহিত যোগের উপযোগিতা তোমাতে উপস্থিত হয়। একবার যখন অন্তরে যোগ নিষ্পন্ন হইল, যোগ চক্ষু তুমি লাভ করিলে তখন আর তোমার বাহিরের বিবিধ ভিন্নতা দেখিয়া তোমার ভ্রান্তি উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন তুমি সকল ভ্রাতার আত্মা ও তৎপ্রকৃতি দর্শন করিয়া তৎসহ আপনার একতা অনুভব করিতেছ, তুমি আর কি তাহাদিগের সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধি পোষণ করিতে পার? এখন তোমার স্বদেশ বিদেশ এক হইয়া গিয়াছে, ভারতবাসী বা লাপলাণ্ডবাসী তোমার চক্ষে সমতুল্য হইয়া গিয়াছে। পথের ভিখারী ও প্রাসাদবাসী সকলেই ভ্রাতৃযোগে তোমাতে এক হইয়া গিয়াছে। সাধু অসাধু জ্ঞানী অজ্ঞানী এ সকলের প্রভেদ থাকিলেও তাঁহাদিগের আত্মার সহিত তোমার যোগ কোন কারণে খণ্ডিত হইতে পারে না। যখন তুমি আত্মা ও তাহার মূল প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ যোগ অবলম্বন করিয়াছ, তখন আর এখানে ভেদবুদ্ধির অবকাশ কোথায়?

বিশুদ্ধ যোগে যখন একত্ব অনুভূত হইল তখন বিশুদ্ধা ভক্তি কি ইহার বিপরীত প্রমাণ দিতে পারেন? যদি দেন তাহা হইলে যোগভক্তির মিলন হইল কোথায়? ভক্তি ও যোগের কোন বিশেষ নাই, যোগ আত্মাকে পরিচিত করিয়া দিলেন, তাহার প্রকৃতি কি দেখাইয়া দিলেন, এখন সেই আত্মার প্রতি অনুরাগ ও প্রীতিভক্তি উপস্থিত। অনুরাগ ও প্রীতিভক্তি বিনা আত্মা কখনও অপর আত্মাকে আত্মসাৎ করিতে পারে না, অতএব ভক্তি বিনা যোগের পূর্ণতা কোন কালে হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ভক্তি ভেদবুদ্ধি উপস্থিত করে, সাধুর নিকটে প্রণত হয় অসাধু হইতে দূরে পলায়ন করে, ভক্তির নামে যে এই অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহা যোগবিরহিত ভক্তি সম্বন্ধে সত্য, যোগপরিপক্ব বিশুদ্ধা ভক্তি সম্বন্ধে তাহা কখন সত্য নয়। ভক্তি প্রেমের নামান্তর, প্রেমে দৃশ্যতঃ ভেদ দেখিলেও ভিতরে কোন ভেদ নাই ইহা আমাদের বোঝা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রেম প্রিয়পাত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। যাদৃশ আচরণে প্রিয়পাত্রের মঙ্গল হইবে, যোগনয়নে অন্তঃ কথায় ঈশ্বরের আদেশে তাহা বুঝিতে পারিয়া যদি কোন ভ্রাতার মঙ্গলার্থ তদনুরূপ আচারণে যোগী প্রবৃত্ত হন, তাহাতে একত্ব কাটিয়া গেল, ভ্রাতৃযোগ আর রহিল না এরূপ মনে করা ভ্রম; কেন না তাঁহার অন্তরে যোগ আছে, তাহার প্রতি প্রেম ও অনুরাগ আছে, তাহার প্রতি উদাসীন হইতে পারেন না, এজন্যই ঈদৃশ আচরণ। যে আপনার নহে, তাহার ভাল মন্দে কিছু আসে যায় না, যে আপনার তৎসম্বন্ধে কি সে কথা বলা যাইতে পারে? আপনি আপনার পাপাদি পরিহার জন্য যে প্রকার আপনার প্রতি ব্যবহার করি, এখানে যদি ঠিক সেইরূপ হয়, তাহা হইলে একত্ব আরও ঘনীভূত হইল। যোগী যখন মণ্ডলিতে সকল ভাইয়ের সহিত এক হইয়াছেন, তখন তিনি কাহারও প্রতি কোন আচরণ আত্মমতে নিয়মিত করিতেছেন সুতরাং তাঁহার এস্থলে ভ্রমের সম্ভাবনা কোথায়? মণ্ডলীকে ঈশ্বর যেরূপ আচরণ করিতে আদেশ করিতেছেন, তিনি সেই আদেশেরই অনুসরণ করিতেছেন, সুতরাং যোগ না কাটিয়া বরং যোগ বিশুদ্ধভূমির উপরে স্থাপিত হইতেছে। যোগ ও ভক্তি চিরদিন পুণ্যভূমির উপরে স্থাপিত। ভ্রাতার আত্মার প্রকৃতি পুণ্যময় জানিয়া ভক্ত যোগী তাঁহার সহিত ঈশ্বরে এক হইয়াছেন, কিন্তু আত্মপাপাংশ ও ভ্রাতার পাপাংশের সহিত যেমন ঈশ্বরের বিচ্ছেদ রহিয়াছে, তেমনি তাহারও বিচ্ছেদ রহিয়াছে, সুতরাং ভিতরের যোগ কাটিল কোথায়? বরং পাপাংশের প্রতি অনুরাগ থাকিলেই যোগ তখনই কাটিয়া যাইত। পাপাংশের জন্য বাহ্য আচরণে যে টুকু পার্থক্য জন্মে, তাহা যদি যথার্থ যোগমূলক হয়, তাহা হইলে পাপাংশ ছাড়া অন্যত্র যে সুকোমল মধুর ব্যবহার থাকিবে, তাহাতে আন্তরিক যোগের বাহিরেও পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভ্রাতৃযোগ লুকাইয়া রাখিবার বস্তু নহে, ইহা কোন না কোন দিক্ দিয়া জগতের নিকটে প্রকাশিত হইবেই হইবে। আমাদের সকলেরই এই যোগে যোগী হইয়া নববিধান পূর্ণ করা সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। এত দিন আমরা এ সম্বন্ধে শিথিল থাকিয়া ঈশ্বর ও নরজাতি উভয়ের নিকটে অপরাধী হইয়াছি, ঈশ্বর করুন আমাদের মধ্যে যেন এ অপরাধ আর অধিক দিন তিষ্ঠিতে না পারে।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী হইতে প্রাপ্ত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

২৯ শে আশ্বিন রবিবার সন্ধ্যার সময় গিরিশ বাবু সামাজিক উপাসনা করিলেন, মধ্য রাত্রিতে আমরা পুরুলিয়া পরিত্যাগ

করিয়া কটকাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ছোটনাগপুর জঙ্গলভূমি ইহার প্রমাণ ক্রমাগত পাইতে পাইতে পরদিন প্রাতঃকালে সিনি নামক ষ্টেশনে বেঙ্গল নাগপুরের গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। উড়িষ্যা যাত্রীগণের এই স্থানে নামিয়া অনেকক্ষণ থাকিয়া স্নানাহ্নিক ও মধ্যাহ্নক্রীয়া করিয়া অন্য গাড়িতে চড়ীতে হয়, কিন্তু এসকল ব্যবস্থা নূতন এবং স্থান প্রায় জনশূন্য বলিয়া পথিকের আশ্রয়ের ব্যবস্থা নাই। অন্য অন্য বহু যাত্রীর সহিত আমরাও বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলাম এবং এই বৃক্ষমূলে উপাসনা ও জলযোগ করিয়া পুনরায় বাস্পীয় শকটে আরোহন করিলাম। সমস্তদিন মৃদুগামী বাস্পীয় রথে গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় মেদিনীপুরের ৬ মাইল দুরস্থ খড়্গাপুরে উপস্থিত হইলাম। এই খড়্গাপুর অতি বৃহৎ রেলওএ ষ্টেশন, এখানে বহু যাত্রীর সমাগম কিন্তু ষ্টেশনের বাড়ী এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। যাত্রীগণ হিমে বসিয়া রাত্রিযাপন করে। যাহা হউক আমাদিগের আর এখানে আকাশের নীচে রাত্রিযাপন করিতে হইল না। রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতা হইতে বরসহ বরযাত্রীকগণ আসিলেন, আমরা জলে জল মিশিয়া গেলাম। আমাদিগকে পাইয়া তাঁহারা বোধ হয় ৩২ জন হইলেন। কতকটা অমৃতানন্দের ভালবাসা অনুরোধে এবং প্রধানতঃ পুণ্যভূমি ও ঐতিহাসিক ভূমি দর্শনের অভিপ্রায়ে আমরা বহু লোক কটকযাত্রা করিলাম, ইতিপূর্ব্বে বন্যা হইয়া ভদ্রক হইতে কটক পর্য্যন্ত রেল চলা বন্ধ হইয়াছিল, প্রভুর ইচ্ছায় বরযাত্রীগণের সুবিধার জন্য ঠিক এই সময়ে কটক পর্য্যন্ত গাড়ী গেল। এখনকার কটকের ষ্টেশন কটক হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে, আমরা মধ্যাহ্নকালে গাড়ী হইতে নামিয়া রেলওএর নৌকায় চড়িলাম ও ষ্টীমলঞ্চ দ্বারা নীত হইয়া কেনালের কপাট পার হইয়া মহানদী ও তাহার একটি শাখা পার হইয়া কটকের ঘাটে উপস্থিত হইলাম। আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বাবু মধুসূদন রাও ও ভাই নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় উপস্থিত ছিলেন। ঘাট হইতে ৩ মাইল পথ ঘোড়ার গাড়ীতে যাইয়া গম্যস্থান শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও এবং মধুসূদন রাও মহাশয়দের গৃহে উপস্থিত হইলাম। ক্লান্ত শ্রান্ত বরযাত্রীগণ সুখে বিশ্রাম করিলেন।

কটক কথার অর্থ অবশ্য আমরা সৈন্যদল বুঝি। কিন্তু কটক নগরের নাম কেন কটক হইল তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশীয় রাজাগণ উড়িষ্যা বিজয় করিয়াছিলেন "উৎকলৈঃ দর্শিতঃ পন্থা কলিঙ্গাভিমুখং যযৌ।" রঘুবংশের একথা তাহার একটা প্রমাণ। উড়িষ্যা দেশ ইংরেজ শাসনাধীনে আসিবার পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র শাসনাধীনে ছিল, কটক মহারাষ্ট্রগণের রাজধানী ছিল। এখানে তাঁহাদিগের কীর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। কটক নগরের তিন দিকেই নদী। তন্মধ্যে কাঠজুড়ি নামক মহানদীর শাখা বর্ষাকালে অত্যন্ত বলবতী হয়, ইহার স্রোত প্রবলবেগে নগরের পার্শ্ব আক্রমণ করে। এই আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য মহারাষ্ট্র রাজগণ প্রস্তর দ্বারা এই তীরকে বহুদূর পর্য্যন্ত অতি দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছিলেন, এই পাথরের বন্ধন না থাকিলে হয়ত নগর এতদিন নদীগর্ভে যাইত। এখানকার লোক সংখ্যা ৬০,০০০ হইবে। এ নগর উড়িষ্যার প্রধান নগর, অল্প সংখ্যক বৃটিশ সৈন্য আছে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে যে মহা দুর্ভিক্ষ হয় তখন খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ অন্নদান করিয়া যাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া ছিলেন তাহারা অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ খ্রীষ্টিয়ান পরিবার অনেক এখানে আছে এবং বাপ্টিষ্ট মিশনের প্রচারালয় সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। এই খ্রীষ্টিয়ানগণ জ্ঞানে ও ধর্ম্মে কত উন্নত হইয়াছে জানিবার সুবিধা হয় নাই, তবে ব্যবহার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে যে অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার আর কোনঃসন্দেহ নাই।

কটকের খ্রীষ্টিয়ান পাড়ার কথা বলিতেই তেলেগু পাড়ার কথা মনে হয়, দক্ষিণী তেলেগু জাতির বহু লোক কটকে বাস করে, এ সহরে এমন অপরিষ্কার স্থান আর নাই।

পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল যে আমাদের উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমৃতানন্দের বিবাহ কটক নিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতি সরস্বতী বাইর সহিত স্থির হইয়া ৪ঠা কার্ত্তিক (১৩০৬) হইবে স্থির হয় আমরা সেই বিবাহে বরযাত্রী হইয়া কটক যাত্রা করি। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও মহারাষ্ট্র বংশজ। উড়িষ্যা জয় করিয়া অনেক মহারাষ্ট্রগণ এখানে বাস করেন, ইহারা সেই বিজয়ী বংশসম্ভূত। নামে ও বংশে মহারাষ্ট্র হইলেও ইহারা উড়িষ্যার লোক হইয়াছেন। পুনশ্চ উড়িষ্যাবাসী হইলেও ইহারা জ্ঞানে, শিক্ষায় ভাবে অনেকটা বাঙ্গালী। ইহাদিগের পরিবারের লোক অনেক ভদ্র বাঙ্গালী পরিবার অপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় অধিকতর অভিজ্ঞ।

আমাদের এই বৃহৎ বরযাত্রীদিগের মধ্যে আমাদের সমাজের অনেক ধার্ম্মিক গুণী ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। ইহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতে ছিলেন। এবং কেহ কেহ অল্প অবকাশও পাইয়া ছিলেন। ৩রা কার্ত্তিক প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতর অধ্যাপক বাবু বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এখানকার প্রিণ্টিং কম্পানীর হলে ইংরাজিতে একটি বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার বিষয় "দেবমন্দির হীন নগর" ছিল। স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সুখী ও লাভবান্ হইয়াছিলেন।

৪ঠা কার্ত্তিক শুক্রবার বিবাহ হইল। বিবাহসভায় খ্রীষ্টিয়ান হিন্দু, এবং না খ্রীষ্টিয়ান্ না হিন্দু বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। এ বিবাহ ছোটখাট রকমের অসবর্ণ বিবাহ নহে। বর বাঙ্গালী বৈদ্য বংশের ও কন্যা মহারাষ্ট্রী ক্ষত্রিয় বংশের। শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রকন্যার উৎকল বিবাহের পর এরূপ বিবাহ আর অধিক হয় নাই। এ বিবাহের আর একটি বিশেষত্ব এই যে বাবু জগন্নাথ রাও উড়িষ্যার একটি ক্ষুদ্র মহারাজার দেওয়ান। সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত লোক, তাঁহার কন্যার বিবাহ মধ্যবিত্ত উপার্জ্জন-

শীল বরের সহিত হওয়াই সাধারণ নিয়ম। আমাদের প্রিয় অমৃতানন্দ বৈরাগ্যব্রতধারী পিতার বৈরাগী পুত্র। সংসারে ধন, মান যশের অনুসন্ধান করেন নাই, ধন মানও এ পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান লয় নাই। বিধাতার বিচিত্র নিয়মে হয়ত অমৃতানন্দের সহজ বৈরাগ্যকে পরীক্ষা করিতেই এই অসমান সাংসারিক অবস্থার কন্যার সহিত তাঁহার মিলন হইল।

বিবাহের পর দিন ৫ই কার্ত্তিক শনিবার বরযাত্রীর অধিকাংশ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ জগন্নাথ দর্শনার্থে রওনা হইলেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলওএ কটক বারং পর্য্যন্ত আসিবে, তাহার পর বারং হইতে ইষ্টকোষ্ট রেলওএ আরম্ভ হইয়াছে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওএ এপর্য্যন্ত বারং পর্য্যন্ত গাড়ী চালাইতে পারে নাই। আমরা কটক হইতে ৮ খানি গোযানে বারং যাত্রা করিলাম। বারং ইষ্ট কোষ্ট রেলের শেষ ষ্টেশন। এ লাইনে আর বাঙ্গালি বাবু বড় নাই মান্দ্রাজি, তেলেগু প্রভৃতি কেরাণী ও অপর লোক। আমরা সন্ধ্যা ৭টার সময় গাড়ীতে চড়িয়া রাত্রি ১১টার সময়, ৪৮ মাইল দূর পুরী ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমরা রেলের ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী দেখিয়া অভ্যস্ত কিন্তু পুরী ষ্টেশনে গোযান ব্যতীত কিছু পাওয়া গেল না। নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আহারীয় অন্বেষণে যাইতে মধ্যরাত্র অতীত হইল। জগন্নাথ মন্দিরে ভাত দাইল কিনিতে গেলাম—তখনও ১০। ১২ খানি দোকান খোলা। কেহ ভাতের হাঁড়ি আনিয়া হাত দিয়া দেখিতে বলে, কেহ ডাল বা তরকারী খাইয়া দেখিতে বলে—চাখিয়া ও দেখিয়া সুশীতল ভাত ডাল তরকারী কিনিয়া আনিলাম ও একবার জগন্নাথের মন্দিরে যাইয়া সেই মূর্ত্তিও দূর হইতে ক্ষীণালোকে দেখিলাম।

৬ই কার্ত্তিক রবিবার আমার জীবনের বিশেষ দিন। আমি জীবনে কখনও সমুদ্র দেখি নাই—আজ প্রথম দেখিলাম। শরীর তত সুস্থ ছিল না, তথাপি ব্যাকুল হইয়া সমুদ্রতীরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আকাশমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত অগাধ নীলাম্বুরাশি ও মহানীল নাগের মহা ফণার ন্যায় তরঙ্গ ক্ষণকাল মধ্যে শ্বেত ফেনরাশিবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং যুগে যুগে, শীতে গ্রীষ্মে, দিবা রজনী এইরূপ রহিয়াছে ইত্যাদি বিষয় যুগপৎ দেখিয়া ও মনে হইয়া যে কি ভাব হইল তাহা প্রকাশ করিতে তো পারিলাম না, তখনই ধারণা করিতে পারি নাই। কেবল বুঝিয়া না বুঝিয়া মন প্রাণ দেহ লইয়া সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ট হইয়া বিশ্বনাথ আনন্দদেবকে প্রণাম করিলাম। আমরা সমুদ্রে স্নান করিয়া বাসায় আসিয়া উপাসনা করিলাম—আমাদের অন্য সকল ভাবুক ব্রহ্মভক্ত সমুদ্রে ও পবিত্র ভূমিতে নানা ভাবে ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

লোকে বলে লোকটা এত পাপী যে জগন্নাথক্ষেত্রে যাইয়াও জগন্নাথদর্শন পাইল না—আমার একরূপ তাহাই হইল—পূর্ব্ব-রাত্রিতে একবার জগন্নাথ মন্দিরে গিয়াছিলাম কিন্তু আজ আর যাওয়া হইল না। সিংহদ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র তাম্র-ফলকে লেখা আছে "None but orthodox Hindus are allowed to enter into the temple." আমি তো আর চলিতরূপ হিন্দু নয় তবে আমি কেন মন্দিরে যাইব—আর ভিতরে গেলাম না। বাহির হইতে মন্দির দেখিতে লাগিলাম। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন, আমরা কটকে আসিয়াই ডাক্তার হাণ্টর ও রাজেন্দ্র লাল মিত্র লিখিত উড়িষ্যার প্রাচীণ ইতিহাস ইত্যাদি কতকটা জ্ঞাত হইয়াছিলাম। পুরীতেও ভুবনেশ্বরে যাহা দেখিলাম তাহা পুস্তকে পড়িয়া অনেকটা জানা ছিল, সে সকল বিষয়ের বর্ণনাও পুস্তকগত বিদ্যার সাহায্যে লেখা হইল। জগন্নাথ মন্দিরের ভিতর যাইব না স্থির করিয়াও সিংহদ্বার পার হইয়া সিঁড়ি চড়িয়া মন্দিরের উচ্চ চত্বরে আরোহণ করিলাম। এই চত্বর সমভূমি হইতে প্রায় ৮। ১০ হাত উচ্চ, ইহার চারি দিকে প্রস্তরের প্রাচীর তাহাও ১২। ১৩ হাত উচ্চ। এই উচ্চ প্রাচীরাবৃত উচ্চ স্থান দৈর্ঘে ৪৩৫ হাত ও প্রস্থে ৪২০ হাত। ইহাই পুরীর প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ী, এই স্থানে ছোট বড় প্রায় ১২০টি দেবমন্দির আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ অবশ্য জগন্নাথের মন্দির—এই সঙ্গে চারিটি মন্দির আছে। বড় দেউল ১২৮ হাত উচ্চ, তাহার পর জগমোহন মন্দির, নাটমন্দির ও ভোগ মন্দির। এ চারিটি মন্দির চত্বরের মধ্যভাগে এক সারিতে আছে, ইহার চারিদিকে অন্য সকল মন্দির। মন্দিরগুলি অনেক অংশে বুদ্ধ মন্দিরের মত। জগন্নাথের মন্দিরের বহির্ভাগে অনেক দেখিবার সামগ্রী আছে—মন্দিরের উচ্চতা ও গাম্ভীর্য্য বলিতেছে মানুষ জগন্নাথ, বিশ্বনাথের পূজার আয়োজন করিতে গিয়া মানুষের মতই চেষ্টা করিবে—এ আয়োজন মানুষের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। মন্দিরের চারিদিকে প্রস্তরের উপর কাটা অনেক মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি বড় সুন্দর নহে, তবে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। অনেক রূপ মূর্ত্তির মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত গভীর কুরুচিব্যঞ্জক মূর্ত্তি আছে। সম্প্রতি মন্দিরের যে জীর্ণ সংস্কার হইয়া গিয়াছে তাহাতেও সেগুলির অশ্লীলতা যত্ন করিয়া রক্ষা করা হইয়াছে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। সমস্ত দেশের পূজ্য এরূপ দেব মন্দিরে কেন এত অশ্লিলতা, জাতীর নীচ রুচির প্রদর্শকরূপ স্থাপিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কথিত আছে এই মন্দির ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়; সম্ভবত খৃষ্ট তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উড়িষ্যাতে এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি ও পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। আমার একবার মনে হয় যে ইতিপূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া নরনারীকে পৃথক রাখিয়া পবিত্রতা রক্ষা করিবার যে আদর্শ দেখাইয়াছিল তাহা এদেশে গৃহীত হইল না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইল বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শ পবিত্রতাকে ভয়ানকরূপে অগ্রাহ্য ও হাস্যাস্পদ করিবার চিহ্ন স্বরূপ, উপাস্য দেবতার মূর্ত্তি যত দূর সম্ভব কুদৃশ্য ও তাঁহার মন্দির যতদূর সম্ভব অশ্লীলতা পূর্ণ করা হইয়াছিল। কিন্তু পুনরায় যখন মনে হয় জগন্নাথের সঙ্গে মানুষের দুর্ব্বলতারও কোন যোগ নাই। জগন্নাথের পার্থিব জীবনের কোন উপাখ্যানও নাই কেবল

তাই ভগ্নী শুদ্ধভাবে মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী, তখন সে কথাও মনে পোষণ করিতে ইচ্ছা হয় না। একথা সম্ভব হইতে পারে যে কতকটা বৌদ্ধধর্ম্মের ভাইভগ্নির মত নরনারীর পবিত্র সম্পর্ক ও কতকটা মানবসুলভ ভাবের আধিক্যে মন্দিরের ভিতর বাহির শোভিত হইয়াছে। এক দিকে দেখিতে গেলে জগন্নাথ এদেশের দেবতা নহেন। তাঁহার বিশেষত্বই নূতনত্ব প্রমাণ করিতেছে। জগন্নাথের প্রসাদের বিষয়ে পানাহারে স্পর্শদোষ নাই। সমস্ত হিন্দুজাতি এখানে পানাহারে এক জাতি—কিন্তু এই নূতন ভাব কেহ ভাল করিয়া গ্রহণ করে না। পুরীর বাহির আসিলেই যে সেই হয়। জগন্নাথ উপাসক কোন সম্প্রদায় আছে মনে হয় না। দশ অবতারের মধ্যে জগন্নাথ নাই। প্রাচীন শাস্ত্রে পুরাণে নাম পাওয়া যায় না। জগন্নাথের লীলা নাই, কাজেই তাঁর প্রতি প্রেম ভক্তি অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে জগন্নাথের কোন আকর্ষণই নাই। এদেশে নূতন দেবতা চালন অত্যন্ত সহজ। জগন্নাথ তাই চলিয়াছে। যদি শ্রীচৈতন্য জগন্নাথে শেষ দ্বাদশ বৎসর না কাটাইতেন, যদি তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণের লীলাভূমি না হইত তাহা হইলে জগন্নাথক্ষেত্র আমার তীর্থক্ষেত্র কোনরূপেই হইতে পারিত না। আমার নিকট পুরী শ্রীচৈতন্য মাখা। যাহা দেখি তাহাতেই চৈতন্যের কথা মনে হয়। তিনি কত দূরে কোথায় বাস করিতেন কেহ বলিতে পারিল না কাজেই পুরীর নিকটবর্ত্তী সকলস্থানই আমার প্রিয়। গরুড়ের বৃহৎ প্রস্তর মূর্ত্তি, সিংহ দ্বার নাটমন্দির সর্ব্বত্রই যেন চৈতন্য ও তাঁহার মহাভাব লেখা রহিয়াছে। যে সমুদ্রে পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত দেখিয়া তিনি হরি প্রেম ভ্রম করিয়া ঝম্প প্রদান করিয়া ছিলেন আমার প্রাণ শত দিন কল্পনায় সেই উদ্বেলিত প্রেমসাগরে ঝম্প প্রদান করিয়াছে আজ চক্ষে যেন চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে। দেখিয়া একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে যদিও পুরী সমস্ত ভারতবর্ষের তীর্থ, এখানে কত লোক কত অর্থ দান করে, নগরটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও নির্ধন। লোক সংখ্যা ৬। ৭ হাজারের অধিক নহে। পাকা বাড়ী অত্যন্ত কম। অধিকাংশ বাড়ী কাদার দেওয়ালের উপর খড়ের চাল। আমরা অনেক লোক ছিলাম। উড়িষ্যায় সকলে মিলিত হইয়া দর্শন স্নান উপাসনা হয় নাই, ভক্ত বিশ্বাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে সমুদ্র স্নান ও ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। বিকালেই আমরা দশ বার জন পুরী হইতে ভুবনেশ্বর আসিলাম, কটকের নিকট বারং হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে হইয়াছে সেই রেল পথে বারং হইতে ৮ মাইল দূরে ভুবনেশ্বর ষ্টেশন, আমরা এই ষ্টেশনে নামিয়া গোযান যোগে এক ক্রোশ দূর ভুবনেশ্বর নামক তীর্থ স্থানে গমন করিলাম। ভুবনেশ্বর আজ কাল একটি ছোট রকম তীর্থস্থান মাত্র কিন্তু প্রাচীন কালে ইহা এরূপ ছিল না। প্রবল প্রতাপ কেশরী বংশের রাজাগণের রাজধানী এই ভুবনেশ্বরে ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ও সম্ভবত দক্ষিণভারতবর্ষেরও অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া ছিল, উড়িষ্যা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান স্থান ছিল। বুদ্ধ দেবের যে দন্ত আছে বলিয়া লঙ্কাতে কাণ্ডী একটি মহা বৌদ্ধ তীর্থ হইয়াছে সে দন্ত এই উড়িষ্যাতে ছিল এবং ক্রমে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্থান শৈব ধর্ম্ম অধিকার করিতে লাগিল তখন বৌদ্ধগণ বুদ্ধের দন্ত এদেশে রক্ষা করা আশঙ্কার বিষয় মনে করিয়া উহা লঙ্কা দ্বীপে লইয়া যান। উড়িষ্যাতে শৈব ধর্ম্ম এক দিনেই স্থাপিত হয় নাই। মনে হয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে কেশরী বংশের রাজাগণ শৈবধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু সকল প্রধান লোক ও প্রজাগণের ভয়ে তাহা প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিতে সাহস করেন নাই, কেবল যথা সাধ্য শৈবমন্দির স্থাপন ও শৈবগণকে আদর সম্মান করিয়া ক্রমে ক্রমে লোকের মনে শৈব ধর্ম্মের প্রতি আস্থা জন্মাইয়াছিলেন। এই অঞ্চলে এখনও শত শত শিব মন্দির আছে। হাণ্টর সাহেব বলেন পূর্ব্বে কালে এখানে ৫ হাজার শিব মন্দির ছিল। এই সকল মন্দিরের অধিকাংশই ভগ্ন দশায় আছে এবং ভগ্ন দশায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত। কোনটা ভূমিসাৎ হইয়াছে, কেবল ভিত্তির চিহ্নমাত্র আছে, কোন কোন মন্দিরের বাহিরে ইট্ সুরকীর সমস্ত কাজ পড়িয়াগিয়াছে কেবল পাথরের উপর পাথর বসান আছে। হঠাৎ দেখিয়া মনে হয় ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মধ্যে বৃহৎ গুহা হইয়াছে। এস্থানের প্রধান শিবমন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দির। এ মন্দির গঠনে ও উচ্চতাতে জগন্নাথ মন্দিরের তুল্য হইবে। ইহারও চারিদিকে অন্যান্য মন্দির আছে। এই সকল মন্দিরের বর্হিভাগে ও নানারূপ প্রস্তরে কাটা মূর্ত্তি আছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গায়ের মূর্ত্তি সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহার কার্য্যও শ্রেষ্ঠতর, লোকে বলিল মহাভারতের প্রধান প্রধান সমস্ত ঘটনা এই মন্দিরের বাহিরে মূর্ত্তি দ্বারা লিখিত আছে, আমরা দেখিয়াও কোন কোন যুদ্ধের দৃশ্য বুঝিতে পারিলাম। দেব মূর্ত্তি ও ঐতিহাসিক মূর্ত্তির আধিক্যের সহিত অশ্লীল মূর্ত্তির ও আধিক্য আছে। প্রভেদ এই ভুবনেশ্বরের অধিকাংশ অশ্লিল মূর্ত্তি জগন্নাথ মন্দিরের মূর্ত্তিগুলির ন্যায় অশ্লিল নয় কিন্তু মধ্যে মধ্যে এত অশ্লীল আছে যে জগন্নাথমন্দিরের মূর্ত্তি গুলিতে তত নীচ রুচি ব্যঞ্জক নহে। জগন্নাথ মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। ভুবনেশ্বর মন্দিরের কিছু হয় নাই। শুনিলাম কটকের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয় মনোযোগী হইয়াছেন এবং ছোটলাট উডবরণ সাহেব সরকার হইতে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া জীর্ণ সংস্কার করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই মন্দিরে বালুকা জাতীয় প্রস্তরের মূর্ত্তি গুলি এত খোসার মত ফাঁপা হইয়া গিয়াছে যে স্পর্শ মাত্রে খসিয়া পড়ে। কোন কৌশলে জীর্ণ সংস্কারের সময় এ গুলিকে রক্ষাকরা উচিত। এইরূপ বালুকা জাতীয় প্রস্তর গুলিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হাণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন এই মন্দির নির্ম্মাণ ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। কেশরী বংশের প্রথম রাজা নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন এবং চতুর্থরাজা শেষ করেন। ভুবনেশ্বরেও অনেক পাণ্ডা আছে কিন্তু রেলের রাস্তা খোলাতে

এখন অধিক লোক ভুবনেশ্বর দেখিতে যায় না, তাহাতে ইহাদের ব্যবসা ভাল চলে না।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি মুঙ্গেরের ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ রায় আর ইহলোকে নাই। দয়াময় পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মার সদ্গতি করুন, এবং তাঁহার বিধবা পত্নিও সন্তানগণের অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন। উক্ত ভ্রাতার খুল্লতাত আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত নবকুমার রায় লিখিয়াছেন।—

বিগত ১১ই ডিসেম্বর সোমবার রাত্রি ১২টার সময় শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ রায় এই নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। বয়ক্রম ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। উক্ত শ্রীমান্ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ক্রম হইতে আমার নিকটে থাকিয়া বিদ্যাজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি বি, এ বি, এল উপাধিধারী ছিলেন, মুঙ্গেরে ওকালতি করিতেন। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল; তাহার কারণ যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন প্রচারকদিগের সহিত যোগাযোগ হইয়াছিল। তিনি মিতভাষী, ইন্দ্রিয়জিত, সরল বিশ্বাসী, সচ্চরিত্র এবং জ্ঞানবান ছিলেন। এতদূর সত্যবাদী ছিলেন, যে মোকদ্দমা বুঝিয়া দেখিয়া লইতেন, যাহাতে মিথ্যা কথা বলিতে না হয়। এই জন্য তায় সমধিক হয় নাই। কোন প্রচারক মহাশয় মুঙ্গেরে আগমন করিলে, যতদূর সাধ্য তাহাদিগকে সম্মানের সহিত এবং ভক্তিভাবে সেবা করিতেন। হৃদয়ে পূজনীয় আচার্য্য দেবের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। প্রায় তিন বৎসর কাল ভয়ানক পক্ষাঘাত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বহু কষ্ট পাইয়া ছিলেন। উক্ত দুর্দান্ত পীড়া তিনবার তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাড়িত হইয়াছিল। বিগত শনিবাসরে ৯ই ডিসেম্বরে চতুর্থবার আক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার একজন পুরাতন ব্রাহ্ম বন্ধু সর্ব্বদা পীড়ার সময়ে তাঁহার নিকট থাকিতেন। মৃত্যুকালে বিশ্বাস সহকারে হরিনাম কর বলিয়া উচ্চরবে কর্ণের অতিশয় সমীপে হরিধ্বনী করিতে করিতে তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন যে দুই মুদিত চক্ষু খুলিয়া গেল ও আগ্রহ সহকারে যেন হরিধ্বনী শুনিতে লাগিলেন। তদনন্তর ঈশ্বর দর্শনের সুহাস্য ভক্তাস্যে উদিত হইয়াছিল। তাঁহার দাহক্রীয়া হইবার সময় অনেকে উক্ত সস্মিত বদন দেখিতে পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—

"গত ১০ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্নে এই লক্ষ্ণৌ নগরস্থ রেফাহেআম এসোসিয়েশন হলে "আশ্ররে এওতাদ" (সম্মিলনতত্ত্ব বিষয়ে উর্দ্দু ভাষায় একটী বক্তৃতা পড়া হইয়াছিল। উক্ত এসোসিএশনের সভাপতি শেখ মোহম্মদ রেজা হোসেন সাহেব সেই বক্তৃতার সভায় সভাপতি হইবেন, বিজ্ঞাপনে এরূপ উল্লেখ ছিল। কিন্তু তিনি পীড়াবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিবশতঃ প্রধান আদালতের উকিল সৈয়দ জহর আহম্মদ সাহেব এম্, এ, বি এল, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা পাঠ হইলে পর সভাপতি বক্তৃতার ভাবা ইত্যাদির প্রশংসা করিয়া উর্দ্দুতে এরূপ বলিলেন, "আমি একজন মোসলমান, বাবুসাহেব যখন কোরাণের অনেকগুলি আয়তের উল্লেখ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তখন সে বিষয়ে আমার মন্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমার বিশ্বাস তিনি নিজের মনোমত আয়ত সকলের অর্থ করিয়াছেন। আমাদের বিশেষ ধর্ম্ম, আমরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত সমভূমিতে উপস্থিত হইয়া একতা স্থাপন করিতে পারি না।" সেদিন বক্তৃতায় আশানুরূপ শ্রোতা হয় নাই। স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া লোকসংগ্রহের উপযুক্তরূপ চেষ্টা যত্ন হইতে পারে নাই তাহা উহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু এখানকার লোক সকল একান্ত বিলাসামোদপ্রিয়, সদ্বিষয়ের আলোচনায় যোগদানে তাঁহাদের অবকাশ অল্প। গতকল্য সোম বার অযোধ্যা ব্রাহ্ম সমাজের একত্রিংশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কল্য শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ বসুর গৃহে নারীসমাজের উৎসব হইয়া ছিল। এখানকার মণ্ডলীর অনেক সভ্যের মৃত্যু ও পতন জন্য মণ্ডলী অতিশয় দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।"

শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ বসুর মাতৃদেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত ভাই গৌরগোবিন্দ রায় হাজারীবাগে গমন করিয়াছেন।

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলপাড়ায় সাধু অঘোরনাথের সমাধি পার্শ্বে তাঁহার স্বর্গারোহণ দিন স্মরণার্থে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই উমানাথ গুপ্ত উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

সীমলা পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বেনেটোলার বাড়ীতে সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় সামাজিক উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বিগত ১লা ডিসেম্বর রাঁচি নগরে শ্রীমান্ বিহারিলাল বসুর নবকুমারীর জাতকর্ম্ম হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। পরম মাতা শিশুকে ও তাঁহার জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আগামী ১২ই পৌষ মঙ্গলবার আন্দুল "আত্মোন্নতী" সভার ষোড়ষ সাম্বৎসরীক উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মোপসনা হইবে। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

গত ২৭শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা ৯২নং হেরিসনরোড বাড়ীর উপাসনা গৃহে প্রীতিভাজন পাঞ্জাবী যুবক শ্রীমান্ গোপাল সিং চোওলা নবসংহিতানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। গোপাল সিং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ পাস করিয়া এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এবং প্রমথলাল সেন উপদেশ, দীক্ষার প্রশ্ন ও উপাসনা কার্য্য করিয়াছেন। গোপাল সিং বাঙ্গলা অনভিজ্ঞ, তাই প্রায় অধিকাংশ কার্য্য ইংরেজী ভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল। বিধানজননী নূতন দীক্ষিত ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করুন, সকল প্রকার পরীক্ষা প্রলোভনে তাঁহাকে রক্ষা করুন, স্বদেশে স্বজাতি মধ্যে তাঁহার জীবনে নববিধান জয়যুক্ত হউক।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আরাতে বাস করিতেছেন। তাঁহার বাঁকিপুর গয়া প্রভৃতি স্থানে যাইবার কথা আছে।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক ২রা পৌষ মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

৩৪ ভাগ।
২৪ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ, শনিবার, ১৮২১ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দীনশরণ, আমরা তোমার অভিপ্রায়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ নই এ কথা বলিয়া যে আমরা অন্ধের ন্যায় এ সংসারে জীবন কাটাইব তাহাতো কিছুতেই পারি না। তুমি আমাদের মনের ভিতরে কেমন একটা অভিলাষ স্থাপন করিয়াছ যে অভিলাষ তোমার কোন একটা অভিপ্রায় না বুঝিয়া কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। তোমার অভিপ্রায় ঠিক বোঝা হইল কি না, সে বিষয়ে কোন বিচার না করিয়া যাহা বুঝিল তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে মন যত্ন করে। ইহাতে অনেক সময়ে ভ্রম ঘটে বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিতে চায়, তাহার ভ্রম তুমি আপনি কাটিয়া দেও, এবং সে যাহাতে তাহার সম্বন্ধে তোমার কি অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, তদুপযুক্ত জ্ঞান তুমি আপনি তাহাকে বিতরণ কর। যদি এ জ্ঞান আমাদের না জন্মায় তাহা হইলে আমরা তোমার সন্তান কি প্রকারে হইব? পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া কে কবে পিতার বাধ্য সন্তান হইতে পারে? তুমি যদি তোমার সন্তানকে তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে না দিলে, তাহা হইলে তুমি তো তাহাকে তোমার সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিলে না। যত দিন মানুষ তোমার অভিপ্রায় না বোঝে, তত দিন তোমার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ঠিক হয় না। চন্দ্র সূর্য্যাদিকে তুমি যেমন তাহাদের অজ্ঞাতসারে চালাও তেমনি তাহাকে তুমি চালাইতে পার, কিন্তু এক জন সচেতনের সহিত অন্য আর এক জন সচেতনের সম্বন্ধ, তাহা তো হইল না? মানুষ হইয়া, সচেতন হইয়া, বিশিষ্ট জ্ঞান পাইয়া যদি তোমার সঙ্গে জড়োচিত সম্বন্ধই থাকিয়া গেল তাহা হইলে আর মানুষ হইবার কি প্রয়োজন ছিল, তুমিই বা কেন মানুষ করিলে? হে দেব, তাই তোমার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা হয়, কি করিলে আমরা তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারি। তুমি আমাদিগকে কৃপা করিয়া ইহা বলিয়া দাও। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তোমার ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়, এক অভিপ্রায়ের সঙ্গে আর এক অভিপ্রায়ের মিল নাই, এরূপ যদি হয় তাহা হইলে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে তোমার বিবিধ অভিপ্রায় বুঝিব, ইহাতো কোন প্রকারে সম্ভব নহে। তুমি কখন কোন্ অভিপ্রায়ে কি করিবে, ইহা জানিতে না পাইয়া আমরা ঘোর অন্ধকারে পড়িব। তুমি যেমন এক তেমনি তোমার অভি-

প্রায়ও এক। তোমার একটী অভিপ্রায় বিবিধ আকারে প্রকাশ পাইতেছে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিবিধ বাহ্য প্রকাশের ভিতরে তোমার সেই একই অখণ্ড অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। তুমি এক অখণ্ড অভিপ্রায়ে আমাদের সঙ্গে বিবিধ ব্যবহার করিতেছ তাই আমাদের নিকটে তোমার অভিপ্রায় বিবিধ বলিয়া মনে হইতেছে, উহা স্মরণে রাখিলে আমরা আর কখন তোমার অভিপ্রায় বহু মনে করিয়া গোলে পড়িতাম না। তাই হে কৃপানিধান, তব শ্রীচরণ সন্নিধানে এই ভিক্ষা করি, তুমি আমাদের সঙ্গে যখন যে প্রকার ব্যবহার কর, আমরা যেন তোমার সেই একই অভিপ্রায় হইতে তাদৃশ ব্যবহার উপস্থিত ইহা বিশ্বাস করিয়া সকল ভয় ভাবনা ও অযুক্ত সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারি। তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার এক অখণ্ড অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করিয়া নির্ভীক মনে সংসারে বিচরণ করিতে পারিব, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে বিনীতভাবে প্রণাম করি।

ধ্যান।

ধ্যান সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আমরা বিশেষ কিছু শিখি নাই, অথচ সকল দেশের সকল জাতির সাধকের নিকটে ধ্যান চিরদিন সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। কেবল ঈশ্বর সাধকগণই যে ধ্যানের অনুসরণ করেন তাহা নহে, যে কোন বিষয়ে সাধনের প্রয়োজন আছে, তাহাতেই ধ্যান নিরতিশয় আবশ্যক। বিজ্ঞানবিদ্গণ কখন বিজ্ঞানের নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিতেন না, যদি ধ্যানে তাঁহারা অভ্যস্ত না হইতেন। ধ্যান আর কি? বিরোধী চিন্তা হইতে মনকে অপসারিত করিয়া একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় লইয়া চিত্তের ব্যাপৃতি। বিজ্ঞানবিদ্গণও যে অতি যত্নের সহিত এই উপায়ের অনুসরণ করেন. ইহা আর কে না জানেন?

আমরা যে ধ্যানের কথা বলিতেছি, তাহাতেও বিরোধী চিন্তা দূরে পরিহার করিয়া চিন্তনীয় বিষয়ে চিত্ত স্থাপন ধ্যানের প্রথমাবস্থা। যিনি চিন্তায় প্রবৃত্ত তিনি তাঁহার সম্মুখে চিন্তনীয় বিষয় রাখিয়াছেন। প্রথম প্রথম ধ্যান এই প্রকারেই সাধিত হইয়া থাকে। আমি ধ্যাতা, ধ্যেয় আমার ঈশ্বর, তিনি আমার অন্তশ্চক্ষুর সমীপে বর্ত্তমান, এই ভাবে ধ্যান সাধারণ। এ ধ্যানের আমরা অবহেলা করিতেছি না, কেন না সকল সাধক সম্প্রদায়ে এই ধ্যানই প্রচলিত, 'আমিই তিনি' 'তিনিই আমি' অদ্বৈতবাদিগণের এ ধ্যানের আমরা অনুমোদন করি না, কিন্তু আমাতে তিনি, তাঁহাতে আমি ধ্যানের প্রথমাবস্থায় এ অভ্যাস প্রকৃত ধ্যানে প্রবেশের দ্বার ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি। অদ্বৈতবাদের মধ্যে কোন সত্য নাই এ কথা আমরা বলি না, আমরা এই বলি যে, আমিকে অপদার্থ করিয়া শূন্যের মত করিতে হইলে 'আমি তিনি' 'তিনি আমি' এরূপে ধ্যানসাধন নিষ্প্রয়োজন, আমাতে তিনি তাঁহাতে আমি, এই সাধনেরই পরিপক্কাবস্থায় যখন অনন্ত ঈশ্বর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হন তখন আর আমির শূন্যের মত হওয়া অবশিষ্ট থাকে না।

সর্ব্ববিধ সাধনের মূলে বিজ্ঞান ও দর্শন থাকা প্রয়োজন। আমরা বিশ্বাস ও দর্শনের বিরোধী সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বিকল্পবর্জ্জিত পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় সিদ্ধমনোরথ হইব তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। কল্পিত বস্তু লইয়া ধ্যান ধারণায় অনেকে বিলক্ষণ সুখানুভব করেন, এবং সুখের লালসায় কল্পনা ত্যাগ তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু আমরা সত্য অতিক্রম করিয়া সত্য বস্তু লাভ করিব ইহা যখন মনেও ভাবিতে পারি না, তখন আমরা আর সে কল্পিত পথ আশ্রয় করিব কি প্রকারে? সুতরাং ধ্যানেতেও আমাদিগকে এমন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে উহা বিজ্ঞান ও দর্শনসিদ্ধ হয়। এই আমি এই আমার ঈশ্বর, এরূপে সম্মুখে

ঈশ্বরকে ধারণ যদিও অসত্য নয়, কেন না আমার সম্মুখে আমার ঈশ্বর নাই, ইহা কখন হইতে পারে না, কিন্তু এখানে সত্যের একাংশমাত্র গ্রহণ করা হইতেছে বলিয়া এ সাধনকে আমরা সম্পূর্ণ দোষ-শূন্য বলিতে পারি না। সর্ব্বকালের সাধকেরা এরূপ সাধনের অনুমোদন করিয়াছেন। ঈদৃশ সাধনের মূলে সত্য আছে বলিয়া তাঁহাদের ইহা অনুমোদিত হইয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই।

আমরা যখন ধ্যান করিতে যাই, তখন আমাদের উদ্দেশ্য চিন্তা নহে, কিন্তু বস্তু প্রত্যক্ষ করা। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যে বস্তু অন্বেষণ করেন, তাঁহারা সেই বস্তু প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই বিরোধী চিন্তাসকল দূর করিয়া দিয়া চিন্তনীয় বিষয়ে চিত্তাভিনিবেশ করেন। ব্রহ্ম বস্তু প্রত্যক্ষ করা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে আমরা ধ্যানাদিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কল্পনাকে বিশোধিত করিয়া তদবলম্বনে অপ্রত্যক্ষ সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রয়াস পান, আমাদিগের পক্ষে কল্পনাকে দূরে অপসারিত করিয়া হৃদয়ে সত্যের সত্য অনন্ত ঈশ্বর আত্মপ্রকাশ করিবেন, ইহারই জন্যে ধ্যানমার্গ অবলম্বনীয়। বিজ্ঞান বহির্জগতের আবরণ উন্মোচনে আমাদিগের সহায়, দর্শন অন্তর্জগতে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিবার তত্ত্ব আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত করে। বিজ্ঞানও দর্শন দুইই ধ্যান সাধনে সহায় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অগ্রে দর্শনের সাহায্য না লইলে আমাদিগকে অত্যল্প সাহায্য করিতে সমর্থ হয়। ধ্যানে দর্শন আমাদিগের কিরূপে সাহায্য করে, সর্ব্ব প্রথমে আমরা তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব।

জ্ঞান ও জ্ঞেয় এ দুইয়ের তত্ত্ব দর্শনশাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। ঈশ্বর জ্ঞান, জীব ও জগৎ তাঁহার জ্ঞেয় আমরা যখন এরূপ নির্দ্ধারণ করি, তখন বিজ্ঞানবিদ্‌গণ আসিয়া আমাদিগকে বলেন, তোমরা ঈশ্বরকে জ্ঞান ও তাঁহার জ্ঞেয় জীব ও জগৎ নির্দ্ধারণ করিয়া ঈশ্বরকে আমাদের ন্যায় পরিমিত জীব করিয়া তুলিতেছ। জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় স্বতন্ত্র থাকা চাই, তাহা না হইলে জ্ঞান জানিবে কি? ঈশ্বরকে যদি জ্ঞান বল, আর জীব ও জগৎকে জ্ঞেয় বল, তাহা হইলে জীব ও জগৎ তাঁহার অতিরিক্ত হইল, ঈশ্বর পরিমিত হইয়া গেলেন। ঈশ্বরকে যদি জ্ঞান বলিতে চাও, তবে তদতিরিক্ত জ্ঞেয়বস্তু তোমায় আনিতেই হইবে, কেন না জানিবার বিষয় না থাকিলে জ্ঞানের অস্তিত্ব মিথ্যাও কাল্পনিক। যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে দোষশূন্য জ্ঞান অর্জ্জন করিতে চাও সত্তামাত্র বা শক্তিমাত্র স্বীকার কর, তাঁহাকে জ্ঞান বলিয়া আপনাদের মত করিও না। বিজ্ঞানের এই প্রতিবাদে দর্শনশাস্ত্রের উত্তর কি আমরা তাহাই দেখি।

দর্শন বলেন, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সারতত্ত্ব, এ দুই ছাড়িয়া চিন্তা কখন অগ্রসর হইতে পারে না। দর্শন এ সম্বন্ধে যে সকল বিচার করিয়াছেন ধ্যান-সম্বন্ধে সে সকলের প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন, সুতরাং এখানে ধ্যানোপযোগী দর্শনসিদ্ধ তত্ত্বের উদ্দেশ্য করিলেই যথেষ্ট হইল। জ্ঞান হইতে জ্ঞেয় স্বতন্ত্র নহে, জ্ঞেয় জ্ঞানের অন্তর্ভূত। জ্ঞেয় যতক্ষণ আমাদের জ্ঞানের অন্তর্ভূত নয়, ততক্ষণ জ্ঞেয় আমাদের নিকটে অজ্ঞেয় থাকে, যখনই উহা আমাদের জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইয়া গেল, তখনই উহা আমাদের জ্ঞেয় হইল। এ কথা যদি সত্য হয় জ্ঞেয় জ্ঞানের বাহিরে নহে তাহার অভ্যন্তরে, তাহা হইলে যত প্রকারের জ্ঞেয় আছে, তাহা অনন্তজ্ঞানের অন্তর্ভূত ইহা আমাদিগকে অবশ্য মানিতে হইবে। সমুদায় জ্ঞেয় অনন্তজ্ঞানের অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে, সমগ্র জ্ঞেয় আমাদের জ্ঞানের অন্তর্ভূত নহে, এ জন্য সেই অনন্তজ্ঞানের অন্তর্ভূত জ্ঞেয় সকল ক্রমান্বয়ে আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় করিয়া লইতে হয়। যখন একবার সেই অনন্তজ্ঞানে অবস্থিত জ্ঞেয় বিশেষ আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইল তখন সেই জ্ঞেয় আমাদের জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইল। এস্থলে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা নিজে সেই অনন্তজ্ঞানের একএকটি জ্ঞেয়। যখন কোন জ্ঞেয় আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইয়া আমাদের জ্ঞেয় হইয়া

যায়, তখন আমরা সেই জ্ঞেয় সহকারে অনন্তজ্ঞানের জ্ঞেয় হইয়া অবস্থান করি। এরূপ অবস্থায় ইহাই মানিতে হইতেছে, আমাদের জ্ঞানের সমুদায় বিষয় লইয়া আমরা অনন্তজ্ঞানেতেই নিত্য স্থিতি করিতেছি, আমরা কোন কালে তাঁহার বাহিরে অবস্থিত নহি। সুতরাং আমরা অনন্তজ্ঞানে স্থিতি করিতেছি, আমাদের জ্ঞানের সমুদায় বিষয় লইয়া অনন্তজ্ঞান আমাদিগেতে স্থিতি করিতেছেন, এই দ্বিবিধ ভাব আমাদিগের ধ্যানসাধনে সহায়। যখনই আমরা ধ্যানে আমাদিগকে ঈশ্বরেতে প্রবিষ্ট দেখি তখনই দেখি তিনি আমাদের জ্ঞানের সমুদায় বিষয় লইয়া আমাদিগেতে বিদ্যমান। আমরা চিন্তার সাহায্য জন্য ধ্যানের শেষাংশ চিন্তাপথের বহির্ভূত করিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু বহির্ভূত করিয়া রাখিলেও উহা যে সেখানে তখন লুক্কায়িত ভাবে আছে তাহাতে আর সংশয় কি? যখন কোন জ্ঞেয়ই অনন্ত জ্ঞানের বহির্ভূত নহে, সুতরাং অতিরিক্ত নহে তখন আমরা যে সকল জ্ঞেয় আত্মস্থ করিয়াছি, সে সকল ধ্যানের সময়ে তাঁহার বহির্ভূত হইয়া থাকিবে কি প্রকারে? তবে নিকটে থাকিতেও আমাদের মন তাহাতে সংযুক্ত না করিলে উহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না, এই নিয়মে চিন্তাপথের বহির্ভাগে রাখিতে পারি, এই মাত্র বিশেষ।

দর্শন ধ্যান সম্বন্ধে আমাদিগের কি সাহায্য করেন তাহা এক প্রকার উল্লিখিত হইল, এখন বিজ্ঞান কি সাহায্য করেন আমাদিগের তাহা দেখিতে হইতেছে। দর্শন অনন্ত জ্ঞানকে লইয়া ব্যাপৃত, বিজ্ঞান জ্ঞেয় সকলের তত্ত্ব নির্দ্দেশে নিযুক্ত। জ্ঞেয়সকলের ভিতরে অনন্ত জ্ঞানের ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া জ্ঞেয় সকলকে স্বচ্ছ কাচের মত করিয়া দেওয়া বিজ্ঞানের কার্য্য। যাহা স্থূলদর্শিগণের নিকটে স্থূল ছিল, একটু মাত্র জ্ঞানের চিহ্নও যাহাতে আজ পর্য্যন্ত তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ পায় নাই, বিজ্ঞান আসিয়া দেখাইয়া দিল, যাহা স্থূল ও জ্ঞানচিহ্নবিবর্জ্জিত তাহা স্থূল ও জ্ঞানলক্ষণ বিবর্জ্জিত নহে, এক অনন্ত জ্ঞান আপনার জ্ঞান এই সকলের ভিতর দিয়া জীবগণের নিকটে প্রকাশ করিতেছেন। যাহাকে স্থূলজগতের সৌন্দর্য্য বলা যায়, উহা আর কিছু নহে জগতের জ্ঞানের বিচিত্র সন্নিবেশ, জ্ঞানই আপনার ভিতরকার সামঞ্জস্য জগতে প্রকাশ করিতেছেন, সেই সামঞ্জস্য আপনাদের মনে সৌন্দর্য্য রূপে প্রতিভাত হইতেছে। বিজ্ঞান যতই সর্ব্বত্র জ্ঞানের বিচিত্র সন্নিবেশ দেখান ততই সেই অনন্তজ্ঞান বাহিরেও আমাদের অন্তরে উপলব্ধির বিষয় হন। অন্তরে যে ধ্যানের আরম্ভ হইয়াছিল, এখন সে ধ্যানের অধিকার বহির্জগতে বিস্তৃত হইল। বিজ্ঞান আমাদিগকে এ সম্বন্ধে সাহায্য দান করিলেন বলিয়া আমরা ধ্যান সম্বন্ধে তাঁহারও নিকটে ঋণী, এবং বিজ্ঞানবিদ্গণের নিকটে এই জন্য চিরকৃতজ্ঞ।

মৃত্যুচিন্তা।

আমাদের প্রাণের প্রিয়তমগণ একটি একটি করিয়া যবনিকার অন্তরালে লুকাইতেছেন। এ পৃথিবীতে তাঁহাদিগের যতটুকু অভিনয় করিবার ছিল ততটুকু শেষ হইবা মাত্র যবনিকা পড়িল, তাঁহারা রঙ্গভূমির অন্য অংশে অভিনয় করিবার জন্য নীত হইলেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির রঙ্গভূমি এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে বদ্ধ নহে, অসীম আকাশস্থ অসীম জগৎ তাঁহার লীলাক্ষেত্র, সুতরাং সে সকলই তাঁহার রঙ্গভূমির অন্তর্ভূত। অভিনেতৃগণ এখানে অভিনয় শেষ করিলেই তাঁহাদের অভিনয় শেষ হইল, উহা আমরা কখনই বলিতে পারি না। তাঁহাদের প্রতিজনের জীবন ইহাই দেখাইয়া দিতেছে যে তাঁহারা এখানে অভিনয় শিক্ষা করিয়া যতটুকু কৃতকার্য্য হইলেন সেই পর্য্যন্ত অভিনয়ের শেষ নহে, আরও অভিনয়ের শেষ রহিয়াছে, ইহাই দেখাইয়া তাঁহারা সহাভিনেতৃগণের নিকটে বিদায় লইলেন। তাঁহাদিগেতে যে জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যের স্ফূর্ত্তি লাভ করিল সে সকল আরও স্ফূর্ত্তি লাভ

করিবার উপযোগী থাকিতে থাকিতে তাঁহারা বিদায় লইলেন, আর যাইবার বেলা নিঃশব্দে বলিয়া গেলেন, দেখ আরও কার্য্য করিবার অবশেষ থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মাণ্ডপতি আমাদিগকে ডাকিয়া লইলেন, মনে করিও না তিনি আমাদের জীবনের কার্য্য এখন অবশিষ্ট থাকিতে দিবেন। যদি ব্রহ্মাণ্ডপতির এই একটিমাত্র কার্য্যক্ষেত্র হইত, তাহা হইলে, ভাই, বলিতে পারিতে আমাদের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, আমাদের আর কার্য্য করিবার অবকাশ রহিল না। তোমরা আমাদের মৃত্যু দেখিতেছ এ তো মৃত্যু নয় এখানকার জীবনের কার্য্য করিয়া সেই জীবনের অপরাংশে যাহা করিবার তাহাই করিতে চলিলাম। আমরা অনন্তের সন্তান, অনন্ত আমাদের জীবন। তোমরা কেন রোদন করিতেছ, সংশয় করিতেছ, এই তো হাসিতে হাসিতে চলিলাম, যদি এই পর্য্যন্ত জীবন শেষ হইত, আমাদের মুখে হাসি কখন তোমরা দেখিতে পাইতে না।

যাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন তাঁহারা নিঃশব্দে আমাদিগকে যাহা বলিয়া যাইতেছেন, তৎপ্রতি আমাদের কর্ণপাত করা সমুচিত। বুদ্ধ বলিতেছেন, সর্ব্বদা মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া সংসার কর, মৃত্যুচিন্তা যেন কখন তোমাদিগকে পরিহার না করে। মৃত্যুচিন্তা সেকালে ভীষণ ছিল, কেবলই অনিত্যতা স্মরণ করাইয়া দিত। সেই অনিত্যতা স্মরণে নিত্য বস্তুর অন্বেষণে জীবের প্রয়াস প্রযত্ন উপস্থিত হইত। এখন মৃত্যু অনিত্যতা স্মরণ না করাইয়া দিয়া নিত্যতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে, এ পরিবর্ত্তন কি সামান্য পরিবর্ত্তন। নববিধানের ঈশ্বর এই পরিবর্ত্তন যথা সময়ে আমাদিগের চিন্তার মূলে স্থাপন করিয়াছেন, তদনুসারে আমরা যখন মৃত্যুচিন্তা করি, তখন অনিত্যতা আমাদিগের চক্ষুর সন্নিধানে প্রতিভাত না হইয়া অনন্ত জীবন নিত্য জীবন আমাদের অন্তশ্চক্ষুর নিকটে প্রকাশ পায়। "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" ব্রাহ্মসমাজ এই সঙ্গীতে আরম্ভ হইয়াছিল, এখন তাহার পরিণতি হইল "কি সুখের মরণ, কে বলে মরণ এতো নূতন জীবন" এই সঙ্গীতে। ব্রাহ্মসমাজের ঈদৃশ পরিণাম কি মানবজাতির পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের বিষয়? মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন পিতার গৃহে অনেকগুলি গৃহ আছে, নববিধান আসিয়া সংবাদ দিলেন, "ওখানে গেলে সকলেরই গান বাজনা করিতে হইবে। কেহ ছোট সুরে, কেহ বড় সুরে, নারীরা ছোট সুরে।......অত্যন্ত মনোহর সুমিষ্ট বাদ্য গানে ঘর পূর্ণ হইবে।...... সকলে না গেলে হয়তো মোটা সুর থাকিবে না হয়তো সরু সুর থাকিবে না, নয়তো যোগ থাকিবে না, নয়তো ভক্তি থাকিবে না।......অতি দীন হীন গরিব তার ঘরও সাজান হয়েছে, তার ঘরেও নববিধান আছেন।" যিনি গেলেন তিনি গিয়া তাঁহার অভিনয়াংশ আরম্ভ করিলেন, তাহার পর সেখানে যাঁহার অভিনয়ের অংশ আছে, তিনি যাই আহূত হইবেন, অমনি এখানকার যবনিকা পড়িবে, সেখানকার যবনিকা উত্তোলিত হইবে। তিনি সেখানকার রঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া এখানকার শিক্ষিত অভিনয়ের পরিচয় দিবেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন অভিনয়াংশ শিক্ষা করিতে থাকিবেন, ইহা কি সামান্য শুভসংবাদ!

মৃত্যুপ্রচারিত এই শুভসংবাদ কে আমাদিগকে প্রথমতঃ দিলেন? আচার্য্য কেশবচন্দ্র। তাঁহার যোগপ্রধান জীবন মৃত্যুকালে হাস্যবিকশিত মুখকমল দেখাইয়া সকলের সন্তাপ হরণ করিয়াছিল, এবং যাহা মুখে বলিয়াছিলেন তাহা জীবনে দেখাইয়া সকলকে চির আশ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। মৃত্যুচিন্তা এখন আরামপ্রদ। বন্ধুগণের, সন্তানগণের, প্রিয়জনগণের মৃত্যু এখন ভীষণ সংবাদবহন করে না। স্বর্গধামের অনন্তধামের একতান সঙ্গীতের আরম্ভ দেখাইয়া তচ্চিন্তনে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে। হে মৃত্যু, তুমি বন্ধু, তোমার চিন্তন মননে অপূর্ব্ব সুখের উদয় হয়, তুমি অনন্তধামের যাত্রিগণকে আস্তে আস্তে সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া পরপারে লইয়া উত্তীর্ণ কর, গমনোদ্যত ব্যক্তিকে আহলা

মানবমানবীর নয়নপথের অন্তরালে লইয়া যাও, কাহারও অপবিত্র সংসারাসক্ত নয়ন যেন তাহাদের উপরে নিপতিত না হয়, এজন্য যেন ঘোর আবরণে তাহাকে আবৃত করিয়া ফেল। স্থূলেন্দ্রিয়ের অগোচর আত্মাকে স্থূলেন্দ্রিয়ের অবিষয় করিলে, কিন্তু যে চক্ষু স্থূলাতীত যে চক্ষু আরও উজ্জ্বলরূপে অন্তর্হিত আত্মাকে দেখিতে পায় তাহাকে তুমি দেখার বিষয় করিলে ইহাতে তুমি সাধকগণের চির আশীর্ব্বাদভাজন, কে তোমায় আর এখন অভিশাপ দিবে? হে মৃত্যু, তুমি আমাদিগের চিন্তনীয় হও, এবং তোমার চিন্তা আমাদিগের আশা ও বিশ্বাস, শান্তি ও আনন্দ বর্দ্ধিত করুক। যাঁহাদিগকে তুমি লইয়া যাও, তাঁহারা তুমি যে শুভসংবাদ বহন করিতেছ, নিঃশব্দে আমাদিগকে তাহা দিয়া গিয়া কৃতার্থ করুন। আমরা বীতশোক বীত ভয় হইয়া এখানকার অভিনয় শেষ করি, এবং সেই সুখধামের অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বুদ্ধি। বিবেক, তুমি বল, তুমি ভগবানের অভিপ্রায় জীবগণের নিকট প্রকাশ কর। ভগবানের অভিপ্রায় অতি গভীর, মনুষ্য বুদ্ধির অতীত, তাহা তুমি জীবের নিকটে প্রকাশ কর ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার অধীন ব্যক্তিগণ ভগবানকে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে কিছুই আর অপ্রকাশিত নাই। এ অভিমান কি তোমার পক্ষে সঙ্গত?

বিবেক। ভগবানের অভিপ্রায় আমি প্রকাশ করি, ইহা আর একটা নিন্দার কথা কি? ভগবানের অভিপ্রায় প্রকাশ করি বলিয়া তাঁহাকে লোকের বুদ্ধির আয়ত্ত করিয়া দি, তিনি যে বুদ্ধির অতীত, এ কথা অপ্রতিপন্ন করি, এত দূর সিদ্ধান্ত করিবার পক্ষে তুমি কি কারণ পাইয়াছ, আমায় বলিতে পার? তোমার অনুগত লোকেরা 'ভগবানের অভিপ্রায়' এ কথা শুনিলেই উপহাস করেন, তিনি বুদ্ধির অগম্য ইহা প্রচার করিয়া লোকদিগকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করেন, অথচ প্রকৃতির সকল কার্য্য পাকতঃ সেই অনন্ত শক্তির এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন না। এরূপ কথা বলিয়া তাঁহারা ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে, আমি যে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি, পাকতঃ তাঁহারা তাহাই করেন, তবে ভীরুতা বশতঃ 'অভিপ্রায়' এই শব্দ উচ্চারণ করেন না। এরূপ ভীরুতার কারণ আর কিছুই নয় কেবল এই যে যাঁহাদিগকে তাঁহারা ঘৃণা করেন, পাছে বা লোকে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দলস্থ বলিয়া মনে করে। তোমার শরণাপন্ন লোকদিগের এ ভীরুতা দেখিয়া বাস্তবিকই নিতান্ত ক্লেশ হয়। প্রকৃতির সকল কার্য্য ঈশ্বরের ইহা বলাও যাহা, তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপনও তাহা, এই সামান্য কথা কি তুমি বোঝ না?

বুদ্ধি। কৈ আমি তো বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি আমায় বুঝাইয়া দাও দেখি।

বিবেক। আমি তোমায় চির দিন বলিয়া আসিয়াছি, বিজ্ঞান ও বিবেক এ উভয় ঈশ্বরের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা জ্ঞাপন করে, সুতরাং বিজ্ঞানও আমাতে কোন বিরোধ নাই। বিজ্ঞানবিদ্গণ আমার লোকদিগকে না বুঝিতে পারিয়া নিন্দা করেন, ইহাতে তাঁহারা অবশ্য কৃপাপাত্র। প্রকৃতির কার্য্য ঈশ্বরের কার্য্য একথা বলিয়াও তাঁহাদের নিন্দা করিবার কারণ এই যে, তাঁহারা বাহ্য প্রকৃতিকেই প্রকৃতি বলেন, আন্তরিক প্রকৃতি বলিয়া যে কিছু আছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। বাহ্য ও অন্তর এ উভয় লইয়া যদি তাঁহারা এক অখণ্ড প্রকৃতি স্বীকার করিতেন তাহা হইলে কোন বিরোধের কারণ ছিল না, কিন্তু তাঁহারা বাহ্যদর্শী হইয়া অন্তরকে একেবারে ভুলিয়া যান এই তাঁহাদের মহান্ দোষ। অন্তর ও বাহ্য এ দুই এক অখণ্ড হইয়া আছে এক ভগবানেতে, এরূপ দৃষ্টিতে অন্তর ও বাহির এ দুইয়ের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্গণ সে পথ ছাড়িয়া বিজ্ঞান ও আমাতে বিরোধ নাই অথচ বিরোধ কল্পনা করিয়া লোকদিগকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন। বাহ্য প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি ঈশ্বরের হইল, অর্থাৎ সে গুলি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইল, তাহা হইলে অন্তরের প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পায় তাহাও ঈশ্বর হইতে, এবং উহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় একথা বলাতে ক্ষতি কি?

বুদ্ধি। থাম, থাম, প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পায় তাহা পাকতঃ ঈশ্বরের, একথা বলাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় আসিল কি প্রকারে? তোমার সিদ্ধান্তগুলির ভিতরে এত ঘোর পেচ থাকে যে, লোকে তাহার ভুল ধরিতে পারে না বলিয়া তুমি বাঁচিয়া যাও।

বিবেক। তুমি না বুঝিয়া হঠাৎ একটা বলিয়া ফেল এই তোমার দোষ। প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পায়, এ কথার ভিতরে একটা অন্ধকার প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া বিজ্ঞানবিদ্গণ লোকের চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলেন, তুমিও দেখিতেছি তাহাতে অন্ধ হইয়াছ। প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পায় তাহা কি? শক্তি? শক্তি বলিলে সব কি বলা হইল তুমি মনে কর? প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ পাইবে তাহার মানব মানবীর সহিত কোন সম্বন্ধ আছে অথবা সম্বন্ধ নাই? যদি কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে তাহার আলোচনা বৃথা। যদি সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে যাহা প্রকাশ পায় তাহা মানবমানবীর জীবনের উপযোগী, ইহা তোমাকে অবশ্য মানিতে হইবে। যাহা তাহাদের জীবনের উপযোগী এবং যদনুসারে তাহাদিগকে চলিতে হইবে, তাহাকেই তাহাদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায়

বলিতে হইবে। যাহা অন্তর ও বাহিরের প্রকৃতিতে প্রকাশ পায়, তদনুসারে নরনারী আপনাদের জীবন নিয়মিত করিলে তাহাদের কল্যাণ হইবে একথা বিজ্ঞানবিদ্গণ স্বীকার করেন। এ 'স্বীকারে' এই স্বীকার হয় যে, ঈশ্বরের এক কল্যাণাভিপ্রায় বিবিধ রূপে প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে বিজ্ঞান তাহা বাহ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে, আমি তাহা অন্তরপ্রকৃতি সম্বন্ধে লোককে জ্ঞাপন করি। বল আমি হঠাৎ কেন সিদ্ধান্ত করিলাম? যে এ সিদ্ধান্তের অতি দৃঢ় ভিত্তি আছে?

বুদ্ধি। তুমি আমায় আজ নিরুত্তর করিলে, কিন্তু তোমার এত পেচাও কথা সাধারণ লোকে বুঝিবে কি প্রকারে, আমি কেবল ইহাই ভাবি।

উপাসনাবাস।

আদর্শ।

১৮ই অগ্রহায়ণ রবিবার ১৮২১ শক।

সকল ধর্ম্মার্থীর সম্মুখেই একটা মহাচিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। আপনার কার্য্য কে আপনি সন্তুষ্ট? আপনার জীবনকে আপনার লক্ষ্য সিদ্ধি, কেই বা মনে করিতে পারে? যেমন শুকতারা দেখিয়া অন্ধকারে নাবিক নৌকা চালায় তেমনি প্রতিদিন চক্ষের সম্মুখে এক ধ্রুবতারা উদিত হইয়া আপনার দিকে তার নৌকা আকর্ষণ করিতেছে। যার আলোক যেমন, যার আদর্শ যেমন তার জীবনও তেমনি। কিন্তু আদর্শ বিনা মানুষ আছে ইহা মনে করিতে পারি না। যার ধনী হইবার ইচ্ছা তার আদর্শও তেমনি আছে, জ্ঞানীরও জ্ঞানের আদর্শ আছে আর ধার্ম্মিকের ত কথায় কাজ নাই। আদর্শ বিনা ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় না। এই আদর্শ কেবল ঈশ্বরেতে আবদ্ধ নহে কিন্তু তাঁহা হইতে অবতীর্ণ হইয়া মানুষে আসিয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, মহম্মদ, শাক্য ইঁহারা আমাদের নয়নগোচর নহেন কিন্তু কত কত লোকের জীবনের লক্ষ্য হইয়া তাহাদের জীবন গঠন করিতেছেন। আমরা আজ তাঁহাদের মধ্যে এক জনের উপদেশ অনুসরণ করি; ঈশা বলিলেন "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ তোমরাও তেমনি পূর্ণ হও।" মানুষ যে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে তাহা একদিন ব্যাখ্যা করিয়াছি; সে বিষয়ে আর বলিবার নাই। কিন্তু এই বলি যে পূর্ণব্রহ্ম আদর্শ হইয়া, গম্য স্থান হইয়া, দৈনিক লক্ষ্য হইয়া যার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই পূর্ণ। কিন্তু যতই পৃথিবীর পথে নামিবে ততই প্রতিমুহূর্ত্তে দেখিবে তোমার লক্ষ্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে। তুমি যদি জ্ঞানী হইতে চাও দেখিবে সংসার অজ্ঞানী এবং সেই অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করিয়া এতই অহঙ্কারী যে তোমার যথার্থ জ্ঞানকে তাচ্ছিল্য করিবেই করিবে। তুমি যদি দেশহিতৈষী হইতে চাও তুমি যদি দেশের জন্য ধন ক্ষতি, মান ক্ষতি এমন কি আয়ু সংক্ষেপ পর্য্যন্ত কর তবু দেখিবে যাহারা তোমার লক্ষ্যের অংশী নয় তাহারা তোমার সিদ্ধির পথে অন্তরায় হইবেই হইবে। অতএব আদর্শ যাহার উচ্চ প্রতিবন্ধকও তার তেমনি বেশী; সমস্ত অবস্থা তার প্রতিকূল। সুতরাং তার নিরাশ হইবার কারণ চারিদিকেই। এই জন্য অনেকে উচ্চলক্ষ্য লইয়া জীবনারম্ভ করে কিন্তু কিছুকাল পরেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু কতকগুলি লোক পাওয়া যায়, যারা যতই পৃথিবীর অননুকূলতা পায় কোথায় নিরাশ হইবে, না আপনাদের বিশ্বাসের বলে, চরিত্রের জোরে সেই বিপরীত স্রোতকে অনুকূল করিয়া লয়। তোমরা জান যে নৌকা চালনের শাস্ত্র আজকাল এমনি হইয়াছে যে নাবিক সহজেই বিপরীত স্রোতকে অনুকূল করে, প্রতিকূল বায়ুকেই অনুকূল করিয়া আপনার গম্য স্থানে নৌকা লইয়া যায়। আমি যে লোকের কথা বলিতেছি তাঁরাও সেইরূপ। সংসারের বিপরীত ঘটনা, লোকের দৌরাত্ম্য ও বিপক্ষতাচরণকে তাঁরা জ্ঞানকৌশলে এবং ভগবৎ কৃপায় স্বপক্ষ করেন। যেরূপ অবস্থার ভিতরেই পড়ুন না কেন সেই অবস্থাকেই অবলম্বন করিয়া আপনার লক্ষ্য সিদ্ধি করিয়া লয়েন। যেমন লোকের ভিতরেই থাকুন না কেন শত্রুই হউক আর মিত্রই হউক সকল লোকেই তাঁদের লইয়া গম্য স্থানে পৌছাইয়া দেন। সংসারে যার যা ইচ্ছা হয় সেই কি তা পায়? যে ধন চায় প্রথমতঃ তাকে কত কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। যারা ধর্ম্ম চায় তাদেরও অবস্থা সেইরূপ; কিন্তু ঈশ্বরের আশ্চর্য্য প্রভাব এই যে শত্রুতাই তাহার ধর্ম্মপথের সহায় হয়; হয় ত অত্যন্ত অভাবনীয় ভয়ানক ঘটনাই তাহার লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় হয়। অতএব বলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না। আদর্শ কখনও কমাইবে না; আর যদি উচ্চ চিত্ত না থাকে শীঘ্রই কোথা হইতে আনিয়া লও।

কিন্তু কি প্রকারে মানুষ বিপরীতকে অনুকূল করে। প্রথমে আপনার লক্ষ্যকে স্থির করিবে; পরে সেই লক্ষ্যের ভিতরে আপনার জীবনকে ফেলিবে। যদি তুমি জ্ঞানী হইতে চাও আর যদি লোকে তোমাকে সাহায্য না করে তবে তুমি যে জ্ঞান পাইয়াছ সেই জ্ঞানের ভিতরে তোমার জীবনকে ফেল; সেই জ্ঞানকে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে উপলব্ধি কর। ধর্ম্মের আদর্শ যদি তোমাকে যথার্থই আকর্ষণ করিয়া থাকে, যদি পূর্ণ হইবার জন্য দেহ মনকে উৎসর্গ করিয়া থাক তবে প্রথমতঃ আদর্শকে আরও দৃঢ় কর, দ্বিতীয়তঃ সকল অবস্থাকেই অনুকূল কর; তৃতীয়তঃ অভ্যাস কর যে তোমার আদর্শ যেন তোমার গৃহ হয়, তোমার আদর্শ যেন তোমার নিশ্বাস প্রশ্বাস হয় এবং প্রতিদিনের কার্য্যের মধ্যে তোমার আদর্শ যেন ঠিক থাকে এবং যে লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য জীবন দিয়াছ সেই লক্ষ্যের ভিতরে স্থিতি কর। যখন মহাত্মাগণ নিজ নিজধ্যানে মগ্ন ছিলেন তখন কজন তাঁহাদের সহায় ছিল? নিরঞ্জনা নদীতীরে শাক্য যখন মহানির্ব্বাণের কথা ভাবিতেছিলেন তখন বালকগণ তাঁহার প্রতি কত অত্যাচার করিয়াছিল; কত প্রস্তর ও

কর্দ্দম নিক্ষেপ করিয়াছিল। যদি সে অত্যাচার তিনি নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন তিনি কখনও সিদ্ধ হইতেন না; কিন্তু তিনি তাঁহার আদর্শের মধ্যে গভীরতর রূপে মগ্ন হইলেন। তাহাতে প্রথমতঃ অত্যাচার নিবারণ হইল এবং দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। এ সময়ে যখন আদর্শের হতাদর দেখিতেছি, বন্ধুর যখন আশা নাই, যদি রক্ষা পাইতে চাও, মানুষ হইতে চাও তবে আদর্শকে অতি উজ্জ্বল কিরণে আবৃত করিয়া বরণ কর, তাহার মধ্যে বাস কর, তাহাতেই কালযাপন কর এবং দৈনিক শান্তি ও সন্তোষ উপার্জ্জন কর। যদি ইহা করিতে পার শত্রুতাই তোমার লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় হইবে; যে অবস্থাকে আঘাত মনে করিয়াছিলে তাহাই তোমার গমাধামে যাইবার সোপান হইবে; যে সকল প্রবৃত্তি তোমাকে বাধা দিত তাহারাই তোমার দাস দাসী হইয়া সেবা করিবে। মনে করিও না যাহারা তোমাকে সহানুভূতি না দেয় ঈশ্বর তাহাদিগকে চেনেন না। তাঁহার দ্বারায় আদিষ্ট হইয়াই মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করে; তুমি জানিও তোমার যাহা ঘটিয়াছে তাহা তিনিই করিয়াছেন; তোমাকে মানুষে মারে নাই তিনিই মারিয়াছেন। কিন্তু, হে মনুষ্য, তুমি জান পরমেশ্বর আঘাত করেন তোমার ত্রাণের জন্য, বিনাশ করেন তোমার লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য। অতএব তুমি নিরাশ হইও না; উচ্চলক্ষ্য ছাড়িও না; কিন্তু সমুদায় অবস্থার প্রতিঘাত সত্ত্বেও, সমুদয় পৃথিবীর বৈপারীত্য থাকিতেও বিশ্বাস বেলে, আদর্শের মধ্যে স্থিতি করিয়া শত্রুকে বন্ধু কর, জগৎকে ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র মনে কর, সকল অবস্থাকেই তোমার সহায় মনে কর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে তোমার লক্ষ্য সিদ্ধি হইবে।

হে পরম পিতা কাহারও শত্রু না হইয়া এত শত্রুদল কোথা হইতে আনিয়াছি? কাহারো উপর জেনে শুনে কুভাব পোষণ না করিয়া কেমন করিয়া অন্যের কুদৃষ্টিতে পড়িয়াছি? ক্ষমা করিয়া কেন ক্ষমা পাইলাম না? প্রেম করিয়া সহানুভূতি পাই নাই কেন? মনে করিয়াছিলাম তোমার ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া অবস্থার অনুকূল বায়ুতে পার হইয়া তরী তোমারই ঘাটে আসিয়া লাগিবে। কিন্তু হায়! এতদিন ধর্ম্মক্ষেত্রে বাস করিয়া বিপরীত হল! এখন আর কার নিকট অভিযোগ করিব। বুঝিতেছি এ সব তোমারই কৌশল, তোমারই অভিনয়। এই ক্ষীণ শরীর ভিতরে যদি সমুদয় অনুকূল করিয়া দিতে তবে কে প্রার্থনা করিত, কে তপস্যা করিত কেই বা ধ্যান করিত? এই জন্য নানা প্রকার লোক আনিয়া আদর্শের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করিলে। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমাদের এই প্রার্থনা শুনিয়া রাখ তোমাকে যেন বন্ধু বলিয়া ডাকিতে পারি এবং এই প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে, চিরকালের আশ্রয়, যেন দিন দিন তোমার আশ্রয় ছায়ায় মস্তক রাখিতে পারি। হরি, তুমি যার বন্ধু তার আর শত্রু কে? তোমার প্রেম যার অনুকূল তার আর প্রতিকূল কি? যদি তোমার সঙ্গে বিশ্বাস যোগে থাকিতে পারি তবে আর ভয় কি? অতএব তুমিই আমাদের চিরকালের বন্ধু হও, সহায় হও, জীবনের লক্ষ্যকে উজ্জ্বল বর্ণে বিবেক পটে সুচিত্রিত করিয়া রাখ। তুমি দুর্ব্বলগণকে যে ইচ্ছায় পাঠাইয়াছিলে তোমারই বলে যেন তাহা পূর্ণ করিতে পারে; আমাদের সকলের মস্তকে তোমার নিত্যাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক প্রেম ভক্তি ও আশার সহিত বার বার তোমাকে নমস্কার করি।

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী হইতে প্রাপ্ত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৭ই কার্ত্তিক সোমবার সকালে আমরা বৌদ্ধ কীর্ত্তি খণ্ড গিরি ও উদয় গিরি দেখিতে পশ্চিম মুখে যাত্রা করিলাম। গোযানে ৬ মাইল পথ যাইতে বেলা হইল। রাস্তার দুধারে কেবল জঙ্গল। ইংরেজ বাহাদুরের সুন্দর পথ দিয়া যাইতে জঙ্গলকে অগ্রাহ্য করা সহজ কিন্তু রাস্তাটি হইবার পূর্ব্বে ভুবনেশ্বর হইতে খণ্ড গিরিতে যাইতে কেবল বন ভূমি দিয়া যাইতে হয় এ কথা মনে করা প্রয়োজন। ভুবনেশ্বর পূর্ব্বকালে একটি বড় নগর ছিল এবং উড়িষ্যায় অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানে বৌদ্ধ ধর্ম্মই প্রধান ছিল। বুদ্ধ দেবের দৃষ্টান্তে তাঁহার শিষ্য ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেন এবং নির্জ্জন বনে বা পর্ব্বতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। যে সকল বৌদ্ধভিক্ষু এ অঞ্চলে বাস করিয়া ছিলেন তাঁহারা এই দুইটি ক্ষুদ্র গিরিতে সামান্য গুহা করিয়া ধ্যান চিন্তা করিতেন এবং বনভূমি অতিক্রম করিয়া ভুবনেশ্বরে ভিক্ষা করিতে আসিতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সাধন স্থান মনোনীত করিবার এই প্রকার রীতিই ছিল। উদয় গিরিতে পৌছিতে আমাদের প্রায় ৮টা বেলা হইল। এই দুইটি ক্ষুদ্র গিরি একটি পাকা রাস্তার দুই ধারে, পরস্পর অত্যন্ত নিকট। পূর্ব্ব পশ্চিমে রাস্তা। রাস্তার ডান দিকে উদয়গিরি—আমরা প্রথমে উদয়গিরিতে চড়িলাম। চড়িবার সময় একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মূর্ত্তিকে পাহাড়ে চড়িতে দেখিলাম কিন্তু তিনি কোন্ গুহায় লুকাইলেন আর দেখিতে পাইলাম না। আমাদের পথপ্রদর্শক ভুবনেশ্বরের একটি পাণ্ডা ছিল সে এস্থানের বিশেষ কিছু সংবাদ রাখে না—আমাদের প্রধানত হাণ্টর সাহেবের পুস্তকের উপর নির্ভর করিতে হইল। কতকটা যেন তাঁহার বর্ণনার সহিত প্রকৃত বস্তু মিলাইয়া দেখিলাম। আমাদের পাণ্ডা বলিলেন এই দুই ক্ষুদ্র গিরিতে ৭৫২ টা গুহা আছে। আমরা অনেকগুলি গুহা দেখিলাম সংখ্যা গণনা করি নাই। এই গুহা গুলিকে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহা এদেশের বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিন অবস্থার সহিত তাহার বেশ ঐক্য হয়। প্রথম অবস্থাতে ভিক্ষুগণ কঠিন বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতা লইয়া সাধন করিতেন। জনসঙ্গ ত্যাগ একটি প্রধান সাধন ছিল। যদিও এই অল্প স্থানে সম্ভবত অনেকে বাস করিতেন তথাপি তাঁহারা

সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না। ঐ তীব্র বৈরাগ্যের সময়ে যে সকল গুহা খোদিত হইয়াছে তাহার এক একটিতে এক জনের অধিক থাকিতে পারা যায় না। এমন কি কোন কোন গুহাতে চড়িতে কষ্ট হয় ও পড়িয়া যাইবারও আশঙ্কা আছে। এই প্রথম যুগের গুহাগুলির কোন সৌন্দর্য্য নাই—কেবল পাহাড়ে গর্ত্ত করিয়া এক জন লোকের থাকিবার স্থান মাত্র করা হইয়াছিল। অপর এক শ্রেণীর গুহা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম রাজা ও ধনী লোকের ধর্ম্ম হইয়াছিল। গুহাগুলি অত্যন্ত প্রশস্ত, বহু লোক একত্র বসিয়া "উপশোথ" ইত্যাদি সভা করিবার স্থানও আছে এবং গুহাগুলির ভিতর বাহির সুন্দর করিতে অনেক চেষ্টা হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর গুহাগুলি বিলাসের চিহ্ন পূর্ণ, বনেও বিলাস প্রবেশ করিল, ধর্ম্মেও তখন দুর্নীতি প্রবেশ করিল তাহার পরই অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম উড়িষ্যা হইতে ক্রমে তাড়িত হইল। আমরা উদয়গিরিতে অল্প দূব চড়িয়াই "রাণীনুর" নামক প্রসিদ্ধ গুহা দেখিতে পাইলাম। পাহাড় কাটিয়া গুহা করা হইয়াছে, তাহা আবার দ্বিতল। নীচতলায় ৪টি ঘর—বেশ প্রশস্ত, প্রত্যেক কুঠরী ৯ হাত লম্বা প্রায় ৫ হাত চওড়া ও ৫ হাত উচ্চ, এক এক ঘরের দুইটি দরজা। ভিতরে গেলে যেন একটু হাঁপ লাগে। উপর তলাতেও এইরূপ ৪টি ঘর, এই ঘরের সম্মুখে বেশ প্রশস্ত বারাণ্ডা আছে। উপরের ও নীচের বারাণ্ডার সম্মুখে পাথরে কাটা অনেক ছবী আছে। কথিত আছে যে রাণী এই সকল গুহা খোদাইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের ইতিহাস ইহাতে লিখিত আছে। প্রথম ছবীতে রাণীর নিকট সংবাদ ও উপঢৌকন যাইতেছে, দ্বিতীয় ছবীতে রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ, তৃতীয় ছবীতে বিবাহ ও বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত যুদ্ধ, তাহার পর সকল ছবীব অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। শেষে রাণী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ ভিক্ষুণী হইয়াছেন। এত কালে প্রস্তরগুলিও বালীর মত হইয়া গিয়াছে ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উদয় গিরিতে আরও অনেক গুলি বড় বড় গুহা আছে। একটা হাতীর মুখের আকৃতি, একটা বাঘের মুখের মত। আমরা এই ব্যাঘ্র মুখে বসিয়া বিশ্রাম করিলাম। এখানে গণেশ গুহা নামক একটি গুহা আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় প্রাচিন কালের কোন গুহাকে বিকৃত করিয়া কতকগুলি ছবি কাটিয়া একটা গুহা আধুনিক সময়ে করা হইয়াছে। উদয়গিরি দেখিয়া আমরা খণ্ড গিরিতে চড়িলাম। এখানে অনেকগুলি ছোট ছোট গুহা আছে। ৩।৪টা বড় গুহাও আছে। খণ্ডগিরিতে কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি করা আছে। প্রথমত দেখিলে মনে হয় যে বুদ্ধগয়াতে যেমন "ধ্যানী" ও "প্রচারী" বুদ্ধমূর্ত্তি আছে এগুলি সেই সময়ের ও সেইরূপ মূর্ত্তি কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহা বৌদ্ধদিগের খোদা মূর্ত্তি নহে। বুদ্ধ মূর্ত্তি ঠিক করা হইয়াছে কিন্তু শরীরের অঙ্গ এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে বৌদ্ধগণ ওরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিতেও ঘৃণা করিবে এবং বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির চারি দিকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ইত্যাদি করিয়াছে তাহা কখনও বৌদ্ধদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। কোন কোন বুদ্ধ মূর্ত্তির উপরে অনন্ত নাগের ফণা করা হইয়াছে, বুদ্ধগয়ায় এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগের ভাব কতক গ্রহণ করিয়া বুদ্ধকে দশ অবতারের অন্তর্গত করিয়া যেমন প্রকৃত বুদ্ধদেবকে দেশ হইতে দূর করিয়াছেন, প্রকৃত বুদ্ধ মূর্ত্তির বিষয়ও তাহাই করিয়াছেন। খণ্ড গিরির উপরিভাগে একটি মন্দির আছে, আমরা সেই মন্দিরে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলাম।

খণ্ডগিরি হইতে ফিরিয়া আসিতে বেলা দুই প্রহর হইল—ভুবনেশ্বরে ভোজন করিয়া আমরা বিকালে কটকে ফিরিলাম। পুনরায় বরযাত্রী দলে মিশিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। পুণ্যভূমি ঐতিহাসিক ভূমি উড়িষ্যা দর্শন করিয়া অনেক শিক্ষা হইল। এই দেশে ধৌলির শিলাতে অশোকের আদেশ বাক্য ও কয়নকে সূর্য্যের মন্দির প্রভৃতি আরও অনেক দেখিবার স্থান আছে। প্রকৃত পক্ষে ক্ষুদ্র উড়িষ্যাতে যত দর্শনের উপযুক্ত স্থান ও দেবমন্দিরাদি আছে এত বড় বঙ্গে তাহার সিকিও নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় উড়িষ্যাবাসীগণ ভীরু বাঙ্গালী হইতেও ভীরু এবং অত্যন্ত নির্ধন, ইংরাজী শিক্ষা এদেশে এখনও অধিক বিস্তৃত হয় নাই, তবে বাবুগিরি একরূপ বেশ প্রবেশ করিয়াছে। স্ত্রীলোকের সাড়ী অত্যন্ত চওড়া পাড়যুক্ত কিন্তু হাঁটুর নীচে নামে না। নাক ও কাণের গহণার ওজন আর কিছু কমা ও সাড়ী আরও প্রশস্ত হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়।

গয়া।

(ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।)

গত বুধবার অপরাহ্নে আমি বাঁকিপুর হইতে গয়ায় পঁহুছিয়াছি। এখানে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ডাক্তর চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছি। সমবিশ্বাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডিঃ কলেক্টর শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র রায় এখানে স্থিতি করিতেছেন। গুরুতর বিষয় কার্য্যের ব্যাপৃতির সঙ্গে ধর্ম্মোৎসাহ ও উপাসনা নিষ্ঠা তাঁহার জীবনে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ অন্য কাহার জীবনে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্যহ নিশান্তে ৫টার সময় তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ক্রমে ২।৩টী বন্ধুর আলয়ে যাইয়া উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। এখানে কয়েক দিন ডাক্তার চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে আমাকে উপাসনা কার্য্য করিতে হইয়াছিল, প্রকাশ বাবু প্রত্যহ প্রাতে ৭টার সময় আসিয়া তাহাতে যোগ দান করিয়াছেন ; ভিন্ন পরিবার হইতে কয়েকটী মহিলা আসিয়াও যোগ দিয়াছেন। যত্ন ও জীর্ণ সংস্কারের অভাবে গয়ার ব্রাহ্মসমাজ গৃহ বহুকাল হইল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্ণ ও ছিল না। সমাজ গৃহের ভিটে সিম বেগুন ইত্যাদি তরকারি জন্মিত,

সম্প্রতি সেস্থানে একটি সুন্দর পাকা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আদর্শে প্রস্তুত। এই মন্দিরের ভিতরকার দৈর্ঘ্য ২২ ফুট, প্রসর ১২ ফুট মাত্র। তাহার চূণ-কাম এবং চূড়ার কিঞ্চিৎ কাজ অবশিষ্ট আছে। দুই পার্শ্বে বারাণ্ডা হইবে, এরূপ প্রস্তাব আছে। ডাক্তার চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় ও রেলওয়ে রোড ইনস্পেক্টর শ্রীমান্ তারকনাথ রায় ও স্থানীয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত লালা রেওয়া লাল প্রভৃতির যত্ন চেষ্টা ও অর্থ সাহায্যে এই ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসব হইবে, তাহাতে এখনকার ব্রাহ্মসমাজের আদি সেবক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয় ভাগলপুর হইতে আহূত হইবেন এরূপ প্রস্তাব হইয়াছে। অত্রত্য জিলা স্কুলের ভূতপূর্ব্ব দ্বিতীয় শিক্ষক স্বর্গগত শ্যামাচরণ সেন ও ভাগলপুরস্থ শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের প্রতি এস্থানের সকল শ্রেণীর লোকের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তাঁহারাই গয়া ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক ও তাহার উন্নতির মূল ছিলেন। অত্রত্য ব্রাহ্মমণ্ডলীর অনেক উন্নত লোক লোকান্তরিত ও স্থানান্তরিত হওয়াতে সমাজ অতিশয় হীনা-বস্থাপন্ন হইয়াছে। কেবল ডাক্তার চন্দ্রনাথ বিলুপ্ত সমাজ গৃহের প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে স্থাপিত একটি ক্ষুদ্র কুটীরে ২।১ টী বন্ধু ও ও কন্যাদ্বয় সহ সাপ্তাহিক উপাসনা করিয়া কোন প্রকারে সমাজটি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণ আশা করা যায়, ক্রমে ইহার সভ্য সঙ্খ্যার বৃদ্ধি সহ ইহার উন্নতি হইবে।

গত রবিবার প্রাতে এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপা-সনার কার্য্য আমাকে করিতে হইয়াছিল। বিশ্বমন্দির, ব্রহ্মমন্দির এবং হৃদয় মন্দির এই ত্রিবিধ মন্দির বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। গত কল্য সোমবার যিশু খ্রীষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষে রামশিলা পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ একটি রমণীয় উদ্যানে প্রায় সমস্ত দিন যাপন করা গিয়াছে। কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু ও মহিলা উপাসনাতে যোগদান করি য়াছিলেন। খিচরান্ন প্রস্তুত করিয়া সেই উদ্যানে মধ্যাহ্নে সকলকে ভোজন করিতে হইয়াছিল। পর্ব্বতেও উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া মহিলারা বিশেষ আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন ইতিপূর্ব্বে গয়াতে ঈশা ও শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসবোপলক্ষে ৫০।৬০ জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সমবেত হইতেন, বাঁকিপুর ও অন্য অন্য স্থান হইতে অনেকে আসিতেন। এক পক্ষ বা সপ্তাহ পূর্ব্বে সংযমন নিরামিষ ভোজন এবং জীবন আলোচনাদি হইত।

গত শুক্রবার আমি বরাবর পর্ব্বতস্থ অপূর্ব্ব বৌদ্ধ কীর্ত্তিসকল দর্শন করিয়া আসিয়াছি। অদ্য ট্রেনে নওয়াদা সবডিবিজনে যাত্রা করিতেছি। তথা হইতে ১৭ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ রাজগিরি দর্শন করিতে যাইব এরূপ ইচ্ছা আছে। সবডিবিজনল অফিসর তথায় যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এ প্রকার আশা করি।

সম্প্রতি এক জন ইংরাজ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তীর্থ পর্য্যটনোপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান স্কটলণ্ডে, তিনি এক্ষণ "অশোক ভিক্ষুক" নামে পরিচিত। ৩০।৩১ বৎসর তাঁহার বয়ঃক্রম হইবে। তিনি অতি বিদ্বান্ লোক, সিলোনের একটি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইয়ুরোপীয় অনেকগুলি প্রাচীন ভাষায় তাঁহার অধিকার আছে। তদ্ভিন্ন তিনি চীনেভাষা ও সিলোনের ভাষা জানেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় কোন ভাষায় তিনি অভিজ্ঞ নহেন। এই নবীন পরিব্রাজক কলেজের প্রিন্সিপালের পদ পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়াছেন। অপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় তাঁহার মস্তকাদি মুণ্ডিত, একখানা মাত্র গৈরিক বস্ত্রে অঙ্গাচ্ছাদিত, তিনি শূন্য পদে চলেন, দিবাভাগে একবার মাত্র ভিক্ষায় ভোজন করেন, কাষ্ঠাসনাদিতে না বসিয়া ভূতলে উপবেশন করিয়া থাকেন। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলিয়া আপনার পরিচয় দান করেন, বৌদ্ধ উপদেষ্টা ও ধর্ম্মযাজক বলিয়া পরিচয় দানে কুণ্ঠিত। এই অশোক ভিক্ষু বলেন, "দুঃখ, অনিত্য ও অনাত্ম" এই তিনটি বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমন্ত্র। ইহা প্রথম সাধন করিতে হয়, ইহাতে সিদ্ধ হইলে নির্ব্বাণ লাভ হয়, কিন্তু নির্ব্বাণ একটি অভাবাত্মক বিষয়, নির্ব্বাণ লাভের পর সাধককে ভাবাত্মক অর্হৎ হইতে হয়। কোন শাস্ত্রে পড়িয়া উপদেশ শুনিয়া ধর্ম্মলাভ হয় না। গুরু পরম্পরার সাহায্যে ধর্ম্মজীবন হইয়া থাকে। পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম নহে। ইহা জ্ঞান মাত্র। পৃথিবীর ধর্ম্ম সকল ও ধর্ম্মপ্রচারক সকল বিবাদের মূল। আজ যদি রাজ শাসন ও আইনের শাসন না থাকিত, তবে খ্রীষ্টান পাদরী বা পূর্ব্ব কালের অপর ধর্ম্মদ্বেষী লোকের ন্যায়, ভিন্ন ধর্ম্মাব-লম্বী সহস্র সহস্র নরনারীকে অগ্নিতে দগ্ধ করিত বা অস্ত্রাঘাতে নিহত করিত। তিনি প্রশ্নক্রমে অনেক উচ্চ উচ্চ কথা বলিয়া-ছেন। এই নবীন সন্ন্যাসী অত্রত্য এক জন ডাক্তারের আবাসে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় প্রয়োজন বশতঃ কিছুদিন হাজারীবাগে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেখানে ৪ঠা ডিসেম্বর ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসুর স্বর্গগতা মাতৃ ঠাকুরাণীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। তৎপর কয়েক দিন ব্রহ্মমন্দিরে গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। পাঠ শুনিবার জন্য ব্রাহ্মগণ, কয়েকটি উকীল ও অপরাপর লোক উপস্থিত হইতেন। প্রতি রবিবার মন্দিরেও তিনি উপাসনা করিতেছেন। তথায় শ্রীমান্ ব্রজকুমার নিয়োগীর কন্যার ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ ঘোষের কন্যার নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বিধান জননী কন্যাদ্বয়ের মঙ্গল করুন।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন গয়াতে গিয়াছেন।

সাধক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেব লিখিয়াছেন—"শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমার কনিষ্ঠ পুত্র, যাহাকে ছয় মাসের রাখিয়া তাহার গর্ভধারিণী পরলোক গমন করিয়াছেন গত ১২ই পৌষ মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় লিভার প্লীহা রোগে সেই শিশুটী পরলোক গমন করিয়াছে। দয়াময়ী জগজ্জননী তাঁহার প্রেম ক্রোড়ে শিশুকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি বারি দান করুন এই প্রার্থনা।"

আমরা দুঃখিতান্তকরণে প্রকাশ করিতেছি, আমাদের স্বর্গগত ভাই কালিশঙ্কর কবিরাজের একটী দৌহিত্র ও একটী দৌহিত্রী বিগত পক্ষে পরলোকে যাত্রা করিয়াছে। একমাসও গত হয় নাই তাহাদের গর্ভধারিণী পরলোকস্থা হইয়াছেন. আর এই অল্পকাল মধ্যেই দুইটী পুত্রকন্যা সেই লোকে চলিয়া গেল। পরম মাতা শোকাকুল পিতা ও ভ্রাতাদের অন্তরে শান্তি দান করুন। তাহাদের পিতা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"গত কল্য দিবা দুইটার সময় দ্বিতীয় পুত্র সুশীল রক্তামাশয় রোগে নির্ম্মলার নিকট চলিয়া গিয়াছে। * * * সেই অনাথনাথ দীনবৎসল মাতৃহীন বালককে আপনার মহা আশ্রমে লইয়া গেলেন। * * * সেখানে খোকা খুকী কেমন আছে? যদি তাহারা বাঁচিয়া না থাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে লিখিবেন। যাহার কেহ নাই সে আর বিপদের ভয় করিয়া কি করিবে? এ প্রাণ একদিন যাইবেই। * * *"

নববিধান বিশ্বাসী যুবক শ্রীমান্ মুক্তিনাথ দাস গত ৭ই পৌষ সাংঘাতিক বসন্তরোগে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। মুক্তিনাথ ব্রাহ্মছাত্রাবাসে একজন উৎসাহী যুবা ছিলেন, কলিকাতা মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি অতি বিনীত স্বভাব ছিলেন, রোগী সেবাতে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। এই সুশীল যুবার অভাবে আমাদের কলিকাতাবাসী যুবক ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়াছেন, আমরাও অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। করুণাময় পরমেশ্বর পরলোক গত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন এবং পুত্রহারা বৃদ্ধপিতার অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন। গত ১৩ই পৌষ ৯২ নং হ্যারিসন রোড ভবন ছাত্রাবাসে তাঁহার আত্মার সদ্গতির জন্য বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীমান্ প্রমথলাল সেন উপাসনা কার্য্য করিয়াছেন।

প্রেরিত।

ব্রহ্মোৎসবের বিবরণ।

অত্রত্য নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব বিগত ২৯শে অগ্রহায়ণ আরম্ভ হইয়া ৮ই পৌষ শেষ হইয়াছে। এই নয় দিবসের সংক্ষিপ্ত কার্য্য প্রণালী এইরূপ—

২৯শে অগ্রহায়ণ প্রাতে বিধানাশ্রমে উপাসনা হয় এবং অপরাহ্ণ ৬টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে বিলাত হইতে আগত শ্রদ্ধেয় ফ্লেচার উইলিয়ম সাহেব প্রার্থনা ও উপদেশ (Sermon) দেন। প্রার্থনাটী অতি সরল ও উপদেশ সারগর্ভ হইয়াছিল। সাহেব Material and spiritual conception ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবে ঈশ্বরানুভূতি বিষয়ে উৎসাহ পূর্ণ ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

১লা পৌষ শুক্রবার প্রাতে বিধানাশ্রমে উপাসনা হয় এবং অপরাহ্ণে বাবু বিহারীকান্ত চন্দের বাসায় উপাসনা হয়।

২রা পৌষ শনিবার প্রাতে বিধানাশ্রমে উপাসনা এবং অপরাহ্ণে মন্দিরে আলোচনা হয়। এই দিবস ঢাকা হইতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস রায় ও প্রচারক ভাই মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আসিয়াছিলেন। মন্দিরে শ্রীযুক্ত এ, সি, সেন সাহেব এবং দুর্গাদাস বাবু মহাশয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয় আলোচনা হইয়াছিল।

৩রা পৌষ রবিবার সমস্তদিনব্যাপী উৎসব ব্রহ্মমন্দিরে সম্পন্ন হয় না। প্রাতঃ সন্ধ্যা দুই বেলার উপাসনা স্থানীয় প্রচারক মহাশয়দ্বয় সম্পন্ন করেন। মাধ্যাহ্নিক উপাসনা বাবু বিহারীকান্ত চন্দ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ ৫টার সময় বহুতর শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীযুক্ত সেন সাহেব বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ঈশ্বরের একটী বিশেষ দান এই বিষয় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে ধর্ম্ম আমরা পাইয়াছি, ইহার সঙ্গে অপর কোন ধর্ম্মের তুলনা হয় না। এই ধর্ম্মে যোগ ভক্তি এবং ইচ্ছার একত্র মিলন হইয়াছে। এই সময়ের জন্য এইটী পূর্ণ ধর্ম্ম। দুঃখের বিষয় আমাদের এদেশে এই ধর্ম্মটী প্রকাশিত হইয়াছে, আমাদের পরিত্রাণের জন্য, কিন্তু আমরা ইহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে চাহিতেছি না। আমরা ভূত এবং ভবিষ্যৎ ভাবিতেছি। বক্তৃতাটী অতি সময়োপযোগী হইয়াছিল।

৪ঠা পৌষ সোমবার প্রাতে বিধানাশ্রমে উপাসনা হয়—মধ্যাহ্নে মহিলাদিগের আলোচনাদি হয়। অপরাহ্ণ ৬টার পর বাবু সুরেন্দ্র নাথ রায়ের বাসায় উপাসনা হয়।

৫ই পৌষ মঙ্গলবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়। অপরাহ্ণে ৪টার পর সহরের প্রধান প্রধান রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনে দুইটী স্থানে প্রকাশ্য বক্তৃতা হইয়াছিল।

৬ই পৌষ বুধবার প্রাতে বিধানাশ্রমে উপাসনা হয়। অপরাহ্ণ ৬টার সময় শ্রীযুক্ত সেন সাহেবের কুঠিতে উপাসনা এবং খেচরান্ন ভোজন হয়।

৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার প্রাতে বিধানাশ্রমে উপাসনা, অপরাহ্ণে নিকটবর্ত্তী কোন এক গ্রামে প্রচার যাত্রা হয়।

৮ই পৌষ শুক্রবার প্রাতে বিধানাশ্রমে উপাসনা হইয়া উৎসবের শান্তিবাচন হয়।

এবারকার উৎসব একটী শোকের ঘটনায় আরম্ভ হয় এবং শোকের ব্যাপারে পারসমাপ্ত হয়। বিধান জননী একটী কন্যা সন্তান দেখাইয়া সাত দিবসের মধ্যে লইয়া যান, পরিবারস্থ সকলেই এই শোকজনক ঘটনার মধ্যে ক্রন্দন করিতে করিতে উৎসবের উদ্বোধন করেন। উৎসবের সমাপ্তির পূর্ব্বেই নগরসঙ্কীর্ত্তনের দিবস ধর্ম্মবন্ধু বাবু বসন্তকুমার ঘোষের পরলোক সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। এই শোক সংবাদে সকলের চিত্ত একবারে অভিভূত হইয়াছে। বৎসরাধিক কাল যাবৎ ইনি মস্তিষ্কের পীড়ায় কাতর

ছিলেন। বিগত ৪ঠা পৌষ ঢাকানগরে ঐ পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার বিধবা পত্নী এবং একপুত্র ও ছয়টী কন্যা বর্ত্তমান। পুত্রটীর ১০ বৎসর বয়স। কন্যা তিনটী বিবাহিতা, তিনটী নাবালিকা। অর্থ সংস্থান বিশেষ কিছু নাই। আত্মীয় বন্ধুদিগের সাহায্যই এই নিরুপায় পরিবারের জীবিকানির্ব্বাহের উপায় আমাদের বন্ধুর ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং ঈশ্বর নির্ভর অতি প্রবল ছিল। তিনি কদাচ সাংসারিক চিন্তা করেন নাই। ভগবানের কৃপায়ই এই পরিবারের সম্বল। তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন না বটে, কিন্তু বহুকাল সমাজের সম্পাদক এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত সমাজের সভ্য ছিলেন, নিয়মিত উপাসক ছিলেন। উৎসবাদিতে তাঁহার কত উৎসাহ হইত। কীর্ত্তনে করতাল বাজাইয়া কেমন মত্ত হইতেন। রবিবাসরিক গাছতলায় খেচরান্ন আহারে তাঁর কত অনুরাগ। প্রচারক মহাশয়দিগের প্রতি অটল শ্রদ্ধা ছিল। বিশেষতঃ আচার্য্যদেবের প্রতি তাঁহার অকৃ[illegible]স জন্মিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব এবং বঙ্গবন্ধুর নিয়মিত [illegible] পাঠক ছিলেন। তাঁহার আসন দেবালয়ে [illegible] তাঁহার স্থান পূর্ণ করে এমন তো কাহাকেও [illegible] জন্য আমরা কি করিব। আনন্দময়ী মা বন্ধুর [illegible] শান্তি ক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং তাঁহার শোকগ্রস্ত পরিবারকে শান্তি দান করুন এই প্রার্থনা।

প্রণত

শ্রীবৈদ্যনাথ কর্ম্মকার।

ধসা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশৎ ব্রহ্মোৎসব।

ধসা গ্রাম হাবড়া জেলার অন্তর্গত, আমতা রেলপথের পার্শ্বে; কলিকাতা হইতে প্রায় বিশ মাইল অন্তর। গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বসতি। এই গ্রামে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুরাগী ৺শ্যামাচরণ রায় বাস করিতেন। তিনিও ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। তিনি বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিতেন, এবং ব্রহ্মোপাসনাদিতে যোগ দান করিতেন। বত্রিশ বৎসর হইল তাঁহারই উদ্যোগ ও যত্নে ধসা গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার বাসভবনের একটী কুঠরী ব্রহ্মোপাসনার জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহে তথায় ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। গ্রামের লোকেরা কেহ কেহ উপাসনায় যোগ দান করিয়া থাকেন। খৃষ্টমাসের বন্ধের সময় ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ প্রতি বৎসর তথায় ব্রহ্মোৎসব হইয়া থাকে। আজ প্রায় চারি বৎসর হইল শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার জীবন কালে তিনি মহা সমারোহ সহকারে উৎসব করিতেন. কলিকাতা হইতে গাইবার বাজাইবার লোকজন লইয়া যাইতেন। পত্রপুষ্প ও আলোকমালায় গৃহ, প্রাঙ্গন, পথ ইত্যাদি সজ্জিত হইত, নহবৎ বাদ্য হইত। উৎসবের তিন দিন উপস্থিত লোকজনকে ভোজ দান করা হইত। এক দিন গ্রামস্থ ও অপর গ্রামের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিবিধ উপচারে ভোজন করান হইত। ভোজ ও আমোদ আহ্লাদ দ্বারা জনসাধারণকে উৎসবে আকর্ষণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি জীবিত কালে এইরূপে গ্রামে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা ও উৎসবাদি করিয়া অনেক সময় গ্রামিকদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান, একটী পোষ্যপুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। সামান্য ভূসম্পত্তি ও জমি জমা দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। এক খানি উইল করিয়া গিয়াছেন, খামারের চৌদ্দবিঘা জমির উপস্বত্ব দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রহ্মোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। গ্রামের এক জন লোককে স্বীয় ব্যয়ে কলিকাতায় রাখিয়া সঙ্গীত ও বাদ্য শিখাইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে সমাজে গান করিত, শ্যামবাবু তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণ জন্য কয়েক বিঘা জমি চাকরান্ দিয়াছিলেন, উৎসবের সময় বিবিধ প্রকার কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর ভার আছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে বার্ষিক কিছু কিছু বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। গায়কটী মারা গিয়াছে। উইলের এক্সীকিউটার এবং তাঁহার পোষ্য পুত্র শ্রীমান হরিচরণ রায় এখনও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদি নিয়মিত রূপে করিয়া আসিতেছেন।

এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া অমরাগড়ির ভাই আশুতোষ রায় ও আমি এবৎসর ধসাতে গিয়াছিলাম। আমরা ৯ই পৌষ হাবড়া আমতা লাইটরেলওয়ে যোগে বেলা ১২টার সময় ধসা উপস্থিত হই। মধ্যাহ্নে আমরা দুজনে ও আরও দুএকটী লোক একত্র উপাসনা করি। সায়ংকালে উপাসনাগৃহে সংকীর্ত্তন হয়, এবং নগর সঙ্কীর্ত্তনের গানটী সকলে অভ্যাস করেন। গ্রামের অনেক গুলি ভদ্র ও সাধারণ লোক কীর্ত্তন শিখিয়াছিলেন। ১০ই পৌষ রবিবার সকাল বেলা আশুবাবু উপাসনা করিলেন, সায়ংকালে সামাজিক উপাসনা আমাকে করিতে হইল। ব্রহ্মোৎসব কি এবং কিরূপে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই বিষয়ে উপদেশ হইল।

১১ই পৌষ সকাল বেলা উপাসনা হইল। অপরাহ্ণ প্রায় তিনটার সময় সকলে উপাসনা গৃহে সমবেত হইলেন এবং আশু বাবু একটী প্রার্থনা করিলেন। তৎপর কীর্ত্তন করিয়া বাহির হওয়া গেল। অল্প দূরে যাইয়া কীর্ত্তন থামিয়া গেল। প্রায় দেড় মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে যাইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রায় ২৫। ৩০টী লোক আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। বেলে, প্রতাপ পুর, রামপুর, রামেশ্বর পুর ও পাইকপাড়া গ্রামে কীর্ত্তন করিয়া প্রায় রজনী নয় ঘটিকার সময় আমরা গৃহে প্রত্যাগত হই। ধসা গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া আবার কীর্ত্তন হইল, গৃহপ্রাঙ্গনে কিছুকাল কীর্ত্তন করিয়া সেদিনের কার্য্য শেষ হইল। সকলে কিঞ্চিৎ মিষ্ট জলযোগ করিয়া স্বস্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

১২ই পৌষ মঙ্গলবার সমস্ত দিন উৎসব। সকাল বেলা কয়েকটী মিষ্ট সংগীতান্তে উপাসনা হইল। মানুষের উচ্চ অধিকার বিষয়ে উপদেশ হইল। অপরাহ্নে পাঠ ও সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে চণ্ডিমণ্ডপে উপাসনা হইল। মহিলাদের জন্য পরদার অন্তরালে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্ত্রীলোক পুরুষ প্রায় ২০০ শত উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরল শিশুর মত পরম মাতার জন্য ক্রন্দন করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় বিষয়ে উপদেশ হইল। উপাসনা কীর্ত্তনাদিতে প্রায় ১১টা রাত্রি কাটিয়া গেল। তৎপর লুচিমণ্ডা দ্বারা নিমন্ত্রিতদিগকে পরিতুষ্ট করা হইল। দুই বেলাই আমাকে উপাসনার কার্য্য করিতে হইল।

১৩ই পৌষ বুধবার সকাল বেলা সমাজঘরে আশুবাবু উপাসনা করিলেন। অপরাহ্নে নাইকুলী গ্রামে বিশালাক্ষী তলায় সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইল। অনিত্য সংসারে নিত্যবস্তু অন্বেষণ কর বিষয়ে বক্তৃতা হয়। আমাকে বক্তৃতা করিতে হইল। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিবাচন হইল। পরদিন আমরা চলিয়া আসিলাম।

অনুগত

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।